শত বর্ষের শত গল্প

শত বর্ষের শত গল্প

প্রথম খণ্ড

॥ ১৭৮৭ - ১৮৯৭ ॥

সাগরময় ঘোষ

সম্পাদিত
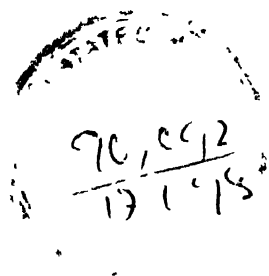
প্রাপ্তিস্থান

দে বুক স্টোর। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলি - ৭৩

পত্র ভারতী। ৩/১ কলেজ রো, কলি - ৯

অনুষ্টুপ। ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলি - ৯

ভস্তক। ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি - ৯

সূচিপত্র

ভূমিকা

।। ১ ।।

"কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে...লিখেছিলে মেঘদূত!" রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এর কোনও উত্তর পাননি। কিন্তু তাতে কোনও ক্ষতি হয়নি, মেঘদূতের রস আস্বাদনে কোনও অসুবিধে ঘটেনি। অথচ, কোন্ সময়ে এই খণ্ডকাব্যটি রচিত হয়েছিল তা জানার কৌতূহল অনেকের আছে। কেউ-কেউ বলেন, কালিদাসের কাল গত হয়েছে দেড় হাজার বছর আগে। তা দেড়ই হোক বা আড়াই-ই হোক—সে বিষয়ে আমাদের কোনও কৌতূহল নেই; যতক্ষণ মেঘদূত হাতে আছে ততক্ষণই কালিদাস আমাদের সঙ্গে আছেন, ততক্ষণই তিনি আমাদের সমকালীন।

গল্প সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা অনুরূপ। আমাদের ধারণা গল্প হচ্ছে মানুষের সমকালীন। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে এসেছে এই জিনিসটি মানুষের ধারার সঙ্গে, প্রত্যেকটি ধাপে মানুষের সমকালীন থাকতে থাকতে আজ সেই গল্প আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে আমাদের সমকালীন চেহারা নিয়ে।

কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে গল্পেব উৎপত্তি—ইতিহাসের পাতায় তা লেখা নেই। লেখা নেই বলেই বিস্মৃত। এবং বিস্মৃত বলেই লোকে বিস্মিত হয়ে ভাবতে বসে—কবে থেকে এল এই বস্তু এই পৃথিবীতে!

আমাদেব মনে হয, যবে থেকে মানুষ এল। মানুষ এল—অন্যান্য জীবের মত কেবল হাত-পা নাক-মুখ-চোখ নিয়ে না—একটা বাড়তি জিনিস নিয়ে। মন নিয়ে। মনের খোরাক দরকার, সেই খোরাকও এল সেই সঙ্গে; এল গল্প।

এখনও তো মানুষ আসে। নতুন মানুষ আসে। তাদের মুখে কথা ফুটলেই সে বলে, 'মা, গল্প বলো।' মুখ ফুটলেই এটা-ওটা-সেটা সে খেতে চায় বটে, সে-সব হচ্ছে তার শরীরের খিদে মেটাবার জন্যে, তার মনের খিদে মেটাবাব জন্যে সে কিন্তু বলে অন্য কথা, বলে 'ঠাকমা, গল্প বলো। ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমির, রাজকন্যা বা রাজপুত্তুরের, রাক্ষসের খোক্কসের।' গল্প তাহলে মানুষের দ্বিতীয় চাহিদা। প্রথমটা জীবনধারণের জন্যে দরকার, আর এই দ্বিতীয়টা সম্ভবত দরকার প্রাণধারণের জন্যে। জীবনধারণের উপযোগী খাদ্যের অন্ত নেই। অনেকে বলে থাকেন, এবং সম্ভবত ঠিকই বলে থাকেন, যে, পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যার খাদ্যের কোনো বাছ-বিচার নেই। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, মানুষ সব খায়। অন্য যে-কোনও প্রাণীর খাদ্যনির্বাচনে একটা নীতি আছে, একটা নিয়ম আছে কিন্তু মানুষ এ-ব্যাপারে নীতি-নিয়ম মানে না। খাদ্যের উপকরণ নিয়ে মানুষের যেমন অবাধ উদারতা, গল্পের উপাদান নিয়েও তেমনি। পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু নেই যা নিয়ে মানুষ গল্প না বানায়—পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ থেকে আরম্ভ ক'রে যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থই তার গল্পের উপাদান। এমনকি, যে বস্তুর সঙ্গে কখনও দেখা হয়নি, যার অস্তিত্ব আছে কি না-আছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তা সত্ত্বেও সেই কাল্পনিক বস্তুকেও গল্পের উপাদান করা হয়ে থাকে। পরীরা তাই এসে গল্পের আসর জুড়ে বসে, তাই শিশুরা চোখে নিদারুণ কৌতুহল নিয়ে বলে 'গল্প বলো ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমির, গল্প বলো রাক্ষসের খোক্কসের।' এ-সবের অস্তিত্ব না থাক, তাতে কোনও অসুবিধে হয়নি, গল্পের মধ্যে দিয়েই তৈরি হয়েছে এদের চেহারা। চাক্ষুষ দেখতে না পেলেও এদের আকৃতি-প্রকৃতি কেমন তা আমরা জানতে পেরেছি। যার কল্যাণে এই অসম্ভবও সম্ভব হয়েছে তারই নাম দিয়েছি—গল্প।

অথচ এর বিপরীতটাও গল্প। আমাদের বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত কাহিনী এক-এক সময় আমাদের মনে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি জাগায়। আমরা তাকে গল্প বলে মনে করি। গল্প বলে মেনে নিই।

আসলে গল্পের কিন্তু কোনও সংজ্ঞা নেই। কাকে গল্প বলে, সহজে তা বলা বড় সহজ নয়। কিন্তু নিজেদের বুঝবার জন্যে একটা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। মানুষে যা শুনতে চায় সেইটেই গল্প। বৈঠকে বৈঠকে এইজন্যে বৈঠকী গল্পের আসর জমে ওঠে।

কিন্তু আমরা যে-গল্পের কথা বলতে বসেছি তা মুখ্য নয়—লেখ্য। মুখেবলা গল্প হাওয়ায় হারিয়ে যায়, লিখে-বলা গল্প থাকে কেতাবে কবলিত।

হাওয়ায় হারিয়ে যদি না যেত তাহলে আদিম আদম তাঁর নবপরিণীতা বধূ ঈভকে যে গল্প বলেছেন তা আজ আমরা হয়তো খুঁজে পেতাম। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন নতুন চেতনা এসে প্রাণকে নাড়া দিল, তখন প্রাণের মধ্যে নিশ্চয়ই জেগে উঠেছিল অজস্র কলরব। সেই কলরবই টুকরো-টুকরো কথায় পরিণত হয়েছে, সেই টুকরো-টুকরো কথা যুক্ত করে আদম ঈভকে এবং ঈভ আদমকে শুনিয়েছে গল্প। তা যদি না শোনাবে তো নির্বান্ধব এই বিপুল পৃথিবীতে সেই নবীন দম্পতি সময় কাটাতো কী ভাবে। গভীর দুখে দুখী না হোক—গভীর সুখে সুখীই না হয় হল, কেবল কি সেইভাবে তারা দুজনে মুখোমুখি নীরবে বসে ছিল? বিশ্বাস হয় না। বর্তমান কালের নবীন মানুষেরা মুখ ফোটার সঙ্গে-সঙ্গে যে চাহিদা জানায়, সেই চাহিদাটি সেই আদিম যুগের নবীন মানবদেরও ছিল। সেইকাল থেকে বয়ে আসছে শত মানুষের ধারা, আর সঙ্গে সঙ্গে বয়ে আসছে গল্পেরও ধারা। আমাদের তো এই ধারণা।

কিন্তু যার কোনও প্রমাণ দাখিল করতে পারা যাবে না, তা নিয়ে তর্ক করা সংগত হয় না। সুতরাং ও প্রসঙ্গ থাক। যে আকারেরই হোক বা যে আকৃতিরই হোক—গল্পের জন্ম অনেক আগে ঘটেছে। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তার চেহারার বা রীতি-পদ্ধতির বদল হয়েছে অবশ্য। বিশেষজ্ঞেরা বলেন গল্পের জন্ম সাহিত্যের সূচনারও আগে। রূপকথা উপকথা ইত্যাদি আরম্ভ হয়েছে কবে থেকে তা জানা যায় না। সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা রচনা করছেন তাঁরা সাহিত্যের সূত্রপাতের অন্তত একটা আনুমানিক কাল নির্দেশ করতে পারেন। কিন্তু গল্পের? তা বুঝি তাঁরা পারেন না।

মানুষের জীবনটাই আসলে একটি ছোটগল্প। এইজন্য জীবন থেকে একে পৃথক করা সম্ভব না, এবং এইজন্যেই গল্পকে মানুষ জীবনেরই একটা অঙ্গ—জীবনেরই একটা অংশ—করে নিয়েছে।

অনুপ্রাসটা অপ্রাসঙ্গিক হয়তো হবে না—তাহলে নিঃসংকোচে বলা যায় যে, রূপকথা উপকথার মত আষাঢ়ে গল্প থেকে আরম্ভ করে চাষাড়ে গল্প পর্যন্ত সবই গল্পের কোঠায় পড়ে।

অবশ্য একটা কথা এখানে বলে নিতে হবে। গল্প নিয়ে আমরা এখন গল্প করছি বটে, কিন্তু এই জিনিসটি খুব পুরনো হলেও এই শব্দটি খুব বেশি দিনের না। দু-এক শতাব্দী হল এই শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে। আগে এই জিনিসেরই নাম ছিল অন্য। নাম ছিল—কথা। যেমন রূপকথা উপকথা। এবং কথা যদি একটু বিস্তৃত হত, তবে তাকে বলা হত—পরিকথা। এবং যদি খুব ছোট হত, তবে তাকে বলা হত—কথানক, অর্থাৎ বর্তমান কালে আমরা যাকে ছোটগল্প বলি সেই জিনিসই আগে হয়তো ছিল এই কথানক।

কিন্তু গোলাপকে যে নামেই ডাকা যাক তার সৌন্দর্যের বা সৌরভের ইতরবিশেষ ঘটে না। এত নাম পরিবর্তনের দরুন, আশা করি, গল্পেরও রসের কোনো ইতরবিশেষ ঘটেনি। একটি নদী দূর পাল্লার পথ চলতে চলতে বাঁকে বাঁকে তার নামের বদল হয়তো হয়, কিন্তু তবু সে থাকে

নদী, থাকে স্রোতস্বিনী। আমাদের দেশের পুরাণ তো ছোট ছোট গল্পে ঠাসা, আমাদের মহাভারত তো গল্পের রাজা। এসব আমরা জেনেও হয়তো সব সময় সে বিষয়ে সচেতন থাকিনে। মহাভারতের কথাই বলি—কুরু-পাণ্ডবের সংগ্রামের মূল কাহিনীর দুইপাশে অজস্র নরনারী ভিড় করে দাঁড়িয়ে, তারা হচ্ছে ছোট ছোট গল্পের নায়ক ও নায়িকা। এদের সকলের খোঁজ আমরা সকলে করিনে ও করিনি, কিন্তু তাদের দিকে একটু দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায় তারা ছোটগল্পের কি রকম আশ্চর্য উপকরণ নিয়ে উপস্থিত। এই উপকরণ নিয়ে গত শতকে অনেক নাটক লেখা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথও দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন মহাভারতের উপাদান নিয়ে। এবং বর্তমান কালেও এই উপকরণ ব্যবহার করে দু-একজন উৎসাহী সাহিত্যিক গল্প এবং কাব্য রচনা করেছেন। মহাভারতের মত গ্রীক পুরাণও গল্পের উপাদানের আকর। রোমক লেখক ওভিদ ও আপুলিয়াস পদ্যে ও গদ্যে সেই উপকরণের সদ্‌ব্যবহার প্রথম আরম্ভ করেন।

আমাদেব এই প্রাচ্য ভূখণ্ডই আসলে গল্পের দিক থেকে অগ্রগামী। অনেক কাল আগের কথা, এই দেশ থেকে গল্পের ধারা পশ্চিমের দিকে প্রবাহিত হয় মধ্যযুগে, এবং তারই পরিণামে দেখা পাই বোকাচ্চিয়োর, দেখা পাই চসারেব—তাঁরা এইসব উপাদান লাভ ক'রে তাব উপর নিজেদের দক্ষতার ও প্রতিভার ছাপ দিয়ে নূতন ভাবে তা পরিবেশন করেন।

অবশেষে, ঐতিহাসিকদের মতে, চতুর্দশ খৃষ্টীয় শতকে গল্প ভেঙে যায় কয়েকটি ভাগে। বাস্তব গল্প, প্রেমের গল্প, হাসির গল্প, রূপক গল্প। এসব অবশ্য পশ্চিম-দেশের কথা। আমাদের দেশে এ-ধরণের ভাঙচুর হয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। তার প্রমাণ রূপকথা, তার প্রমাণ মহাভারত। মহাভারতের গল্পে হাসি আছে, কান্না আছে, দয়া আছে, মায়া আছে, শঠতা, কপটতা, মহত্ত্ব, বীরত্ব সবই আছে। এককথায, মানুষের চরিত্রের এমন কোনো দিক বা ঘটনা নেই যা মহাভারতের শাখা-কাহিনীতে বিবৃত না হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বলতে গেলে মহাভারত হচ্ছে একটি ছোটগল্পের সংকলন। আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই গল্প হচ্ছে লোকশিক্ষার একমাত্র বাহন। যুগ যুগ ধরে মানুষ ধর্ম দর্শন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেছে গল্পের মধ্য দিয়ে। গভীর তত্ত্ব আর জটিল জীবন-জিজ্ঞাসা সহজ সরল রূপ নিয়েছে ছোট-ছোট পৌরাণিক কাহিনী ও কিংবদন্তীর মধ্যে।

সেই গল্পের দেশের মানুষ আমরা। আমাদের কল্পনাও তাই বিস্তৃত, জল্পনাও তাই ব্যাপক। দেবদেবীর কল্পনা যখন আমরা করি তখনও তাঁদের বিশ্রম্ভালাপকে নেহাত প্রণয়কূজন বলে ভাবতে পারিনে, গল্পের কথা পেলেই আমরাও পঞ্চমুখ হয়ে উঠি। মেঘনাদবধ কাব্যে মাইকেল মধুসূদন হরগৌরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন তাঁরা গল্পে রত। বলেছেন—

পঞ্চতন্ত্রকথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে।

এই পঞ্চতন্ত্রকথাও গল্প। এখানে আমরা ঈশপের গল্পের কথা মনে করতে পারি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, পঞ্চতন্ত্রের চেয়ে ঈশপের নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশি। কিন্তু ঈশপের অনেক আগেই আমাদের দেশে আছে এই পঞ্চতন্ত্র আর আছে কথাসরিৎসাগর। পঞ্চতন্ত্রের বয়স কত বলা কঠিন। কিন্তু এ যে অতি সুপ্রাচীন তাব অন্যতম একটি প্রমাণ এই যে, দেবদেবীর মুখে এই কথা আরোপ করতে আমাদের কোনো দ্বিধা হয়নি। কিন্তু ঈশপের গল্প কোনও দেবদেবীর মুখে আরোপ করতে আমাদের দ্বিধা হবে।

মোটকথা, আমরা গল্প নিয়ে যে এমন মশগুল হতে পারি—এইটেই আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য একদিনে আসেনি; এর একটা উৎস আছে। ধারাবাহিকতা আছে। এইটুকু

বলার জন্যেই এই আলোচনা। আমরা আড্ডা দিতে যেমন পারি এমন বুঝি অন্য কোনও রাজ্যের বা দেশের লোক পারে না। গল্প না হলে আড্ডা জমে না। আড্ডার উপকরণই গল্প—সে খোসগল্পই হোক বা গালগল্পই হোক।

।। ২ ।।

এদেশে ইংরেজি প্রভাব আরম্ভ হয়েছে গত শতকের গোড়ায়। ইংরেজরা এসেছেন অবশ্য তার অনেক আগে, এবং পলাশীর প্রান্তরে আমাদের জাতীয় ট্র্যাজিডিও ঘটে গেছে। কিন্তু ইংরেজি প্রভাব বলতে যা বোঝায় তার দ্বারা অভিভূত হতে সময় লাগে, এবং ঐ জাতীয় ট্র্যাজিডিরও প্রায় বছর পঞ্চাশ পরে আমরা ইংরেজির কবলে পড়ি। সেই সময় থেকে আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাসের নতুন অধ্যায় শুরু। নতুন অধ্যায় শুরু—এই কথাটার উপরে জোব দিতে ইচ্ছে করি। কেননা, অনেকের হয়তো এই রকমের ধারণা আছে যে, প্রকৃতপক্ষে ঐ সময়েই আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের শুরু অর্থাৎ সূত্রপাত। ইংরেজরা এদেশে আসায় এবং আমাদের দেশের ও দশের উপরে তার প্রভাব পড়ায় আমাদের অকল্যাণ হয়েছে—এমন অকৃতজ্ঞ কথা বলার ইচ্ছে নেই। ইংরেজের দ্বারা আমরা উপকৃত হয়েছি—একথা অকপটে স্বীকার করতে হবে। তথাকথিত দেশাত্মবোধের প্রেরণায় যাঁরা এই উপকারকে অস্বীকার করেন তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়া যেমন কঠিন, তেমনি, যাঁরা ইংরেজ-প্রভাবকেই আমাদের জাতীয় জীবনের ও জাতীয় সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করেন তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়াও সহজ না। ইংরেজ শাসন ও ইংরেজি সাহিত্যকে আমরা পৃথকভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি বলেই আমাদের মতের এই ভিন্নতা।

এই প্রভাবের কথা তোলা হল এই জন্যে যে এ'কে উপলক্ষ্য করেই গত শতকে আমাদের সাহিত্যের নূতন অধ্যায় রচিত হয়েছে। ইংরেজিয়ানায় মত্ত হয়ে একদল নব্যযুবক সনাতনীদের ব্যঙ্গ করতে আরম্ভ করলেন, এবং সনাতনপন্থীরা নবভাবে ভাবিত নব্যযুবকদের তিবস্কার করার জন্যে লেখনী ধারণ করলেন। এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার আলোড়নে জেগে উঠল একটি আবর্ত – দেখা দিলেন রামমোহন রায়, দেখা দিল ব্রাহ্মসমাজ। সে আমলের বঙ্গবাসীর চোখে এসবের চেহারা কি রকমের ছিল, তা অনুমান করার চেষ্টা করতে চাইনে। এখন আমরা ঐসব আলোড়ন—আন্দোলনের থেকে প্রায় এক শতাব্দী দূরে সরে এসে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছি জাতীয় চেতনা তখন মন্থন করা হয়েছে। অমৃত ও হলাহল—দুই-ই হয়তো উঠেছে তাতে। কিন্তু হলাহল নয়, আমরা অমৃত বিষয়ে আলোচনা করছি।

অমৃত লাভ করেছি আমরা। আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা পেয়েছি মধুসূদনের, দেখা পেয়েছি বঙ্কিমচন্দ্রের, দেখা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের। এ আমাদের পরমলাভ। এঁরা কেউ-ই কেবল আমাদের স্বদেশী সাহিত্যের দ্বারা পুষ্ট নন—বিদেশী সাহিত্যের রসেও সঞ্জীবিত। অথচ এঁরা খাঁটি স্বদেশী। এঁদের রচনা যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, এঁদের দেশাত্মবোধের উগ্রতা ছিল না, ছিল গভীরতা। এঁরা বিদেশীকে নকল করেননি, বিদেশের যা ভালো তা গ্রহণ করে পরিপাক করেছেন। পরিপাক-কার্যটি উত্তমরূপে সাধিত হয়েছে বলেই তাঁদের রচিত সাহিত্যের স্বাস্থ্য এমন উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। ইংরেজি-প্রভাবের সঙ্গে আরও এক প্রভাব গত শতকের মাঝামাঝি দেখা দেয়। সে হচ্ছে ফরাসি সাহিত্যের প্রভাব। এই দ্বিবিধ সাহিত্য এসে আমাদের দেশের তদানীন্তন নব্যযুবকদের আন্দোলিত করে তোলে। তাঁদের ধারণা হয় যে, ইংরেজের প্রভাবে আমরা যেমন পেয়েছি রোমান্টিসিজ্‌ম্‌, ফরাসির প্রভাবে তেমনি পেয়ে গেলাম রিয়ালিজ্‌ম্‌। এ-দুটি পেলাম—

এতে আপত্তি নেই। কিন্তু আপত্তি এই যে, এ-দুটি জিনিসই আমাদের দেশে আগে থেকেই ছিল, সেই সঙ্গে ছিল সে সম্বন্ধে অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতা কথাটা রূঢ় শোনালে আমরা তার বদলে না হয় অন্য কথা বলতে পারি, বলতে পারি—উপেক্ষা।

কেবল এই কথা অকপটে স্বীকার করা যায় যে, গল্প-রচনায় আমরা সে-সময়ে তেমন মনোনিবেশ করতে পারিনি, ইংরেজ অথবা ফরাসিরা সাহিত্যের এই দিকটার উৎকর্ষ -সাধনে ব্রতী হয়েছেন আমাদের চেয়ে আগে। বিদেশের মাটি থেকে ওক্ গাছের চারা এনে আমাদের মাটিতে পোঁতা হল, এবং তারপরে আমরা পেলাম বট—এমন কথা আমরা যেন না ভাবি। গল্পও আমাদের ছিল, রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ও ছিল, রিয়ালিজ্‌ম্‌ও ছিল।

রোমান্টিসিজ্‌ম্? চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলীর কথা স্মরণ করলে আমরা এর প্রমাণ পাব। কেবল দুজন প্রধানের নামোল্লেখ করা হল, আরো অজস্র পদকার পদাবলী রচনা করেছেন। তাঁরা নিজের মনের ভাব প্রকাশ করেছেন ঐ পদে—নিজেই নিজ রচনার নায়ক সেজেছেন। রোমান্টিক রচনার এ হচ্ছে চরম দৃষ্টান্ত।

রিয়ালিস্টিক রচনাও আমাদের দেশে নতুন না। কবিকঙ্কণ তাঁর রচিত চণ্ডীকাব্যে যে-সব চরিত্র চিত্রিত করেছেন তার মত বাস্তব চরিত্র বুঝি হয় না। ভাঁড়ু দত্ত যে একটি অতি প্রাচীন গ্রন্থের একটি চরিত্র মাত্র, এমন মনে হয় না। মনে হয়, জলজ্যান্ত মানুষটা যেন একেবারে চেনা।

সুতরাং, এইসব পশ্চাৎপট আমাদের ছিল। হাতে তুলিও ছিল, রংও ছিল; তার সঙ্গে কিছুটা বিদেশী রং মিশিয়ে নিয়ে আমাদের দেশের শিল্পীরা অঙ্কন করতে আরম্ভ করলেন নতুন চিত্রাবলী। আমরা ক্রমশ পেতে আরম্ভ করলাম, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে, নিত্যনবীন চিত্রবহুল কাহিনী।

উপকথা বা রূপকথার পর্ব পার হয়ে গল্প রচনা আরম্ভ হল সমাজের মানুষকে নিয়ে। তখন গল্প হল সমাজেরই একটি ছবি—এক-একটি খণ্ডচিত্র। এর সূত্রপাত হয়েছে আগে—সমাজের ব্যঙ্গ ছবি আঁকা হয়েছে। এঁকেছেন ভবানীচরণ, এঁকেছেন প্যারীচাঁদ। তারপরে এলেন বঙ্কিম, তিনি—ব্যঙ্গ নয়, বলা যায়—বঙ্গচিত্র রচনা করলেন, বাংলাদেশের মানুষের সুখদুঃখের চিত্র। কিন্তু গল্প-রচনায় তেমন মনোযোগ না দিয়ে তিনি উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনাতেই তাঁর প্রতিভা নিয়োগ করলেন।

অবশেষে এলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর হাতে গল্পের চেহারা নতুন রূপ নিল।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ অভিজাত বংশের সন্তান। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মেশার সুযোগ তাঁর তেমন ঘটেনি। বাংলাদেশের একটি নতুন সমাজ—যাকে আজকাল আমরা মধ্যবিত্ত সমাজ বলে অভিহিত করি, সেই সমাজ—গড়ে উঠতে আরম্ভ করে উনিশ শতকের গোড়ায়। তার আগে ছিল দুটি মাত্র সমাজ—জমিদার ও রায়ত। ওয়ারেন হেস্টিংসের দশসালা-বন্দোবস্তের দরুন জমিদার-সমাজে ভাঙন ধরল, ধীরে ধীরে দেখা দিল চাকুরিজীবী—অর্থাৎ ধীরে ধীরে গড়ে উঠল মধ্যবিত্ত সমাজ। এ-সমাজ বঙ্কিমের আমলে তেমনভাবে জমে ওঠেনি, রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালেও না। এই সমাজকে ভালভাবে পেলেন শরৎচন্দ্র—এবং তার চিত্রও তিনি আমাদের দিয়েছেন। কেবল ভালোভাবে পাওয়াই না, শরৎচন্দ্র নিজেই এই সমাজের মানুষ ছিলেন। সেইজন্যেই তিনি এ-সমাজকে দেখেছেন স্পষ্টভাবে।

রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে এমন স্পষ্টভাবে দেখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাতে বুঝি ক্ষতি হয়নি কিছু। দৃষ্টি প্রখর হলে দূর থেকে দেখাও অন্তরঙ্গভাবে দেখার সমান হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের সঙ্গে, বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পদ্মানদীর দুইকূল বরাবর। রাজশাহী পাবনা নদীয়া—বাংলাদেশের এই তিনটি জেলার অধিবাসীদের তিনি দেখেছেন স্পষ্টভাবে, প্রত্যক্ষভাবে।

নৌকায় আরোহী হয়ে তিনি এই ত্রিজেলার কূলে কূলে ভেসে বেড়িয়েছেন, আকাশের অসীমেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না, তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত ছিল দুই তীরের শস্যশ্যামল প্রান্তরে, এবং প্রান্তরের প্রহরী হয়ে যারা ছিল, সেই নরনারীর জীবনযাত্রার প্রণালীর উপরে, তাদের সুখের তাদের দুঃখের তাদের অভাবের তাদের অভিযোগের তাদের জীবনের বিবিধ বিধানের উপর। সাধারণ ও সামান্য মানুষ বলে যাদের আমরা অভিহিত করি তাদের অন্তরঙ্গভাবে দেখার সৌভাগ্যে ভাগ্যবন্ত হতে পেরেছেন রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে। দুই পারে যেমন ঋতুতে ঋতুতে ফলে উঠেছে নতুন ফসল, রবীন্দ্রনাথের জীবনেও তেমনি দেখা দিয়েছে ফসলের সমারোহ—তিনি তাদের নিয়ে লিখেছেন গল্প। আমরাও সেই ফসল ঘরে তুলে ভাগ্যমন্ত হতে পেরেছি।

ভাগ্যমন্ত হতে পেরেছি আরও এই জন্যে যে, রবীন্দ্রনাথ গল্পরচনার ক্ষেত্রে বিষয়নির্বাচনে যে-ব্যাপকতার সন্ধান দিয়েছেন সেই পথ ধরে বাংলাদেশের গল্পকারেরা অগ্রসর হতে পেরেছেন। প্রথমে পথ থাকে না, পায়ে-চলা-পথ দেখা দেয় প্রথমে—সে পথেও একদিন প্রথম একজনের পা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তেমনি একজন পথিকৃৎ, প্রথম চলা আরম্ভ করে তিনি একটি পথের দাগ আঁকলেন, নিজে সেই পথে চলে চলে তার বিস্তার বাড়ালেন। এবং সে পথ ক্রমে হয়ে দাঁড়াল রাজপথ।

রাজপথ ধরে বর্তমানে চলেছেন অনেক পথিক। পথিকের সমাবেশে আজ এ-পথ পরিপূর্ণ বলা যায়। এই সংকলনে আমরা সেই বাজপথের শত পথিকের কণ্ঠস্বর ধরে এনেছি। একই গান যদি সকলে গায়, তবু গলায় গলায় তার সুর এক হলেও স্বর ভিন্ন হবে।

কেবল স্বর-বদল অবশ্য নয়, রীতির বদলও আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন আচার-আচরণ পোশাক-পরিচ্ছদ বদল হয়, তেমনি ভাষার পরিবর্তন ঘটে, ভঙ্গিরও বদল হয়। আমাদের পিতামহ যেভাবে কথা বলতেন, যেভাবে সাজপোশাক পরতেন, তাঁরই বংশধর হয়েও তাঁরই বংশের ধারা রক্ষা করেও আমরা অনেক পরিমাণে অন্যরকম হয়েছি। তাঁকে অস্বীকার করিনি, কিন্তু তাঁর সবকিছু স্বীকার করে নিতেও পারিনি। এইজন্যে শত বর্ষের গল্পের ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করলে ভাবের ভাষার ভঙ্গির অনেক পার্থক্য দেখা যাবে। এতে গল্পের গল্পত্ব অটুট ত থাকেই, অধিকন্তু আমাদের পরিবর্তনশীল জীবনের একটি চলচ্চিত্র যেন দেখা যায়।

।। ৩ ।।

এই সংকলনে ১৭৮৭ থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে-সব লব্ধপ্রতিষ্ঠ গল্পকারের জন্ম, তাঁদের রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে ১৮৯৭ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে তার পরবর্তিগণ আছেন।

আমরা বলেছি, সামাজিক আচার-আচরণের প্রতি কটাক্ষ করে আমাদের নবীন গল্পের সূত্রপাত। আমরা সেই সূত্র ধরে অগ্রসর হয়েছি। সেকালে বাংলাদেশে একটি নতুন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, 'বাবু' সম্প্রদায় নামে তার উল্লেখ করা হত। ভবানীচরণ প্যারীচাঁদ কালীপ্রসন্ন-প্রমুখ লেখকগণ তাঁদের রীতিনীতি নিয়ে বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে তাঁদের নায়ক হিসাবে গ্রহণ করে কাহিনী রচনা করেছেন। এইসব লেখায় গল্প যেমন আছে, তেমনি আছে সে-আমলের সমাজের চিত্র। যা গত হয়েছে, তা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সাহিত্যের কল্যাণে তা ধরা থাকে। সমাজব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষের আর-একটি দৃষ্টান্ত, এই গ্রন্থে সংকলিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী'। অন্যান্য গল্পও যদিও সমাজের প্রতি কটাক্ষ নয়, কিন্তু সেগুলিও সামাজিক চিত্র।

সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তনের দৃষ্টান্তও যেমন এসব গল্পে আছে, তেমনি গল্পের নিজস্ব রীতিনীতি পরিবর্তনের দৃষ্টান্তও এতে পাওয়া যাবে।

চতুর্দিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকলে তার প্রতি দৃষ্টি পড়ে না। আমরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে এখানে তা আহরণ করেছি, এই আহরণ-কাজে সহায় ছিলেন শ্রীমান সুবিমল লাহিড়ী। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবৃন্দের কাছে এ-সংকলন আদরণীয় হবে।

সাগরময় ঘোষ

৪৫ এস আর দাশ রোড
কলিকাতা-২৬
৭ পৌষ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

নতুন সংস্করণ প্রসঙ্গে

শতবর্ষের শতগল্প দুই খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয় সাতান্ন বছর আগে। প্রকাশক ছিলেন বেঙ্গল পাবলিশার্স। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হবার অনতিবিলম্বেই এই প্রকাশন সংস্থার দুই মালিকের মধ্যে মতভেদ দেখা দেওয়ায় তা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে এক ভাগের নাম বেঙ্গল পাবলিশার্সই থেকে গেল, অপরটি হল প্রকাশ ভবন। শতবর্ষের শতগল্পর দুটি খণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রথম খণ্ড গেল বেঙ্গল পাবলিশার্স-এ, দ্বিতীয়টি প্রকাশ ভবনে। দু'টি খণ্ডই নিঃশেষিত হয়ে যাবার পর নতুন সংস্করণ প্রকাশে দুই প্রকাশক নীরব থেকে যাওয়ায় এবং অন্য কোনও প্রকাশক নতুন মুদ্রণের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত না হওয়ায় আমারও আর উৎসাহ রইল না।

সম্প্রতি 'বঙ্গবাণী' নামে একটি নতুন প্রকাশক আমার কাছে এসে 'শতবর্ষের শতগল্প' দুই খণ্ডে প্রকাশের আগ্রহ নিয়ে আবেদন জানালেন। তাঁদের বাসনা, আমার সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশ করেই তাঁরা এই নতুন প্রচেষ্টার শুভসূচনা করতে চান। তাদের আগ্রহ, উৎসাহ ও নিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে আমিও সম্মতি না দিয়ে পারিনি। তাদের বক্তব্য, সাতান্ন বছর পরেও পাঠক মহলে এখনও নাকি এই সংকলনটির খুবই চাহিদা হবে। জানি না এই সংকলন প্রকাশ করে তারা হঠকারিতা করলেন কি না। তবে আমার ধারণা এই সংকলনের নতুন সংস্করণ পাঠকদের বহুদিনের প্রত্যাশা পূরণ করবে।

এই সুবাদে সম্পাদনা প্রসঙ্গে আমার কিছু কৈফিয়ৎ দেবার আছে। 'শতবর্ষের শতগল্প' বইটির প্রথম সংস্করণে পঞ্চান্নটি গল্প ছিল। দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল পঁয়তাল্লিশটি। প্রথম খণ্ডের এই নতুন সংস্করণে পাঁচটি গল্প বাদ দেওয়ায় সংখ্যা দাঁড়াল পঞ্চাশ। দ্বিতীয় খণ্ডেও পঞ্চাশটি গল্প থাকবে। প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের 'ভিখারিণী' গল্পটি ছিল। তার বদলে 'ল্যাবরেটরি' গল্পটি দেওয়া হল।

প্রথম খণ্ডের বানানপদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। বানানপদ্ধতির নতুন প্রবর্তনার পূর্বে প্রথম খণ্ডের লেখকরা যে বানান অনুসরণ করেছেন সেটিই বহাল রাখা হল। দ্বিতীয় খণ্ডের নতুন সংস্করণে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রস্তাবিত বানান-বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।

এইবার আসছি সংকলন গ্রন্থের নামকরণ প্রসঙ্গে। শতবর্ষের কালসীমা অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের অগ্রগতি সগৌরবে আরও পঞ্চাশ বছর এগিয়ে গেলেও এই সংকলনের নাম 'শতবর্ষের শতগল্প'-ই রাখা হল। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ রেখাঙ্কণ সত্যজিৎ রায় শতব্যস্ততার মধ্যেও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করে দিয়েছিলেন আমার প্রতি তাঁর গভীর প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ। সেই সুখস্মৃতির প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যই তাঁর হাতে আঁকা প্রচ্ছদ রেখে দেওয়া হল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

সাগরময় ঘোষ

ফুলবাবু

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুলবাবু অর্থাৎ বাবু ফুল হইলেন। খলিপা সঙ্গে কখন বাগানে কখন নিজভবনে নানাজাতি প্রমোদিনী বিবিধ বিলাসিনী বারাঙ্গনা আনয়নপূর্ব্বক আপন [মন] খুসি করিতেছেন। খুসির তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণনে অক্ষম হইলাম, এক দিবসের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি; খলিপা কহিলেন, কল্য বাগানে সকল রকম মজা দেখাইব; কিন্তু পাঁচ শত টাকা অদ্য ব্যয় করিতে হইবেক। বাবু কহিলেন, খলিপা অদ্য আমার হস্তে একটি টাকাও নাই, সংপ্রতি টাকার কি হইবেক। খলিপা কহিল, বাবুজী আমি তোমার নিকটে যত দিবস থাকিব তত দিবস টাকার নিমিত্ত মজা ভঙ্গ হইবে না, কেবল তুমি আপন নাম সহি করিয়া দিবা। বাবু আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন, আর কহিলেন শীঘ্র টাকার সুযোগ অর্থাৎ ফিকিব করহ; খলিপা কাপ্তেনি আফিসে খবর দিয়া তৎক্ষণাৎ দুই জন দালাল আনিয়া বাবুর নিকটে নিযুক্ত করিলেন, দালালেরা কহিলেক, বাবুজী কত টাকা চাহি আজ্ঞা করুন, বাবু কহিলেন পাঁচ শত টাকা; দালালেরা একে হনুমান, তাহাতে যদি আজ্ঞা পান, তবে তৎক্ষণাৎ নক্ষত্রবেগে মহাজনের বাটীতে হয়েন ধাবমান। মহাজন ব্যাধের প্রায় ফাঁদ পাতিয়া আছেন, কে ফাঁদে পড়ে তাহাই সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতেছেন। দালালেরা কহিলেক, মহাশয় অভাগা অজা পাইয়াছি, পাঁচ শত টাকা চাহে। মহাজন কহিলেক, তাহাব নাম কি এবং পিতার বা কি নাম, বাটী কোথা। দালালেরা কহিলেন এক্ষণে ওসকল কথায় প্রয়োজন নাই, আপনকার জ্ঞানেও এমন শিকার পান নাই। ইহার নাম জগদ্দুর্লভ বাবু, পিতার নাম রামগঙ্গা নাগ, হরেক রকম সওদাগরি আছে বেলেঘাটায় চুনের গোলা, জক্‌সনের ঘাটে থল্যার দোকান, খাতাবাটীতে মুটের সরদারি প্রায় লক্ষ দুই লক্ষ টাকার সম্ভাবনা হইবেক। মহাজন আপন লিষ্টি বাহির করিলেক, তাহার ঐ লিষ্টিতে লেখা আছে যে কোন লোক ধনী অবিরোধী অজাতুল্য এবং সন্তানকে অধিক স্নেহ করে, ঐ লিষ্টির মধ্যে রামগঙ্গা নামও লেখা আছে আর দেখিলেক এ লোক কখন আদালত দেখে নাই এবং উকীল কৌনসলী কি কর্ম্ম করে তাহাও জ্ঞাত নহে, মহাজন আপন লিষ্টিতে এইসব অবগত হইয়া মহাতুষ্ট হইল। পরে দালালদিগকে কহিলেক, পাঁচ শত টাকা দিব দুই হাজার টাকার খত সহি করাইতে হইবেক, তোমরা দালালি সেই স্থানে লইবা; যাও বাবুর সহিত রফা কর। বাবু বৈঠকখানায় খলিপাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন অদ্য কি মজা হইবেক, আর এক একবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন টাকা পাওয়া যাইবেক কি না। খলিপা কহে টাকার কারণ উদ্বেগ করিবা না, যাহারা এক কথায় টাকা না দেয় এমত লোকের সহিত ব্যবহার ও আলাপ করি না, বাবুকে এত এত টাকা দেওয়াইয়াছি, এই যত হুমরা চুমরা দেখিতে পাও এক্ষণে কেহ ঝকমারি দলের রাজা, কেহ পাখির দলের সর্দ্দার, সকের যাত্রানির্ব্বাহিক ইহারা সকলেই আমার কাছে তালিম হইয়াছে, কোন বেটাকে আমি টাকা না দেওয়াইয়াছি, ইহারা কএদ হইয়াছে ইহাদিগের পিতার কাছে গমনাগমন করিয়া খালাস করিয়াছি। তোমাকে একেবারেই কহিয়াছি আমি নিকটে থাকিতে কোন পেঁচ নাই, স্বচ্ছন্দে মজা কর, কেবল আমার কথাপ্রমাণে চলিবা। এমত [সময়] সমুদয় দালালেরা আসিয়া কহিলেক, বাবুজী টাকা স্থির করিয়াছি, কত স্থানে ভ্রমণ করিলাম তাহা কি কহিব কেহ দিতে চাহে না। তৎপরে এই সুর বাবুর নাম ডিউয়ের দিনে অর্থাৎ খতের মেয়াদ পূর্ণ হইলে টাকা না পাও আমরা দিব। বাবু কহিলেন, তোমারদিগের সহিত সে মহাজনের কি প্রকার আলাপ। দালালেরা কহিলেক, বাবুজী এ কর্ম্মে আমরা

নূতন ব্রতী নহি। আপনি জ্ঞাত নহেন আমরা এই কর্ম্ম করিতে করিতে প্রাচীন হইলাম, আমাদিগের বাটী ছিল কোড়াগাছি, তাহা কে না জানে, এই সুরবাবু সকলি জানেন, ঞিহাকে কত টাকা দেওয়াইয়াছি এবং আমরাও ইহার স্থানে কত টাকা পাইয়াছি, যদি ইহার টাকা কিম্বা দুই চারিখান বাটী থাকিত তবে আজি আমারদিগের কি কি ভাবনা ছিল। সে যাহা হউক এক্ষণে আমারদিগের কি দালালি দিবেন। বাবু কহিলেন খলিপাজী যাহা দিতে কহিবেন তাহাই দিব। পরে খলিপা বাবুর সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া কহিলেন, তোমারা দুই জনে ৫০ টাকা পাইবা। দালালেরা এ কথা শুনিয়া কহিলেক, মহাশয় এ কি কথা আপনি পাঁচ শত টাকা লইবেন আমাদিগকে পঞ্চাশটি টাকা দিবেন এমন কথা কখন শুনি নাই, যদি কোন লোক দুই শত টাকা লয় সেও পঞ্চাশ টাকা দেয়। এইরূপ অনেক কথোপকথনের পর এক শত টাকায় রফা হইল। ইহাতে বাবু কিঞ্চিৎ বিরস হইলেন যে পাঁচ শত টাকার কমে এ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবেক না, ইহার মধ্যে এক শত টাকা দালালদিগকে দিতে হইবেক ইহাই ভাবিছেন। খলিপা কহিলেক, বাবুজী এক কথা আছে দালালি টাকা খতের উপর চড়াইয়া দাও। বাবু কহিলেক, এ কথা ভাল আমি ইহা স্বীকৃত আছি। ইহা শুনিয়া দালালেরা তৎক্ষণাৎ মহাজনের নিকট গমন করিয়া দুই হাজার এক শত টাকার এক লোট লেখাইয়া আনিল। বাবু সহি করিলেন টাকা খলিপা বুঝিয়া লইলেন। মহাজনের তরফ তিন লোক আসিয়া বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবুজী এই নোটের বেবাক টাকা পাইয়াছেন। বাবু কহিলেন, হাঁ পাইয়াছি। পরে টাকা লইয়া খলিপা মজার নিমিত্তে দ্রব্যাদির আয়োজন কবিছেন।

নববাবুবিলাস ঃ ১৮২৩

বা বু য়া না

প্যারীচাঁদ মিত্র

সোনাগাজির দরগায় কুনী বুনী বাসা করিয়াছিল। চারি দিক্ শেওলা ও বোনাজে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে কাকের ও সালিকের বাসা—ধাড়ীতে আধার আনিয়া দিতেছে—পিলে চিঁ চিঁ করিতেছে—কোনখানেই এক ফোঁটা চূণ পড়ে নাই—রাত্রি হইলে কেবল শেয়াল কুকুরের ডাক শোনা যাইত ও সকল স্থানে সন্ধ্যা দিত কি না তাহা সন্দেহ। নিকটে এক জন গুরুমহাশয় কতকগুলি ফরগুল গলায় বাঁধা ছেলে লইয়া পড়াইতেন—ছেলেদিগের লেখাপড়া যত হউক বা না হউক, বেতের শব্দে ত্রাসে তাহাদিগের প্রাণ উড়িয়া যাইত—যদি কোন ছেলে এক বার ঘাড় তুলিত অথবা কোঁচড় থেকে এক গাল জলপান খাইত তবে তৎক্ষণাৎ তাহার পিঠে চট্ চট্ চাপড় পড়িত। মানবস্বভাব এই যে কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব থাকিলে সে কর্ত্তৃত্বটি নানারূপে প্রকাশ চাই তাহা না হইলে আপন গৌরবের লাঘব হয়—এই জন্য গুরুমহাশয় আপন প্রভুত্ব ব্যক্ত করণার্থ রাস্তার লোক জড় করিতেন—লোক দেখিলে সেই দিকে দেখিয়া আপন পঞ্চম স্বরকে নিখাদ করিতেন ও লোক জড় হইলে তাঁহার সরদারি অশেষ বিশেষ রকমে বৃদ্ধি পাইত, এ কারণ বালকদিগের যে লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইত তাহার আশ্চর্য্য কি? গুরুমহাশয়ের পাঠশালাটি প্রায় যমালয়ের ন্যায়—সর্ব্বদাই চটাপট্, পটাপট্, গেলুম রে, মলুম্ রে ও "গুরুমহাশয় গুরুমহাশয় তোমার পড়ো হাজির" এই শব্দই হইত আর কাহার নাকখত—কাহার কাণমলা—কেহ ইটেখাড়া—কাহার হাতছড়ি—কাহাকেও কপিকলে লট্‌কান—কাহার জলবিচাটি, একটা না একটা প্রকার দণ্ড অনবরতই হইত।

সোনাগাজির গুমর কেবল উক্ত গুরুমহাশয়ের দ্বারাই রাখা হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ প্রান্তভাগে দুই এক জন বাউল থাকিত—তাহারা সমস্ত দিন ভিক্ষা করিত। সন্ধ্যার পর পরিশ্রমে আক্রান্ত হইয়া শুয়ে শুয়ে মৃদুস্বরে গান করিত। সোনাগাজির এইরূপ অবস্থা ছিল। মতিলালের শুভাগমনাবধি সোনাগাজির কপাল ফিরিয়া গেল। একেবারে "ঘোড়ার টি হিঁ, তবলার চাটি, লুচি পুরির খচাখচ' উল্লাসের কড়াংধুম রাতদিন হইতে লাগিল আর মণ্ডা মিঠাই, গোলাপ ফুলের আতর ও চরস, গাঁজা মদের ছড়াছড়ি দেখিয়া অনেকেই গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিল। কলিকাতার লোক চেনা ভার—অনেকেই বর্ণচোরা আঁব। তাহাদিগের প্রথমে এক রকম মূর্ত্তি দেখা যায় পরে আর এক রকম মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। ইহার মূল টাকা—টাকার খাতিরেই অনেক ফেরফার হয়। মনুষ্যের দুর্ব্বল স্বভাব হেতুই ধনকে অসাধারণরূপে পূজ্য করে। যদি লোকে শুনে যে অমুকের এত টাকা আছে তবে কি প্রকারে তাহার অনুগ্রহের পাত্র হইবে এই চেষ্টা কায়মনোবাক্যে করে ও তজ্জন্য যাহা বলিতে বা করিতে হয় তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে না। এই কারণে মতিলালের নিকট নানা রকম লোক আসিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ উলার ব্রাহ্মণের ন্যায় মুখফোঁড়া রকমে আপনার অভিপ্রায় একেবারে ব্যক্ত করে—কেহ বা কৃষ্ণনগরীয়দিগের ন্যায় ঝাড় বুটা কাটিয়া মুন্‌সিয়ানা খরচ করে—আসল কথা অনেক বিলম্বে অতি সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ হয়—কেহ বা পূর্ব্বদেশীয় বঙ্গভায়াদিগের মত বেনিয়ে বেনিয়ে চলেন—প্রথম প্রথম আপনাকে নিস্প্রয়াস ও নির্লোভ দেখান—আসল মত্‌লব তৎকালে দ্বৈপায়নহ্রদে ডুবাইয়া রাখেন—দীর্ঘকালে সময়বিশেষে প্রকাশ হইলে বোধ হয় তাহার গমনাগমনের তাৎপর্য্য কেবল "যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য"।

মতিলালের নিকট যে ব্যক্তি আইসে সেই হাই তুলিলে তুড়ি দেয়—হাঁচিলে "জীব" বলে। ওরে বলিলেই "ওরে ওরে" করিয়া চীৎকার করে ও ভালমন্দ সকল কথারই উত্তরে—"আজ্ঞা আপনি যা বল্‌ছেন তাই বটে' এই প্রকার বলে। প্রাতঃকালাবধি রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত মতিলালের নিকট লোক গস্‌গস্ করিতে লাগিল—ক্ষণ নাই—মুহূর্ত্ত নাই—নিমেষ নাই—সর্ব্বদাই নানা প্রকার লোক আসিতেছে—বসিতেছে—যাইতেছে। তাহাদিগের জুতার ফটাং ফটাং শব্দে বৈঠকখানার সিঁড়ি কম্পমান—তামাক মুহুর্মুহু আসিতেছে—ধুঁয়া কলের জাহাজের ন্যায় নির্গত হইতেছে। চাকরেরা আর তামাক সাজিতে পারে না—পালাই পালাই ডাক ছাড়িতেছে। দিবারাত্রি নৃত্য গীত, বাদ্য, হাসিখুসি, বড়ফট্টাই, ভাঁড়ামো, নকল, ঠাট্টা, বট্‌কেরা, ভাবের গালাগালি, আমোদের ঠেলাঠেলি—চড়ুইভাতি, বনভোজন, নেশা একাদিক্রমে চলিয়াছে। যেন রাতারাতি মতিলাল হঠাৎবাবু হইয়া উঠিয়াছেন।

এই গোলে গুরুমহাশয়ের গুরুত্ব একেবারে লঘু হইয়া গেল—তিনি পূর্ব্বে বৃহৎ পক্ষী ছিলেন এক্ষণে দুর্গাটুনটুনি হইয়া পড়িলেন। মধ্যে মধ্যে ছেলেদের ঘোষাইবার একটু একটু গোল হইত—তাহা শুনিয়া মতিলাল বলিলেন এ বেটা এখানে কেন মেও মেও করে—গুরুমহাশয়ের যন্ত্রণা হইতে আমি বালককালেই মুক্ত হইয়াছি আবার গুরুমহাশয় নিকটে কেন?—ওটাকে ত্বরায় বিসর্জ্জন দাও। এই কথা শুনিবামাত্র নববাবুরা দুই এক দিনের মধ্যেই ইট পাটকেলের দ্বারা গুরুমহাশয়কে অন্তর্দ্ধান করাইলেন সুতরাং পাঠশালা ভাঙ্গিয়া গেল। বালকেরা বাঁচলুম বলিয়া তাড়ি পাত তুলিয়া গুরুমহাশয়কে ভেংচুতে ভেংচুতে ও কলা দেখাইতে দেখাইতে চোঁচা দৌড়ে ঘরে গেল।

এদিকে জান সাহেব হৌস খুলিলেন—নাম হৈল জান কোম্পানি। মতিলাল মুৎসুদ্দি, বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা কর্ম্মকর্ত্তা। সাহেব টাকার খাতিরে মুৎসুদ্দিকে তোয়াজ করেন, ও মুৎসুদ্দি আপন সঙ্গীদিগকে লইয়া দুই প্রহর তিনটা চারিটার সময় পান চিবুতে চিবুতে রাঙ্গা চকে এক এক বার কুঠী যাইয়া দাঁদুড়ে বেড়াইয়া ঘরে আইসেন। সাহেবের এক পয়সার সঙ্গতি ছিল না—বটলর সাহেবের অন্নদাস হইয়া থাকিতেন এক্ষণে চৌরঙ্গিতে এক বাটী ভাড়া করিয়া নানা প্রকার আসবাব

ও তসবির খরিদ করিয়া বাটী সাজাইলেন ও ভাল ভাল গাড়ি, ঘোড়া ও কুকুর ধারে কিনিয়া আনিলেন এবং ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া তৈয়ার করিয়া বাজির খেলা খেলিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে সাহেবের বিবাহ হইল, সোনার ওয়াচগার্ড পরিয়া ও হীরার আঙ্গুটি হাতে দিয়া সাহেব ভদ্র ভদ্র সমাজে ফিরিতে লাগিলেন। এই সকল ভড়ং দেখিয়া অনেকেরই সংস্কার হইল জান সাহেব ধনী হইয়াছেন এই জন্য তাঁহার সহিত লেন দেন করণে অনেকে কিছুমাত্র সন্দেহ করিল না কিন্তু দুই একজন বুদ্ধিমান্ লোক তাঁহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া আল্‌গা আল্‌গা রকমে থাকিত—কখনই মাখামাখি করিত না।

কলিকাতার অনেক সৌদাগর আড়তদারিতেই অর্থ উপার্জ্জন করে—হয় ত জাহাজের ভাড়া বিলি করে অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা জিনিসপত্র খরিদ বা বিক্রয় করে ও তাহার উপর ফি শতকরায় কতক টাকা আড়তদারি খর্চ্চা লয়। অন্যান্য অনেকে আপন আপন টাকায় এখানকার ও অন্য স্থানের বাজার বুঝিয়া সৌদাগিরি করে কিন্তু যাহারা ঐ কর্ম্ম করে তাহাদিগকে অগ্রে সৌদাগরি কর্ম্ম শিখিতে হয় তা না হইলে কর্ম্ম কাজ ভাল হইতে পারে না।

জান সাহেবের কিছুমাত্র বোধশোধ ছিল না, জিনিস খরিদ করিয়া পাঠাইলেই মুনফা হইবে এই তাঁহার সংস্কার ছিল। ফলতঃ আসল মতলব এই পরের স্কন্ধে ভোগ করিয়া রাতারাতি বড়মানুষ হইব। তিনি এই ভাবিতেন যে সৌদাগরি সেস্ত করা—দশটা গুলি মারিতে মারিতে কোনটা না কোনটা গুলিতে অবশ্যই শিকার পাওয়া যাইবে। যেমন সাহেব ততোধিক তাহার মুৎসুদ্দি—তিনি গণ্ডমূর্খ—না তাঁহার লেখাপড়াই বোধশোধ আছে—না বিষয়কর্ম্মই বুঝিতে শুঝিতে পারেন সুতরাং তাহাকে দিয়া কোন কর্ম্ম করান কেবল গো বধ করা মাত্র। মহাজন, দালাল ও সরকারেরা সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট জিনিসপত্রের নমুনা লইয়া আসিত ও দর দামের ঘাট্‌তি বাড়্‌তি এবং বাজারের খবর বলিত। তিনি বিষয়কর্ম্মের কথার সময় ঘোর বিপদে পড়িয়া ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া থাকিতেন—সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন না—কি জানি কথা কহিলে পাছে নিজের বিদ্যা প্রকাশ হয়, কেবল এই মাত্র বলিতেন যে বাঞ্ছারাম বাবু ও ঠকচাচার নিকটে যাও।

আফিসে দুই একজন কেরানি ছিল, তাহারা ইংরাজীতে সকল হিসাব রাখিত। এক দিন মতিলালের ইচ্ছা হইল যে ইংরাজী ক্যাশবহি বোঝা ভাল এজন্য কেরানির নিকট হইতে বহি চাহিয়া আনাইয়া এক বার এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া বহিখান্ এক পাশে রাখিয়া দিলেন। মতিলাল আফিসের নীচের ঘরে বসিতেন—ঘরটি কিছু সেঁতসেঁতে—ক্যাশবহি সেখানে মাসাবধি থাকাতে সরদিতে খারাপ হইয়া গেল ও নববাবুরা তাহা হইতে কাগজ ছিড়িয়া লইয়া সল্‌তের ন্যায় পাকাইয়া প্রতিদিন কাণ চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন—অল্প দিনের মধ্যেই বহির যাবতীয় কাগজ ফুরিয়া গেল কেবল মলাট্‌টি পড়িয়া রহিল। অনন্তর ক্যাশবহির অন্বেষণ হওয়াতে দৃষ্ট হইল যে তাহার ঠাটখানা আছে, অস্থি ও চর্ম্ম পরহিতার্থ প্রদত্ত হইয়াছে। জান সাহেব হা ক্যাশবহি জো ক্যাশবহি বলিয়া বিলাপ করত মনের খেদ মনেই রাখিলেন।

জান সাহেব বেধড়ক ও দুচকোব্রত জিনিসপত্র খরিদ করিয়া বিলাত ও অন্যান্য দেশে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন—জিনিসের কি পড়তা হইল ও কাট্‌তি কিরূপ হইবে তাহার কিছুমাত্র খোঁজ খবর করিতেন না। এই সুযোগ পাইয়া বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা চিলের ন্যায় ছোবল মারিতে লাগিলেন তাহাতে ক্রমে তাহাদিগের পেট মোটা হইল—অল্পে তৃষ্ণা মেটে না—রাতদিন খাই খাই শব্দ ও আজ হাতিশালার হাতী খাব, কাল ঘোড়াশালার ঘোড়া খাব, দুই জনে নির্জ্জনে বসিয়া কেবল এই মতলব করিতেন। তাঁহারা ভাল জানিতেন যে তাঁহাদিগের এমন দিন আর হইবে না—লাভের বসন্ত অন্ত হইয়া অলাভের হেমন্ত শীঘ্রই উদয় হইবে অতএব নে থোরই সময় এই।

দুই এক বৎসরের মধ্যেই জিনিসপত্রের বিক্রীর বড় মন্দ খবর আইল—সকল জিনিসেতেই

লোকসান বই লাভ নাই। জান সাহেব দেখিলেন যে লোকসান প্রায় লক্ষ টাকা হইবে—এই সংবাদে বুকদাবা পাইয়া তাঁহার একেবারে চক্ষুঃস্থির হইয়া গেল আর তিনি নিজে মাসে মাসে প্রায় এক হাজার টাকা করিয়া খরচ করিয়াছেন, তদ্ব্যতিরিকে ব্যাঙ্কে ও মহাজনের নিকটও অনেক দেনা—আফিস কয়েক মাসাবধি তলগড় ও ঢালসুমরে চলিতেছিল এক্ষণে বাহিরে সম্ভ্রমের নৌকা একেবারে ধুপুস্ করিয়া ডুবে গেল, প্রচার হইল যে জান কোম্পানি ফেল হইল। সাহেব বিবি লইয়া চন্দননগরে প্রস্থান করিলেন। ঐ সহর ফরাসিদিগের অধীন—অদ্যাবধি দেনদার ও ফৌজদারি মামলার আসামিরা কয়েদের ভয়ে ঐ স্থানে যাইয়া পলাইয়া থাকে।

এদিকে মহাজন ও অন্যান্য পাওনাওয়ালারা আসিয়া মতিলালকে ঘেরিয়া বসিল। মতিলাল চারি দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন—এক পয়সাও হাতে নাই—উট্‌নাওয়ালাদিগের নিকট হইতে উট্‌না লইয়া তাঁহার খাওয়া দাওয়া চলিতেছিল। এক্ষণে কি বলিবেন ও কি করিবেন কিছুই ঠাওরাইয়া পান না, মধ্যে মধ্যে ঘাড় উঁচু করিয়া দেখেন বাঞ্ছারাম বাবু ও ঠকচাচা আইলেন কি না, কিন্তু দাদার ভরসায় বাঁয়ে ছুরি, ঐ দুই অবতার তুলতামালের অগ্রেই চম্পট দিয়াছেন। তাহাদিগের নাম উল্লেখ হইলে পাওনাওয়ালারা বলিল যে চিঠিপত্র মতিবাবুর নামে, তাহাদিগের সহিত আমাদিগের কোন এলেকা নাই, তাহারা কেবল করপরদাজ বই তো নয়।

এইরূপ গোলযোগ হওয়াতে মতিলাল দলবল সহিত ছদ্মবেশে রাত্রিযোগে বৈদ্যবাটীতে পলাইয়া গেলেন। সেখানকার যাবতীয় লোক তাঁহার বিষয়-কর্ম্মের সাত কাণ্ড শুনিয়া খুব হয়েছে হয়েছে বলিয়া হাততালি দিতে লাগিল ও বলিল—আজও রাতদিন হচ্ছে—যে ব্যক্তি এমত অসৎ—যে আপনার মাকে ভাইকে ভগিনীকে বঞ্চনা করিয়াছে—পাপকর্ম্মে কখনই বিরত হয় নাই, তাহার যদি এরূপ না হবে তবে আর ধর্ম্মাধর্ম্ম কি?

কর্ম্মক্রমে প্রেমনারায়ণ মজুমদার পরদিন বৈদ্যবাটীর ঘাটে স্নান করিতেছিল—তর্কসিদ্ধান্তকে দেখিয়া বলিল—মহাশয় শুনেছেন—বিট্‌লেরা সর্ব্বস্ব খুয়াইয়া ওয়ারিণের ভয়ে আবার এখানে পালিয়ে আসিয়াছে—কালামুখ দেখাইতে লজ্জা হয় না! বাবুরাম ভাল মুষলং কুলনাশনং রাখিয়া গিয়াছেন। তর্কসিদ্ধান্ত কহিলেন—ছোঁড়াদের না থাকাতে গ্রামটা জুড়িয়ে ছিল—আবার ফিরে এলো? আহা! মা গঙ্গা একটু কৃপা করিলে যে আমরা বেঁচে যাইতাম। অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন—নববাবুদিগের প্রত্যাগমনের সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদিগের দাঁতে দাঁতে লেগে গেল, ভাবিতে লাগিলেন যে আমাদিগের স্নান আহ্নিক বুঝি অদ্যাবধি শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণ করিতে হইবে। দোকানি পসারিরা ঘাটের দিকে দেখিয়া বলিল—কই গো। আমরা শুনিয়াছিলাম যে মতিবাবু সাত সুলুক ধন লইয়া দামামা বাজিয়ে উঠিবেন—এখন সুলুক দূরে যাউক একখানা জেলে ডিংগিও যে দেখিতে পাই না। প্রেমনারায়ণ বলিল তোমরা ব্যস্ত হইও না—মতিবাবু কমলে কামিনীর মুস্‌কিলের দরুণ দক্ষিণ মশান প্রাপ্ত হইয়াছেন—বাবু অতি ধর্ম্মশীল—ভগবতীর বরপুত্র—ডিঙ্গে সুলুক ও জাহাজ ত্বরায় দেখা দিবে আর তোমরা মুড়ি কড়াই ভাজিতে ভাজিতেই দামামার শব্দ শুনিবে।

আলালের ঘরের দুলাল ° ১৮৫৮

সফল স্বপ্ন

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গান্ধার দেশের নির্জ্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে দিনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া খরতর কিরণ-নিকর বিস্তার দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে, পথিক অধ্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ রজ্জুযুক্ত করিয়া দিলেন এবং আপনি সমীপবর্ত্তী নির্ঝরতীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্থানটি ভয়ানক এবং অদ্ভুতরসের আস্পদ হইয়া আছে। নিবিড় বনপত্রে সূর্য্যকিরণ প্রায় সর্ব্বতোভাবেই আচ্ছাদিত ; কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশমান মাত্র। বৃক্ষগণ অতি দীর্ঘ। কাহার কাহার গাত্রে একটিও শাখাপল্লব না থাকাতে বোধ হয় যেন, উহারা উপরিস্থ পর্ণচন্দ্রাতপ ধারণের স্তম্ভ হইয়া আছে। অদূরে বন-হস্তিগণ সুশীতল ছায়াতলে সুষুপ্তি-সুখানুভব করত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনতরুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগের অপেক্ষাকৃত খর্ব্বতা প্রমাণ করিতেছে। ফলত বিধাতা নিভৃত নির্জ্জন কাননে, অথবা নির্গম গিরিশিখরেই সৃষ্টির পরম রমণীয় শোভা সমস্ত সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। সেই মনুষ্য-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত, নিঃশব্দ, শান্ত-রসাস্পদ স্থানে নানা অদ্ভুত বস্তুর সন্দর্শন হওয়াতে মন অবশ্যই ভক্তি শ্রদ্ধা ও ঔদার্য্যগুণ অবলম্বন করিয়া সেই মহৈশ্বর্য্যশালী জগৎকর্ত্তার সন্নিধানে নীত হয়।

অনুমান হয়, পথিক তাদৃশ উদারভাবে নিমগ্ন-চিত্ত হইয়া ধ্যানাবলম্বিতের ন্যায় সম্মুখস্থ নির্ঝরের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এমত সময়ে হঠাৎ সমীপবর্ত্তী ক্ষুদ্রশাখী সমুদায় প্রবল বেগে সমালোড়িত, তাবৎ অরণ্য গভীর গর্জ্জনে শব্দায়মান এবং পথিকের অশ্ববর এক প্রকাণ্ড সিংহের পদাঘাতে ভূতলশায়ী হইল। পথিক নিমিষ মধ্যে সিংহের সমীপবর্ত্তী হইয়া নিষ্কোষিত করবাল দ্বারা এক এক আঘাতেই তাহার পশ্চাৎ পদদ্বয়ের শিরাচ্ছেদন করিলেন। মৃগরাজ ছিন্নপদ হওয়াতে চলৎশক্তিরহিত হইয়া অশ্বকে পরিত্যাগ করিল—কিন্তু অশ্ব তাহার দারুণ পদাঘাতে একান্ত আহত এবং নখর বিদারণে জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল—অতএব ক্ষণমাত্র পরেই প্রাণত্যাগ করিল। সিংহ অতিশয় ভয়ঙ্কররূপে গর্জ্জন করিতেছিল—তাহার চক্ষুর্দ্বয় তেজে উদ্দীপ্ত এবং কেশর উত্থিত হইয়াছিল—কিন্তু সেই ক্রোধ কোন কার্য্যকরী হইল না। পশু সম্মুখের দুই পায়ের উপর ভর দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, পথিক নির্ভয়ে গমনপূর্ব্বক তাহার মস্তকে খড়্গ প্রহার করিলেন ; দ্বিতীয় আঘাতেই পশুরাজ আর্ত্তনাদ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

পথিক বাহনবিনাশে নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন—কিন্তু কি করেন, অপ্রতিবিধেয় দুঃখে দুঃখী হওয়া অকর্ত্তব্য, বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন বহুক্ষণ অতীত হইয়াছে, দিবাভাগ থাকিতে থাকিতেই পদব্রজে অরণ্য উত্তীর্ণ হইতে হইবে, এই বিবেচনা করিয়া বাজিপৃষ্ঠে যাবৎ পাথেয় দ্রব্যসামগ্রী ছিল, সমুদায় স্বীয় স্কন্ধে আরোপণ করত দ্রুতবেগে গমনোন্মুখ হইলেন। বহুক্ষণ কাননের কুটিল পথে গমন করিয়া একান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, এমত সময়ে সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হইল। অগ্রসর হইয়া দেখেন, প্রান্তরমধ্যভাগে এক নবপ্রসূতা হরিণী স্বীয় শাবক সমভিব্যাহারে তৃণ ভক্ষণ করিতেছে। পথিক সত্বরপদে আসিয়া অনতিবেগবান্ সদ্যোজাত সেই হরিণশিশুকে গ্রহণ করিলেন। ভয়বিহ্বলা হরিণী প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। মৃগয়া সফল হওয়াতে পথিক মনে মনে ভাবিলেন, এইক্ষণে উত্তম উপযোগ দ্রব্য পাইলাম, কাননে রাত্রি যাপন করিতে হইলেও হানি নাই। এই ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে মৃগশিশুর পদে রজ্জু বন্ধন করিয়া লইলেন, এবং প্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার অটবী-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করণের যথাযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া হরিণশিশুকে একটা
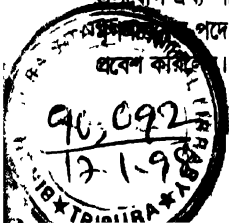
বৈদ্যুতাগ্নিশুষ্ক বৃক্ষমূলে স্থাপন করত দুইখানি শুষ্ককাষ্ঠ ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন। অনন্তর অসিধারণপূর্ব্বক মৃগশাবকের প্রাণবধে উদ্যত হইয়াছেন, দৈবাৎ অদূরে দণ্ডায়মানা মৃগমাতার প্রতি নেত্রপাত হইল। আহা! পশুজাতির মধ্যেও অপত্যস্নেহ কি প্রবল! হরিণী উন্নতমুখী হইয়া জলধারাকুল লোচনে পথিকের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছিল। পরে, ক্ষণে স্বীয় শাবকের প্রতি এবং ক্ষণে পথিকের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে এক এক পা করিয়া শাবকের সমীপাগত হইলে, পথিক কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। হরিণী এক লম্ফে শাবকের সন্নিহিত হইয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল এবং পার্শ্বে শয়ন করিয়া নানা প্রকারে স্পষ্টরূপে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। পথিক পুনর্ব্বার নিকট গমনের উপক্রম করিলেন। হরিণী অমনি দীর্ঘলম্ফ প্রদান করিল। কিন্তু অকৃত্রিম স্নেহ-বন্ধন প্রযুক্ত পলায়ন করিতে পারিল না—পূর্ব্ববৎ অপত্য-বিরহ-বিষাদ প্রদর্শন করিতে লাগিল। পশুযোনিতে ঈদৃক্ মানুষ-সদৃশ বাৎসল্য ভাব অবলোকনে কাহার মনে সত্ত্ব গুণের উদয় না হয়? পথিক কারুণ্যবসেব প্রাদুর্ভাবে বিচলিতান্তঃকরণ হইয়া কুরঙ্গের কোমলাঙ্গ হইতে বন্ধন মোচন কবত অপাব পবিত্র আনন্দানুভব করিলেন। মৃগশাবক মুক্ত হইয়া অতি শীঘ্র মাতৃসন্নিহিত হইল এবং সিদ্ধমনোবথা হরিণী তৎক্ষণাৎ আনন্দধ্বনি করিয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু শাবক সমভিব্যাহারে অটবী-মধ্যে প্রবেশ করিবাব পূর্ব্বে, একবার সন্তানেব জীবনবক্ষিতার প্রতি সজল দৃষ্টিদ্বাবা কৃতজ্ঞতাব চিহ্ন প্রকাশ করিয়া গেল।

ধর্ম্মাত্মা পথিক এইরূপ সদাশযতা প্রকাশ দ্বাবা অতীব চিত্তপ্রসাদ লাভ কবিলেন। জীবন অপেক্ষা ইহলোকে অধিকতব প্রেমাস্পদ পদার্থ আব কি আছে? বিশেষতঃ নিকৃষ্ট জীবগণ অপরিণামদর্শী ও ইন্দ্রিয-প্রীতিপরাযণ। এই জন্য জিজীবিষাবৃত্তি পশ্বাদির মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রবল থাকে। হায়! তাহাবা কি নির্ঘৃণ, যাহাবা অকাবণে কোন প্রাণীব জগদীশ্বব-প্রদত্ত সর্ব্ব-সুখনিদান প্রাণাপহরণ করিয়া আপনাদিগের চিত্ত কলুষিত করে। সাত্ত্বিক কর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! অনুমান হয়, পবিত্রচিত্ত ধর্ম্মাত্মাব অন্তঃকবণে জগদীশ্বব স্বযং অধিষ্ঠিত থাকেন, সুতরাং সৃষ্ট প্রাণিমাত্রের প্রতি তাঁহার হিংসা দ্বেষ ক্রোধাদি ভাব অপনীত হইযা সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস জন্মে। দেখ, পথিক কুরঙ্গশাবককে মোচন করিয়া অবধি সেই ভযাবহ গহনবনকে প্রার্থনীয় পুণ্যতীর্থ বোধ কবিয়া স্থানান্তরে বাত্রি যাপনের মানস পবিত্যাগ কবিলেন এবং পাথেয় তণ্ডুলেব কিয়দংশ হইতে যথাকথঞ্চিৎরূপে অন্ন প্রস্তুত করিযা ক্ষুধাশান্তি কবত অতীব তৃপ্তি-লাভ করিলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইল। সুধাংশুমণ্ডলনিঃসৃত জ্যোৎস্নারাশি মন্দ মন্দ সমীবণে সঞ্চালিত মহীরুহগণ কর্ত্তৃক সহস্র সহস্র খণ্ডে বিকীর্ণ হইযা নৃত্যকাবী বনদেবতাগণের অলৌকিক অঙ্গপ্রভার ন্যায় প্রতীযমান হইতে লাগিল, এবং শুষ্কপত্র পতনেব মর মর শব্দ, নির্ঝরের ঝর ঝর ধ্বনি ও রাত্রিচর পশুগণের গভীর নিনাদ সমুদায় মিলিত হওয়াতে বোধ হইল যেন জগদ্‌যন্ত্র-বাদ্যের মধুর লয়সঙ্গতি হইতেছে এবং উহাবই মোহিনীশক্তি প্রভাবে যাবতীয় জীব একেবারে সুপ্ত-শক্তি হইয়াছে।

পথিক বৃক্ষমূলে পর্ণশয্যায় শয়ন করিযা পথ-পরিশ্রম বশতঃ শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন। কিন্তু দিবাভাগে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল তদ্দ্বারা চিত্ত-চাঞ্চল্যের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তিনি নিদ্রাবস্থায় একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন কবিলেন। তিনি দেখিলেন মৃগাঙ্কমণ্ডল হইতে জ্যোতির্ম্ময দেবমূর্ত্তি অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। পরে ক্ষণকাল তাঁহার প্রতি সহাস্যাননে এবং সস্নিগ্ধ নয়নে দৃষ্টি করিযা কহিলেন—"রে বৎস! তুমি অদ্য অতি সুকৃত করিয়াছ, অতএব যিনি নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সমস্ত জীবকে সমভাবে সুখদুঃখভাজন করিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন, সেই পরাৎপর পরমাত্মা তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, এবং তাঁহার অনুগ্রহ বশাৎ তুমি অচিরে গজনন্ নগরের অধিপতি হইবে, কিন্তু দেখিও, যেন প্রভুত্বমদে মত্ত হইয়া নিজ নৈসর্গিক দয়া দাক্ষিণ্য বিবর্জ্জিত হইও না, অদ্য পশুযোনির প্রতি যাদৃশ সদয়তা প্রকাশ করিয়াছ, যাবজ্জীবন নরলোকের প্রতিও তাদৃশ ব্যবহার করিও।"

১ এই বলিয়া দেবমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে পথিকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখেন নিশা অবসান হয় নাই। গগনমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডল পরিবেষ্টিত অম্লানকিরণ দ্বিজরাজ বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু তাদৃশ স্বপ্নদর্শনে পথিক এমত চঞ্চল-মনা হইয়াছিলেন যে, আর নিদ্রাবেশে নেত্র নিমীলিত করিতে পারিলেন না। পর্ণশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া করতলে কপোলবিন্যাস পূর্ব্বক হিমাংশুর ব্যোমান্ত অবলম্বন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নভোমণ্ডল ঈষৎশুক্লাম্বর ধারণ করিল, চন্দ্রমামুখ ম্লান হইল, এবং দূরস্থ গিরিশৃঙ্গ সমুদায় হইতে কুজ্ঝটিকারাশি উত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল প্রচ্ছন্ন করিল। ক্রমে পূর্ব্বদিক কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইল—পরে সহস্রাংশুর তীক্ষ্ণ রশ্মি সমুদায় কুজ্ঝটিকাজাল বিদীর্ণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল— দূরস্থ মহীধরশৃঙ্গসকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিরাশিপ্রায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—নীহারমণ্ডিত বৃক্ষগণের পত্র-বিটপাদি বালাতপ-সংযোগে বিচিত্র বর্ণ ধরিল—এবং শিশির-সিক্ত শষ্পশয্যা যেন, রাত্রিবিহারী বনদেবীগণের পরিচ্যুত অঙ্গাভরণ বিভূষিত হইয়া তাদৃশ চাক্‌চিক্যশালী হইতে লাগিল—তথা প্রশস্ত পত্র মাত্রেই পবিত্র অম্বুভারে অবনত হইয়া সহৃদয় ব্যক্তির ন্যায় সদ্‌গুণাধার বশত নিজ নিজ নম্রতা স্বীকার করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মন্দ মন্দ মারুতহিল্লোলে অথবা রবিরশ্মি-সংযোগে যে যাহার আপনাপন শোভা—কেহ বা পৃথিবীতে অভিষেক করিল, কেহ বা স্বর্গাভিমুখে প্রেরণ করিল—করিয়া, সকলে শান্তিপ্রদ হরিদ্বর্ণ ধারণ করিয়া রহিল।

পান্থ প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর শুষ্ক পত্রাদি সংযোগে অগ্নি জ্বালনপূর্ব্বক পূর্ব্বদিবসের ন্যায় অন্ন পাক করিয়া প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলেন। পরে পাথেয় দ্রব্যসামগ্রী সমুদায় স্কন্ধে আরোপণ কবিযা ভূতলে জানু পাতনপূর্ব্বক আন্তরিক ভক্তি সহকারে সংযত-মনোবৃত্তি হইয়া স্বীয় ধর্ম্মের শাসনানুযায়ী পুণ্যধাম মক্কার প্রত্যভিমুখে ঈশ্বরারাধনা করিয়া পুনর্ব্বার গমনোদ্যত হইলেন।

অপরিজ্ঞাত কাননপথে একাকী যাইতে যাইতে পূর্ব্বরাত্রিব অদ্ভুত স্বপ্নটি বাবম্বার স্মৃতি-পথারূঢ় হইতে লাগিল। স্বপ্নটি তাঁহার চিত্তপটে এমনি স্পষ্টরূপে চিত্রিত হইয়াছিল যে, এক এক বার বোধ হইল উহা অবশ্যই সত্য হইবে। আবার ভাবিলেন, আমি এই দেশে নামধামবিহীন আগন্তুক ব্যক্তি, আমি এই দেশের একাধিপতি হইব ইহা স্বপ্নেরই বিষয় হইতে পারে, কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে; স্বপ্ন কেবল বাতিকের ক্রীড়া মাত্র; জাগ্রদবস্থায় যে সকল ভাব মনোমধ্যে উদিত হয়, মনুষ্য তাহা বুদ্ধিবলে দমন করিয়া মনোবৃত্তি সকলকে আপন আপন উচিত কার্য্যে নিযুক্ত করেন; স্বপ্নাবস্থায বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়, সুতরাং মনোমধ্যে বিবিধ অসঙ্গতভাবের আর্বিভাব হইবে আশ্চর্য্য কি? অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনও স্বপ্নে বিশ্বাস করেন না—বিশেষতঃ এরূপ দুরাশা সঞ্চিত করায় মহৎ হানির সম্ভাবনা; কারণ যদিও ইহা কস্মিন্‌কালে সফল হয়, তাহাতেই বা তাৎকালিক সুখের আধিক্য কি? আর যদি সফল না হয়, তবে যতকাল বাঁচিব ততকাল লোভরূপ দাবাগ্নিদ্বারা অন্তর্দাহ হইতে থাকিবে; অপরন্তু, সংকীর্ণ ধর্ম্মপথাবলম্বী হইয়া ঈদৃশ দুশ্চিন্তা নিমগ্ন হইলে স্খলিতপদ হইয়া অধঃপতিত, অথবা অন্যমনস্কতা বশতঃ বিপথগামী হইতে হয়—অতএব হে জগৎপতে! আমার এই প্রার্থনা, কখন যেন অন্তঃকরণে লোভের ভার এমত না হয় যে, তজ্জন্য অবিনশ্বর ধর্ম্ম পদার্থকে এই নশ্বর জীবন অপেক্ষা লঘু বোধ করি।

শুদ্ধাত্মা পথিক এই সকল চিন্তাদ্বারা উদ্রিক্ত দুরাকাঙ্খা নিরাকরণের চেষ্টা করিতে করিতে চলিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পথিক এইরূপ চিন্তা-মগ্ন হইয়া কুটিলকানন-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ একটি স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কতিপয় ব্যক্তি একত্র উপবেশন করিয়া কেহ বা তাম্রকূটধূম পানে কেহ বা অন্যান্য

উপযোগে মনোযোগ করিয়া আছে। পর্য্যটক মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইহারা যদি শত্রুতা করে, তবে কখনই পলাইয়া রক্ষা পাইব না, আর শত্রুতাই করিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?—মিত্রতা কবিলেও কবিতে পারে। অতএব ইহাদিগেব সম্মুখে সাহস করিয়া গিয়া পথ জিজ্ঞাসা করি, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। এইরূপে সাহসে ভর করিয়া তিনি ঐ বনচরদিগের সম্মুখীন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "ওহে ভাই সকল! আমি পথিকজন—এই স্থানের পথ জানি না, অনুগ্রহ করিয়া কহিয়া দেও।" এই কথা শ্রবণমাত্র একজন শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বিকট হাস্য করত কহিল, "ওহে পথিক! ভাল, বল দেখি, যদি এইখানেই তোমার গতি শেষ করা যায়, তাহাতে হানি কি?" পর্য্যটক উত্তব কবিলেন, "তাহাতে অনেক ক্ষতি আছে, কিন্তু সে সকল কথা কহিবাব অবকাশ নাই—এক্ষণে পথ বলিয়া দেও উত্তম—নচেৎ চলিলাম।" বনেচর কহিল, "তুই আব কোথা যাবি?—জানিস না, আমবা এই কাননবক্ষক, যে যে এখান দিয়া যায় সকলের স্থানেই আমবা শুল্ক আদায় কবি—আমাদিগেব অনুমতি ভিন্ন কেহই এখান দিযা যাইতে পারে না।" পথিক কহিলেন, "ভাই, আমি পণ্যজীবী বণিক্ নহি, কোন ব্যবসায-বাণিজ্য করি না।—আমার স্থানে কি শুল্ক পাইবে?" তস্কব তখন আপন প্রকৃত মূর্ত্তি ধাবণ করিয়া কহিল, "ওরে মূর্খ! তুই নিঃসহায়, আমবা আটজন, তোর দুই হস্তেব কি এত বল হইবে যে, আমাদিগেব আটজনেব সহিত একাকী যুদ্ধ করিবি?—যদি ভাল চাহিস্ তবে বাকছল পবিত্যাগ কব, সমভিব্যাহাবে যে ধনসম্পত্তি বা ভক্ষ্যসামগ্রীসম্ভার আছে সমুদায় আমাদিগকে আনিযা দে, দিয়া স্বচ্ছন্দে চলিযা যা, নিবাবণ করিব না—আমাদিগেব এই ব্যবসায, কেহ কখন আমাদিগেব কথাব অন্যথা কবিতে পাবে না।" "তবে তোমবা চৌর্য্যবৃত্তি?" "আমবা চোব হই বা না হই সে কথায় তোর প্রযোজন কি?" "এই প্রযোজন যে, তোমাব সাতজন মাত্র সহায, কিন্তু যদি সাতশত হয় তথাপি জীবনসত্ত্বে আমি আত্মাবহ হইব না।" তস্কব পথিকের সাহসেব কথা শুনিযা আপন সহযোগিগণকে কহিল, "এ বেটা বলে কি বে?—এ যে মবিতে বসেও কার্দ্দানি ছাড়ে না। ভাল, দেখা যাউক, দুই এক ঘা ওসাবিয়া দিলেই ইহাব বুদ্ধি স্বস্থান প্রাপ্ত হইবে" এই বলিযা পথিকেব প্রতি দৃষ্টি কবিযা কহিল—"আইস তোমার পিঠ্‌বোচ্‌কাটি নামাইযা দি, ছি ছি কুজেব মত পিঠে থাকাতে কি কদাকাব দেখাইতেছে, এবার সোজা হইয়া রূপখানি দেখাও।" পথিক তস্কবের উপহাসে ক্রুদ্ধ হইযা কহিলেন, "বে চোর! আমি প্রাণের ভয কবি না, বিশেষতঃ একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এমত কোন সুখ পাই নাই এবং কখনও পাইব এমত আশাও কবিতেছি না যে, জীবনভযে কাতব হইযা তোর শরণ প্রার্থনা করিব—মৃত্যু আমার পক্ষে প্রার্থনীয—অতএব সাবধান হইযা আমাব গতি রোধ কব্।" এই বলিযা পথিক এক বৃহৎ বনতরুকে আশ্রয কবিযা নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে দণ্ডাযমান হইলেন, এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা কবিলেন। চোবেবা ঈদৃশ সাহস এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে চমৎকৃত হইল। পরে একজন দুবাত্মা দূব হইতে সন্ধান কবিযা পথিকেব অপসব্য হস্তে শর নিক্ষেপ কবিল। পথিক তৎক্ষণাৎ শবকে উৎপাটন কবিযা ফেলিলেন, কিন্তু শবধাবে বাহুব শিরা ছিন্ন হইয়াছিল, অতএব যুদ্ধ করিবেন কি, ভুজোত্তোলন করিতেও সমর্থ হইলেন না। চোবেবা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিবস্ত্র কবিল, এবং তাহার পৃষ্ঠস্থিত থলিযা মোচন করিয়া ফেলিল।

লুব্ধেরা পথিকের সমুদায় সম্ভার বাহির কারয়া দেখে তাহাতে এমন কিছুই নাই যে, গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হয়। কিন্তু পথিক সেই সকল দ্রব্যসামগ্রীর জন্যই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, ইহা ভাবিযা কেহ পরিহাস করিতে লাগিল, এবং কেহ অদ্ভুত ব্যাপার মানিয়া তূষ্ণীভূত হইয়া রহিল। অনন্তর তস্করপতি নিজ অনুচরদিগকে আদেশ করিয়া কহিলেন, "দেখ ইহার সঙ্গে এক কপর্দ্দকও নাই, কিন্তু ইহার শরীর বিলক্ষণ সবল এবং পরিশ্রমক্ষম, এমন দাস পাইলে অনেকে ক্রয় করিবে, অতএব চল উহাকে সঙ্গে করিয়া লই, যে কয়েক দিবস হাতের ঘা-টা আরাম না হয়, আমাদিগের

সঙ্গেই থাকুক, পরে কোন গ্রামে লইয়া বিক্রয় করিলেই হইবে।" এইরূপ কর্ত্তব্যতা নিৰ্দ্ধারিণ হইলে চোরেরা পথিকের হস্তযুগল তাঁহার নিজ উষ্ণীষ বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করত তাঁহাকে আপনাদিগেব মধ্যবৰ্ত্তী করিয়া লইল।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই পথিক তাহাদিগের কর্ত্তৃক কতিপয় কুটীর সম্মুখে নীত হইলেন। ঐ সকল কুটীর তস্করদিগের নিৰ্ম্মিত এবং তাহাদিগের পরিজনের আবাস। চোরেরা সেই স্থানে পথিকের নিমিত্ত একটি নূতন কুটীর প্রস্তুত করিয়া দিল। পান্থ বনেচরদিগের সমভিব্যাহারে তিন দিবস যাপন করিলেন। তাঁহার হস্তের ক্ষত প্রায় শুষ্ক হইযাছিল, আর দুই চাবি দিবসে সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার সম্ভাবনা, এমত সময়ে তস্করেরা একত্র হইযা তাহাকে সম্মুখীন করিল, এবং তাহাদের অধিপতিদ্বারা কহিতে লাগিল, "শুন পথিক! আমরা তোমার দেহ-শক্তি এবং সাহস দর্শনে পরমাপ্যায়িত হইয়াছি, আমরা চোর বটি, কিন্তু যথার্থগুণেব পুবস্কাবে পবাঙ্মুখ নহি, তোমার পাথেয দেখিয়া নিতান্ত দুরবস্থা বুঝিয়াছি, অতএব আমরা তোমাকে সমভিব্যাহারী করিতে স্বীকার করিলাম; দেখ আমাদিগের কন্যা কলত্রাদি আছে এবং আমবা বনেচব বলিযা নিতান্ত ক্লেশে কালযাপন কবি না—ইচ্ছা হয় ত আমাদিগের সহিত মিলন কর, নচেৎ পূৰ্ব্বে যে অভিসন্ধি কবিযাছি অবশ্য তাহাই করিব।" পথিক ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "তোমাদিগেব যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে, আমি কোনক্রমেই অসৎবৃত্তি অবলম্বন করিব না—ববং তোমাদিগকে অগ্রে সাবধান করিতেছি যে, আমাকে কোন রহস্যানুসন্ধান জ্ঞাত করিও না, কবিলে, প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা জানিবে।" তস্করপতি কহিলেন, "আমরা সে ভয় কবি না। সাহসী বীবগণ কখন বিশ্বাসহন্তা হইতে পারে না, বিশ্বাসঘাতকতা নীচপ্রকৃতি ভীরুগণেরই ধৰ্ম্ম।" পথিক কহিলেন, "তোমরা সে আশা পরিত্যাগ কব, চোর ও দস্যু প্রভৃতি যে সকল দুরাত্মা মনুষ্যমাত্রেরই অপকারক, তাহাদিগকে ব্যাঘ্রভল্লুকাদিব ন্যায উচ্ছেদ করা সকল ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য কৰ্ম্ম—না করিলে, ধাৰ্ম্মিকগণের অনুপকাব কবা হয।" চৌরপতি পথিকের ভর্ৎসনা বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "আব তোব সাধুতা প্রকাশ কবিতে হইবে না, আমি বুঝিলাম, তুই না ধাৰ্ম্মিক জনের, না সাহসী পুরুষদিগেব সংসর্গী হইবার যোগ্য—অতএব তুই যাদৃশ নীচপ্রকৃতি অচিরাৎ তদুপযুক্ত দাস্যবৃত্তি প্রাপ্ত হইবি।" পথিক উত্তর করিলেন, "নিবস্ত্র এবং আহত ব্যক্তিকে অধাৰ্ম্মিক ভীরুজনেরাই অপমান করে—তাহাতে মনুষ্যত্ব নাই।" চৌরপতি ঈষৎ লজ্জাযুক্ত হইয়া গাত্রোত্থান করত কহিলেন, "ভাল ভাল, এত বাকবিতণ্ডাব প্রয়োজন নাই—তুমি আমার অনুচর হইতে অস্বীকার করিলে, অতএব চল তোমাব শরীর বিক্রয় করিযা আমাদিগেব এতাবৎ পরিশ্রম সফল করি।" এই বলিয়া তস্করেরা পথিককে সমভিব্যাহাবে করিযা চলিল এবং বন উত্তীর্ণ হইয়া অনতিদূরে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম প্রাপ্ত হইল। সেই গ্রামের হট্টে একজন দাসক্রেতা পথিককে ক্রয় করিয়া লইল। চোরেরা মূল্য পাইয়া চলিয়া গেল। পথিক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার স্বপ্ন বিলক্ষণই সফল হইল। আমি কি নিৰ্ব্বোধ যে, এমন দুরাশাকে মনোমধ্যে স্থান দান করিয়াছিলাম! কোথায় রাজ্যেশ্বব হইব, না দাস হইলাম! বিধাতা কপালে আরও কি লিখিয়াছেন, বলা যায় না; কিন্তু যাহা হউক এমত কোন কৰ্ম্ম করা হইবে না, যাহাতে শেষে অনুতাপ বা অপযশের ভাজন হইতে হয়।

দাস-ক্রেতা পথিকের অঙ্গস্পর্শ করিয়া এবং বীরলক্ষণাক্রান্ত শরীর দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত পরিশ্রমসহিষ্ণু বুঝিয়াছিলেন। অতএব আপন আলয়ে আনিয়া বিশিষ্ট যত্নপূৰ্ব্বক ভেষজসেবন করাইয়া তাহার হস্তের ক্ষতদোষ সংশোধন করাইলেন। কিন্তু তিনি লোভপরবশ হইয়া ঐ দাসটির প্রতি যেরূপ অধিক মূল্য নিরূপিত করিলেন, তাহাতে কেহই ক্রয় করিতে চাহিল না। কিছুদিন এইরূপে গত হইলে দাস-বিক্রেতা মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই দাসটির জন্য অনেক ব্যয়ব্যসন করিলাম, কিন্তু কেহই ইহাকে ক্রয় করিতে চাহে না—কি করি?—অথবা উহার যাদৃশ শ্রী দেখিতে

পাই, তাহাতে উহাকে সদ্বংশজাত বলিয়া বোধ হয়, অতএব উহাকেই জিজ্ঞাসা করি যদি আমাকে অর্থদ্বারা তুষ্ট করিতে পারে, তবে দাস্যবন্ধন হইতে মোচন করিয়া দিব। এই ভাবিতে ভাবিতে দাসের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে! তুই স্বাধীন হইতে চাহিস্ কি না?" "মহাশয়! এ কথা কি জিজ্ঞাস্য? পিপাসাতুর কি জল পান করিতে পরাঙ্মুখ হয়?" "ভাল, তবে তুই আমাকে তুষ্ট করিবি কি না?" "কি প্রকারে তুষ্ট করিব, অনুমতি করুন।" "অর্থদ্বারা।" দাস দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিল, "স্বাধীনতা প্রাণিমাত্রের স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, কেহ কাহাকে এই ধনে বঞ্চিত করিতে পারে না, আমিও সেই নিজস্ব অর্থদ্বারা ক্রয় করিতে সম্মত নহি—তাদৃশ অধার্ম্মিক জনের প্রবঞ্চনাতেই দুষ্ট লোকে দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয় এবং দুর্ভাগ্য জনের স্বাধীনতা অপহরণ করে।" এই বলিতে বলিতে দাসের চক্ষুর্দ্বয় ক্রোধে লোহিতবর্ণ এবং শরীর কম্পমান হইতে লাগিল। দাস-বণিক্ ভয়ে সঙ্কুচিতচিত্তে এবং ম্লানবদন হইয়া শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। সেই অবধি তাহার চেষ্টা হইল, যাহাতে দাসকে অন্যহস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি নিষ্কৃতি পায়।

কিযদ্দিনান্তর সৌভাগ্যক্রমে খোরাসান-প্রদেশাধিপতি অতি বদান্য এবং ক্ষমতাবান্ আলেপ্তাগীন্ ঐ দাসকে ক্রয় করিয়া আপন পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

দাস কিছুকাল মহীপালের আশ্রয়ে বাস করিতে করিতে প্রভুকে স্বীয় গুণে বদ্ধ করিল। রাজা তাহার ধর্ম্ম-পরায়ণতা, জিতেন্দ্রিয়তা, নিরালস্য এবং স্বামিবাৎসল্য দেখিয়া পরম তুষ্ট হইয়া তাহাকে সর্ব্বদা আপন সমীপে রাখিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে তাহার পদোন্নতি করিয়া দিলেন। একদিন দুইজনে একত্র বসিয়া আছেন এমন সময়ে রাজা নিজ দাসের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত অবগত হইবার ইচ্ছা খ্যাপন করিলে দাস কহিতে লাগিল।—

"মহারাজ! আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত অতি সঙ্ক্ষেপ। আমি দাস হইয়াছি বটে, কিন্তু কখন এমত কোন কর্ম্ম করি নাই যাহাতে বংশের কলঙ্ক হয়। যখন মুসলমানেরা 'কালিফ্ ওথ্‌মানের' আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পারস্যরাজ্য আক্রমণ করে, তখন পারস্য-ভূপাল 'ইসদ্গর্দ' তাহাদিগের পরাক্রম-অসহিষ্ণু হইয়া তুর্কস্থানে পলায়ন করেন। আমি সেই রাজার বংশজাত। তাঁহার সন্তানেরা তদ্দেশের আচার-ব্যবহার অবলম্বন করিয়া তুর্কীয় জাতি হইয়া গেলেন। আমিও সেইরূপে তুর্কী হইয়াছি।—আমার পিতা নির্ধন ছিলেন, সুতরাং বালককালাবধি আমাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। তজ্জন্য সর্ব্বদা পরিশ্রম এবং ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু তাহাতে আমার বপু সবল এবং মন উৎসাহশীল ও পরিশ্রমানুরক্ত হইল। অতএব আমি দরিদ্রাবস্থাকে ক্ষেমঙ্কর বলিয়া মানি।—পিতা নির্ধন ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞানযোগ ছিল। তিনি প্রাচীন ইতিহাসাদি গ্রন্থ অনেক জানিতেন, কিন্তু তত্তাবৎ পাঠ করাইবার অনবকাশ বশতঃ সমুদায় বিদ্যার সার পদার্থ যে ধর্ম্মতত্ত্ব তাহাই অহরহ শিক্ষা করাইতেন। অতএব তাঁহার অনুগ্রহ বশাৎ আমি বালককালাবধি ইন্দ্রিয়দমন করিতে এবং জগৎপিতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে অভ্যাস করিয়াছিলাম। শৈশবাবধি আমার অন্তঃকরণে এই ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল যে, আমার দ্বারা পরিবারের ক্লেশমোচন হইবে। সেই আশা অবলম্বন করিয়া ঊনবিংশতি বর্ষ বয়ঃকালে পিত্রালয় পরিত্যাগ করি। ইচ্ছা ছিল, কোন রাজসংসারে যোদ্ধৃকর্ম্ম স্বীকার করিব। পথিমধ্যে দস্যুকর্ত্তৃক পরাভূত এবং দাস্যে নিযুক্ত হওয়াতে সেই বর্দ্ধমান আশালতা একেবারে ছিন্নমূলা হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া অবধি তাহা পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত, সম্বর্দ্ধিত এবং ফলিত হইয়াছে।

আলেপ্তাগীন্ এই বৃত্তান্ত শ্রবণে তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার দাসত্ব মোচন করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে উন্নত-পদ করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রিত্বে এবং সর্ব্ব-সৈন্যাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত

করিলেন। দাস তাদৃশ উচ্চপদারূঢ় হইয়া ব্যবহারের কিছুমাত্র অন্যথা করিলেন না। তাঁহার শান্তস্বভাব ও বিচক্ষণতায় সেনাপুঞ্জ বিলক্ষণ ভক্তিমান ও সুশিক্ষাসম্পন্ন হইল। তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যপ্রভাবে রাজার সকল শত্রু ক্ষীণবল হইয়া অধীনতা স্বীকার করিল, এবং রাজ্যও নিরুপদ্রবে পালিত হওয়াতে প্রজাবৃন্দের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বেই এই অমাত্যের পিতা লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, অতএব আত্মজের ঈদৃশ বিভব দেখিতে পান নাই। কিন্তু জননী তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন, অতএব তিনি পুত্র সন্নিধানে আনীত হইয়া তাঁহার তাদৃশ গৌবব দর্শনে ও গুণকীর্ত্তন শ্রবণে চক্ষুকর্ণের চবিতার্থতা লাভ কবিতে লাগিলেন। কি চমৎকার। যে ব্যক্তি সহায়সম্পত্তিবিহীন হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করত সিংহভল্লুকেব সহবাসী হইয়াছিল, যে নানা সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে জীবন্মৃত্যুস্বরূপ দাসত্বদশাগ্রস্ত হইযাছিল, সেই ব্যক্তিই এক্ষণে পৃথ্বীপতির সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইতে লাগিল, এবং সহস্র সহস্র নবগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া তাহাদিগের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে লাগিল। পবমেশ্বরেব কি অপাব মহিমা! তিনি অতি উচ্চকে নীচ করিয়া এবং অতি অধমকেও প্রধান পদারূঢ় কবিযা মানবকুলকে সর্ব্বদাই সাংসারিক বিভবের অস্থায়িত্ব এবং ধর্ম্মপদার্থেব অবিনশ্বরত্বের প্রমাণ দর্শাইতেছেন। ফলতঃ প্রধান মন্ত্রী এক্ষণে পরমসুখে কালযাপন কবিতে লাগিলেন এবং বাল্যাবস্থায় নানাপ্রকার দুঃখ পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার চরম সুখ অধিকতব প্রীতিজনক বোধ হইতে লাগিল।

আলেপ্তাগীন্ রাজার একটি পবমাসুন্দবী কন্যা ছিল। কন্যার যাদৃশ লাবণ্যমাধুবী তাহাব গুণও তাদৃশ ছিল। অতএব দেশীয় এবং বৈদেশিক আঢ্য কুলীন সন্তানগণ তাহাব পাণিগ্রহণাভিলাষে আসিযা নিবন্তর উপাসনা কবিত। কিন্তু রাজকন্যা উপাসনার বশ ছিলেন না। তিনি ক্রমে ক্রমে সকল বিবাহার্থীকেই বিদায় করিয়া অনূঢ়াবস্থায় কালযাপন কবিতে লাগিলেন। বাজাব অন্য অপত্য ছিল না। কেবল সেই একমাত্র কন্যা। সুতরাং কন্যা বিবাহে সম্মতা হইযা উপযুক্ত ববপাত্র গ্রহণ করেন, এমত একান্ত বাসনা থাকিলেও কন্যাব অনভিমতে তাহার বিবাহ সম্পন্ন কবণে ইচ্ছা করিতেন না।

প্রধানমন্ত্রীকে সর্ব্বদাই রাজবাটীর অভ্যন্তবে গমন কবিতে হইত। সেই সকল সময়ে বাজকন্যাব সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন হইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের উভযেবই মানসে প্রণয়েব সঞ্চার হইয়া উঠিল এবং দিন দিন উভয়েই উভযেব গুণ পবিচিত হইযা পবস্পব অধিকতব নৈকট্য বাসনা করিতে লাগিলেন। আন্তরিক ভাবমাত্রই নয়ন দ্বাবা বিলক্ষণ প্রকাশমান হয। বিশেষতঃ প্রকৃত অনুরাগের অঙ্কুরোদয় হইলে প্রণয়িযুগলেব প্রীতি-প্রফুল্ল নেত্র এমত রমণীয়, সস্নেহ, সতৃষ্ণ দৃষ্টি ধারণ করে যে, দেখিবামাত্রই পরস্পরের মন বিকশিত হইয়া উঠে, এবং কথা না কহিলেও তাদৃশ নয়নদ্বারাই মনোগত সমুদায় ভাব ব্যক্ত হইয়া যায়। একদিন প্রধানমন্ত্রী বাজনন্দিনীব সহিত কথোপকথন কালে তাঁহার ঐরূপ দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিযা আপন মানস ব্যক্ত কবণেব সাহস প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কি বলিলেন, এবং গুণবতী জেহীরা কি উত্তর করিলেন তাহা বর্ণন কবা অসাধ্য। যথার্থ প্রণয়ের আবির্ভাবে শুদ্ধাত্মা মানবের চিত্ত যে কত প্রকার রমণীয় গুণধারণ করে তাহা কে বলিতে পারে? তখন শরীরের জড়তা অপগত হয়, অন্তঃকরণের অসাধুতা দূবীভূত হয়, জিহ্বাগ্রে সরস্বতী নৃত্য করেন, এবং সর্ব্বতোভাবে আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হওয়াতে অন্তরিন্দ্রিযগণ পরোক্ষ দৃষ্টির প্রথম সোপান অবলম্বন করে। আহা! জগদীশ্বর যে প্রীতি-পদার্থকে পরমসুখের প্রধান বর্ত্ম করিয়া দিয়াছেন, অজিতেন্দ্রিয় মানবগণ নিরঙ্কুশ রিপুগণ কর্ত্তৃক সেই বর্ত্ম দ্বারাই কি বিষম বিপাকে পতিত হইতেছে। প্রধানমন্ত্রী আপন মনোগতভাব প্রকাশ করিলে পর সরলহৃদয়া রাজপুত্রীও সমুদায় ব্যক্ত করিলেন। পরে কিঞ্চিৎকালান্তরে কহিলেন, "আমি তোমার সহিত মিলিত-জীবন হইয়া যাবজ্জীবন তোমার সুখ-দুঃখ-ভাগিনী হইতে অসম্মতা নহি, কিন্তু অগ্রে পিতার অনুমতি গ্রহণ করা

আবশ্যক, স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীই প্রধান গুরু, কিন্তু যে কামিনী অনূঢ়াবস্থায় পিতার অসম্মান করে, সে যে গৃহিণী হইয়া স্বামীর বশীভূতা হইবে এমত সম্ভাবনা অতি বিরল।" প্রধানমন্ত্রী বলিলেন, "আমি এইক্ষণে রাজ-সন্নিধানে চলিলাম, তাঁহাকে আমাদিগের মানস ব্যক্ত করিয়া বলিব। তিনি আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন বটে, তথাপি আভিজাত্যাভিমান মানবগণের অন্তঃকরণে অতি প্রবল বলিয়া শঙ্কা হয়।"

সেই দিনই রাজা এবং রাজমন্ত্রী উভয়ের ঐ বিষয়ে কথোপকথন হইল। মন্ত্রী স্বীয় মনোগত ব্যক্ত করিলে ভূপাল কিছুমাত্র বিরূপ না হইয়া উত্তর করিলেন, "দেখ, জেহীরা আমার একমাত্র সন্তান—এই জীবন-বৃক্ষের একমাত্র পুষ্প, যাহার দ্বারা আমার সংসারকানন আমোদিত এবং অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হইয়া আছে। অতএব আমার একান্ত বাসনা যে, তাঁহাকে এমন পাত্রসাৎ করি, যাহাতে চিরকাল সুখভাগিনী হইয়া থাকে। অনেক রাজপুত্র এবং কুলীনসন্তান বিবাহার্থী হইয়া তাহার উপাসনা করিয়াছেন, সে কাহাকেও বরমাল্য প্রদানে সম্মতা হয় নাই—আমিও এই বিষয় তাহার অনভিমত করিতে চাহি না। অতএব তুমি অগ্রে তাহার মত কর তাহা হইলেই আমার সম্মতি পাইবে।" মন্ত্রিবর উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমি আপনকার কন্যার নিকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছি এবং তিনিও আমাকে স্বামিত্বে বরণ করিতে সম্মতা আছেন; কেবল আপনকার অনুমতির অপেক্ষা; এক্ষণে আপনকার অনুকূলতার প্রতি আমার যাবজ্জীবনের সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে।" রাজা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে উত্তর করিলেন, "যদি তুমি জেহীরার সম্মতিলাভ করিয়া থাক, তবে আর আমার কোন প্রতিবন্ধকতা নাই, আমি এই দণ্ডেই অনুমতি দিতেছি , যে পরম পুরুষ মনুজগণের মধ্যে উদ্বাহসংস্কার সংস্থাপন করিয়াছেন তিনি এই কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলাবহ করুন,—যাহা হউক, এই আমার পরম পরিতোষ যে, জেহীরা অনুপযুক্ত পাত্রে প্রীতি সমর্পণ করে নাই।"

অনন্তর কতিপয় দিবস মধ্যেই ভূপাল মহা সমারোহ পুরঃসর স্বীয় প্রিয়পাত্রের সহিত আত্মজার উদ্বাহসংস্কার সম্পন্ন করিলেন। অজ্ঞাতকুলশীল জনের সহিত কন্যার পরিণয়-সম্বন্ধ করাতে দেশীয় কুলীনবর্গ মৎসর-ভাবাপন্ন হইলেন, কিন্তু মন্ত্রীর গুণগ্রামে বশীভূত প্রজাসাধারণ অত্যন্ত প্রফুল্লমনে আনন্দ-মহোৎসব করিতে লাগিল।

কিয়দ্দিবস পরে আলেপ্তাগীন্ গজনন্ নগরে রাজধানী সংস্থাপন করিয়া পঞ্চদশ বর্ষকাল পরম সুখে রাজ্যভোগ করিলেন। তাঁহার পরলোক হইলে পুত্রপৌত্রাদি কেহ না থাকাতে ঐ জামাতাই রাজ্যাধিকারী হইয়া নিজ স্বপ্ন সফল বোধ করত সবক্তাগীন নামে বিখ্যাত হইলেন। ইঁহারই পুত্র গজ্নবী মহম্মুদ, যৎকর্ত্তৃক এই ভারতভূমি সর্ব্ব প্রথমে আক্রান্ত এবং মুসলমানাধিকার-সম্ভূত হয়।

ঐতিহাসিক উপন্যাস ১৮৫৮

দা মি নী

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বহুদিন হইল, একদিন সন্ধ্যার সময় সপ্তবৎসরবয়স্কা একটি বালিকা ভাগীরথীতীরে দাঁড়াইয়া, অনিমেষ-লোচনে স্রোতস্তাড়িত দীপমালা দেখিতে দেখিতে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী এক বৃদ্ধাকে বলিল, "আয়ি, আমার দীপ ভাসিয়া গেল।" আয়ী উত্তর করিলেন, "তা যাক, এখন তুমি ঘরে চল, অন্ধকার

হইল।" "আর একটু দেখি" বলিয়া বালিকা দাঁড়াইয়া রহিল।

বালিকাটির নাম দামিনী। বৃদ্ধ মাতামহী ব্যতীত দামিনীর আর কেহই ছিল না: সেই মাতামহীর সঙ্গে আসিয়া দামিনী এই প্রথমে দীপ ভাসাইল; দীপ ভাসিয়া গেল। অন্য বালিকার ন্যায় দামিনী হাসিল না, অন্য বালিকার ন্যায় "ঐ আমার দীপ যাইতেছে" বলিযা আহ্লাদে সঙ্গিনীকে দেখাইল না; কেবল গম্ভীরভাবে একদৃষ্টিতে সেই দীপের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সেই অকুল নদীতে দামিনীর দীপ একা ভাসিয়া চলিল। দামিনীর দীপ দামিনী আপনি ভাসাইয়াছে এক্ষণে আর উপায় নাই; অতএব কাতর অন্তরে দামিনী বলিতে লাগিল, "হে ঠাকুর। আমার দীপকে রক্ষা কর।"

অন্ধকার ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল দেখিয়া, মাতামহী দামিনীকে গৃহে লইযা চলিলেন। দামিনী গম্ভীরভাবে কেবল দীপের গতি ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গেল। প্রাঙ্গণপার্শ্বে একটি কলসে জল ছিল; দামিনী সেই জলে আপন ক্ষুদ্র পদদ্বয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বাবা প্রক্ষালন করিয়া শযনঘবে প্রবেশ করিল। শয়নমাত্রই নিদ্রা আসিল। নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—যেন মেঘ অন্ধকারে ভাবী হইযা নদীর উপর নামিয়া পড়িয়াছে। ঐ মেঘ দেখিয়া দামিনীর দীপ যেন ভয়ে অল্প অল্প জ্বলিতে জ্বলিতে পলাইতেছিল; এমত সময়ে পতনোম্মুখ ভয়ানক ভয়ানক তরঙ্গ আসিয়া তাহাব চারি দিকে ঘেবিল। ঐ তরঙ্গের মধ্যে একটির চূড়ার উপব গম্ভীরভাবে একটি বিড়াল বসিযা আছে। দামিনী চিনিল যে, সেইটি তাহাদের পাড়ার দুরন্ত বিড়াল; সেটি তাহাকে দেখিলেই নখাঘাত করিতে আসিত। দামিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কেবল চক্ষু মুদিযা চীৎকাব করিত, কখনও পলাইতে পাবিত না। এক্ষণে তরঙ্গচূড়ায় সেই বিড়ালকে দেখিয়া দামিনী ভয়ে মাতামহীব অঞ্চল ধরিয়া চক্ষু মুদিল। বৃদ্ধা যেন ক্রুদ্ধা হইয়া আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া লইয়া দামিনীর ক্ষুদ্র দেহ সেই অগাধ জলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। দামিনী চীৎকাব করিয়া উঠিল। মাতামহী "ভয় কি" বলিয়া নিদ্রিতা দামিনীকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। দামিনী নিদ্রাভঙ্গে "আমার মা কোথায" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অভাগিনীব মা ছিল না। তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহাব মাতা নিরুদ্দেশ হইযাছিল।

পরদিবস প্রাতে দ্বাদশবর্ষীয় একটি বালক পাঠশালায যাইতেছিল; দামিনীর গৃহদ্বাবে দাঁড়াইযা পক্ষীশাবকের নিমিত্ত পতঙ্গ সংগ্রহ হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা কবিল। দামিনী একা বসিযাছিল, বালকের প্রশ্নে কেবল মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল। বালক অগ্রসর হইযা জিজ্ঞাসা কবিল, "জ্বর হইয়াছে কি?" দামিনী আবার মাথা নাড়িল। বালক বলিল, "আয়ীর উপব রাগ করিয়াছ?" দামিনী কোন উত্তর দিল না। বালক বস্ত্রাগ্র হইতে কতকগুলি পতঙ্গ দামিনীর নিকট রাখিযা চলিয়া গেল।

বালকটির নাম রমেশ। দামিনীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিল না; প্রতিবাসী বলিযা দামিনী তাহাকে রমেশদাদা বলিয়া ডাকিত। দামিনী রমেশের বড় অনুগত ছিল। যে বিড়ালটিকে দামিনী বড় ভয় করিত, রমেশ তাহাকে দেখিলেই মারিত। স্নানেব সময রমেশ স্রোতে সন্তবণ কবিয়া দামিনীব নিমিত্ত পুষ্প ধরিয়া আনিত; দামিনী তাহা লইয়া হাসিতে হাসিতে কেশে পরিত; পরা হইলে মাথা নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "রমেশদাদা, দেখ, হয়েছে?" রমেশ প্রায় ভাল বলিত, আবার মধ্যে মধ্যে মনোনীত না হইলে আপনি পরাইয়া দিত। রমেশ জানিত যে, গ্রামের সকল বালিকার অপেক্ষা দামিনী শান্ত আর দুঃখিনী। আর দামিনী ভাবিত যে, গ্রামের সকল বালক অপেক্ষা রমেশদাদা তাহার "আপনাব জন"। আর কেহ ত তাহার জন্য ফুল কুড়ায় না, পতঙ্গ ধরে না, বিড়াল মারে না। এই জন্য রমেশদাদাকে দেখিলেই দামিনী দৌড়িয়া নিকটে যাইয়া দাঁড়াইত; হাসিমুখে সকল কথার উত্তর দিত। কিন্তু এই দিন রমেশকে দেখিয়া আর পূর্ব্বানুরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিল না। দামিনী শৈশবগম্ভীর হইয়াছে।

দামিনী শৈশবে এত গম্ভীরপ্রকৃতি কেন? যে সুখী, সেই চঞ্চল, যে দুঃখী, সেই শান্ত, সেই ধীর,

সেই গম্ভীর। এক দারুণ দুঃখে দামিনী এই শৈশবে কাতর। দামিনীর মা কোথা? তাহার মা কি মরিয়াছেন? তা হইলে লোকে বলে না কেন? পাড়ায় সকল ছেলে, মার কোলে শোয়, মার হাতে খায়, মার কথা শোনে, মার মুখপানে চায়, মার সঙ্গে গল্প করে, মার সঙ্গে কোন্দল করে, মার কাছে দৌরাত্ম্য করে, দামিনীরই কপালে এই সকল হলো না কেন? আয়ী আছে—আয়ী বেশ—মার মত ভালবাসে—তবু মা। মার আদর কেমন। তিন বৎসর বয়সে দামিনী মা হারাইয়াছিল, দামিনীর মাকে একটু একটু মনে পড়িত।—একটু একটু—কেবল ছায়াটী—কেবল একখানি শরীর আর একখানি মুখ—তাতে আহ্লাদ আর হাসি—যেমন, যে বাল্যকালে দুর্গোৎসব দেখিয়াছে—আর কখন দেখে নাই—তাহার যেমন প্রৌঢ়াবস্থায় সেই দুর্গাপ্রতিমা মনে পড়ে, দামিনীর তেমনি মাকে মনে পড়িত। দামিনী কত সময়ে মনে মনে মাকে গড়িত—বসনে, অলঙ্কারে, মনে মনে সাজাইত,—তাহার উপর হাসিতে, আদরে প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া সাজাইত—সাজাইয়া মনে মনে মা মা মা! বলিয়া ডাকিত!

আজি মার কথা ভাবিতে ভাবিতে, মার কথা, দীপের কথা, স্বপ্নের কথা, রমেশের কথা, সব কেমন মিশাইয়া মনের ভিতর গোলমাল হইল। দামিনী ভাবিল, মরি ত বেশ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দশ বৎসর পরে আর একদিবস অপরাহ্নে একটী ক্ষুদ্র শয়নগৃহে দামিনী একা শয্যারচনা করিতেছিলেন। পশ্চিমদিকের ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া সূর্য্যকিরণ শয্যায় পড়িয়া দামিনীর মুখকমলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। তাঁহার নাসাগ্রে এবং কপোলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর্ম্মবিন্দু ক্ষুদ্র মুক্তারাজীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। দামিনী একখানি সিক্ত গাত্রমার্জ্জনী লইয়া গাত্রমার্জ্জনা আরম্ভ করিলেন।

দামিনী আর ক্ষুদ্র বালিকা নাই; এক্ষণে সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এক্ষণে সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। শরীরের গুরুত্বানুরূপ আবার অঙ্গচালনার গাম্ভীর্য্য জন্মিয়াছে। দামিনী স্বভাবতঃ গৌরাঙ্গী, এক্ষণে সেই বর্ণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল হইয়াছে।

গাত্রমার্জ্জনা সমাধা করিয়া দামিনী একখানি দর্পণ তুলিতেছিলেন, এমত সময়ে প্রাঙ্গণ হইতে একটী স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। দামিনী অমনি চঞ্চল হইয়া দর্পণ ফেলিয়া দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন। বালিকাবয়সে যাঁহারে দামিনী রমেশদাদা বলিতেন, তিনি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আপনার বিমাতার সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁহার প্রতি সস্নেহলোচনে দামিনী চাহিয়া রহিলেন।

রমেশ দামিনীর স্বামী; দামিনীর সর্ব্বস্ব।

কথা সমাধা হইলে রমেশ আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। শয্যায় দুই একটী পুষ্প পড়িয়া আছে দেখিয়া, দামিনীকে বলিলেন, "কোন্ চোরে আমার নামাবলী থেকে ফুল চুরি করেছে রে?"

দামিনী বলিল, "খুব করেছে, উনি ফুল এনে নামাবলীতে বেঁধে রাখতে পারেন, আর লোকে চুরি করতে পারে না? খুব করেছে—চুরি করেছে।"

রমেশ বলিলেন, "খুব করেছে বই কি? চোরকে একবার ধরিতে পারিলে বুঝিতে পারি।"

চোর আসিয়া ধরা দিল।

রমেশ দুই হস্তে দামিনীর দুই গাল ধরিলেন; দুই করে দামিনীর দুই কর্ণ আবরণ করিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। দামিনী রমেশের দুই বাহু ধরিয়া ঊর্দ্ধমুখে রমেশকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব।" দামিনীর চক্ষু অমনি জলে পূরিয়া আসিল। দামিনী কাঁদিয়া উঠিলেন।

রমেশ দামিনীকে ছাড়িয়া দিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "তুমি কি নিত্য কাঁদিবে?" দামিনী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "তুমি নিত্য আদর কর কেন?"

এই সময় দ্বারের পার্শ্বে ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ হইয়া উঠিল। যেন আর এক জন কেহ কাঁদিল। দামিনী ও রমেশ উভয়ে ব্যস্ত হইয়া সেই দিকে দেখিতে গেলেন। দেখিলেন, একজন অপরিচিতা অর্দ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া যাইতেছে। দামিনী তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন; বহির্দ্বার পর্য্যন্ত দামিনী গেলে স্ত্রীলোকটী ফিরিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ তাহাকে উন্মাদিনী বলিয়া বোধ হইল। দেখিয়া, দামিনীর যেন কি মনে পড়িল—কিন্তু কি মনে পড়িল, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। উন্মাদিনী হঠাৎ দামিনীর গলা ধরিয়া তাহার বক্ষে মাথা দিয়া মা! মা! বলিয়া কাঁদিতে লাগিল—কত কি বলিল—কত আশীর্ব্বাদ করিল—দামিনী কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না,—কিন্তু তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন।—কান্না দেখিলে কান্না পায় বলিয়া, কি কেন—তাহা জানি না।

দামিনী ধীরে ধীরে উন্মাদিনীর আলিঙ্গন হইতে আপনাকে বিমুক্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গা তুমি কে গা?"

উন্মাদিনী কিছু বলিল না, "মা মা"। বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। দামিনী বলিলেন, "কাঁদিতেছ কেন?"

উন্মাদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মা আছে?"

দামিনী কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিলেন, "বিধাতা জানেন", বলিযাই কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

পাগলী বলিল, "দেখ, তোমার মার নামেই তুমি কাঁদিতেছ—আমি আজ আমাব মা পাইয়াছি—আমি কাঁদিব না?"

একটী কথা সহসা বিদ্যুতের মত দামিনীর মনের ভিতর চমকিল—"এই আমার মা নয় ত?"

হাঁ, সেই ত মা। দামিনীর মা যে স্বামীর শোকে পাগল হইয়া পলাইয়াছিল। কোথায় গিয়াছিল, কোথায় ছিল, তাহা কে জানে? দিনকত ভৈরবী হইয়া ত্রিশূল ধরিয়া বেড়াইয়াছিল। আবার বহুকাল পরে সংসার মনে পড়িল—দামিনীকে দেখিতে আসিল—লুকাইয়া দামিনীকে দেখিতেছিল। দামিনীব মনে হঠাৎ উদয় হইল—"এই আমার মা নয় ত?"

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে রমেশের বিমাতা ডাকিলেন। দামিনী চমকিয়া ফিরিলেন। যেখানে পাগলী দাঁড়াইয়াছিল, সে দিকে আবার দেখিলেন; পাগলী চলিয়া গিয়াছে। একবার ভাবিলেন, তাহার অনুসরণ করি; দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন। আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিলেন। রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্ত্রীলোকটী কে?" দামিনী অন্যমনে মৃদুভাবে ভাবিতে ভাবিতে উত্তর করিলেন, "পাগল।"

রমেশ আর কোন কথা না বলিয়া বহিৰ্ব্বাটীতে গেলেন। দামিনী শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে কাঁদিলেন; দুই একবার অস্ফুটস্বরে মা বলিয়া ডাকিলেন। শৈশবে মা হারাইয়াছেন, সেই অবধি মা বলিয়া ডাকেন নাই। এক্ষণে পাগলের কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে বড় সাধ হইল। দামিনী বালিশে মুখ লুকাইয়া কত কাঁদিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে গ্রামে রমেশ বাস করিতেন, তাহার দক্ষিণপ্রান্তে ভাগীরথীতীরে একটা ভগ্ন অট্টালিকা ছিল। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বকালে এক রাজা আপন মাতার গঙ্গাবাসের নিমিত্ত ঐ অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন দৈব ঘটনায় ঐ অট্টালিকায় একটী স্ত্রী-হত্যা হওয়ায় রাজার মাতা উহা পরিত্যাগ করেন। সেই পর্য্যন্ত কেহ তথায় বাস করে নাই। অট্টালিকার ক্রমে ভৌতিক অপবাদ জন্মিল। শেষে দিবাভাগেও কেহ এ অট্টালিকার নিকট গিয়া গতিবিধি করিতে সাহস করিত না।

পাগলী দেখিল যে, এই ভয়ানক ভগ্ন অট্টালিকা তাহার বাসোপযোগী। অতএব গোপনে তথায় বাস করিতে লাগিল। দামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাগলের অনেক মতিস্থির হইয়াছিল; তথাপি

মধ্যে মধ্যে দামিনীকে চুরি করিয়া এই গোপনীয় স্থানে আনিয়া একা দেখিবে, এই মনে মনে স্থির করিত। আবার পরক্ষণেই ইহার অকর্ত্তব্যতা বুঝিতে পারিত। পাছে চাঞ্চল্যপ্রযুক্ত আত্মপরিচয় দিয়া জামাতার কলঙ্ক রটায়, এই ভয়ে আর দামিনীর বাটীতে যাইত না। একা ভগ্ন অট্টালিকায় বসিয়া আপনা আপনি উদ্দেশে দামিনীকে আদর করিত, দামিনীকে কিরূপে রমেশ আদর করিতে ছিল, আবার তাহাই ভাবিত।

একদিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় পাগলী স্নিগ্ধ গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া ভগ্ন অট্টালিকার ছাদের উপর বসিয়া অন্ধকারে কেশ শুকাইতেছিল। কেশরাশি নানাদিকে নানাভঙ্গীতে তুলিতেছিল, ফেলিতেছিল। এমন সময় পূর্ব্বদিকের অশ্বত্থবৃক্ষমূলে হঠাৎ এক অশ্বের চীৎকার শুনিতে পাইল। দক্ষিণকরে কেশগুচ্ছ ধরিয়া অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বৃক্ষমূল প্রতি চাহিয়া রহিল। দেখিল, ক্রমে দুই একটী মশাল জ্বালিত হইল, এবং তদালোকে কতকগুলি অস্ত্রধারী সৈনিক আর এক অশ্বারোহী পুরুষ দৃষ্ট হইল। পাগলী প্রথমে ভাবিল, ইহারা ডাকাইত; পাছে ইহাবা আমার দামিনীব ঘরে ডাকাতী করে, এই আশঙ্কায় দ্রুতবেগে ছাদেব উপর হইতে অবতরণ করিয়া ডাকাতদিগেব নিকট যাইতে ইচ্ছা কবিল। ফিরিয়া ঝটিতি গৃহে আসিয়া ভৈরবীবেশ ধাবণ করিয়া, করাল ত্রিশূল হস্তে লইয়া সদর্পে চলিল। কথঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া একখানি পাল্কী দেখিয়া ভাবিল, ইহারা ডাকাত নহে, ডাকাতেব সঙ্গে পাল্কী থাকে না। ইহাবা বরযাত্রী হইবে। পাগলী তাহাদের সঙ্গে চলিল। দামিনীর বিবাহ সে দেখিতে পায় নাই, অতএব বিবাহ দেখিব মনে কবিয়া পবম আহ্লাদ-পূর্ব্বক পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অন্ধকাবে তাহাকে কেহই প্রথমে দেখিতে পায় নাই, শেষ কতদূর গেলে একজন শিবিকাবাহক তাহাকে দেখিয়া রুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা কবিল, "কে বে, তুই এমত সময় আমাদের সঙ্গে যাইতেছিস্?" পাগলী উত্তর করিল, "আমি তোমাদের সঙ্গে বিবাহ দেখিতে যাইতেছি, তোমাদের সঙ্গে বাদ্যকর নাই কেন?"

বাহক উত্তব করিল, "এ বড় ভয়ানক বিবাহ, এ বিবাহে বাদ্য থাকে না।" পাগলী এ কথায় মনোনিবেশ না করিয়া আপন ইচ্ছানুসারে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাব বাড়ীর বব, কাহাব বাড়ীব কনে?" বাহক কহিল, "হিন্দুর কনে, মুসলমানেব বর।" পাগলী উত্তর করিল, "মিছে কথা।" বাহক দেখিল যে, স্ত্রীলোকটী পাগল, অতএব তাহার সঙ্গে বঙ্গ করিতে লাগিল। "কে বব?" এই কথা উন্মাদিনী পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় বাহক অশ্বারোহীকে দেখাইয়া দিল। উন্মাদিনী দেখিল, অসম্ভব নহে, বযস অল্প, জরির কাপড় পবিধান। আব কোন শব্দ না করিয়া সঙ্গে চলিল।

সঙ্গীদিগেব পরিচয় দিতে বাহকের প্রতি বিশেষ নিষেধ ছিল, কিন্তু সে নিষেধ তাহার পক্ষে ক্রমে ভাব হইয়া উঠিতেছিল। পাগলীকে পাইয়া বাহক মনে করিয়াছিল যে, সে ভার নামাইবে; কিন্তু পাগলী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করায় তাহার আশা পরিতৃপ্ত করিবার ব্যাঘাত জন্মিল। শেষ বাহক পাগলীকে বলিল, "তুমি স্ত্রীলোক, আমাদের সঙ্গে যাওযা ভাল নহে, এখনই কাটাকাটি হইবে, অতএব তুমি পালাও।" পাগলী বলিল, "বিবাহ শুভ কর্ম্ম, ইহাতে কাটাকাটি হইবে কেন?" বাহক উত্তর করিল, "এ ব্যাপার বিবাহেব নহে। যিনি তাজ পরিয়া তববারি লইযা ঘোড়ার উপর যাইতেছেন উনি আমাদের ফৌজদারের পুত্র। এই গ্রামে একটি অদ্ভুত সুন্দরী আছে শুনিয়া তাহাকে কাড়িয়া লইতে যাইতেছেন; তাই বলিতেছিলাম, কাটাকাটি হইবে।"

পাগলী শিহরিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার কন্যা লইয়া যাইবে?" বাহক বলল, "আমি সবিশেষ জানি না, শুনিয়াছি কোন ভট্টাচার্য্যের পুত্রবধূ; যুবতীর স্বামী নাকি অদ্য কয়েক দিন হইল শিয্যালয়ে গিয়াছে। সুন্দরীর নাম বুঝি দামিনী।"

এই কথা শুনিবামাত্র পাগলী ফণিনীর ন্যায় বাহকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পথরোধ করিল; দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল তুলিল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া বাহক ভয়ে বলিল, "আমি দরিদ্র বাহক, পেটের জ্বালায়

সকল করি; আমাকে মারিলে কি হইবে? আমি হিন্দু, অতএব হিন্দুর অত্যাচার আমার ইচ্ছা নয়। এক্ষণে গোলযোগ করিলে এই যবনেরা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে, অতএব আমার পরামর্শ শুন। তুমি অন্য পথ দিয়া দ্রুত যাইয়া গ্রামবাসীদিগকে জাগ্রত কর; সকলে একত্র প্রতিবন্ধক হইলে সফল হইতে পারিবে, নতুবা আর উপায় নাই।"

পাগলী শুনিবামাত্র ছুটিল; গ্রামের মধ্যে যাইয়া দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিতে লাগিল, বলিতে লাগিল, "হিন্দুর হিন্দুত্ব যায়, সকলে উঠ; সতীর সতীত্ব যায়, একবার সকলে উঠ। ফৌজদারের পুত্র আসিয়া তাহার পুত্রবধূকে হরণ করে, একবার সকলে উঠ।"

কেহই উঠিল না। কেহ বলিল, "যাউক শত্রু পরে পরে।" কেহ বলিল, "পরের নিমিত্ত মাথা দিবার আমার কি প্রয়োজন পড়িয়াছে?" কেহ বলিল, "অদিতির সর্ব্বনাশ হয় যদি, তাহাতে আমার কি ক্ষতি?"

ক্ষতি আছে। আমরা ভিন্ন তাহা অপরদেশীয় সকলে বুঝে। বিপদ অদ্য আমার, কল্য তোমার; অত্যাচার এক ঘরে প্রবেশ করিতে পাইলে সকল ঘরে পথ পায়। অগ্নি এক ঘরে লাগিলে সকল ঘর আক্রমণ করে। পরের ঘরের অগ্নি যে নিবায়, কেবল সেই আপনার ঘর রক্ষা করে। এ বোধ বাঙ্গলা হইতে অনেক কাল অন্তর্হিত হইয়াছে; অতএব পাগলীর চীৎকারে কেহই উঠিল না।

দুর্বৃত্ত যবনের অত্যাচার কেহ নিবারণ করিল না; রমেশের পিতা অদিতি বিশারদ একা, তাহে বৃদ্ধ; দামিনীকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। যবনেরা দ্বার ভাঙ্গিয়া মূর্চ্ছিতা দামিনীকে লইয়া গেল।

পাগলী দেখিল, কেহই উঠিল না, কেহই সহায়তা করিল না। রমেশের গৃহদ্বারে আসিয়া দেখিল, সকল ফুরাইয়াছে; দামিনীকে লইয়া গিয়াছে। তখন পাগলীর কপোলমধ্যে যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। পাগলী পূর্ব্বতন উন্মত্তা হইয়া সিংহীর ন্যায় ক্ষণেক দাঁড়াইল। শেষে ত্রিশূল তুলিয়া ছুটিল।

যবনেরা এক প্রান্তরের মধ্য দিয়া দামিনীকে লইয়া যাইতেছিল। পাল্কীর চারিদিকে অস্ত্রধারী পদাতিক। সর্ব্ব পশ্চাতে ফৌজদারপুত্র অশ্বারোহণে যাইতেছিল। পাগলী বায়ুবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া ত্রিশূল নিক্ষেপ করিল। ত্রিশূল ফৌজদারপুত্রের পৃষ্ঠদেশে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে ঈষৎ দেখা দিল। ফৌজদারপুত্রের শরীর প্রথমে দুলিল, শেষে অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। পাগলী বিকট হাসি হাসিল; অশ্ব চমকিয়া উঠিল; পদাতিকেরা ফিরিয়া দেখিল।

পাগলী আবার বিকট হাসি হাসিতে হাসিতে ছুটিল। দামিনীকে আর তাহার স্মরণ হইল না। সেই অবধি পাগলীকেও আর কেহ দেখিতে পাইল না। পদাতিকেরা দেখিল যে, ফৌজদারপুত্র সাঙ্ঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া পাল্কীতে তুলিল। পাল্কী হইতে দামিনীকে ফেলিয়া দিয়া গেল। দামিনী একা প্রান্তরে পড়িয়া রহিলেন। নবপল্লবিত পুষ্পিত লতাবৃক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া পথে ফেলিয়া গেলে যেমন বাতাসে তাহা উলটি পালটি করিতে থাকে, প্রান্তরে পড়িয়া দামিনীর সেইরূপ দশা ঘটিল। বাতাসে তাঁহার অঞ্চল উলটি পালটি করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রভাত হইল। রমেশের পিতা অদিতি বিশারদ নামাবলী স্কন্ধে লইয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। প্রাতঃসন্ধ্যা হয় নাই; দামিনী নাই, সন্ধ্যার আয়োজন আর কে করিয়া দিবে? বিশারদ অতি বিমর্যভাবে একা বসিয়া রহিলেন; ক্রমে প্রতিবাসিগণ, গ্রামবাসিগণ, আত্মীয়-কুটুম্বগণ আত্মীয়তা করিতে আসিতে লাগিলেন। কেহ আসিয়া বলিলেন, "কি বিপদ, কি বিপদ!" কেহ বলিলেন, "কখন্ কাহার কি ঘটে, কে বলিতে পারে?" কেহ বলিলেন, "অদৃষ্টই মূল।" অদিতি বিশারদ ইহার কোন কথাতেই উত্তর করিলেন না দেখিয়া গণেশচন্দ্র নামে জনৈক মধ্যবয়স্ক স্থূলশরীর প্রতিবাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ব্বে ইহার কোন সূচনা ছিল না? অর্থাৎ, পূর্ব্বে কি মহাশয় কিছুই জানিতে পারেন নাই?" অদিতি

বিশারদ ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিব, তবে এমন ঘটিবেই বা কেন? রমেশকেই বা বিদেশে যেতে দিব কেন? এই রাত্রে রমেশ থাকিলে শৃগালের সাধ্য কি যে সিংহের গৃহে প্রবেশ করে?"

গণেশচন্দ্র বলিলেন, "রমেশের প্রয়োজন কি? আমরাই যে আপনার পুত্রবধূকে রক্ষা করিতে পারিতাম। তবে কি জানেন, সকল সময় সাহস হয় না; যবনেরা প্রায় বিশজন, আমরা একা; বিশেষতঃ তখন যদি সদরবাড়ীতে থাকিতাম, তবে যা হয় একখানা করিয়া বসিতাম। কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্য বশতঃ অথবা রমেশের দুরদৃষ্ট বশতঃ আমি তখন অন্দরে শয়ন করিয়াছিলাম। শয়ন করিলে সহজে উঠা যায় না; তথাপি ব্রাহ্মণীর কথায় উঠিলাম, ভাল করে কাপড় পরিলাম, সেই অন্ধকারে অনুসন্ধান করিয়া নস্য শম্বুক বাহির করিলাম; এক টীপ বিলক্ষণ করিয়া গ্রহণ করিলাম; এ সকল কার্য্যে নস্য আবশ্যক। তাহার পর দেখি, আমি ঘর্ম্মাক্তকলেবর। এ সকল কার্য্যে ঘর্ম্ম ভাল নহে; কি জানি, পাছে যবনেরা পিছলে পলায়, এই মনে করিয়া গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা বিলক্ষণ করিয়া ঘর্ম্ম পরিষ্কার করিলাম; সকল বিষয় এককালে স্মরণ হয় না; গাত্রমার্জ্জনী রাখিলে অস্ত্রের কথা মনে পড়িল। আমি বলিলাম, 'পুতির তক্তা আন।' ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'তাহার কর্ম্ম নহে।' শেষে একটি শিশু, আমার সপ্তম সন্তান, একটা ইট আনিয়া দিল। আমি সেই ইট হাতে করিয়া ছাদে আসিয়া দেখি, দুর্বৃত্তেরা তখন ফিরিয়া যাইতেছে; আমি অমনি সেই ইট ছুঁড়িলাম।"

প্রতিবাসী এইরূপ আত্মবীরত্বের পরিচয় দিতেছেন, এমত সময় একজন কৃষক আসিয়া বলিল যে, ফৌজদারপুত্র মারা পড়িয়াছে। কে তাহারে মারিয়াছে, তাহার স্থির নাই।

গণেশচন্দ্র আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "তবে সে আমারই ইটে মরিয়াছে; নিশ্চয় বলিতেছি, আমিই যবন মারিয়াছি। আমার অব্যর্থ সন্ধান।"

আর একজন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ওরূপ কথা মুখে আনা ভাল নহে। যিনি মরিয়াছেন, তিনি ফৌজদারের একমাত্র পুত্র; সে পুত্রকে যে মারিয়াছে, তাহার অদৃষ্টে নিশ্চয় শূল আছে।"

গণেশ অমনি ভয়ে জড়বৎ হইলেন। কম্পান্বিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি উপহাস করিতেছিলাম; আমি তা বলি নাই; আমি কি বলিতেছি, কিছুই নহে। আমার দ্বারা হাকিমের অনিষ্ট হইবে, কখনও সম্ভব নহে। আমি বরং বলিতেছি যে, এত ডাকাডাকি করেছে, তথাপি আমি কথা কই নাই। রমেশ বড়, না হাকিম বড়?" এই বলিতে বলিতে তিনি পলাইলেন।

যে ব্যক্তি ফৌজদারপুত্রের মৃত্যুসংবাদ আনিয়াছিল, সে অদিতি বিশারদকে বলিল যে, মহাশয়ের পুত্রবধূ বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন। এই কথা শুনিবামাত্র বিশারদ সকলের মুখ প্রতি চাহিলেন। কেহ কিছু বলিলেন না। শেষে অদিতি বিশারদ আপনিই সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? আমার পুত্রবধূ যবনস্পৃষ্টা হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না?" সকলে উত্তর করিল যে, মহাশয় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ইহার ইতিকর্ত্তব্যতা আপনিই মীমাংসা করুন। অদিতি বিশারদ কিঞ্চিৎ ভাবিলেন, শেষে অন্দরে যাইয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "সেই বউকে আবার ঘরে? তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি স্বতন্ত্র গৃহে লইয়া সংসার কর।"

কর্ত্তা বলিলেন, "কেন, তাহার ত কোন দোষ নাই।"

গৃ। "দোষ তবে সকল আমার?"

ক। "না, তোমার দোষ দিই নাই। আমি জিজ্ঞাসা করি, পুত্রবধূকে গ্রহণ করিলে কি দোষ হইতে পারে?"

গৃ। "দোষ অনেক। প্রথমত লোকে গালে কালি-চুণ দিবে, দ্বিতীয়তঃ শিষ্যেরা ত্যাগ করিবে, তখন আমার এই শিশু সন্তানের কি উপায় হইবে?"

ক। "কেন লোকেরা দোষ দিবে? আমাদের পুত্রবধূ কুলত্যাগী নহে, ইচ্ছা পূর্ব্বক যায় নাই, যবন-গৃহেও যায় নাই, পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।"

গৃ। "কুলত্যাগী নহে? ইচ্ছাপূর্ব্বক যায় নাই, এ কথা তোমায় কে বলিল? তুমি সকল সংবাদই প্রায় জান।.কয় দিবস পর্য্যন্ত এক মাগী পাগলের বেশ ধরিয়া যাতায়াত করিতেছিল; সে দিবস সন্ধ্যার সময় বধূকে লইয়া পলাইতেছিল, আমি যাইয়া ফিরাইয়া আনিলাম। ফিরে এসে বালিশ মুখে দিয়া যে আবার মেয়ের কান্না! আমি কি সকল কথা তোমায় বলি। তোমার পুত্রবধূ যখন দেখিল যে, আমি থাকিতে আর পালাতে পারিবে না, তখন এই পরামর্শ করিয়া লোকজন আনাইয়া চলিয়া গেল।"

গৃহিণীর বাক্য শুনিয়া কর্ত্তা বিস্মিত হইলেন, দুই একবার বলিলেন, "শাস্ত্র মিথ্যা হয় না, স্ত্রীচরিত্র কে বুঝিতে পারে?" শেষে বলিলেন, "তুমি যাহা বলিলে, তাহা আমার বিশ্বাস হইল। আমি কদাচ তাহাকে আর গ্রহণ করিব না।"

অদিতি বিশারদ বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সকলকে বলিলেন, "আমাব ভ্রম হইযাছিল, মনে করিয়াছিলাম আমার পুত্রবধূ নির্দ্দোষী, এক্ষণে জানিলাম, তাহা নহে। তোমবা আমাব আত্মীয়, তোমাদিগের নিকট বলিতে লজ্জা কি? আমার পুত্রবধূ কুলটা। অনেকদিন পর্য্যন্ত গৃহত্যাগ কবিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু গৃহিণীব সতর্কতা হেতু সফল হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি আমাব এই ঘর দ্বার ভগ্ন হওয়া সে কেবল আমার কুলবধূর পবামর্শ ও কৌশলে হইযাছে। সে যাহা হউক, যদি তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া আমরা স্বীকার কবি, তথাপি তিনি যে যবনস্পৃষ্টা হইয়াছেন, সে বিষয় ত আর সন্দেহ নাই। অতএব শাস্ত্রানুসাবে তাহারে আব কেমন কবিয়া গ্রহণ কবি? শাস্ত্রে সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে, এ পাপেরও অবশ্য আছে, কিন্তু বধূকে গ্রহণ কবিলে আর একটী বিপদ আছে। ফৌজদার মনে করিবেন যে, আমরাই তাঁহার পুত্রকে হত্যা কবিয়া বধূকে ঘরে আনিয়াছি। আমি কি, যে কেহ বধূকে আশ্রয় দিবে, তাহারই প্রতি সেই সন্দেহ হইবে। অতএব আত্মবক্ষা মানুষের প্রধান ধর্ম্ম; শাস্ত্রে তাহাব ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এক্ষণে স্থির কবিযাছি, পুত্রবধূ গৃহে আসিতে চাহিলে আর আমি তাঁহাকে স্থান দিব না। তোমরা এ পরামর্শে কি বল?"

সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "এ ভাল যুক্তি করিয়াছেন, আমরাও এ পবামর্শানুবর্ত্তী হইযা কার্য্য করিব। আমরাও কেহ আপনাব পুত্রবধূকে স্থান দিব না; অন্য কেহ স্থান দিতে চাহিলে নিবারণ করিব। কেন একটা পাপিষ্ঠার নিমিত্ত গ্রামস্থ সকলে বিপদ্‌গ্রস্ত হই? বিশেযতঃ কুলটাকে গ্রামে স্থান দেওয়া উচিত নহে; এখানে স্থান না পাইলে সে আপনিই অন্যত্র যাইবে।"

সকলে এই পরামর্শ করিয়া আপন গৃহ সাবধান কবিতে উঠিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সকলে স্ব স্ব গৃহে গেলে পর কিঞ্চিৎ বিলম্বে গৃহিণী কর্ত্তাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমাব দেশউজ্জ্বল মুখউজ্জ্বল কুলবধূ আসিতেছেন, এখন কি বলিতে হয় যাইয়া বল।" ইহা শুনিয়া অদিতি বিশারদ খিড়কীদ্বারের নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। দামিনী মুখ ঢাকিয়া অধোমুখে ধীবে ধীবে আসিতেছিলেন, দ্বারে শ্বশুরকে দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া উঠিলেন, বড় যন্ত্রণা পাইয়াছেন। অন্যদিন হইলে সে ক্রন্দন দেখিয়া অদিতি বিশারদ আপনিও কাঁদিতেন, কিন্তু এ সময় তিনি কাঁদিলেন না; চক্ষে জল আসিয়াছিল, স্ত্রীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া তাহা সংবরণ করিলেন। পরে নস্য-শম্বুক বাহিব করিয়া দুই একবার তাহাতে অঙ্গুলির আঘাত করিয়া শেষ দীর্ঘ টানে এক টিপ টানিয়া চক্ষু মুদিয়া বলিলেন, "বৎসে! আমি সকল দিক ভাবিয়া দেখিলাম, তোমায় আর গ্রহণ করিতে পারি না; তুমি যবনস্পৃষ্টা হইয়াছ; ব্রাহ্মণগৃহে আর তুমি স্থান পাইতে পার না; অতএব

স্থানান্তবে যাও।" এই বলিয়া অদিতি বিশাবদ দ্বাব রুদ্ধ কবিয়া চলিয়া গেলেন, দামিনী প্রথমে বুঝিতে পাবিলেন না; ক্রমে শ্বশুবেব প্রত্যেক বাক্য স্মরণ কবিয়া অর্থ বুঝিলেন, কিন্তু তাহা বিশ্বাস কবিলেন না; ভাবিলেন, ইহা স্বপ্ন হইবে। স্বপ্ন কি না স্থিব কবিবাব নিমিত্ত চাবিদিক চাহিয়া দেখিলেন। নিকটে তিন্তিড়ীবৃক্ষ, তাহাব শুষ্ক ডালে একটী চিল বসিয়া আছে; খিড়কী-পুষ্কবিণীব কাল জলে ডাহুক সাঁতাব দিতেছে, ঘাটেব নিকট জলে উচ্ছিষ্ট পাত্র বহিয়াছে; যে দাসী তাহা জলে বাখিয়া গিয়াছে, তাহাব জলসিক্ত পদচিহ্ন সোপানে স্পষ্ট বহিয়াছে। শ্বশুব যে দ্বাব রুদ্ধ কবিয়া গিয়াছেন, এখনও তাহা রুদ্ধ বহিয়াছে। দামিনী একবাব সেই দ্বাবে হাত দিয়া দেখিলেন পবে আপনাব গাত্রে চক্ষে হাত দিয়া দেখিলেন, স্বপ্ন নহে —সকলই সত্য। গৃহে প্রবেশ কবিতে নিষেধ সত্য—দামিনী 'ব্রাহ্মণেব অগ্রাহ্য' এই কথা যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাও স্বপ্ন নহে। দামিনীব চক্ষে সূর্য্য নিবিয়া গেল, সকলই অন্ধকাব হইল, দামিনী পড়িয়া গেলেন।

ক্ষণকাল বিলম্বে পাড়াব অনেকগুলি বৃদ্ধা, মধ্যবয়স্কা, যুবতী, বালিকা সকলে আসিযা দামিনীকে ঘিবিয়া দাড়াইল। দামিনী এখনও মাথা স্থিব কবিতে পাবেন নাই। যেখানে পড়িয়া গিয়াছিলেন সেইখানে নতমুখে বসিয়া একটা দূর্ব্বাদল নখদ্বাবা অন্যমনস্কে ছিঁড়িতেছিলেন। অন্যমনস্কে হউক, আব সমনস্কে হউক, তাহাব নয়ন হইতে বাবিধাবা বহিতেছিল।

প্রতিবাসীদিগেব মধ্যে একটী বৃদ্ধা বলিলেন, "এমনও কপাল কবে ভাবতে এসেছিলে। আহা। কি অদৃষ্ট। কি দুর্গতি।" দামিনী ধীবে ধীবে মাথা তুলিয়া বৃদ্ধাব মুখপ্রতি ব্যথিত হবিণীব ন্যায় চাহিয়া বহিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন, "এ মুখ প্রতি পোড়া শ্বশুব একবাব ফিবে চাহিল না। ধর্ম্ম বড় হল না, জাত বড় হল, আ বে পোড়া বিধাতা। কপালে মন্দ লিখিতে আব কি লোক পেলে না? এই বযসে এই কষ্ট। আহা। মবি মবি মবি। মেয়ে ত নয়, যেন স্বর্ণলতা।"

আব একজন মধ্যবয়স্কা বলিলেন, "আহা। দামিনী আমাদেব চিবদুঃখিনী, বুড়া মাতামহী দামিনীব বিবাহ দিয়া বলিয়াছিল যে, 'এতদিনে আমাব দামিনীব উপায হইল, এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মবিতে পাবিব।' আহা। যদি বুড়ী বেঁচে থাকিত, তবে দামিনী দাঁড়াইবাব একটা স্থান পাইত। এখন আব দামিনীব দাঁড়াইবাব স্থান নাই।"

দামিনীব অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিল, শেষে দামিনী মাতামহীব জন্য কাঁদিয়া উঠিলেন। উদ্দেশে মাতামহীকে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন "আয়। আমায কাব কাছে ফেলে আপনি চলে গেলেন?" এই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া তাঁহাব শাশুড়ী বাগভবে সশব্দে খিড়কীব দ্বাব খুলিয়া দাঁড়াইলেন ও তিবস্কাব আবম্ভ কবিলেন। "বলি বউ। তোমাব কেমন আক্কেল আচবণ! এই দুই প্রহব বেলা গৃহস্থেব দ্বাবে বসিয়া মবা কান্না আবম্ভ কবিলে? জান না কি যে, এতে গৃহস্থেব অমঙ্গল হয়?" প্রতিবাসিনীদিগকে লক্ষ্য কবিয়া বলিলেন, "আব তোমাদেবই বা কি আচবণ' আপনাব আপনাব ঝি-বউ ঘবে বেখে পবেব বউ নাচাতে এলে। এখন সকলে সময পাইয়াছ, ভাল, পবমেশ্বব আমাকেও একদিন দিবেন, আমিও একদিন পাব।"

কেহ কোন উত্তব কবিল না, সকলেই একে একে চলিয়া গেল। দামিনীও চক্ষেব জল মুছিয়া নিঃশব্দে বসিয়া বহিলেন। প্রতিবাসিনীবা আপন আপন গৃহকার্য্যে গেল। তাঁহাদেব একজন সমবযস্কা একটু দূবে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। বমেশেব বিমাতা পূর্ব্বমত দ্বাব রুদ্ধ কবিলে দামিনীব নিকট আসিয়া বলিলেন, "একবাব উঠ ত।" দামিনী বলিলেন, "আমি আব কোথায়ও যাব না; কোথাযও যাইবাব আব আমাব স্থান নাই, কেহ আব আমায স্থান দিবে না।" সমবযস্কা বলিল, তবে কি এইখানে মবিবাব?" দামিনী উত্তব কবিলেন, এইখানেই মবিব। আমাব স্থান কোথা? তিনি আমায এইখানে বাখিয়া গেছেন আমি এইখানেই থাকিব, যতদিন তিনি না আসেন, ততদিন যেমন কবে পাবি বাঁচিব। আমি তাঁবে না দেখে মবিতে পাবিব না।"

এই বলিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। সমবয়স্কা বলিলেন, "অন্যত্র না যাও, এই বৃক্ষমূলে আসিয়া বস; রৌদ্র অসহ্য হইয়াছে. আমরা আর দাঁড়াইতে পারিব না।" দামিনী এই কথায় ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষমূলে গিয়া বসিলেন. ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার গৃহে যাও, তোমার গৃহ আছে, গৃহে তোমায় না দেখিলে তোমার মা ব্যস্ত হবেন, আবার বুড়া মানুষ. এই রৌদ্রে তোমায় খুঁজিতে আসিবেন।"

প্রতিবাসিনী গৃহে গেলেন, কিন্তু বিস্তর ক্ষণ থাকিতে পারিলেন না; অপরাহ্ণ না হইতে অদিতি ভট্টাচার্য্যের বাটীর পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, দামিনী পূর্ব্বমত একা বৃক্ষমূলে অন্যমনস্কে বসিয়া একটী পক্ষী দেখিতেছেন। আর চক্ষে জল নাই।

প্রতিবাসিনী আসিয়া দামিনীর নিকটে বসিলেন। পরস্পর কেহই ক্ষণকাল পর্য্যন্ত কথা কহিলেন না। পরে দামিনী বলিলেন, "যদি এই রাত্রে তিনি আসেন।"

প্র। "কে? তোমার স্বামী? তা আসেন ত ভালই হয। যাহা হউক, ভালমন্দ একটা স্থির হইয়া যায়।"

দা। "তিনি যদি আসিয়া পথ হইতে ফিরে যান?"

প্র। "সে কি! তা কি হইতে পারে?"

দা। "পারে। পথে যদি তাঁরে কেহ কোন কথা শুনায। তিনিও কি আমায় ত্যাগ করিবেন?"

প্র। "কি জানি ভাই। পুরুষের মন কখন কেমন থাকে, তা কে বলিতে পারে?"

দা। "তিনি আমায় কত ভালবাসেন। আমায দেখিতে দেখিতে কাঁদেন। আমায় দেখিবার তাঁর কত সাধ। দেখিবার নিমিত্ত কত ছল করে আমার কাছে আসিয়া বসেন, কতবার কতদিকে বসে দেখেন। আবার কপালে হাত দিয়া দেখেন; দাড়িতে হাত দিয়া দেখেন; ওষ্ঠে হাত দিযা দেখেন; দেখিয়া আর তাঁহার পরিতৃপ্তি হয় না। রাত্রে নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া আমার মুখের উপর চাহিয়া থাকেন, আমি পোড়া চক্ষু বুজিয়া ঘুমাইয়া থাকি।"

এই বলিতে বলিতে দামিনীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। দামিনী কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবাসিনী বলিলেন, "সন্ধ্যা হইল, রাত্রি যাপন কিরূপে হইবে? কোথা থাকিবে?" দামিনী প্রথমে বলিলেন, "কি জানি", পরক্ষণেই বলিলেন, "এইখানে থাকিব। কে আমায় স্থান দিবে?"

প্রতিবাসিনী শিহরিয়া বলিলেন, "তা কি স্ত্রীলোকের সাধ্য? এই অন্ধকার বনমধ্যে একা পুরুষে থাকিতে পারে না, তুমি কেমন করিয়া থাকিবে? রাত্রের নিমিত্ত ঘরে অন্য কোন চালায শাশুড়ী কি স্থান দিবেন না? অবশ্যই দিবেন।"

দামিনীও সেই আশা করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় মনে করিয়াছিলেন যে. রাত্রে কেহ না কেহ তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইবে; কিন্তু রাত্রি হইল, প্রতিবাসিনী চলিয়া গেল। কেহ তাঁহার তত্ত্ব করিল না। খিড়কীদ্বার এতক্ষণ মুক্ত ছিল, শেযে তাহাও রুদ্ধ হইল।

দামিনী একা অন্ধকারে বসিয়া রহিলেন। রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। দূরে যে দুই একটী দীপালোক দেখা যাইতেছিল, তাহা একে একে নিবিয়া গেল। গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্ত হইয়া সকলে নিদ্রা গেলেন, দামিনীর ভাবনা কেহ ভাবিল না। দামিনী আপনার ভাবনা আপনি ভাবিতে লাগিল। ক্রমে দুই একবার ভয় পাইতে লাগিল, অন্ধকারে নানাদিকে নানা মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। একা থাকা বিষম হইয়া উঠিল। একে সমস্ত দিন অনাহার, তাহে আবার সমস্ত দিন কাঁদিয়াছেন, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, দামিনী ধূলায় শয়ন করিলেন, শীঘ্র নিদ্রা আসিল। স্বপ্নে যেন শুনিলেন, কে ডাকিল, "মা।" স্বপ্নে যেন উত্তর দিলেন "মা।" স্বপ্নে বোধ হইল. তাঁহার মা বলিতেছেন, "উঠ মা! এঘরে আর কাজ কি?"

পরদিন, প্রাতে উঠিয়া কেহ আর দামিনীকে দেখিতে পাইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দশ বারো দিবস পরে রমেশ বাটী আসিয়া সকল শুনিলেন। পিতাকে কিছু বলিলেন না, বিমাতার প্রতি দোষারোপ করিলেন না, কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী হইতে চলিয়া গেলেন। গ্রামে গ্রামে পথে পথে পাঁচ সাত দিবস ভ্রমণ করিলেন, কোথাও দামিনীর সন্ধান পাইলেন না। শেষে এক দিবস রাত্রিশেষে বিষন্নভাবে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, নদীতীরে ভগ্ন অট্টালিকা দেখিয়া দাঁড়াইলেন। ভগ্ন অট্টালিকার অবস্থাসহিত আপনার সাদৃশ্য দেখিলেন। অট্টালিকার আলিসা ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; স্থানে স্থানে অশ্বথ বট প্রভৃতি বৃক্ষ আপন আপন মূল বিদ্ধ করিয়া সাহঙ্কারে দুলিতেছে। দুর্ব্বল অট্টালিকা একা নদীতীরে দাঁড়াইয়া তাহা সহ্য করিতেছে।

রমেশ অগ্রসর হইলেন, দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন। দ্বার মুক্ত ছিল, গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সমাগমশব্দে অসংখ্য চামচিকা, বাদুড় অন্ধকারে উড়িতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে ক্রমে ক্রমে তাহাদের শব্দ থামিল। ঘর ভয়ানক গম্ভীর হইল। রমেশ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরক্ষণেই কক্ষান্তরে মনুষ্য-কণ্ঠ-নিঃসৃত একটী মৃদু শব্দ শুনিলেন। রমেশের শরীর কণ্টকিত হইল। রমেশ সাবধানে নিঃশব্দে সেই দিকে গেলেন, অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে দেখিলেন, মৃত্যুশয্যায় একটী রুগ্ন মনুষ্যদেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

রমেশ কি ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নরদেহ একেবারে সংজ্ঞাহীন হয় নাই, তাহার কণ্ঠস্বর আবার অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইতে লাগিল, "আমি। এলেম বসো, আর বিলম্ব করিব না, কেবল একবার রমেশকে দেখে আসি।"

রমেশ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "দামিনী, দামিনী! আমি এসেছি, আর কখন তোমা ছাড়া হব না।"

দামিনী কোন উত্তর দিল না। রমেশ আছড়াইয়া পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, "আবার কথা কও, অনেক দিন কথা শুনি নাই; আবার কথা কও।" আর কোন উত্তর নাই; সকল নিঃশব্দ। রমেশ কতক বুঝিলেন, রুদ্ধশ্বাসে গ্রামমধ্যে গেলেন। তথা হইতে দীপ জ্বালিবার দ্রব্যাদি লইয়া আসিলেন। দীপ জ্বালিলেন। দেখিলেন, সেখানে আর একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়া দামিনীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। দামিনী এ জন্মের মত চক্ষু মুদিয়াছেন।

রমেশকে দেখিয়া বৃদ্ধা হাসিয়া উঠিল, সে ভীষণ হাসি দেখিয়া রমেশের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। বৃদ্ধা উঠিল, দাঁড়াইয়া একদৃষ্টিতে রমেশের দিকে চাহিয়া রহিল। রমেশ চিনিলেন যে, এই পূর্ব্বপরিচিতা পাগলী।

পাগলী একবার অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "চুপ, আমার দামিনী ঘুমাইতেছে; ঘুমাইতেছে।" পরক্ষণেই আবার বিকট হাসি হাসিয়া রমেশের উপর পড়িয়া রমেশের গলদেশ বজ্রবৎ টিপিয়া বলিল; "আমি চিনিযাছি, তুই রমেশ; তোর জন্যই আমার দামিনী মরিয়াছে।"

রমেশের শ্বাস রুদ্ধ হইল; চক্ষুর শিরাসকল উঠিল। রমেশ বাক্যরহিত, শক্তিরহিত, শেষে দামিনীর পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন। পাগলী আবার রমেশের গলদেশ পূর্ব্বমত ধরিল। এবার সকল ফুরাইল।

'সঞ্জীবনীসুধা' ঃ ১৮৯৩

রাধারাণী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল — বড়মানুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই, তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দমা হয়, সর্ব্বস্ব লইয়া মোকদ্দমা, মোকদ্দমাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রীদার জ্ঞাতি ডিক্রী জারি করিয়া ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি, ডিক্রীদার সকলই লইল। খরচা ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহা ছিল, তাহাও গেল, রাধারাণীর মাতা, অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া প্রিবি কৌন্সিলে একটি আপীল করিল। কিন্তু আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটি কুটীরে আশ্রয় লইয়া কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রথের পূর্ব্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িতা হইল — যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। সুতরাং আর আহার চলে না। মাতা রুগ্ন, এজন্য কাজে কাজেই তাহার উপবাস — রাধারাণীর জুটিল না বলিয়া উপবাস। রথের দিন মাতা একটু বিশেষ হইল, পথ্যের প্রয়োজন হইল, কিন্তু পথ্য কোথা? কি দিবে?

রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিল। মনে ভাবিল যে, এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুই একটি পয়সা পাইব, তাহাতেই মার পথ্য হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্দ্ধেক হইতে না হইতেই বড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোক সকল ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণী মনে করিল যে, আমি একটু না হয় ভিজিলাম — বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল, রাত্রি হইল—বড় অন্ধকার হইল—অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

অন্ধকার—পথ কর্দ্দমময়, পিচ্ছিল—কিছু দেখা যায় না। তাহাতে মুষলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার অন্নাভাব মনে করিয়া তদপেক্ষাও রাধারাণীর চক্ষু বারি বর্ষণ করিতেছিল। রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল—কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিতেছিল। আবার কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল। দুই গণ্ডবিলম্বী ঘন কৃষ্ণ অলকাবলী বহিয়া, কবরী বাহিয়া বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।

এমত সময় অন্ধকারে, অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারাণীর ঘাড়ের উপর পড়িল। রাধারাণী এতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কাঁদে নাই—এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিল।

যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল, "কে গা তুমি কাঁদ?"

পুরুষ মানুষের গলা—কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধারাণীর রোদন বন্ধ হইল। রাধারাণীর চেনা লোক নহে—কিন্তু বড় দয়ালু লোকের কথা— রাধারাণী ক্ষুদ্র বুদ্ধিটুকুতে ইহা বুঝিতে পারিল। রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল, "আমি দুঃখিলোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই - -কেবল মা আছে।"

সে পুরুষ বলিল, "তুমি কোথা গিয়াছিলে?"

রাধা। "আমি রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী যাইব। অন্ধকারে, বৃষ্টিতে পথ পাইতেছি না।"

পুরুষ বলিল, "তোমার বাড়ী কোথায়?'

রাধারাণী বলিল, "শ্রীরামপুর।"

সে ব্যক্তি বলিল, "আমার সঙ্গে আইস—আমিও শ্রীরামপুর যাইব। চল, কোন পাড়ায় তোমার বাড়ী—তাহা আমাকে বলিয়া দিও—আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া আসিতেছি। বড় পিছল, তুমি আমার হাত ধর, নহিলে পড়িয়া যাইবে।"

এইরূপে সে ব্যক্তি রাধারাণীকে লইয়া চলিল। অন্ধকারে সে রাধারাণীর বয়স অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্তু কথার স্বরে বুঝিয়াছিল যে, রাধারাণী বড় বালিকা। এখন রাধারাণী তাহার হাত ধরায় হস্তস্পর্শে জানিল, রাধারাণী বড় বালিকা। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল যে, "তোমার বয়স কত?"

রাধা। "দশ এগার বছর—"

"তোমার নাম কি?"

রাধা। "রাধারাণী।"

"হাঁ রাধারাণী! তুমি ছেলেমানুষ, একেলা রথ দেখিতে গিয়াছিলে কেন?"

তখন সে কথায় কথায়, মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি বলিয়া, সেই এক পয়সার বনফুলের মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। শুনিল যে, মাতার পথ্যের জন্য বালিকা এই মালা গাঁথিয়া রথহাটে বেচিতে গিয়াছিল — রথ দেখিতে যায় নাই — সে মালাও বিক্রয় হয় নাই — এক্ষণেও বালিকার হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত আছে। তখন সে বলিল, "আমি একছড়া মালা খুঁজিতেছিলাম। আমাদের বাড়ীতে ঠাকুর আছেন, তাঁহাকে পরাইব। রথের হাট শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল — আমি তাই মালা কিনিতে পারি নাই। তুমি মালা বেচ ত আমি কিনি।"

রাধারাণীর আনন্দ হইল, কিন্তু মনে ভাবিল যে আমাকে যে এত যত্ন করিয়া হাত ধরিয়া, এ অন্ধকারে বাড়ী লইয়া যাইতেছে, তাহার কাছে দাম লইব কি প্রকারে? তা নহিলে, আমার মা খেতে পাবে না। তা নিই।

এই ভাবিয়া রাধারাণী মালা সমভিব্যাহারীকে দিল। সমভিব্যাহারী বলিল, "ইহার দাম চারি পয়সা—এই লও।" সমভিব্যাহারী এই বলিয়া মূল্য দিল। রাধারাণী বলিল, "এ কি পয়সা? এ যে বড় বড় ঠেকছে।"

"ডবল পয়সা—দেখিতেছ না দুইটা বই দিই নাই।"

রাধা। "তা এ যে অন্ধকারেও চক্‌চক্ করচে। তুমি ভুলে টাকা দাও নাই ত?"

"না। নূতন কলের পয়সা, তাই চক্‌চক্ করচে।"

রাধা। "তা, আচ্ছা, ঘরে গিয়ে প্রদীপ জ্বেলে যদি দেখি যে, পয়সা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটু দাঁড়াইতে হইবে।"

কিছু পরে তাহারা রাধারাণীর মার কুটীরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া, রাধারাণী বলিল, "তুমি ঘরে আসিয়া দাঁড়াও আমরা আলো জ্বালিয়া দেখি, টাকা কি পয়সা।"

সঙ্গী বলিল, "আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি। তুমি আগে ভিজা কাপড় ছাড়—তারপর প্রদীপ জ্বালিও।"

রাধারাণী বলিল, "আমার আর কাপড় নাই—একখানি ছিল, তাহা কাচিতে দিয়াছি। তা, আমি ভিজা কাপড়ে সর্ব্বদা থাকি, আমার ব্যামো হয় না। আঁচলটা নিঙড়ে পরিব এখন। তুমি দাঁড়াও, আমি আলো জ্বালি।"

"আচ্ছা।"

ঘরে তৈল ছিল না, সুতরাং চালের খড় পাড়িয়া চকমকি ঠুকিয়া, আগুন জ্বালিতে হইল। আগুন জ্বালিতে কাজে কাজেই একটু বিলম্ব হইল। আলো জ্বালিয়া রাধারাণী দেখিল, টাকা বটে, পয়সা নহে।

তখন রাধারাণী বাহিরে আসিয়া আলো ধরিয়া তল্লাস করিয়া দেখিল যে, যে টাকা দিয়াছে, সে

নাই—চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণী তখন বিষণ্নবদনে সকল কথা তাহার মাকে বলিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিল—সকাতরে বলিল—"মা! এখন কি হবে?"

মা বলিল, "কি হবে বাছা! সে কি আর না জেনে টাকা দিয়েছে? সে দাতা, আমাদের দুঃখ শুনিয়া দান কবিয়াছে— আমরাও ভিখারী হইয়াছি, দান গ্রহণ কবিয়া খরচ কবি।"

তাহারা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমন সময়ে কে আসিয়া তাহাদের কুটীবে আগড় ঠেলিয়া বড় সোর গোল উপস্থিত করিল। রাধারাণী দ্বাব খুলিযা দিল—মনে করিযাছিল যে, সেই তিনিই বুঝি আবার ফিবিয়া আসিয়াছেন। পোড়া কপাল! তিনি কেন? পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিন্‌সে!

রাধারাণীব মার কুটীব বাজারের অনতিদূরে। তাহাদেব কুটীরের নিকটেই পদ্মলোচন শাহার কাপড়ের দোকান। পদ্মলোচন খোদ,—পোড়ামুখো কাপুড়ে মিন্‌সে—একজোড়া নূতন কুঞ্জদার শান্তিপুরে কাপড় হাতে করিযা আনিযাছিল, এখন দ্বাব খোলা পাইয়া তাহা রাধাবাণীকে দিল। বলিল, "রাধারাণীব এই কাপড়।"

রাধারাণী বলিল, "ও মা। আমার কিসেব কাপড়!"

পদ্মলোচন—সে বাস্তবিক পোড়ারমুখো কি না, তাহা আমাবা সবিশেষ জানি না—রাধারাণীর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল; বলিল "কেন, এই যে এক বাবু এখনই আমাকে নগদ দাম দিযা বলিয়া গেল যে, এই কাপড় এখনই ঐ বাধাবাণীকে দিয়া এস।"

রাধারাণী তখন বলিল, "ও মা সেই গো! সেই। তিনিই কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হাঁ গা পদ্মলোচন?"—

রাধারাণীর পিতাব সময় হইতে পদ্মলোচন ইঁহাদেব কাছে সুপরিচিত—অনেক বারই ইঁহাদিগেব নিকট যখন সুদিন ছিল, তখন চাবি টাকার কাপড়ে শপথ করিযা আট টাকা সাড়ে বাবো আনা, আর দুই আনা মুনাফা লইতেন।

"হাঁ পদ্মলোচন—বলি সে বাবুটিকে চেন?"

পদ্মলোচন বলিল,"তোমবা চেন না?"

রাধা। "না।"

পদ্ম। "আমি বলি তোমাদের কুটুম্ব। আমি চিনি না।"

যাহা হৌক, পদ্মলোচন চারি টাকাব কাপড় আবাব মায় মুনাফা আট টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনায বিক্রয় করিয়াছিলেন, আব অধিক কথা কহিবাব প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া, প্রসন্নমনে দোকানে ফিরিয়া গেলেন।

এ দিকে রাধারাণী প্রাপ্ত টাকা ভাঙ্গাইযা মার পথ্যেব উদ্যোগের জন্য বাজাবে গেল। বাজার করিয়া, মাকে অন্ন দিবে, এই অভিপ্রাযে ঘব ঝাঁটাইতে লাগিল। ঝাঁটাইতে একখানা কাগজ কুড়াইয়া পাইল—হাতে করিয়া তুলিল—"এ কি মা!"

মা দেখিয়া বলিলেন—"একখানা নোট!"

রাধারাণী বলিল,"তবে তিনি ফেলিয়া গিযাছেন।"

মা বলিলেন, "হাঁ! তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। দেখ, তোমার নাম লেখা আছে।"

রাধারাণী বড়ঘরের মেয়ে, একটু অক্ষর-পবিচয় ছিল। সে পড়িয়া দেখিল, তাই বটে। লেখা আছে।

রাধারাণী বলিল, "হাঁ মা, এমন লোক কে মা!"

মা বলিলেন, "তাঁহার নামও নোটে লেখা আছে। পাছে কেহ চোরা নোট বলে, এই জন্য নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম রুক্মিণীকুমাব রায়।"

পরদিন মাতায় কন্যায়, রুক্মিণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু শ্রীরামপুরে বা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে, এমত কোন সন্ধান পাইল না। নোটখানি তাহারা ভাঙ্গাইল না—তুলিয়া রাখিল—তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাধারাণীর মাতা পথ্য করিলেন বটে, কিন্তু সে রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া, তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। তিনি অতিশয় ধনী ছিলেন। এখন অতি দুঃখিনী হইয়াছিলেন, এই শারীরিক এবং মানসিক দ্বিবিধ কষ্ট তাঁহার সহ্য হইল না। রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, তাঁহার শেষ কাল উপস্থিত হইল।

এমত সময়ে বিলাত হইতে সংবাদ আসিল যে, প্রিবি কৌন্সিলের আপীল তাঁহার পক্ষে নিষ্পত্তি পাইয়াছে; তিনি আপন সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, ওয়াশিলাতের টাকা ফেরত পাইবেন এবং তিনি আদালতের খরচা পাইবেন। কামাখ্যানাথ বাবু তাঁহার পক্ষে হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, তিনি স্বয়ং এই সংবাদ লইয়া রাধারাণীর মাতার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। সুসংবাদ শুনিয়া, রুগ্নার অবিরল নয়নাশ্রু পড়িতে লাগিল।

তিনি নয়নাশ্রু সংবরণ করিয়া কামাখ্যা বাবুকে বলিলেন, "যে প্রদীপ নিবিয়াছে, তাহাতে তেল দিলে কি হইবে? আপনার এ সুসংবাদেও আমার আর প্রাণরক্ষা হইবে না। আমার আয়ুঃশেষ হইয়াছে। তবে আমার এই সুখ যে, রাধারাণী আর অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে না। তাই বা কে জানে? সে বালিকা, তাহার এ সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে? কেবল আপনিই ভরসা। আপনি আমার এই অন্তিমকালে আমাকে একটি ভিক্ষা দিউন— নহিলে আর কাহার কাছে চাহিব।"

কামাখ্যা বাবু অতি ভদ্র লোক এবং তিনি রাধারাণীর পিতার বন্ধু ছিলেন। রাধারাণীর মাতা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে, তিনি রাধারাণীর মাতাকে বলিয়াছিলেন যে যতদিন না আপীল নিষ্পত্তি পায়, অন্ততঃ ততদিন তোমরা আসিয়া আমার গৃহে অবস্থান কর, আমি আপনার মাতার মত তোমাকে রাখিব। রাধারাণীর মাতা তাহাতে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। পরিশেষে কামাখ্যা বাবু কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিতে চাহিলেন। "আমার এখনও কিছু হাতে আছে—আবশ্যক হইলে চাহিয়া লইব।" এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া রাধারাণীর মাতা সে সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। রুক্মিণীকুমারের দান গ্রহণ তাঁহাদিগের প্রথম ও শেষ দান গ্রহণ।

কামাখ্যা বাবু এতদিন বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। দশা দেখিয়া কামাখ্যা বাবু অত্যন্ত কাতর হইলেন। আবার রাধারাণীর মাতা যুক্তকরে তাঁহার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছেন, দেখিয়া আরও কাতর হইলেন; বলিলেন, "আপনি আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব? আপনার যাহা প্রয়োজনীয়, আমি তাহাই করিব।"

রাধারাণীর মাতা বলিলেন, "আমি চলিলাম, কিন্তু রাধারাণী রহিল। এক্ষণে আদালত হইতে আমার শ্বশুরের যথার্থ উইল সিদ্ধ হইয়াছে; অতএব রাধারাণী একা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আপনি তাহাকে দেখিবেন, আপনার কন্যার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিবেন, এই আমার ভিক্ষা। আপনি এই কথা স্বীকার করিলেই আমি সুখে মরিতে পারি।"

কামাখ্যা বাবু বলিলেন, "আমি আপনার নিকট শপথ করিতেছি, আমি রাধারাণীকে আপন কন্যার অধিক যত্ন করিব। আমি কায়মনোবাক্যে এ কথা কহিলাম; আপনি বিশ্বাস করুন।"

যিনি মুমূর্ষু, তিনি কামাখ্যা বাবুর চক্ষের জল দেখিয়া, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার সেই শীর্ণ শুষ্ক অধরে একটু আহ্লাদের হাসি দেখা দিল। হাসি দেখিয়া কামাখ্যা বাবু বুঝিলেন, ইনি আর বাঁচিবেন না।

কামাখ্যা বাবু তাহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, এক্ষণে আমার গৃহে চলুন। পরে

ভদ্রাসন দখল হইলে আসিবেন। রাধারাণীর মাতার যে অহঙ্কার, সে দারিদ্র্যজনিত—এজন্য দারিদ্র্যাবস্থায় তাঁহার গৃহে যাইতে চাহেন নাই। এক্ষণে আর দারিদ্র্য নাই, সুতরাং আর সে অহঙ্কারও নাই। এক্ষণে তিনি যাইতে সম্মত হইলেন। কামাখ্যা বাবু, রাধারাণী ও তাহার মাতাকে সযত্নে নিজালয়ে লইয়া গেলেন।

তিনি রীতিমত পীড়িতার চিকিৎসা করাইলেন। কিন্তু তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না, অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

উপযুক্ত সময়ে কামাখ্যা বাবু রাধারাণীকে তাহার সম্পত্তিতে দখল দেওয়াইলেন। কিন্তু রাধারাণী বালিকা বলিয়া তাহাকে নিজ বাটীতে একা থাকিতে দিলেন না, আপন গৃহেই রাখিলেন।

কালেক্টর সাহেব রাধারাণীর সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে আনিবার জন্য যত্ন পাইলেন, কিন্তু কামাখ্যা বাবু বিবেচনা করিলেন, আমি রাধারাণীর জন্য যতদূর করিব, সরকারি কর্ম্মচারিগণ ততদূর করিবে না। কামাখ্যা বাবুর কৌশলে কালেক্টর সাহেব নিবস্ত হইলেন। কামাখ্যা বাবু স্বয়ং রাধারাণীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

বাকি রাধারাণীর বিবাহ। কিন্তু কামাখ্যা বাবু নব্যতন্ত্রের লোক—বাল্যবিবাহে তাঁহার দ্বেষ ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, রাধারাণীর বিবাহ তাড়াতাড়ি না দিলে, জাতি গেল মনে করে, এমত কেহ তাহার নাই। অতএব যবে রাধারাণী স্বয়ং বিবেচনা করিয়া বিবাহে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাহার বিবাহ দিব। এখন সে লেখাপড়া শিখুক।

এই ভাবিয়া কামাখ্যা বাবু রাধারাণীর বিবাহের কোন উদ্যোগ না করিয়া, তাহাকে উত্তমরূপে সুশিক্ষিত করাইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসর গেল—রাধারাণী পরম সুন্দরী ষোড়শবর্ষীয়া কুমারী। কিন্তু সে অন্তঃপুর মধ্যে বাস করে,তাহার সে রূপরাশি কেহ দেখিতে পায় না। এক্ষণে রাধারাণীর সম্বন্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইল। কামাখ্যা বাবুর ইচ্ছা, রাধারাণীর মনের কথা বুঝিয়া তাহার সম্বন্ধ করেন। তত্ত্ব জানিবার জন্য আপনার কন্যা বসন্তকুমারীকে ডাকিলেন।

বসন্তের সঙ্গে রাধারাণীর সখীত্ব। উভয়ে সমবয়স্কা। এবং উভয়ে অত্যন্ত প্রণয়। কামাখ্যা বাবু বসন্তকে আপনার মনোগত কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

বসন্ত সলজ্জভাবে, অথচ অল্প হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে?"

কামাখ্যা বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "না। তা ত জানি না। কেন?"

বসন্ত কহিল, "রাধারাণী রুক্মিণীকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।"

কামাখ্যা। "সে কি? রাধারাণীর সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পরিচয় কি প্রকারে হইল?"

বসন্ত অবনতমুখে অল্প হাসিল। সে রথের রাত্রির বিবরণ সবিস্তারে রাধারাণীর কাছে শুনিয়াছিল, পিতার সাক্ষাতে সকল বিবৃত করিল। শুনিয়া কামাখ্যা বাবু রুক্মিণীকুমারের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "রাধারাণীকে বুঝাইয়া বলিও, রাধারাণী একটি মহাভ্রমে পড়িয়াছে। বিবাহ কৃতজ্ঞতা অনুসারে কর্ত্তব্য নহে। রুক্মিণীকুমারের নিকট রাধারাণীর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত; যদি সময় ঘটে, তবে অবশ্য প্রত্যুপকার করিতে হইবে। কিন্তু বিবাহে রুক্মিণীকুমারের কোন দাবি দাওয়া নাই। তাতে আবার সে কি জাতি, কত বয়স, তাহা কেহ জানে না, তাহার পরিবার সন্তানাদি থাকিবার সম্ভাবনা। রুক্মিণীকুমারের বিবাহ করিবারই বা সম্ভাবনা কি?"

বসন্ত বলিল, "সম্ভাবনা কিছুই নাই, তাহাও রাধারাণী বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। কিন্তু সেই রাত্রি

অবধি, রুক্মিণীকুমাবেব একটি মানসিক প্রতিমা গডিযা আপনাব মনে তাহা স্থাপিত কবিযাছে। যেমন দেবতাকে লোকে পূজা কবে, বাধাবাণী সেই প্রতিমা তেমনি কবিযা, প্রত্যহ মনে মনে পূজা কবে। এই পাঁচ বৎসব বাধাবাণী আমাদিগেব বাডী আসিযাছি, এই পাঁচ বৎসবে এমন দিন প্রায যায নাই, যে দিন বাধাবাণী রুক্মিণীকুমাবেব কথা আমাব সাক্ষাতে একবাবও বলে নাই, আব কেহ বাধাবাণীকে বিবাহ কবিলে, তাহাব স্বামী সুখী হইবে না।"

কামাখ্যা বাবু মনে মনে বলিলেন "বাতিক। ইহাব একটু চিকিৎসা আবশ্যক। কিন্তু প্রথম চিকিৎসা বোধ হয, রুক্মিণীকুমাবেব সন্ধান কবা।"

কামাখ্যা বাবু রুক্মিণীকুমাবেব সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বযং কলিকাতায তাঁহাব অনুসন্ধান কবিতে লাগিলেন। বন্ধুবর্গকেও সেই সন্ধানে নিযুক্ত কবিলেন। দেশে দেশে আপনাব মোযাক্কেলগণকে পত্র লিখিলেন। প্রতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। সে বিজ্ঞাপন এইরূপ —

"বাবু রুক্মিণীকুমাব বায নিম্ন স্বাক্ষবকাবী ব্যক্তিব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিবেন—বিশেষ প্রযোজন আছে। ইহাতে রুক্মিণী বাবুব সন্তোষেব ব্যতীত অসন্তোষেব কাবণ উপস্থিত হইবে না।

শ্রী ইত্যাদি— "

কিন্তু কিছুতেই রুক্মিণীকুমাবেব কোন সন্ধান পাওযা গেল না। দিন গেল, মাস গেল বৎসব গেল, তথাপি কৈ রুক্মিণীকুমাব ত আসিল না।

ইহাব পব বাধাবাণীব আব একটি ঘোবতব বিপদ উপস্থিত হইল—কামাখ্যা বাবুব লোকান্তবগতি হইল। বাধাবাণী ইহাতে অত্যন্ত শোকাতুবা হইলেন, দ্বিতীয বাব পিতৃহীনা হইলেন মনে কবিলেন। কামাখ্যা বাবুব শ্রাদ্ধাদিব পব বাধাবাণী আপন বাটীতে গিযা বাস কবিতে লাগিলেন এবং নিজ সম্পত্তিব তত্ত্বাবধান স্বযং কবিতে লাগিলেন। কামাখ্যা বাবুব বিচক্ষণতা হেতু বাধাবাণীব সম্পত্তি বিস্তব বাডিযাছিল

বিষয হাতে লইযাই বাধাবাণী প্রথমেই দুই লক্ষ মুদ্রা গবর্ণমেণ্টে প্রেবণ কবিলেন। তৎসঙ্গে এই প্রার্থনা কবিলেন যে, এই অর্থে তাঁহাব নিজ গ্রামে একটি অনাথনিবাস স্থাপিত হউক। তাহাব নাম হউক – "রুক্মিণীকুমাবেব প্রাসাদ।"

গবর্ণমেণ্টেব কর্ম্মচাবিগণ প্রস্তাবিত নাম শুনিযা কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তাহাতে কে কথা কহিবে? অনাথনিবাস সংস্থাপিত হইল। বাধাবাণীব মাতা দবিদ্রাবস্থায নিজ গ্রাম ত্যাগ কবিযা শ্রীবামপুবে কুটীব নির্ম্মাণ কবিযাছিলেন, কেন না, যে গ্রামে যে ধনী ছিল, সে সহসা দবিদ্র হইলে, সে গ্রামে তাহাব বাস কবা কষ্টকব হয। তাঁহাদিগেব নিজ গ্রাম শ্রীবামপুব হইতে কিঞ্চিৎ দূব—আমবা সে গ্রামকে বাজপুব বলিব। এক্ষণে বাধাবাণী বাজপুবেই বাস কবিতেন। অনাথনিবাসও বাধাবাণীব বাডীব সম্মুখে, বাজপুবে সংস্থাপিত হইল। নানা দেশ হইতে দীন দুঃখী অনাথ আসিযা তথায বাস কবিতে লাগিল।

চতুর্থ পবিচ্ছেদ

দুই এক বৎসব পবে, একজন ভদ্রলোক সেই অনাথনিবাসে আসিযা উপস্থিত হইলেন। তাঁহাব বযস ৩৫-৩৬ বৎসব। অবস্থা দেখিযা, অতি ধীব, গম্ভীব এবং অর্থশালী লোক বোধ হয। তিনি সেই "রুক্মিণীকুমাবেব প্রাসাদেব" দ্বাবে আসিযা দাঁড়াইলেন। বক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, এ কাহাব বাডী?"

তাহাবা বলিল, "এ কাহাবও বাড়ী নহে, এখানে দুঃখী অনাথ লোক থাকে। ইহাকে 'রুক্মিণীকুমাবেব প্রাসাদ' বলে।"

আগন্তুক বলিলেন, "আমি ইহার ভিতরে গিয়া দেখিতে পারি?"

রক্ষকগণ রলিল, "দীন দুঃখী লোকেও ইহার ভিতর অনায়াসে যাইতেছে—আপনাকে নিষেধ কি?"

দর্শক ভিতরে গিয়া সব দেখিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বলিলেন, "বন্দোবস্ত দেখিয়া আমার বড় আহ্লাদ হইয়াছে। কে এই অন্নসত্র দিয়াছে? রুক্মিণীকুমার কি তাঁহার নাম?"

রক্ষকেরা বলিল, "এক জন স্ত্রীলোক এই অন্নসত্র দিয়াছেন।"

দর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ইহাকে রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ বলে কেন?"

রক্ষকেরা বলিল, "তাহা আমরা কেহ জানি না।"

"রুক্মিণীকুমার কার নাম?"

"কাহারও নয়।"

"যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন, তাঁহাব নিবাস কোথায়?"

রক্ষকেরা সম্মুখে অতি বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিল।

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তোমবা যাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিলে, তিনি পুরুষ মানুষেব সাক্ষাতে বাহির হইয়া থাকেন? রাগ করিও না, এখন অনেক বড় মানুষের মেয়ে মেম লোকের মত বাহিরে বাহির হইয়া থাকে, এই জন্যই জিজ্ঞাসা কবিতেছি।"

রক্ষকেরা উত্তর করিল— "ইনি সেরূপ চরিত্রের নন। পুরুষেব সমক্ষে বাহিব হন না।"

প্রশ্নকর্ত্তা ধীবে ধীরে রাধাবাণীর অট্টালিকার অভিমুখে গিযা, তন্মধ্যে প্রবেশ কবিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ সচরাচব বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মত; বিশেষ পাবিপাটা, অথবা পারিপাট্যের বিশেষ অভাবও কিছু ছিল না, কিন্তু তাঁহার অঙ্গুলিতে একটি হীবকাঙ্গুরীয় ছিল; তাহা দেখিয়া, রাধারাণীর কর্ম্মকাবগণ অবাক্ হইযা তৎপ্রতি চাহিয়া বহিল, এত বড় হীবা তাহারা কখন অঙ্গুরীয়ে দেখে নাই। তাঁহার সঙ্গে কেহ লোক ছিল না, এজন্য তাহাবা জিজ্ঞাসা কবিতে পারিল না যে, কে ইনি? মনে করিল, বাবু স্বয়ং পরিচয় দিবেন। কিন্তু বাবু কোন পবিচয দিলেন না। তিনি রাধারাণীর দেওযানজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাব হস্তে একখানি পত্র দিলেন। বলিলেন, "এই পত্র আপনার মুনিবের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, আমাকে উত্তর আনিয়া দিন।"

দেওযানজি বলিলেন, "আমার মুনিব স্ত্রীলোক, আবাব অল্পবযস্কা। এজন্য তিনি নিযম কবিয়াছেন যে, কোন অপবিচিত লোকে পত্র আনিলে আমরা তাহা না পড়িয়া তাঁহার কাছে পাঠাইব না।"

আগন্তুক বলিল, "আপনি পড়ুন।"

দেওয়ানজী পত্র পড়িলেন—

"প্রিয় ভগিনি।

এ ব্যক্তি পুরুষ হইলেও ইহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ কবিও—ভয় কবিও না। যেমত যেমত ঘটে, আমাকে লিখিও।

শ্রীমতী বসন্তকুমারী।"

কামাখ্যা বাবুর কন্যার স্বাক্ষর দেখিয়া, কেহ আর কিছু বলিল না। পত্র অন্তঃপুরে গেল।

অন্তঃপুর হইতে পরিচারিকা, পত্রবাহক বাবুকে লইতে আসিল। আর কেহ সঙ্গে যাইতে পাইল না—হুকুম নাই।

পরিচারিকা, বাবুকে লইয়া এক সুসজ্জিত গৃহে বসাইল। রাধারাণীর অন্তঃপুরে সেই প্রথম পুরুষ মানুষ প্রবেশ করিল। দেখিয়া এক জন পরিচারিকা রাধারাণীকে ডাকিতে গেল, আর এক জন অন্তরালে থাকিয়া আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল যে, তাঁহার বর্ণটুকু গৌর, স্ফুটিত মল্লিকারাশির মত গৌর; তাঁহার শরীর দীর্ঘ, ঈষৎ স্থূল; দীর্ঘ, অতি সূক্ষ্ম পরিষ্কার ঘনকৃষ্ণ সুরঞ্জিত কেশজালে মণ্ডিত; চক্ষু বৃহৎ, কটাক্ষ স্থির, ভ্রূযুগ সূক্ষ্ম, ঘন, দূরায়ত এবং নিবিড় কৃষ্ণ; নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত; ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ, ক্ষুদ্র এবং কোমল; গ্রীবা দীর্ঘ, অথচ মাংসল; অন্যান্য অঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত, কেবল অঙ্গুলি দেখা যাইতেছে, সেগুলি শুভ্র, সুগঠিত, এবং একটি বৃহদাকার হীরকে রঞ্জিত।

রাধারাণী সেই স্থানে আসিয়া পরিচারিকাকে বিদায় করিয়া দিলেন। রাধারাণী আসিবামাত্র দর্শকের বোধ হইল যে, সেই কক্ষমধ্যে এক অভিনব সূর্য্যোদয় হইল—রূপের আলোকে তাঁহার মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আগন্তুকের উচিত, প্রথম কথা কহা কেন না, তিনি পুরুষ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ— কিন্তু তিনি সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাধারাণী একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনি এরূপ গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করিয়াছেন কেন? আমি স্ত্রীলোক, কেবল বসন্তের অনুরোধেই আমি ইহা স্বীকার করিয়াছি।"

আগন্তুক বলিল, "আমি আপনার সহিত এরূপ সাক্ষাতের অভিলাষী হইয়াছি, ঠিক তা নহে।"

রাধারাণী অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "তা নয়, বটে। তবে বসন্ত কি জন্য এরূপ অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা কিছু লেখেন নাই। বোধ হয় আপনি জানেন।"

আগন্তুক একখানি অতি পুরাতন সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহা রাধারাণীকে দেখাইলেন। রাধারাণী পড়িলেন; কামাখ্যা বাবুর স্বাক্ষরিত রুক্মিণীকুমার সম্বন্ধে সেই বিজ্ঞাপন। রাধারাণী দাঁড়াইয়াছিলেন— দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নারিকেলপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। আগন্তুকের দেব তুল্য গঠন দেখিয়া, মনে ভাবিলেন, ইনিই আমার সেই রুক্মিণীকুমার। আর থাকিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "আপনার নাম কি রুক্মিণীকুমার বাবু?"

আগন্তুক বলিলেন, "না।" "না" শব্দ শুনিযাই রাধারাণী ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন। আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—তাঁহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া গেল। আগন্তুক বলিলেন, "না। আমি যদি রুক্মিণীকুমার হইতাম, তাহা হইলে, কামাখ্যা বাবু এ বিজ্ঞাপন দিতেন না কেন না, তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু যখন এই বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তখনি আমি ইহা দেখিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।"

রাধারাণী বলিলেন, "যদি আপনার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের কোন সম্বন্ধ নাই, তবে আপনি ইহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন কেন?"

উত্তরকারী বলিলেন, "একটি কৌতুকের জন্য। আজি আট দশ বৎসর হইল, আমি যেখানে সেখানে বেড়াইতাম—কিন্তু লোকলজ্জাভয়ে আপনার নামটা গোপন করিয়া কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিতাম। কাল্পনিক নাম রুক্মিণীকুমার। আপনি অত বিমনা হইতেছেন কেন?"

রাধারাণী একটু স্থির হইলেন—আগন্তুক বলিতে লাগিলেন— "যথার্থ রুক্মিণীকুমার নাম ধরে, এমন কাহাকেও চিনি না। যদি কেহ আমারই তল্লাস করিয়া থাকে— তাহা সম্ভব নহে—তথাপি কি জানি—সাত পাঁচ ভাবিয়া বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিলাম—কিন্তু কামাখ্যা বাবুর কাছে আসিতে সাহস হইল না।"

"পরে?"

"পরে কামাখ্যা বাবুর শ্রাদ্ধে তাঁহার পুত্রগণ আমাকে নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু আমি কার্য্যগতিকে আসিতে পারি নাই। সম্প্রতি সেই ত্রুটির ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য তাঁহার পুত্রদিগের নিকট আসিলাম। কৌতুকবশতঃ বিজ্ঞাপন সঙ্গে আনিয়াছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে উহার কথা উত্থাপন করিয়া কামাখ্যা বাবুর

জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা কবিলাম যে. এ বিজ্ঞাপন কেন দেওয়া হইয়াছিল? কামাখ্যা বাবুর পুত্র বলিলেন যে, রাধারাণীর অনুরোধে। আমিও এক রাধারাণীকে চিনিতাম—এক বালিকা—আমি এক দিন দেখিয়া তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম না। সে মাতার পথ্যের জন্য, আপনি অনাহারে থাকিয়া বনফুলের মালা গাঁথিয়া—সেই অন্ধকাব বৃষ্টিতে—" বক্তা আর কথা কহিতে পারিলেন না—তাঁহাব চক্ষু জলে পুরিয়া গেল। রাধারাণীরও চক্ষু জলে ভাসিতে লাগিল। চক্ষু মুছিযা রাধারাণী বলিলেন, "ইতব লোকের কথায় এখন প্রয়োজন কি? আপনার কথা বলুন।"

আগন্তুক উত্তর করিলেন, "রাধারাণী ইতর লোক নহে। যদি সংসাবে কেহ দেবকন্যা থাকে, তবে সেই রাধারাণী। যদি কাহাকে পবিত্র. সরলচিত্ত, এ সংসারে আমি দেখিয়া থাকি, তবে সেই রাধারাণী—যদি কাহারও কথায় অমৃত থাকে, তবে সেই রাধারাণী—যথার্থ অমৃত। বর্ণে বর্ণে অপ্সরার বীণা বাজে, যেন কথা কহিতে কহিতে বাধ বাধ করে অথচ সকল কথা পরিষ্কার, সুমধুব,— অতি সবল! আমি এমন কণ্ঠ কখনও শুনি নাই, এমন কথা কখনও শুনি নাই।"

রুক্মিণীকুমার মনে মনে ভাবিতেছিলেন আজি এত দিন হইল, সেই বালিকাব কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম, ঠিক্ আজিও সে কণ্ঠ আমার মনের ভিতর জাগিতেছে! যেন কাল শুনিযাছি। অথচ আজি এই সুন্দরীব কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার সেই রাধারাণীকেই বা মনে পড়ে কেন? এই কি সেই? আমি মূর্খ! কোথায় সেই দীনদুঃখিনী, কুটীববাসিনী ভিখারিণী—আর কোথায় এই উচ্চপ্রাসাদবিহাবিণী ইন্দ্রাণী! আমি সে রাধারাণীকে অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, সুতবাং জানি না যে. সে সুন্দবী. কি কুৎসিতা. কিন্তু এই শচীনিন্দিতা রূপসীর শতাংশের একাংশ রূপও যদি তাহাব থাকে. তাহা হইলে সেও লোকমনোমোহিনী বটে!

এ দিকে রাধারাণী. অতৃপ্তশ্রবণে রুক্মিণীকুমাবের মধুব বচনগুলি শুনিতেছিলেন—মনে মনে ভাবিতেছিলেন, তুমি যাহা পাপিষ্ঠা রাধারাণীকে বলিতেছ. কেবল তোমাকেই সেই কথাগুলি বলা যায়! তুমি আজ আট বৎসরেব পর রাধারাণীকে ছলিবার জন্য কোন্ নন্দনকানন ছাড়িযা পৃথিবীতে নামিলে! এতদিনে কি আমার হৃদযের পূজায় প্রীত হইয়াছে? তুমি কি অন্তর্যামী? নহিলে আমি লুকাইযা লুকাইয়া, হৃদয়ের ভিতবে লুকাইয়া তোমাকে যে পূজা করি, তাহা তুমি কি প্রকাবে জানিলে?

এই প্রথম, দুই জনে স্পষ্ট দিবসালোকে, পবস্পবেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলেন। দুই জনে, দুই জনেব মুখপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আব এমন আছে কি? এই সসাগরা. নদনদীচিত্রিতা, জীবসঙ্কুলা পৃথিবীতলে এমন তেজোময়, এমন মধুব. এমন সুখময, এমন চঞ্চল অথচ স্থিব. এমন সহাস্য অথচ গম্ভীর, এমন প্রফুল্ল অথচ ব্রীড়াময, এমন আর আছে কি? চিবপরিচিত অথচ অত্যন্ত অভিনব, মুহূর্তে মুহূর্তে অভিনব মধুরিমাময, আত্মীয় অথচ অত্যন্ত পব, চিরস্মৃত অথচ অদৃষ্টপূর্ব্ব—কখন দেখি নাই. আর এমন দেখিব না, এমন আর আছে কি?

রাধারাণী বলিলেন,—বড় কষ্টে বলিতে হইল. কেন না, চক্ষেব জল থামে না আবাব সেই চক্ষের জলের উপর কোথা হইতে পোড়া হাসি আসিয়া পড়ে—রাধাবাণী বলিলেন, "তা আপনি এতক্ষণ কেবল সেই ভিখারিণীর কথাই বলিলেন, আমাকে যে কেন দর্শন দিয়াছেন, তা ত এখনও বলেন নাই।"

হাঁ গা, এমন করিয়া কি কথা কহা যায় গা? যাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে, প্রাণেশ্বর! দুঃখিনীর সর্ব্বস্ব! চিরবাঞ্ছিত! বলিয়া যাহাকে ডাকিতে ইচ্ছা করিতেছে; আবার যাকে সেই সঙ্গে "হাঁ গা, সেই রাধারাণী পোড়ারমুখী তোমার কে হয় গা" বলিয়া তামাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে— তার সঙ্গে আপনি, মশাই, দর্শন দিয়াছেন, এই সকল কথা নিযে কি কথা কহা যায় গা? তোমরা পাঁচজন রসিকা, প্রেমিকা, বাক্চতুরা, বয়োধিকা ইত্যাদি ইত্যাদি আছ, তোমরা পাঁচজনে বল দেখি, ছেলেমানুষ রাধারাণী কেমন করে এমন কথা কয় গা?

রাধারাণী মনে মনে একটু পরিতাপ করিলেন; কেন না, কথাটা একটু ভর্ৎসনার মত হইল। রুক্মিণীকুমার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"তাই বলিতেছিলাম। আমি সেই রাধারাণীকে চিনিতাম—রাধারাণীকে মনে পড়িল, একটু—এতটুকু—অন্ধকার রাত্রে জোনাকির ন্যায়—একটু আশা হইল যে যদি এই রাধারাণী আমার সেই রাধারাণী হয়!"

"তোমার রাধারাণী।" রাধারাণী ছল ধরিয়া চুপি চুপি এই কথাটি বলিয়া মুখ নত করিয়া ঈষৎ ঈষৎ হাসিলেন। হাঁ গা, না হেসে কি থাকা যায় গা? তোমরা আমার রাধারাণীর নিন্দা করিও না।

রুক্মিণীকুমারও মনে মনে ছল ধরিলেন— এ তুমি বলে কেন? কে এ? প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমারই রাধারাণী। আমি একরাত্রি মাত্র তাহাকে দেখিযা—দেখিযাছিই বা কেমন করিয়া বলি— এই আট বৎসরও তাহাকে ভুলি নাই। আমারই রাধারাণী।"

রাধারাণী বলিলেন। "হোক আপনারই রাধারাণী।"

রুক্মিণী বলিতে লাগিলেন, "সেই ক্ষুদ্র আশায় আমি কামাখ্যা বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধাবাণী কে? কামাখ্যা বাবুর পুত্র সবিস্তারে পরিচয দিতে বোধ হয অনিচ্ছুক ছিলেন; কেবল বলিলেন, 'আমাদিগের কোন আত্মীয়াব কন্যা।" যেখানে তাঁহাকে অনিচ্ছুক দেখিলাম; সেখানে আব অধিক পীড়াপীড়ি করিলাম না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধাবাণী কেন রুক্মিণীকুমাবের সন্ধান কবিযাছিলেন, শুনিতে পাই কি? যদি প্রযোজন হয় ত বোধ কবি, আমি কিছু সন্ধান দিতে পারি। আমি এই কথা বলিলে, তিনি বলিলেন, 'কেন রাধারাণী রুক্মিণীকুমাবকে খুঁজিয়াছিলেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি না; আমাব পিতৃঠাকুর জানিতেন; বোধ কবি, আমাব ভগিনীও জানিতে পাবেন। যেখানে আপনি সন্ধান দিতে পারেন বলিতেছেন, সেখানে আমার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা কবিযা আসিতে হইতেছে।' এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। প্রত্যাগমন কবিযা তিনি আমাকে যে পত্র দিলেন, সে পত্র আপনাকে দিয়াছি। তিনি আমাকে সেই পত্র দিযা বলিলেন, আমাব ভগিনী সবিশেয কিছু ভাঙ্গিয়া চুবিযা বলিলেন না, কেবল এই পত্র দিলেন, আর বলিলেন যে, এই পত্র লইযা তাঁহাকে স্বয়ং রাজপুবে যাইতে বলুন। বাজপুরে যিনি অন্নসত্র দিযাছেন, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিবেন। আমি সেই পত্র লইযা আপনার কাছে আসিযাছি। কোন অপরাধ কবিযাছি কি?"

রাধারাণী বলিলেন, "জানি না। বোধ হয যে, আপনি মহাভ্রমে পতিত হইযাই এখানে আসিয়াছেন। আপনার রাধাবাণী কে, তাহা আমি চিনি কি না, বলিতে পাবিতেছি না। সে বাধারাণীব কথা কি, শুনিলে বলিতে পাবি, আমা হইতে তাহার কোন সন্ধান পাওযা যাইবে কি না।"

রুক্মিণী সেই বথের কথা সবিস্তাবে বলিলেন, কেবল নিজদত্ত অর্থ বস্ত্রের কথা কিছু বলিলেন না। রাধাবাণী বলিলেন,—"স্পষ্ট কথা মার্জ্জনা করিবেন। আপনাকে রাধাবাণীব কোন কথা বলিতে সাহস হয না; কেন না আপনাকে দযালু লোক বোধ হইতেছে না। যদি আপনি সেরূপ দযার্দ্রচিত্ত হইতেন, তাহা হইল আপনি যে ভিখারী বালিকাব কথা বলিলেন, তাহাকে অমন দুর্দ্দশাপন্ন দেখিযা অবশ্য তার কিছু আনুকূল্য করিতেন। কই, আনুকূল্য করার কথা ত আপনি বলিলেন না?"

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আনুকূল্য বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই। আমি সে দিন নৌকাপথে রথ দেখিতে আসিয়াছিলাম—পাছে কেহ জানিতে পারে, এই জন্য ছদ্মবেশে রুক্মিণীকুমাব বায পরিচয়ে লুকাইয়া আসিযাছিলাম—অপবাহ্নে ঝড় বৃষ্টি হওযায বোটে থাকিতে সাহস না করিয়া একা তটে উঠিয়া আসিয়াছিলাম। সঙ্গে যাহা অল্প ছিল, তাহা রাধারাণীকেই দিয়াছিলাম; কিন্তু সে অতি সামান্য। পরদিন প্রাতে আসিয়া উহাদিগের বিশেষ সংবাদ লইব মনে কবিয়াছিলাম, কিন্তু সেই রাত্রে আমার পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তখনই আমাকে কাশী যাইতে হইল। পিতা অনেক দিন রুগ্ন হইযা রহিলেন, কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিতে আমার বৎসরাধিক বিলম্ব হইল। বৎসব পরে আমি ফিবিযা আসিয়া আবার সেই কুটীরের সন্ধান করিলাম—কিন্তু তাহাদিগকে আর সেখানে দেখিলাম না।"

রা। "একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে। বোধ হয়, সে রথের দিন নিরাশ্রয়ে, বৃষ্টি বাদলে, আপনাকে সেই কুটীরেই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। আপনি কতক্ষণ সেখানে অবস্থিতি করিলেন?"

রু। "অধিকক্ষণ নহে। আমি যাহা রাধারাণীর হাতে দিয়াছিলাম,তাহা দেখিবার জন্য রাধারাণী আলো জ্বালিতে গেল—আমি সেই অবসরে তাহার বস্ত্র কিনিতে চলিয়া আসিলাম।"

রা। "আর কি দিয়া আসিলেন?"

রু। "আর কি দিব? একখানি ক্ষুদ্র নোট ছিল, তাহা কুটীরে রাখিয়া আসিলাম।"

রা।"নোটখানি ওরূপে দেওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হয় নাই। তাহারা মনে করিতে পারে, আপনার নোটখানি হারাইয়া গিয়াছে।"

রু। "না, আমি পেন্‌সিলে লিখিয়া দিয়াছিলাম, 'রাধারাণীর জন্য'। তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলাম 'রুক্মিণীকুমার রায়'। যদি সেই রুক্মিণীকুমারকে সেই রাধারাণী অন্বেষণ করিয়া থাকে এই ভরসায় বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।"

রা। "তাই বলিতেছিলাম, আপনাকে দযার্দ্রচিত্ত বলিয়া বোধ হয় না। যে রাধারাণী আপনার শ্রীচরণ দর্শন জন্য—" একটুকু বলিতেই-আ ছি ছি রাধারাণী। ফুলের কুঁড়ির ভিতর যেমন বৃষ্টির জল ভরা থাকে, ফুলটি নীচু করিলেই ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া যায়, রাধারাণী মুখ নত করিয়া এইটুকু বলিতেই, তাহার চোখের জল ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল। অমনই যে দিকে রুক্মিণীকুমার ছিলেন, সেই দিকের মাথার কাপড়টা বেশী করিয়া টানিয়া দিয়া সে ঘর হইতে রাধারাণী বাহির হইয়া গেলেন। রুক্মিণীকুমার বোধ হয়, চক্ষের জলটুকু দেখিতে পান নাই, কি পাইযাই থাকিবেন, বলা যায় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাহিরে আসিয়া, মুখে চক্ষে জল দিয়া অশ্রুচিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া, রাধারাণী ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "ইনিই ত রুক্মিণীকুমার। আমিও সেই রাধারাণী। দুই জনে দুই জনের জন্য মন তুলিয়া রাখিয়াছি। এখন উপায়? আমি যে রাধারাণী, তা উহাকে বিশ্বাস করাইতে পারি—তার পর? উনি কি জাতি, তা কে জানে। জাতিটা এখনই জানিতে পারা যায়। কিন্তু উনি যদি আমার জাতি না হন। তবে ধৰ্ম্মবন্ধন ঘটিবে না, চিরন্তনের যে বন্ধন, তাহা ঘটিবে না, প্রাণের বন্ধন ঘটিবে না। তবে আর উহার সঙ্গে কথায় কাজ কি? না হয় এ জন্মটা রুক্মিণীকুমার নাম জপ করিয়া কাটাইব। এত দিন সেই জপ করিয়া কাটাইয়াছি, জোয়ারের প্রথম বেগটা কাটিয়া গিয়াছে—বাকি কাল কাটিবে না কি?"

এই ভাবিতে ভাবিতে রাধারাণীর আবার নাকের পাটা ফাঁপিয়া উঠিল, ঠোঁট দুখানা ফুলিয়া উঠিল—আবার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আবার তিনি জল দিয়া মুখ ধুইয়া টোয়ালিয়া দিয়া মুছিয়া ঠিক হইয়া আসিলেন। রাধারাণী আবার ভাবিতে লাগিলেন,—"আচ্ছা! যদি আমার জাতিই হন, তা হলেই বা ভরসা কি? উনি ত দেখিতেছি বয়ঃপ্রাপ্ত—কুমার, এমন সম্ভাবনা কি? তা হলেনই বা বিবাহিত? না! না! তা হইবে না। নাম জপ করিয়া মরি, সে অনেক ভাল—সতীন সহিতে পারিব না।

"তবে এখন কৰ্ত্তব্য কি? জাতির কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াই কি হইবে? তবে রাধারাণীর পরিচয়টা দিই। আর উনি কে, তাহা জানিয়া লই; কেন না, রুক্মিণীকুমার ত ওঁর নাম নয়—তা ত শুনিলাম। যে নাম জপ করিয়া মরিতে হইবে, তা শুনিয়া লই। তার পর বিদায় দিয়া কাঁদিতে বসি। আ পোড়ারমুখী বসন্ত! না বুঝিয়া, না জানিয়া এ সামগ্রী কেন পাঠাইলি? জানিস্ না কি, এ জীবনসমুদ্র অমন করিয়া মন্থন করিতে গেলে, কাহারও কপালে অমৃত, কাহারও কপালে গরল উঠে!

"আচ্ছা! পরিচয়টা ত দিই।" এই ভাবিয়া রাধারাণী, যাহা প্রাণের অধিক যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বাহির করিয়া আনিলেন। সে সেই নোটখানি। বলিয়াছি, রাধারাণী তাহা তুলিয়া

রাখিয়াছিলেন। রাধারাণী তাহা আঁচলে বাঁধিলেন। বাঁধিতে বাঁধিতে ভাবিতে লাগিলেন—

"আচ্ছা, যদি মনের বাসনা পুরিবার মতনই হয়? তবে শেষ কথাটা কে বলিবে?" এই ভাবিয়া রাধারাণী আপনা আপনি হাসিয়া কুটপাট হইলেন। "আঃ, ছি-ছি-ছি। তা ত আমি পারিব না। বসন্তকে যদি আনাইতাম। ভাল, উহাকে এখন দুদিন বসাইয়া রাখিয়া বসন্তকে আনাইতে পারিব না? উনি না হয় সে দুই দিন আমাব লাইব্রেরি হইতে বহি লইয়া পড়ুন না। পড়াশুনা করেন না কি? ওঁরই জন্য ত লাইব্রেরি করিয়া রাখিয়াছি। তা যদি দুই দিন থাকিতে বাজি না হন? উহার যদি কাজ থাকে? তবে কি হবে? ওঁতে আমাতেই সে কথাটা কি হবে? ক্ষতি কি, ইংরেজের মেয়ের কি হয়? আমাদের দেশে তাতে নিন্দা আছে, তা আমি দেশের লোকের নিন্দাব ভয়ে কোন্ কাজটাই করি? এই যে উনিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত আমি বিয়ে করলেম না, এতে কে না কি বলে? আমি ত বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত কুমারী;— তা এ কাজটাও না হয় ইংবেজের মেয়ের মত হইল।"

তার পর রাধাবাণী বিষণ্ণ মনে ভাবিলেন, "তা যেন হলো; তাতেও বড় গোল। মমবাতিতে গড়া মেয়েদের মাঝখানে প্রথাটা এই যে, পুরুষ মানুষেই কথাটা পাড়িবে। ইনি যদি কথাটা না পাড়েন? না পাড়েন, তবে—তবে হে ভগবান্! বলিয়া দাও, কি করিব! লজ্জাও তুমি গড়িয়াছ—যে আগুনে আমি পুড়িতেছি, তাহাও তুমি গড়িয়াছ। এ আগুনে সে লজ্জা কি পুড়িবে না? তুমি এই সহায়হীনা, অনাথাকে দয়া কবিয়া পবিত্রতাব আবরণে আমাকে আবৃত কবিয়া লজ্জার আবরণ কাড়িয়া লও। তোমার কৃপায় যেন আমি এক দণ্ডের জন্য মুখরা হই।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভগবান বুঝি, সে কথাও শুনিলেন। বিশুদ্ধচিত্তে যাহা বলিবে, তাহাই বুঝি তিনি শুনেন। রাধারাণী মৃদু হাসি হাসিতে হাসিতে, গজেন্দ্রগমনে রুক্মিণীকুমারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রুক্মিণীকুমার তখন বলিলেন, "আপনি আমাকে বিদায় দিযাও যান নাই, আমি যে কথা জানিবার জন্য আসিয়াছি, তাহাও জানিতে পাবি নাই। তাই এখনও যাই নাই।"

রা। "আপনি রাধারাণীর জন্য আসিয়াছেন, তাহা আমারও মনে আছে। এ বাড়ীতে একজন রাধাবাণী আছে, সত্য বটে। সে আপনার নিকট পবিচিত হইবে কি না, সেই কথাটা ঠিক করিতে গিয়াছিলাম।

রু। "তার পর?"

রাধারাণী তখন অল্প একটু হাসিয়া একবার আপনার পার দিকে চাহিয়া, আপনার হাতের অলঙ্কার খুঁটিয়া, সেই ঘরে বসান একটা প্রস্তরনির্ম্মিত Niobe প্রতিকৃতি পানে চাহিয়া রুক্মিণীকুমারের পানে না চাহিয়া, বলিলেন—"আপনি বলিয়াছেন, রুক্মিণীকুমার আপনার যথার্থ নাম নহে। রাধারাণীর যে আবাধ্য দেবতা, তাহার নাম পর্য্যন্ত এখনও সে শুনিতে পায় নাই।"

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আরাধ্য দেবতা। কে বলিল?"

রাধারাণী কথাটা অনবধানে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, এখন সামলাইতে গিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "নাম ঐরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।"

কি বোকা মেয়ে।

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আমার নাম দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।"

রাধারাণী গুপ্তভাবে দুই হাত যুক্ত করিয়া মনে মনে ডাকিলেন, "জয় জগদীশ্বর। তোমার কৃপা অনন্ত।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের নাম শুনিয়াছি।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "অমন সকলেই রাজা কব্‌লায়। আমাকে যে কুমার বলে, সে যথেষ্ট সম্মান করে।"

রা। "এক্ষণে আমার সাহস বাড়িল। জানিলাম যে, আপনি আমার স্বজাতি। এখন স্পর্দ্ধা হইতেছে, আজি আপনাকে আমার আতিথ্য স্বীকার করাই।"

দে। "সে কথা পরে হবে। রাধারাণী কৈ?"

রা। "ভোজনের পর সে কথা বলিব।"

দে। "মনে দুঃখ থাকিলে ভোজনে তৃপ্তি হয় না।"

রা। "রাধারাণীর জন্য এত দুঃখ? কেন?"

দে। "তা জানি না, বড় দুঃখ— আট বৎসরের দুঃখ তা জানি।"

রা। "হঠাৎ রাধারাণীর পরিচয় দিতে আমার কিছু সঙ্কোচ হইতেছে। আপনি রাধারাণীকে পাইলে কি করিবেন?"

দে। "কি আর করিব? একবার দেখিব।"

রা। "একবার দেখিবার জন্য এই আট বৎসর এত কাতর?"

দে। "রকম রকমের মানুষ থাকে।"

রা। "আচ্ছা, আমি ভোজনের পর আপনাকে আপনাব রাধাবাণী দেখাইব। ঐ বড় আয়না দেখিতেছেন; উহার ভিতর দেখাইব। চাক্ষুষ দেখিতে পাইবেন না।"

দে। "চাক্ষুষ সাক্ষাতেই বা কি আপত্তি? আমি যে আট বৎসর কাতব।"

ভিতরে ভিতরে দুই জনে দুই জনকে বুঝিতেছেন কি না জানি না, কিন্তু কথাবার্ত্তা এইরূপ হইতে লাগিল। রাধাবাণী বলিতে লাগিলেন, "সে কথাটায় তত বিশ্বাস হয় না। আপনি আট বৎসব পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তখন তাহার বযস কত?"

দে। "এগার হইবে।"

রা। "এগার বৎসরের বালিকার উপব এত অনুবাগ?"

দে। "হয় না কি ?"

রা। "কখনও শুনি নাই।"

দে। "তবে মনে করুন কৌতূহল!"

রা। "সে আবার কি?"

দে। "শুধুই দেখিবার ইচ্ছা।"

রা। "তা, দেখাইব, ঐ বড় আয়নার ভিতর। আপনি বাহিরে থাকিবেন।"

দে। "কেন সম্মুখ সাক্ষাতে আপত্তি কি?"

রা। "সে কুলের কুলবতী।"

দে। "আপনিও ত তাই।"

রা। "আমার কিছু বিষয় আছে। নিজে তাহার তত্ত্বাবধান করি।" সুতবাং সকলের সম্মুখেই আমাকে বাহির হইতে হয়। আমি কাহারও অবীন নই। সে তাহার স্বামীর অধীন, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত—'

দে। "স্বামী"

রা। "হাঁ। আশ্চর্য্য হইলেন কেন?"

দে। "বিবাহিতা।"

রা। "হিন্দুর মেয়ে—উনিশ বৎসর বয়স—বিবাহিতা নহে?"

দেবেন্দ্রনারায়ণ অনেকক্ষণ মাথায় হাত দিয়া রহিলেন। রাধারাণী বলিলেন, "কেন, আপনি কি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন?"

দে। "মানুষ কি না ইচ্ছা করে?"

রা। "এরূপ ইচ্ছা রাণীজি জানিতে পারিয়াছেন কি?"

দে। "রাণীজি কেহ ইহার ভিতরে নাই। রাধারাণী সাক্ষাতের অনেক পূর্ব্বেই আমার পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে।"

রাধারাণী আবার যুক্তকরে ডাকিলেন, "জয় জগদীশ্বর। আর ক্ষণকাল যেন আমার এমনই সাহস থাকে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "তা শুনিলেন ত, রাধাবাণী পরস্ত্রী। এখনও তাহার দর্শন অভিলাষ করেন?"

দে। "করি বৈ কি।"

রা। "সে কথাটা কি আপনার যোগ্য?"

দে। "রাধারাণী আমাব সন্ধান করিয়াছিল কেন, তাহা এখনও আমার জানা হয় নাই।"

রা। "আপনি রাধারাণীকে যাহা দিয়াছিলেন তাহা পরিশোধ করিবে বলিয়া। আপনি শোধ লইবেন কি?"

দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "যা দিয়াছি, তাহা পাইলে লইতে পারি।"

রা। "কি কি দিয়াছেন?"

দে। "একখানা নোট।"

রা। "এই নিন।"

বলিয়া বাধারাণী আঁচল হইতে সেই নোটখানি খুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের হাতে দিলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন, তাঁহার হাতে লেখা রাধাবাণীব নাম সে নোটে আছে। দেখিয়া বলিলেন, "এ নোট কি রাধারাণীর স্বামী কখনও দেখিয়াছেন?"

বা। "রাধারাণী কুমারী। স্বামীব কথাটা আপনাকে মিথ্যা বলিয়াছিলাম।"

দে। "তা, সব ঋণ শোধ হইল না।"

বা। "আব কি বাকি?"

দে। "দুইটা টাকা আর কাপড়।"

বা। "সব ঋণ যদি এখন পবিশোধ হয় তবে আপনি আহার না কবিয়া চলিয়া যাইবেন। পাওনা বুঝিয়া পাইলে কোন মহাজন বসে? ঋণের সে অংশ ভোজনের পর বাধাবাণী পবিশোধ করিবে।"

দে। "আমাব যে এখনও অনেক পাওনা বাকি।"

রা। "আবাব কি?"

দে। "রাধারাণীকে মনঃপ্রাণ দিয়াছি—তা ত পাই নাই।"

রা। "অনেক দিন পাইয়াছেন। রাধারাণীর মনঃপ্রাণ আপনি অনেক দিন লইয়াছেন—তা সে দেনাটা শোধ-বোধ গিয়াছে।"

দে। "সুদ কিছু পাই না?"

রা। "পাইবেন বৈ কি।"

দে। "কি পাইব?"

রা। "শুভ লগ্নে সুতহিবুক যোগে এই অধম নারীদেহ আপনাকে দিয়া, রাধাবাণী ঋণ হইতে মুক্ত হইবেন।"

এই বলিয়া রাধারাণী ঘর হইতে বাহিব হইয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাধারাণীর আজ্ঞা পাইয়া, দেওয়ানজি আসিয়া রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণকে বহির্ব্বাটীতে লইয়া গিয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন। যথাবিহিত সময়ে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ ভোজন করিলেন। রাধারাণী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে রাধারাণী বলিলেন, "আপনার নগদ দুইটা

টাকা ও কাপড় এখনও ধারি। কাপড় পরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি; টাকা খরচ করিয়াছি। তাহা আর ফেরত দিবার যো নাই। তাহার বদলে যাহা আপনার জন্য রাখিয়াছি, তাহা গ্রহণ করুন।"

এই বলিয়া রাধারাণী বহুমূল্য হীরকহার বাহির করিয়া দেবেন্দ্রর গলায় পরাইয়া দিতে গেলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ নিষেধ করিয়া বলিলেন, "যদি ঐরূপে দেনা পরিশোধ করিবে, তবে তোমার গলায় যে ছড়া আছে, তাহাই লইব।"

রাধারাণী হাসিতে হাসিতে আপনার গলায় হার খুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের গলায় পরাইলেন। তখন দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "সব শোধ হইল—কিন্তু আমি একটু ঋণী রহিলাম।"

রা। "কিসে?"

দে। "সেই দুই পয়সার ফুলের মালার মূল্য ত ফেবত পাইলাম। তবে এখন মালা ফেবত দিতে আমি বাধ্য।"

রাধারাণী হাসিলেন।

দেবেন্দ্রনারায়ণ ইচ্ছাপূর্ব্বক মুক্তাহার পরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা রাধারাণীর কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই ফেরত দিলাম।"

এমন সময়ে পোঁ করিয়া শাঁক বাজিল।

রাধারাণী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শাঁক বাজাইল কে?"

তাহার একজন দাসী, চিত্রা উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আমি।'

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বাজাইলি?"

চিত্রা বলিল,"কিছু পাইব বলিয়া।"

বলা বাহুল্য যে, চিত্রা পুরস্কৃত হইল। কিন্তু তাহার কথাটা মিথ্যা। বাধারাণী তাহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া দ্বারের নিকট বসাইয়া আসিয়াছিলেন।

তার পরে দুই জনে বিরলে বসিয়া মনের কথা কহিলেন। বাধারাণী দেবেন্দ্রনারাযণের বিস্ময দূব করিবার জন্য, সেই রথের দিনের সাক্ষাতের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার পিতামহের বিযযসম্পত্তিব কথা, পিতামহের উইল লইয়া মোকদ্দমার কথা, তজ্জন্য রাধারাণীব মার দৈন্যের কথা,মাব মৃত্যুর কথা, কামাখ্যাবাবুর আশ্রয়ের কথা, প্রিবি কৌন্সিলের ডিক্রীব কথা, কামাখ্যা বাবুর মৃত্যুর কথা সব বলিলেন। বসন্তের কথা বলিলেন, আপনাব বিজ্ঞাপনের কথা বলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে, হাসিতে হাসিতে, বৃষ্টি বিদ্যুতে চাতকী চিরসঞ্চিত প্রণয়সম্ভাষণপিপাসা পরিতৃপ্ত করিলেন। নিদাঘসন্তপ্ত পর্ব্বত যেমন বর্ষার বারিধারা পাইয়া শীতল হয়, দেবেন্দ্রনাবায়ণও তেমনি শীতল হইলেন।

তিনি রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ত কেহ নাই। কিন্তু এ বাড়ী বড় জনাকীর্ণ দেখিতেছি।"

রাধারাণী বলিলেন, "দুখের দিনে আমার কেহ ছিল না। এখন আমার অনেক আত্মীয় কুটম্ব জুটিয়াছে। আমি এ অল্প বয়সে একা থাকিতে পারি না, এ জন্য যত্ন করিয়া তাহাদিগকে স্থান দিযা রাখিয়াছি।"

দে। "তাহাদের মধ্যে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট কেহ আছে যে, তোমাকে এই দীনদরিদ্রকে দান করিতে পারে?"

রা। "তাও আছে।"

দে। "তবে তিনি কেন সেই শুভলগ্নযুক্ত সুতহিবুক যোগটা খুঁজুন না?"

রা। "বোধ করি, এতক্ষণ সে কাজটা হইয়া গেল। তোমার সঙ্গে রাধারাণীর এরূপ সাক্ষাৎ অন্য কোন কারণে হইতে পারে না, এ পুরীতে সকলেই জানে। সংবাদ লইব কি?"

দে। "বিলম্বে কাজ কি?"

রাধারাণী ডাকিলেন, "চিত্রে!" চিত্রা আসিল। রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিন টিন কিছু হইল কি?"

চিত্রা বলিল, "হাঁ দেওয়ানজি মহাশয় পুরোহিত মহাশয়কে ডাকাইয়াছিলেন। পুরোহিত পর দিন বিবাহের উত্তম দিন বলিয়া গিয়াছেন। দেওয়ানজি মহাশয় সমস্ত উদ্যোগ করিতেছেন।"

তখন বসন্ত আসিল, কামাখ্যা বাবুর পুত্রেরা পরিবারবর্গ সকলেই আসিল, আর যত বসন্তের কোকিল, সময়ের বন্ধু, যে যেখানে ছিল, সকলেই আসিল। দেবেন্দ্রনারায়ণের বন্ধু ও অনুচর-বর্গ সকলেই আসিল।

বসন্ত আসিলে রাধারাণী বলিলেন, "তোমার কি আক্কেল ভাই বসন্ত?"

বসন্ত বলিল, "কি আক্কেল ভাই রাধাবাণী?"

রা। "যাকে তাকে তুমি পত্র দিয়া পাঠাইয়া দাও কেন?"

বসন্ত। "কেন, লোকটা কি করেছে বল দেখি?"

রাধাবাণী তখন সকল বলিলেন। বসন্ত বলিল, "রাগের কথা ত বটে। সুদ শুদ্ধ দেনা পাওনা বুঝিয়া নেয়, এমন মহাজনকে যে বাড়ী চিনাইয়া দেয়, তার উপর রাগের কথাটা বটে।"

রাধাবাণী বলিলেন, "তাই আজ আমি তোব গলায় দড়ি দিব।"

এই বলিয়া রাধাবাণী যে হীবকহাব কক্মিণীকুমাবকে পরাইতে গিয়াছিলেন, তাহা আনিয়া বসন্তের গলায় পরাইয়া দিলেন।

তাব পব শুভ লগ্নে শুভ বিবাহ হইয়া গেল।

'বঙ্গদর্শন', ১২৮২

হঠাৎ অবতার

কালীপ্রসন্ন সিংহ

বাবু পদ্মলোচন ওরফে হঠাৎ অবতার ১১১২ সালে তার মাতামহ নাউপাড়মুযুলীর মিত্তিরদের বাড়ি জন্মগ্রহণ করেন। নাউপাড়ামুযুলী গ্রামখানি মন্দ নয় অনেক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের বাস আছে; গাঁযের জমিদাব মজফ্ফর খাঁ, মোছলমান হয়েও গরু জবাই প্রভৃতি দুষ্কর্মে বিরত ছিলেন, মোল্লা ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই সমান দেখতেন—মানীর মান রাখতেন ও লোকের খাতিব ও সেলামাঙ্কীর গুণা কত্তেন না, ফাবসীতে তিনি বড় লায়েক ছিলেন, বাঙ্গলা ও উর্দ্দুতেও তাঁর দখল ছিল; মজফফ্র খাঁ গাঁয়ের জমিদার ছিলেন বটে কিন্তু ধোপা নাপিত বন্ধ করা, হুঁকা মারা, ঢ্যালা ফ্যালা ও বিয়ে ভাটির হুকুম হাকাম ও নিষ্পত্তি করার ভার মিত্তির বাবুদের ওপরই দেওয়া হয়। পূর্ব্বে মিত্তিরবাবুদের বড় জলজলাট ছিল, মধ্যে পরিবারের অনেকে মরে যাওয়ায় ভাগা ভাগা ও বহু গুষ্টি নিবন্ধন কিঞ্চিৎ দৈন্যদশায় পড়তে হয়েছিল কিন্তু নিঃস্বত্ব হয়েও গ্রামস্থ লোকেদের কাছে মনের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নি।

পদ্মলোচনের জন্মদিনটি সামান্য লোকের জন্মদিনের মত অমনি যায় নি, সে দিন—হঠাৎ মেঘাড়ম্বর করে সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়—একটি সাপ আঁতুড়ঘরের দরজায় সমস্ত রাত্তির বসে ফোঁস ফোঁস করে, আর বাড়িব একটি পোষা টিয়েপাখি হঠাৎ মরে গিয়ে দাঁড়ে ঝুলে থাকে, পদ্মলোচনের পিতামহী এ সকল লক্ষণ শুভ নিমিত্ত বিবেচনা করে বড়ই খুসি হয়ে আপনার পরবার একখানি লালপেড়ে সাড়ি দাইকে বকসিস দ্যান, অভ্যাসগত ঢুলী ও বাজন্দরেরাও একটি সিকি আর এক হাঁড়ি

নারকেলনাড়ু পেয়েছিল। ক্রমে মহা আনন্দে আটকৌড়ে সারা হলো, গাঁয়ের ছেলেরা "আটকৌড়ে বাট্‌কৌড়ে ছেলে আছে ভাল; ছেলেরা বাবার দাড়িতে বসে হাগ" বলে কুলো বাজিয়ে ফুটকড়াই, বাতাসা ও এক এক চক্‌চকে পয়সা নিয়ে আনন্দে বিদেয় হলো। গো-ভাগাড় থেকে একটা মরা গরুর মাথা কুড়িয়ে এনে আঁতুড়ঘরের দরজায় রেখে "দোরষষ্ঠী" বলে হলুদ ও দুর্ব্বো দিয়ে পুজো করা হলো। ক্রমে ১৫ দিন ২০ দিন এক মাস সম্পূর্ণ হলে গাঁয়ের পঞ্চানন্দতলায় ষষ্ঠীর পুজো দিয়ে আঁতুড় ওঠানো হয়।

ক্রমে পদ্মলোচন তিথিগত চাঁদেব মতন বাড়তে লাগলেন। গুলিডাণ্ডা, কপাটি কপাটি, চোর চোর, তেলী হাত পিছলে গেলি প্রভৃতি খেলায় পদ্মলোচন প্রসিদ্ধ হয়ে পড়লেন। পাঁচ বছবে হাতে খড়ি হলো, গুরুমশায়েব ভয়ে পদ্মলোচন পুকুরপাড়ে, নলবনে ও বাঁশবাগানে লুকিয়ে থাকেন, পেট কামড়ানি ও গা বমি বমি প্রভৃতি অন্তঃশিলে বোগেরও অভাব বইলো না; ক্রমে কিছুদিন এই রকমে যায়, এক দিন পদ্মলোচনের বাপ মলেন, তাঁব মা আগুন খেয়ে গেলেন, ক্রমে মাতামহ, মামা ও মামাতো ভায়েরাও একে একে অকালে ও সময়ে সল্লেন সুতরাং মাতামহ মিত্তিরদের ভিটে পুরুষশুন্য প্রায় হলো; জমিজমা গুলি জয়কৃষ্ণের মত জমিদারে কতক গিলে ফেল্লে, কতক খাজনা না দেওযায বিকিয়ে গেল, সুতরাং পদ্মলোচনকে অতি অল্প বয়সে পেটের জন্যে অদৃষ্ট ও হাতযশেব ওপব নির্ভব কত্তে হলো। পদ্মলোচন কলকাতায় এসে এক বাঁসাড়েদের বাসায পেটভাতে ফাই ফরমাস, কাপড় কোঁচানো ও লুচি ভাজা প্রভৃতি কর্ম্মে ভর্ত্তি হলেন,—অবকাশ মত হাতটাও পাকান হবে— বিশেষতঃ কুঠেলরা লেখাপড়া শেখাবেন প্রতিশ্রুত হলেন।

পদ্মলোচন কিছুকাল ঐ নিয়মে বাঁসাড়েদের মনোরঞ্জন কত্তে লাগলেন; ক্রমে দু'এক বাবুর অনুগ্রহ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় মাথালো মাথালো জায়গায় উমেদারি আবম্ভ কল্লেন। সহবের যে বড়মানুষের বৈঠকখানায় যাবেন প্রায় সর্ব্বত্রই লোকারণ্য দেখতে পাবেন, যদি ভিতরকাব খবর নেন তা হলে পাওনাদার, মহাজন, উঠ্‌নোওয়ালা, দোকানদার, উমেদার আইবুড়ো ও বেকার কুলীনের ছেলেই বিস্তর দেখতে পাবেন— পদ্মলোচনও সেই ভিড়েব মধ্যে একটি বাড়লেন; ক্রমে অষ্ট প্রহব ঘন্টাব গরুড়ের মত উমেদারিতে অনবরত এক বৎসর হাঁটাহাঁটি ও হাজ্‌রের পব দু'চাবখানা সই সুপাবিস্‌ও হস্তগত হলো; শেষে এক সদয়হৃদয় মুচ্ছুদী আপনার হউসে একটি ওজোন সবকাবী কর্ম্ম দিলেন।

পদ্মলোচন কষ্টভোগের একশেষ করেছিলেন, ভদ্রলোকের ছেলে হযেও কাপড় কোঁচান, লুচি ভাজা, বাজার করা, জল তোলা প্রভৃতি অপকৃষ্ট কাজ স্বীকার কত্তে হয়েছিল, ক্রমশ লুচি ভাজতে ভাজতে ক্রমে লুচিভাজায় তিনি এমনি তৈরি হয়ে উঠলেন যে, তাঁব মত লুচি অনেক ঘটক ও মেঠাইওয়ালা বামুনেও ভাজতে পাত্তো না। বাঁসাড়েরা খুসি হয়ে তাঁরে "মেকর" খেতাব দেয়, সুতরাং সেই দিন থেকে তিনি মেকর পদ্মলোচন দত্ত নাকে বিখ্যাত হলেন।

ভাবাকথায় বলে "যখন যার কপাল ধরে মুত্তে বসে....." যখন পড়্‌তা পড়তে আরম্ভ হয, তখন ছাইমুটো ধল্লে সোনামুটো হয়ে যায়। ক্রমে পদ্মলোচন দত্তের শুভাদৃষ্ট ফল্‌তে আরম্ভ হলো—মুচ্ছুদী অনুগ্রহ করে সিপসরকারী কর্ম্ম দিলেন। সায়েবরাও দত্তজার চালাকি ও কাজের হুঁসয়ারিতে সন্তুষ্ট হতে লাগলেন—পদ্মলোচন ততই সায়েবদের সন্তুষ্ট করবার অবসর খুঁজতে লাগলেন—একমনে সেবা কল্লে ভয়ঙ্কর সাপও সদয় হয়, পুরাণে পাওয়া যায় যে তপস্যা করে অনেক হিন্দুদের ভুতের মত ভয়ানক দেবতাগুলোকেও প্রসন্ন করচে। ক্রমে সায়েবরাও পদ্মলোচনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভাল করবার চেষ্টায় রইলেন; একদিন হউসের সদরমেট কর্ম্মে জবাব দিলে—সায়েবরা মুচ্ছুদীকে অনুরোধ করে পদ্মলোচনকে সেই কর্ম্মে ভর্ত্তি কল্লেন।

পদ্মলোচন সিপসরকার হয়েও বাঁসাড়েদের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন নি, কিন্তু সদরমেট হয়ে সেখানে থাকা আর ভাল দেখায় না বলেই অন্যত্র একটু জায়গা ভাড়া করে নিয়ে একটি খোলার ঘর

প্রস্তুত করে রইলেন। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁরে অধিক দিন থাক্‌তে হলো না। তাঁর অদৃষ্ট শীঘ্রই লুচির ফোস্‌কার মত ফুলে উঠ্‌লো—বের জল পেলে কনেরা যেমন ফেঁপে ওঠে, তিনিও তেমনি ফাঁপতে লাগলেন। ক্রমে মুচ্ছুদ্দীর সঙ্গে সায়েবদের বড় একটা বনিবনাও না হওয়ায় মুচ্ছুদ্দী কর্ম্ম ছেড়ে দিলেন, সুতরাং সায়েবদের অনুগ্রহধর পদ্মলোচন বিনা টাকায় মুচ্ছুদ্দী হলেন।

টাকায় সকলই করে। পদ্মলোচন মুচ্ছুদ্দী হবামাত্র অবস্থার পরিবর্ত্তন বুজতে পাল্লেন, তার পরদিন সকালে সেই খোলার ঘর বালাখানাকে ভ্যাংচাতে লাগলো—উমেদার, দালাল, প্যায়দা, গদিওয়ালা ও পাইকেরে ভরে গ্যালো, কেউ পদ্মলোচন বাবুকে নমস্কার করে হাঁটু গেড়ে জোড়হাত করে কথা কয়, কেউ "আপনার সোনার দোত কলম হোক" "লক্ষপতি হোন" "সম্বৎসরের মধ্যে পুত্তুর সন্তান হোক" "অনুগতের হুজুর ভিন্ন গতি নাই" প্রভৃতি কথায় পদ্মলোচনকে তুঁদুলে পাঁউরুটি হতেও ফোলাতে লাগলেন —ক্রমে দুরবস্থা দুকুরে লোচ্চার মত মুখে কাপড় দিয়ে নুকুলেন—অভিমান ও অহঙ্কারে ভূষিত হয়ে সৌভাগ্যযুবতী বারাঙ্গনা সেজে তাঁরে আলিঙ্গন কল্লেন; হুজুকদারেরা আজকাল "পদ্মলোচনকে পায় কে" বলে ঢ্যাড্‌রা পিটে দিলেন, প্রতিধ্বনি—রেও রামুন, অগ্রদানী ও গাইয়ে বাজিয়ে সেজে এই কথাটি সর্ব্বত্র ঘোষণা করে বেড়াতে লাগলেন—সহরে ঢি ঢি হয়ে গেল—পদ্মলোচন এক জন মস্ত লোক।

কলকাতা সহরে কতকগুলি বেকার "জয়কেতু" আছেন, যখন যার নতুন বোলবালাও হয় তখন তাঁবা সেইখানে মেশেন, তাঁকেই জাতের শ্রেষ্ঠ দেখেন ও অনন্যমনে তাঁরই উপাসনা করেন; আবার যদি তাঁর চেয়ে কেউ উঁচু হয়ে পড়েন তবে তাঁরে পরিত্যাগ করে উঁচুর দলে জমেন; আমরা ছেলেবেলা বুড়ো ঠাকুরমার কাছে "ছাঁদন দড়ি ও গোদা বাড়ির গল্প শুনেছিলাম, এই মহা-পুরুষরা ঠিক সেই ছাঁদন দড়ি গোদা বাড়ি। গল্পে আছে, "রাজপুত্তুর জিজ্ঞাসা কল্লেন, ছাঁদন দড়ি গোদা বাড়ি। এখন তুমি কার?"—"না আমি যখন যার তখন তার।" তেমনি হুতোম প্যাঁচা বলেন সহুরে জয়কেতুরাও "যখন যার তখন তার"।।।

জয়কেতুরা ভদ্রলোকের ছেলে, অনেকে লেখাপড়াও জানেন, তবে কেউ কেউ মূর্ত্তিমতী মা। এঁদের অধিকাংশই পৌত্তলিক, কুলীন বামুন, কায়স্থ কুলীন বেকার পেনসুনে ও ব্রোকদই বিস্তর। বহু কালের পর পদ্মলোচন বাবু কলকেতা সহরে বাবু বলে বিখ্যাত হন, প্রায় বিশ বৎসর হলো সহরের "হঠাৎ বাবুর" উপসংহার হয়ে যায় তন্নিবন্ধন "জয়কেতু" "মোসাহেব" "ওস্তাদজী" "ভড়জা" "ঘোষজা" "বোসজা" প্রভৃতি বরাখুরেরা জোয়ারের বিষ্ঠার মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন, সুতরাং এখন পদ্মলোচনের "তর্পণের কোষায়" জুড়াবার জায়গা পেলেন।

জয়কেতুরা ক্রমে পদ্মলোচনকে ফাঁপিয়ে তুল্লেন, পড়্‌তাও ভালো চল্লো—পদ্মলোচন অ্যাম্বিশনের দাস হলেন হিতাহিত বিবেচনা দেনাদার বাবুদের মত গাঢাকা হলেন। পদ্মলোচন প্রকৃত হিন্দুর মুকোস পরে সংসার রঙ্গভূমিতে নাবলেন—ব্রাহ্মণের পাদ্‌ধুলো খান—পা চাটেন—দলাদলির ও হিন্দু ধর্ম্মের ঘোঁট করেন—ঠাকুরণ বিষয় ও সখীসম্বাদ গাওনার পক্ষে প্রকৃত ব্লটিং পেপার; পদ্মলোচনের জোরদণ্ড প্রতাপ। বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপক ধরে না, মিউটিনির সময় গবর্মেন্ট যেমন দোচোকোব্রত ভলন্‌টিয়ার জুটিয়েছিলেন পদ্মলোচন বাবু হয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সংগ্রহ কত্তে বাকি রাখলেন না, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়মের মত বিবিধ আশ্চর্য্য জীব একত্র কল্লেন—বেশীর ভাগ জ্যান্ত।।।

বাঙ্গালি বদমায়েস ও দুর্ব্বুদ্ধির হাতে টাকা না থাকলে সংসারের কিছু মাত্র ক্ষতি কত্তে পারে না, বদমায়িসী ও টাকা একত্র হলে হাতা পর্য্যন্ত মারা পড়ে, সেটি বড় সোজা কথা নয়, শিবকেষ্টো বাঁড়ুজ্যে পর্য্যন্ত যাতে মারা যান। পদ্মলোচনও পাঁচজন কুলোকের পরামর্শে বদমায়িসী আরম্ভ কল্লেন—পৃথিবীর লোকের নিন্দা করা, খোঁটা দেওয়া ও টিট্‌কারি করা তাঁর কাজ হলো. ক্রমে তাতেই তিনি এমনি চ্যোড়ে উঠলেন যে, শেষে আপনাকে আপনি অবতার বলে বিবেচনা কত্তে লাগলেন; পরিষদেরা

অবতার বলে তাঁরে স্তব কত্তে লাগলো, বাজে লোকে "হঠাৎ অবতার" খেতাব দিলে—দর্শক ভদ্দর লোকেরা এই সকল দেখে শুনে অবাক্ হয়ে ক্ল্যাপ দিতে লাগলেন।

পদ্মলোচন যথার্থই মনে মনে ঠাউবেছিলেন যে, তিনি সামান্য মনুষ্য নন, হয় হরি নয় পীর কিম্বা ইহুদীদের ভাবী মেসায়া—তারই সফল ও সার্থকতার জন্য পদ্মলোচন বুজরুকি পর্য্যন্ত দেখাতে ত্রুটি করেন নাই।

বিলাতী জুজেস্ ক্রাইষ্ট— এক টুক্‌রো রুটিতে এক শ লোক খাইয়েছিলেন—কাণা ও খোঁড়া ফুঁয়ে ভাল কত্তেন। হিন্দুমতের কেষ্টও পূতনা বধ, শকট ভঞ্জন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য করেছিলেন। পদ্মলোচন আপনাবে অবতার বলে মানাবার জন্য সহবে হুজুক তুলে দিলেন যে, "তিনি এক দিন বারো জনের খাবার জিনিসে এক শ লোক খাইয়ে দিলেন"; কাণা খোঁড়াবা সর্ব্বদাই হাতা বেড়ির ধ্বজবজ্রাঙ্কুশযুক্ত পদ্মহস্ত পাবাব প্রতীক্ষায় দবজায় দাঁড়িয়ে থাকেন, বুড়ী বুড়ী মাগীবা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে নিয়ে "হাতবুলানো" পাইযে আনে—প্রভৃতি নানাবিধ বুজরুকি প্রকাশ কত্তে লাগলেন। এই সকল শুনে চতুষ্পাঠীওয়ালা মহাপুরুষরা মড়কেব মত নাচতে লাগলেন—টাকাব এমনি প্রতাপ যে, চন্দ্রকে দেখে রত্নাকর সাগরও কেঁপে ওঠেন,—অন্যেব কি কথা। মযবাব দোকানে যত রকমাবি মাছি বসন্তি বোল্‌তা আর ভোঁভুঁয়ে ভোমরা দেখা যায়, বইয়েব দোকানে তাব কটা থাকে—সেথায় পদার্থহীন উই পোকাবা—আন্‌সাড়ে আরসুলোর দল, আব দু'একটা গোড়িমওয়ালা ফচ্‌কে নেংটি ইঁদুব মাত্র:

হঠাৎ টাকা হলে মেজাজ যে রকম হয়, এক দম গাঁজাতেও তত হয় না: "হঠাৎ অবতাব" হযেও পদ্মলোচনেব আশা নিবৃত্তি হয় নাই—বাদসাই পেলেই যে সে আশা নিবৃত্তি হবে তাবও সম্ভাবনা কি! কিছুদিনের মধ্যে পদ্মলোচন কলিকাতা সহরেব এক জন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন তিনি হাই তুল্লে হাজার তুড়ি পড়ে— তিনি হাঁচলে জীব! জীব! জীব! শব্দে ঘর কেঁপে ওঠে। ওবে! ওবে! হুজুব ও "যো হুকুমের" হল্লা পড়ে গেল, ক্রমে সহবের বড় দলে খপব হলো যে কলকাতার ন্যাচ্‌র‍্যাল হিষ্ট্রীর দলে একটি নম্বরে বাড়লো।

ক্রমে পদ্মলোচন নানা উপাযে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায কত্তে লাগলেন, অবস্থাব উপযুক্ত একটি নতুন বাড়ি কিনলেন, সহরের বড়মানুষ হলে যে সকল জিনিসপত্র ও উপাদানেব আবশ্যক, সভাস্থ আত্মীয় ও মোসাহেবেরা ক্রমশঃ সেই সকল জিনিস সংগ্রহ করে ভাণ্ডাব ও উদর পূবে ফেল্লেন, বাবু স্বয়ং পছন্দ করে (আপন চক্ষে সুবর্ণ বর্ষে) একটি রাঁড়ও রাখলেন।

বেশ্যাবাজিটি আজকাল এ সহরে বাহাদুরির কাজ ও বড়মান্‌ষের এলবাত পোশাকেব মধ্যে গণ্য, অনেক বড়মানুষ বহু কাল হলো মরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়েব বাড়িগুলি আজও মনিমেন্টেব মত তাঁদের স্মরণার্থে রয়েচে—সেই তেতলা কি দোতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর এমন কিছু কাজ হয় নি, যা দেখে সাধারণে তাঁরে স্মরণ করে। কলকেতার অনেক প্রকৃত হিন্দু দলপতি ও রাজা রাজ্‌ড়ারা রাত্তিরে নিজ বিবাহিত স্ত্রীর মুখ দেখেন না, বাড়িব প্রধান আম্‌লা দাওয়ান মুচ্ছুদ্দীরা যেমন হুজুরদের হয়ে বিষয় কর্ম্ম দেখেন—স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাঁদের উপর আইনমত অর্শায়, সুতরাং তাঁরা ছাড়বেন কেন। এই ভয়ে কোন বুদ্ধিমান্ স্ত্রীকে বাড়ির ভিতরের ঘরে পুরে চাবি বন্ধ করে বাইরের বৈঠকখানায় সাবারাত্রি রাঁড় দিয়ে আমোদ করেন, তোপ পড়ে গেলে ফর্‌সা হবাব পূর্ব্বে গাড়ি বা পালকি করে বিবি সাহেব বিদায় হন—বাবু বাড়ির ভিতরে গিয়ে শয়ন কবেন— স্ত্রীও চাবি হতে পরিত্রাণ পান। ছোক্‌রা গোছের কোন কোন বাবুরা বাপ মার ভয়ে আপনার শোবার ঘরে একজন চাকর বা বেয়ারাকে শুতে বলে আপনি বেরিয়ে যান, চাকর দরজায় খিল দিয়ে ঘরের মেঝেয় শুয়ে থাকে, স্ত্রী তুলসীপাতা ব্যবহার করে খাটে শুয়ে থাকেন, মধ্যরাত্তির কেটে গেলে বাবু আমোদ লুটে ফেরেন ও বাড়িতে এলে চুপি চুপি শোবার ঘরের দরজায় ঘা মারেন, চাকর উঠে দরজা খুলে দিয়ে বাইরে যায়, বাবু শয়ন করেন,— বাড়ির কেউই টের পায় না যে বাবু রাত্তিরে ঘরে থাকেন

না। পাঠকগণ। যারা ছেলেবেলা থেকে "ধর্ম্ম যে কার নাম তা শোনেনি, হিতাহিত বিবেচনার সঙ্গে যাদের সুদূর সম্পর্ক, কতকগুলি হতভাগা মোসাহেবেই যাদের হাল্" তারা যে এই রকম পশুবৎ কদাচারে রত থাক্‌বে, এ বড় আশ্চর্য্য নয়। কলকেতা সহর এই মহাপুরুষদের জন্য বেশ্যাসহর হয়ে পড়েচে, এমন পাড়া নাই যেথায় অন্তত দশ ঘর বেশ্যা নাই; হেথায় প্রতি বৎসর বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্চে বই কম্‌চে না। এমন কি একজন বড়মানুষের বাড়ির পাশে একটি গৃহস্থের সুন্দরী বৌ কি মেয়ে নিয়ে বাস করবাব যো নাই; তাহলে দশ দিনেই সেই সুন্দরী টাকা ও সুখের লোভে কুলে জলাঞ্জলি দেবে—যত দিন সুন্দরী বাবুর মনস্কামনা পূর্ণ না কর্ব্বে তত দিন দেখ্‌তে পাবেন বাবু অষ্টপ্রহর বাড়ির ছাদের উপর কি বারাণ্ডাতেই আছেন, কখন হাসচেন, কখন টাকার তোড়া নিয়ে ইসাবা করে দেখাচ্চেন, এ ভিন্ন মোসাহেবদেবও নিস্তাব নাই, তাঁরা যত দিন তাঁরে বাবুব কাছে না আনতে পার্ব্বেন, ততদিন মহাদায়গ্রস্ত হযে থাক্‌তে হবে, হয ত সে কালেব নবাবদের মত "জান বাচ্চা এক গাড়" হবার হুকুম হয়েচে। ক্রমে কলে কৌশলে সেই সাধ্বী স্ত্রী বা কুমারীর ধর্ম্ম নষ্ট করে শেষে তাড়িয়ে দেওয়া হবে—তখন বাজারে কসব কবাই তাব অনন্যগতি হয়ে পড়ে। শুধু এই নয়; সহরের বড়মানুষরা অনেকে এমনি লম্পট যে, স্ত্রী ও রক্ষিত মেয়েমানুষ ভোগেও সন্তুষ্ট নন, তাতেও সেই নরাধম রাক্ষসদের কামক্ষুধাব নিবৃত্তি হয না—শেষে ভগ্নি ভাগ্নি—বউ ও বাড়িব যুবতী মাত্রেই তাঁর ভোগে লাগে—এতে কত সতী আত্মহত্যা কবে বিষ খেয়ে এই মহাপাপীদেব হাত এড়িয়েচে। আমবা বেশ জানি, অনেক বড়মানুষেব বাড়ি মাসে একটি কবে ভ্রূণহত্যা হয় ও রক্তকম্বলের শিকড়, চিতের ডাল ও করবীর ছালেব নুন তেলেব মত উঠ্‌নো ববাদ্দ আছে। যেখানে হিন্দুধর্ম্মের অধিক ভড়ং, যেখানে দলাদলির অধিক ঘোঁট, ও ভদ্রলোকেব অধিক কুৎসা, প্রায সেখানেই ভেতরবাগে উদোম এলো কিন্তু বাইবে পাদে গেরো!

হায়! যাদেব জন্মগ্রহণে বঙ্গভূমিব দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা যায, যাবা প্রভূত ধনেব অধিপতি হযে স্বজাতি সমাজ ওবঙ্গভূমিব মঙ্গলের জন্য কায়মনে যত্ন নেবে, না সেই মহাপুরুষবাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপেব আকব হযে বসে রইলেন, এর বাড়া আর আক্ষেপেব বিষয় কি আছে? আজ এক শ বৎসর অতীত হলো, ইংরেজরা এ দেশে এসেচেন, কিন্তু আমাদেব অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হয়েছে? সেই নবাবী আমলের বড়মানুষী কেতা, সেই পাকানো কাছা, সেই কোঁচানো চাদর, লপেটা জুতো ও বাবরি চুল আজও দেখা যাচ্চে, বরং গৃহস্থ মধ্যস্থ লোকের মধ্যে পরিবর্ত্তন দেখা যায়, কিন্তু আমাদের হুজুরেরা যেমন তেমনিই রয়েচেন! আমাদের ভরসা ছিল, কেউ হঠাৎ বড়মানুষ হলে রিফাইণ্ড গোছেব বড়মানুষীব নজির হবে কিন্তু পদ্মলোচনের দৃষ্টান্তে আমাদের সে আশা সমূলে নির্ম্মূল হয়ে গেল—পদ্মলোচন আবার কফিন চোবের বেটা ম্যাক্‌মারা হয়ে পড়লেন; কফিন চোর, মরা লোকের কাপড় চোপড় চুরি কত্তো মাত্র কিন্তু তার উত্তরাধিকারী মবা লোকের কাপড় চোপড় চুরি করে শেষে—রাঁড় রেখে অবধি পদ্মলোচন স্ত্রীর সহবাস পরিত্যাগ কল্লেন, স্ত্রী চরে খেতে লাগলেন, পূর্ব্ব সহবাস বা তাঁর হাতযশে পদ্মলোচনের গুটি চার ছেলে হয়েছিল; ক্রমে জ্যেষ্ঠটি বড় হয়ে উঠ্‌লো সুতরাং তাঁর বিবাহে বিলক্ষণ ধূমধাম হবার পরামর্শ হতে লাগলো।

ক্রমে বড়বাবুর বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগলো, ঘটক ও ঘটকীরা বাড়ি বাড়ি মেয়ে দেখে বেড়াতে লাগলেন— "কুলীনের মেয়ে, দেখতে পরমা সুন্দরী হবে, দশ টাকা যোত্তোর থাক্‌বে" এমনটি শীগ্‌গির ফুটে ওঠা সোজা কথা নয়; শেষে অনেক বাছা গোছা ও দেখা শোনার পর সহরের আগড়োম ভোঁম সিঙ্গির লেনের আত্মারাম মিত্তিরের পৌত্তুরীরই ফুল ফুটলো। আত্মারাম বাবু খাস হিঁদু, কাপ্তেনির কর্ম্মে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করেছিলেন, আত্মারাম বাবুর সংসারও রাবণের সংসার বল্লে হয়—সাত সাতটি রোজগেরে বেটা, পরীর মত পাঁচ মেয়ে আর গড়ে গুটি চল্লিশে পৌত্তুর পৌত্তুরী, এ সওয়ায় ভাগ্নে জামাই কুটুম্ব-সাক্ষাৎ বাড়িতে গিজগিজ করে—সুতরাং সর্ব্বগুণাক্রান্ত আত্মারাম

পদ্মলোচনের বেয়াই হবার উপযুক্ত স্থির হলেন; শুভ লগ্নে মহা আড়ম্বর করে লগ্নপত্রে বিবাহের স্থির হলো, দলস্থ সমুদায় ব্রাহ্মণরা মর্য্যাদা মত পত্রের বিদেয় পেলেন, রাজভাট ও ঘটকেরা ধন্যবাদ দিতে দিতে চল্লো; বিয়ের ভারী ধুম। সহরে হুজুক উঠ্‌লো পদ্মলোচন বাবুর ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ—গোপাল মল্লিক ছেলের বিয়েতে খরচ করেছিলেন বটে, কিন্তু এত নয়।

দিন আস্‌চে; দেখতে দেখতেই এসে পড়ে, ক্রমে বিবাহের দিন ঘুনিয়ে এলো—ক্রিয়েবাড়িতে নহবত বসে গেল। অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য্য ও দলস্থদের ঘোঁট বাদান সুরু হলো—ত্রিশ হাজার জোড়া শাল, সোনার লোহা, ও ঢাকাই সাড়িওয়ালা দু লক্ষ সামাজিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত দলে বিতরণ হলো, বড়মানুষদের বাড়িতে শাল ও সোনাওয়ালা লোহা, ঢাকাই কাপড়, গ্যাঁদ্‌ড়া কদ্দক্, গোলাব ও আতর, ও এক এক জোড়া শাল সওগাত পাঠান হলো; কেউ কেউ আদর করে গ্রহণ কল্লেন, কেউ কেউ বলে পাঠালেন যে আমরা ঢুলী বা বাজান্দরে নই যে শাল নেবো। কিন্তু পদ্মলোচন হঠাৎ অবতার হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন সুতরাং সে কথা গ্রাহ্য কল্লেন না। পারিষদ, মোসাহেব ও বিবাহের অধ্যক্ষেরা বলে উঠ্‌লেন— ব্যাটার অদৃষ্টে নেই।

এদিকে বিয়ের বাইনাচ আরম্ভ হলো, কোথাও রূপোর বালা, লাল কাপড়েব তকমা ও উর্দ্দীপরা চাকরেরা ঘুরে বেড়াচ্চে, কোথাও অধ্যক্ষরা গড়ের বাজনা আন্‌বার পবামর্শ কচ্চেন— কোথাও বরের সজ্জা তৈরির জন্য দর্জীরা একমনে কাজ কচ্চে—চার দিকেই হৈ হৈ ও রৈ রৈ শব্দ —বাবুব দেওয়া শালে সহরের রাস্তায় অর্দ্ধেক লোকই লালে লাল হয়ে গেল, ঢুলী ও বাজন্দরেরা তো অনেকের বিয়েতেই পুরানো শাল পেয়ে থাকে কিন্তু পদ্মলোচনের ছেলের বিয়েয় ভদ্দর লোকেও শাল পেয়ে লাল হয়ে গেলেন।

১২ই পৌষ শনিবার বিবাহের লগ্ন স্থির হয়েছিল, আজ ১২ই পৌষ; আজ বিবাহ। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে সহরে টি টি হয়ে গিয়েছিল যে "পদ্মলোচনের ছেলের বিয়ের পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ" সুতরাং বিবাহের দিন বৈকাল হতে রাস্তায় ভয়ানক লোকারণ্য হতে লাগলো, পাহারাওয়ালাবা অতি কষ্টে গাড়ি ঘোড়া চলবার পথ করে দিতে লাগ্‌লো। ক্রমে সন্ধ্যার সময় বর বেরুলো— প্রথমে কাগজের ও অব্বরের হাত ঝাড়, পাঞ্জা ও সিঁড়ি ঝাড়, রাস্তার দু' পাশে চল্লো, ঐ রেশালার আগে আগে দুটি চল্‌তি নবৎ ছিল, তার পেছনে গেট— দালান ও কাগজের পাহাড়—পাহাড়ের ওপর হর পার্ব্বতী, নন্দী, ষাঁড়, ভৃঙ্গী, সাপ ও নানা রকম গাছ—তার পেছনে ঘোড়াপঙ্খী, হাতীপঙ্খী, উটপঙ্খী ও ময়ুরপঙ্খী; পঙ্খীগুলির ওপরে বারো জন করে দাঁড়ি, মেয়ে ও পুরুষ সওদাগর সাজা ও দুটি কবে ঢোল। তার আশে পাশে তক্তানামার ওপর "মগের নাচ" "ফিরিঙ্গীর নাচ" প্রভৃতি নানা প্রকার সাজা সং। তার পশ্চাৎ এক শ ঢোল, চল্লিশটি জগঝম্প ও গুটি ষাইটেক্ ঢাক, মায় রোশন-চৌকি— শানাই, ভোড়ং ও ভেঁপু— তার কিছু অন্তরে এক দল নিমখাসা রকমের চুনোগলির ইংরিজি বাজানা। মধ্যে বাবুর মোসাহেব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পারিষদ, আত্মীয় ও কুটুম্বরা। সকলেরই একরকম শাল, মাথায় রূমাল জড়ান, হাতে এক এক গাছি ইষ্টিক; হঠাৎ বোধ হলো যেন এক কোম্পানি ডিজার্মড্ সেপাই। এই দলের দুই ধারে লাল বনাতের খাসগেলাপ, ও রূপোর ডাণ্ডিতে রেশমের নিশেন ধরা তক্‌মাপরা মুটে ও ক্ষুদে ক্ষুদে ছোঁড়ারা, মধ্যে খোদ বরকর্ত্তা, গুরু, পুরোহিত, বাছালো বাছালো ভুঁড়ে ভুঁড়ে ভট্‌চায্যি ও আত্মীয় অন্তরঙ্গরা; এর পেছনে রাঙ্গামুখো ইংরিজি বাজনা, সাজা সায়েব তুরুকসওয়ার, বরের ইয়ারবক্স, খাস দরওয়ানরা, হেড খান্‌সামা ও রূপোর সুখাসনে বর; সুখাসনখানির চার দিকে মায় বাতি বেললণ্ঠান টাঙ্গান, সামনে রূপোর দশ-ডেলে বসা ঝাড়, দুই পাশে চামরধরা দুটো ছোঁড়া; শেষে বরের তোরঙ্গ, প্যাটরা, বাড়ির পরামাণিক, সোনার দানা গলায় বুড়ি বুড়ি গুটি কত দাসী ও বাজে লোক, তার পেছনে বরযাত্রীর গাড়ির সার— প্রায় সকলগুলির উপরে এক এক চাকর, ডবল বাতি দেওয়া হাতলণ্ঠান ধরে বসে যাচ্চে।

ব্যাণ্ড, ঢাক, ঢোল ও নাগরার শব্দে, লোকের রল্লা ও অধ্যক্ষদের মিছিলের চীৎকারে কল্‌কেতা কাঁপতে লাগ্‌লো, অপর পাড়ার লোকেরা তাড়াতাড়ি ছাতে উঠে মনে কল্লে ওদিকে ভয়ানক আগুন লেগে থাক্‌বে, রাস্তার দুধারি বাড়ির জানালা ও বারাণ্ডা লোকে পুরে গেল, বেশ্যারা "আহা দিব্যি ছেলেটি যেন চাঁদ।" বলে প্রশংসা কত্তে লাগলো, হুতোম প্যাঁচা অন্তরীক্ষ থেকে নক্‌শা নিতে লাগ্‌লেন — ক্রমে বর কনেবাড়ি পৌঁছিল। কন্যাকর্ত্তারা আদর ও সম্ভাষণ করে বরযাত্রোবদের অভ্যর্থনা কল্লেন—পাড়ার মৌতাতী বুড়ো ও বওয়াটে ছোঁড়ারা গ্রামভাটির জন্য বরকর্ত্তাকে ঘিরে দাঁড়ালো—বর সভায় গিয়ে বস্‌লেন, ভাটেরা ছড়া পড়তে লাগ্‌লো, মেয়েরা বারাণ্ডা থেকে উঁকি মাত্তে লাগ্‌লো, ঘটকরা মিত্তির বাবু ও দত্ত বাবুর কুলজী আউড়ে দিলে; মিত্তির বাবু কুলীন সুতরাং বল্লালী রেজেষ্টরীতে তাঁর বংশাবলি রেজেষ্টরী হয়ে আছে, কেবল দত্ত বাবুর বংশাবলিটি বানিয়ে নিতে হয়!

ক্রমে বরযাত্র ও কন্যাযাত্রেরা সাপ্টা জলপান করে বিদেয় হলেন, বর স্ত্রী আচারের জন্য বাড়ির ভিতবে গেলেন। ছাঁদনাতলায় চারটি কলাগাছের মধ্যে আলপনা দিয়ে একটি পিঁড়ে বাখা হয়েছিল, বর চোরের মত হয়ে সেইখানে দাঁড়ালেন, মেয়েরা দাড়া গুয়া পান, বরণডালা, মঙ্গলের ভাঁড়ওয়ালা কুলো ও পিদ্দিম দিয়ে ববণ কল্লেন, শাঁক বাজানো ও উলু উলুর চোটে বাড়ি সরগরম হয়ে উঠ্‌লো, ক্রমে মায় শাশুড়ী এয়োরা সাত বার ববকে প্রদক্ষিণ কল্লেন—শাশুড়ী বরের হাতে মাকু দিয়ে বল্লেন, "হাতে দিলেম মাকু এক বার ভ্যা কর ত বাপু"। বর কলেজ বয়, আড়-চকে এয়োদের পানে তাকাচ্ছিলেন ও মনে মনে লঙ্কা ভাগ কচ্ছিলেন; সুতবাং "মনে মনে কল্লেম" বল্লেন—অমনি শালাজরা কাণ মলে দিলে, শালীবা গালে ঠোনা মাল্লে; শেষে গুড় চাল, তুক্ তাক্ ও ওষুদ বিশুদ ফুকলে, উচ্ছুগ্‌গু করবার জন্য কনেকে দালানে নিয়ে যাওয়া হলো, শাস্ত্রমত মন্ত্র পড়ে কনে উচ্ছুগ্‌গু হলেন, পুরুত ও ভট্টাচার্য্যরা সন্দেশের সরা নিয়ে সল্লেন, বরকে বাসরে নে যাওয়া হলো। বাসরটিতে আমোদের চূড়ান্ত হয়। আমরা তো এত বুড়ো হয়েচি, তবু এখনও বাসরেব আমোদটি মনে পড়লে মুখ দে লাল পড়ে ও আবার বিয়ে কত্তে ইচ্ছে হয়!

ক্রমে বাসরের আমোদের সঙ্গেই কুমুদনাথ অস্ত গেলেন, কমলিনীর হৃদয়বঞ্জন প্রকৃত তেজীয়ান হয়েও যেন তাঁর মানভঞ্জনের জন্যই কোমল ভাব ধারণ করে উদয় হলেন, কমলিনী কামাতুর নাথের তাদৃশ দুর্দ্দশা দেখেই যেন সবোবরের মধ্যে হাসতে লাগ্‌লেন, পাখিরা "ছি ছি কামোন্মত্তদের কিছু মাত্র বাহ্যজ্ঞান থাকে না।" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, বায়ু মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসতে লাগ্‌লেন—দেখে ক্রোধে সূর্যদেব নিজ মূর্ত্তি ধারণ কল্লেন; তাই দেখে পাখিরা ভয়ে দূবদূরান্তরে পালিয়ে গেল—বিয়েবাড়ি বাসি বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগ্‌লো। হলুদ ও তেল মাখিয়ে বরকে কলতলায় কনের সঙ্গে নাওয়ান হলো, বরণডালায় বরণ ও কতক কতক তুক্‌তাকের পর, বর কনের গাটছড়া কিছু ক্ষণের পর খুলে দেওয়া হয়।

এদিকে ক্রমে বরযাত্র ও বরের আত্মীয় কটুম্বরা জুটতে লাগ্‌লেন, বৈকালে পুনরায় সেই রকম মহাসমারোহে বব কনেকে বাড়ি নে যাওয়া হলো, বরের মা বর কনেকে বরণ করে ঘরে তুল্লেন, এক কড়া দুধ দরজার কাছে আগুনের ওপর বসান ছিল, কনেকে সেই দুধের কড়াটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো, "মা। কি দেখ্‌চো? বল যে আমার সংসার উত্‌লে পড়্‌চে দেখচি"। কনেও মনে মনে তাই বল্লেন। এ সওয়ায় পাঁচ গিন্নিতে নানা রকম তুকতাক্ কল্লে পর বর কনে জিরুতে পেলেন, বিয়ে বাড়ির কথঞ্চিৎ গোল চুক্‌লো—ঢুলীরা ধেনো মদ খেয়ে আমোদ কত্তে লাগ্‌লো, অধ্যক্ষরা প্রলয় হিন্দু সুতরাং একটা একটা আগাতোলা দুর্গোমণ্ডা ও এক ঘটি গঙ্গাজল খেয়ে বিছনায় আড় হলেন, বর কনে আলাদা আলাদা শুলেন—আজ একত্রে শুতে নেই, বে বাড়ির বড়গিন্নির মতে আজকের রাত—কালরাত্তির।

শীতকালের রাত্তির শিগ্‌গির যায় না। এক ঘুম, দু' ঘুম, আবার প্রস্রাব করে শুলেও বিলক্ষণ এক

ঘুম হয়; ক্রমে গুড়ুম করে তোপ পড়ে গেল— প্রাতঃস্নানে মেয়েগুলো বক্‌তে বক্‌তে রাস্তা মাথায় করে যাচ্চে— খুড়ো বুড়ো ভট্‌চায্যিরা স্নান করে "মহিম্নঃ পারস্তেঃ" মহিম্নস্তব আওড়াতে আওড়াতে চলেচেন। এদিকে পদ্মলোচন রাঁড়ের বাড়ি হতে বাড়ি এলেন, আজ তাঁর নানা কাজ। পদ্মলোচন প্রত্যহ সাত আটটার সময় বেশ্যালয় থেকে উঠে আসেন, কিন্তু আজ কিছু সকালে আসতে হয়েছিল— সহরের অনেক প্রকৃত হিন্দু বুড়ো দলপতির এক একটি রাঁড় আছে এ কথা আমরা পুর্ব্বেই বলেচি, এদের মধ্যে কেউ কেউ রাত্তির দশটার পর শ্রীমন্দিরে যান, একেবারে সকালবেলা প্রাতঃস্নান করে টিপ তেলক ও ছাপা কেটে, গীতগোবিন্দ ও তসব পরে, হরিনাম কত্তে কত্তে বাড়ি ফেরেন—হঠাৎ লোকে মনে কত্তে পারে শ্রীযুত গঙ্গাস্নান করে এলেন, কেউ কেউ বাড়িতেই প্রিয়তমাকে আনান, সমস্ত রাত্তির অতিবাহিত হলে ভোরের সময় বিদেয় দিয়ে স্নান করে পূজো কত্তে বসেন—যেন বাত্তিত্তের তিনি নন—পদ্মলোচনও সেই চাল ধরেছিলেন।

ক্রমে আত্মীয় কুটম্বেরাও এসে জমলেন—মোসাহেবরা "হুজুর! কল্‌কেতায় অ্যামন বিযে হয়নি, হবে না।" বলে বাবুর ল্যাজ ফোলাতে লাগ্‌লেন। ক্রমে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ফুলশয্যাব তত্ত্ব এলো, পদ্মলোচন মহাসমাদরে কনের বাড়ির চাকর চাকরাণীদের অভ্যর্থনা কল্লেন, প্রত্যেককে একটি করে টাকা ও একখানি করে কাপড় বিদেয দিলেন। দলস্থ ও আত্মীয়বা কিছু কিছু কবে অংশ পেলেন, ঢাকী ঢুলী ও রেশালাব লোকেরা বক্‌সিস পেয়ে বিদেয় হলো; মহাসমাবোহে পাঁচ লক্ষ টাকার বিবাহ শেষ হয়ে গেল; কোন কোন বাড়ির গিন্নিরা সামিগ্রী পেয়ে হাঁড়ি পুরে পুরে শিকেয টাঙ্গিযে বাখলেন, অধিক অংশ পচে গেল, কতক বেরালে ও ইঁদুরে খেযে গেল, তবু পেট ভরে খাওয়া কি কারেও বুক বেঁধে দিতে পাল্লেন না—বড়মানুষদেব বাড়ির গিন্নিরা প্রাযই এই বকম হয়ে থাকেন, ঘবে জিনিস পচে গেলেও লোককে হাত তুলে দিতে মায়া হয়। শেযে পচে গেলে মহাবাণীর খানায ফেলে দেওয়া হবে সেও ভাল। কোন কোন বাবুরও এ স্বভাবটি আছে—সহবেব এক বড়মান্‌যেব বাড়িতে পূজার সময় নবমীর দিন গুটি ষাইটেক পাঁঠা বলিদান হয়ে থাকে; পূর্ব্বপরম্পবায সেগুলি সেই দিনেই দলস্থ ও আত্মীয়দের বাড়ি বিতরিত হয়ে আসচে, কিন্তু আজকাল সেই পাঁঠাগুলি নবমীব দিন বলিদান হলেই গুদোমজাত হয়; পূজোর গোঁল চুকে গেলে পূর্ণিমার পর সেইগুলি বাড়ি বাড়ি বিতরণ হয়ে থাকে; সুতরাং ছয় সাত দিনের মবা পচা পাঁঠা কেমন উপাদেয়, তা পাঠক! আপনিই বিবেচনা করুন। শেষে গ্রহীতাদের সেই পাঁঠা বিদেয় কত্তে ঘব হতে পয়সা বার কত্তে হয। আমবা যে পুর্ব্বে আপনাদেব কাচে সহরের সর্দ্দার মূর্খের গল্প করেচি, ইনিই তিনি।

এদিকে ক্রমে বিবাহের গোল চুকে গেল, পদ্মলোচন বিষয কর্ম্ম কত্তে লাগলেন। তিনি নিত্য নৈমিত্তিক দোল, দুর্গোৎসব, প্রভৃতি বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ ফাঁক দিতেন না; ঘেঁটুপুজোতেও চিনির নৈবিদ্দি ও সকের যাত্রা বরাদ্দ ছিল ও আপনার বাড়িতে যে রকম ধুম করে পূজো আচ্ছা কত্তেন, রক্ষিত মেয়েমানুষ ও অনুগত দশ বারো জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদেরো তেমনি ধুমে পূজো করাতেন। নিজের ছেলের বিবাহের সময় তিনি আগে চল্লিশ জন আইবুড়ো বংশজের বিবাহ দিয়ে দেন। ইংরিজি লেখাপড়ার প্রাদুর্ভাবে, রামমোহন রায়ের জন্মগ্রহণে ও সত্যের জ্যোতিতে হিন্দুধর্ম্মের যে কিছু দুরবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তিনি কায়মনে পুনরায় তার অপনয়নে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু তিনি, কি তাঁর ছেলেরা দেশের ভালোর জন্য এক দিনও উদ্যত হন নি—শুভ কর্ম্মে দান দেওয়া দূরে থাকুক, সে বৎসরের উত্তর পশ্চিমের ভয়ানক দুর্ভিক্ষেও কিছু মাত্র সাহায্য করেন নি, বরং দেশের ভালো করবার জন্য কেউ কোন প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হলে তারে কৃশ্চান ও নাস্তিক বলে তাড়িয়ে দিতেন— এক শ বেলেল্লা বামুন ও দুই শ মোসাহেব তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হতো—তাতেই পদ্মলোচনের বংশ মহান্ পবিত্র বলে সহরে বিখ্যাত ছিল। লেখাপড়া শেখা বা তার উৎসাহ দেওয়া পদ্ধতি পদ্মলোচনের বংশে ছিল না, সুদ্ধ নামটা সই কত্তে পাল্লেই বিষয় রক্ষা হবে, এই তাঁদের বংশপরম্পরার স্থির সংস্কার

ছিল। সরস্বতী ও সাহিত্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে ঐ বংশের সম্পর্ক রাখতেন না। উনবিংশতি শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের জন্য সহরে কোন বড়মানুষ তাঁর মত পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই। যে রকম কাল পড়েছে, তাতে আর কেউ যে তাদৃক্ যত্নবান হন, তারো সম্ভাবনা নাই। তিনি যেমন হিন্দুধর্ম্মের বাহ্যিক গোঁড়া ছিলেন, অন্যান্য সৎকর্ম্মেও তাঁর তেমনি বিদ্বেষ ছিল; বিধবাবিবাহের নাম শুনলে তিনি কাণে হাত দিতেন—ইংরিজি পড়লে পাছে খানা খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরিজি পড়ান নি—অথচ বিদ্দেসাগরের উপর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানও হয়ে ওঠে নাই—বিশেষতঃ শূদ্রের সংস্কৃততে অধিকার নাই এটিও তাঁর জানা ছিল, সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলিও "বাপ্‌কা বেটা—সেপাইকা ঘোড়া"র দলেই পড়ে।

কিছু দিন এই রকম অদৃষ্টচর লীলা প্রকাশ করে আশী বৎসর বয়সে পদ্মলোচন দেহ পরিত্যাগ কল্লেন—মৃত্যুর দশ দিন পূর্ব্বে এক দিন হঠাৎ অবতারের সর্ব্বাঙ্গ বেদনা করে। সেই বেদনাই ক্রমে বলবতী হয়ে তাঁরে শয্যাগত কল্লে—তিনি প্রকৃত হিন্দু, সুতরাং ডাক্তারি চিকিৎসায় ভারি দ্বেষ কত্তেন, বিশেষতঃ তাঁর ছেলেবেলা পর্য্যন্ত সংস্কার ছিল ডাক্তারি ওযুধ মাত্রেই মদ মেশান, সুতরাং বিখ্যাত বিখ্যাত কবিরাজ মশাইদের দ্বারা নানা প্রকার চিকিৎসা করান হয় কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, শেষে আত্মীয়রা কবিরাজ মশাইদের সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রীশ্রী৺ভাগীরথীতটস্থ কল্লেন; সেখানে তিনি রাত্তির বাস করে মহাসমারোহে প্রায়শ্চিত্তের পর সজ্ঞানে রাম ও হরিনাম জপ কত্তে কত্তে প্রাণত্যাগ করেন।

পাঠকগণ! আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে বহুদূর এসেছেন। যে পদ্মলোচন আপনাদের সম্মুখে জন্মালেন আবার মলেন, তাঁর সুদ্ধ নিজের চরিত্র আপনারা অবগত হলেন এমন নয়, সহরের বড়মানুষদের মধ্যে অনেকেই পদ্মলোচনের জুড়িদার, কেউ কেউ দাদা হতেও সরেস! যে দেশের বড়লোকের চরিত্র এই রকম ভয়ানক, এই রকম বিষময়, সে দেশের উন্নতির প্রার্থনা করা, নিরর্থক! যাঁদের হাতে উন্নতি হবে, তাঁরা আজও পশু হতেও অপকৃষ্ট ব্যবহারের সর্ব্বদাই পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাঁরা যে সকল দুষ্কর্ম্ম করেন, তার যথারূপ শাস্তি নরকেও দুষ্প্রাপ্য।

জন্মভূমি-হিতচিকীর্ষুরা আগে এই সকল মহা পুরুষদের চরিত্র সংশোধন করবার যত্ন পান, তখন দেশের অবস্থায় দৃষ্টি করবেন, নতুবা বঙ্গদেশের যা কিছু উন্নতি প্রার্থনায় যত্ন নেবেন, সকলই নিরর্থক হবে।

আলালের ঘরের দুলাল লেখক—বাবু টেকচাঁদ ঠাকুর বলেন "সহরের মাতাল বহুরূপী" কিন্তু আমরা বলি, সহরের বড়মানুষরা নানারূপী—এক এক বাবু এক এক তরো, আমরা চড়কের নক্‌শায় সেগুলির প্রায়ই গড়ে বর্ণন করেচি, এখন ক্রমশ তারই সবিস্তার বর্ণন করা যাবে—তারি প্রথম উঁচু দল খাস হিন্দু; এই হঠাৎ অবতারের নক্‌শাতেই আপনারা সেই উঁচু-কেতার খাস হিন্দু দলের চরিত্র জানতে পার্ব্বেন—এই মহাপুরুষেরাই রিফর্ম্মেশনের প্রবল প্রতিবাদী—বঙ্গসুখসৌভাগ্যের প্রলয় কণ্টক ও সমাজের কীট।

হঠাৎ অবতারের প্রস্তাবে পাঠকদের নিকট আমরাও কথঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়ে নিয়েছি; আমরা ক্রমে আরো যত ঘনিষ্ঠ হবো, ততই রং ও নক্‌শার মাজে মাজে সং সেজে আস্‌বো—আপনারা যত পারেন হাততালি দেবেন ও হাসবেন।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' ১৮৬২

ল লি ত - সৌ দা মি নী

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ষোড়শী কুলীনকুমারী সৌদামিনী এক দিবস অপরাহ্নে বিরলে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। প্রফুল্ল শতদল সদৃশ মুখখানি প্রতিভাশূন্য দেখাইতেছে—চক্ষুর পক্ষ্মাগ্রভাগে গুটি দুই অশ্রুবিন্দু মুক্তাফলেব ন্যায় ঝুলিতেছে—নিবিড় কৃষ্ণ কুঞ্চিত কুন্তলজাল নিতম্ব ঝাঁপিয়া পড়িয়া মেঘমালার ন্যায় শোভা সম্পাদন করিতেছে—তপ্তকাঞ্চননিভ উজ্জ্বল গৌরকান্তি বিদ্যুৎপ্রভা বিকীর্ণ করিতেছে। সৌদামিনী অবনতমস্তকে রোদন করিতেছেন। এমন সময় অনতিদূরস্থ পদধ্বনি সৌদামিনীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সৌদামিনী চমকিয়া কক্ষ দ্বারাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন তাঁহার মাতা সাবিত্রীসুন্দরী আসিতেছেন। সৌদামিনী ত্রস্ত হইয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলেন এবং একটি সূচিকা গ্রহণ করিয়া শেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন। সাবিত্রী গৃহে প্রবেশ করিয়া চতুর্দিক অবলোকন পূর্বক সৌদামিনীর নিকট গিয়া বসিলেন। সৌদামিনী মুখ তুলিয়া দেখিলেন না। শেলাই করিতেই লাগিলেন—যেন তিনি এতক্ষণ অনবরতই সূচীকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সাবিত্রী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সুদাম! চুপ ক'রে বসে আছিস কেন?"

সৌদামিনী মুখ তুলিয়া একটু হাসিলেন, ভাবিলেন একটু হাসিলে সাবিত্রী তাঁহাব মনোগত ভাব বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু ইঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হইল। সাবিত্রী তাঁহাব মুখে স্পষ্ট বিষণ্ণতার চিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া সাদরে পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "আজ তোর কি হয়েছে? অমন কচ্ছিস্ কেন?"

সৌদামিনী মুখ তুলিয়া পুনরায় হাসিতে গেলেন। কিন্তু আশানুরূপ কৃতকার্য হইলেন না। হাসির সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষু দিয়া দুটি ধারা বহিল। রৌদ্রবৃষ্টি এককালে হইল। ভাবুক যদি দেখিত, তাহার ভাবসিন্ধু উছলিয়া উঠিত।

সাবিত্রী সৌদামিনীর চিবুকে নিজহস্ত সংলগ্ন কবিয়া কহিলেন, "ভেবে কি কববে বাছা, অদৃষ্টে যা আছে তা হবেই। প্রজাপতির নির্বন্ধ কি কেউ খণ্ডাতে পাবে?"

মাতার সকরুণ কথায় সৌদামিনী পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবল বেগে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সৌদামিনী কুলীনকন্যা। জন্মাবধিই মাতামহালয়ে বাস। তাঁহার পিতাব ৪টি বিবাহ। তন্মধ্যে এক স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম হইয়াছিল। অপর তিনটির—দুইটির সন্তানাদি হয় নাই। সৌদামিনী তাঁহার মাতাব একমাত্র সন্তান। তাঁহার পিতার নাম বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বামনদাস, যে স্ত্রীটির গর্ভে একটি পুত্র ও কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহাকে লইয়াই ঘরসংসার করিতেন। অপর তিনটির তত্ত্ব তল্লাস লইতেন না। ক্রমে সৌদামিনী বিবাহযোগ্যা হইলে তাঁহার মাতুল বামনদাসের নিকট পাত্রানুসন্ধান করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। বামনদাস সে পত্রে মনোযোগ করিলেন না। ভাবিলেন, সৌদামিনীকে সৎপাত্রে সমর্পণ করা তাঁহার মাতুলের অবশ্য কর্তব্য। বস্তুতঃ সৌদামিনীর মাতুল পত্র লিখিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনিও নিজে পাত্রানুন্ধান কবিতে লাগিলেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলেন—বামনদাসের স্বঘরের পাত্র পাইলেন না।

এমন সময় এক দিবস সাবিত্রী হঠাৎ একটি বালককে দেখিতে পাইলেন। বালকটির বয়স আনুমানিক দ্বাবিংশতি বৎসর, নাম ললিতমোহন। সৌদামিনীর মাতুলের বাটির নিকট এক বাটিতে ললিতের ভগিনীপতি দুশ্চিকিৎস্য চক্ষুরোগাক্রান্ত হইয়া কালেজের ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করিবার মানসে আসিয়া বাসা করিয়াছিলেন। ললিত হিন্দুকালেজে পড়িতেন এবং সর্বদাই আসিয়া ভগিনী ও ভগিনীপতিকে দেখিয়া যাইতেন। সাবিত্রী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকেই জামাতা করিবেন মনে মনে স্থির করিলেন।

সাবিত্রী ললিতের কথা নিজ ভ্রাতার নিকট বলিলেন। তাঁহার ভ্রাতার নাম দিগম্বর। দিগম্বর অনন্তর ললিতের কুলশীলের পরিচয় গ্রহণ করিলেন। পরিচয়ে জানিতে পারলেন ললিত বংশজ। দিগম্বরের হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। পাত্রটি দেখিতে শুনিতে ও বিদ্যা বুদ্ধি সর্বাংশেই উৎকৃষ্ট। কিন্তু বংশজকে কি প্রকারে নৈকোষ্য কুলীনের কন্যা দান করেন?

সাবিত্রী ললিতকে প্রথমতঃ যে প্রকারে দেখেন, সৌদামিনীও সেইরূপে এক দিবস ললিতকে দেখিতে পাইলেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের বাটির জানালায় বসিয়া আছেন, এমন সময় ললিত তাঁহার ভগিনীপতিকে দেখিতে আইলেন, ললিতকে দেখিবামাত্রই সৌদামিনীর মন প্রাণ ললিতের প্রতি আকৃষ্ট হইল। প্রণয় চিরকালই এরূপে আরম্ভ হয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া, —স্বভাব বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া কাহার কোন্ কালে প্রণয় হইয়া থাকে? বারুদ অগ্নিস্পর্শ মাত্রেই যে রূপ প্রজ্বলিত হয়, কাষ্ঠাদির ন্যায় রহিয়া রহিয়া জ্বলে না, সেইরূপ প্রণয দর্শন মাত্রেই হয, অল্পে অল্পে কখনও প্রণয়ের উৎপত্তি হয় না।

রোগী বিশ্রাম লাভার্থে যতই শয্যায় এ পাশ ও পাশ ফিরিতে থাকে ততই তাহার নিদ্রা দূর হয়, সেইরূপ যে ভালো বাসিয়াছে সে যতই নিজ মনের ভাব গোপন করিতে চায় ততই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। অল্পদিনের মধ্যেই সাবিত্রী সৌদামিনীর মনের ভাব অবগত হইতে পারিলেন। কিন্তু ললিত বংশজকুলোদ্ভব, সৌদামিনীর সহিত তাঁহার পরিণয় অসম্ভব, জানিতে পারিয়া সাবিত্রী নিজ তনয়াকে নানা প্রকারে উপদেশ দিয়া ললিতের চিন্তা দূর করিতে কহিলেন। সৌদামিনীকে আর জানালায় বসিতে দেন না। তাঁহাকে নিষ্কর্মা দেখিলে অমনি কোনো না কোনো কার্যে নিয়োজিত করেন। কিন্তু প্লাবনের জল কার সাধ্য হঠাৎ শুখায, সৌদামিনী একাকিনী হইলেই বসিয়া বসিযা অনবরত ললিতের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, এবং কেহ কোথায না থাকিলে অমনি গিয়া জানালায় বসিতেন।

ললিতের ভগিনীপতিকে এক্ষণে ললিত প্রত্যহই দেখিতে আইসেন। পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে। কিন্তু ললিতের আসার ক্ষান্ত না হইয়া বৃদ্ধি হইতেছে। এক দিবস ললিত ভগিনীপতিকে দেখিয়া পুনরায় নিজ বাসে গমন করিয়াছেন। যতক্ষণ ললিত ছিলেন সৌদামিনী তাঁহাকে অনিমিষ লোচনে নিরীক্ষণ করিলেন। ললিত চলিযা গেলে ঘবের মেঝের উপর বসিযা ললিতের চিন্তা করিতে লাগিলেন। চক্ষু দিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে দুই এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইতেছিল। এইরূপ সময়ে সাবিত্রী অনেক্ষণ তনয়াকে না দেখিতে পাইয়া যে ঘরে সৌদামিনী বসিয়াছিলেন, সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন এবং এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভোক্ত সান্ত্বনা বাক্যগুলি তনয়াকে প্রয়োগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষ একবার মস্তিষ্কে উঠিলে আর তাহার চিকিৎসা করা বৃথা। তখন সে অসাধ্য হইয়া পড়ে। সৌদামিনীকে উপদেশ বাক্য, এক্ষণে সেই অবাধ্য রোগে ঔষধ প্রয়োগের ন্যায় হইয়াছিল। সৌদামিনী মাতার কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনেন ও তদনুরূপ কার্যানুষ্ঠান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন কিন্তু সকলি বৃথা হইয়া পড়ে। তাঁহার মন আর আত্মবশে নাই। বহতা নদীকে পথান্তর খনন করিয়া অনায়াসে সেই নূতন পথে লইয়া যাওয়া যায়; কিন্তু তাহার প্রবাহ কেহ একেবারে বন্ধ করিতে পারে না। সৌদামিনীকে বোধ হয় পাত্রান্তরে বিমুগ্ধমনা করা যাইতে পারিত কিন্তু তাহার মাতা সে চেষ্টা করেন নাই। তিনি একেবারে তাঁহাকে চিন্তাশূন্য করিবার যত্ন করিয়াছিলেন। প্রবাহকে একেবারে শুষ্ক করিবেন মানস করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে নিষ্ফল প্রয়াস হইবেন তাহার আর বিচিত্র কি?

সাবিত্রী যখন দেখিলেন যে তাঁহার সমুদয় যত্ন বিফল হইল তখন তিনি তদীয় ভ্রাতাকে পুনরায় ললিতের কথা কহিলেন। ললিত সর্বাংশে সুপাত্র; কিন্তু তাঁহার সহিত সৌদামিনীর বিবাহ দিলে বামনদাসের কুল থাকিবে না। তাহাতে সাবিত্রীর কি ক্ষতি? সাবিত্রীর পুত্র সন্তান নাই যে তাহার কুল থাকিবে না। সপত্নিপুত্রের কুল থাকিলেও সাবিত্রীর কোনো লাভ নাই, গেলেও কোনো দুঃখ নাই।

দিগম্বর শুনিয়া ভগিনীকে বিস্তর বুঝাইলেন। কহিলেন "কুলীনের কুল নষ্ট করা মহাপাপ, তাহাতে যত্নবান্ হওয়াও উচিত নয়।" সাবিত্রী উত্তর করিলেন, "তোমরা যদি সত্বর সৌদামিনীর বিবাহ না দাও, তবে আমি ললিতের সহিত তাহার বিবাহ দিব। আমি কাহারো কথা শুনিব না।"

দিগম্বর উত্তর করিলেন, "দিদি! আর দশ দিন কাল বিলম্ব কর। যদি এত দিন গিয়াছে তবে আর দশ দিনে কি হবে? আমি একখানা পত্র লিখি, দেখি কি জবাব পাই।"

সাবিত্রী কহিলেন, "তবে পত্র লেখ। কিন্তু আমি এগারো দিনের দিন বিবাহ দেব, তাব আব ভুল নাই। আমি আর কাহাকে জানাবও না, দিন ক্ষণও দেখিব না।"

দিগম্বর উত্তর করিলেন, "আচ্ছা, দশ দিনই যাউক তারপর তোমার যা খুশি তাই করো। আমি আজই পত্র লিখিব। দশ দিনের মধ্যে অবশ্যই পত্রের উত্তর পাইব।"

ললিতকে দেখিয়া সৌদামিনীর যেরূপ মন হইয়াছিল, সৌদামিনী দর্শনেও ললিতের সেইরূপ হইয়াছিল। দুই এক দিবস ভাবিলেন সৌদামিনী লালসা আমার পক্ষে বামনেব প্রাংশুলভ্য ফল লালসাব ন্যায়। কিন্তু যখন সাবিত্রী নিজেই সেই কথাব উত্থাপন করিলেন, তখন আর ললিতের পক্ষে সে আশা দুরাশা বলিয়া বোধ হইল না। যে আগুন ললিত ইচ্ছা পূর্ব্বক অনায়াসেই নির্বাপিত করিতে পারিতেন, সাবিত্রী বায়ু স্বরূপ হইয়া সেই অগ্নিকে দিন দিন প্রবল করিয়া তুলিলেন। ললিত পূর্বে পূর্বে দুই তিন দিনে একবার আসিতেন, কিন্তু এক্ষণে প্রত্যহই আসিতে আরম্ভ করিলেন। ললিতেব ভগিনী নিষেধ করিবেন ভাবিলেন, কিন্তু লজ্জায় ভ্রাতার নিকট ও বিষয়ে কথা কহিতে পারিলেন না। ললিতের ভগিনীপতি সমস্ত দিবস একাকী থাকিতেন। চক্ষু রোগ নিবন্ধন পড়াশুনা কবিয়া কালক্ষেপ কবিতে পারিতেন না। তাঁহার নিকটে কেহ বসিয়া কথোপকথন করিলে তিনি যাব পর নাই শান্তি প্রাপ্ত হন। সুতরাং তিনি, যাহাতে ললিত পূর্বাপেক্ষাও ঘন ঘন আইসে তাহাব চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। সঙ্ক্ষেপতঃ ললিতকে কেহ কোনো উপদেশ দিল না, কেহ তাঁহাকে স্বরূপ দেখিতে সাহায্য করিল না। ললিতের পড়াশুনা বন্ধ হইয়া গেল। বাসায় থাকিলে কতক্ষণে ভগিনীপতিকে দেখিতে আসিবেন ভাবেন। ভগিনীপতিকে দেখিতে আসিলে আবার, পুনরায় বাসায় প্রত্যাগমন কবিতে হইবেক এই ভাবনায় সন্তাপিত হন। সাবিত্রী ক্রমাগত ললিতের উৎসাহই বর্ষণ কবিয়া আসিতেছেন, এক দিনের জন্যও এমন কথা বলেন নাই যে, বিবাহ না হইলেও হইতে পাবে। কিন্তু সৌদামিনীকে কখনই উৎসাহের কথা কহেন নাই। তাহাকে অনবরতই এ বিবাহ যে সম্ভবপর নহে তাহাই বুঝাইয়া দিবাব চেষ্টা করিতেন।

সকলে এই ভাবে অবস্থিত আছেন এমত সময়ে দিগম্বর নিজ ভগিনীপতিকে পত্র লিখিলেন। দশ দিবসের মধ্যেই পত্রের উত্তর আইল। বামনদাস সানুনয়ে অন্তত আর এক মাস অপেক্ষা করিতে লিখিয়াছেন। বলিয়াছেন এক মাসের মধ্যেই উপযুক্ত পাত্র সমভিব্যবহারে লইয়া একেবারে কলিকাতায় পৌঁছিয়া শুভ কর্ম সম্পন্ন করিবেন। দিগম্বর ভগিনীকে পত্রের মর্ম অবগত কবাইয়া সেইরূপ অনুরোধ করিলেন। তখন সাবিত্রী মহা গোলযোগে পড়িলেন। ললিতকে বলিয়া রাখিয়াছেন দশ দিবসের পরেই বিবাহ দিবেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল এত অল্প- সময়ের মধ্যে কোনো রূপেই পত্রেব জবাব আসিবে না। কিন্তু ভাবিয়া আব কি করিবেন? লজ্জাবনত-মুখী হইয়া ললিতের ভগিনীকে পত্রের মর্ম অবগত করাইয়া কহিলেন, "ললিতকে বলো কর্মের সুবিধা হইবেক না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ললিত প্রত্যহ যে সময় ভগিনীপতিকে দেখিতে আসিতেন, অদ্য সে সময় অতিক্রম করিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় ভগিনীপতির বাসায় সমাগত হইলেন। সৌদামিনীর পিতার নিকট পত্র অদ্য দশ দিবস গিয়াছে। অদ্য উত্তর না অসিলে সৌদামিনী তাঁহার হইবেন। ললিত এই ভাবিয়া সমস্ত দিন কাটাইয়া

আসিলেন যে, ভগিনীপতির বাটাতে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকিবেন কিংবা তাহার পরেও দুই চারি দণ্ড অপেক্ষা করিয়া যাইবেন। একেবারে দশম দিবসের শেষ খবর লইয়া যাইবেন। ললিত রাস্তায় ভাবিতে ভাবিতে আসিয়া কম্পিত হৃদয়ে তদীয় ভগিনীপতির দ্বারে আঘাত করিলেন। ললিতের ভগিনী গিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন। ললিতেব ভগিনীর মুখ অদ্য কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ। কিন্তু ললিতের হৃদয় সৌদামিনীময়। তাহাতে তৎকালে অন্য কাহারো স্থান হওয়া অসম্ভব। ললিতের চক্ষে তাঁহার ভগিনীব মুখে কোনো বৈলক্ষণ্য বোধ হইল না। অন্যান্য দিবসের ন্যায় ললিত গিয়া তদীয ভগিনীপতির নিকট উপবেশন করিলেন। অন্যান্য দিবস হয় সাবিত্রী নতুবা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোনো না কোনো লোক তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে। তিনি আসিলেই তাহাদিগেব মুখে দিবসের খবর পাইতেন, কিন্তু অদ্য কেহই তাহার নিকট আসিয়া সংবাদ জানাইল না। ললিত অত্যন্ত চঞ্চল-চিত্ত হইলেন। তাঁহার ভগিনীপতি কথা কহেন কিন্তু তাহা ললিতেব কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হয না। হয় তো ললিতের ভগিনীপতি এক কথা কহিয়া উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন— ললিত কিছুই জানিতেছেন না; অথবা উত্তর দিতেছেন কিন্তু "হাঁ" স্থানে "না" বা "না" স্থানে "হাঁ" বলিতেছেন। ললিতের ভগিনীপতি ললিতের চিত্তচাঞ্চল্য অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইলেন, তিনি তাহার কারণ সম্যক অবগত ছিলেন। কিন্তু কি প্রকারে তিনি ললিতকে কুসংবাদ দিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন; এবং যে বিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল তাহা ত্যাগ করিয়া চুপ কবিযা বসিযা রহিলেন। ললিতও চুপ কবিযা থাকিলেন। সন্ধ্যা হইল, প্রদীপ জ্বালা হইল যে ঘরে ললিত ও তদীয ভগিনীপতি বসিযাছিলেন সেই ঘবে দাসী প্রদীপ দিয়া গেল। হঠাৎ আলোক অবলোকন করিযা ললিত ঘবের চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিলেন। আর কি উপলক্ষে বসিযা থাকিবেন তাহা স্থিব করিতে না পাবিযা ভগিনীপতিকে কহিলেন, "তবে আজ আমি যাই।"

ললিতের ভগিনীপতি উত্তর কবিলেন, "হাঁ, আর আজ থাকিযা কি কবিবে?"

ললিত এই কথা শুনিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তখন ললিতের ভগিনীপতিব যেন হঠাৎ মনে হইল, ললিতকে কোনো কথা কহিতে হইবেক; এজন্য তিনি ললিতকে কহিলেন, "ভালো কথা, ললিত তোমার একটা সংবাদ আছে শুনে যাও।"

ভগিনীপতির কথা শুনিযা ললিতের হৃৎপিণ্ড এরূপ জোবে বক্ষঃস্থলে প্রতিঘাত হইতে লাগিল যে ললিতের বোধ হইল তাঁহাব ভগিনীপতি সে আঘাতেব শব্দ শুনিতে পাইলেন। ললিত যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেইখানেই বসিযা জিজ্ঞাসিলেন, "কি সংবাদ?"

ললিতের ভগিনীপতি কহিলেন, "সৌদামিনীর সহিত তোমার যে বিবাহ হইবাব কথা হইযাছিল তাহার প্রতিবন্ধক পড়িয়াছে। সে বিবাহ হইবেক না।"

ললিত আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "কে কহিল?"

ললিতের ভগিনীপতি উত্তব করিলেন, "সৌদামিনীব মাতা দাসী দ্বারায় সংবাদ পাঠাইয়াছেন। দাসী কহিযা গেল, 'মা লজ্জায় নিজে আসিতে পাবিলেন না; আমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন'।"

ললিত ক্ষণ-কাল মৌনভাবে থাকিযা পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় বিবাহ হবে?"

ললিতের ভগিনীপতি উত্তব করিলেন, "দাসী কহিল সৌদামিনীর পিতা উপযুক্ত পাত্র লইয়া সত্বর কলিকাতায় পৌঁছিয়া নিজ কন্যার বিবাহ দিবেন। তিনি ত্বরায় পৌঁছিবেন।"

ললিতের আর উঠিয়া যাইবার শক্তি রহিল না, কিন্তু তথাপি কহিলেন, "তা আমি জানি। আমি কখন প্রত্যাশা করি নাই যে আমার সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হইবেক। কুলীনের কন্যা আমাকে দিবে কেন? তবে তাঁরাও বলিতেন, আমিও সায় দিতাম।"

ললিতের ভগিনীপতি ললিতের কথায় কোনো উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ললিতও কিয়ৎক্ষণ মৌন ভাবে থাকিয়া তথা হইতে উঠিয়া নিজবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। সে রাত্রি ললিত

কি রূপে অতিবাহিত করিলেন সহজেই অনুভূত হইতে পারে। পর দিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া ললিত পড়াশুনায় মনোনিবেশ করিবেন স্থির করিলেন। পুস্তকাদি খুলিয়া দেখিলেন সমুদায় আবার প্রথম পত্র হইতে আরম্ভ করিতে হইবেক। এদিকে গণনা করিয়া দেখিলেন পরীক্ষার আর অধিক দেরি নাই। সাত পাঁচ ভাবিয়া স্থির করিলেন এ বৎসর পরীক্ষা দিবেন না। তবে কলিকাতায় থাকিবারই বা আবশ্যকতা কি? এইরূপ চিন্তা করিয়া ললিত সেই দিবসই পুস্তকাদি লইয়া বাটী গমন করিলেন। ট্রেন যখন চলিতে আরম্ভ হইল তখন ললিত কত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন তাহা বলা দুঃসাধ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত কলিকাতা অদৃশ্য না হইল ততক্ষণ পশ্চাৎ ভাগ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কলিকাতা অদৃশ্য হইল। ললিত নিজ বস্ত্রে মুখাবরণ পূর্বক অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আশ্রয় বৃক্ষ ভগ্ন হইলে আশ্রিত লতার যেরূপ দুরবস্থা হয়, ললিত বিরহে সৌদামিনীর চিত্ত সেইরূপ হইল। ললিতের সহিত তিনি কখন কথা কন নাই, একত্র উঠা বসা করেন নাই, তথাপি ললিত চলিয়া গেলে তাঁহার হৃদয় শূন্য,গৃহ শূন্য, সমুদয় সংসার শূন্য বোধ হইতে লাগিল। সাবিত্রী এক দিনেব জন্যও সৌদামিনীকে ললিতের সহিত বিবাহ হইবে বলিয়া উৎসাহ দেন নাই, কিন্তু তথাচ সৌদামিনীর চিত্তে এক প্রকার বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার ললিতের সহিত পরিণয় হইবেক। এক্ষণে সেই বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ হইয়া গেল। সৌদামিনী নিজ মনের ভাব গোপন করিবার জন্য যত্ন করিলেন। কিন্তু কোনো রূপে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। পূর্বে যে স্থানে বসিলে ললিতকে দেখিতে পাইতেন সেই স্থানে সর্বদা থাকিতে ভালোবাসিতেন কিন্তু এক্ষণে ভ্রমেও আর সে গৃহে গমন করেন না। সৌদামিনীব মুখের হাসি যেন কোথায় গেল, ভাবিয়া ভাবিয়া বর্ণ মলিন ও শরীর শুষ্ক হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার পিতা লিখিয়াছিলেন এক মাসের মধ্যেই উপযুক্ত পাত্র সমভিব্যাহারে কলিকাতায পৌঁছিবেন। সে এক মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। পাত্র সমভিব্যাহারে আসা দূরে থাকুক তিনি একখানি পত্রও লিখিলেন না। সাবিত্রীও যার পর নাই চিন্তিতা হইলেন। তনায়ার সুখে তাঁহার সুখ, তনয়ার দুঃখে দুঃখ; ভাবনায় সেই তনয়াকে কৃশাঙ্গী দেখিয়া সাবিত্রী সাতিশয় ভাবনা-যুক্ত হইলেন। ললিতকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন সেজন্য এক্ষণে হৃদয় আত্মগ্লানিতে সন্তাপিত হইতে লাগিল। কতবার ললিতকে পত্র লিখিতে উদ্যত হইলেন, কতবার আবার নিরস্ত হইলেন। কি লজ্জায়, যাহাকে একবার বিদায় দিয়াছেন তাঁহাকে পুনরায় আহ্বান করিবেন? এই রূপে যখন তিন মাস অতিবাহিত হইয়া গেল, তখন আর সাবিত্রী থাকিতে পারিলেন না। ললিতকে পত্র লিখিলেন। লিখিলেন যে এবার আর বিবাহ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। তাঁহার আগমন মাত্র প্রতীক্ষা। সৌদামিনীর পিতা যদি রতিপতির ন্যায় রূপবান, বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্বান, কুলে কুলীনের অগ্রগণ্য পাত্রও লইয়া আইসেন, তথাপি সাবিত্রী সৌদামিনীকে ললিতের করে সমর্পণ করিবেন।

সাবিত্রী এই ভাবিয়া ললিতকে এরূপ পত্র লিখিলেন যে যদি তাঁহার সৌদামিনীকে সুখী করিতে না পারি তবে তাঁহার জীবনে ফল কি? কৌলীন্যের অনুরোধে তিনি নিজ স্বামী বর্তমানেও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। তাঁহার তনয়াকে কখনই সে যন্ত্রণা ভোগ করিতে দিবেন না এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া তিনি সৌদামিনীকে কহিলেন, "বাছা আর কেঁদ না, এই ললিতকে পত্র লিখিলাম। ললিত আসিলেই তোমার বিবাহ দিব। আর কাহারও অনুরোধ শুনিব না।"

যে দিবস প্রাতঃকালে সাবিত্রী ললিতকে উল্লিখিতরূপ পত্র লিখিলেন, সেই দিবস সায়ংকালে বামনদাস বন্দোপাধ্যায় হৃষ্টচিত্তে পাত্র সমভিব্যাহারে লইয়া দিগম্বরের বাটীতে উপনীত হইলেন। পাত্রটির নাম রামকানাই চট্টোপাধ্যায়। রামকানাই কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, কৃশ। বয়ঃক্রম আনুমানিক চত্বারিংশৎ বৎসর, মস্তকের কেশ দুটি একটি পাকিতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং সম্মুখের দুইটি দন্ত

পড়িয়া গিয়াছে। এই পাত্র। ইহাই অনুসন্ধান করিতে বামনদাসের তিন মাস অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি দিগম্বরের দ্বিতীয় পত্র পাইবামাত্রেই বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। নানা স্থান অনুসন্ধান করিলেন, কোনোখানেই সুপাত্র, অর্থাৎ তাঁহার সমান ঘরের পাত্র পাইলেন না। পরিশেষে রামকানাইয়েব সহিত সাক্ষাৎ হইল। বিবাহ করা রামকানাইয়ের ব্যবসায়। তিনি ইতিপূর্বে এগারোটি কুলীন কামিনীর আইবড় নাম ঘুচাইয়াছেন। সৌদামিনীকে উদ্ধার করিতে পারিলে দ্বাদশটি হয়। বামনদাস রামকানাইকে পাইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং অন্যান্য কথোপকথনের পর সৌদামিনীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। রামকানাই কহিলেন উপযুক্ত পণ পাইলে বিবাহ করিতে তাঁহার কোনো আপত্তি নাই, তবে এক কথা এই তিনি স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ইহাতে যদি বামনদাস সম্মত হন তবে দিন স্থির করিয়া বলিয়া গেলেই রামকানাই নির্ধারিত দিবসে কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইবেন।

বামনদাস ভাবী জামাতাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাপু তুমি চিরজীবী হও, তোমার ন্যায় সুবুদ্ধি লোক আজকাল মেলা ভার। তুমি যথার্থই কুলীনের মর্যাদা বুঝো, তুমিই যথার্থ কুলীন। তুমি যে সমস্ত কথা কহিলে আমি তৎসমুদায়ে সম্মত আছি। কন্যার ভরণপোষণেব ভাব তোমার লইতে হইবেক না। আমি তাহা ইষ্টম্বরে লিখিয়া দিতে পারি। সে জন্মাবধি মাতামহালয়ে আছে, বিবাহের পরেও সেইখানে থাকিবেক। এখন পণের কথাটা সাব্যস্ত হইলেই হয়।"

রামকানাই উত্তর করিলেন, "পণের কথা পাত্রীর বয়সের উপর নির্ভর করে। কন্যা যতই বয়স্থা হইবেক পণ ততই বেশি লাগিবেক। এ কথা আপনি না জানেন তাহা ত নহে? আপনিও ত কুলীন?"

বামনদাস কহিলেন, "যাহা বলিলে, সত্য। কিন্তু আমার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে পণের কথাটা বলো, আমার কন্যার বয়সও অধিক নহে। যদি বড়ো বেশি হয় তবে চৌদ্দ বৎসর।"

রামকানাই একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "বৎসর পিছু দু'টাকা দিবেন, আপনার নিকট আর অধিক প্রার্থনা করিব না।"

বামনদাস বিস্তর বলিয়া কহিয়া ১৫৲ টাকায় রাজী করিয়া রামকানাইকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়াছেন। সমস্ত পথ ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিলেন শ্বশুর-বাটী গেলে তাঁহার আদরের সীমা থাকিবেক না, কিন্তু সে আশা যে কতদূর ফলবতী হইল তাহা পরে জানা যাইবেক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ললিতের ভগিনীর নাম গিরিবালা। তাঁহার ভগিনীপতির নাম কেশবচন্দ্র। কেশবের চক্ষে ছানি পড়িয়াছিল; সেই ছানি কাটাইবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ছানি কাটিবার উপযুক্ত না হওয়ায় তাঁহাকে অনেক দিবস কলিকাতায় থাকিতে হইল। পরে ছানি কাটিবার যোগ্য হইলে ডাক্তার সাহেব এক চক্ষের ছানি কাটিয়া দিলেন। কহিলেন একটা আরোগ্য হইলে অন্যটা কাটিবেন। ললিত যখন বাটী যান তখন একটি চক্ষু বিলক্ষণ আরোগ্য হইয়াছে। কিন্তু ডাক্তার সাহেব তথাপি পড়াশুনা বা যে কোনো কার্যে অধিক্ষণ চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি প্রয়োজন হয় তাহা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ললিত কলিকাতায় থাকিতে তিনি প্রত্যহই কেশবকে দেখিতে আসিতেন এবং প্রায় সমস্ত দিবস তাঁহার নিকট থাকিয়া কথোপকথন বা তাশ ক্রীড়া করিতেন। কিন্তু ললিত কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গেলে কেশবের পক্ষে একাকী থাকা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিল। তাঁহার স্ত্রী পাক শাক ও অন্যান্য গৃহকার্যে সর্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। কেশবের নিকট বসিয়া কথোপকথন করেন এরূপ অবকাশ পাইতেন না। ললিতের গমনের পর প্রথম দিবস কেশব কোনো রূপে কাটাইয়া দিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিবস আর নিষ্কর্মা থাকিতে পারিলেন না। একখানি পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মনে করিয়াছিলেন দুই এক পৃষ্ঠা পড়িয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন, কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য বশতঃ পুস্তকখানি এতই ভালো লাগিয়াছিল যে তাহা শেষ না করিয়া রাখিতে পারিলেন না। প্রাতঃকালে ৮টা ৯টার সময় আরম্ভ করিয়াছিলেন,

আর রাত্রি ১০টার সময় শেষ হইল। গিরিবালা পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র তাঁহার কথা শুনিলেন না, কহিলেন, "কোনো কষ্ট বোধ হইতেছে না তবে কেন না পড়িব? আর কত কালই বা চক্ষু থাকিতে অন্ধের ন্যায় বসিয়া থাকব?" সঙ্ক্ষেপতঃ কেশব স্ত্রীর নিষেধ শুনিলেন না। পুস্তকখানি এক দিবসেই শেষ করিলেন।

পুস্তক সমাপ্ত করিয়া কেশব হৃষ্টচিত্তে শয়ন করিলেন। কোনোই অসুখ নাই। কিন্তু শেষ রাত্রে চক্ষের বেদনায় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। জাগিয়া দেখিলেন আর চক্ষু মেলিতে পারেন না। কোনো রূপে সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পর দিবস পুনরায় ডাক্তারকে চক্ষু দেখাইলেন। ডাক্তার দেখিয়া কহিলেন, "চক্ষুটি আর পূর্ববৎ হইবেক না। কিন্তু অপর চক্ষুটি অস্ত্র করিলে আরোগ্য হইতে পারে।"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া কেশব রোদন করিতে লাগিলেন। গিরিবালাও তদ্দর্শনে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর ডাক্তার সাহেব দুই চারিটি সান্ত্বনা বাক্য প্রযোগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কেশব রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "এত দিনেব পর অন্ধ হইলাম। আর কিছুই দেখিতে পাইব না। কেনই বা তোমার কথা অবহেলা করিলাম?"

গিরিবালা গাঢ়স্বরে উত্তর করিলেন, "সে কথা ভাবিয়া রোদন করিলে আর কি হইবে? অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা ঘটিয়াছে।"

কেশব উত্তর করিলেন, "না গিরিবালা। তোমার কথা না শুনিয়া আমি যখন যে কার্য কবিযাছি তাহাতেই কোনো না কোনো অনিষ্ট ঘটিযাছে। তুমি মিথ্যা অদৃষ্টকে দোষিতেছ। এ আমাব নিজের দোষ।"

গিরিবালা কেশবের শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অঞ্চল দ্বারা তাঁহার চক্ষু মুছিয়া দিয়া কহিলেন, "অদৃষ্টে লেখা আছে বলেই তুমি আমাব কথা শুন নাই। অদৃষ্টের লিপি কি কাহাবও বারণে বন্ধ হয?"

গিরিবালার কথা শুনিয়া কেশব ক্ষণকাল চুপ করিযা থাকিযা কহিলেন, "গিরিবালা, আমি আর কিছুই দেখিতে পাইব না!"

গিরিবালা রোদন কবিতে কবিতে কহিলেন, "যদি একজনেব চোখ আব একজনকে দেওয়া যাইত তাহা হইলে মাথার উপর ঈশ্বরই জানেন আমার চোখ এখনই তোমাকে দিতাম। কিন্তু তা যেখানে হবার যো নাই সেখানে যাতে একজনেব চোখ দুজনেব হয তাই কবিব। তুমি যেমন আমাবে সব বিষয় বুঝাইয়া দাও আমি তেমনি তোমাকে যা যখন দেখিতে পাই বলিয়া দিব।"

কেশব কহিলেন, "আমার আর এক ভয় হচ্ছে, গিরিবালা, আমি অন্ধ হইলাম, তুমি আর এখন আমাকে ভালোবাসিবে না। কাণা বলিয়া ঘৃণা করিবে।"

গিরিবালা দুই হস্তে কেশবের পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন, "এমন কথা মুখেও এনো না। পূর্বে আমি কখনো কখনো রাগ করিতাম, কখনো কখনো অভিমান করিতাম, কিন্তু এখন আর আমার তাহা কখনই ইচ্ছা হইবে না। আমি দেবতার স্থানে এই ভিক্ষা চাই যেন জন্ম জন্ম তোমার মতন স্বামী পাই।"

কেশব কহিলেন, "সে তুমি ভালোবাসিয়া যা বল। আমার মনের কথা এই, গিরিবালা যে, তোমার ন্যায় পত্নী বুঝি আর পৃথিবীতে নাই।"

গিরিবালা আর কথা কহিতে পারিলেন না। স্বামীর নিকটে বসিয়া উচ্ছ্বাসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বামনদাস কর্তৃক আনীত পাত্র দর্শন করিয়া সাবিত্রী যার পর নাই বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন বামনদাস ললিতের মতন আর একটি পাত্র আনিবেন। রামকানাইয়ের ন্যায় পাত্র আসিবে তাহা স্বপ্নেও জানিতেন না। ললিতের সহিত দেখা হইবার অগ্রে যদি সাবিত্রী বামকানাইকে দেখিতেন, তাহা হইলে

বোধ হয় তাহার প্রতি এত গাঢ় ঘৃণা জন্মিত না। ঘরে বয়স্থা কন্যা, পাত্রও বৃদ্ধ নহে; তাহাদিগের বিবাহ হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু একবার ললিতকে দেখিয়া রামকানাইয়ের ন্যায় পাত্রে কন্যা সমর্পণ করা সাবিত্রীব নিকট কন্যা জলে নিক্ষেপ করার ন্যায় বোধ হইল। ভালো পাইবার সম্ভব থাকিলে মন্দ কে চায়? সাবিত্রী একমাত্র কন্যাকে কেন রামকানাইয়ের করে সমর্পণ করিবেন?

বামনদাস স্বভাবতঃ যে রামকানাইকে কন্যা দান করিতে উৎসুক হইবেন তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু রামকানাই এতাবৎ টাকার জন্যই বিবাহে সম্মত ছিলেন। তিনি কন্যাকে দেখেন নাই। কন্যা সুরূপা তাহা অনুসন্ধান কবিবাব তাঁহার কোনোই প্রয়োজন ছিল না। টাকা মেকি না হইলেই হইল। টাকার্ব জন্যই তাঁহার বিবাহ, কন্যার জন্য নহে। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া সৌদামিনীকে দর্শন করিয়া রামকানাইয়েব চিত্ত পরিবর্তিত হইল; তাঁহাব আব অর্থ স্পৃহা বহিল না। তখন যদি সৌদামিনী লাভার্থ তাঁহার কিঞ্চিৎ ব্যয় হয তাহাও তিনি প্রস্তুত। কিন্তু বিবাহেব ভযানক প্রতিবন্ধক সমুত্থিত হইল। সাবিত্রী কহিলেন তিনি ওরূপ পাত্রে সৌদামিনীকে দান কবিতে দিবেন না। বামনদাস বুঝাইলেন, তোযামোদ কবিলেন, রাগ কবিলেন, সাবিত্রী তাঁহাব কথায কর্ণপাতও করিলেন না।

ভাব ভঙ্গী দেখিয়া রামকানাই বামনদাসকে কহিলেন, "মহাশয! মনের ভাব ভেঙে বলাই ভালো আমি বাড়ি হইতে সকলকে বিবাহ কবিব বলিয়া আসিয়াছি। এমন স্থলে বিবাহ না কবিয়া ফিরিয়া গেলে লোকে ঠাট্টা কবিবে। বিশেষ, মুখে যা বলি কিন্তু আমাব সংসাবে স্ত্রীলোক নাই, বিবাহ করা আমাব আবশ্যক হইতেছে, এমন অবস্থায আমি পূর্বে যে বন্দোবস্ত করিযাছিলাম তাহার অতিরিক্ত আবও স্বীকাব করিতেছি যে, বিবাহ হইলে আমি কন্যা নিজ বাটী লইয়া যাইব।" রামকানাই ভাবিলেন যে পূর্বে তাঁহার কন্যা লইয়া ঘব কবিবাব কথা ছিল না। এক্ষণে তাহা স্বীকাব করিলেন সুতবাং সাবিত্রীর আব অধিক আপত্তি থাকিবেক না ও বামনদাসও বিবাহ পক্ষে অধিকতব প্রয়াস পাইবেন।

বামনদাস কহিলেন, "যদি তোমাকে কন্যা দেয় তবে তো বাটী নিয়ে যা'বে। যে গতিক দেখিতেছি তাঁহাকে অপ্রতিভ হইয়া যাইতে হইবে সেই সম্ভবই অধিক।"

ক্ষণকাল নীববে থাকিয়া বামকানাই পুনবায কহিলেন, "আমাব সংসাবে একটি স্ত্রীলোক নহিলে চলে না। কি কবি যদি পনেবো টাকা হইতে কিছু বাদ দিলে সম্মত হ'ন আমাব তাহাও কর্তব্য।" বামকানাই যেরূপ টাকাব মর্ম বুঝিতেন অমন অতি অল্প লোকেই বুঝে। টাকা তাঁহার শবীবেব শোণিত সদৃশ। সুতবাং কম টাকা লইলে যে সাবিত্রী তাঁহাকে কন্যা দান করিতে পারেন এরূপ ভাবনা তাঁহার পক্ষে বড়ো আশ্চর্যেব ব্যাপার নহে।

বামনদাস স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, রামকানাই কি জন্য কম টাকা লইয়াও বিবাহ কবিতে সম্মত। সুতরাং তিনি বামকানাইকে যে নিবাশ হইয়া যাইতে হইবেক ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। কহিলেন, "ইহারা বড়োমানুষ, ৫। ৭ টাকাব প্রলোভনে ইহাবা যে ভুলিবে তাহা বোধ হয় না।" বামনদাসের মনোগত ইচ্ছা যে বিনা পণে রামকানাই সম্মত হইলেই ভালো হয়। বস্তুত তাহাই ঘটিল। আবার ক্ষণকাল চিন্তা কবিয়া বামকানাই কহিলেন, "আমাব নিতান্ত প্রয়োজন, বিশেষ বিবাহ করিতে আসিয়াছি, না কবিয়া গমন করিলে লোকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবে, অতএব আমি বিনা পণেই এ কর্ম করিতে সম্মত আছি।"

বামনদাসের ইচ্ছানুরূপ কথা হইল। ভাবিলেন সাবিত্রীর যদি পায ধবিতে হয়, তিনি তাহাও ধরিবেন। যদি বিবাহের জন্য অনাহাবে ধন্না দিতে হয়, তাহাও দিবেন। তিনি দেখিলেন এরূপ সুবিধা আর হইবে না। এমন ঘর, এত কম ব্যয়ে আর পাওযা যাইবে না। তাঁহার কুলও এ কর্ম না হইলে আর টিকিবে না। এইরূপ চিন্তা কবিয়া পুনবায় সাবিত্রীকে বুঝাইবার জন্য অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

সাবিত্রী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন—রামকানাইযেব সহিত সৌদামিনীর বিবাহ দিবেন না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা কেহ কখন ভঙ্গ করাইতে পারে নাই। বামনদাসও পারিলেন না। বামনদাস বুঝাইলেন,

রামকানাইয়ের সহিত বিবাহ দিলে টাকা লাগিবে না, কুল বজায় থাকিবে, পাত্র নিতান্ত মন্দ নহে। সাবিত্রী সক্রোধে উত্তর করিলেন, "১৫ টাকা, ভারি টাকা, ভারি সাশ্রয় দেখাইতেছ, ও টাকা আমিই তোমাকে দিচ্ছি, তুমি এখন যেখানে ছিলে সেই খানে যাও।"

বামনদাস কাতরস্বরে কহিলেন, "টাকা যেন দিলে, কুলবজায়ের কি করলে?" সাবিত্রী পূর্ব্ববৎ সরোষে কহিলেন, "আমার কুলের দরকার কি? কুল না থাকিলেই আমার পক্ষে ভালো। বাবা কুলক্রিয়া করিয়াছিলেন বলিয়া আমার যাবজ্জীবনটা দুঃখে গেল। আবাব আমি কুলক্রিয়া কবিয়া সুদামকে চিবকালের জন্যে দুঃখভোগী কবিযা যাইব, তাহা আমি পারিব না।"

বামনদাস ক্ষণকাল নীববে থাকিয়া কহিলেন, "তোমার কিসের দুঃখ হলো? তোমাব কিসের অভাব?"

সাবিত্রীব আর ববদাস্ত হইল না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "কিসেব দুঃখ? কিসেব অভাব? অভাব আর দুঃখ এই যে, তুমি মব না।" এই বলিযা ক্রন্দন করিতে কবিতে তথা হইতে প্রস্থান কবিবাব জন্য গাত্রোত্থান করিলেন।

বামনদাস তাঁহাব অঞ্চলাকর্ষণ কবিযা কহিলেন, "আর একটা কথা শুনে যাও।"

সাবিত্রী উত্তব কবিলেন, "যে শুনতে চায তাকে গিযা বল।" এই বলিযা বলপূর্বক নিজেব অঞ্চল মুক্ত কবিযা তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পবিচ্ছেদ

বামনদাসের আব একটি মাত্র উপায বহিল—অনাহারে ধন্না দেওযা। এক্ষণে সেই উপায় অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়া বহির্বাটী আগমন করিলেন। পাঠকবর্গকে বলা বাহুল্য বামনদাস অধুনাতন ইংরাজি-পরিমার্জিত যুবক নহেন। স্ত্রীকে প্রহার কবা অবিধেয়, তাহা তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না। তাঁহার এই দুঃখ হইতে লাগিল যে সাবিত্রী তাঁহাব আলয়ে নহে। মনে মনে বলিলেন, "আমাব বাটীতে থাকিলে ে.তেব আগে সোজা কবিতাম।" কিন্তু এ স্থানে আর তাহা ভাবিয়া কি করিবেন। মৌনভাবে আসিয়া রামকানাইযেব নিকট উপবেশন করিলেন।

রামকানাই তাঁহাকে বিবসবদন দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কি খবব?" তিনি এতক্ষণ ভাবিতেছিলেন যে একেবারে পণ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া কার্য ভালো হয় নাই, হযত কিঞ্চিৎ কম গ্রহণ করিবেন বলিলেই হইতে পাবিত! হায়! ঘবে লক্ষ্মী আসিতেছিল, তিনি নিজেই তাহাকে বন্ধ করিলেন। কিন্তু বামনদাসকে বিবসবদন দেখিযা চিন্তাদগ্ধচিত্ত অপেক্ষাকৃত শীতল হইল। ভাবিলেন যদি বিনাপণেও কর্ম কবিতে স্বীকাব না হইয়া থাকে তবে আব তিনি পণগ্রহণ কবিবেন না বলায় ক্ষতি হয় নাই।

বামনদাস বামকানাইয়ের কথায় উত্তব না করিয়া যেখানে বসিযাছিলেন সেইখানে শুইয়া পড়িলেন। রামকানাই পুনরায় জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কি খবব?"

বামনদাস কাতরস্বরে কহিলেন, "আর কি খবর? কোনো মতেই স্বীকাব করে না। তার প্রতিজ্ঞা সে আমার কুল নষ্ট কবিবে। আমারও প্রতিজ্ঞা যে যতক্ষণ সে আমাব কথায় স্বীকার না হয় ততক্ষণ আমি অনাহারে এইখানে পড়িয়া থাকিব।"

রামকানাই কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইযা জিজ্ঞাসা কবিলেন, "আমাকেও কি অনাহারে থাকতে হবে?"

বামনদাস কহিলেন "না, তুমি কেন থাকবে?"

অনন্তর স্নানের সময় দিগম্বর বামনদাসকে স্নান করিতে কহিলেন। বামনদাস উত্তর করিলেন, "আমি নাবও না, খাবও না। আমি এইখানে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।" দিগম্বর নানাপ্রকার অনুনয় বিনয় করিলেন, বামনদাস কিছুতেই স্নান কবিলেন না। তখন নিজ ভগিনীর নিকট গিয়া কহিলেন,

"দিদি, যাতে ব্রাহ্মণের কুল বজায় থাকে, তার চেষ্টা কর।" সাবিত্রী সরোষে কহিলেন, "কুল গেলে ত বয়ে গেল, আমি প্রাণ থাকতে অমন বরে কন্যা দিতে পারব না।"

দিগম্বর নিরুপায় হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা তাই হবে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার মতের অন্যথা করব না। তুমি এখন একবার বল যে রামকানাইকে কন্যা দেবে, তাহ'লে আমি বাঁচি, আর আমার দ্বাবে ব্রহ্মহত্যা হয় না।"

সাবিত্রী কহিলেন, "আমি যা বলব, তা করবে?"

দিগম্বর উত্তর করিলেন, "করিব।"

সাবিত্রী। "তবে যা বল্‌লে স্নান আহার কবেন, তাই গিয়ে বল।"

সাবিত্রী কি সংকল্প কবিয়া দিগম্বরকে প্রতিশ্রুত করাইলেন তাহা পরে প্রকাশ হইবে। আপাততঃ বামনদাস আশ্বস্ত হইযা স্নানাহাবে করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্ত্রীলোকের চরিত্র ও পুরুষের অদৃষ্টের কথা মনুষ্য দূবে থাকুক, দেবতারাও বলিতে পারেন না। ললিতের ভগিনী ও ভগিনীপতি এতকাল সদ্‌ভাবে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে কেশবেব চক্ষু গিয়াছে, গিবিবালাব উচিত পূর্বাপেক্ষা তাঁহার অধিক যত্ন করা, কিন্তু কি আশ্চর্য এত কালেব পর তাঁহাদিগেব মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইবাব সম্ভব হইল। বিবাদ আবার একটি দাসীব কথায। দাসীটি বাল্যকালাবধি কেশবেব বাটীতে আছে। কলিকাতায আসিবাব সময় কেশব সেই দাসীটি লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই দাসীটির দ্বারাই সংসারে কাজ কর্ম নির্বাহ হইত। কিন্তু কেশবেব চক্ষু যাওয়া অবধি একটি চাকরের প্রযোজন হইল। সর্বদা তাঁহাকে ডাক্তারখানায় যাইতে হয কিন্তু এক্ষণে চক্ষু না থাকায় নিজে গিয়া গাড়ি ভাড়া করিয়া যাইতে পারেন না। ললিতও কলিকাতায নাই যে তাঁহার দ্বারা এক্ষণে কোনো সাহায্য হইবে। দাসীটি পল্লীগ্রামেব, সুতরাং সে সহবের ভাব ভঙ্গী কিছুই জানে না। এ সমস্ত কারণে একটি চাকব রাখা হইল, কিন্তু দাসী চাকবে একরূপ বিবাদ আবম্ভ হইল যে দাসীটি বহুকালেব হইলেও গিরিবালা তাহাকে বিদায কবিয়া দিলেন।

দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে কেশবের নিকট গমন করিয়া নিজের নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিল কিন্তু যখন দেখিল যে কেশবও তাহাকে রাখিতে সম্মত নহেন তখন বলিয়া গেল, "এতকাল আমি ছিলাম কোনো কথাটি জন্মায় নি, এখন সখেব চাকব আসিয়াছে আর আমাব দরকার নাই। আমি যদি আপনাব মতন কানা হতে পাত্তেম, তবে আমি থাকলে কোনো আপত্তি থাকতো না।" কেশব দাসীব কথা শুনিয়া দূর দূর করিয়া তাহাকে তথা হইতে তৎক্ষণাৎ যাইতে আদেশ কবিলেন।

ক্ষণকাল পবে কেশবের রাগেব সমতা হইলে কেশব ভাবিতে লাগিলেন, এত কালের পর দাসী আজ হঠাৎ একরূপ কথা বলিযা গেল কেন? সে যদি কানা হইত তাহা হইলেই তাহার থাকার কোনো আপত্তি জন্মিত না। ইহার অর্থ আর কি হইতে পাবে? কি ভয়ানক কথা কহিল? হায়, কেন তাহার নিকট সবিশেষ না শুনিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলাম? সন্দেহ একবাব উপস্থিত হইলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয় ভিন্ন কমে না। তুচ্ছ কথা, যাহাতে পূর্বে কর্ণপাতও করিতেন না, এক্ষণে সেগুলি গুরুতর বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। চাকরকে তামাক দিতে কহিলে যদি একটু দেবি হয় তাঁহার অমনি মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়। এইরূপে দিন কতক কাটিয়া গেল। কেশব কাহাকে কিছু স্পষ্ট করিয়া বলেন না। কিন্তু গিরিবালা ও চাকরের প্রতি কথা, প্রতি পদধ্বনি, মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করেন, ও তদ্বিষয়ে তর্ক করেন। কেশব কখন কখন বোধ করেন যে সে সব কিছুই নহে, দাসীর রাগ প্রকাশ মাত্র; আবার সময়ে সময়ে যেন সমুদায় স্পষ্ট দেখিতে পান। কেশবের মন এই ভাবে আছে এমন সময় এক দিবস বহির্দ্বারে

শব্দ হইল। চাকর ইহার পূর্বে বাজারে গিয়াছে সুতরাং গিরিবালা গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। একটি যুবা পুরুষ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া গিরিবালাকে দেখিয়া একটু হাসিল। গিরিবালাও তাহাকে দেখিয়া একটু হাসিলেন। পরক্ষণেই যুবক গিরিবালাকে দরজার আড়ালে ডাকিয়া অস্পষ্ট স্বরে কি কহিল। অনন্তর গিরিবালা নিঃশব্দে দরজা পুনরায় বন্ধ করিয়া, যুবকটিকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ লইয়া, গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গিরিবালা স্বাভাবিক পদধ্বনি করিয়া যাইতে লাগিলেন। যুবক নিঃশব্দে গমন করিল। উভয়ে অন্তঃপুরে যাইতেছেন এমন সময় কেশব গিরিবালাকে ডাকিলেন। গিরিবালা নিকটে গেলে কেশব জিজ্ঞাসিলেন, "কে দুয়ারে না ডাকিতেছিল?" গিরিবালা অম্লানবদনে উত্তর করিলেন, "কেহ না।" কেশব জিজ্ঞাসিলেন, "ফিস্ ফিস্ করে কার সঙ্গে কথা কহিতেছিলে?" গিরিবালা কহিলেন, "কৈ? কার সঙ্গে কথা কহিলাম?" কেশব দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। গিরিবালা কেশবের মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া একটু মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

গিরিবালা! এই কি তোমার উচিত হইল? যে স্বামীকে তুমি দেবতাতুল্য জ্ঞান করিতে আজ তাঁহার চক্ষু গিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে এত হেয়জ্ঞান করিলে?

গিরিবালা স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। আগন্তুক যুবকও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। সে গৃহ হইতে অন্য গৃহে প্রবেশ করিবার সময় যুবকের চর্ম-পাদুকা চৌকাঠে লাগিয়া শব্দ হইল। সেই শব্দ কেশবের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কেশবের মনে হইল যেন তাঁহার হৃদয় পাদুকা দ্বারা আহত হইল। তিনি আবার গিরিবালাকে ডাকিয়া কিসের শব্দ হইল জিজ্ঞাসিলেন। গিরিবালা উত্তর করিলেন, "কৈ শব্দ হলো?"

কেশব আবার মৌনাবলম্বন করিয়া বসিলেন, গিরিবালা যুবকের নিকট গমন করিলেন এবং তাহার সহিত নানাবিধ গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন।

কেশব ভাবিলেন চাকর প্রকাশ্যরূপে বাহির হইয়া গিয়া পুনরায় প্রবেশ করিল, আবার অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া গিয়া পুনরায় প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিবে।

গিরিবালা যুবককে লইয়া অনেকক্ষণ পরে পুনরায় বাহিরে আসিলেন। যুবককে কহিলেন, "এই বেলা যাও। নৈলে প্রকাশ হয়ে পড়বে।" এই বলিয়া যুবককে লইয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দ্বারদেশে গমন করিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। কিন্তু পুনরায় দ্বাররুদ্ধ করিবার সময় শব্দ হইল। কেশব জিজ্ঞাসিলেন, "কে—ও?" গিরিবালা দেখিলেন আর গোপন করা যাইবে না, এজন্য কহিলেন, "চাকর ফিরিয়া আসিল কি না দেখিতে গিয়াছিলাম।" এই কথা বলিতে না বলিতে পুনরায় দ্বারদেশে শব্দ হইল। গিরিবালা গিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। এবার চাকর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া কথা কহিতে কহিতে আসিল। কেশব মনে করিলেন, "এই প্রকাশ্য প্রবেশ করিল।"

নবম পরিচ্ছেদ

সূর্য অস্তমিত হইল। পৃথিবী গাঢ়তিমিরাবৃত হইল। তদপেক্ষা গাঢ়তর তিমির কেশবের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিল। পৃথিবীর সহিত মানব হৃদয়ের এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একতা আছে। অরুণোদয়ে কেবল পৃথিবী হাসেন এরূপ নহে। জীবলোকে সমুদায় সূর্যালোকে প্রফুল্ল হয়। হাজার ভাবনা চিন্তা থাকিলেও রজনী অপেক্ষা দিবাভাগে মন নিরুদ্বেগ থাকে। যামিনী নিজে মলিন, সুতরাং সকলকেই মলিন করিতে পারিলেই যেন ভালো থাকে।

রজনী আগমনে কেশবের হৃদয় যার পর নাই সন্তাপিত হইতে লাগিল। গিরিবালা রন্ধনাদি করিয়া কেশবকে আহার করিতে ডাকিলেন। কেশব ক্ষুধা নাই বলিয়া আহার করিলেন না। অন্যান্য সকলে আহারাদি করিল। চাকর গিয়া নিজস্থানে শয়ন করিল। গিরিবালা স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার গায়ে তালবৃন্ত-ব্যজন করিতে লাগিলেন। কেশব মনে করিলেন গিরিবালা তাঁহাকে নিদ্রিত করিবার

চেষ্টা কবিতেছে। এজন্য তিনি কহিলেন, "আজ আব বাতাস কবিতে হইবে না। আমাব জ্বৰভাব হইযাছে। গা শীত শীত কবিতেছে। তুমি শোও।"

গিবিবালা স্বামীব কপাল স্পর্শ কবিলেন। হাত কেশবেব কপালে জ্বলন্তবৎ বোধ হইল। অনন্তব গিবিবালা শযন কবিযা নিদ্রিত হইলেন।

কেশব ক্ষণকাল শযন কবিযা শয্যায উঠিযা বসিলেন। এরূপ স্ত্রীব সহিত কিরূপে সহবাস কবিবেন? গিবিবালাকে তিনি বিষধব সর্প জ্ঞান কবিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ নানা প্রকাব চিন্তা কবিযা প্রকাশে বলিতে লাগিলেন, "গিবিবালা। এই কি তোমাব উচিত? তুমি এমন হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। আমি এক্ষণে অন্ধ হইযাছি, কোথায তুমি আমাকে অধিকতব যত্ন কবিবে, তাহা না কবিযা তুমি আমাকে ত্যাগ কবিলে?" এতদূব বলিযা আব কেশব ক্রন্দন সম্ববণ কবিতে পাবিলেন না। তাহাব উচ্ছ্বাসে গিবিবালাব নিদ্রাভঙ্গ হইল. কিন্তু তিনি তাহাব কোনো চিহ্ন না দেখাইযা চুপ কবিযা শুনিতে লাগিলেন। কেশব কহিতে লাগিলেন, "গিবিবালা, ক্ষমা কব, তোমাব বৃথা দোষ দিযাছি। এ দোষ তোমাব নহে, এ আমাব অদৃষ্টলিপি তুমি তো আমাকে সে দিবস পডিতে নিষেধ কবিযাছিলে, আমি তোমাব কথা না শুনিযা পডিলাম। পডিযা চক্ষুবত্ন হাবাইলাম। আমাব অদৃষ্ট যদি ভালো হইত তাহা হইলে চিবকাল তোমাব কথা শুনিযা আসিযা সে দিবস তোমাব পবামর্শেব বিপবীত আচবণ কবিতাম না। আমাব অদৃষ্ট ভালো হইলে তুমিই বা কেন আমাকে ত্যাগ কবিবে? কিন্তু গিবিবালা, যদি তোমাব চক্ষ এরূপ হইত তাহা হইলে আমি কখন তোমাকে অনাদব কবিতাম না কখন তোমাকে ত্যাগ কবিযা অপব কাহাকে বিবাহ কবিতাম না। গিবিবালা তোমাব চক্ষু আছে বটে কিন্তু তুমি আমাব অন্তঃকবণ দেখিতে পাইতেছ না। আমি যে তোমাকে কত ভালোবাসি তোমা বিনে যে আমাব দেহে প্রাণ থাকিবে না তাহা তুমি টেব পাইতেছ না। তুমি বলিবে 'কানাব ভালোবাসায আবাব কাজ কি?' সত্য, কিন্তু গিবিবালা তোমাব অন্তঃকবণ যে মৃণাল অপেক্ষাও কোমল তাহা তো আমি জানি। আমাব ভালোবাসাব জন্য না হউক আমাব অন্তঃকবণেব কষ্ট একবাব দেখিতে পাইলে তুমি আমাকে কখন পবিত্যাগ কবিতে পাবিতে না। নিতান্ত পব হইলেও তুমি তাহাব কষ্ট সহ্য কবিতে পাব না। গিবিবালা এখনও ফেব। তুমি যাহা কবিযাছ তা কবিযাছ, আব আমাকে ত্যাগ কবিও না। সহস্র দোষে দোষী হইলেও গিবিবালা তুমি আমাবি। একবাব তুমি আমাকে এইরূপ আদব কবিযা আমাকে 'আমাব' বলিযা ডাক। তাহা হইলে আমাব সকল দুঃখ দূব হইবে।"

এতদূব প্রকাশে বলিযা কেশব চুপ কবিলেন। গিবিবালাব চক্ষে বাবি বহিতে লাগিল। কিন্তু তিনি প্রকাশ কবিযা কিছুই বলিলেন না।

দশম পবিচ্ছেদ

সৌদামিনীব বিবাহেব দিনস্থিব হইযাছে। বামনদাস আনন্দ সলিলে ভাসিতেছেন। বামকানাই দুঃখার্ণবে হাবুডুবু খাইতেছেন। বামনদাসেব উপব তাঁহাব যাব পব নাই বাগ হইযাছে। মনে মনে ভাবিতেছেন, "বামনদাসকে সেই ধন্না দিতে হইল, তবে কিঞ্চিৎ আগে দিলেই হইত, তাহা হইলে আব আমাব ক্ষতি হইত না।"

দিগম্বব সমস্ত দিবস বিবাহেব উদ্যোগে ব্যস্ত আছেন, ভগিনীপতিব সহিত বসিযা গল্প কবিবাব অবকাশ নাই। ক্রমে সমস্ত উদ্যোগ হইল, কল্য বাত্রে বিবাহ। বামকানাইযেব পূর্বাবাত্রি নিদ্রা হইল না। সৌদামিনী- লাভ হইবে ভাবিযা তাঁহাব চিত্ত আনন্দে উছলিত হইতে লাগিল, কিন্তু পণ পাইবেন না ভাবিযা আবাব যাব পব নাই দুঃখিত হইতে লাগিলেন। বামনদাসেব উপবেই তাঁহাব বাগ, —তিনি কেন কিঞ্চিৎ অগ্রে ধন্না দিলেন না, এই তাঁহাব দোষ।

বিবাহেব দিন বামকানাই ও বামনদাস উভযেই উপবাস কবিলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইল। নিমন্ত্রিত

ব্যক্তিরা দু'একটি করিয়া আসিতে লাগিলেন। বিবাহের লগ্ন অনেক রাত্রে; সুতরাং সকলে বৈঠকখানায় বসিয়া গল্প ও বরকে লইয়া নানাবিধ হাস্য কৌতুক করিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্ষণকাল পরে রামকানাই কহিলেন, "দিগম্বর বাবু কোথায়?" বামনদাস কহিলেন "কেন?" রামকানাই উত্তর করিলেন, "তাঁহার সহিত আমার কোনো বিশেষ প্রয়োজন আছে, একবার ডাকিয়া পাঠান।"

দিগম্বর বাটীর মধ্যে ব্যস্ত ছিলেন, আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। রামকানাই বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আমি ডাকছি, তাতে দেরি!"

নিকটে একজন বসিয়া ছিল, সে রামকানাইয়ের কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "দিগম্বর বাবু শীঘ্র আসুন, শিশুপাল রাগ করছেন।"

রামকানাই রাগতস্বরে কহিলেন, "আপনি কি বল্‌লেন?"

সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "কিছু না।"

রামকানাই রাগত হইয়া কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় দিগম্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামকানাই তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "এমন স্থানে আমি বিবাহ করিতে চাই না। দু'দণ্ড আমাকে সুস্থির থাকিতে দেয় না।"

দিগম্বর কহিলেন, "তোমরা সকলে চুপ কর।" পরে রামকানাইকে কহিলেন, "মহাশয়! বিবাহের রাত্রে এমন ক'রে থাকে, আপনি ওসব কথায় কান দেন কেন?"

রামকানাই কহিলেন, "আর এক কথা আছে, আমি ২০্ টাকা পণ না পাইলে বিবাহ করিব না।"

দিগম্বর কহিলেন, "সে কি মহাশয়? আপনি তো আগে এমন কথা বলেন নাই।"

রাম। "কখন বলি নাই? আমাকে কে জিজ্ঞাসা করিল?"

ইতিপূর্বে বামনদাসের সহিত রামকানাইয়ের বন্দোবস্ত হইয়াছে, যদি রামকানাই বিবাহের সময়ে কোনো ছলে কিছু লইতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কোনো আপত্তি নাই।

দিগম্বর কহিলেন, "বামনদাস বাবু বলেছেন আপনি পণ লইবেন না। কেমন বামনদাস বাবু, আপনি এ কথা বলেন নাই?"

বামনদাস নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হাঁ—না। তাই বটে— তাও তো নয়। কুলীনের ছেলে বিবাহের সময় কিছু পেয়ে থাকে।"

দিগম্বর কহিলেন, "এ আপনার বড়ো অন্যায়।"

বামনদাস কহিলেন, "যাক্ যাক্ সে সব কথা এখন যাক্—পরে হবে। এখন তুমি এঁর কুটুম্ব হ'লে, দশ পাঁচ টাকা চাইলে কি তুমি দেবে না?"

দিগম্বর কহিলেন, সে স্বতন্ত্র কথা। রামকানাইকে যদি মেয়েই দি, তবে কি আর দু'চার টাকা চাইলে পাবেন না?"

দিগম্বরের কথার ভাবে বোধ হইল যে এখনও কন্যাদান পক্ষেই বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। তখন বামনদাস ও রামকানাই কহিলেন, "সে কেমন কথা?"

দিগম্বর কহিলেন, "২০্ টাকা না পেলে তো উনি আর বিবাহ করবেন না, তাই বল্‌ছিলাম।"

দিগম্বরের কথা শুনিয়া রামকানাইয়ের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিলেন টাকা চাহিয়া ভালো কর্ম করি নাই।

এমন সময় বাটির অভ্যন্তরে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি হইল। বামনদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "লগ্নের সময় হলো কি?"

স্বরভঙ্গীর সহিত দিগম্বর উত্তর করিলেন, "হাঁ, বিবাহ হইল।"

বামনদাস ও রামকানাই উভয়েই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার মানে কি?"

দিগম্বর কহিলেন, "তার মানে আবার কি? বিবাহ হইল, এ কথার আবার কি অর্থ হইয়া থাকে।" এই বলিয়া সভাস্থ সকলকে বলিলেন, "আপনারা গাত্রোত্থান করুন, আহারের উদ্যোগ হইয়াছে।"

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ প্রতিবেশবাসী, তাঁহারা সকলেই এ ব্যাপারে পূর্বাবধি অবগত ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা কেহ এ কথায় চমৎকৃত হইলেন না। প্রত্যেকেই উঠিয়া যাইবার সময়ে রামকানাইয়ের কান মলিয়া দিয়া যাইতে লাগিলেন। রামকানাই উচ্চৈঃস্বরে "দোহাই মেজেষ্টর সাহেব, দোহাই কোম্পানির সাহেবের" বলিয়া চীৎকার কবিতে আরম্ভ করিলেন।

বামনদাস কহিলেন, "বামকানাই একটু স্থিব হও, ব্যাপারটা কি শুনি।" বামনদাস যতই এইরূপ বলিতে লাগিলেন, ততই রামকানাই "দোহাই মেজেষ্টর সাহেবের, দোহাই জজ সাহেবের, আমার জাত মারলে, আমার কান ছিঁড়লে" বলিযা বোদন কবিতে আরম্ভ করিলেন।

দিগম্বর বামনদাসেব হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, "ব্যাপারটা শুনতে চাও কি দেখ্‌তে চাও?"

বামনদাস কহিলেন, "শুনতেও চাই, দেখ্‌তেও চাই।"

"তবে আমাব সঙ্গে এস", এই বলিযা দিগম্বব বামনদাসকে সঙ্গে লইযা বাটির মধ্যে গেলেন। সেই সঙ্গে রামকানাইও গমন কবিলেন। যে স্থানে বব কন্যা ছিল, দিগম্বব বামনদাসকে তথায় লইযা গিযা ববকে কহিলেন, "ললিত, ইনি তোমাব শ্বশুব, এঁকে প্রণাম কব।"

ললিত প্রণাম করিলেন। বামনদাস সবোষে কহিলেন, "আশীর্বাদ আব কি কবিব, শীঘ্রই উচ্ছিন্ন যাও, এই আমাব প্রার্থনা।"

রামকানাই উচ্চৈঃস্ববে কহিলেন, "তোমাব ভিটেয ঘুঘু চরুক।"

দিগম্বর তাঁহাদিগেব মুখে এতাদৃশ কথা শুনিযা বাগতস্ববে কহিলেন, "বেবো তোবা আমাব বাড়ি থেকে। যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা আজি আনন্দেব দিনে অমঙ্গলেব কথা?" এই বলিযা বামনদাসের বুকে হাত দিযা ধাক্কা মারিলেন। বামনদাস সমস্ত দিবস অনাহাবে; ধাক্কা সামলাইতে না পারিযা বামকানাইযেব গাযেব উপব পড়িলেন। বামকানাই অমনি মাটিব উপর পড়িযা গেলেন। বামনদাস তাঁহাব উপব পড়িলেন। পড়িযা চীৎকাব কবিযা উঠিলেন, "আমাকে মেবে ফেল্‌লে কে কোথায আছ ঠ্যাকাও।" বামকানাই কহিলেন, আমাব সর্বস্ব লুটে নিলে। আমার টাকা কড়ি সব নিলে। কে কোথায আছ বক্ষা কর দোহাই মেজেষ্টব সাহেবেব, দোহাই কোম্পানিব সাহেবের।"

এই চীৎকাব শুনিযা যে যেখানে ছিল, সকলেই সেই স্থানে দৌড়িযা আসিল। বামনদাস কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "তোমবা সব দেখ আমার হাত ভেঙে গিযাছে। আমি এখনই থানায যাব।"

বামকানাই কহিলেন, "তোমবা সব দেখ, আমাব নগদ দুশো টাকা ছিল, আব পাঁচ খান মোহর ছিল, সব লুটে নিল। আমি এর জন্য লাটসাহেবের কাছে যেতে হয় তাও যাব।"

দিগম্বর কহিলেন, "যা তোরা কোথায যাবি যা। এখানে গোলমাল কবলে মেবে হাড় ভেঙে দেব।" এই বলিযা উভয়ের হাত ধবিযা বাটিব বাহিবে লইযা চলিলেন। পশ্চাৎ হইতে অমনি দুই চারি জন বামকানাইয়ের কাপড় ধরিয়া কহিল, "কোথায় যান মহাশয়! গ্রামভাটী ও বারোযাবী দিয়ে যান, নইলে যেতে দেব না।" উপস্থিত সকলে তদ্দর্শনে হাসিতে লাগিল। রামকানাই ও বামনদাস চীৎকাব করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। দিগম্বর বিবক্ত হইয়া একজন পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া দিলেন। পাহারাওয়ালা উভযকে তথা হইতে লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। সৌদামিনীব বিবাহে গিবিবালার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। বিবাহ সমাধা হইবাবমাত্র তিনি নিজ বাটীতে আগমন পূর্বক কেশবেব নিকট গমন করিলেন। কেশব নিজের শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। গিরিবালা কহিলেন, "তোমাকে যদি একটি সুসমাচার দিতে পারি, তবে আমাকে কি দাও?"

কেশব কহিলেন, "কে—ও গিরিবালা! কি সুসমাচার?"

গিরিবালা কহিলেন, "আগে আমাকে কি দেবে বল?"

"এ অন্ধের আর অদেয় কি আছে?"

"আমি তা শুনতে চাইনে। তুমি একটু হাসবে কি না? আর আমার সমস্ত দোষ মার্জনা করবে কি না?"

কেশব গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "অন্ধের রাগে তোমার কি হবে?"

"তবে তুমি কিছু দেবে না, —আমি অমনই বলি। সৌদামিনীর সহিত ললিতের বিবাহ হইয়াছে।"

"সে কি! রামকানাইয়ের কি হ'ল?"

"তার শিশুপালের বিবাহ হয়েছে।"

কেশব চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "বিষয়টা কি ভেঙেই বল না।"

গিরিবালা কহিলেন, "রামকানাইকে দেখে অবধি সুদামের মা প্রতিজ্ঞা করলেন তাব সঙ্গে মেয়েব বিবাহ দেবেন না তাই শুনে বামনদাস আব নায়ও না, খায়ও না, বল্‌লে অনাহাবে প্রাণত্যাগ করবে। সৌদামিনীর মা কি করেন? তাঁহাকে বল্‌লেন রামকানাইকে কন্যা দিবেন। এদিকে গোপনে ললিতকে এখানে আসতে পত্র লিখলেন। ললিত পত্র পেয়ে এল, এসে আমাকে মাথার দিব্য দিয়ে বাবণ কবলে, যেন তুমি একথা শুনতে না পাও। আমি কত বল্‌লাম, তোমাকে বলায় কোনো ক্ষতি নাই, তবু সে শুন্‌লো না। এমনি দুই এক দিন আস্‌তে দাসী তাকে দেখতে পেলে, কিন্তু সন্ধ্যার পব বলে চিন্‌তে পারলে না। সে মনে কবলে চাকরই বুঝি গোপনে বাহির হয়ে যাচ্ছে। এই মনে করে তাব মনে সন্দেহ হ'ল। আমাকে মন্দ কথা বল্‌লে। সেই জন্য তাকে বিদায় ক'বে দিলাম। যাবার সময় বুঝি তোমাকে কিছু বলে গিয়ে থাক্‌বে, তাই তোমার মনে সন্দেহ হয়েছে। সে দিন বাত্রে তোমার কথা শুনে আমি জান্‌তে পারলাম। আমি তখনই তোমাকে সব কথা কহিতাম, কিন্তু ললিত দিব্য দিয়েছিল বলেই বলি নাই। আমি কি তোমাকে ত্যাগ করতে পারি? তোমার মতন—"

কেশব এত দূর শুনিয়া গিরিবালার হাত ধরিয়া কহিলেন, "আর কাজ নাই, আমি সব বুঝেছি। গিরিবালা আমার অপবাধ হয়েছে, ক্ষমা কব।"

গিরিবালা কহিলেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করিব? তুমি আমাকে এই ক্ষমা কর যে ললিতেব কথা শুনে আমি এত দিন [illegible]মার নিকট এ বিষয় গোপন কবে রেখেছি। আমার বড়ো কঠিন প্রাণ যে তোমার এই কয়েকদিনকার কষ্ট দেখেও আমি গুপ্ত কথা প্রকাশ কবি নাই।" তোমাব স্ত্রী হওয়া দূবে থাকুক, আমি তোমার দাসী হওয়ারও যোগ্য নই।"

পূর্ববৎ গিরিবালার হস্তাকর্ষণ কবিয়া কেশব কহিলেন, "তোমার দোষ কি? তোমাকে দিব্য দিয়া বলিয়াছিল, তাই তুমি এ কথা বল নাই। দোষ দু'জনেরই। আমি যে দাসীব কথা শুনে তোমাকে কলঙ্কিনী মনে করেছি, এই আমাব ঘোরতর অপরাধ, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।" এই বলিয়া কেশব কাঁদিতে লাগিলেন। গিরিবালাও তদ্দর্শনে কাঁদিতে লাগিলেন।

"জ্ঞানাঙ্কুর" ঃ ১২৮২

বীরবালা

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

দেবীসিংহের যখন এগারো বৎসর বয়স, তখন পাঁচ বৎসরের একটি বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার শ্বশুরবাড়ি অনেক দূর। বিবাহের পর আর তিনি শ্বশুরবাড়ি যান নাই। শ্বশুর-শাশুড়ীকে তাঁহার মনে পড়ে না। শুভদৃষ্টির পর স্ত্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। আজ দেবীসিংহের শ্বশুর সপরিবারে অযোধ্যায় তীর্থ করিতে আসিতেছেন। আজ সরযূর ঘাটে আসিয়া পৌঁছিবেন। তাই পিতামহী বলিলেন, —"দেবী। সকাল সকাল আহার করিয়া ঘাটে গিয়া বসিয়া থাক। তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীকে আমাদের বাটী লইয়া আইস। আজ আমার বড়ো আনন্দের দিন। দেবী। আজ আমি পুত্র-বধূর মুখ দেখিয়া জন্ম সার্থক করিব।"

সরযূর ঘাটে গিয়া দেবী বসিয়া রহিলেন। অশ্বত্থ বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া দেবী ভাবিতে লাগিলেন। "তাঁহার শ্বশুর কিরূপ? তাঁহার নাম কি? তাঁহার স্ত্রী এখন কত বড়ো হইয়াছে? দেখিতে কিরূপ? নাম কি? এইরূপ শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে নানা কথা দেবী ভাবিতে লাগিলেন। দিন অতীত হইল, সন্ধ্যা হইল, তবুও তাঁহারা আসিলেন না। দেবী মনে করিলেন, —"আজ বুঝি তাঁহারা আসিলেন না। যাই হউক, রাত্রি নয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখি, তাহার পর বাটী ফিরিয়া যাইব।"

অশ্বত্থমূলে ঠেশ দিয়া দেবীসিংহ বসিলেন, —বসিয়া পুনরায় শ্বশুরবাড়ির কথা ভাবিতে লাগিলেন। সরযূকূল এখন জনমানবশূন্য; নীরব। রাখালগণ গরু-মহিষের পাল লইয়া ঘরে গিয়াছে। পলাশ কেশব-রঞ্জিত পীত-বসনা অঙ্গনাগণ এখন আর সরযূর ঘাটে নাই। পাণ্ডাদিগের কোলাহল-ধ্বনি একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সরযূর জল কুল কুল শব্দে বহিয়া যাইতেছে। নক্ষত্ররাশি সরযূর ঈষৎ তরঙ্গ হিল্লোলে নাচিতেছে। দেবী তাই দেখিতেছেন, তাই শুনিতেছেন, আর শ্বশুরবাড়ির কথা মনে মনে ভাবিতেছেন। এমন সময় কি হইল?—না,—ভয়ানক "উপ" করিয়া এক প্রকাণ্ড হনুমান অশ্বত্থ গাছ হইতে লাফ দিয়া দেবীসিংহের সম্মুখে পড়িল। পাছে কামড়াইয়া দেয়, সেই ভয়ে দেবীসিংহ পলাইবার উদ্যোগ করিলেন। পলাইতে না পলাইতে বীর হনুমান তাঁহাকে বলিলেন, — "আমার গাছতলা তুমি অপবিত্র করিলে কেন? তোমার কি কৃস্তানি মতলব?"

দেবীসিংহ উত্তর করিলেন, —"আজ্ঞা, না মহাশয়! কৃস্তানি মতলব কেন হইবে? এই দেখুন, আমার মাথায় শিখা রহিয়াছে!"

বীর হনুমান বলিলেন,—"কৈ দেখি?"

দেবীসিংহ, বীর হনুমানের দিকে মস্তক অবনত করিলেন। টিকির মর্যাদারক্ষক বীর হনুমান বাম হাত দিয়া টিকিটি ধরিলেন; ধরিয়া, একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া টান মারিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—"বেশ টিকিটি। বাঃ দিব্য টিকিটি!"

কিন্তু টিকিটি ভালো হইলে কি হইবে, দেবীসিংহের এদিকে প্রাণ বাহির হইতে লাগিল, মুণ্ডটি ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল, দেবীসিংহের চক্ষে জল আসিল। টিকির টানে একবার তাঁহার ঘাড়টি খুট্ করিয়া উঠিল। ঘাড়টি যেই খুট্ করিল, আর দেবীসিংহ জ্ঞান হারাইলেন। তাহার পর কি হইল, তিনি কিছুই জানেন না।

যখন পুনরায় জ্ঞান হইল, তখন দেবীসিংহ দেখিলেন যে, মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছেন। একটি স্ত্রীলোকের কোলে তাঁহার মাথা রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটি কাঁদিতেছেন, সেই চক্ষু জলের দুই এক ফোঁটা তাঁহার গায়ে পড়িতেছে। আশে পাশে অনেকগুলি পুরুষ-মানুষ মেয়ে-মানুষ, বালক বালিকা—সব দাঁড়াইয়া আছে। সকলেই অপরিচিত। দেবীসিংহ যেই চক্ষু চাহিলেন, আর চারিদিকে আনন্দধ্বনি

হইল। সকলে বলিল—"আর কোনোও ভয় নাই। ধর্মদত্ত এইবার প্রাণ পাইল। ধর্মেব মা! আর কাঁদিও না, আর কোনো ভয় নাই। বাছাকে লইয়া এখন ঘরে যাও।"

যে স্ত্রীলোকটির কোলে তাঁহার মাথা ছিল, তিনি অতি স্নেহের সহিত দেবীসিংহের গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, — "ধর্মদত্ত! বাবা আমার। এখন একটু কি ভালো হইয়াছ?"

দেবীসিংহ উত্তর করিলেন, —"তুমি কে? আমি তো তোমাকে চিনি না। আমার নাম তো ধর্মদত্ত নয়! আমার নাম যে দেবীসিংহ!"

স্ত্রীলোকটি কাতরস্বরে বলিলেন, — "কৈ গা। আমার ধর্মের তো এখনও জ্ঞান হয় নাই। আমার ধর্মদত্ত তো কৈ এখনও ভালো হয় নাই। সে কি বাবা ধর্ম। দশমাস দশ দিন তোমাকে গর্ভে ধরিলাম, আজ এগারো বৎসর ধরিয়া প্রতিপালন করিলাম, আমাকে তুমি চিনিতে পার না?"

সকলে বলিলেন,—"ধর্মের মা। ভাবিও না, জলে ডুবিয়া যাইলে ওরূপ হয়। এখনি জ্ঞান হইবে, সকল কথা মনে পড়িবে। ধর্মদত্ত। ঐ দেখ, তোমাব পিতা ভারতসিংহ বিষন্ন মনে বসিয়া আছেন। ঐ দেখ, রামসেবক, যিনি তোমাকে নদীর জল হইতে তুলিয়াছেন। এই দেখ, তোমার খেলাইবাব সঙ্গী, প্রতাপ ও মহাবীর। আর এই দেখ, বীববালা, যে খেলা কবিতে করিতে নদীর জলে পড়িয়া গিয়াছিল। যাহাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত তুমি জলে ঝাঁপ দিয়াছিলে। কিনারার দিকে যাহাকে ঠেলিয়া দিযা, তুমি জলে ডুবিয়া গিয়াছিলে। ভাগ্যক্রমে মহাবীর প্রতাপ প্রভৃতি বালকেরা চীৎকার কবিযা উঠিল। ভাগ্যক্রমে রামসেবক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। তাই তো বাছার প্রাণরক্ষা হইল! তা না হইলে ভারতসিংহের আজ কি সর্বনাশই হইত! ধর্মদত্ত। এই দেখ, বীরবালাকে চিনিতে পার?"

দেবীসিংহ বীরবালার পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, —বীরবালা একটি পাঁচ বৎসবের সুরূপা বালিকা। নিজের শরীর পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,—বসন আর্দ্র, হাত-পা-গুলি ছোটো, —দশ এগারো বৎসরের বালকের যেরূপ হয়, সেইরূপ। পিতা ভাবতসিংহকে দেখিলেন, সজল-নয়না মাতাকে দেখিলেন। সমবয়স্ক মহাবীর, প্রতাপ প্রভৃতিকে দেখিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ক্রমে তাঁহার মনে বিশ্বাস হইল যে, তিনি দেবীসিংহ নন, তিনি ধর্মদত্ত। তিনি বিংশতি বৎসরেব যুবক নন, তিনি একাদশ-বর্ষীয় বালক। স্বপ্নে আপনাকে দেবীসিংহ মনে করিযাছিলেন, স্বপ্নে তিনি বীর হনূমানকে দেখিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
অমাবস্যা বাবাজী

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ধর্মদত্তকে লইয়া সকলে বাড়ি যাইলেন। তাঁহার পিতা ভারতসিংহ বলিলেন,— "ধর্মদত্ত! সৌভাগ্যক্রমে আজ তোমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে। বাবাজীকে গিয়া প্রণিপাত কর।"

বাবাজী সন্ন্যাসী। নাম অমাবস্যা বাবাজী। বাবাজী দীর্ঘদন্ত, লোহিতলোচন, ঘোর কৃষ্ণকায়। ঘোর কৃষ্ণকায় বলিয়াই বোধ হয়, তাঁহার নাম অমাবস্যা বাবাজী হইয়া থাকিবে। ইনি অতি সাধু পুরুষ। কেবল দুগ্ধ খাইয়া প্রাণ ধারণ করেন। তাই ভারতসিংহ ইহাকে অতি ভক্তি করেন। চিমটা হাতে দেশে দেশে তীর্থ পর্যটন করিতে দেন না। নিজ ঘরে রাখিয়া ভারতসিংহ ইহাকে যথাবিধি পূজা করেন। সতত ইঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া থাকেন। ভারতসিংহের ঘরে অমাবস্যা বাবাজী সর্বেসর্বা, যা করেন তাই হয়।

ধর্মদত্ত গিয়া বাবাজীকে প্রণাম করিলেন, পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। কোনও কথা না বলিয়া বাবাজী ধর্মদত্তকে চিমটা দ্বারা সবলে প্রহার করিলেন। আর বলিলেন, —"ধর্মদত্ত। দিন দিন তুই অতি মূর্খ ও অতি নির্বোধ হইতেছিস্! শাস্ত্রে আছে, —'চাচা, আপনা বাঁচা!' তাই প্রতিবাসীর গৃহে ডাকাত পড়িলে সেকালের লোকে আপনার আপনার ঘরে দোহারা তেহারা খিল ও হুড়কো দিয়া বসিয়া

থাকিত, কেহ বাহির হইত না। আজকালের ছেলেরা সব হইল কি? পরের জন্য প্রাণসমর্পণ! পাঁচ বৎসরের একটা মেয়ে বাঁচাইতে জলে ঝাঁপ। এ সকলি কলির মাহাত্ম্য!"

চিমটার প্রহারে ধর্মদত্ত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সজলনয়নে পিতার মুখপানে চাহিলেন। ভারতসিংহ কিছুই বলিলেন না। মাতা আসিয়া ধর্মদত্তকে বাটীর ভিতর লইয়া যাইলেন। মাতা বলিলেন, —"বাছা, ধর্ম। চুপ কর, আর কাঁদিও না। কালা-মুখ সন্ন্যাসী এখান হইতে যায়ও না, মরেও না। কি গুণে যে কর্তাকে এত বশীভূত করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না উঁহার কু-পরামর্শে কর্তাটি দিন দিন যেন জন্তু হইতেছেন। কালা-মুখ আমার সোনার সংসার ছারখার করিল।"

কিছু দিন পরে বীববালার পিতা, জবরদস্তসিংহ আসিয়া ভারতসিংহের নিকট প্রস্তাব করিলেন, —"মহাশয়। ধর্মদত্ত আমার কন্যাব প্রাণ রক্ষা করিযাছে। যদি অনুমতি হয় ত বীরবালাকে ধর্মদত্তের হস্তে সমর্পণ কবি। বীরবালা, —ধীব, লজ্জাশীলা ও পরমাসুন্দরী।"

এ কথায় সকলে সম্মত হইলেন। ধর্মদত্তের সহিত বীরবালার বিবাহ হইল। দিনেব পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর গত হইতে লাগিল। এদিকে ভারতসিংহের ঘরে ধর্মদত্ত বাড়িতে লাগিলেন। ওদিকে জবরদস্তসিংহেব গৃহে বীরবালা বাড়িতে লাগিলেন। ধর্মদত্ত ও ধর্মদত্তের মাতা কিন্তু বড়োই অসুখে কালযাপন কবিতে লাগিলেন। ভারতসিংহের গৃহে অমাবস্যা বাবাজীর এখন একাধিপত্য। ধর্মদত্তকে তিনি দুটি চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারেন না। বিনা দোষে সর্বদাই তাঁহাকে প্রহাব কবেন। টাকা-কড়ি বিষয়-বিভব, সমুদায় এখন অমাবস্যা বাবাজীব হাতে। ধর্মদত্তের মাতাকে তিনি আহার-পরিচ্ছেদের ক্লেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে ভাবতসিংহ নির্জীব জড় পদার্থপ্রায় জবু-থবু হইয়া পড়িলেন।

এইরূপে সাত আট বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন অমাবস্যা বাবাজী ধর্মদত্তকে চিমটার দ্বারা অতিশয় প্রহার করিলেন। ধর্মদত্তের শবীরে শতধারা হইয়া বক্ত পড়িতে লাগিল। সেইদিন বিনয় কবিয়া ধর্মদত্ত বাবাজীকে বলিলেন, "মহাশয়। দেখুন, আমি আব এখন বালক নই, এক্ষণে বড়ো হইয়াছি। আমাকে বিনা দোষে প্রহাব করা আব ভালো দেখায় না। আমাকে আর মারিবেন না। স্মরণ রাখিবেন যে, খরতর ক্ষত্রিয-শোণিত আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে।"

বাবাজী পরিহাস করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিছুদিন পরে পুনরায তিনি ধর্মদত্তকে প্রহার করিলেন। ধর্মদত্ত সে দিন আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পাবিলেন না। বাবাজীর গলা টিপিযা ধরিলেন। সবল ক্ষত্রিয় যুবার সহিত শীর্ণকায বাবাজী পারিবেন কেন? শ্বাসরোধ হইয়া বাবাজী মৃতপ্রায় হইলেন। কেবল প্রাণটি থকিতে থাকিতে ধর্মদত্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। রাগদ্বেষে পবিপূর্ণ হইয়া বাবাজী বলিলেন, —"ভালো। দেখিয়া লইব! অমাবস্যা বাবাজীর গায়ে হাত তুলিয়া কে বাঁচিতে পারে, এ কথা আমি দেখিয়া লইব।"

অল্পদিন পরে ভারতসিংহের একটি কন্যা হইল। সূতিকা-ঘরে সমাগতা প্রতিবাসিনীগণ নবপ্রসূতা কন্যাটির অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দেখিয়া আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন। কন্যাব রূপে সূতিকা -ঘর প্রভাময় হইল। সকলে একবাক্য হইয়া বলিলেন,—'ধর্মেব মা। তোমার কন্যাটির কি অদ্ভুত-রূপ হইয়াছে! দিদি, আঁতুড়-ঘরে এরূপ রূপ তো কখনও দেখি নাই। কন্যাটির নাম কমলা রাখ।' সকলে মিলিয়া কন্যাটির নাম কমলা রাখিলেন।

ভারতসিংহের কন্যা হইযাছে শুনিয়া অমাবস্যা বাবাজীর রাগ হইল। ভারতসিংহকে তিনি বলিলেন,—"মহাশয়। আপনার বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলে কন্যা কখনও জীবিত থাকে নাই। আপনার পূর্বপুরুষদিগকে শ্বশুর বলিয়া কেহ সম্বোধন করেন নাই। ইংরাজের দৌরাত্ম্যে আজ ক্ষত্রিয়কুল কলঙ্কিত হইতেছে সত্য, কিন্তু আমি আপনার গৃহে থাকিতে আপনার কুল কলঙ্কিত হইতে দিব না। এক্ষণে যেরূপ অনুমতি হয়।"

ভারতসিংহ এক্ষণে জড়পদার্থ। জ্ঞানগোচর কিছুই নাই। তিনি বলিলেন, —"যা ভালো বিবেচনা করেন, তাহাই করুন।"

অমাবস্যা বাবাজী সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নীচ জাতি ধাত্রীকে অর্থ দ্বারা বশ করিলেন। একদিন ঘোর নিশীথে, ধর্মের মাতাকে নিদ্রিত পাইয়া ধাত্রীর যোগে বাবাজী কমলাকে চুরি করিলেন। পূর্বপ্রচলিত প্রথা অনুসারে কন্যাটিকে মৃত্তিকাপাত্রে রাখিলেন। সেই হাঁড়িতে একটু গুড় ও একটুখানি তুলা রাখিয়া সরা চাপা দিলেন। গ্রামের বাহিরে জনশূন্য মাঠের মাঝে লইয়া, হাঁড়িটিকে পুঁতিয়া ফেলিলেন। গর্ত খুঁড়িবার সময় ও হাঁড়ি পুঁতিবার সময় বাবাজী বার বার এই মন্ত্রটি পাঠ করিতে লাগিলেন,—

কমলা তুমি হও দূর।
যাও শীঘ্র যমপুর।।
খাও গুড় কাটো সূত।
তোমায় চাই না—চাই পুত।।

রাজপুতদিগের মনে বিশ্বাস এই যে, নবপ্রসূতা কন্যাকে সংহার করিলে, সেই কন্যাই বারবার আসিয়া গৃহে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এইরূপ প্রণালীতে মন্ত্রপাঠ কবিয়া জীবিত কন্যাকে মৃত্তিকাসাৎ করিলে পুনরায় আর সে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে না।

মাতা জাগরিত হইয়া শিশুটিকে দেখিতে পাইলেন না। সূতিকাঘরে হাহাকাব পড়িযা গেল। কত কাঁদিলেন, কত কাটিলেন। মনে করিলেন,—তাঁহার অসাবধানতা বশতঃ কন্যাকে শৃগালে লইযা গিয়াছে।

অমাবস্যা বাবাজী গোপনভাবে পুলিসের নিকট পত্র পাঠাইলেন। তাহাতে ধর্মদত্তের প্রতি ভগিনীবধের দোষারোপ কবিলেন। পুলিসেব দ্বারা তদন্তের সময় অমাবস্যা বাবাজী প্রকাশ্যভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। ধর্মদত্ত রাত্রিকালে হাঁড়ির ভিতর করিয়া শিশুটিকে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এইরূপ ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। ধাত্রীও সেইভাবে সাক্ষ্য দিল। প্রতিবাসী রামসেবক বলিলেন যে, রাজপুতেরা কিরূপে আপনাদিগের কন্যা বধ কবিত, এ কথা ধর্মদত্ত তাঁহাকে কিছুদিন পূর্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বামসেবক মিথ্যা বলেন নাই, কুতুহলবশতঃ ধর্মদত্ত সত্য সত্যই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য ভারতসিংহ কিছুমাত্র যত্ন করিলেন না; একটি পযসাও খরচ করিলেন না। ধরাশায়িনী শোকাকুলা পত্নীর অবিরত অশ্রুধারায় তাঁহার মন ঈষৎমাত্রও ভিজিল না। অমাবস্যা বাবাজী যে তাঁহার ঘোর সর্বনাশ করিতেছে, সে জ্ঞান তাঁহার হইল না। বীরবালার পিতা অনেক অর্থব্যয় করিলেন; সুচতুর উকিল নিযুক্ত করিয়া জামাতার রক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সামান্য বালিকা হইয়াও কুলের কুল-বধূ হইয়াও, এই বিপদের সময় স্বামিরক্ষার নিমিত্ত, বীরবালা উকিলের বাড়ি, সাক্ষীদিগের বাড়ি, কত লোকের বাড়ি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ধর্মদত্তের উকিল আসিয়া ভারতসিংহকে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, —"ধর্মদত্ত যে ভগিনীকে বধ করে নাই, তাহা নিশ্চয়। অমাবস্যা বাবাজীর কুটিলতা ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। প্রকৃত ঘটনা কি মহাশয়ের বোধ হয় অবিদিত নাই। অতএব সকল কথা প্রকাশ করিয়া, পুত্রের প্রাণরক্ষা করুন।" ভারতসিংহ, না রাম না গঙ্গা,—কোনও উত্তর করিলেন না। জড়ের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

জবরদস্তসিংহের সমুদয় চেষ্টা বিফল হইল। ধর্মদত্তের মাতা, পুত্রের হিত-কামনায় দেবতাদিগকে রাত্রি-দিন ডাকিতেছেন। দেবতারা তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন না। বীরবালার কান্নায় দয়ার্দ্র-চিত্ত ব্যক্তিদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইল বটে, কিন্তু তাঁহার স্বামী অব্যাহতি পাইলেন না। যাবজ্জীবনের নিমিত্ত ধর্মদত্ত দ্বীপান্তরিত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়
ঘোমটাবতী

জামাতা-শোকে জবরদস্তসিংহ অতিশয় কাতর হইলেন। ক্রোধে সর্বশরীর তাঁহার কাঁপিতে লাগিল। অমাবস্যা বাবাজীর যথোচিত দণ্ড করিয়া অবশেষে তাহার প্রাণবধ করিবেন, মনে মনে এই সংকল্প করিলেন। বিষণ্ণ-বদনে, অশ্রুনয়না মলিন-বসনা বালিকা কন্যাকে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রি হইয়াছে, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। মাটিতে পড়িয়া বীরবালা অবিরত কাঁদিতেছেন। বেড়াইতে বেড়াইতে ঘোমটাবতী বলিয়া একটি উপদেবতা সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বীরবালাকে শিশুকাল হইতে তিনি দেখিয়া আসিতেছেন। বীরবালাকে আজ দুঃখ-সাগরে নিমগ্না দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। ঘোর রজনীতে বীরবালা মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছেন, ঘোমটাবতী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বীববালাকে হাত-ছানি দিয়া ডাকিলেন। এরূপ সময়ে বীরবালার আর ভয় কি? তিনি উঠিলেন। ঘোমটাবতী যে দিকে যাইতে লাগিলেন, সেই দিকে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গ্রাম পার হইয়া, দুই জনে মাঠের মাঝে উপস্থিত হইলেন। হাত বাড়াইয়া ঘোমটাবতী একটি স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন।

তাহার পব ঘোমটাবতী অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। বীরবালা দেখিলেন যে, সেই নির্দিষ্ট স্থানের মৃত্তিকা কোমল, যেন অল্প দিবস পূর্বে সে স্থান কেহ খনন করিয়াছিল। হাত দিয়া বীরবালা সেই স্থানের মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন। খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটি হাঁড়ি বাহির হইল। হাঁড়িটি তুলিয়া মুখের সরাখানি খুলিয়া দেখিলেন যে, তাহার ভিতর একটু গুড় একটুখানি কার্পাস ও একখানি কাগজ রহিয়াছে। সেইগুলি বাটী লইয়া আসিলেন ও আপনার পিতাকে দেখাইলেন। জবরদস্তসিংহ দেখিলেন যে, সেই কাগজখানিতে এইরূপ লেখা রহিয়াছে,—"আমার নাম শাহ্ সুলতান, নিবাস বোগদাদ। ভারতবর্ষ হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিতেছি। লোকজন লইয়া তাঁবু খাটাইয়া এই মাঠে আমি বাত্রিযাপন করিতেছি। রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে নিকটে ঐ ঝোপের ভিতর বসিয়াছিলাম। সেই সময় কৃষ্ণকায় এক ব্যক্তি একটি হাঁড়ি লইয়া মাঠে আসিল। হাঁড়ির ভিতর হইতে শিশুব ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। মন্ত্র পড়িতে পড়িতে সেই ব্যক্তি হাঁড়িটি পুঁতিল। সেই মন্ত্র শুনিয়া বুঝিলাম যে, শিশুটি রাজপুত কন্যা, কমলা। কৃষ্ণকায় ব্যক্তি চলিয়া যাইলে, আমি তৎক্ষণাৎ মাটি খুঁড়িয়া হাঁড়িটি তুলিলাম। শিশুটি জীবিত রহিয়াছে দেখিলাম। আমি নিঃসন্তান। কমলাকে আমি আপনার দেশে লইয়া চলিলাম।"বীরবালার পিতা ও বীববালা সেই কাগজখানি ও হাঁড়িটি উকিল ও বিচারকর্তাকে দেখাইলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না। সকলে বলিল, —"তুমি যে নিজে এই কাগজখানি প্রস্তুত কর নাই, তাহার প্রমাণ কি?"

বীরবালা ও তাঁহার পিতা পুনরায় বিষণ্ণ-চিত্তে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। সেই রাত্রিতে বীরবালা গোপনে পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। পাগড়ীর ভিতর আপনার দীর্ঘ কেশ লুকাইলেন। সেই রাত্রিতেই অতি গোপনভাবে বাটী পরিত্যাগ করিলেন। পিতার প্রবোধের নিমিত্ত একখানি কাগজে এই লিখিয়া যাইলেন, —"পিতা। আমি কমলার অন্বেষণে চলিলাম। বোগদাদ নগরে চলিলাম। কমলাকে আনিয়া নিশ্চয় স্বামীর উদ্ধার করিব। স্বামিপদ ধ্যান্ করিয়া আমি যাইতেছি। নিশ্চয় কৃতকার্য হইব। আপনি চিন্তিত হইবেন না।"

বীরবালা চলিলেন। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা বৈ তো নয়? পথ-ঘাটের কথা তিনি কি জানেন? লোকের মুখে শুনিলেন যে, বোগদাদ অনেক দূর, পশ্চিমদিকে। বীরবালা সেই পশ্চিমদিকে চলিলেন। এক দিনে অধিক পথ যাইবেন এরূপ ক্ষমতা কোথায়? অল্প অল্প করিয়া প্রতিদিন পথ হাঁটিতে লাগিলেন। নানা ক্লেশ পাইয়া, নানা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে ভারতের পশ্চিম-প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এক দিন এক স্থানে একটি মেলা হইতেছে, বীরবালা তাহা দেখিতে পাইলেন। বীরবালা সেই মেলার ভিতর প্রবেশ করিলেন। সে স্থানে নানা দেশ হইতে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল। ভারতের নানা স্থান হইতে শত শত সাধুগণও আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বীরবালা

দেখিলেন যে, একজন সাধু, সিদ্ধি বাটিয়া সকলকে বিতরণ করিতেছেন। যে চাহিতেছে, তাহকেই তিনি সিদ্ধি ও মিষ্টান্ন দিতেছেন। সহসা সকলের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। সকলের সন্দেহ হইল যে, সাধু হিন্দু নন্, মুসলমান। এইরূপ মনে করিয়া লোকে তাঁহার উপর ঢিল ও পাথর বর্ষণ করিতে লাগিল। সাধুর একটি কুকুর ছিল। কুকুরটি নিকটে শুইয়া ছিল। ক্রোধে অপর কাহাকে কিছু না বলিয়া, সাধু দুই হাতে কুকুরটির পা ধরিয়া তুলিলেন, নিকটস্থ একখানি পাথরের উপর আছাড় মারিলেন। কুকুরের মাথাটি ফাটিয়া গেল, চরিদিকে মস্তিক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, কুকুরটি তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। কুকুরের মৃতদেহ ফেলিয়া দিয়া সাধু সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া শিষ দিতে লাগিলেন। সেই শিষ শুনিয়া মৃত কুকুরটি তৎক্ষণাৎ বাঁচিয়া উঠিল, দৌড়িয়া সাধুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন, সকলেই তখন সাধুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মেলাস্থান পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে সাধু অরণ্যময় নির্জন পর্বতের দিকে চলিলেন। বীরবালাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বার বার হাত নাড়িয়া সাধু তাঁহাকে ফিরিয়া যাইবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। বীরবালা তাহা শুনিলেন না, বীরবালা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। অবশেষে সাধু ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —"তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছ কেন? আমাকে এরূপ বিরক্ত করিতেছ কেন?" বীরবালা তাঁহাকে আপনার দুঃখের কথা সমুদয় বলিলেন। সাধুর দয়া হইল। বৃক্ষপত্রে একখানি কবজ লিখিয়া বীরবালাকে দিলেন, ও বলিলেন, —"এই কবজখানি বাম হাতে ধরিয়া যেখানে ইচ্ছা করিবে, সেই দণ্ডে সেই খানে উড়িয়া যাইতে পারিবে। ইহার সহায়তায় তুমি বোগদাদ গমন কর। সে স্থান হইতে কমলাকে আনিয়া পতিব উদ্ধার সাধন কর। আর আমার সঙ্গে আসিও না। কিন্তু দেখিও, কবজখানি যেন ছিঁড়িয়া না যায়। তাহা হইলে ফল হইবে না।"

চতুর্থ অধ্যায়
সবুজ ভূত

কবজ পাইয়া বীরবালা মনে আনন্দ হইল। অনায়াসে এখন বোগদাদ যাইতে পারিবেন, শাহ সুলতানের অনুসন্ধান হইবে। কমলাকে পাইবেন, পতির উদ্ধার হইবে, তাঁহার মনে এখন ভরসা হইল। বীরবালা মনে করিলেন, —আচ্ছা দেখি, সত্য সত্যই কবজের এইরূপ গুণ আছে কি না? প্রথমে বোগদাদ না গিয়া অন্য কোনোও স্থানে যাইবাব বাসনা করি। কবজের পরীক্ষা করি। দেখি সেইস্থানে গিযা উপস্থিত হই কি না।"

এইরূপ ভাবিয়া তিনি কবজখানি বাম হাতের ভিতর করিলেন, আর মনন করিলেন,—"আমি পৃথিবীর মুড়োতে যাইব।" মনে করিতে না করিতে বীরবালা শূন্যপথে দ্রুত বেগে উড়িয়া চলিলেন। নিমিষের মধ্যে পৃথিবীর প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। বীরবালা দেখিলেন যে অতি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা আমাদের এই পৃথিবীটি বেষ্টিত। আকাশ ভেদ করিয়া সেই প্রাচীর রহিয়াছে। বীরবালা ভাবিলেন যে, তবে এই প্রাচীর হইল পৃথিবীর শেষ, ইহার ও-দিকে আর পৃথিবী নাই। প্রাচীরের ও-ধারে কি আছে? সেটি দেখিতে হইবে। প্রাচীরের গায়ে গোল গোল ছোটো ছোটো ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্র দিয়া বীরবালা উঁকি মারিলেন। সর্বনাশ। প্রাচীরের ও-ধারে পৃথিবীর ও-পারে কোটি কোটি খর্বকায় ভূত। প্রাচীর ধরিয়া ক্রমাগত তাহারা ঠেলিতেছে; ইচ্ছা,—প্রাচীর ভাঙিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করে। পৃথিবীতে আসিয়া পৃথিবী একেবারে রসাতলে দিবে, এই তাহাদের বাসনা। কোটি কোটি খর্বকায় ভূতগণ একবার যদি প্রাচীর পার হইতে পারে, তাহা হইলে পৃথিবীর আর রক্ষা নাই। মনুষ্যকুল ধ্বংস করিয়া পৃথিবী তাহারা অধিকার করিবে। তাহাদের ভয়াবহ মূর্তি দেখিয়া বীরবালার প্রাণে ভয় হইল।

ছিদ্র দিয়া তাহারাও সেই সময়ে বীরবালাকে দেখিতে পাইল। ছিদ্র দিয়া হাত বাড়াইয়া তাহারা

বীরবালার হাত ধরিল। কবজখানি কাড়িয়া লইবে এই তাহাদের বাসনা। অতি কষ্টে বীরবালা হাত ছাড়াইয়া লইলেন। কিন্তু ঘোর বিপদের কথা। টানাটানিতে কবজখানি ছিঁড়িয়া গেল।

বোগদাদে না গিয়া পৃথিবীর প্রান্তভাগে মিছামিছি আসিয়া কবজখানি হারাইলেন। সে নিমিত্ত বীববালা আপনাকে কত তিরস্কার করিলেন। কিন্তু কি করিবেন। আর উপায় নাই। পৃথিবীর প্রান্তভাগ হইতে পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। পৃথিবীর আগা কি এখানে? পথ আর ফুরায় না। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বীরবালা এইরূপ পথ চলিলেন। তথাপি লোকালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিলেন না। একদিন এক পাহাড়ের নিকট বীরবালা একটি সবুজ বর্ণের বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধা গাছতলায় বসিয়া রৌদ্র পোহাইতেছিল ও চরকা কাটিতেছিল। বীরবালাকে দেখিয়া সে অমনি তাড়াতাড়ি চরকা ফেলিয়া উঠিল, আর আকাশপানে পা করিয়া বীরবালার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। বীরবালা যে দিকে যান, আর আকাশ পানে পা করিয়া বুড়িও সম্মুখে আসিযা উপস্থিত হয়। এইরূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, অবশেষে বীরবালাকে বুড়ি যেই একটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করাইল, আর সব দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। বীরবালার বড়ো ভয় হইল। দ্বার ঠেলিতে লাগিলেন, কিছুতেই খুলিতে পারিলেন না। সবুজ বুড়ি আপনার আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ কবিয়া আনিল। সবুজ বুড়ির বাটীতে কোলাহল পড়িয়া গেল। ঘরেব ভিতর বসিয়া বসিয়া বীববালা তাহাদের সকল কথা শুনিতে পাইলেন। এই পৌষপার্বণে তাহারা বীরবালাকে কাটিয়া কুটিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া খাইবে, সবুজ ভূতেবা এই পরামর্শ করিতে লাগিল। চারিদিকে চাউল কুটিবার ধূম পড়িয়া গেল। ডাল বাটা হইতে লাগিল। অবশেষে বীরবালাকে কুটিবার সময় উপস্থিত হইল। অন্য ভূতদিগেব মতো সবুজ ভূতেরা আচার-বিহীন নয়। ইহারা বৃথা মাংস ভক্ষণ করে না; ঠাকুরদের নিবেদন কবিয়া বীরবালার বলিদান হইবে। তাহার পর বীরবালার দেহকে কাটিয়া কুটিয়া পিষ্টক প্রস্তুত কবিবে। দুই চারি জন সবুজ ভূতে বীরবালাকে ধরিয়া স্নান কবাইল। পাহাড়েব মাথায় দেবতার মন্দিবে গিয়া পূজা দিল। যথাবিধি বীববালাকে উৎসর্গ করিল। বলিদান দিবাব নিমিত্ত বীরবালাকে পাহাড়েব ধারে লইযা গেল। এক দিকে পাহাড়, অপব দিকে অতল গিবিগহ্বর। কোপ মারিবার নিমিত্ত কামার-ভূত খাঁড়া তুলিল। বীরবালা ভাবিলেন, —"মরিলাম তো। মরিতে তো আর বাকি নাই। কিন্তু আমার মাংস লইযা সবুজ ভূতেরা যে পিঠে করিযা খাইবে, তাহা দিব না।" এই মনে করিয়া তিনি পর্বতের শিখর দেশ হইতে ঝাঁপ দিলেন। শূন্যপথে বীরবালা পাহাড়েব তলদেশে পড়িতে লাগিলেন।

পাহাড়ের গায়ে একখানি পাথরের উপর সবুজ ভূতদিগের একটি ছেলে বসিয়াছিল। ভালো কাপড়-চোপড় পরিয়া সবুজ বুড়ির বাড়িতে সে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিল। সবুজ বুড়ির বাড়িতে আজ মানুষেব পিঠে হইবে, পৌষপার্বণের দিনে পেট ভরিয়া মানুষেব পিঠে খাইবে। তাই, মনের আনন্দে ভূতের ছেলেটি পায়ের উপর পা দিয়া পাথরের উপর বসিয়া আছে।

পড়বি তো পড়, বীরবালা তাহার ঘাড়ে পড়িলেন। অকস্মাৎ কি আসিয়া আকাশ হইতে ঘাড়ে পড়িল, সে জন্য ভূতবালক চমকিয়া উঠিল। তাহার বড়ো ভয় হইল। নিমন্ত্রণ খাওয়া ঘুরিয়া গেল। পলাইবার নিমিত্ত সে আকাশে উড়িল। দৃঢ়রূপে বীরবালা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। আকাশে উড়িতে উড়িতে ভূতবালক ক্রমাগত গা-ঝাড়া দিতে লাগিল, কিন্তু বীরবালা তাহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না, বীরবালাকে সে কিছুতেই ফেলিয়া দিতে পারিল না। উড়িতে উড়িতে ভূতবালক গিয়া মহাসমুদ্রের উপর উপস্থিত হইল, উড়িয়া উড়িয়া তাহার শ্রান্তি বোধ হইল। সমুদ্রের উপর একখানি জাহাজ যাইতেছে, সে দেখিতে পাইল। সেই জাহাজের মাস্তুলের উপর ভূতবালক গিয়া বসিল। এই সময় বীরবালা তাহার গলা ছাড়িয়া দিলেন, আর হাত দিয়া মাস্তুলের দড়ি ধরিলেন। ছাড়ান পাইয়া ভূতবালক তৎক্ষণাৎ উড়িয়া পালাইল।

মাস্তুল হইতে বীরবালা নামিয়া জাহাজের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। জাহাজের লোকে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলে আশ্চর্য হইল যে, এই অকূল সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজের উপর মানুষ

কোথা হইতে আসিল। আকাশ হইতে পড়িল না কি ? যাহা হউক, বীরবালা সেই জাহাজে রহিলেন। অল্পদিন পরে প্রবল ঝড় উঠিল, পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গ দ্বারা মহাসমুদ্র আলোড়িত হইতে লাগিল; জাহাজ ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। জাহাজের লোকে মনে করিল, বীরবালার আগমনেই তাহাদের এই বিপদ ঘটিতেছে। এ মানুষ্য নয়। ভূত কি ডাইন হইবে। আকাশ হইতে মানুষ আবার কবে কোথায়, জাহাজের উপর পড়ে ? এই মনে করিয়া রাত্রিকালে তাহারা বীরবালাকে সমুদ্র-জলে ফেলিয়া দিল। তরঙ্গ দ্বারা তাড়িত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে বীরবালা চলিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। যখন জ্ঞান হইল, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সমুদ্র-কূলে বালির উপর পড়িয়া আছেন। আস্তে আস্তে উঠিলেন, উঠিয়া চলিতে লাগিলেন। চারিদিকে বালুকাপ্রান্তর, ধূ ধূ করিতেছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই। যাইতে যাইতে একটি মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। উটে করিয়া মনুষ্যটি আসিতেছিল। বীরবালাকে ধরিয়া সে আপনার নিকট উটের পৃষ্ঠে বসাইল, উট চালাইয়া দিল। সাত দিন সাত রাত্রি বীরবালা সেই মনুষ্যের সহিত উটের পৃষ্ঠে যাইলেন। অবশেষে তাঁহারা একটি নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই মনুষ্য বীরবালাকে লইয়া এক জন অর্থবান ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিল। ক্রেতার নাম ইব্রাহিম। বীরবালা এক্ষণে জানিতে পারিলেন যে, তিনি আরব দেশে মক্কা নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

মক্কা নগরে ইব্রাহিমের ঘরে বীরবালা বাস করিতে লাগিলেন। সুন্দর শান্ত-প্রকৃতি বালক দেখিয়া ইব্রাহিম বীরবালাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। ইব্রাহিমের স্ত্রীও তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। কিছু দিন থাকিতে থাকিতে বীরবালা এক দিন ইব্রাহিমের বিবিকে আপনার সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন। তখন ইব্রাহিমের স্ত্রী বুঝিতে পারিলেন যে, বীরবালা বালক নন্ —বালিকা। স্বামীকে তিনি সকল কথা বলিলেন। স্ত্রী-পুরুষ বীরবালার দুঃখে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। দয়া করিয়া তাঁহারা বীরবালাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিলেন ও অর্থ দিয়া বণিকদের সহিত বোগদাদে প্রেরণ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

সাহেব ভূত

বীরবালা বোগদাদে উপস্থিত হইয়া শাহ সুলতানের বাটী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শাহ সুলতান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, অনায়াসেই তাঁহার তত্ত্ব পাইলেন। বীরবালা শুনিলেন যে, আজ এক বৎসর শাহ সুলতান মরিয়া গিয়াছেন। তিনি বিপুল ধন রাখিয়া গিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসরের একটি শিশু কন্যাকে সেই বিষয়ের অধিকারিণী করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফরাগৎ হোসেন, কন্যাটিকে তাড়াইয়া দিয়া সমুদয় বিষয় আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তাহার পর নানারূপ দুষ্ক্রিয়া দ্বারা অল্পদিনে সমুদয় বিষয় তিনি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। পথের ভিখারী হইয়া অবশেষে একটি সাহেবের বাড়িতে চাকরি করিতেছেন। এই সকল কথা শুনিয়া বীরবালার নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, শিশুটি আর কেহ নয় কমলা—এক্ষণে তিনি সেই শিশুটির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক সন্ধান করিয়া অনেক ক্লেশে, শেষে জানিতে পারিলেন যে, শাহ সুলতানের বাটী হইতে বিদূরিত হইয়া শিশুটি কয়েক দিনের নিমিত্ত পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল। একদিন গাছতলায় বসিয়া কাঁদিতেছিল, এমন সময় সেই পথ দিয়া একটি ইংরেজ বণিক ও তাঁহার স্ত্রী যাইতেছিলেন। নিরাশ্রয় শিশুটিকে দেখিয়া তাঁহাদের দয়া হইল। আদর করিয়া তাহাকে বাটী লইয়া যাইলেন। সেই অবধি ইংরেজ বণিকের ঘরে শিশুটি বাস করিতেছিল। ইংরেজ বণিকের সহসা সৌভাগ্যের উদয় হইল। সহসা তিনি বিপুল অর্থলাভ করিয়া স্বদেশে গমন করিলেন। শিশুটি তাঁদের সঙ্গেই রহিল।

এই কথা শুনিয়া বীরবালা হতাশ হইয়া পড়িলেন। বোগদাদে আসিয়াও কমলাকে পাইলেন না। কিন্তু কি করিবেন ? এক্ষণে বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন।

বহুদিন পরে ভূমধ্যসাগর-কূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কি করিয়া বিলাত যাইবেন, বিষণ্ণ-বদনে সেইখানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। নিজের দুরদৃষ্ট ভাবিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। নিঃশ্বাসটি যেই ফেলিয়াছেন, আর কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া নিকটে কে কাঁদিয়া উঠিল। চমকিত হইয়া বীরবালা চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটি সাহেব-ভূত! সাহেব-ভূত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"ওগো তুমি আমার সহিত এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার কেন করিলে? জোরে নিঃশ্বাস ফেলিলে কেন? এই দেখ আমার শরীরের জোড় সব খুলিয়া গেল।"

বীরবালা দেখিলেন, সত্য সত্যই সাহেব-ভূতের শরীরের জোড় সব খুলিয়া যাইতেছে। হাত, পা, নাক, কান খসিয়া পড়িতেছে।

সভয়ে বীরবালা বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি যে এখানে বসিয়াছিলেন, তাহা জানিতাম না। আপনার শরীরের জোড় যে এত ভঙ্গুর, তাহাও জানিতাম না। তাহা যদি জানিতাম, তাহা হইলে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলিতাম।"

সাহেব-ভূত পুনরায় বলিলেন, —"আমার আঙুল খসিয়া গেল, এখন আঙটি পরিব কোথায়? পা খসিয়া গেল, মল পরিব কোথায়? নাক খসিয়া গেল, নোলক পরিব কোথায়? কান খসিয়া গেল, মাকড়ি পরিব কোথায়?"

সাহেব-ভূতের দুঃখে বীরবালা দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! ইহার কি কোনও উপায় নাই?" ভূত বলিলেন, —"যদি তুমি কাদা দিয়া আমার হাত পা ভালো করিয়া জুড়িয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি ভালো হই।" বীরবালা তাহাই করিলেন। সুস্থ হইয়া সাহেব-ভূত বীরবালার সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। সাহেব-ভূত বলিলেন, —"তার ভাবনা কি? আমি এইক্ষণেই তোমাকে টেলিগ্রাফে বিলাত পাঠাইয়া দিতেছি। জন-সাহেব কমলাকে বিলাত লইয়া গিয়াছেন, রঙ্গিণী মেমের নিকট তোমাকে আমি পাঠাইব। আমি জীবিত থাকিতে রঙ্গিণী আমার স্ত্রী ছিলেন। জন-সাহেবের মেমের সহিত রঙ্গিণীর ভাব আছে।" এই বলিয়া সাহেব-ভূত সমুদ্রের বালি দিয়া বড়ো একটি টেলিগ্রাফের তার প্রস্তুত করিলেন। বীরবালাকে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন।

বীরবালা তাহার ভিতর প্রবেশ করিলে সাহেব-ভূত তারের বাঁটটি টক্ টক্ টক্ টক্ করিয়া নাড়িলেন, আর সেই মুহূর্তেই বীরবালা বিলাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। একেবারে রঙ্গিণীর ঘরের ভিতর গিয়া পৌঁছিলেন। আরসির নিকট দাঁড়াইয়া রঙ্গিণী তখন বেশ-ভূষা করিতেছিলেন, মুখে পাউডার মাখিতেছিলেন। সহসা বীরবালাকে ঘরের ভিতর আসিতে দেখিয়া তিনি চমকিত হইলেন।

রঙ্গিণীর নিকট বীরবালা সকল পরিচয় দিলেন। বীরবালা তাঁহার নিকট দুই এক দিন বাস করিলেন। তাহার পর রঙ্গিণী তাঁহাকে জন-সাহেবের নিকট লইয়া যাইলেন। জন-সাহেব বলিলেন যে, বোগদাদ হইতে কমলাকে তিনি বিলাতে আনিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এখানে আনিয়া কন্যাটিকে বিজয়ার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। বিজয়া অতি সম্ভ্রান্ত মহিলা, অতি দয়াময়ী, অতি পবিত্রপ্রাণা। শিশুটিকে তিনি নিজের কন্যার ন্যায় অতি যত্নে প্রতিপালন করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া বীরবালা বিজয়ার নিকট গমন করিলেন। কমলাকে দেশে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। অতি মধুর ভাষে বিজয়া বলিলেন,—"কমলা আমার প্রাণস্বরূপ। কমলাকে আমি কিছুতেই দিতে পারিব না।" ভূমে জানু পাতিয়া, জোড় হস্তে বীরবালা স্তুতি-বিনতি করিতে লাগিলেন। বীরবালা বলিলেন—"মহোদয়া! দয়াময়ী! দয়াময়ী বলিয়া সকলে আপনাকে জানে। আপনার প্রভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাস, দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে। আপনি পবিত্রতাময়ী। আপনার পবিত্রতা আদর্শ স্থল হইয়া ঘরে ঘরে আজ পবিত্রতার আবির্ভাব করিয়াছে। আমার পতিধর্মের প্রতি আপনি কৃপা করুন। আমার শ্বশুর ভারতসিংহের প্রতি আপনি কৃপা করুন। ভারতসিংহ বৃদ্ধ বুদ্ধিহীন হইয়াছেন। তাঁহার সংসার আজ শ্মশানভূমি হইয়াছে। কমলাকে প্রদান করুন। ধর্মকে আমি পুনরায় দেশে আনয়ন করি। ভারতসিংহের অন্ধকার সংসার পুনরায় আলোকিত হউক।"

এইরূপ স্তুতি-বিনতি শুনিয়া বিজয়ার মনে দয়া হইল, ভারতসিংহের দুর্দশা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। বীরবালার হস্তে কমলাকে সমর্পণ করিলেন। বীরবালা তাঁহার কে হন, তাহা শুনিয়া কমলার আর আহ্লাদের অবধি রহিল না। মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু সকলের মুখ দেখিবেন, সে জন্য কমলার মনে অপার আনন্দের উদয় হইল। বীরবালার গলা ধরিয়া কমলা কত কাঁদিলেন, কত হাসিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
পোষড়ার পিঠে

কমলাকে লইয়া বীরবালা দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। নিকটস্থ নগরে থকিয়া পিতাকে সংবাদ দিলেন। জবরদস্তসিংহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কন্যাকে পাইয়া, কমলাকে দেখিয়া জবরদস্তসিংহের আর সুখের পরিসীমা রহিল না। কমলাকে দেখাইয়া, যথাবিধি উপায় করিয়া, ধর্মদত্তকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিলেন। অবশেষে ধর্মদত্ত, বীরবালা ও কমলাকে সঙ্গে লইয়া তিনি ভারতসিংহের ভবনে উপস্থিত হইলেন। জবরদস্তসিংহ, বীরবালার পুনরাগমন, কমলা-লাভ, ধর্মের মুক্তি, এতদিন সকল কথা গোপন রাখিয়াছিলেন। আজ সকলকে লইয়া সহসা ভারতসিংহের বাটিতে উপস্থিত হইলেন। পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূ দেখিয়া ধর্মের মাতা স্বর্গ যেন হাত বাড়াইয়া পাইলেন। অমাবস্যা বাবাজীর মাথায় যেন বজ্রঘাত হইল। তিনি ভারতসিংহকে বলিলেন, —"আপনার এ পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূকে কিছুতেই ঘরে লওয়া হইবে না।" এই কথা শুনিয়া জবরদস্তসিংহ আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। বাবাজীর চিমটাটি সেই স্থানে পড়িয়া ছিল, চিমটার অগ্রভাগ অগ্নির ভিতর ছিল। অগ্নির উত্তাপে চিমটার অর্ধাংশ ঘোর রক্তবর্ণ হইয়াছেল। জবরদস্তসিংহ সেই চিমটাটি তুলিয়া লইয়া, তাহার অগ্রভাগ দ্বারা অমাবস্যা বাবাজীর নাক ধরিলেন। বাবাজীর নাসিকা পড় পড় শব্দে পুড়িতে লাগিল। তাহা হইতে দারুণ দুর্গন্ধময় ধূম নির্গত হইতে লগিল। যন্ত্রণায় বাবাজী চীৎকার করিতে লাগিলেন। আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, বাবাজী আপনার পৃষ্ঠে পক্ষীর মতো পাখা বাহির করিলেন। অবশেষে জানালা দিয়া উড়িয়া পালাইলেন।

সকলে আশ্চর্য হইলেন। সকলে তখন বুঝিলেন যে, অমাবস্যা বাবাজী মনুষ্য নন। অমাবস্যা বাবাজী যেই উড়িয়া যাইলেন, আর ভারতসিংহ যেন চমকিত হইয়া ঘোর নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন। নির্বাণ প্রায় তাঁহার চক্ষু দুইটিতে পুনরায় আলোকের সঞ্চার হইল, তাঁহার মুখ প্রভাময় হইল। সহসা ভারতসিংহের যেন পুনরায় নবযৌবন উদয় হইল। ধর্মদত্ত বীরবালা ও কমলাকে তিনি সাদরে কোলে করিলেন। মোহবশতঃ অন্ধ হইয়া স্ত্রী-পুত্রকে নানারূপ ক্লেশ দিয়াছিলেন, দেবদুর্লভ ধর্ম হেন পুত্র ও কমলা হেন কন্যারত্নকে তিনি বিসর্জন দিয়াছিলেন, সে জন্য ভারতসিংহ এক্ষণে মনোদুঃখে অতিশয় কাতর হইলেন, আকুল হইয়া মনের বেদনায় তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে বীরবালা ভাবিলেন, —"যদি ঘোমটাবতীকে দেখিতে পাই, ত তাঁহার চরণে একবার প্রণাম করি। তিনি আমার বড়ো উপকার করিয়াছেন।" এইরূপ ভাবিয়া বীরবালা একাকিনী মাঠের দিকে চলিলেন। কমলা যে স্থানে মাটিতে প্রোথিত হইয়াছিলেন, বীরবালা সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃক্ষতলে ঘোমটাবতী বসিয়া রহিয়াছেন, বীরবালা দেখিতে পাইলেন। করযোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —"মাতঃ! আপনি কে বলুন। আপনি যে ভূতিনী নন, তাহা আমি নিশ্চয় জানি। আপনি কে বলুন।" কোনওরূপ উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া ঘোমটাবতী ঘোমটা খুলিলেন। বিদ্যুৎপ্রায় তাঁহার রূপের ছটায় জগৎ আলোকিত করিল। বিশ্বসংসার শান্তিসুধায় সিক্ত হইল। আকাশের দ্বার উন্মুক্ত হইল। অপ্সরাগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। অপ্সরা বালকগণ মধুরতানে বীরবালার সাহস, বিক্রম ও পতিভক্তির গুণগান করিতে লাগিল।

বীরবালাকে মাঠের দিকে যাইতে ধর্মদাস দেখিয়াছিলেন। বীরবালার প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতেছে

দেখিয়া তাঁহার ভাবনা হইল। বীরবালার অনুসন্ধানে তিনিও মাঠের দিকে চলিলেন। মাঠের মাঝখানে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া ধর্মদত্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বীরবালা বসিয়া আছেন। অপ্সরাবালক-বালিকাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। কেহ তাঁহার চুল বাঁধিয়া দিতেছে, কেহ তাঁহার সুকোমল শরীর সুগন্ধ দ্বারা সিক্ত করিতেছে। আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলেন যে, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। ভালো করিয়া দেখিবার নিমিত্ত ধর্মদত্ত আকাশের দিকে মস্তক আরও উন্নত করিলেন। সবলে মাথাটি যেই তিনি তুলিলেন, আর তাঁহার ঘাড়টি খুট্ করিয়া উঠিল।

ঘাড়টি যেই খুট্ করিয়া উঠিল, আর সেই অপূর্ব দৃশ্য তাঁহার নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইল, দেখিলেন যে, তিনি সরযূকূলে অশ্বত্থমূলে ঠেশ দিয়া বসিয়া আছেন। আপনার শরীর পানে চাহিয়া দেখিলেন যে, সে শরীর ধর্মদত্তের শরীর নয়, আর কা'র শরীর। "আমি কে?" এই কথা লইয়া তাঁহার মনে ঘোরতর সংশয় উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সকল কথা মনে পড়িল। তিনি অযোধ্যানিবাসী দেবীসিংহ। স্বপ্নে তিনি আপনাকে ধর্মদত্ত মনে করিয়াছিলেন, আর এই সমস্ত অদ্ভুত রহস্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাকে স্বপ্নই বা কি করিয়া বলি। ক্ষণকালের নিমিত্তও তিনি তো নিদ্রা যান নাই। কেবল একবার মাত্র তাঁহার ঢুল আসিয়াছিল। সম্মুখ দিকে তাঁহার মাথাটি একবার ঢুলিয়া পড়িয়াছিল, আর সেই সময় তাঁহার ঘাড়টি একটু খুট্ করিয়াছিল। সেই মুহূর্তেই তিনি মাথাটি সোজা করিয়া লইলেন, আর ঘাড়টি আব একবার খুট্ করিল। এ কতটুকু সময়? কিন্তু এই ক্ষণকালের মধ্যেই তিনি এত কাণ্ড দেখিলেন, এত কাণ্ড শুনিলেন, এত কাণ্ড করিলেন। কি আশ্চর্য ব্যাপার। স্বপ্ন হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু বীরবালা যে স্বপ্ন, প্রকৃত দেবীরূপিণী নারী নন, সে কথা ভাবিযা দেবীসিংহেব মন বড়োই কাতর হইল। "যদি বীরবালাকে আর দেখিতে পাইব না, তবে এ জাগবণে প্রয়োজন কি? চিরনিদ্রায় কেন আমি অভিভূত হইয়া থাকিলাম না?"

দেবীসিংহ অতি কাতর হইয়া বৃক্ষেব দিকে চাহিলেন। দেখিলেন যে, বৃক্ষডালে একটি হনুমান বসিযা বহিয়াছে। সেইক্ষণেই চতুর্দশ বর্ষীয়া একটি পরমাসুন্দরী বালিকা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিল, —"মহাশয়! অযোধ্যা কি এই পথ দিয়া যাইতে হয়?" সে কণ্ঠস্বর, সে রূপ, দেবীসিংহের হৃদয়ে অঙ্কিত আছে, কখনও আব ভুলিবার নহে। চকিত হইয়া দেবীসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে ও বীববালা?"

বালিকাটি উত্তব কবিল, —"আজ্ঞা, হাঁ। আমার নাম বীরবালা বটে। আপনি আমাব নাম কি করিয়া জানিলেন?"

এই কথা বলিতে বলিতে বালিকাটির পিতা এবং তদীয় পরিবারবর্গ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরিচয় পাইয়া দেবীসিংহ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারাই তাঁহার শ্বশুর ও শ্বশুরবাড়ির লোক, বালিকাটি তাঁহার স্ত্রী। আর দেখ, আশ্চর্যের কথা কি বলিব। এই যে বালিকা বীরবালা তাঁহার স্ত্রী 'ইনি যেন সেই বীববালা' সেই স্বপ্নের বীরবালা। অদ্ভুত মানিয়া দেবীসিংহ গাছপানে পুনরায় চাহিয়া দেখিলেন। গাছের উপর বীব হনুমান বসিয়া হাসিতেছেন। দেবীসিংহ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সাদরে শ্বশুর ও তাঁহার পরিবারবর্গকে দেবীসিংহ বাটী লইয়া যাইলেন। বীরবালার রূপে, বীরবালার গুণে দেবীসিংহের পিতামহী ও আত্মীয়-স্বজন প্রতিবাসিগণ মুগ্ধ হইলেন। পৌষপার্বণের সময় গৃহে কুটুম্বেরা সমাগত হইয়াছেন। পিতামহী কত চাউল কুটিলেন, কত ডাইল বাটিলেন, কত নারিকেল কুরিলেন। নানাবিধ পিষ্টক করিয়া কুটুম্বদিগকে আহার করিতে দিলেন। এই বীরবালার গল্পটি যাঁহারা মনোযোগ দিয়া পাঠ করেন, চিরদিন তাঁহাদের ঘরে পৌষপার্বণের আনন্দ বিরাজ করে তাঁহাদের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়।

গো রা চাঁ দ

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যার মীমাংসা

নব বিধানের রহস্য-ভেদ শুনিয়া সমগ্র বঙ্গদেশ আন্দোলিত; রাজকুমার আলবার্টের মধ্যম পুত্রের প্রপিতামহী জুলুভূমি হইতে অনুচ্চর্যনামা বন্যজন্তু আনাইয়া জীবতত্ত্ববিষয়ক বিজ্ঞানের পরিধি বাড়াইতেছেন দেখিয়া, বিবাট-লাট-প্রতিনিধি পুণ্যভূমি আর্যভূমিতে একটি কাবুলী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সুচারুরূপে তাহার সেবা পবিচর্যাব বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, এবং এবম্বিধ বহুবিধ ঐতিহাসিক ব্যাপার পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া নৈসর্গিক নিয়মাবলীর অবিকলতা প্রতিপন্ন করিতেছে; এমন সময় খৃষ্টীয় শত একাশীতিতম অব্দের প্রথম এপ্রিল দিবসে বেলা ছয়টার পর গোরাচাঁদের বাড়িতে ভবপুব মজলিশ জমিযা গেল।

কোমলপ্রাণ পাঠক। বীরপ্রসবিনী পাঠিকে। প্রথম পবিচ্ছেদের প্রথম প্রকরণটা একটু কঠিন হইয়াছে বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। যখন বিদ্যাব বেগ সংবরণ করা যায় না, তখনই লেখকেরা গ্রন্থ আরম্ভ করে, সুতবাং ভাষাব জোয়ারের মুখে জঞ্জাল দেখা যাইবে, ইহাতে আশ্চর্য কি? আমি পাঠক মহাশয়ের স্বজাতি-বাৎসল্যেব—পাঠিকা ঠাকুবাণীর গুরুজনভক্তিব দিব্য করিয়া বলিতেছি, ইহার পর যাহা লিখিব, অতি প্রাঞ্জল নির্মল ভাষাতেই লিখিব। দন্তহীন ব্যক্তিব স্বাদবোধ অল্প; সেজন্য গোড়াতে একমুঠা একমুঠা চালভাজা ছোলাভাজা দিযা আপনাদেব অভ্যর্থনা করিলাম। আমি দরিদ্র—আতা, বাতাবি কোথায় পাইব? যদি অঙ্কুরেই অপ্রীতি না জন্মিযা থাকে, তাহা হইলে আসিতে আজ্ঞা হউক, আমার এ ভুনির দোকানে যাহা-কিছু আসে সকলই দেখাইব।

বাগবাজারের ঘোষপাড়াব একটা গলিতে প্রবেশ কবিয়া সূর্যদেব অদ্যকার মতো রাত্রিবাসরের জায়গা খুঁজিতেছিলেন; একটা প্রকাণ্ড নারিকেল গাছেব পশ্চিমদিকের পাতাগুলা তাই দেখিয়া হাসিতেছিল। পূর্বদিকেব পাতাগুলোর স্বভাব কিছু নম্র, আস্তে আস্তে অল্প অল্প মাথা মুড়িয়া ম্লান মুখে তাহাদিগকে হাসিতে বারণ করিতেছিল। ইত্যাদি। এ সমস্ত কবিকল্পনা; লেখকের বর্ণনশক্তিব পবিচয় মাত্র। প্রকৃত কথা পশ্চাৎ বলা যাইতেছে।

যেখানে সেই নারিকেল গাছ, তাহার উত্তরদিকেব ইটের প্রাচীব, তাহার উত্তরেই গলি; তাহাব পরেই দরজা দিয়া উত্তবমুখে প্রবেশ করিলেই গোরাচাঁদের বাড়ি। বাড়িব বর্ণন করিয়া আর কষ্ট দিব না, ফলে বাড়িখানা দুমহল। নির্ভয়চিত্তে, আমার সঙ্গে অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন, পূর্বদ্বারী একতালা ঘরের দরদালানে পাড়ার মহিলাগণের মজলিশ বসিয়া গিয়াছে। উপরে এই মজলিশের কথা বলিতে গিয়াই বর্ণনকণ্ডূয়নে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিলাম।

রামী, বামী, শামী, অলকা, তিলকা, মেনকা, বিমলমণি, কমলমণি, সূর্যমণি, হেবোর মা, পুঁটিব মা, খোকার মা, প্রভৃতি ছোটো বড়ো মাঝারী বয়সের বিস্তর মহিলা এই মজলিশে উপস্থিত। কেহ গা আদুড় করিয়া, কেহ পা ছড়াইয়া, কেহ আধ-ঘোমটা টানিযা— নানাভাবে নানা মহিলা বসিয়া আছেন। আর, কেহ বা দুয়ারের শিকল ধরিয়া, কেহ বা এক পায়ে ভর করিয়া দেয়ালে ঠেসান দিয়া, কেহ বা আঁচলের খুঁটে বাঁধা চাবির রিং আঙুলে ঘুরাইয়া অন্যমনস্ক হইয়া — কত জন কত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছেন। কেহ বাসরের গান ভাবিতেছেন, কেহ নূতন অপেরার নূতন টপ্পাটা বার বার মনে মনে আওড়াইতেছেন, কেহ অপরের নূতন ধরণের বেশবিন্যাসটা সপ্রণালী মৌনসমালোচনা করিতেছেন; কেহ বা গোরাচাঁদের বনিতাকে সাহস দিতেছেন, কেহ বা কল্পিত বহুদর্শিতার সুপারিশে তাঁহার আশঙ্কা বাড়াইতেছেন। ফল কথা নানারকমে নানাজনে কথা কহিতেছেন। হাসির উপদ্রবে, নিষেধের

তাড়নায়, পরামর্শের গভীরতায়, রোদনের শান্ত অভিনয়ে, নিতান্ত অগ্রাহ্য নয়, এমনতর একটা গোলযোগ সেখানে হইতেছে। মজলিশের উপস্থিত বিষয়— গোরাচাঁদের বনিতা আসন্নপ্রসবা।

যশোহর জেলায় পূর্বপ্রান্তে অপ্রসিদ্ধ-নামে এক পল্লী গ্রামে গোরাচাঁদের বনিতার বাপের বাড়ি; নাম বসুমতী। নামটা ঊনবিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত নয় মনে করিয়া, গোরাচাঁদ স্বীয় উত্তমার্ধকে বিকল্প বসন, বসনী বা বসী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, প্রাণান্তেও বসুমতী বলিতেন না আমি কিন্তু এ নিয়মের অধীনতা স্বীকার করিব না, যেখানে যেমন সুবিধা, সেখানে সেই নাম করিয়া গোরাচাঁদ-গৃহিণীর পরিচয় দিব।

বসুমতীর বয়স উনিশ বৎসর মাত্র, বর্ণ গৌর, এমন কি চুলগুলি পর্যন্ত খুব কালো নয়; গড়ন দীর্ঘাকার, একহারা, তবে সম্প্রতি তেহারা বলিয়াই মনে হয়; কপাল ছোটো; চক্ষু দুটি ডাগর, কিন্তু কোলে বসা; নাক সুদীর্ঘ, টিকলো, সরু; গাল দুখানি মরা মরা, উপর ঠোঁট খুব পাতলা, নীচের খানি পুরু, থুতনী খুব অল্প। বসুমতীর সুর চড়া, কিন্তু মিহি, অল্পেই নাকিতে উঠে। এহেন বসুমতী আসন্নপ্রসবা সেই মজলিশে বসিয়া আছেন, কদাচ দুই-একটি কথা কহিতেছেন। কিন্তু এত গোলে তাঁহাব কথা ধবা যাইতেছে না। যাঁহারা দেখিতে, দেখা করিতে বা দেখা দিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা নিজে নিজে কথা কহিয়াই পরিতুষ্ট, সুতরাং বসুমতীর কথা বুঝিলেও তাঁহাদের কোনো ক্ষতি হইতেছে না।

গোবাচাঁদ বাড়িতে ছিলেন না। "স্ত্রী-উত্তোলনী" সভার অদ্য বিশেষ অধিবেশন। সুতরাং সভাপতি গোঁবাচাঁদ বেলা একটাব সময় সেইখানেই গিয়াছিলেন। স্ত্রীর অবস্থা মনে ছিল না, বাড়িতে এ মজলিশ বসিবে তাহারও সংবাদ পান নাই, কাজে কাজেই সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘরে ফিরিয়া আসিলেন না। পাড়ার মেয়েরা গোরাচাঁদকে বড়ো ভয় করিত, আজি বাহিরে গোরাচাঁদের বিলম্ব হইবে টের পাইয়া মেয়েরা তাঁহার বাটীতে আসিয়া জুটিয়াছিল। এমত অবস্থায়, সন্ধ্যার পর গোরাচাঁদ যখন বাড়ি আসিলেন, তখন মজলিশের কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

গোরাচাঁদের পরিচয় দিবার এই সুযোগ হইয়াছে, অতএব পাঠক-পাঠিকাগণের সহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দেওয়া যাউক।

বর্ণচোরা আমের দোষ বা গুণ এই যে, ভিতরে পাকিয়া পচিবার উপক্রম হইলেও খোসা যে সবুজ সেই সবুজই রহিয়া যায়। বয়সের হিসাবে গোরাচাঁদও বর্ণচোরা আম; পঁচিশের উপর পঞ্চান্ন পর্যন্ত সকল বয়সই গোরাচাঁদের হইতে পারিত। কেবল এক বুড়ি মা বাড়িতে থাকাতেই গোরাচাঁদের বয়স চল্লিশেব নীচে রাখিতে পাড়া-প্রতিবাসী বাধ্য হইয়াছিল। নবদূর্বাদলশ্যাম, — (ইহার ভাবার্থ যাহাই হউক)—বিলক্ষণ খর্বাকৃতি, প্রশস্ত চতুষ্কোণ ললাট, স্থূলনাস, প্রবল হনুমন্ত, বর্তুলাক্ষ গুম্ফবিভূষিত নিষ্পিষ্ট ওষ্ঠাধর, বিরল অথচ দীর্ঘ শ্মশ্রু-শোভিত চিবুক, মস্তকে ধুসর কাশ্মীরার ক্যাপ, গলায় দু'হাতলম্বা কম্ফটর, আধ-চীনে-আধ-বিলাতী কালো আলপাকার কোট এবং সাদা জিন কাপড়ের পেন্টলুন পরা, হাতে পিচের মোটা ছড়ি, পায়ে গরাণহাটার ডবলস্প্রিং জুতা—পুষ্ট না হইলেও হৃষ্ট গোরাচাঁদ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়াকাশের চাঁদ (বসন) কাতর মুখে, কাতর ভাবে বসিয়া একাগ্রচিত্তে স্বীয় দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ দেখিতেছেন। ভীত, চিন্তিত, বা বিস্মিত না হইয়া বসুমতীর হাত ধরিলেন এবং শুদ্ধ হস্তবলের অনুরোধে তাঁহাকে শয়নগৃহে লইয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। বসুমতী মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু কথা কহিল না।

গোরাচাঁদের মা রান্না-ঘরে ছিলেন, জুতার শব্দে পুত্রের আগমন-বার্তা জানিতে পারিয়া ত্রস্ত ব্যস্তভাবে উপস্থিত হইয়া পুত্র-পুত্রবধূকে তদবস্থ দেখিতে পাইলেন।

জননীকে দেখিয়া গোরাচাঁদ বিরক্ত হইলেন। বসুমতীর হাত ছাড়িয়া দিয়া, স্বীয় বাম কটিতটে বামহস্তের মণিবন্ধ স্থাপন করিয়া, দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ তুলিয়া, সোজা অথচ একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া গোরাচাঁদ বলিলেন, —"যাও, তোমার রান্না ঘরে যাও—কর্তব্য পালন আগে, বিশ্রাম কি আমোদ, তার পর।

রুটি হয়েছে? — হয় নাই; ডাল হয়েছে? হয় নাই; চচ্চড়ি হয়েছে?— হয় নাই; মাছ ভাজা হয়েছে; —হয় নাই। আমি জানি, নিশ্চয় জানি, এ সব কিছুই হয় নাই। তবু তুমি কাজ ফেলে, আমার কাছে আমোদ করতে এলে। ছি। ছি।" মাকে সম্বোধন করিয়া এই পর্যন্ত। আপনা-আপনি খুব স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,—"মা মনে কর যে, মা হ'লেই বুঝি সাত খুন মাফ। এই এলুম একটা কাজ ক'রে, কোথায় দুটো মিষ্টি মুখের কথা শুনে মন তুষ্ট করব, পরিশ্রমের অবসাদ বিনাশ করব, না বুড়ি এসে সুমুখে দাঁড়ালেন। এদের কি বিবেচনার লেশ মাত্র নাই?"

মা থতমত, ভীত, সংকুচিত। বলিলেন—"না বাবা, এই বৌমার অসুখ করেছে, তাই বলতে এলুম, যদি কারুকে ডাক্‌তে টাক্‌তে হয় তা হ'লে—"

"তা হ'লে তোমার সাত গুষ্টির পিণ্ডি, আর আমার বাবার মাথা। তা হলে আবার কি? —যাও, যাও, বিরক্ত করো না।"

"আহা পরের জন্য বাছার আমার আহার-নিদ্রে নেই। খেটে খুটে এয়েছে"—বিড় বিড় করিয়া এইরূপ বলিতে বলিতে গোরাচাঁদের মা, কর্তব্য পালনের স্থান রন্ধনশালায় পলায়ন করিলেন।

তখন গোরাচাঁদ আবার পূর্বভাব অবলম্বন করিয়া, প্রেয়সীর হাতে ধরিয়া একটু উৎকণ্ঠা, একটু আগ্রহের স্বরে বলিলেন—"অসুখ হয়েছে? কি অসুখ, বসন? তোমার অসুখ করেছে? তোমার?"

বসন উত্তর দিতে বিলম্ব করিল। গোরাচাঁদ বসনের হাতে ধরিয়া বসনকে টানিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া গেলেন, খাটের উপর বসনকে সবলে উপবেশন করাইলেন।

বসুমতীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল, নয়ন-নদের পঙ্কিল জলে কপোলভূমি ভাসিয়া গেল। "তোমাব বসীর কি হয়েছে, তা কি তুমি জান না?" স্বল্পভাষিণী বসুমতী প্রত্যেক শব্দের পর এক এক দীর্ঘশ্বাস, অথবা কণ্ঠরোধসূচক অব্যক্ত ধ্বনি সহকারে কয়েকটি শব্দ প্রয়োগ করিয়া ক্ষান্ত হইল। গোরাচাঁদ মাথার টুপি খুলিতেছিলেন, খোলা হইল না, টুপির সঙ্গে হাতের যোড় লাগিয়া গেল।

"আমি ত জানি না যে, তোমার কোনো অসুখ করেছে। তোমার অসুখ জান্‌লে কি আমি এমনি স্থির হ'য়ে থাকবার লোক? তোমার জন্য আমি নদীব জল, গাছের পাতা, আকাশেব নক্ষত্র তন্ন তন্ন করে তোলপাড় করতে পারি, স্বর্গ মর্ত্য আন্দোলিত করতে পারি—আর, আমার সেই বসনের, আমার হৃদয়ের বসীর, আমার সেই তোমার অসুখ জেনেও আমি হিমাচলের মতো শীতল, অচলভাবে বসে থাকব, এও তোমার বিশ্বাস হয়?"

বসুমতী দেখিলেন বেগতিক। এখন এই যে প্রণয়-সরোবরের লহরীলীলা দেখিয়া তিনি সুখানুভব করিবেন, এমন অবস্থা তাঁহার নয়। কাজে কাজেই আর বাক্যাড়ম্বরের দিকে না গিয়া সাদা কথায় বলিয়া উঠিলেন,—"আজ বুঝি আমার ছেলে হবে। একটু একটু ব্যথা উঠেছে।"

গোরাচাঁদ। —"এই বুঝি অসুখ?"

বসুমতী। —"দত্তদের বাড়ির মেয়েদের কথা শুনে অবধি আমার ভয় আরও ভয় হচ্চে ওমা। তা হ'লে আমি কি করব?"

বসুমতী আবার কাঁদিয়া ফেলিল। দত্তদের বাড়ির মেয়েরা ভয় দেখাইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত কি না, বসুমতীর ব্যথা উঠিয়াছে, ডাক্তারকে প্রথমেই ডাকিয়া আনা উচিত কি না; যে জন্য যে স্ত্রী-পুরুষের সাম্য-সংস্থাপন জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ব্রত সার্থক করিবার এই সুযোগে কাজ হাসিল করিবার চেষ্টা করা উচিত কিনা—এই মানসিক বিতণ্ডায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গোরাচাঁদ একটু মৌনী হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে, শেষ চিন্তাই শ্রেষ্ঠ চিন্তা, এই সার করিয়া প্রফুল্লভাবে, হাসি হাসি মুখে বলিলেন,—

"বেশ হয়েছে! তোমার এই যে অসুখের কথা বলছ, এ চমৎকার হয়েছে। তোমার কষ্ট পাবার দরকার নাই, আমি স্বয়ং সন্তান প্রসব করব, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমাও গে। আমি

রইলুম, ছেলে প্রসবের ভারও আমার রইল।"

বসুমতী অবাক।

"সে কি? তুমি প্রসব করবে কি? তা যদি হ'ত, তবে আর ভাবনা কি বলো?"—অনেক কষ্টের উপরেও একটু হাসিয়া, বসুমতী এই কথা কয়টি বলিল।

"তা যদি হ'ত?—কেন? যদি কেন? তা হ'তেই হ'বে। তুমি যেটা অসম্ভব মনে করছ, সেটা আমাব মতে একটুকুও অসম্ভব নয়।—হাঁ আমি স্বীকার করি যে, এ পর্যন্ত পুরুষে কুত্রাপি প্রসব করে নাই। কিন্তু এর কারণ কি? কারণ শুদ্ধ পুরুষেব অত্যাচার, স্ত্রীজাতির বিড়ম্বনা, আর তোমাদের অর্থাৎ স্ত্রীলোকের কুঅভ্যাস। আগে রেলের গাড়ি ছিল না, তাই বলে কি রেলের গাড়ি হ'ল না? আগে কেবল পুরুষেই বই পড়ত, স্ত্রীলোকে রাঁধাবাড়া করত—এখন কি তা উল্‌টে যায় নি? কু-অভ্যাস, সমস্তই কু-অভ্যাস, আর কু-সংস্কার, আব অত্যাচার। আমাকে যদি মা বাপ ছাড়তে হয়, বাগবাজাব ছাড়তে হয়,—সেও স্বীকার, তবু এবার তোমাকে আমি প্রসব হ'তে দিচ্ছি না। আমি ফরাসডাঙ্গায় গিয়ে বাড়ি কবব, সেখানে নিজে প্রসব করব—তবু তোমাকে আর-কষ্ট সহ্য করিতে, একমাত্র স্ত্রীজাতিকে বিড়ম্বিত হ'তে দিব না।"

বক্তৃতা করিতে করিতে, গোরাচাঁদ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুত্রের ভাব দর্শনে গোরাচাঁদের মা কাতব ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাতের এক গোছা রুটি উননে পড়িয়া পুড়িতে লাগিল, পাডাব লোক একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল। মহা এক হুলস্থূল ব্যাপার। কিন্তু গোরাচাঁদের বিরাম নাই, নিবৃত্তি নাই। বাস্তবিক সদ্‌বক্তাব সুকবির, প্রতিভাশালী ব্যক্তি মাত্রেরই গুণ এই; ইহাবা তন্ময় হইযা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। নহিলে প্রতিভা কি? অসাধাবণতা কোথায়?

অনেকক্ষণ পরে গোবাচাঁদের চট্‌কা ভাঙিল। তখন তিনি বুঝিতে পাবিলেন যে, অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছে, বুঝিতে পারিলেন যে, আপনি বক্তৃতা করিতেছেন, আর কথাটা না কি নিজ গৌরবের কথা,—তাই মনে মনে একটু ইতস্তত কবিয়া গোরাচাঁদ বুঝিতে পারিলেন যে, শুদ্ধ বক্তৃতার ইন্দ্রজালে জড়িত এবং বিমোহিত হইয়াই এত লোকে সমবেত হইয়াছে। গোরাচাঁদ সিদ্ধবক্তা:—জনতাই তাঁহার ঘর বাড়ি, জনতাই তাঁহার অস্থি-মাংস। মৎস্যের যেমন জল, নক্ষত্রের যেমন আকাশ, অগ্নির যেমন ইন্ধন, জনতাও গোরাচাঁদের তদ্রূপ, সুতরাং গোবাচাঁদ বিস্মিত হইলেন না, সস্মিত-বদনে হতবুদ্ধি জননীকে বলিলেন,—"মা, এক গেলাস জল নে এস দেখি"—বলিয়া সেই স্ত্রীবহুল লোকসমুদ্রে নয়ন সঞ্চালনপূর্বক দেখিলেন, সংবাদপত্রের লেখক তাহাতে ভাসিতেছেন কি না। দেখিলেন, কিন্তু বৃথা! যেহেতু, সংবাদপত্রের সম্পর্কীয় নরনারী কেহ তথায় ছিল না। সংসাবের দোষই এই, শিয়রে সময়মতো ইতিবেত্তা থাকে না বলিয়া আমাদের কত কত সোনার স্বপ্ন স্বপ্নেই বিলীন হইযা যায়।

জননী জল আনিবার অভিপ্রায়ে ঘরের ভিতর গিয়া দেখিলেন যে, বৌমা বিছনায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ কবিতেছেন, এবং কাতরভাবে—"মাগো মরচি গো, আর বাঁচলাম না গো" ইত্যাদি শব্দ করিতেছেন। সুতরাং জলের কথা ভুলিয়া বৌমার শুশ্রূষা করিতে বসিয়া গেলেন। অভ্যাস দোষেই হউক, কুল-ধর্মের গুণেই হউক, বসুমতী যে তখন বিলক্ষণ কষ্টভোগ করিতেছিল, তাহার আর কথাটি নাই। এবং গোরাচাঁদের মা যে সে কষ্ট বুঝিতেছিলেন, তাহারও সংশয় নাই। সুতরাং প্রিয় পুত্রের পিপাসার কথা ভুলিয়া যাওয়াতে তিনি যে একটা খুব গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন, এ কথা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

জল আসিল না দেখিয়া গোরাচাঁদ অতিশয় ত্যক্ত হইলেন। বক্তৃতা ব্যাপারের দুইটা প্রধান অঙ্গ—সংবাদপত্রের লিপিকর এবং জলের গেলাস—অনুপস্থিত দেখিয়া উপস্থিত মহিলামণ্ডলীর উপর গোরাচাঁদ কটূক্তি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"তুই মাগীরেই তো যত দোষের গুরু। আপনি ভালো হবি না, পরকেও হ'তে দিবি না।—তোর

আপনার নাক কাটিস্, কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করিস্। সংকার্যে যোগদান, —আপনাদের উপকারের কথাতে উৎসাহ—দূরে থাক, বাপ পিতামহের ব্যাভারের উল্লেখ ক'রে আবার আমাদেরই টিটকারি করাটুকু আছে। এখানে তামাশা দেখতে এয়েছেন, —আমার—চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ দেখ্‌তে এয়েছেন। বেরো আমার বাড়ি থেকে। বেরো, বললুম বেরো। এক্ষুনি বেরো। নইলে এক এক কিলে তোদের নাক থেঁতো ক'রে দেবো, জানিস্ নে?"

স্ত্রীলোকেরা গোরাচাঁদকে ভয় করিত, তাহা উপরে বলা হইয়াছে। কেন তাহারা ভয় করিত, তাহাও এখন জানা গেল। তিরস্কারের তাড়নায় রমণীগণ দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিল।

সেই রাগের ভরেই গোরাচাঁদ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, জননীর উপস্থিতির প্রতি দৃকপাত না করিয়া, ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, —"বসন। এই তোমাকে শেষবার জিজ্ঞাসা করছি, তুমি আমাকে প্রসব করতে দিবে কি না?"

"বসন" নিরুত্তর। পূর্ববৎ এ পাশ, ও পাশ, হা হুতাশ করিতে লাগিলেন।

"বাবা গোরাচাঁদ"—বলিয়া জননী মুখ ব্যাদান করিতে না করিতে, একবার তীব্র দৃষ্টির পর এক লম্ফ প্রদানে গোরাচাঁদ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; এবং সেই রাত্রি নয়টার সময়ে স্ত্রীব দুরভিসন্ধির প্রতিবিধান কল্পে কিংকর্তব্য স্থির করিবার জন্য সভাগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। মনে মনে সংকল্প করিয়া চলিলেন, যে স্ত্রী-পুরুষের সাম্য বিধান জন্য আবশ্যক মতো বল প্রয়োগ করাও বিহিত, সভায় এইরূপ অবধারণ করিয়া সভার কার্য-বিবরণে ইহা লিপিবদ্ধ কবাইয়া লইবেন। নচেৎ এ সমস্যা পূরণের উপায়ান্তর নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(পাঠক-পাঠিকার মরণ বাঁচন গ্রন্থকর্তারই হাতে।)

তখন দ্বিতীয় প্রহর বাত্রি উত্তীর্ণ হইয়াছে। এমন যে কলিকাতা সহব, তাহাও এক প্রকার নিস্তব্ধ হইয়াছে; এত যে জনস্রোত, তাহাও যেন শুকাইয়া, শীর্ণ হইয়া, সংকুচিত হইয়া, বালুকারাশির মধ্যে অন্তর্ধান হইয়াছে। (পাঠক মহাশয় সমীপেষু, —জনস্রোতের অনুরোধ আমি অবশ্য মানি; কিন্তু এস্থলে বালুকারাশি যে কোন্ পদার্থের উপমান, তাহা আমি অবগত নহি)। কেবল কদাচ কোথাও একখান ভাড়াটে গাড়ি ভয় দেখাইবাব জন্য বিকট শব্দসহকারে মৃতপ্রায় অশ্বযুগলের অনুধাবন করিতেছে; অশ্বদ্বযও প্রাণের দায়ে একমনে [illegible]ক ভাবে চলিয়াছে। অনেকে ভূত মানে না, কিন্তু ভূতকে বড়ো ভয় কবে; রাত্রিকালে সন্দিগ্ধ স্থল দিয়া যাইতে হইলে ভয়ে দৌড়িতে পারে না; থামিয়া পশ্চাৎ ফিবিয়া দেখিতেও সাহস করে না। ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়ার অবস্থাও সেইরূপ। কোনও কোনও স্থানে বেড়ার গায়ে, দেওয়ালের গায়ে, রেলিঙের গায়ে, ঠেস্ দিয়া চক্ষু মুদিয়া আন্ধাবিয়া লাণ্ঠান হাতে এক এক জন পাহারাওয়ালা দুইটি পরমতত্ত্বের ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে; এক—সার্জন সাহেব এ পথে না আইসে; অপর —একটা চোর কিংবা মাতাল গায়ে পড়িয়া ধরা দেয়। যাহারা পাখা টানে আর যাহারা পাহাবা দেয়, তাহারা ইহকাল পরকাল একসঙ্গে রক্ষা করে—ধ্যান ছাড়ে না, অথচ কাজ ভোলে না। ইহা ছাড়া, পথের ধারে কিংবা দোতলায় উপরে কোথায়ও বাঁয়া তবলা, মানুষের গলা প্রভৃতি হইতে ওয়াক্ ওয়াক্ মিশ্রিত অনির্বচনীয় শব্দে নেশায় তর্‌র্ কলিকাতার বিরক্তি সম্পাদন করিতেছে। ঘুমাইয়াও কলিকাতা ঘুমাইতে পাইতেছে না।

ফলে আমি প্রকৃতি বর্ণন করিতে বসি নাই, পটও আঁকিব না। গোরাচাঁদ না কি সভাস্থল হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছেন, তাই ঐতিহাসিক নবাখ্যানের সার্থকতা রক্ষা করিবার জন্যই এত বাক্য ব্যয় করিতেছি। আপনারা সেটা ভুলিবেন না।

তত রাত্রিতে সভায় গিয়া গোরাচাঁদ দেখিলেন, সভাগৃহের দ্বার রুদ্ধ, সুতরাং প্রবেশ করিবার

উপায় নাই। যে সে লোক হইলে হতশ্বাস হইয়া এইখানেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিত। কিন্তু গোরাচাঁদের অধ্যবসায় অপ্রতিহন্য; সংকল্প অটল, সাহস দুর্জয়। অসাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু গোরাচাঁদের অভীষ্ট বিচলিত হইতে পারে না। অনেক উত্তম উত্তম উপমা দিয়া এ বাক্য সমুজ্জ্বল করিতে পারিতাম, কিন্তু প্রয়োজনাভাব। যে অসম্ভবকে বাস্তব করিতে বদ্ধপরিকর, তাহার প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে উপমা প্রয়োগ করা ধৃষ্টতা ত বটেই, পূর্ণ বাতুলতা।

স্ত্রী-উত্তোলনীর সম্পাদকের বাড়ি গোরাচাঁদ স্বয়ং গেলেন, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া সভ্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়া আবশ্যক সংখ্যা পূরণ করিয়া সকলে মিলিয়া সভাতলে উপনীত হইলেন।

অসাধারণ সভাব এই অসাধারণ অধিবেশন খুব জমিয়া গেল, ইহা বলাই বাহুল্য। ক্রমে প্রস্তাব বক্তৃতা, বাদ, অনুবাদ, প্রতিবাদ, বিতর্ক বিতণ্ডা— কত বলিব? আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি ক্ষুদ্র মানব, কেমন করিয়া সে বাক্যসাগর মসীরেখায় অঙ্কিত করিব? সাহারার মরুভূমি যদি কাগজ হইত, মিশরের শিখামন্দির[১] যদি লেখনী হইত, ভূমধ্যসাগর যদি দোয়াত হইত, তাহা হইলেও এই সভার, এই রজনীর কার্যবিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে সাহস করিতাম কি না, বলা যায় না। আমার বর্তমান অবস্থায়,উপস্থিত উপকরণ লইয়া ত কোনোমতেই নয়। আপনারা এইস্থলে একটা বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন, উপবে যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ভাবত ছাড়া। পাণ্ডিত্য থাকিলে, আর পাণ্ডিত্য দেখাইতে হইলে এরূপ নহিলে হয় না; ফল কথা, আমি সে কার্যবিবরণ এখানে তুলিতে সাহসী হইলাম না; সদ্য সদ্য তাহা না পড়িলে যাঁহাব সংসার অচল হইবে, তিনি সভাসম্পাদকের খাতায় পড়িয়া আসিতে পারেন; আর, অপেক্ষা করা যদি চলে, তবে আগামী কল্য মন্তব্য সমেত সংবাদপত্রে পাঠ করিতে পারিবেন।

স্ত্রী-পুরুষের সম্যক্ সাম্য বিধান জন্য গোরাচাঁদ যথাবিধি প্রস্তাব করিলেন। যথাবিধি গোরাচাঁদের সে প্রস্তাব গৃহীত, অনুমোদিত, অবলম্বিত এবং সভার পুস্তকে লিখিত আকাবে পরিণত হইল। একটু বলা আবশ্যক। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, জয়েব পূর্বে যুদ্ধও অবশ্যম্ভাবী, নহিলে জয় কিসে? অতএব গোরাচাঁদের প্রস্তাবে বাধা উপস্থিত করিয়া, তাহার বিরোধ চেষ্টা করিয়া কেহ যে নিজ দুর্বলতা, অসমসাহসিকতা প্রকাশ করিয়াছিল, ইহা না বলিলেও চলে।

সেই জয়ে উল্লসিত হইয়া, সভাভঙ্গেব পব দ্বিপ্রহর রাত্রি অতীত কবিয়া গোবাচাঁদ কর্ণবালিস[২] রথ্যা অবলম্বনে বাটি যাইতেছিলেন। তাহাতে সুকিয়ার গলির মোড়ের সম্মুখে গ্রন্থকাবের সহিত দেখা। সেই কথাটা জানাইবার জন্য আমাব এ প্রয়াস। অনেক কথা বলিতে ভুলিযাছি; তন্মধ্যে এক কথা এই যে, মির্জাপুর বথ্যাব কোনও এক স্থানে স্ত্রী-উত্তোলনীব কারখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল; সেই ধড়া-চূড়া বাঁধা গোরাচাঁদ সেই স্থান হইতে বাড়ি যাইতেছিলেন। আর এক কথা এই যে, গাড়ি ভাড়ার পযসা সঙ্গে ছিল না বলিয়া গোবাচাঁদ একাকী পদব্রজে যাইতেছিলেন। এই অর্থাভাবে এই ইতিহাসের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, গোরাচাঁদ গাড়ি হাঁকাইযা যাইতে পারিলে আমরা সঙ্গে যাইতে পবিতাম না। অত-এব ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক নিঃশ্বাস পদসঞ্চারে আমার এবং গোরাচাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলুন।

যাহাদের মানসক্ষেত্রের পরিসর অল্প, এরূপ ক্ষুদ্রপ্রাণ মনুষ্যগণ উন্মত্ত হইয়া উঠে। কিন্তু গোরাচাঁদ বিরাট পুরুষ, উন্মত্ত হইলেন না; তাই বলিয়া অন্তরের তরঙ্গ-বিক্ষোভে তিনি যে একটুকুও বিচলিত হন নাই, এমন বলিতে পারি না। প্রাকৃতিক বলের সংঘর্ষ একেবারে পরিহার্য নহে, ভূকম্পে ভূধরও টলিয়া যায়। সুতরাং গোরাচাঁদ চলিতে চলিতে এক একবার দণ্ডায়মান হইবেন, থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গভঙ্গীসমেত সবলে দক্ষিণ হস্তের সঞ্চালন, বাম করতলে দক্ষিণ করমুষ্টি সশব্দে প্রহার করিবেন, ইহা আশ্চর্য নহে। এক পার্শ্ববর্তী পাদপচ্ছা হইতে অপর দিকের পাদপচ্ছায়, আবার এধার হইতে ওধার— বার বার গোরাচাঁদ এ প্রকার করিয়া চলিতেছিলেন, তাহাও আমি অস্বীকার করি না, অস্থিরমতিতে

---

১ অগ্নিশিখাকার স্তূপ Egyptian Pyramid

২ Cornwallis street

পদ-বিক্ষেপ অস্থির হইয়াছিল, তাহাও আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু ইহার কারণ ছিল।

সভাতে গোরাচাঁদ কৃতকার্য, সিদ্ধকাম হইয়াছেন, সভার নির্ধারিত প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া বসুমতী আর আপত্তি করিতে পারিবে না, সহজেই পুরুষত্ব লাভে সম্মত হইবে, সমগ্র নারীকুল বাধ্য হইয়া দায়ে পড়িয়া সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে, ইহা চাপিয়া রাখিবার আনন্দ নহে। এখন, এই গৌরবের কথা, এই আনন্দের কথা, দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘোষিত হইবে বটে, কিন্তু অদ্য রাত্রিতেই "বঙ্গমশালে" এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধ লেখাইতে যাওয়া কর্তব্য কিনা, গোরাচাঁদ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কাজে কাজেই তাঁহাকে সর্পগতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, কাজে কাজেই মাঝে মাঝে থমকিয়া দাঁড়াইতে হইতেছিল। গোরাচাঁদ একবার ভাবেন "বঙ্গমশালের" বাড়ি যাই, অমনি রাস্তার ডান ধারে উপস্থিত, আবার মনে করেন, "বঙ্গমশাল" হয়ত এতক্ষণ ঘুমাইয়াছে, অমনি দাঁড়াইয়া মাথা কাঁপাইয়া চিন্তা; তখনি স্থির করেন—আত্মগৌরব পরমুখে ব্যক্ত হইলেই ভালো, সঙ্গে সঙ্গে বেগে রাস্তার বাঁ ধারে আসিয়া পড়েন; ক্ষণে আবার যুগপৎ সমস্ত ভাবের সমাবেশ হয়, তখন এক পা তুলিতে এক পা পড়িয়া যায়, দু পা আগে হাঁটিতে এক পা পাছে সরিয়া যায়, যেখানকার সেইখানে পা থাকিতে দেহপ্রতিমা দুই বার বামে, দুই বার দক্ষিণে হেলিয়া যায়। ফলতঃ গোরাচাঁদের সেই আপাতদৃশ্যমান অস্থিরতার কারণ ছিল, ইহা আমি দেখাইলাম। সে কারণ "বঙ্গমশাল"। "বঙ্গমশাল" যে বঙ্গদেশীয় বঙ্গভাষাবিরচিত, বঙ্গোন্নতির কেন্দ্রীভূত জগদ্বিখ্যাত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, এ কথা যে না জানে,—মহারাজা, রাজা এবং রায় বাহাদুরের তালিকা হইতে তাহার নাম খারিজ করিয়া দেওয়া উচিত। আবশ্যক হইলে "বঙ্গমশাল" সম্বন্ধে অন্য কথা পশ্চাৎ।

উপরে বলা হইয়াছে—বৃথা কথা আমি বলি না—রাস্তার ধারে স্থানে স্থানে পাহারাওয়ালা ছিল। একজন পাহারাওয়ালা একটা আলোকস্তম্ভে নির্ভর করিয়া মুদিত-নয়নে ভাবনা করিতেছিল যে, ব্রজবাসিনী গোপীগণের ভাণ্ড ভাঙিয়া নবনী চুরি করিয়া কিষণজী বড়ো উত্ত্যক্ত করিতেছেন, যশোদামাইব খাতিরে কেহ কিছু বলিত না, আর তেমন হুঁসিয়ার পাহারাওয়ালাও সে আমলে ছিল না এখন এই "কোম্পানির" মুলুকে আমার সামনে পড়িল কিষণজী যেই ননীর ভাঁড় হইতে হাতটি তুলিতেন, অমনি খপ্ করিয়া—ভগবৎধ্যানমগ্ন পাহারাওয়ালা সত্য সত্য দক্ষিণ হস্তখানি বাড়াইয়াছে, এমন সময়ে দৈবের বিচিত্র সমাবেশ, গোরাচাঁদের দেহখানি সেই হাতখানির প্রান্তদেশে উপস্থিত। সুতরাং সংস্পর্শ; ফল, উভয়েরই ধ্যানভঙ্গ। একভাব হইতে ভাবান্তর প্রাপ্তির কারণ নির্দেশ করিতে বড়ো বড়ো দার্শনিকগণ সমর্থ হন নাই; সুতরাং 'কিষণজী' ভাবিতে ভাবিতে পাহারাওয়ালা কেন যে 'শ্বশুরা' বলিয়া উঠিল, আমি কেমন করিয়া জানিব? কিন্তু বলিল 'শ্বশুরা।' গোরাচাঁদও "বঙ্গমশাল" ভাবিতেছিলেন, সহসা বলিয়া উঠিলেন—"ক্যা হ্যায়"। চিত্তবৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতেই নাটকের উৎপত্তি; শব্দের উপর শব্দ পড়িলেই গোলযোগের উৎপত্তি; এ নাকি নৈসর্গিক নিয়ম, তাই এ স্থলেও ইহার কার্য হইল। পাহারাওয়ালা পূর্বে কেবল 'শ্বশুরা' বলিয়াছিল, এখন বলিল "শ্বশুরা, বাউরা, মাতোয়ারা"। অগত্য গোরাচাঁদের মুখে "যও" অর্থাৎ সরিয়া যাও ধ্বনিত হইল। পাহারাওয়ালা পুনরপি বলিল "চলো থানা পর" এবং সর্বাঙ্গ চঞ্চল করিল। গোরাচাঁদও ইংরেজি ভাষায় উত্তর দিয়া সর্বাঙ্গ অধিকতর সঞ্চালন করিলেন। ফল হইল উভয়ের বেগে গমন, অগ্রে গোরাচাঁদ, পশ্চাৎ পাহারাওয়ালা; ক্রমে রীতিমতো নরদৌড়, সঙ্গে সঙ্গে শব্দ—"পাকড়ো চোর—মাতোয়ারা" ইত্যাদি।

দৌড়। দৌড়। দৌড়। নিরপরাধ পরহিতপরায়ণ গোরাচাঁদ জানেন না যে কেন দৌড়িতেছেন, তথাপি দৌড়। সাহস নাই এমন নয়, —এত রাত্রিতে সভ্য সংগ্রহ, সভা হইতে একাকী প্রত্যাগমন ভীরু লোকে পারে না। শরীরে বল নাই এমত নয়, —জ্বরের উচ্ছিষ্ট প্লীহাগর্ভ বঙ্গবাসী সহজে এত বেগবান্ হইতে পারে না, তবু দৌড়। ভ্রম বশত দৌড়। পাহারাওয়ালা দৌড়িতেছে, সেও ভ্রম বশত দৌড়। সংসারে কয়জন ফিরিয়া দেখে? সংসারের গতিকই এই।

ইঁহারা দৌড়ুন, কিন্তু পাঠক-পাঠিকা এখন নিতান্তই গ্রন্থকারের হাতে। এখন আমি মারিলে মারিতে পারি, রাখিলে রাখিতে পারি; এখন একমাত্র আমার দয়ার উপর নির্ভর। এই জন্যই গ্রন্থকারের এত সম্মান, লোকে গ্রন্থকারদের এত ভয় করে। নিত্য নিত্য দেখিতে পাও না, দক্ষিণা দিয়া হাসি হাসি মুখে গ্রন্থকারের কর-কবলিত হইয়া কত সুশীল সুবোধ পাঠক শেষে কাঁদিয়াও নিস্তার পান না? অতি কোমল শয্যায় সবলে শোয়াইয়া দিলেও যাহার অস্থিভঙ্গের সম্ভাবনা, এমন কোমলপ্রাণা, পাঠকের ভালোবাসার ধন, নায়িকাকেও উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে তুলিয়া 'এই ফেলি, এই ফেলি' করিয়া গ্রন্থকার ছাড়িয়া দেন, বহু অশ্রুপাত, বহুতর বিচ্ছেদ, বহুতর দুঃখ ভুঞ্জাইয়া আশার সুখপ্রান্ত সংস্পর্শ করাইয়া ধীর শান্ত নায়ককেও গ্রন্থকার ভদ্রাসনের খিড়কির বাঁধা ঘাটের নিম্নে অতল সাগরতলে নিমজ্জমান রাখিয়া ভদ্রলোকের মতো সরিয়া দাঁড়ান। গ্রন্থকারের এই রীতি। এক্তেয়ার আছে বলিয়াই এই কার্দানি। আমিও ত গ্রন্থকার।

গোরাচাঁদ অনন্তক্ষেত্র ব্যাপিয়া অনন্তকাল পর্যন্ত পাহারাওয়ালা-তাড়িত হইয়া দৌড়িতে পারেন; মুহূর্ত মধ্যে পাহারাওয়ালার করাল কবলে কবলিত হইতে পারেন; অথবা বিপদ্-প্রশান্তমহাসাগরের সন্তরণ লীলা দেখাইয়া পাঠকের অলক্ষিতে, পাঠিকার অতর্কিতে বেলা-ভূমিতে পদার্পণ করিয়া হাস্যরাশি বিকীর্ণ করিতে পারেন; পারেন বটে, কিন্তু আমি রাজি হইলে ত? সেই জন্যই বলিয়াছি, পাঠক-পাঠিকার মরণ বাঁচন গ্রন্থকর্তারই হাতে।

এখন আপনাদের ধৈর্য পরীক্ষা করিবার জন্য আমি একবার বিশ্রাম লভিব; আপনারা ভাবিতে থাকুন।

ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী

মা তৃ ভ ক্তি

অমৃতলাল বসু

মেমারি ষ্টেশনে নেমে বেলা ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত কাঁচা রাস্তাতে হেঁটে গেলে বাঁশখালি গ্রামে পৌঁছানো যায়। ঐ গ্রামের সুদাম মণ্ডল জাতিতে মাহিষ্য এবং পল্লীগ্রামের পক্ষে যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন। প্রায় এক বিঘা জমির উপর বাস্তু; খড়ের বাড়ি কিন্তু সদরে একখানি প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, তারদু'ধারে ও অন্দরে বড়ো বড়ো চালা, বাড়ির নিকটেই মস্ত বাগান, বড়ো বড়ো পুকুর, আম কাঁটাল জাম লিচু পেয়ারা পেঁপে ডালিম চালতা আমড়া নোড় প্রভৃতির গাছ, তাল গাছ, খেজুর গাছ-ও প্রচুর, ফলন্ত নারিকেল গাছ-ও ১০।১২টা আছে। বাড়িতে নারায়ণ-শিলা প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং নিত্য-সেবার জন্য বক করবী কুরচী স্থল-পদ্ম শেফালী চাঁপা কৃষ্ণকলি বেল যুঁই মল্লিকা এবং নানাবিধ দিশী ফুলের গাছ আছে। ভিটের আধরশিটাক্ তফাতে ৩।৪ টি বড়ো বড়ো গোলা, তা'তে দু' তিন রকম ধান ডাল কলাই সরষে তিল প্রভৃতি সর্বদা বহু পরিমাণে মজুত থাকে। জমাজমি বিস্তর, তরিতরকারি শাকপাতা মাছ কিছু-ই কিনে খেতে হয় না, ক্ষেতের দোক্তায় ও ক্ষেতের আকের গুড়ের সাহায্যেই ঐ শ্রান্তিহর আলস্য-রঞ্জন বস্তু প্রস্তুত হয়। হেলে গরু ও দুধেলা গাই থাকবার জন্যে যে গোয়াল-বাড়িটা আছে, সেটি-ও নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়।

সুদামরা চার ভাই, সকলে-ই বিবাহিত, ছেলেপুলে-ও সবার হয়েছে। এ ছাড়া বিধবা খুড়ি জ্যেঠাই মাসী পিসী দিদি বোন ভাগ্নে ভাগ্নী এবং বাঙালী গৃহস্থের অবশ্য-পোষ্য এবং দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের

অবস্থানে ভিটাখানিতে মা-লক্ষ্মী আপনার অপূর্ব শ্রী দিয়ে ফুল ফুটিয়ে রেখেছেন।

সুদামের ছোটো ভাই মুকুন্দ ছেলেবেলায় গ্রামের পাঠশালায় অর্জুন সরকারের কাছে কাগজে লেখা পর্যন্ত শেষ করে 'সরকার' উপাধি পায়, সেই জন্য সে নাম লিখিবার সময় 'মণ্ডল' না লিখে মুকুন্দ সরকার ব'লে দস্তখত ক'রত। চিঠা দাখিলা দলিল দস্তাবেজ এক রকম পড়তে পারত, জমিদারী কাছারিতে কি সরকারী আদালতে মামলা টামলা তদবীরের ভার মুকুন্দের উপর-ই ছিল। মুকুন্দ ভিন্ন পরিবারস্থ অন্য সকল পুরুষই নিরক্ষর; তবে মুখে-মুখে হিসেব-নিকেশ করায় নিরক্ষর অগ্রজেরা কেহ-ই মকুন্দ অপেক্ষা অল্প পটু ছিলেন না।

এই মাহিষ্য-পরিবারের মধ্যে আর একটি প্রাণী মুদ্রিত অক্ষরের সহিত পরিচিত ছিলেন; সেই প্রাণীটি সুদাম মণ্ডলের অষ্টাদশ বর্ষীয়া রূপসী কন্যা। মণ্ডলের বড়ো গিন্নী স্বামীকে দু'টি পুত্র সন্তান দান ক'রে প্রায় আট বৎসর সৃষ্টি-রক্ষার সাহায্যে বিরত থাকার পর এই কন্যা-রত্নের দেহ-জ্যোতিঃতে সূতিকাগৃহ উজ্জ্বল করিয়া দিবার উপলক্ষ হয়েন।

অন্নপ্রাশনের পূর্বেই যে এ কন্যার নাম রত্নময়ী হ'বে সেটা অতি সহজ; আর অন্নপ্রাশনের সময় এই কন্যার লাবণ্যবিম্বে যে রজত-কাঞ্চন-ভূষণ প্রতিবিম্বিত হবে, তা' মণ্ডলদের পারিবারিক ইতিহাসে নূতন ঘটনা হ'লেও গ্রামবাসীদের মনে কোনও-রূপ বিস্ময়োৎপাদন করে নি।

যদি-ও মণ্ডল-পরিবারের সধবারা নিরাভরণা ছিলেন না, তথাপি চাষে-কারবাবে শিক্ষিত সুদাম মণ্ডল খাটাবার টাকা আটক ক'রে সোনারূপোকে আগুনে পোড়ানোটা গৃহস্থ লোকেদের পক্ষে বড়ো একটা সুলক্ষণ ব'লে মনে করতেন না। কিন্তু অপ্রত্যাশিত অতিথির প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন-ছলে পিতা এ ক্ষেত্রে হাঁসুলি পদক তাগা ও বালায় প্রায় পাঁচ ভরির উপর কিছু সোনা ও কোমরেব নিমফল পায়ের মল ও বেঁকীতে প্রায় বারো ভরি রূপো বাজে খরচ করেছিলেন।

রত্নময়ী যখন সাত বছরে পড়ে তখন মহা সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশী রাজবল্লভ কবিরাজ মহাশয়ের দৌহিত্রী বিজয়ার সঙ্গে রত্নর মা তাঁর কন্যার 'গঙ্গাজল' পাতিয়ে দেন। জাতি খ্যাতি সম্পতি প্রতিপত্তি শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতির অভিমান কবিরাজ মহাশয়ের ঈড়া পিঙ্গলা সুষম্নাতে প্রবলভাবে প্রবাহিত থাকিলে-ও সুদাম মণ্ডলের শুদ্ধি বুদ্ধি ধর্মনিষ্ঠা ও নিরভিমান সারল্যের তিনি সতত প্রশংসা করতেন, সুতরাং এই সখীত্ব-সম্বন্ধ-বন্ধনে তিনি কোনো আপত্তি করেন নি; বরং রত্ন যখন বিজয়ার সঙ্গে তাঁদের বাড়ি বেড়াতে আসত, তখন তাকে এক এক দিন কাছে ডেকে আদর-করতেন এবং আর একটু বড়ো হ'লে দু' এক পুরিয়া স্বর্ণ-সিন্দুর খাইয়ে তার সৌন্দর্যের বৃদ্ধি করে দেবেন, এমন আশা-ও দিতেন।

এখন বিজয়ার ছোটো মামা বর্ধমানে থেকে ইংরেজি লেখাপড়া করে, সুতরাং সে বিজয়ার-ও একটু বাড়িতে পড়াশুনার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। আখ্যান-মঞ্জরী পাঠ-রতা বড়ো 'গঙ্গাজলে'র মাষ্টারিতে ছোটো 'গঙ্গাজল' মাস কয়েকের মধ্যেই "পাখি সব করে রব" আগাগোড়া মুখস্থ ক'রে আপনার বাপ্‌কে শোনাতে পারত। যে বাড়িতে আড়া পশারী ছালা পালা রেক্ কেঁড়ে ঢেঁকি কুলো ধুচুনি চরকা প্রভৃতি বৈষয়িক বা রান্নাবান্না ঝোল ঝাল আদি গার্হস্থ্য কথা ছাড়া অন্য কথা প্রায়ই উচ্চারিত হ'ত না,—পূজারী ব্রাহ্মণের মুখোচ্চারিত অশুদ্ধ অবোধ্য অনুস্বার-সংযুক্ত মন্ত্রোচ্চরণে যে বাড়িতে সারস্বত-শ্রাদ্ধ সম্পাদিত হ'ত, সে ভিটের ফুট্‌ফুটে ছোটো মেয়ের কণ্ঠালাপে মধুর কবিতা ঝ'রে বাপের প্রাণ পরিতৃপ্ত ক'রত।

চাষী গৃহস্থের ঘরের ছেলের বই প'ড়ে সময় নষ্ট করাটা ভালো কাজ না মনে করলেও, সম্পত্তি-সঞ্চয়ের সঙ্গে-সঙ্গে সুদামের মনের কোনো একটা লুকানো কোণে "ভদ্র" হবার আকাঙ্খা মাঝে-মাঝে উঁকি মারত; অবশ্য সুদাম আপনাদের কখন-ই অভদ্র মনে ক'রত না এবং তাদের সংসারের সকলেরই আচারব্যবহারে এমন একটা শিষ্টতা ছিল, যাতে গ্রামবাসী অতিশয় জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণ-ও তাদের 'ভদ্র' সম্বোধন না ক'রে থাকতে পারতেন না।

কিন্তু মণ্ডল তার কোনো কোনো খবরেব কাগজ-পড়া প্রতিবেশীর মুখে শুনেছিল যে, এখনকার কালে জামা না গায়ে দিলে, ঘাড় মুড়িয়ে চুল না ছাঁটলে, আর বইয়ের কথা আওড়াতে না পারলে সহর অঞ্চলে কেউ ভদ্র ব'লে পরিচয় দিতে পারে না, সুতরাং রত্ন ন' বছরে পা দিতে-ই সে তার জন্যে বেড়ালকে 'মাজ্জার' আব গাছকে 'ব্রখ্যো' বল্‌তে পারে এমন একটি বরের সন্ধান করছিল। পল্লীগ্রামে ব'সে সহজে ওরূপ বর পাওয়া যায় না—কাজে-ই এগারো বছর বয়সের আগে আর রত্নর বিবাহ হ'ল না।

বরটি নিতান্ত ভদ্র। জন্ম ভাদ্রমাসে, নিবাস ভদ্রেশ্বরের নিকট, নাম ভদ্রনাথ। পাছে স্বাধীন শ্রমজীবীর অসভ্য আদর্শের ছায়াপাতে পুত্রের মনে ভদ্রভাব ভালোরূপে উন্মেষিত না হয় এই ভয়ে ভদ্রনাথের জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে-ই তার পিতা নিজের চাষবাস করা ছেড়ে দিয়ে যা-কিছু সামান্য জোতজমি ছিল, তা' জ্ঞাতিভ্রাতা হলধরকে ভাগে জমাবিলি ক'বে দেয় ও নিজে সুপারিশাদিব জোরে জমিদারেব কাছারি থেকে নিজগ্রামে তহশীলেব ভার প্রাপ্ত হয়। সেই অবধি ভদ্রজনসুলভ 'অনাটন' পাঁজাদের সংসারে বাঁশগাড়ী ক'রে বসে। স্কুলে পড়া ছেলেব চিকণ ধুতি, ধোপদস্ত জামা, চকচকে জুতা তার সঙ্গে বইয়ের উপর বই—বাংলা সাহিত্য, পদ্য সংগ্রহ, অঙ্কপুস্তক ১ম ভাগ, ২য় ভাগ ইত্যাদি, অঙ্কপুস্তকেব অর্থপুস্তক, জ্যামিতি, জ্যামিতি শিখিবাব সহজ উপায়, পদ্যগাথাব গদ্য-ব্যাখ্যা, বিজ্ঞান-বিভাব, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় উঠিবাব সোপান প্রভৃতি পুস্তক আর খাতাব উপর খাতা। এব উপর স্কুলের মাইনে, কোচিংয়ের মাইনে, পাখার ফি, খেলার ফি, মাষ্টাবেব অভিনন্দন, শোক-সভার চাঁদা, ভেকের মরণে পুত্রেব স্বরচিত শোকোচ্ছ্বাস মুদ্রণেব ব্যয়, মাববেল, ব্যাটবল, ইত্যাদি খবচের ফর্দে বাবা-পাঁজাকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্‌লে। এর সঙ্গে যোগ ক'বে নাও যে তিনি ভদ্রপুত্রেব পিতা ও গ্রামের তহশীলদাব; কাজে-ই তাঁর-ও আর আটহাতী খেঁটোতে চলে না। সুতবাং কোঁচা-ও একটু দুলেচে, গায়ে একটা মেরজাই চ'ড়েচে, পায়ে-ও একজোড়া কে-এম দাস—বগলে-ও একটি বেলীর বাড়িব ছাতা। যার মাথায এত জ্বালা, অনটনের চিন্তায় যে সদা এত অন্যমনস্ক, জমা আদায়ের হিসাব-কিতেব নিয়ে তার প্রজা আর জমিদারের সঙ্গে যে হিসেবের গোলমাল হ'বে সেটা কিছু বিচিত্র নয়। আর হলধর-ও বাগ বুঝে ফসলের ভাগ নিয়ে গোলমাল কবে।

বাল্যাবধি খাটুনির জোরে মজবুত শবীর ভদ্রনাথেব ছাত্রবৃত্তি পবীক্ষা দেবার পূর্ব বৎসর পর্যন্ত টিকে ছিল,—কিন্তু আর রইল না। পেয়ারা গাছ, আতা গাছ তাতে আওতায শুকিয়ে শুকিয়ে ম'রে যায়, কিন্তু তালগাছ যখন ঝড়ে নড়ে তখন একেবারে ঘাড়মুড় ভেঙে পড়ে। জ্বরগ্রস্ত পিতাব শয্যাশিয়রে ব'সে পুত্র দশদিন 'স্বাস্থ্য শিক্ষা' মুখস্থ করবার পর ভদ্রনাথ তাঁব অস্থি ভদ্রেশ্বরেব জাহ্নবীজলে বিসর্জন ক'রে এল। বিধবা মাতা বল্লেন, "বাবা ভদ্দর, এখন তুমিই ভরসা।" পব বৎসর ভদ্রনাথ দিবারাত্রি পরিশ্রম ক'রে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে মাসিক বৃত্তি লাভ কবলে। এক্ষণে ভদ্রনাথের বয়স ১৫ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। নিবারণ চক্রবর্তীর ঘটকালিতে সুদাম মণ্ডল পাশ-কবা জামাই পেযে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করলে।

সুদামের একান্ত ইচ্ছে যে জামাইটিকে নিজেব কাছে রেখে চাষবাসের কার্য শেখায় এবং কন্যার যৌতুক স্বরূপ কিছু জমিজমা দিয়ে ভদ্রনাথকে স্থিতু করে। ভদ্রনাথের মনে-মনে ঘবজামাই থাক্‌তে বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু টেক্‌স্‌ট-বুক লিখিত আলুর চাষ মুখস্থ ক'বে পরীক্ষা পাশ করা এক কথা, আর হাতে-হাতে লাঙল ধ'রে মাঠের পাট করা আর এক কথা, এটি ভদ্রনাথ বেশ বুঝত।

শৈশব হতেই সে শিক্ষা পেয়েছিল যে সরস্বতীর আবাস কেবলমাত্র রসনায়, হস্তপদাদির ব্যবহারে শুধু মূর্খের-ই অধিকার; বিবাহের পর সে বুঝলে যে চক্ষুদুটির-ও একটু কার্য আছে, তা' এলোকেশী প্রেয়সীর কৌমার অধরের সলাজ হাসির সৌন্দর্য দর্শন, আর—হৃদয় ব'লে একটা নিরাকার প্রত্যঙ্গে প্রণয়চিন্তার পরিপোষণ। সে বড়ো বড়ো আক্ক আস্ক আস্থ আদ্ধ আদ্দা প্রভৃতি শব্দ সংযোগে শ্বশুরকে

বুঝিয়ে দিলে যে বিদ্যা অমূল্য ধন, সমস্ত নরনারী বিদ্যাশিক্ষা করে নি ব'লে-ই আজ-ও স্বাধীনতা পায় নি, একমাত্র কৃষিকার্যে রত হয়েই ভারতবর্ষ আজ-ও পরাধীন।

শ্বশুর আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভারতবর্ষ', সে কোন্ দেশ, কোথায় বাবা?" নবীন জামাতা গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে, ম্যাপে।" শ্বশুর মহাশয় কিছুই বুঝ্লেন না, তবে জামাতার আব্দ আব্দ উচ্চারণ স্তব্ধ হ'য়ে শুন্লেন এবং তার ভদ্রতার আবাদে অভদা নামাবার ভয়ে কেবল যে কোনো আপত্তি করলেন না তা' নয়, বরং তার হুগ্‌লীতে থেকে নর্মাল স্কুলে পড়বার জন্যে বাসা খরচাদি ব্যয়ের কিছু কিছু সাহায্য করতে-ও প্রতিশ্রুত হলেন।

উলুবেড়ে সাবডিভিসনের অধীন ঝাউহাটী গ্রামস্থ মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে আজ ভদ্রনাথ পাঁজা বিরাজমান। প্রবেশ করেছিলেন ১৮ টাকা মাসিক বেতনে তৃতীয় শিক্ষকের পদে চার বৎসর পূর্বে। কিন্তু এক বৎসর কাজ করার পরেই তখনকার দ্বিতীয় পণ্ডিত হোমিওপ্যাথিতে এম্ ডি পাশ করবার জন্যে কলকাতায় চলে যান। সেক্রেটারির বাসায় থেকে খাবেন, আর তাঁর ছেলেদের পড়াবেন এই সর্তে ভদ্রনাথ ঐ পদে বাইশ টাকা বেতনে উন্নীত হন। এ সওয়ায় ড্রিল-শিক্ষা দেবার জন্যে দু'টাকা করে মাসে অতিরিক্ত বেতন। স্কুলের ছুটির পর উমো গোয়ালিনীর নাতিকে তার পড়া মুখস্থ করিয়ে দিতেন ব'লে উমো প্রত্যহ মাষ্টার মশায়কে এক পো ক'রে দুধ খেতে দিত। কথাটা অসম্ভব হ'লেও আপনারা বিশ্বাস করবেন যে শুধু গোপধর্ম রক্ষা করবার জন্যে উমো এ দুধটুকুতে এক ছটাকের বেশি জল কখনই দিত না। অপ্রত্যাশিত আশা পূর্ণ হ'লে লোকের পিপাসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এক বছরের মধ্যে যে হঠাৎ এমন প্রোমোশন ২২+২ = ২৪ এবং দু' বেলা ভাত, এতে ভদ্রনাথ বৃহস্পতির দৃষ্টিপাত প্রত্যক্ষ করলে। তখন আশা ফিস্ ফিস্ ক'রে দ্বিতীয় পণ্ডিতের কাণে কাণে বল্লে, "প্রথম শিক্ষক মহাশয়ের কিছু ভালো-মন্দ হ'লে বেশ সুবিধা হয় না!" দিবসে অবসর পেলেই ভদ্রনাথ ঝাউহাটী গ্রামের ষষ্ঠীতলায় মনসাতলায় শীতলাতলায় বাবা-ঠাকুরতলায় হেড্‌পণ্ডিত মশায়ের কোনোরূপে তাঁদের কৃপায় ত্বরায় সজ্ঞানে স্বর্গ-লাভের ব্যবস্থা যাতে হয়, তার মানত করেন আর রাত্রে সেক্রেটারির পাতকো-তলার পাশের কুঠুরীতে ব'সে 'নিত্যকর্ম পদ্ধতি' দেখে ব্রজবন্ধু পণ্ডিতের উদ্দেশে সকল রকম তর্পণের মন্ত্র পাঠ করেন। ভদ্রনাথের শোনা ছিল যে জীবিত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করলে সে শীঘ্র শীঘ্র মরে যায়।

কিন্তু ব্রজবন্ধু রায় উগ্রক্ষেত্রীর বাচ্ছা। তার বাপ মরেছিল কাশরোগে বটে, পিতামহ দিনকতক বাতে ভুগে তুলসীতলা পান। তার আগে তাদের বংশের কোনো পুরুষ লাঠির ঘায়ে ভিন্ন পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হয় নি, আর তা-ও ১০।১৫টা মাথা নামানোর আগে নয়। তিনি নর্ম্যালই পাশ করুন, আর পাটীগণিতের সরল ব্যাখ্যাই লিখুন, তাঁদের বংশটা শীতলা-মনসা-পঞ্চানন সকলেরই বিশেষ পরিচিত। লাঠি দিয়ে যারা মাটি রাখ্তে পার্ত, তাদের ভিটেয় যমকে পৌঁছে দিতে দেবতারা-ও একটু ইতস্ততঃ করতেন।

কলিতে দেবতা নিদ্রিত বুঝতে পেরে ভদ্রনাথ তখন পিতৃতুল্য প্রাচীন হেড্‌পণ্ডিত মহাশয়কে নানাবিধ সৎপরামর্শ দিতে সুরু করলে। "উঃ, কি দুঃখের বিষয়! আপনার মতো বিজ্ঞ লোক—তার ওপর এই পরিশ্রম—মায় পঁয়ত্রিশটি টাকা মাসে,—কি আর বল্‌ব মশায়, আপনি যদি কলকাতায় যান তা' হ'লে অনায়াসে সংস্কৃত কলেজে হেড্‌পণ্ডিত হ'তে পারেন, এমন কি মুন্সীপাল-স্কুল-ও আপনাকে পেলে বর্ত্তে যাবে।"

হেড্‌পণ্ডিত মশায় বল্‌লেন, "আর ভাই, কোথায় যাই! এইখানে-ই আছি, কাটিয়ে দিই এইখানেই বাকি কটা দিন—" আবার ভদ্রনাথ বল্‌লেন, "তা-ও বলি, চাকরি-ই বা আপনার করবার প্রয়োজন কি? কেবল যদি ঘরে ব'সে ব'সে বই-ই লেখেন, তাতে-ই আপনার টাকা খায় কে? এই ধরুন, অর্থপুস্তক ত অনেকে-ই লিখচে কিন্তু অর্থপুস্তকের যে 'সরল প্রবেশিকা' লেখা যায় এ কথাটা ত আজও কারও মাথায় আসে নি। আমার বিশ্বাস আপনিই এ বিষয়ে একটা নতুন আবিষ্কার ক'রে

যেতে পারেন। তারপর আপনার "ছাত্র-প্রবোধে" এক বৃদ্ধা এবং তাহার কুক্কুটের ডিম্ব ব'লে যে গল্পটি লিখেছেন, তাতে বোধ হয় আপনি উপন্যাস লিখলে 'সাহিত্য-ভারতেশ্বর' হ'তে পারেন।" কিন্তু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়া সম্ভব, ব্রজবন্ধু রায় যে গঙ্গালাভের পূর্বে ঝাউহাটী বঙ্গ-বিদ্যালয়ের লোহার পতোর মারা পুরানো পচা কেদারাখানি পরিত্যাগ করবেন এর কোন-ও লক্ষণ-ই তিনি ইঙ্গিতে-ও প্রকাশ করলেন না। আসল কথা, এই স্কুলটি তিনি হাতে ক'রে তৈরি করেছেন, অনেক পিতা-ছাত্রের পুত্র-ছাত্রেরা এখন-ও তাঁর কাছে পড়ছে। সত্য-ই অন্যত্র গেলে তাঁর আর্থিক উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা, প্রলোভন-ও যে চোখের সামনে হাত নেড়ে যায় নি তা-ও নয়, কিন্তু তথাপি তিনি তাঁর হাতে-গড়া পুতুলটির মায়া পরিত্যাগ করতে পারেন নি।

ভাদ্রমাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন প্রথম ঘন্টাতেই ভদ্রনাথ স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে সাহিত্য পড়াচ্ছেন। সহরের বড়ো বড়ো স্কুলেব অনুকবণে ছাত্রদের আবৃত্তি শোনা, বানান ও অর্থ-ব্যাকরণাদির প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার চেয়ে তাদের খাতায় রচনাদি লিখতে দিয়ে বা একেবারে এগারোটা অঙ্ক কসতে দিয়ে নিজের বৈষয়িক, বাসা খরচিক্, প্রাইভেট্ টিউশনিক্ প্রভৃতির চিন্তা কবাই ছাত্রদেব বিদ্যোন্নতির সহজ উপায় ব'লে ভদ্রনাথ স্থির ক'রে নিয়েছেন। ভদ্রনাথ আজ ছেলেদের 'মাতৃভক্তি' সম্বন্ধে রচনা লিখতে দিয়েছেন; ব'লে দিয়েছেন, 'এক-সাসাইজ' বইয়ের চার পাতার অধিক না হয়, আর প্রতি দশ লাইনের ভিতর ৩২টি করিয়া যুক্তাক্ষর থাকিবে। ছেলেরা অবশ্য মাকে ভালোবাসে, ভয় কবে, মার কাছে আব্দার করে, কখন-ও কখন-ও বকাবকি-ও করে, তার নাম যদি 'মাতৃভক্তি' হয় তাতে-ও তাদের আপত্তি নেই; কিন্তু যুক্তাক্ষব-বহুল রচনার মাতৃভক্তি কখনই সত্যকার মাতৃভক্তি নয়, সুতরাং কোন বইয়ে কে একটু আধটু মাতৃভক্তির বিষয় প'ড়েছে—তাই পরস্পরে কানাকানি ক'রে জিজ্ঞেস করছে। কেউ বা আরম্ভ করেছে—"মাকে জননী বলে, জননী বিশেষ্য পদ, জনন শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয় করিলে জননী হয়। মাতা ভিন্ন জননী শব্দের আরও অনেক অর্থ আছে, যথাঃ—দয়া, জ্ঞানীনামগন্ধদ্রব্য, মঞ্জিষ্ঠা, জটামাংসী, চর্মটীকা, চামচিকা ইত্যাদি—।"

পণ্ডিত মহাশয় অলস চিন্তা ত্যাগ ক'রে পাঠে নিযুক্ত। গত রাত্রের ডাকে বাঁশখালী গ্রাম থেকে তাঁর স্ত্রীব একখানি পত্র পেয়েছেন। রত্নময়ী এক্ষণে অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী। বিবাহের পর স্বামী-ও যেমন প্রায় বাবো মাস বিদেশে থাকে, সে-ও তেমনি বাপের বাড়িতেই থাকে। তবে মাঝে মাঝে দু' চার দিনের জন্য শাশুড়ীকে গিয়ে দেখা দিয়ে আসে। মণ্ডল পরিবারের সকল মেয়েরাই অশিক্ষিতা, সুতরাং কেবল মাত্র দাসীজনোচিত ধান-ভানা, ডালকলাই-ভাঙা, চাল-ঝাড়া, ঘুঁটে দেওয়া, বাট্‌না বাটা, কুট্‌নো-কোটা, ভাতব্যান্নুন রাঁধা, মুড়ি ভাজা, মুড়ি, নারকোল নাড়ু পাক করা, ক্ষীরের ছাঁচ ও চন্দ্রপুলি গড়া, বালিসের ওয়াড়, কাঁথা সেলাই করা, প্রভৃতি ইতর কার্যেই দক্ষা; বাড়িতে রত্নময়ী একমাত্র শিক্ষিতা মহিলা। সুতরাং বিদ্যার সম্মান রক্ষার্থ কেউ তাকে কোনো কাজ করতে বলে না। সে সকালে নেয়ে উঠে পিঠের উপরে চুল ফেলে চিকণ শাড়ি পরে হেসে খেলে ঘুরে বেড়ায়, সম্পর্ক বুঝে কারুর সঙ্গে একটু আধটু ঠাট্টা-তামাশা করে। কখন-ও কখন-ও ঘরে ব'সে একটু আধটু দীর্ঘ-নিঃশ্বাস, আর মাঝে মাঝে শুয়ে প'ড়ে নূতন নূতন উপন্যাসের মধ্যে সতীত্বের সহিত রতিত্বের যে অপূর্ব মিলন কাহিনী রচিত আছে, তাই পাঠ ক'রে পতি-বিরহ-বিধুর হৃদয়কে শান্ত করে। ২রা ভাদ্র তারিখে রত্নময়ী স্বামীকে যে পত্রখানি লিখেছেন তিনি সেখানি কাল পেয়ে বার দশেক পড়েছেন; এখনও চক্ষু দুটি সেই পত্রে নিবিষ্ট।

রত্নময়ীর বিদ্যাভ্যাস যদিও হাল্‌কা উপন্যাস পাঠেই শেষ, তবু তাঁরে বিদুষী বলা উচিত; তার ওপর তিনি কিঞ্চিৎ সুরসিকা; এই রসালাপের শিক্ষয়িত্রী-ও সেই 'গঙ্গাজল'। বিজয়ার বিবাহ হয়েছে হালীসহরে; ঈশ্বর গুপ্তের জন্মভূমি যার শ্বশুর বাড়ি—তার প্রাণে যে একটু রঙ্গ-রসের বুদ্বুদ উঠবে, তা আর আশ্চর্য কি?

লেখক ভদ্রনাথ পণ্ডিতের ঠাকুরদাদা স্থানীয়, কাজে-ই নাত্‌বৌয়ের গোপন চিঠিখানি যদি লুকিয়ে প'ড়ে নকল ক'রে নেয়, তা হ'লে নেহাৎ সম্পর্ক-বিরুদ্ধ কাজ হবে না।

রত্নময়ীর পত্র

পরম পুজোনিয় শ্রীজুত পাতিরাম নাথ মহাষয়

শ্রীচরণসরোষ পানের বরোজেযু

প্রাণেশ্যর,—

(প্রথম প্রথম রত্নময়ী স্বামীকে 'প্রণমা শতকোটী নিবেদন' লিখত, কিন্তু ভদ্রনাথ তাকে প্রাণেশ্বর, হৃদয়বল্লভ, প্রিয়তম প্রভৃতি লিখতে উপদেশ দিয়েছিল)।

সেই গর্‌মীর ছুটির সময় এখানে দু'মাস কাটিয়ে তুমি যে চোলে গেছো তারপর থেকে তোমার বদনচন্দ্র না দেখে আমার দুঃখিনী মনে কি যে অচেনা অজানা বেদনবাঁশী দিবানিশি বাজ্‌ছে তা আব কেমন ক'রে তোমায় জানাবো? আমার নিতুই নতুন ভাবনা সাগরে যে সপনের পদ্মফুল ফোটে তা দেখ্‌লে তোমার বুক ফেটে যাবে। এক একটা কাজ্‌লা রাতে এমন এক একটা পুরানো কথার রাগীনি কী ঝড়ের বেগে চায়ের পেয়ালা হাতে ক'রে আমার হৃদয়-মোন্দিরে একটা দম্‌কা বিদ্দুতের সৃষ্টি করে, তা যদি তুমি দেখতে পাও, তাই থেকে অনায়াসে একখানি উপন্নাস লিখতে পারো। পূজোব সময় তুমি এখানে আসবে, তাই আমি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, ভোরের পর ভোর, দুপুরের পর দুপুর, সোন্দের পর সোন্দে, আজকের পব কাল, কালেকেব পর পরশু, পরশুব পর তরশু গুণ্‌ছি। তোমার মা ভালো আছে, সদুর মা গিযে খবোর এনেচে; ক'টা চাল্‌তা আর এক ঝুড়ি তাল এনেছিলো— আহা, আর কেথায় কি পাবে। তুমি মাকে পুজোর কাপড় দিও, মাথা খাও, মাথা খাও— আর পিস্‌ শাউড়িকেও দিযো, খুরশসুর, তোমার হলাকাকা—তাকেও দিলে ভালো হয়; আর তোমার বোনের খুকীকে একটা রাঙা যামা আর ছোটো যুতো না দিলে ভালো দেখায় না; মার কাপড় একটু বেসি দামের কিনো, জেন এক টাকা চার আনার কম হয় না। আর যাকে জেমন পার্ব্বে তেমোন দেবে, তাতে ৬।৭ টাকা পড়ে যাবে তা কি কোরবে। মা পরোম গুরু, ঠাকুব মশাইযেব চেয়ে বড়ো, —স্ত্রীরীর চেয়েও বড়। মাকে লিখো যে আমাদের বাড়ী পুজোয় বরাবব ঘটা হয, সব কটুম আস্‌বে— তুমিও আস্‌বে। তাই বাড়ী জেতে পার্ব্বে না, ঐ চিঠির গায়েই বিজযার নেমোস্‌কার লিখে দিও, বাবা তোমার জোন্নে খুব ভাল কাপড় চাদব কিনবেন, ছোটকাকা বদ্দোমান থেকে দু' পাটি জুতো এনে দেবে। আমার জোন্যে জেন কিছু কিনোনা, কিনলে ভারি রাগ কোর্ব্বো —এ্যাঁ। ঐ তো মাইনে পাও, খেতে কষ্টো—তার ওপরে কোথেকে খরচ করবে। একটা বেলাই্‌স না কি বলে দেখবার ইচ্ছে ছিলো, তা যখন তুমি হেডপণ্ডিত হবে তখন না হয় কিনে দিও। বাবা আমায ৫।৬ খানা কাপড় দেবে, তবে বোমবাঈ সাড়িটাড়ি বাবা বোঝে না। আর এ পাড়াগেয়ে দেখবেই বা কে? তোমার শহোবে জানাশুনো আছে, তুমিই দেখচো। এক সের নারকেল তেল শস্‌তায় পাও তো এনো। আমি এখানে মাতাঘসা ভিজিয়ে গন্দ ক'রে নেবো। সিসির গন্দ তেল শুনেছি অনেক দাম, তুমি এনোনা। গাংগাজল বলছে তুমি বাড়ি এলে সে তার সিসি থেকে আমাকে একটু অতিকলোম আর লেগেণ্ডার দেবে; ভাল কথা আমি একদিন গংগাজলের কৌটো থেকে একটু পাউটার মেখেছিনু, সবাঈ বলেছিলো বেশ দেখাচ্চে। না, না ছি তুমি কিনো না, আমি মাখ্‌বো না। আল্‌তাগোলা না কি আজকাল সিসি ক'রে বিক্‌কিরী হয়— ওমা সে কি। বুরুষ মাথায় দিলে চুল নাকি নরোম হয়, তা বাবু আমি অত ফেসান ভালো বাসিনী। কিছু কিনোনা, কিছু এনোনা, খালি সুদু তুমি এসো। তবে পারো যদি এক ঠোঁট্‌ আদরের চুম্‌ এনো।

তোমার প্লিয়োতমা

রত্ন।

পুঃ। "বোলতে ভুলে গেচি—গাংগাজলের বাড়ী একজন এক যোড়া কাসির পাঁজোর বাঁধা রেখেছিল, ওৎরাতে পারে নি, সেটা আমি তোমায় না বোলেই কিনেচি, কুড়ি টাকার ওপর পেরায় বানি বেঁচে গেলো। রূপোর দরে চলিশ টাকা লেগেছে। তা বাবা আমায় মাসে মাসে যে একটাকা জলপানি দেয় , তাই জোমিয়ে জোমিয়ে আট টাকা কোরেচি আরো জমিয়ে ২ শোদ কোরবো, তুমি তার জোন্নে ভেবোনা, ভেবোনা, মাথা খাও।"

একদিকে বেঞ্চিতে ব'সে ছাত্রবৃন্দ 'মাতৃভক্তি' প্রকাশের জন্য যুক্তাক্ষর নির্বাচনে নিযুক্ত, অন্যদিকে পত্নী রত্নময়ীর যত্নগ্রথিত প্রেমপত্রের প্রতিছত্রের শিহরণসঞ্চারে কেদারাধিকারী শিক্ষক মহাশয়ের গাত্র রোমাঞ্চিত। যে বর্ণাশুদ্ধি বা ব্যাকরণ-বুদ্ধি শিষ্যেরা প্রকাশ করলে পণ্ডিত মহাশয় চণ্ডমূর্তি ধারণ করতেন সেই সাহিত্য-হত্যা-কাণ্ড প্রেয়সীর লেখনী-অগ্রে সম্পাদিত হয়ে প্রাণেশ্বরকে মুগ্ধ ক'রে দিলে। ভদ্রনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রলে, সে আর কখনও "কি" লিখতে ক'য়ে হ্রস্ব "ই" দেবে না, কারণ যখন প্রিয়তমার হাত দিয়ে দীর্ঘ "ঈ" বেরিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই এ দৈব্য-প্রেরণা। ভদ্রনাথ চক্ষু বুজে ভাবতে লাগল, —"আহা। সরলা বালিকে! বোধ হয় প্রিয়তমা এখন আলুলায়িতকেশে পুকুর ঘাটের পৈটেয় ব'সে—।"

এখনও অনেকেব একটা কুসংস্কার আছে যে আজকালকার ধরণের লেখাপড়া শিখলে লোকের জাত যায়! এটা একেবারে ডাহা মিথ্যে কল্পনা, কেন না জাত কখন যায় না—যেতে পারে না; যে ছেলেবেলা নবাবকে "লবাব", নবান্নকে "লবান্ন" ব'লে এসেছে সে সংস্কৃতে এম্, এ পাশ করলেও "লবাব" আর "লবান্ন"বলবেই। ভদ্রনাথ নর্মাল ইস্কুলের দ্বিতীয়-বার্ষিক-পবীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষক। সীতার বনবাস, মেঘনাদ বধ, ভুদেববাবুব সামাজিক প্রবন্ধ এ সব ত পড়েইছে তার উপর বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, নবীন সেন, হেমবাবু প্রভৃতি-ও বাদ যায় নি; তবু, —বর্ধমেনে ন্যাসন্যালেটি কিছুতেই ছাড়তে পারে নি; সে "বালিকে"-ও বল্‌বে, "পুকুর"-ও বল্‌বে।

"যাক, এখন উপায় কি? এই যে রত্নময়ীব স্বার্থত্যাগ, —শাশুড়ী, পিস্‌শাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী, খুড়শ্বশুর প্রভৃতির জন্য কাপড় আনতে এত অনুরোধ, অথচ মাথায় দিব্বি দিয়ে নিজের জন্যে কিছু আনতে মানা, —নাবী-হৃদয়েব এই মহত্ব এ কেউ দেখলে না, শুনলে না। লোকে রাণী ভবানী, মহারাণী স্বর্ণময়ী, অহল্যাবাঈ—এদের-ই নাম কবে; এই যে —

"লোক লোচনের দুরে ঘন-বন-মাঝে,
সুন্দব সুরভি ভরা কত ফুল বাজে,
বিজনে ফুটিয়ে উঠে গোপনে শুখায়,
সাজে না দেবতা পায় রমণী খোঁপায়।।"

এব সংবাদ কি কেউ নিয়ে থাকে? কিন্তু—কিন্তু—আমি কি তা' বলে তাব এই অনুরোধ রক্ষা করবো? মানব-ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য রমণীর এই আত্মত্যাগে সহায়তা করবো? মা! মা! আমার চিরারাধ্যা— কিন্তু তুমি-ও হয়ত মনে মনে করচো, ভদ্র আমার জন্যে পূজোর সময় একখানা কাপড় আনবেই আনবে, আর এই কিশোরী স্বল্পদিনেব পরিচিতা লাবণ্যময়ী তরুণী করুণার বরুণার স্রোত প্রবাহিত ক'রে মানা করচে—'কিছু এনোনা; নাথ, কিছু এনোনা।' এইখানেই ভক্তি আর প্রেমের তফাৎ। ভক্তি পূজা চায়—প্রেম আপনাকে বিলিয়ে দেয়। এই দেখ আমার ভাব আসচে—আসচে, এই রকম খানিক চালালেই একখানা উপন্যাস লিখে ফেলতে পারি। প্রেম—প্রেম—তুমি কাব্যবিদ্যালয়ের হেড্‌পণ্ডিত।"

"ব্লাউজ, বোম্বাইশাড়ি, বিলেতি এসেন্স, সুগন্ধি নারিকেল তেল, পাউডার, তরল আল্‌তা এ সব আমায় কিনে যেতে-ই হবে। প্রেয়সী লিখেছেন আমায় 'তুমি কোথায় পাবে, তোমার কষ্ট হবে'—এটা কবিতা। কিন্তু শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মন-ত সে দিকে ধাবিতা নয়। তিনি যে একেবারে পুরোপুরি

বাস্তব। ঢেঁকি-পদাঘাত-পটিয়সী-প্রেয়সী-প্রসবিনী ত' নিশ্চয় ভেবে বসবেন যে 'জামাইটে হা-ঘরে, পুজোর সময় মেয়েটাকে একখানা দশী দিতে পারলে না।' এই স্বাধীনতার দিনে আত্মমর্যাদার উপর এ রকম অসম্মান আমি কখনই সহ্য করতে পারব না। কিন্তু হা রে প্রণয়, তোর জন্য খোরাক-পোষাক ক্রয় করতে হয় কেন? ? আর ক্রয় করতেই যখন হয় তখন তার ব্যয় সংকুলান অদৃষ্ট কেন করে না? প্রিয়া আবার পাঁজর কিনেছেন, নিজেই তার ঋণ পরিশোধ করবেন বলেছেন, আর আমি 'কী' এমনই হীন যে সেই পাঁজরের ঝুমুর ঝুমুর সংগীত নিঝুম হয়ে শুয়ে শুয়ে শুনবো? টাকা গুণে দেবার ঠুন্ ঠুন্ ধ্বনিতে একটা একতানের সৃষ্টি করবো না?"

"আহা-হা—পদ্যের স্রোতস্বিনীর মধ্যে টাকার চিন্তা গদ্যের একটা বালিব চড়া! সেপ্টেম্বরেব মাইনে ২৪ চব্বিশ—অক্টোবরেরটা দিলেও দিতে পারে, না হয সেক্রেটারি মশায়কে ধ'বে ক'বে নেব, —হ'ল আটচল্লিশ। গেল মাসে মা'র খবচ পাঠাতে পারি নি সে দশটাকা এখনও মজুত আছে; এই ত আটান্ন: —উমো গয়লানী মানুষ ভালো, লোক মন্দ নয়, মা'র অনন্তব্রত উদ্‌যাপন বল্‌লে গোটা কুড়িক টাকা সে ধার দিতে পারে—হ'ল আটাত্তব। উলুবেড়ের পার্বণ—সরকার তেল এসেন্স আলতা-ফালতা এই রকম দু-পাঁচটা জিনিস নিশ্চযই আমাকে ধারে দেবে। ভগবতী দাদা এখন কল্‌কেতায় ক্যাম্বেলে পড়ছে; সিল্কের শাড়ি জামা-ফামাগুলোর জন্য এখন তাকে-ই চিঠি লিখি। আহা! এস মা, এস মা আনন্দময়ী! এই মাটির-মেদিনী মধ্যে আনন্দধাম সেই শ্বশুব-ভবনে গিয়ে আমার আনন্দময়ী প্রেয়সীকে যেন লেগেগুার গন্ধে—" ঢং ঢং ঢং সাড়ে এগারোটার ঘন্টা পড়লো, ছাত্রেরা রচনার খাতা বন্ধ ক'বে অঙ্ক পুস্তক খুল্‌লে, পণ্ডিত ভদ্রনাথ-ও বিজ্ঞান পড়াবার জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে চলে গেল।

হেড্‌পণ্ডিত মশায় ছিলেন আমায়িক লোক, আব সেক্রেটারি বাবু-ও ভাব্‌লেন, "ছুটিব আগে এ-কটা দিন ছেলেগুলো ত ভালো ক'রে পড়বেই না, তবে ব'সে ব'সে পাঁজার পো মিছি মিছি ক'বেলা ভাত মারে কেন? "এই দুই শুভগ্রহের সংযোগ "চিঠি পেয়েছি, মা জ্বরে পড়েছেন, দেখবার কেউ লোক নেই"—এই অছিলায় দ্বিতীয়ার দিন থেকেই ভদ্রনাথের ছুটি মুঞ্জুর হ'ল। মাতৃভক্তি বচনা লিখতে দেবার পর থেকেই ভদ্রনাথ কলকাতায় গিয়ে শীঘ্র শীঘ্র বাজার-টাজাব ক'বে শ্বশুব বাড়ি যাবে তারই ঠিক কবছিল। কাজেই মাতৃভক্তি প্রদর্শনের সুযোগটা সহজেই তাব মনে জেগে উঠ্‌ল তা'তেই মা'র অসুখের সৃষ্টি— আর তাঁর সেবার নামে শ্বশুর বাড়িব দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি।

আজ পঞ্চমী—বেলা ঢলে পড়েছে, নাচ-দোরের দু-ধাবে তুলসীমঞ্চের পাশে [illegible] গাছে ফুল ফুটে উঠেছে, এমন সময কাপড়-চোপড় শিশি-বোতল প্রভৃতি সবঞ্জাম স[illegible] গ্রামে পৌঁছিল।

বাড়িতে ঢুকেই দেখে লোকের ভিড়, মহা-গোলমাল। মণ্ডপে সুসজ্জিতা প্রতিমা, প্রতিমাব দুই দিকে দুটি বড়ো বড়ো পিতলের দীপ-গাছা; উঠানে সামিয়ানার নীচে বেল লণ্ঠন খাটানো; চারদিকে চালের ছাঁচে আম পাতার সার গাঁথা; বড়ো বড়ো থালা, বারকোষ, লটকান, ছেপযা, ঘটি, ঘড়া প্রভৃতি দলুজে স্তূপাকারে সাজানো। "নিয়ার রে", "কোথা গেলি রে", "ময়দাব ছালাগুলো বি তোলা করলি", "ঘি-টা ওজন হ'ল?" "ঘোষের ঘরে জানান্ দিতে কা'রে পেঠিয়ে দিলি?" "ভস্‌চায্যি ঠাকুর বুঝি এই ওক্‌তে সরে পড়া ক'রলে"—ইত্যাদি হাঁক্‌ডাক্ কলরবে মুখরিত নয— একেবারে চীৎকৃত। তার ওপর আবার ছেলেমেয়েদের কল্‌কলানি; —"দেখেছিস্ আমার কাপড়ে কেমন নীল কোর", "আমার কেমন নতুন ঘুন্‌সি হ'য়েছে, তোর ত নেই", "দেখিস্ দেখিস্ আমার রঙিন চুড়ি ভেঙে যাবে", "হ্যাঁ, জুতো হবে না বুঝি, মামা কাল বদ্যমান থে' আনা করবে", "ক্যাঙ্‌লা, তুই যে বড়ো আমায় মারলি, আমি তোর দাদা হই না বে শালা",—আর-ও এই নমুনার কত কি? জামাইবাবু

কাপড় টাপড়গুলো একটা দাওয়ার উপর রেখে, শ্বশুরদের গড় হয়ে প্রণাম করলে; "ভাল আছলে ত বাবা", "রেলে কেলেশ পাওঁ নি," "বাবুর মতো থাকা অভ্যেস, হেঁটে মাঠ পার হ'য়ে বড্ডই হয়রান হয়েছে, ব'স, হাত মুখ ধোয়া কর—" ইত্যাদি সম্ভাষণে ভদ্র জামাইকে পরিতৃপ্ত করা হ'ল। ছেলেপুলেগুলো জামাই দেখে যেন আরও কলরব বাড়িয়ে তুল্‌লে; কর্মগত অভ্যাসে ভুলে একবার ডান হাতের আঙুল খাড়া ক'রে ভদ্রনাথ বলে ফেল্‌লে, "স্থীর"। জামাই তামাসা করছে মনে ক'রে, ছেলেগুলো বলে উঠ্‌ল, "জামাই ক্ষীর খাবেক্ গো ক্ষীর খাবেক্।"

জামাইবাবু কিন্তু সারা পথটাই ক্ষীর খেতে খেতে এসেছেন, এখন-ও খাচ্ছেন। তাঁর হৃদয়কটাহে মুগ্ধকারী আশার দুগ্ধধারা আবেগের উত্তাপে ঘনীভূত হ'য়ে, মিলনের শর্করা-সংযোগে যে দেবদুর্লভ প্রেমের ক্ষীরে পরিণত হয়েছে—তাঁর বিরহী মন তৃষিত মুখ জুব্‌ড়ে শুধু যে সেই ক্ষীর পান করছে তা নয়, একেবারে লেলিহান জিহ্বা বিস্তারিত ক'রে সৃক্কনী পরিলেলিয়েৎ। (এই চমৎকার অলংকারটি যেন কোনো পাঠক মনে না করেন লেখকের স্বকৃত রচনা।) উদ্ধৃত ক'রে স্বীকার করলে, শিষ্টাচার-ও হয় কপিরাইট্ আইন-ও রক্ষা পায়। নর্মাল দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হ'লে এমন নৈষধ-সূদন অলংকার কার-ও কল্পনা-রাজ্যে প্রস্ফুটিত হয় না।

সন্ধ্যার জলখাবারটা যখন বাইরে এসেছিল, তখন মনে ততটা খোঁচ লাগে নি; কিন্তু রাত্রে ভাত খাবার ডাক পড়লে তার পাত-ও পাঁচজনের সঙ্গে পশ্চিমের দলুজে হয়েছে দেখে, ভদ্রনাথের প্রাণটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌ল। এক পিস্‌শ্বশুর মশায় দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন, "বাবাজী, অন্দরে পা বাড়াবার ঠাঁই নেই, কুটুমের মেয়েতে একেবারে বাড়ি ভ'রে গেছে, কে যে কোথায় শোয়, কে যে কোথায় খায়, তার ঠিকানা করতে মুশকিলে পড়ে গেছি, ব'সে যাও বাবা খাওয়া যাক্; আবার ভাতটা জুড়িয়ে যাবেক্, দশ দশটা আকায় হাঁড়ি চড়েছে; এ সকাল সন্ধ্যে আর বিরেম নেই।"

প্রেমে বা বিরহে ক্ষুধামান্দ্য ও নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এটা একটা চলিত কুসংস্কার; বরং বর্ধমানের রান্না কলায়ের ডাল আর কই মাছের মুড়োযোগে তেঁতুলের টক-গোছ সুখাদ্য অনুপান সহযোগে উদরে অন্ন একটু চাপাচাপি ব'সে গেলে শকুন্তলা-বিরহ-বিধুর দুষ্মন্তের-ও গাঢ় নিদ্রা আসে তা' মাহিষ্য-নন্দিনী-হৃদয়ানন্দ পাঁজা-বাবাজীর কত ত দূরে থাক্। বত্রিশটি নাসিকার ঘর্ঘর ভৈরব রবে জামাইবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে যাবার দরকার হওয়ায়, উঠানে এসে দেখে যে আকাশে তারা দলের ভেতর অনেকের-ই পাহারা বদল হয়েছে, সাতভাই চম্পা প্রায় মাথার কাছাকাছি এসে পড়েছে; মিঠাইকরেরা রসের গাম্‌লায় গজাগুলো ঢেলে দিয়ে আর কাল ষষ্ঠীর উপলক্ষে যে শতাধিক ব্রাহ্মণ খাবে তাদের মতন লুচি ভেজে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে; নাসিকাধ্বনি শুনে শঙ্কিত ঝিল্লিরা-ও নীরব। কেবল উচ্ছিষ্টভোজীদের কলহকলরব সতত জাগ্রত; এক্ষণে এই আড়াই প্রহর রাত্র সেই কলরব কুক্কুরকণ্ঠোচ্চারিত শানিত স্বরে নিশীথিনীকে যাতনা দিচ্ছে। আমপাড়া কলকেয় দা-কাটা তামাক টিপে দিয়ে উনুন থেকে আগুন এনে ভদ্রনাথ একবার বেশ ক'রে তামাকটা খেয়ে নিলে, তারপর আবার শয়ন, এবার কিন্তু নয়ন মুদলে-ও অঙ্গ অসাড় হয় না। নাসিকার ঘর্ঘর, মশকের স-ভন্‌ভন্ দংশন, আর বিরহের হুতাশন—ত্র্যহস্পর্শের নিষেধ নিয়ে ভদ্রনাথের নিদ্রাযাত্রার পথে দাঁড়ালো। চৌকিদারদের মতোন রবি ঠাকুর-ও প্রাতে মাত্র প্রেয়সীর সঙ্গে একটু প্রেমালাপের অবসর পান, দুপুর বেলা বেচারীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারেন, আবার বৈকালে যেন একটু লজ্জায় লাল হ'য়ে লুকিয়ে পশ্চিমে হাওয়া খেতে চলে যান। এ ক্ষেত্রে বিরহ-বিধুর সূর্যদেব ভোর না হতে-ই পূর্বদিকে আমবাগানে আড়ালে, আর ডিটো ডিটো ভদ্রনাথ উত্তর দিকের বড়ো পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটে, একজন রাঙা মুখ আর একজন রাঙা চোখ খুলে প্রকাশ হ'লেন।

খুড়শ্বশুর মুকুন্দ মণ্ডল পৈটেয় ব'সে দাঁতন করছিল। জামাইকে দেখে বল্‌লে, "হরির মধ্যে গা তুলে উঠে পড়্‌ছ? নিদ্রে কি ভালোরূপ হয় নি;" ভদ্রনাথ বল্‌লে, আজ্ঞে, হইছিল—তবে—মশা—

একটু—এই যা”—

মুকুন্দ। ‘‘আরে করি কি কও ত, এ বাগে কাটোয়া মুকসুদাবাদ আর উ-দিক ধর ত’ শান্তিপুর লগদ্বীপ নাগাদ যে পর্যন্ত কুটুম আনা করানো গেছে; মোশারি-ও ত’ মজুত ছিল না কম্‌তি —তা বাড়ির ভিতর ওনারা-ই সবগুলো দখল ক’রে নিলেক্,—কওয়া ত’ যায় না কিছু, তা বাবা, জামাই-ও যে, ঘরের বেটা-ও সে। এ-কটা দিন বাইরে একটু কষ্ট সইতে হবেক্।” ভদ্রনাথের বুকে যেন একটা ঢেঁকি ধপাৎ ক’রে পড়লো, মনে মনে বল্‌লে, ‘‘কটা দিন।” মুকুন্দ ব’লে যেতে লাগ্‌লো, ‘‘তা, কি জানো জামাই, আনন্দময়ী মা ভিটেয় পায়েব ধুলো দিছে, পাঁচকুটুমের মুখ দেখে এ সময়টা আনন্দ করা-ই চাই; তুমি ত’ পাশ করা পণ্ডিত তোমায় আর বোঝাব কি।”

মুখটুকু ধুয়ে স্নানটান করার পর, ভদ্রনাথ একটা চাল চেলে দেখ্‌লে; ‘‘স্বপ্নবিলাস শাড়ি”, ‘‘বুক জুড়ানো বডিস্”, যৌবন-জমক্ জ্যাকেট”, ‘‘হায়াহারা শাযা”, ‘‘বিধুমুখী সিঁদুব”, ‘‘পতিপাগল তৈল”, ‘‘চিকুর-চিকণ-চিরুণী”, ‘‘উষার-তুষার-পাউডার”, ‘‘হৃদয়রক্ত অলক্ত”, ‘‘কুন্দনন্দিনী মঞ্জন”, চুম্‌্বক বসানো একখানা খোঁপার জাল, একখানা স্নানবতা সতীর চিত্র, দুইখানি নূতন চক্‌চকে বাঁধানো উপন্যাস,—একখানির নাম ‘‘বাবাঙ্গনা না বরাঙ্গনা” আর একখানি ‘‘পতিতাব অপূর্ব সতীত্ব”, একশিশি ম্যালেরিয়া-মিক্‌শ্চার আর শাউড়ীর জন্য আনা একখানি কস্তাপেড়ে শাড়ি, সব গুছিয়ে টুছিয়ে বেঁধে বড়ো শালার ছেলে হাতোল্‌কে ডেকে তাব হাতে দিয়ে ব’লে দিলে যে ‘‘এই গুনি নিয়ে আস্তে আস্তে তোমার পিসীকে দাও গে; বুঝছে ত’ তোমার পিসী— পিসীমা।” হাতোল বল্‌লে, ‘‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি গো, তুমি তো আমার পিসা, তবেই হোল পিসি। তোমাব বউ, তা সব বুঝিপিসীর জন্যেই আনা করলে, আমার জন্যে কি নিয়ে আসছ? ভদ্রনাথ বল্‌লে ‘‘এগুনি বেশ ক’বে বুঝিয়ে দিযে আস দিকি তারপব তোমায় এক জিনিস দেবো’খন, একখানা ফুটবলের ক্যাটালাক্—অনেক ছবি আছে।” ঘুড়িকাটা লক্ পাবে মনে ভেবে বোঁচকাটি বুকে ক’রে হাতোল্ বাড়ির মধ্যের দিকে দৌড় দিলে।

সমস্ত দিনেব ভেতব হাতোলের আর টিকিটিব দেখা নেই, সে রত্নীপিসীর ঘবে বোঁচকাটা পৌঁছে দিতে না দিতেই ঠাকুরমার হুকুমে বদ্দিদের বাড়ি ‘ছিবি’ (শ্রী) আন্‌তে কখন লোক যা’বে তাই জিগ্‌গুস্‌তে গেল, সেখানে গিয়ে মনে প’ড়লো—তার স্যাঙাৎ দুলেদেব ষাঁড়াকে সন্ধ্যেপূজোব পব পোড়াবাব জন্যে যে তুবড়ী তৈবি করতে দিয়েছে, তাব কতদূর হ’ল একবাব তাগিদ্ দিতে হবে। সেখান থেকে ফিরে তেল মেখে পুকুরে স্নান—একপাল ছেলের সঙ্গে সাঁতাব খেলা—তার পব অন্ন-মেরু ভক্ষণ, সুতরাং পিসা-মোসার দৌত্য-কার্যের কথা তার মন থেকে একেবারে ধুযে পুঁছে লোপ পেয়েছিল, বিকেলবেলায় করবীতলায় দেখা হ’তে পিসা শুধলে, ‘‘কিরে, সে সব জিনিস পত্তর নিয়ে গেলি, তারা কি বল্‌লে আমায় বল্‌লি নি?” হাতোল বল্‌লে, ‘‘তাবা বুঝি—? আমি তেমন কৈবতের ব্যাটা নই।” ভদ্রনাথ বল্‌লে, ‘‘ছিঃ ও কথা বল্‌তে আছে? আমরা মাহিষ্য।”

হাতোল্। ‘‘মাহিষ্যি-ই হই, আর হর্বিষ্যি-ই হই, আমি রা’ কাড়্‌তি না কার্‌্তি আঁতের কথা বুজ্জেকলি, আমার পিসী তোমার তো পিসী না, বউ; তুমি তা’কে যা’ দিলেক তা কি হাটেব মধ্যে গোল করি? আমি চুপিসাড়ে রত্নী পিসীর ঘরকে ঢুকে চৌকির উপর থুয়ে আসছি।”

ভদ্র। ‘‘তা-তা—সে কি বল্‌লে?”

এইবার হাতোল্ মুশকিলে প’ড়ল, পিসী-ও কিছু বলে নি, সে-ও কিছু শোনে নি, অথচ কথাটার উত্তর দিতে না পারলে, সহুরে পিসে তাকে যে পাড়াগেঁয়ে বোকা ঠাওরাবে এটা-ও তার সহ্য হবে না, কি উত্তর দিবে ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার মনে পড়্‌ল হাজার ভালো হ’লেও মেয়েরা একটা না একটা খুঁত ধরবেই ধরবে, তাই বলে উঠ্‌ল, ‘‘পুট্‌লিটা খুব ভালো কইল বটেক, তবে মু’খানা একটু বাঁকা ক’রে কইলেক্ যে একটা ছাতা বুঝি আর আন্‌তে পারেক নি।”প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করে-ই ব্যতিব্যস্ত হাতোল্ Right about- ভোঁ দৌড়। ছাতার ভেতর কি প্রেমের আশ্লেষ লুকানো আছে, তার সমস্যার

নিস্ফল ভাবনায় মাথা ঘামাতে ভদ্রনাথের আধঘন্টার উপর কেটে গেল।

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় আনন্দ যখন প্রদীপ শিখায়, ধূপের গন্ধে, ঢোলের ছন্দে, বাঁশীর রন্ধ্রে, আলাপের প্রবন্ধে অভিব্যক্ত; যখন সারা ভূমগুলেব হাসি মণ্ডলদের চণ্ডীমণ্ডপস্থ প্রতিমার অধর হ'তে বলির অপেক্ষায় জীবিত ছাগশিশুব চক্ষে-ও প্রস্ফুটিত, তখন একমাত্র ভদ্রনাথ-ই নিরানন্দ। কেবল নিরানন্দ নয়, শান্তির উপর কঠিন শাস্তি প্রাণের সমস্ত ছন্দ কণ্ঠনালীপথে বন্ধ ক'রে ঠোঁটে একটা বিকারগ্রস্ত হাস্যরেখার আঁচড় কাটতে হচ্ছে। জল সইতে যাবার বাজ্না বেজে উঠ্‌ল। অবগুণ্ঠনবতী অন্তঃপুরিকারা মঙ্গলকলস-কক্ষে বাটীর অনতিদূরস্থ ষষ্ঠীতলায় পুষ্করিণী-অভিমুখে ধীরপদে শুভযাত্রা করলেন; তখন ভদ্রনাথ নিজ আর্দ্র চক্ষে প্রেমের বীক্ষণ-শক্তি প্রয়োগ ক'রেও স্থির করতে পারলেন না যে সেই চত্বাবিংশ সুধাংশু মালার মধ্যে নববস্ত্র-মণ্ডিত কোন্ কবরী কুণ্ডলীটি তাঁর হৃদ-পিণ্ড-স্পন্দন-সক্ষম-সূত্র-গুচ্ছে রচিত।

ছাত্রদেব সেই "মাতৃভক্তি"-রচনা লিখতে দেবার পর থেকে ভদ্রনাথ আর নিজের মার নাম মুখে আনে নি, গর্ভধারিণী মার-ও নয়, জগৎপ্রসবিনী মাব-ও নয়। জামা কেন্‌বার সময়, "রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে" গেছে যদি মা কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে থাকে , তবে সেটা জ্ঞানকৃত অপরাধ নয়। শ্বশুর বাড়ি এসে বার-বাড়িতে রাত কাটানোব ব্যবস্থা হওযার সুরু থেকে-ই চণ্ডীমণ্ডপস্থ মৃন্ময়ী মার নিষ্ঠুর আচবণে দেখে হিন্দুধর্মের উপব ভদ্রনাথের আস্থা একেবারে মন্দীভূত হয়ে গেল। অ্যাঁ, এই মা! এর নাম দয়াময়ী! সঞ্চিত যা' কিছু ছিল সব গেল, পর মাসেব বেতন-ও বস্ত্রনিকেতনে গমন কবেছে, উমো-ধুম্‌সীব কাছে ধার—এত আশা, এত স্বপ্ন, এত কল্পনা সব ব্যর্থ হ'ল! কুটুম্ব! কুটুম্ব! জামাতার চেয়ে আবাব বড়ো কুটুম্ব কে আছে! সেই জামাই বাইরে প'ড়ে 'হা হুতাশ' কবছে, আর মাসীর ননদেব সতীনের বকুলফুলের নাতবোয়েরা এসে ঘব জোড়া ক'রে আছেন। ধিক্ এই বাঙালীর সামাজিক আচাবে। একটু যদি ভালো ক'বে ইংবাজি পড়তাম, তা হ'লে কালই সাহেব হ'যে যেতাম। কি সুন্দব সুখেব সংসাব সাহেবদের, বলিহাবী যাই, বলিহারী যাই; শুধু ওয়াক্ আব আই-বাই-ইটসেল্‌ফ-আই! আর কোন-ও বালাই নেই। একবাব দেখতে বা একটা কথা কইতে পেলুম না। চিরুণী কিনে এনেছিলাম বেতে আমাব সামনে বসে চুল বাঁধ্‌বে দেখব, আপনাব হাতে ক'রে মুখে পাউটার মাখিয়ে দোব, কলকাতায় যেতে হয়েছিল থিয়েটার পর্যন্ত দেখে এসেছি, তার গল্প করতাম, এ সব আশায় ছাই পড়ল।

মাব জন্যে একগাছা সুতো পর্যন্ত কিনে পাঠাই নি, বিটি শাপ দিলে না কি! না, তা' বিটি গালমন্দ কখন-ই দেয় নি। আর সেই ত' বিয়ে দিয়েছে, মা কালীঘাটের কালী, এই দুগ্যোপুজোটা যদি উঠিয়ে দাও মা, তা হ'লে আমি তোমায় পাঁচসিকে পুজো পাঠিয়ে দিই। ওঃ, বিটি আমার আনন্দময়ী! আনন্দময়ী! সারা রাত বাইশ বেটার নাকের ডাকে আর মশার কামড়ে আনন্দ আর ত' ধর্‌ছে না। সেই পঞ্চমী থেকে সুরু আর এই নউমীর রাত পোয়ায় পোয়ায়, প্রাণের ভেতর আনন্দনাড় পাকিয়ে তুলছে!

তারা এই কি তোমার বিচাব বটে।
(দুর্গা এই কি তোমার বিচার বটে)
এতে-ই তো মা ভক্তি টক্তি যায় গো চটে।।
কিনে এসেন্স বডি জ্যাকেট শাড়ী
এলেম কত আশায় শ্বশুর বাড়ি,
এখন বাইরে প'ড়ে ছাড়ছে নাড়ী যেন ঘাটের মড়া নদীর তটে;—
কি গুণে আনন্দময়ী নামটি তোমার ধরায় বটে।।

পাঁচ ছেলের গল্প

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

আমি আজ একটি গল্প বলিব। সেই—সেই পুরান গল্প। ঠান্‌দিদিদের কাছে শোনা গল্প; তাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের ঠানদিদিদের কাছে। তাঁরা তাঁদের ঠানদিদিদের কাছে, তারা তাঁদের;— এই রকম করে গল্প ঠানদিদিতে ঠানদিদিতে চলিয়া আসিতেছিল। এখন ইংরাজীর চোটে ঠানদিদিদেব গল্প আর ভালো লাগে না, শোনাও যায় না। এই ঠানদিদিদের গল্প যখন বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে জাতক। যখন মহাযানীরা বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে অবদান। যখন ব্যাসদেব বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে সংবাদ। আবার বিষ্ণুশর্ম্মাব মুখে হইয়াছে পঞ্চতন্ত্র। এখনকার পাড়াগাঁয়ের স্ত্রীলোকদের কাছে হইয়াছে ব্রতকথা। এ সব গল্পে প্রেমের ছড়াছড়ি নাই, প্রেমের বীজ গজায় না ও ক্রমে ফলফুল ঝাঁকড়িয়া পড়ে না। এ লেখায় কৌশল নাই, বাঁধুনী নাই, রকমারী নাই। নিভাননী, নগেন্দ্রবালা, বিদ্যুৎবরণী, তড়িৎসৌদামিনী, অমিযানিভা চপলাপ্রভা প্রভৃতি একেলে বাহারে নাম নাই। চন্দ্রিমার বর্ণনা নাই, বসন্তের হাহুতাশ নাই আছে শুদ্ধ একটি গল্প। সেকালে মিষ্ট লাগিত। লোক পড়িত, শুনিত, একালে যাঁদের ভাল না লাগে, পড়িবেন না, শুনিবেন না, গল্পটি এই—

এক আছেন রাজপুত্র, তাঁর আছেন চার বন্ধু—গুরুপুত্র, পাত্রেরপুত্র, পুরুতপুত্র আর কোটালেব পুত্র। তাঁদের বয়স এক, বাড়ী একখানে, এক পাঠশালায় পড়া, একত্রে খেলা করা, যেন পাঁচটিতে এক। রাজা ছেলেগুলিকে ভালবাসেন, গুরুঠাকুর তাদের ভালবাসেন, পাত্র ভালবাসেন, পুরুত ভালবাসেন, কোটালও ভালবাসেন। সকলেই পাঁচটি ছেলেকে আপনার ছেলেব মত দেখেন। চাকবরা ভালবাসে, কাছারীর লোকজন ভালবাসে, প্রজারা ভালবাসে এবং যে-দেখে, সেই ভালবাসে। কিন্তু পাঁচজনের প্রকৃতি পাঁচরকমের। তাঁরা পাঁচ বকম জিনিস ভালো করিয়া শিখিলেন, আপনাব মনোমত জিনিস শিখিলেন। রাজপুত্র শিখিলেন পুণ্যকর্ম, দান, ধ্যান, অতিথিসৎকাব, সবলতা, অমাযিকতা, সত্যকথা বলা ইত্যাদি। গুরুপুত্র শিখিলেন বিচার করা, সূক্ষ্ম হইতে আরও সূক্ষ্মে যাওয়া; শিখিলেন শাস্ত্র, শিখিলেন বুদ্ধি কেমন করিয়া মাজিয়া লইতে হয়, শিখিলেন শাস্ত্র কেমন করিয়া প্রযোগ করিতে হয়। পুরুতের পুত্র শিখিলেন শিল্প, ৬৪ কলা নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদি। পাত্রের পুত্র দেখিতে সুন্দর ছিলেন। তিনি শিখিলেন চেহারাটা কেমন করিযা খোলে তাই করিতে, রূপের কেমন করিযা বাহাব দিতে হয়। কোটালের পুত্র শিখিলেন কুস্তী, কসরৎ, লাঠিখেলা ইত্যাদি এবং শিখিলেন কেমন করিয়া দেহে জোর করিতে হয়, আর কেমন করিয়া সে জোর কাজে লাগান যায।

বৌদ্ধ বইএ বলে, ইহাদের বাড়ি কাশী। ইহাদের প্রকৃতি অনুসাবে নাম হইয়াছে, পুণ্যবন্ত, প্রজ্ঞাবন্ত, রূপবন্ত, শিল্পবন্ত আর বীর্যবন্ত। রাজার প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড দেউড়ী, তাহাব ভিতরে অন্তঃপুর, হাতীশালা, ঘোড়াশালা, গোশালা, কাছারী, দেওয়ানখানা ইত্যাদি রাজার সমস্ত মহল। দেশের মধ্যে বড়ো রাস্তার উপর রাজার বাড়ি। এক দিকে রাজার বাড়ি— আর এক দিকে সব দেবমন্দির, মাঝখানে প্রকাণ্ড রাস্তা। রাস্তা প্রকাণ্ড, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথ একেবারে দুই তিনখানা টানা যায়। মন্দিরগুলিতে বিষ্ণু আছেন, শিব আছেন, কালী আছেন, কার্তিক আছেন, গণেশ আছেন, যষ্ঠী-মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি আছেন। প্রত্যেক মন্দিরে ছোটো-বড়ো নাটমন্দির, সেইখানে দেশের লোক ব'সে গল্প করে। দেবতার সামনে বসিয়া মিছা কথা বলিতে পারে না। উহারই মধ্যে একটায় পাঠশালা। রাজপুত্র প্রভৃতিরা পড়েন, লেখেন, খেলা ও গল্প করেন। গল্প করিতে করিতে এক দিন কথা উঠিল, পুণ্য বড়ো না, প্রজ্ঞা বড়ো, না শিল্প বড়ো, না রূপ বড়ো, না বীর্য বড়ো। আপন আপন কোট কেহই ছাড়িলেন না। রাজপুত্র বলিলেন, পুণ্য বড়ো; গুরুপুত্র বলিল, প্রজ্ঞা বড়ো; পাত্রের পুত্র বলিল, রূপ বড়ো; পুরুতপুত্র বলিল, শিল্প বড়ো;

কোটালের পুত্র বলিল, বীর্য বড়ো। বিচার ত হয় না, অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল, এখানে এর বিচার হবে না, এখানে সকলে আমাদের চেনে; পক্ষপাত করিবে। চল আর এক ভিন্ন রাজার দেশে যাই। ঘর থেকে কেউ কিছু লইয়া যাইতে পারিবে না। যে যা উপার্জন করিবে, ভাগ করিয়া খরচ চালাইবে।

যাইতে যাইতে তাঁহারা কাম্পিল্য নগরে উপস্থিত হইলেন, তথায় একটি বাড়ি ভাড়া করিলেন, এবং পাঁচজনই আপনাব গুণের পরিচয় দিয়া রোজগারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলের মনের ইচ্ছা, তাঁহার গুণের পুরস্কার দেখিয়া অন্য বন্ধুরা তাক হইয়া যাইবেন। দুপুরবেলা কোমরে গামছা জড়াইয়া পাঁচজন মহাপ্রভু স্নান করিতে গেলেন; গঙ্গায় পড়িয়া স্নান করিতেছেন। সাঁতার দিতেছেন, দেখা গেল, একখানা বাহাদুবী কাঠ ভাসিয়া আসিতেছে। বর্ষায় গঙ্গার বেগ খরতর, মাঝে মাঝে ঘূর্ণিও আছে, কেহই সে কাঠ ধরিতে যাইতে সাহস করিতেছে না। কোটালের পুত্র বলিল, "আমি যাইব", বলিয়া সাঁতার দিয়া কাঠেব উপর উঠিল। তাহাব পব যেমন দাঁড় বহে, হাতে-পায়ে সেইরূপ জল কাটাইয়া তাহাকে কৌশলে ডাঙার কাছে আনিল এবং গায়ে অসীম জোর ছিল, উহাকে পাড়ে তুলিয়া ফেলিল। পাঁচ বন্ধুতে তখন বাহাদুরী কাঠখানাকে পরীক্ষা কবিতে লাগিলেন। বেশ সুগন্ধ বাহির হইতেছে। কিসের গন্ধ? কিসেব গন্ধ? চন্দনের গন্ধ। তবে এটা চন্দনেব কাঠ। প্রকাণ্ড চন্দনের কাঠ নদীর পাড়ে তোলা হইয়াছে শুনিয়া কাম্পিল্যের লোক ভাঙিয়া পড়িল। গন্ধবেণেবা এমন দাঁও ছাড়া যায় না বলিয়া বীর্যবন্তেব কাছ থেকে অল্প দামে কাঠখানি কিনিয়া লইবার চেষ্টা কবিল, কিন্তু তাহাব চেহারা দেখিয়া ও "উহাকে ঠকান সহজ নয়" বুঝিয়া এক লক্ষ "পুরাণ" নামে টাকা দিয়া কিনিয়া লইল। সে-ও বাসায় আসিয়া আপনার বন্ধুবর্গকে ভাগ কবিয়া দিল এবং একটি গাথা পড়িল—

"বীর্যেব প্রশংসা লোকে আছে পূর্বাপব।
মানুযেব বাহুবল সবাব উপর।।
বীর্যেব প্রভাবে দেখ কোটালেব সুত।
আনিল প্রচুর ধন সহস্র অযুত।।"

সকলে বীর্যবন্তেব প্রশংসা কবিতে লাগিল।

তাহাব পব শিল্পবন্তের পালা। তিনি বীণা লইয়া বন্ধুদের কাছ হইতে সবিয়া পড়িয়া একটি মন্দিরের নিকটে দাঁড়াইয়া বীণা বাজাইতে লাগিলেন। নগর ভাঙিয়া পড়িল। যত লোক কাম্পিল্য নগরে বীণা বাজাইতে পটু ছিল, সকলেই আসিয়া জুটিল। কত অমাত্য-পুত্র আসিলেন, কত শ্রেষ্ঠিপুত্র আসিলেন। সকলেই শিল্পবন্তকে হারাইবার বিশেষ চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ওস্তাদ ছিলেন, সকলকে ছাড়াইয়া উঠিলেন। এমন সময় তাঁহার সাততারা বীণার একটা তাব ছিঁড়িয়া গেল। ছয় তাব হইতেই সাত তাবার সমস্ত আওয়াজ ও সুর বাহির হইতে লাগিল। লোক চমৎকৃত হইয়া গেল। ক্রমে আরও এক তাব ছিঁড়িল, তবুও সেই সুব, যেন তার ছিঁড়েই নাই। ক্রমে সব তার ছিঁড়িয়া যখন একটিমাত্র তারে ঠেকিল, তখনও সেই সাততারার সব সুর বাহিব হইতে লাগিল। সকলে আশ্চর্য হইয়া উহাকে 'পুবাণ' নামে টাকা ও বস্ত্র, অলংকার পেলা দিতে লাগিল। সে সব পেলা কুড়াইয়া বাড়ি আসিল ও পাঁচজনে ভাগ কবিয়া লইল। সকলে খুব খুসী হইল ও গাথা গাহিল—

"শিল্পের প্রশংসা লোকে আছে পূর্বাপব।
শিল্পকলা মানুষের সবার উপর।।
শিল্পের প্রভাবে দেখ পুরুত-নন্দন।
আনিলেন কত ধন করি উপার্জ্জন।।"

সকলে শিল্পবন্তের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এবার রূপবন্তের পালা। তিনিও অন্যান্য বন্ধুদের নিকট হইতে সরিয়া পড়িয়া, অনুপম বেশ-বিন্যাস করিয়া, চকের রাস্তার মাঝখান দিয়া চলিতে লাগিলেন। সকলেই বলিতে লাগিল, এমন রূপ

ত কখন দেখি নাই। এ কোথা হইতে আসিল? এ কি "অমিয় ছানিয়া বিধি রূপ নিরমিল। তাহাতে গড়িল বরবপু?" স্ত্রীলোকেরা দেখিয়াই মনে মনে স্বামি-নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। ভাবিল, আমাব এইরূপ একটি স্বামী হইলে কত ভালো হইত। তা নয়, বাবা একটা পোড়া কাঠের সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়াছে!

যাহাই হউক, চকের বাজার দিয়া যাইতে যাইতে পাত্রের পুত্র নগরের প্রধান গণিকার চোখে পড়িয়া গেলেন। সে দোতলায় জানালায় বসিয়া ছিল, উহাকে দেখিয়াই চাকরাণীকে বলিল, "তুমি যাও, ঐ লোকটিকে আমার নাম করিয়া ডাকিয়া লইয়া আইস।" তিনি দাসীর সঙ্গে গণিকার সুসজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। গণিকা অমনই স্বহস্তে তাঁহার পা ধোয়াইয়া দিয়া মাথাব চুল দিয়া পা মুছাইয়া দিল এবং বলিল, আর্যপুত্র, আপনি দাসীর এই খাটের উপর বসুন। আমার যা' কিছু আছে, আপনি সকলেরই মালিক। আজ হইতে আমি আপনার দাসী। আপনি আমার সহিত ক্রীড়া করুন, কৌতুক করুন, আর যাই করুন, সব আপনার স্বেচ্ছাধীন। স্নানের ঘরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া গণিকা তাঁহাকে স্বহস্তে গন্ধ-তৈল মাখাইয়া দিল; নানারকম স্নান-চূর্ণ দিয়া জল সুবাসিত করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইল। তাহার সুগন্ধ অনুলেপন দিয়া তাঁহার গা লেপিয়া দিল; মিহি কাপড় ও চাদর পবাইয়া তাহার মধ্যে নানারূপ ধূপের ধোঁয়া লাগাইয়া দিল, তাহার পর সে চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় চাবি প্রকারের উৎকৃষ্ট আহার প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিল। তখন তিনি বলিলেন, "আমার ঘরে আমার চাবিজন বন্ধু আছেন, তাঁহাদের এই সময়ে আনান আবশ্যক এবং তাঁহাদের টাকাকড়ি দেওয়া আবশ্যক।" তাহাদের ডাকা হইল। তাহাবা আসিয়া সব দেখিল। তখন সে গাথা গাহিল—

"রূপের প্রশংসা লোকে আছে পূর্বাপর।
মানুষের রূপ হয় সবার উপর।।
দেখ রূপবন্ত গণিকার কোলে বসি।
আহরণ করিয়াছে কত ধনবাশি।।"

তোমরা এখন এই লক্ষ টাকা লও ও খরচ কর। তাহাবা টাকা লইয়া বাসায় গেল।

এইবার প্রজ্ঞাবন্তের পালা তিনি রাস্তায় যাইতে যাইতে শুনিলেন, এ দেশে এক মজার মামলা উপস্থিত হইয়াছে। রাজসভায় কেহই তাহার সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দিতে পবিতেছেন না। ব্যাপাবটি এই,—এক জন শ্রেষ্ঠী নগরের প্রধানা গণিকাকে এক রাত্রি তাঁহাব সঙ্গে কাটাইবাব জন্য আহ্বান করেন, এবং তাহাকে লক্ষ টাকা দিবেন স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি যে দিন তাহাকে চান, সে দিন সে আসিয়া বলিয়া যায়, সে অন্যত্র ভাড়া লইয়াছে, সে-দিন আসিতে পারিবে না। তাহার পরদিন সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, কবে আসিতে হইবে? শ্রেষ্ঠী বলে, "তোমার আর আসিতে হইবে না, আমি কা'ল রাত্রে তোমায় স্বপ্নে দেখিয়াছি।" তখন সে বলিল "আচ্ছা, যদি আমারই সঙ্গে সারারাত কাটাইয়াছ, তবে আমার ভাড়া লক্ষটাকা দাও।" সে বলিল, "তা কেন দিব? তুমি ত অন্যত্র ছিলে, আমি তোমায় দক্ষিণা কেন দিব? জবাব হইল, "তুমি ত আমাকেই পাইয়াছিলে, আমার প্রাপ্য আমায় দিবে না কেন?" তখন দু পক্ষই রাজার কাছে গিয়া নালিশবন্দী হইল। রাজা ও রাজার সভাসদ্‌গণ কেহই ইহার মীমাংসা করিয়া দিতে পারিতেছেন না এবং যে পারিবে, তাহাকে বিশেষ পুরস্কার দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। দুই পক্ষই রোজ দরবারে যাতায়াত করিতেছেন, কিন্তু কিছুই হইতেছে না।

শুনিয়া প্রজ্ঞাবন্ত রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, একজন তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণকে সভায় আসিতে দেখিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ পাদ্য ও অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার সৎকার করিয়া বসিবার জন্য তাঁহাকে আসন দিলেন। তিনি বসিয়া আলাপচারি করিতেছেন, এমন সময় রাজা এই কঠিন মোকর্দমার কথা তাঁহাকে বলিলেন এবং তিনি যদি ইহার কিনারা করিয়া দিতে পারেন, পুরস্কার দিবেন, তাহাও বলিয়া দিলেন, তিনি বলিলেন, "বাদী প্রতিবাদী উপস্থিত আছে?" রাজা বলিলেন "আছে।" তিনি তাহাদের সামনা-সামনি দাঁড়

করাইয়া তাহাদের ব্যবহার শুনিলেন। উভয় পক্ষই যখন স্বীকার করিতেছে, তখন সাক্ষীসাবুদের দরকার নাই। তিনি গম্ভীরভাবে অনেকক্ষণ ভাবিয়া শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন, "তুমি এক লক্ষ টাকা এইখানে রাখ।" আর মহারাজকে বলিলেন, "মহাবাজ, একখানা বড়ো আরসী আনাইয়া এইখানে রাখিবার আজ্ঞা হউক।"

বলিবামাত্রই দুই জিনিস আসিয়া পৌঁছিল। তিনি গণিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, শ্রেষ্ঠী স্বপ্নে তোমার আবছায়া উপভোগ করিয়াছেন। তুমি যে তাহার ভাড়া বা দক্ষিণাস্বরূপ সত্যকার টাকা চাহিতেছ, তাহা হইতে পারে না। তুমি এই আরসীব মধ্যে ঐ লক্ষ টাকার যে আবছায়া আছে, তাই দক্ষিণা বলিয়া গ্রহণ কর।" এই নিষ্পত্তিতে বাজসভায় একটা মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। কেহ বলিল, "ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিবও এমন বিচাব করিতে পরিতেন না।" কেহ বলিল, "বোধ হয়, রাজার বিপদে স্বয়ং বৃহস্পতি স্বর্গ ছাড়িয়া এখানে আসিযাছেন।" রাজা মহা আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে যে পুবস্কার দিবেন বলিযাছেন, তাহা ত দিলেনই, আর তাহার উপরও কিছু দিলেন; কারণ, তিনি বুঝিতে পারেন নাই, এত সহজে এমন মামলার বিচাব হইবে। উদ্ধার পাইয়া শ্রেষ্ঠী বলিল, "আপনি আমার মান বাঁচাইয়াছেন, এ লক্ষ টাকা আপনারই, আমি আব উহা বাড়ি লইয়া যাইব না।"

সমস্ত ধন-বত্ন লইয়া প্রজ্ঞাবন্ত তাঁহাব বন্ধুদিগকে বাঁটিয়া দিলেন এবং গাথা গাহিলেন—

"প্রজ্ঞাব প্রশংসা লোকে আছে পূর্বাপর।
প্রজ্ঞা মানুষেব হয় সবাব উপর।।
এই দেখ প্রজ্ঞাবন্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া।
রাশীকৃত ধন-বত্ন দিলেক আনিয়া।।"

এ বার বাজপুত্রেব প লা। তিনিও বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে সরিয়া পড়িয়া বাজবাড়ির নিকট এক জাযগায চুপ কবিযা বসিয়া বহিলেন। রাজার এক অমাত্যপুত্র সেইখানে উপস্থিত হইলেন। বাজপুত্রকে দেখিযাই অমাত্যপুত্র তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে লইয়া আখড়ায় গেলেন, নানারূপ কুস্তী-খেলার পর তাঁহাকে লইয়া স্নানাগারে গেলেন, সেখানে স্নান করাইয়া অনুলেপন মাখাইয়া শরীর ধূপ দিয়া সুগন্ধ করাইয়া রাজপুত্রকে আহারে বসাইলেন। সে আহাব ত রাজভোগ। আহারাদির পব অমাত্যপুত্র তাঁহাকে লইয়া রাজার যানশালায একটি সুসজ্জিত গৃহে শয়ন করাইয়া দিলেন। তিনি ক্লান্ত ছিলেন, খুব ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাজকন্যা তাঁহাকে দুব হইতে দেখিয়াছিলেন, তিনিও একখানি যান লইয়া সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন এবং বাজপুত্র উঠিলেই "তাঁহাব সহিত কথা কহিয়া যাইব।" ভাবিয়া "এই উঠেন, এই উঠেন" করিয়া সারারাত কাটাইয়া দিলেন। যখন তিনি যানশালা হইতে যানে চড়িয়া ঘরে যায়েন, তখন অমাত্যেরা ভাবিলেন, "এ কি? রাজকন্যা রাত্রিতে যানশালায় ছিলেন কেন?" খুঁজিতে খুঁজিতে এক ঘবে বাজপুত্র শুইয়া আছেন দেখা গেল। দেখিযাই অমাত্যগণ তাঁহাকে বাজার কাছে লইয়া গেল, এবং কন্যান্তঃপুবদূষক বলিয়া অভিযোগ করিল। বাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বল?" তিনি বলিলেন, মহারাজ, অমাত্যপুত্র আমায় যানশালায় শোয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, আমি তথায় আর কাহাকেও দেখি নাই।" রাজকন্যাও সেইরূপ সাক্ষ্য দিলেন। অমাত্যপুত্রও সব কথা খুলিয়া বলিল। রাজার বোধ হইল, আসামী নির্দোষ। তিনি উঁহাকে পবিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, উনি বলিলেন, "আমি বারাণসীর রাজা অঞ্জনের পুত্র, দেশভ্রমণে আসিয়াছি।" রাজা অপুত্রক ছিলেন, ঐ কন্যাটিই তাঁহার একমাত্র সন্তান। তিনি বলিলেন, "তোমায় দেখিয়া আমার পুত্রস্নেহ উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমার পুত্র হও ও আমার এই বিস্তীর্ণ রাজত্ব তোমার হউক।" পুণ্যবন্ত রাজা হইয়া আপন বন্ধুদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন—

"পুণ্যের প্রশংসা লোকে আছে পূর্বাপর।
নরলোকে নাহি কিছু পুণ্যের উপর।।

•এই দেখ পুণ্যবলে আমি পুণ্যবন্ত।
পাইলাম রাজ্য যার নাই সীমা-অন্ত।।'

এইরূপে পাঁচ বন্ধুই আপন আপন শিক্ষার পুরস্কারে অন্য অন্য বন্ধুগণকে ভাগ করিয়া দিলেন। সকলেই বলিলেন, পুণ্য, প্রজ্ঞা, রূপ, শিল্প ও বীর্য ইহার কাহাকেও অবজ্ঞা করা যায় না। সকলই মানুষের কাজে আইসে এবং সকলেরই সময়ে প্রচুর পুরস্কার হয়।

বৌদ্ধ গল্পে বলিল, ঐ যে রাজপুত্র পুণ্যের জোরে কাম্পিল্য রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, উনিই অনেক জন্মের পর হইয়াছিলেন ভগবান্ বুদ্ধদেব, শুদ্ধোদনের পুত্র ও কপিলাবস্তুবাসী। যিনি সে জন্মে বীর্যবন্ত ছিলেন, বুদ্ধের সময় তিনি শোণক হইয়াছিলেন, যিনি শিল্পবন্ত ছিলেন, তিনি হইয়াছিলেন রাষ্ট্রপাল; যিনি রূপবন্ত ছিলেন, তিনি হইয়াছিলেন সুন্দরনন্দ। আর যিনি প্রজ্ঞাবন্ত ছিলেন, তিনি হইয়াছিলেন শারিপুত্র। যাঁহারা বৌদ্ধ সাহিত্যে দক্ষ, তাঁহারাই এই সকল জাতকের মর্ম বুঝিতে পরিবেন, তাহার জন্য আমার আর বাক্যব্যয় করা বৃথা।

বার্ষিক বসুমতী: ১৩৩৩

ম ডে ল ভ গি নী

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

জ্যৈষ্ঠ মাস। দিবা দ্বিপ্রহর। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, বাতাস সাঁ সাঁ করিতেছে, মন খাঁ খাঁ করিতেছে। স্থলে, বাবুর বাগানে, দাড়িম্ব-পত্র যেন ঝলসিয়া গিয়াছে; কদম্বকাণ্ড যেন নীরস, নির্গুণ, নিশ্চলভাবে, পরমব্রহ্মের ন্যায় দণ্ডায়মান আছে। জলে, কমল-সরোবরে, তপন-সোহাগে তৃপ্ত হইয়া, কমলিনীকুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। এদিকে নভোমণ্ডলে পাখি, প্রাণবঁধু জীবনধন জলকে "ফটী-ঈক জল" বলিয়া ডাকিতেছে। ওদিকে, তারকেশ্বরের মহান্তের হাতিটা অতি গরমে ক্ষেপিয়া উঠিয়া জলে পড়িয়া কমল-দলের অন্তরালে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। স্বভাবের এই বিপরীত ব্যবহারে, বঙ্গভূমি চমকিত।

আরও কথা আছে। অতি-গরমে আম পাকিল, জাম পাকিল, লিচু পাকিল, কলা পাকিল,—চুল পাকিবে না কেন? হাতি ক্ষেপিল, কমলিনী ফুটিল, দাড়িম ঝলসিল,—বারি-পতন হইবে না কেন? ঘর গরম হইল, ভাই-ভগিনীর দেহ গরম হইল, ঘাম বাহিরিল,—কাপড় ভিজিবে না কেন?

কলিকাতার দালানগুলা যেন দাবানল জ্বলিতেছে। খোলার ঘর ত আগুনের খাপ্‌রা টিনের ছাদ তাতিয়া তাঁহা তাঁহা করিতেছে। নূতন চুণকামকরা সাদা দেওয়ালে মধ্যাহ্নতপনের তাপ লাগিয়া, গরিব পথিকের চক্ষু কেবল ঝলসিতেছে। যে বাড়িগুলার হল্‌দে রঙ, সে গুলাতে বরং একটু রক্ষা আছে। তক্তা-চাপা-অসূর্যম্পশ্য-নবদূর্বাদল-শ্যাম-রঙের অনুকরণে যে সকল বাড়িতে আজকাল একটু হরিতালী গোছ রঙ মাখান হয়, সেইখানেই কতকটা উত্তপ্ত পথিকের মন-প্রাণ-শরীর ঠাণ্ডা হইতে পারে।

বড়ো সুখের বিষয়, কলিকাতার বাড়ি যতই জরাজীর্ণ হইতেছে, ততই ঐ হরিতাল-রঙে একটু "নিকেন পোঁছান" করিয়া, তাহার ভাড়া বাড়ান হইতেছে। বাড়ি পড় পড়; বনিয়াদে ঘুণ ধরিয়াছে, ছাদ ফাটিয়াছে, কড়ি ঝুলিয়াছে। ভাবিলাম, মিউনিসিপালিটী হইতে দুচার দিনের মধ্যে উহাকে ভাঙিয়া দিবার আজ্ঞা আসিবে। ওমা! পনের দিন পরে দেখি, কতকগুলা রাজমিস্ত্রী, সেই হরিতালী

রঙ, হাঁড়া হাঁড়া গুলিয়া হু হু শব্দে তাহার অষ্টপৃষ্ঠললাটে মাখাইতেছে। দেখিতে দেখিতে, দিব্য ফুট্‌ফুটেটি হইল। তখন বাড়ির কর্তা, প্রচার করিতে লাগিলেন, "আমার ইচ্ছা, (ত্রিশ টাকা ভাড়া ছিল) দশ টাকা বাড়াইয়া চল্লিশ টাকা করি। গিন্নী বলেন, তা হবে না; পঞ্চাশ টাকার কম এবার ও-বাড়ি ছাড়া হবে না।" পঁয়তাল্লিশ-বর্ষ-বয়স্কা বারাঙ্গনা, গোলাপী-রঙে ছোপান পুরান কাপড়ের কাঁচুলি-কসনে, ডবলবিজিটের দাবী করে।

কলিকাতার কোনো এক ফিরিঙ্গীপাড়ায় ঐরূপ একটা হল্‌দে বাড়িতে, এ গরমের দিনে, কয়েকজন নরনারী আশ্রয় গ্রহণ কবিয়াছেন। বাড়িটা প্রকাণ্ড; দ্বিতল; সুমুখে বড়ো বড়ো থাম; যেন নবাবের খাস-বৈঠকখানা। ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ও হরি।—নীচের ঘরগুলো অন্ধকাব।—সপ্‌ সপ্‌ জল উঠছে।—একটা দুর্গন্ধ। বসবার, কি দাঁড়াবার একটু যদি স্থান থাকে, তা আমায় দিব্য আছে! তবে নরনাবীগণের, নীচে-তলার সঙ্গে বড়ো একটা অধিক কারবার নাই। সংসারধর্মে থাকিতে হইলে, অনেক কষ্টই সহিতে হয়। সময়ে সময়ে মানবধর্মের আবশ্যকীয় কোনো কাজ পড়িলে, সেই অন্ধকারময় ঘরেই লোকজনের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ-আদি করিতে হয়। অভ্যাস বশত গৃহস্থের অন্ধকারে তত অসুবিধা হয় না। কিন্তু আগন্তুকের প্রাণ-বিয়োগ।

সাধাবণ নিয়ম এইরূপ হইলেও বিশেষ সুবিধা আছে। বিচালীওয়ালা, টিকেওয়ালা, জুতাবুরুশওয়ালা, দরজী, রাজমিস্ত্রী যত বাজে-লোক আসে, তাহাদের সঙ্গেই কেবল নিম্নতলে কথাবার্তা কাব কাববার চলে। কোনো ভদ্রলোক আসিলে, তাঁহাকে নীচে বসিতে, দাঁড়াইতে, বা কথা কহিতে কিছুই হয় না; একেবারে গট্‌ গট্‌ উপরে চলিয়া যাও, নিষেধ নাই, অবারিত দ্বার। আরও বিশেষ সুবিধা এই যে, পরিচিত বিশেষ-বন্ধুবান্ধব আসিলে, গৃহস্থ শীঘ্র স্বয়ং আসিয়া, সসম্ভ্রমে তাঁহাকে নীচে হইতে উপরে লইয়া যান। এক কথায, নীচে-তলাকে বর্জিতদেশ বা নরককুণ্ড বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

নিম্নদেশ নরক হউক, ন্যক্কারজনক হউক, উপরিভাগ কিন্তু নন্দনকানন। একবার ঠেলে-ঠুলে, চোখ-বুজে, নাকে কাপড় দিয়ে উপবে উঠিতে পারিলে প্রথমে মনে হয়, আঃ বাঁচিলাম।—এ যে, দ্বিতীয় স্বর্গ। দ্বিতলের দ্বারে দ্বারবান সদা দণ্ডায়মান। পাগড়ী, চাপকান, পায়জামা, দিল্লীর নাগরা, সকলই তাঁহাতে আছে। পরিচিত, অপরিচিত, সুপরিচিত, যাঁহাকে তিনি দেখিতেছেন, তাঁহাকেই অমনি তিনি ঘাড় নোযাইয়া সেলাম করিতেছেন। যেন কাঠেব পুতুল, কলে কাজ করিতেছে। হাসি নাই, স্ফূর্তি নাই, কথা নাই, অঙ্গচাঞ্চল্য নাই,—ঠায়, ঠিক্‌ সোজা গাছেব গুঁড়ির মতো সে ব্যক্তি দণ্ডাযমান।

দ্বারবানরূপ জিনিসকে দেখিয়াই, এক প্রকাণ্ড হলে প্রবেশ করিতে হয। সে হল প্রথম দর্শনমাত্র, আমাদেব মতো বাংলা-লেখকের মনে প্রথমে ভয হয,—জুতা খুলে ঢুকি, কি, জুতা পায়ে দিয়ে ঢুকি! জুতা পায়ে দিয়া ঢুকাই যদি নিযম হয়, তবে, জুতা খুলিয়া ঢুকিলে আমাকে অসভ্য বলিবে। আর নিয়ম যদি বিপরীত হয়, অথচ আমি জুতা পরিয়া ঢুকিলাম, তাহা হইলেও আমি উনবিংশ শতাব্দীর কুলাঙ্গার বলিয়া পরিচিত হইব। প্রথম দর্শনেই এই বিপদ। জুতা রাখি, কি, জুতা ফেলি,—এই সংশয়দোলায় চিত্ত ঘুরিতে থাকে।

প্রথমত মেজে মাদুরিত; তার উপর সতরঞ্চ; তস্য উপর, কারপেট বিছানা। অর্থাৎ যেন প্রথমত ঘনদুধ, তার উপর দু আঙুল পুরু সর, তার উপর বৌবাজারের ভীমবাবুর কাঁচাগোল্লা,—এই দেবোপম তিন মহাপ্রাণীর উপর কেমন করিযা আমার সেই ছেঁড়া জুতা বসাই বল দেখি? জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালবিশিষ্ট, চারিদিকে চারুতালি-সুশোভিত, নানাবিধ-পার্থিব-পদার্থপূর্ণ, সেই দিনে-রেতে-ঘরে-বাহিরে একমেবাদ্বিতীয়ং নাস্তিং জিনিসং, আমার সেই ছেঁড়াজুতাং—(আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোকে বলুন দেখি)—কেমন করিয়া সেই মাদুর-সতরঞ্চ-কারপেটরূপ ট্রিনিটী বক্ষে বিচরণ করিবে!

বুঝিলাম, সে ঘর ছেঁড়াজুতার উপযুক্ত ত' নহেই। তালতলার নূতন চটী তাহার সম্মান রাখিতে সক্ষম কিনা, তদ্বিষয়েও সন্দেহ আছে। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের চটী, বিদ্যাসাগরের চটী, ডাক্তার সরকারের চটী, এই ত্রিচটী ত তাহার কাছে ঘেঁসিতেই পারে না। মিঃ লালমোহন ঘোষের বিলাতী বুট, রাম-শ্যাম-নবীন-জ্ঞানী বাবুগণের ডসনের বার্ণিস বিনামা, সেই বিরাট, বিশাল বিস্তৃত ক্ষেত্রে বাহার দিবারই একমাত্র উপযুক্ত।

জুতা-বিভ্রাটের পরই, আসন-বিভ্রাট উপস্থিত। বসি কোথা? মেজেতে কার্পেটের উপরে এমন একটু জায়গা নাই যে, খানিক পা ছড়ায়ে বসা যায়। "ন স্থানং তিলধারণং" কেবল রাশিকৃত চৌকিতে, ঘরটা বোঝাই করা। তাই কি ছাই, সব সোজা রকমের কেদারা? স্থূল, সূক্ষ্ম, লঘু, গুরু,—ঢ্যাঙা, গেঁড়া, চেপটা, চৌকা—নানা ঢঙের, নানা রঙের যেন নানা সঙ উপস্থিত। কোনো কেদারাখানি এত মিহি যে, প্রাণ খুলে ভর দিয়ে বসিতে ভয় হয়,—বুঝিবা এ দেহ-ভার অনুভব করিলে তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দে অন্তর্ধান হইবে। আবার কোনো কোনো কেদারা গোদা-গোদা মোটা-সোটা যেন "বজ্জর বাঁটুল",—লোহার মুগুর মাব, তবু ভাঙিবে না,—স্বয়ং হিমালয় কবে দেখা করিতে আসিবেন বলিয়াই যেন সাজাইয়া রাখা হইযাছে। কোনো কেদারায় বসিলেই, তিনি দুলিতে থাকেন;—নাগরদোলায় নায়ককে রস-পাকে দুলাইবার আযোজন করিতেছেন। কোনো চৌকি ল্যাজ-বিশিষ্ট,—চারিহাত লম্বা, বুক চিতাইয়া পড়িয়া আছেন, তার উপর তুমি চোদ্দপোয়া হইয়া শোও; পা দুটা আকাশে উঠিবে, কোমরটা পাতালে পড়িবে, ঘাড়টা ত্রিশূন্যে বাঁকিয়া রহিবে, মাথাটা আঠেকাঠে বদ্ধ হইযা সোলার গোখুরা সাপেব ফুটন্ত চক্র গোছ সদাই ফণা ধরিয়া থাকিবে। কোনো চৌকি বিলাতীকলেব গদী আঁটা,—বসিলেই অতলস্পর্শ! চোবাবালিতে প্রাণ হারাবো নাকি? কোনোখানির নির্মাণ-কৌশল এইরূপ যে, দুজনে কেবল ঠিক্‌সোজা নড়ন-চড়ন-বিহীন হইয়া, মুখোমুখি বসিয়া থাকে,—ঈষৎ অঙ্গচালনা করিলেই উভয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উভযের গাযে ঠেকে। তখন ত্রাহি মধুসূদন। ফল কথা, স্বচ্ছন্দে বসিবার একটুকুও স্থান নাই।

দাঁড়াইয়া থাকিই বা কেমন করিয়া? দেওয়ালের পানে চাহিলে চোখ ঝলসিয়া যায়। লাল, নীল, সবুজ, সাদা রঙের দেওয়াল-গিরি ঝল্ ঝল্ করিতেছে। মাঝে মাঝে গ্লাসে ঢাকা ছবি। একখানি ছবি কাপড়ের ঘেরাটোপে ঢাকা। এইরূপ জনশ্রুতি, ঐ কাপড়ের আড়ালে আদম এবং ইভ, আদিম এবং অকৃত্রিম অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন।

"অদ্বিতীয় স্বর্গে" আসিয়া যদি এরূপ ধাঁধা ঠেকে, এমন বিপদ গ্রস্থ হইতে হয, তবে তেমন স্বর্গে আমার কাজ কি? গা খুলে, পা মেলে, কাঁকাল চুলকাইতে চুলকাইতে গুড়ুকতামাক না খেতে পেলে কি আমাদের পোষায়? ওরূপ আটাকাটীতে বদ্ধ থাকা কি ভদ্রলোকের কাজ? স্বর্গে দণ্ডবৎ! নরকেও দণ্ডবৎ! ভালো মানুষের ছেলের সোজাসুজি কার-কারবারই ভালো। অতএব বিদায়।

বলি, ও হচ্চে কি? এই রকম করে কি নভেল লেখে? সেই হল্‌দে ঘরের বর্ণনাটা, চলেছে ত চলেইছে। ছি!

উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ, মেয়েমানুষ কৈ? সেই গুণবতী, জ্ঞানবতী, রসবতী, যুবতী প্রসন্নমতি নায়িকা কৈ? সেই হেসে হেসে ঢলে পড়া কৈ? সেই কেঁদে কেঁদে বুকভাসান কৈ? সেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চম্‌কে-উঠা কৈ? সেই জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা কৈ? আচ্ছা, না হয় নায়িকাই এখন নাই।

সেই জ্ঞানের সাগর, গুণের সাগর, রসের আকর নায়ক-প্রবরই কৈ? বসন্তকাল, আমের মুকুল, কোকিল, ভ্রমর, চাঁদ, পদ্ম, জ্যোৎস্নারাত্রি, গোধূলি, প্রভাত-তপন, দীর্ঘ-নিশ্বাস, হা হুতাশ, বুকের ভিতর কুলকাঠের অগ্নি, চোখের ভিতর মন্দাকিনী, মুখের ভিতর বক্তৃতা-রাগিণী, কণ্ঠের ভিতর বীণাপাণি, কত আর লিখিবে লেখনী,—উপন্যাসের এ সমস্ত প্রত্যঙ্গ কৈ? এ কালিয়দমনের যাত্রার রাধাও নাই, কৃষ্ণও নাই; শুধু আখড়াই গাওনায় কতক্ষণ আর আসর থাকিবে বল?

রাগ করিবেন না। হাতে সবই আছে। কিন্তু ধীরে ধীরে, ধীরে। যখন যেখানে যে ভাবে যেটি চাহিবেন, তখনি সেইখানে তাহাই পাইবেন। শিক্ষিতা, স্বাধীনতাপ্রাপ্তা, সাম্যভাবাক্রান্তা, অবিবাহিতা, যৌবন-বিকারগ্রস্তা-বিরহিণী চান কি? দিব। পরিপূর্ণ-ভাণ্ডার। জগৎশেঠের কুঠী। কি রকম নায়ক দরকার? খাসা, শুকো, নিম-খাস, চলন, রাশি—এই পাঁচ প্রকার নায়কই উপস্থিত। উপনায়ক, উপনায়িকা, প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বরী, সখা, সখী আছে। আর ঐ পদ্মফুল, আমের মুকুল, কোকিল, ওসব ত' ধরিই না। আমের মুকুল ত বাগানভরা, পদ্মফুল ঠাকুরদাদার খাস-দিঘিতে দিন-রাতই ফুটে আছে,—কোকিল ত' গাছের পাখি, যাবে কোথা?

আছে সব। এখন এনে দিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করিতে পারিলেই হয়।

প্রথমে শাকান্ন; শেষে পায়সপিষ্টক। তাই প্রথমেই বসন্তবর্ণন এবং নাযিকার বিবাহবর্ণন না করিয়া, জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম রোদের কথা পড়িয়াছিলাম।

গ্রন্থারম্ভ। সেই জ্যৈষ্ঠমাসের রোদে তাতিযা পুড়িয়া. অনর্গল ঘাম ঝরাইতে ঝরাইতে এক প্রবীণ ব্রাহ্মণ কলিকাতাব রাস্তা দিয়া হাঁটিতেছে। বামুনের বয়স অনুমান ৩৭।৩৮ বৎসর; শ্যামবর্ণ; মাথায় টিকি; পায়ে চটিজুতা; নাকে তিলক; স্কন্ধে মুড়ি-সেলাই চাদর, পরিধান থান ধুতি;—গায়ে পিরিহান নাই, মাথায় টেড়ি নাই, চড়নে গাড়ি নাই; ট্যাকে কড়ি নাই, হাতে ছড়ি নাই;—ব্রাহ্মণ তথাচ বেশ সতেজে রাজপথে চলিতেছে। সঙ্গে একটি মুটে,—মাথায় একটি সামান্য মোট করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে।

মুটে। "হাম আউর কেতনা দূর যাযগা,—বহুবাজার বোল্‌কে তোম্ হাম্‌কো লালবাজাবমে লে যাতা হ্যায়।"

ব্রাহ্মণ। "নাগে বাপু। রাগ করোনা,—একটু এগিয়ে বাঁহাতি গলিতে ঢুকলেই বাড়ি।"

মুটে। "সিয়ালদা ষ্টেসনসে হুয়াকা কেবেয়া আট পযসা দস্তুর হ্যায়—হাম পযসা নেহি ছোড়েগা।"

ব্রাহ্মণ। "বাপু! ছ পয়সা চুক্তি ক'বে, দু পয়সা বেশী বল কেন? তা পাবে না।"

মুটে। "তোমারা মোট লেও, পয়সা দেও, হাম্ আউর নেহি যাঙ্গে।"

বক্ষা করুন। ক্ষান্ত হউন। আপনার আব উপন্যাস লিখে কাজ নাই। এ কি এ? কেবল ধাষ্টমো।—একটা বুড়ো ডোক্‌রা বামুন, আব একটা নগদা মুটে। এ নিযেই কাববার! চলে যান আপনি।—সভ্য সমাজের আর অপমান করিবেন না।

মাপ করিবেন। প্রথমে শাকান্ন, শেষে পায়সপিষ্টক,—ইহাই আমি জানি। আগে যে আপনারা দই-ক্ষীর-সন্দেশ খাবেন, তা আমি বুঝি নাই। মজুত সবই আছে; ভালো,—তাহাই হইবে। তবে দুঃখ এই যে, এ পবিচ্ছেদ অঙ্কুরেই এইখানেই শেষ করিতে হইল। আর, ভাবনা এই, কেহ পাছে মনে করেন যে, আমি নভেল লিখিতে অক্ষম। আমি বিলক্ষণ জানি. পরিচ্ছেদ যতই লম্বা হইবে, ততই লেখকের কৃতিত্ব অধিক। পদ্ধতি, প্রকরণ, ধারা, ধরণ সবই অবগত আছি। ইংরেজি, লাটিন, ফ্রেঞ্চ, গ্রীক ক্যোটেসান দিতেও পারি, ভগবদ্গীতা, সাংখ্যদর্শন, ঋগ্বেদ-মন্ত্র উপযুক্ত স্থানে যোজনা করিতে শিখিয়াছি। অভাব কি? সন্ন্যাসী চক্রবর্তী গাইয়ে, দাশরথি রায় ছড়াকাটিয়ে; ব্যালেন্টাইন বারিষ্টার, পিকক বিচারক; সৈন্যাধ্যক্ষ নেপোলিয়ান, সুশিক্ষিত ফরাসী সৈন্য;—সুতরাং দিগ্বিজযেব অভাব কি?

তবে এইবার হাত দেখাই।

এখনও কথা ফুরায় নাই। বুড়োমানুষ কিছু বেশি বকে।

সপ্তমে সুর চড়াইয়া বাঁধিলাম। দীপক রাগে তার ধরিলাম। হয় লেখক না হয় পাঠক, উভয়ের মধ্যে একজন ভস্মীভূত হইবেই হইবে। তবে সুবিধা এই, দীপকে পুড়িয়া মরিলে তান্‌সেনের মতো

মহাক্ষেত্রে সমাধি হইবে, তদুপবি রসজ্ঞ ব্যক্তিগণেব বার্ষিক উৎসব হইবে, এবং সংগীত-আচার্যগণ সেই গোরের মাটি লইয়া মাথায় দিবে। অতএব সুবিধা।

সেই প্রকাণ্ড হরিতাল রঙের হলে কি দেখিলাম? দেখিলাম, এক পীনোন্নত-পয়োধরা, আলুলায়িতকেশা, বিবিধবর্ণের বেশ-ভূষিতা ববর্বর্ণিনী রমণী একাকিনী সেই ল্যাজবিশিষ্ট চেয়াবে অধিষ্ঠিতা। তিনি শায়িতা, কি উপবিষ্টা, কি দণ্ডায়মানা, হঠাৎ কিছুই বুঝিবাব যো নাই। উত্তমাঙ্গ ও পদদ্বয় ঈষৎ উর্ধ্বে উত্থিত এবং নিতম্বপ্রদেশ নিম্নভাগে কথঞ্চিৎ অবনমিত। ফল কথা, শোয়া, বসা এবং দাঁড়ানো,—এ তিনের সংমিশ্রণে যে ভাব দাঁড়ায়, ইহা তাহাই।

কমলিনীর কোমল অঙ্গ কুটিল আঙবাখায় পরিবৃত। স-টান সতেজ অঙ্গরক্ষণী দেহযষ্টিকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া, ছাঁদিয়া রাখিয়াছে। মবি, মরি! বিধাতার কি এই কঠোর লীলা! এমন কুসুম-সুকুমাব, মাখমে-গড়া, গৌরাঙ্গখানি, কাব অভিশাপে, কি দোষে, ঐ কালো-জামারূপ-কারাবাসে এ গরমেব দিনে পচিতেছে? কমলিনী ইন্দমুখেব ঘার্মবিন্দু, রেশমী রুমাল সাহায্যে মুঁছিয়া ফেলিতেছেন;—না-জানি, তাহাতে হাতের কত কষ্টই হইতেছে।

ও হরি! এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই;—পায়ে এস্টাকিন্! মাগী কে গো? এমন গুমট গ্রীষ্মে দিন-দুপুরে যে মেয়ে-মানুষ, এষ্টাকিন্ এঁটে ব'সে থাকতে পাবে, তার কি অসাধ্য কিছু আছে?

বোধ করি, ওব কোনো একটা বিলাতী ব্যাবাম থাকিবে। এখনকার মা-লক্ষ্মীদেব শরীবে একটা না একটা রোগ লেগেই আছে। আহা! বড়ো ঘবেব মেয়ে; লেখাপড়া শিখেছেন; কেতাবের সঙ্গে চোখের এক তিল বিচ্ছেদ নেই; কাজেই ওঁদেব একটুকুতেই অসুখ কবে। মা লক্ষ্মীব দোষ কি? দোষ যত, তা আমাব পোড়া কপালেব।

হু হু শব্দে কপি-কলের সাহায্যে টানাপাখা চলিতেছে। দ্বারে, জানালায় জলময়ী খস্খসেব পরদা! তবু কেন তিনি পায়ে এষ্টাকিন্ এবং গায়ে জামা দিয়া ঘাম ঝরাইতেছেন?

বুঝি অতি লজ্জাশীলা হবেন! তাই কি? তবে ধনুকেব ছিলাব মতো সুতীক্ষ্ণটান-বিশিষ্ট জামাব রঙ্গভঙ্গ কেন? মাথায় কাপড়ও ত নাই। কেশ-কলাপ কেদাবা ডিঙাইয়া কার্পেট চুম্বন করিতে উদ্যত। সর্বাঙ্গে ঘেরাটোপ; মাথাটি খোলা; এই বা কেমন লজ্জা? আব, এ নির্জনে লজ্জাই বা কাকে? বিধাতার বিচিত্রলীলা বুঝিতে পাবিলাম না!

কমলিনী ক্ষীণ-মৃদু-পঞ্চমে বসন্তবাহাব রাগিণীতে ডাকিলেন,—"বেয়াবা, বরফ পাণি লে আও না!" বেয়ারা আসিয়া মা-লক্ষ্মীব সম্মুখস্থ টেবিলে এক গ্লাস ববফজল বাখিয়া গেল।

রমণী কথা কহিলেন না, নড়িলেন না—কেবল মিটিমিটি চাহিয়া বহিলেন।

অবাক্! ডেপুটি বাবুর বাড়িতে ঝি নাই নাকি? পবপুরুষ অমন হন্ হন্ কবে এসে সুমুখে দাঁড়ালো; তবু একটু মাথায় কাপড় দিলে না গা? সেই ত্রিভঙ্গভাবেই খাড়া শুয়ে বইল? মাগীকে ভূতে পায় নাই ত? জানিনা, কোন্ গন্ধর্বকন্যা, কোন্ নাগকন্যা, অথবা কোন্ কিন্নরকন্যা, কলিকালে কলিকাতায় সমুদ্ভূতা হইয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে বেলা ২টা বাজিল। গ্রীষ্মটা যেন পাকিয়া উঠিল। কমলিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বারান্দাব দিকে আসিয়া পা-চালি করিতে লাগিলেন। তাহাতে যেন মন স্থির হইল না। টেবিলের কাছে গিয়া এক চুমুক বরফজল খাইলেন; তাহাও যেন ভালো লাগিল না। টেবিলে শেলিব কবিতাবলী ছিল; তাহা লইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই, মাঝখানটা খুলিয়া, মনে মনে পড়িতে লাগিলেন। অল্পক্ষণমধ্যেই শেলির উপর বিরক্ত হইয়া, কেতাব রাখিয়া দিলেন। তার পর, আপন পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, বেলা আড়াইটা বাজিয়াছে। মুখ বাঁকান এবং নাক শিট্কান দেখিয়া বোধ হয়, তিনি ঘড়ির উপরও বিষম চাটিয়াছেন। তখন একটা কেদারায় বসিলেন। বসিয়া, কাগজ, কলম লইয়া কি লিখিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে কমলিনীর মা, পাশের কুঠারি হইতে আসিয়া তথায় উপনীত হইলেন। জননী প্রবীণা ব্রাহ্মণী; গৌরাঙ্গী; হাতে কঙ্কণ; কপালে সিন্দুর, মাথায় কাপড়। মা বলিলেন, "বাছা! দুপুরবেলা ঘরে এসে শুয়ে একটু ঘুমাও না? ডাক্তার বলে গেছেন, আহারের পর বিশ্রাম দরকার। সারাদিন লেখাপড়া করিল, ব্যাবাম যে বাড়বে।"

কমলিনী। "দিনেব বেলা ঘুম হয় না তো, আমি কি করিব? ঘুমের উপর তো জোর নাই?"

মা। "আমি তোমাব ভালোর জন্যই বলি। দুপুর বেলা সহজ-প্রাণ আইঢাই করে,—তোমার ত অসুখ শরীর। এস, আমারে সঙ্গে এস—খানিক শোও সে।"

কমলিনী। "এখন আর শোব কখন? চারিটার সময় মাষ্টার পড়াতে আসবে যে; শোবার কি আব সময় আছে?"

মা। "এই তো দুটো বেজেছে বৈ ত না। চারটার এখন ঢের দেরি। মাষ্টাববাবু পড়াতে এলে, ঘুম থেকে আমি তোমাকে উঠিয়ে দেব।"

কমলিনী। "না, তিনি বাগ কববেন। আমার পড়া তৈয়াবি না হ'লে তিনি যে রাগ করেন!"

মা। "বাছা, বোগ হলে আমাকেই ভুগতে হয়। শবীরটা আগে, না পড়া আগে? শিরঃপীড়াটা একটু কমে যাক্, তাবপব দিন-রাত পড়।"

কমলিনী। "মা, তুমি আমাব স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কবিও না। এইরূপ দৌরাত্ম্যেই ত আমাব মাথাধরা রোগ জন্মিয়াছে। হৃদয়কমল-উত্থিত নিগূঢ় ভাব-নিচযেব গতি প্রতিবোধ কবিলে, ডাক্তাবি মতে, সেই বদ্ধভাবরূপ বিষে শরীব দূষিত হয়। তখন মস্তিষ্কে বিকাব উপস্থিত হয়। আর্যরমণীব ধমনীতে তখন শোণিতনিচয ইতস্ততঃ প্রবল পবাক্রমে প্রধাবিত হয। শিরঃপীড়ার ইহাই আদি এবং মূল কাবণ। আপনি যদি আমাকে আব দুইবার "শোও শোও" বলিয়া জেদ কবেন, তাহা হইলে আমাব এখনি মাথা ধরিবে।"

মা। "তা বাছা, তুমি যাতে ভালো থাক, তাই তুমি কর।"

এই বলিযা জননী প্রস্থান কবিলেন। কন্যা আবাব ঘড়ি দেখিলেন,—তিনটা বাজিতে এখনও দশমিনিট বিলম্ব। কাঁটা সরাইয়া দিয়া তিনটা বাজাইলে প্রকৃতই তিনটা বেলা হয় কি না,—গুম্ হইযা একমনে তাহাই বোধ হয তিনি ভাবিতে লাগিলেন। সূর্যের বশে ঘড়ি হইল কেন? ঘড়ির বশে সূর্য চলিল না কেন? বিধাতার এমন কুনিযম কেন? ঘড়িব অধীনতা, দাসত্ব, পরমুখপ্রেক্ষিতা, সাম্যনীতির মূলে কি কুঠারাঘাত করিতেছে না? সূর্য কি ব্রাহ্মণ, ঘড়ি কি শূদ্র?—তাই আজও এই কুসংস্কাবাচ্ছন্ন ভাবতে ঘড়ি, সূর্যের পদানত থাকিবে? এ দাস-প্রথা, পাপব্যবস্থা এদেশে আর কত দিন চলিবে? এখানে কি কোনো উইলবারফোর্স আজও জন্মগ্রহণ কবেন নাই? কমলিনী ভাবনা-সাগবে ডুব দিলেন।

ডুব দিযা, পাতাল পানে তলাইয়া যাইতেছেন, একম সময় তাঁহাব কবপদ্মে এক প্রকাণ্ড চৌকো লেফাফা আসিয়া পৌঁছিল। খামেব এক পার্শ্বে ইংবেজিতে কেবল এইটুকু লিখিত আছে;—

KAMALINI
55 Lane, Calcutta

ভিতরে বাংলা।—

"সুহৃদ্‌বরাসু।—

পরমপিতা পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, হৃদয় পবিত্র করুন, দেহ সুস্থ রাখুন। চারিটার সময় তোমার শিক্ষা দিবার জন্য যাইতে সক্ষম হইলাম না। চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই,—অভাবনীয় বিবিধ যত্ন সত্ত্বেও, নির্দিষ্ট সময়ে তথায় উপনীত হইতে পারিলাম না। সন্ধ্যার একটু পরেই পৌঁছিব।

তোমার পাঠে ব্যাঘাত দিলাম বলিয়া আমি দুঃখিত, কাতর এবং মর্মাহত। আমার দোষ লইও না। এই পত্রের উত্তর দিয়া আমার মনপ্রাণ শান্ত করিলে বড়োই অনুগ্রহ করা হয়।

তোমারই নগেন।—"

রমণী এই পত্র পাইয়া অবশ্যই নিতান্ত ব্যথিতা হইলেন। অবশ্যই প্রথমত উষ্ণদীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, কিন্তু দুঃখ এই, সে শ্বাসবায়ুব শব্দ কেহ শুনিল না।

কমলিনী ভাবিতে লাগিলেন, পত্রের উত্তর দি, কি না দি। খুব ক্রোধের বশীভূত হইয়া বলিলেন আমি আর পত্র লিখিব না। কিন্তু তাঁহার সে রাগের সান্ত্বনা করিবার কেহই নাই দেখিয়া, তিনি আবার মনে মনে বলিলেন, আচ্ছা, এবার এই শেষপত্র লিখিলাম, আর কখনো লিখিব না।

"সুহৃদ্‌বর।

আমি আপনাকে গুরুর মতো দেখি। এ নারী-জন্মের আপনিই আমার শিক্ষক। গুরুদেব! অধীনীর প্রতি আপনার কৃপা কম হইল কেন? নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া আপনি আমায় অমৃতময় বাক্যে উপদেশ দিবেন, সেই আশায় আমি বসিয়া আছি। আশায় নিরাশ হইলে বুক ভাঙিয়া যায়। আপনার বিশেষ কাজ থাকিলে আসিয়া কাজ নাই। কারণ, আপনার কোনোরূপ ক্ষতি হইলে আমার কষ্ট হয়। আমি আপনার রূপ কল্পনা করিয়া, আপনার মূর্তি গড়িয়া, হৃদয়-রাজ্যে বসাইব। সেই মূর্তিকেই গুরুদেব বলিয়া প্রণাম করিয়া, আমি শেলি পাঠ আরম্ভ করিব।

চিরদুঃখিনী কমলিনী।"

এই পত্র ভৃত্য লইয়া গেল। কমলিনী আবার সেই ল্যাজবিশিষ্ট চেয়ারে গিয়া শুইলেন। বাঁ হাতে কেতাব, ডান হাতে পেন্‌সিল, চক্ষু মুদ্রিত।

এমন সময় আর একখানি পত্র আসিয়া পৌঁছিল। পত্র দিয়া দ্বারবান জিজ্ঞাসিল, "ডাক্তাব বাবুকা আদ্‌মী খাড়া হ্যায়, আপ বোলী ত জবাবকে ওয়াস্তে খাড়া বহে।" কমলিনী পত্র খুলিতে খুলিতে উত্তর দিলেন, "আবি রহেনে বোলো।"

দ্বারবান সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। সেই পত্রের অভ্যন্তর প্রদেশে এইরূপ লেখা ছিল।—

"প্রিয় ভগিনি!

অদ্য তোমার মাথাধরা ব্যারামটা কেমন আছে, জানিবাব জন্য বড়ো উৎসুক হইয়াছি। অদ্য তোমাদের বাড়ি আমার যাওয়া দরকাব হইবে কি? যাইব কি? অতি অল্প পবিমাণ মাথা ধরিলে, তৎক্ষণাৎ লিখিয়া পাঠাইও; আমি সকল কাজ ছাড়িয়া যাইব। তোমার দাদা কবে আসিবেন?

তোমারই মহেন্দ্র।"

কমলিনী ঝটিতি এই পত্রের উত্তর লিখিয়া দিলেন;—

"প্রিয় ভ্রাতঃ!

আপনার অনুগ্রহপত্র পাইয়া পরম প্রীত হইলাম। আমার উপর আপনার যেরূপ কৃপাদৃষ্টি, যেরূপ যত্ন, যেরূপ স্নেহ, তাহাতে আমার মাথাধরা ব্যারাম অচিবে আবোগ্য হইবার সম্ভাবনা। আপনিই এ জগতে আমার একমাত্র পরমবন্ধু; প্রকৃত শান্তি, সুখ, স্বচ্ছন্দ আপনিই আমাকে প্রদান করিলেন। কিন্তু এরূপ অনুগ্রহদৃষ্টি চিরদিন থাকিবে কি? ভগবন্! আমায় অভয় দিন।

ভগবানের ইচ্ছায় এখন একটু ভালো আছি। যদি বিশেষ মাথা ধরে তবে ৭টাব পর ডাকিতে পাঠাইব।

তোমার দুঃখিনী।"

বার বার তিন বার। তখন আর একখানি পত্র আসিয়া পৌঁছিল। পত্রাকৃতি বড়ই জমকালো— চারিদিকে সোনার হল্‌করা—এবং শিরোদেশে উড়নশীলা, বিবসনা পরীর ছবি। পত্রের অভ্যন্তব এবং বাহ্যপ্রদেশ হইতে, আতর-গোলাপেব সুগন্ধ বাহির হইতেছে। পত্রখানি পদ্যে;

"কেন ভালোবাসি, কি দিব উত্তর?
নীল নয়নের তারা, ফেটে পড়ে বারিধারা,
ভাসে মুখ, ভাসে বুক, ভাসয়ে কোমর।
কেন হায়! ভালোবাসি কি দিব উত্তর।

হাসে চাঁদ গগনেব কোলে,
হাসে ফুল এ মহীমণ্ডলে,
ক্ষবে মধু কমলেব ফুলে,
বহে বায়ু বাসন্তী-হিল্লোলে,
গায় পিক সুধামাখা বোলে,
নাচে শিখী ঘন-ঘটা বোলে,—
দাবানলে দহে শুধু অভাগা অন্তব
কেন ভালোবাসি হায কি দিব উত্তব!

ক্ষুদ্রমতি ক্ষুদ্রপ্রাণ বামন বন্ধুর গতি,
দেহ মোব অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।
দূবে অই গুরুগিরি, ধাপে ধাপে ধীরি ধীরি,
কেমনে উঠিয়া পাব ত্রাণ।।
কাঁদি তাই দিবানিশি ভাবিয়া ঈশ্বব।
কেন ভালোবাসি তোমা, কি দিব উত্তব।

পঙ্কজ প্রফুল্ল কেন অরুণ উদয়ে,
কুমুদিনী ফুটে কেন চাঁদ-মধু-পিয়ে,
বসন্তে কোকিল কেন কুহু কুহু করে,
মলয় অনিল কেন ঝুরঝুর ঝরে,
কমলিনী পানে কেন ধাইছে ভ্রমর,
কেন ভালোবাসি প্রিয়ে! কি দিব উত্তর!

কি দিব উত্তর?—চাই আকাশের পানে,
কি দিব উত্তর?—চাই পাতালের পানে;
কি দিব উত্তর?—হেরি সুনীল সাগর;
কি দিব উত্তর?—হেরি হিমগিরিবর;
চারিদিক অন্ধকাব—ঘোব, ঘোরতর,
কেন ভালোবাসি প্রিয়ে। কি দিব উত্তর।

ব্রহ্মাণ্ড কাগজ যদি, মৈনাক লেখনী,
কালী তোয়নিধি কিম্বা নয়নের পাণি,

সময় অনন্ত যদি, শ্রম নিশিদিশি,
তবে ত উত্তব দিব, কেন ভালোবাসি। '
কিম্বা যদি হ'তো দেখা,—বিরল বাসরে,
সুধাংশুবদনি! শুধু অর্ধদণ্ড তরে!
নখে করি, বুক চিবি, খুলিয়া অন্তর,
কেন ভালোবাসি, তার দিতাম উত্তর।

দেখাতাম হাড়ে হাড়ে তব নাম লেখা,
দেখাতাম ত্বকে ত্বকে তব ছবি আঁকা;
দেখাতাম প্রেমতরী শোণিত-সাগবে,—
জীবাত্মা নাবিক তাব আছে হাল ধবে;
দেখাতাম হৃদিমূল—শবতেব শশী,
তবে তো উত্তর হ'তো—কেন ভালোবাসি।

এই শেষ-লিপি, তবে,—বিদায! বিদায!
সাজিব সন্ন্যাসী, মাখি, ভস্মবাশি গায়।
গেরুয়া বসন পবি, কবে, কমণ্ডলু ধরি,
ভ্রমিব ভারতমাঝে নগবে কাননে,—
নদীবক্ষে গিরিশৃঙ্গে, সাগরতবঙ্গভঙ্গে,
গাইব তোমার গান আনন্দ-আননে।
যাগ যজ্ঞ হোম জপ তপ মন্ত্র তন্ত্র,—
সেই নাম, সেই নাম, সেই নাম মন্ত্র,—
সে নাম সঙ্গের সাথী—সে নাম ঈশ্বব,
কেন ভালোবাসি প্রিয়ে! কি দিব উত্তব।

শ্রীনবঘনশ্যাম।

এই পদ্যটি কেবল আপনাব পাঠের জন্যই লিখিলাম।, আপনি যদি ছাপাইতে অনুমতি দেন, তবে ছাপাইব। আর যদি লোকসমাজে প্রচার করা, ইহা আপনাব অভিপ্রেত না হয, তাহা হইলে ছিঁড়িয়া কুচি কুচি করিয়া ফেলিবেন। আজ দুই বৎসর পূর্বে সেই অপূর্ব গোলাপ ফুলটি আমাব হাত হইতে ঈযৎ হাসিয়া, কাড়িয়া লইয়া আপনি কোমল নখ দ্বাবা যেরূপ ধীরে ধীরে ছিঁড়িযাছিলেন, এই পত্র সেই ভাবেই ছিঁড়িবেন। পনেরো দিন কলিকাতায় রহিলাম, তথাচ একদিনও দেখা হইল না—সে সকল আমারই দুরদৃষ্ট! এখন দূর দেশে চলিলাম, কবে ফিরিব জানি না।

শ্রীনবঘনশ্যাম।"

কমলিনী, পত্র পাঠান্তে, প্রায় দশমিনিট কাল, আপন মনে গভীর চিন্তা করিলেন। শেযে উত্তর দিলেন,—

'ইহার উত্তর আজ নহে। আপনার কর্ম্মস্থানে, ডাকযোগে উত্তর পাঠাইব। এখন এইমাত্র বলিতে পারি, আমি নিরপরাধিনী অবলা।

সংসারসুখ-বিরহিতা কমলিনী।"

তৃতীয় পত্রের উত্তর দিয়া, কমলিনী নীরবে সোফায় গিয়া শুইয়া রহিলেন। ভৃত্যকে বলিলেন

"জোরেসে পাঙ্খা চালাও।" তৎপরে তিনি নয়ন দুখানি বুজিলেন।

কি কর্মভোগ! দেখিতে দেখিতে, আর একখানি পত্র আসিল। পত্রখানি, বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাসের লিখিত। যথা ঃ—

"মহিলা-কুল-গৌরবে!

রমণীতে বিজ্ঞান বুঝিবে, ইহা আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া, আমার সে ভ্রমান্ধকার দূর হইল। আজ একমাস মধ্যে শরীর-বিজ্ঞানে তুমি যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা অত্যদ্ভুত। আর রসায়নেও তোমার দৃষ্টি প্রখরা। আজ আমার শিক্ষা দেওয়া সার্থক হইল। কিন্তু একটা বড়ো অসুবিধা ঘটিয়াছে। সপ্তাহে কেবল একদিন বিজ্ঞান পড়িবার দিন নির্দিষ্ট আছে; তাহাতে পড়া অতি অল্পই হয়। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্য-পাঠ সপ্তাহে ছয় দিন হইয়া থাকে। একদিন সাহিত্য-পাঠ কমাইয়া, সপ্তাহে বিজ্ঞান পাঠ দুইদিন ধার্য করিলে ভালো হইত না কি? বিশেষ, সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞান কিছু গভীরতর বিষয়। চন্দ্রমুখি! এ বিষয়ে তুমি যাহা অনুমতি করিবে, তাহাই হইবে।

অনুগত শ্রীনিত্যানন্দ দাস।"

নিত্যানন্দ বাবু বহুকাল বিজ্ঞানচর্চায়, দুচারগাছি চুল পাকাইয়া, ক্রমশঃ প্রবীণত্বে পা দিয়াছেন। কমলিনী এ পত্রের এই উত্তর দিলেন,—

"অদ্য আমার শরীর অসুস্থ। সুতরাং গভীর বিষয় আলোচনা করিবার অদ্য উপযুক্ত সময় নহে। কিন্তু আপনার কথা দিবানিশি আমার মনে জাগিয়া থাকিবে। শয়নে, স্বপনে, শ্রবণে, ভবনে—কেবল ঐ কথাই ভাবি। কারণ আপনার দ্বারা আমি যেরূপ উপকৃত হইতেছি, অন্যের দ্বারা সেরূপ নহে;— আপনি ভিন্ন বিজ্ঞানের কঠোর অর্থ আর কে বুঝাইতে পারে?

বিজ্ঞান-ভিখারিণী কমলিনী।"

এমন সময়, উকিলবাবুর "ভেট" কমলিনীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। রজতথালে সন্দেশ এবং গোলাপফুলের তোড়া। পত্রখানি গালামোহর করা। উপরে লেখা আছে 'অন্যের পাঠ নিষেধ'। কমলিনী সেই পত্রখানি মনে মনে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পত্রবাহক একটাকা বক্‌শীশ পাইয়া বিদায় হইল।

উপরি উপরি চারিখানি পত্র লিখিয়া কমলিনী নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কোমল করপল্লব আড়ষ্ট হইল। আঃ, উঃ, গেলাম, বাঁচিনা, ইত্যাদি মিহি মিহি শব্দ তাঁহার মুখ-বিবর হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। তথাপি চাবিটা বাজিল না। এমত স্থলে ঘড়ির কল খারাপ হইয়াছে, এরূপ অনুমান করাই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং কমলিনী, দ্বারবান্‌কে গির্জার ঘড়ি দেখিতে পাঠাইলেন।

পাঠাইয়া, নিজ পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঘরটি ক্ষুদ্র। মধ্যভাগে একটি ছোটো টেবিল; তার দুধারে দুখানি কেদারা; পাশে একখানি বেঞ্চ। ঈষৎ দূরে খাট, গদী আঁটা, ধপধপে চাদর বিছানো; তদুপরি সরু, মোটা, পাতলা,—নানারকমকের ৫। ৬টি বালিস। বইভরা দুইটি ছোটো আলমারি। কাগজ, কলম, দোয়াত। ছবি, দেয়ালগিরি, ক্লকঘড়ি। কুঁজোয় কলের জল, বোতলে লাল ঔষধ, আলনায় বিলাতি তোয়ালে। ডিবেয় পান, খাতায় গান, বাক্সে হারমোনিয়াম।

কমলিনী সেই নির্জন কক্ষে বসিয়া আপন মনে মহাকবিতা রচনা করিবার উপক্রম করিলেন। প্রথম সেক্ষপীয়র খুলিয়া, তাহা হইতে সুচিকণ কাগজে ইংরেজি কবিতা উদ্ধৃত করিলেন।—

To be, or not to be, that is the question
Whether 'tis nobler in the mind, to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them?—To die,—to sleep.—

No more, and, by a sleep to say we end
The heart-ache, and the thousand natural shocks
The flesh is heir to,-'tis a consummation
Devoutly to be wish'd. To die,—to sleep ;—
To sleep! perchance to dream ; ay, there's the rub ;

এই পর্যন্ত লিখিয়া ইহার বঙ্গানুবাদ আরম্ভ হইল,—
হয়, কি না হয়,—মরি কিম্বা বাঁচি,—প্রশ্ন
ইহাই এখন। হতভাগ্য কপালের
বিষমাখা-বাণ গায়ে ফোটে সদা,—
দুঃখের সমুদ্রঘোর, তরঙ্গ-সঙ্কুল!
উচ্চহৃদে রোধিব কি গতি তার? কিম্বা
অনন্ত-আলয়ে দিব—যত যত ক্লেশ!
মৃত্যু—নিদ্রা—আর কিছু নয়, ঘুমাইলে,—
হ্রাস হয়, হৃদয়বেদনা—মাংসপিণ্ড
শরীরের শতেক যাতনা;—এই ফলে
পূর্ণ হয় মনের কামনা। মৃত্যু—নিদ্রা!—
নিদ্রা বুঝি অসার স্বপন। এইখানে,
হায়! হায়! কাঁচাবাঁশে ধরিলবে ঘুণ!

লেখা শেষ হইলে, কমলিনী কবিতাটির প্রথম-আধখানা খুলিয়া, দ্বিতীয় আধখানা ঢাকিয়া টেবিলের উপর, অতি যত্নে রাখিয়া দিলেন। অথচ সাহিত্য-শিক্ষক আসিয়া উপনীত হইলেন না। কমলিনী তখন জানালার নিকট গিয়া উর্ধ্বমুখী হইয়া নীল আকাশপানে তাকাইলেন ; আকাশ ভালো লাগিল না। দক্ষিণ দিকের গবাক্ষ দিয়া রাজপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ;—জনতা বিষবৎ বোধ হইল। অবশেষে, সেই নিজস্ব নির্জন ঘরে "সহজ-কেদারায়" শুইয়া, শেলির গ্রন্থ বুকে রাখিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

[illegible]

লজ্জাবতী

স্বর্ণকুমারী দেবী

১

শুনিতে পাই তাহার আসল নাম লজ্জাবতী নহে। সে ছোট বেলায় নাকি বড় অভিমানী ছিল, কোন দোষ করিলে পিতা মাতা যদি তাহাকে তিরস্কার করিতেন অমনি সে লজ্জাবতী-লতাটির মত সঙ্কুচিত জড় সড় হইয়া পড়িত। তাহার ছোট্ট, গৌরবর্ণ মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিত, তাহার ডাগর ডাগর হাসি হাসি চোখ দুটি জলে ভরিয়া যাইত, হৃদয়ের ভাব লুকাইবার ইচ্ছায় হাসিতে চেষ্টা করিয়া অশ্রুজলে ও ম্লান হাসিতে সে এক অপূর্ব্ব-শ্রী ধারণ করিত তাই তাহার বাপ মা তাহাকে আদর করিয়া ডাকিতেন—লজ্জাবতী।

লজ্জাবতীর পিতা মাতা এই মধুর কোমল অভিমানের মধ্যে তাহার হৃদয় মাধুর্য্য প্রকাশিত দেখিতেন, তাই তাঁহারা সাদরে ইহার সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন। কিন্তু শ্বশুর গৃহে লজ্জাবতীর এই অকৃত্রিম বিনয়-নম্রতা প্রসূত শিশুসুলভ সরল লজ্জামাধুরী কখনও আদৃত হয় নাই। কি করিয়া হইবে? সংসারে নীরবতার গীতি-মাহাত্ম্য সকলের প্রাণে পৌঁছে কি?

সে ত' প্রশংসার কাজ করিয়া ঢ্যাড়্‌বা পিটাইতে জানে না, দোষের কাজ করিলেও পাঁচ রকম কথাব ছলে ঢাকিয়া লইতে পারে না, বিনা দোষে তাহাকে দোষী করিলেও তাহাতে কোন কথা না কহিয়া অশ্রু বর্ষণ করে। কিন্তু কঠোর সংসারে কোমল অশ্রুব সাক্ষ্য কযজন সত্য বলিয়া গ্রহণ করে? ইহাতে বরং তাহার সপ্রমাণিত হয়; সুতরাং যে স্বভাবের গুণে লজ্জাবতী পিতামাতাব আদবের ছিল, সেই স্বভাবেব গুণেই শ্বশুর-গৃহে প্রতিপদে তাড়না সহ্য করে।

শীতেব প্রভাত, কিন্তু আজ কুয়াসা নাই, নির্ম্মল আকাশে সূর্য্যের অগ্নিগোলক জ্বলন্ত মহিমায় বিরাজিত হইয়া দিক্ বিদিক্ বিভাসিত করিযা তুলিযাছে। নিদ্রাভঙ্গে লজ্জাবতী দেখিল, তাহার ঘরের দেওয়াল সূর্য্যকিবণ ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে; ভাবিল কতই না জানি বেলা হইয়া গিয়াছে! তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া, একবার মাত্র আকাশের দিকে চাইয়া সসম্ভ্রমে সূর্য্য প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া আসিল; তাহাব পব তাড়াতাড়ি স্নান সমাপন করিযা দ্রুতপদে রন্ধন-গৃহে আসিযা দেখিল, তাহাব 'যা' তখনও রান্নাঘবে আসেন নাই; দাসী উনুন ধরাইয়া বাঁটনা বাটিতেছে; সে তখন নিশ্বাস ফেলিয়া সুস্থির ভাবে কুটনার আয়োজন কবিয়া লইয়া কুটনা কুটিতে বসিল। সেদিন তাহার রাঁধিবাব পালা নহে, বড় বৌ রাঁধিবেন সে যোগাড় দিবে মাত্র। তাহার কুটনা কুটা প্রায শেষ হইযাছে, এই সময় শাশুড়ী আসিযা সহাস্য মুখে কোমল স্বরে বলিলেন—"বৌমা, শুনেছ—?"

দ্বাদশ বৎসব লজ্জাবতী শ্বশুব গৃহে আসিয়াছে—এমন সাদরে শাশুড়ী তাহার সহিত কথা কহিযাছেন বলিযা তাহাব মনে নাই, সে তাঁহার দিকে চাইতে গিযা থতমত খাইযা আঙ্গুল কাটিযা ফেলিল। —শাশুড়ী বলিলেন, "শুনেছ ফুলকুমাবী আসছে—?" লজ্জাবতী তাড়াতাড়ি কাটা হাত কাপড়ে লুকাইযা আশ্চর্য্যব্যঞ্জকস্বরে বলিল— "ঠাকুরঝি!"

আশ্চর্য্য হইবাব কথা, লজ্জাবতী শ্বশুর গৃহে আসিযা অবধি কখনও এ পর্য্যন্ত তাহাকে দেখে নাই, চতুর্দ্দশ বৎসব হইল ফুলকুমাবীব বিবাহ হইযাছে—বিবাহের পব একবাবও সে বাপের বাড়ী আসে নাই, শ্বশুব ধনী লোক, পুত্রবধূকে এই গৃহস্থ ঘরে পাঠাইতে অপমান জ্ঞান করিতেন, শ্বশুবের মৃত্যুর পব তাই এতদিনে ফুলকুমাবী পিত্রালযে আসিতেছে। শাশুড়ী আবাব বলিলেন, "আজ কাব রাঁধার পালা? বড় বৌযেব বুঝি? তা দেখো বৌমা, বড় মানুষেব বৌ— এতদিন পরে আসছে, যত্নেব যেন কিছু কমি না হয।"

শাশুড়ী চলিযা গেলেন, কাটা আঙ্গুল জলে চুবাইযা ধরিযা লজ্জাবতী ভাবিতে লাগিল "আজ যে এই সুপ্রভাত আনিযাছে সে না জানি কিরূপ কল্যাণরূপী ঊযাময়ী প্রতিমা! তাহাব আগমনে এই কঠোর অন্ধকাব প্রান্তর এতদিনে বুঝি প্রেমালোকে আলোকিত হইযা উঠিবে!"

এক অপূর্ব্ব আনন্দে তাহাব হৃদয পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

২

একে কন্যা, তাহে ধনীব ঘবনী, গৃহে আসিয়াছে আবার অনেক দিনেব পব;—চৌধুবী বাড়ীর অন্তঃপুবে আজ পর্ব্বোৎসবের ধুম, কাহারো মুহূর্ত্ত দাঁড়াইবাব অবকাশ নাই। বধূগণ রাঁধিতে ব্যস্ত, দাসীগণ যোগাড় দিতে ব্যস্ত, গৃহিণী আনাগোনা ও ফরমাস করিতে ব্যস্ত, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা "পিসিমা আসিতেছেন" বলিয়া আনন্দ-কোলাহল করিয়া ছুটাছুটি করিতে ব্যস্ত। এই ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে চাকর আসিয়া খবর দিল "দিদিমণি আসছেন গো।"

চাকর দাসী ছেলে মেয়ে গৃহিণী সকলে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—লজ্জাবতীও তাড়াতাড়ি হাতা বেড়ী ফেলিয়া মাতৃদেবীর তিরস্কার না মানিয়া দ্বার দেশে আসিয়া উঁকি মারিল। রন্ধন-গৃহের সম্মুখেই অন্তঃপুরের উঠান। একখানি বস্ত্রাবৃত পালকী,—অগ্রপশ্চাতে দুইজন সুসজ্জিত দ্বারবান্ এবং উভয় পার্শ্বে পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণহার-বিভূষিতা দুই দাসী, উঠানে আসিয়া দেখা দিল। এই রাজসজ্জা দেখিয়া লজ্জবতীর স্ফীত হৃদয সহসা দমিযা গেল,—ধনীব নিকট দরিদ্র অনুগ্রহের পাত্র, তাহাদের মধ্যে কি সখ্যতা সম্পর্ক—হৃদয়ের সম্বন্ধ জন্মিতে পাবে?

কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই আড়ম্বরের মধ্যে যখন সামান্য সাজে, সামান্য বেশে এক হাস্যময়ী প্রফুল্লময়ী আসামান্য রমণী আবির্ভূত হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন নিমেষে তাহার বিরস ভাব দূর হইল, হৃদয় এক উত্তাল আনন্দ তবঙ্গে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। মা ফুলকুমারীর হাত ধরিয়া উপবে লইয়া গেলেন, লজ্জাবতী তাহার আনন্দ উচ্ছ্বাস লইয়া আবার রান্নাঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়াই খানিকটা হলদ লইয়া বড় বৌয়ের পৃষ্ঠ-বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া দিল, বড় বৌ রাগিয়া বলিলেন, "ও আবার কি সোহাগীপণা!" সে হাসিয়া অস্থির হইল। বড় বৌয়েব রাগ তাহাতে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত কবিযা তীব্রস্বরে বলিলেন, "কাজের সময ওসব ন্যাকরামি ভাল লাগে না, কি হাসিই পেয়েছে।" ছোট বৌ বুঝিল, কাজটা ভাল করিতেছে না। তবুও হাস্য সম্ববণ করিতে পারিল না। বড় বৌ আবাব বলিলেন, "ভ্যালা আদুরেপণা শিখেছিলি। আদুরেগিবি ফলাতে হয বাপেব বাড়ী গিয়ে ফলাস্; আমাদেব ও-সব ভাল লাগে না"— এই কথায় তাঁহার অন্তর বিদ্ধ হইল, নযন সজল হইয়া উঠিল, তবুও সে হাসিতে লাগিল। অনেক দিনের পর তাহাব স্বাভাবিক শিশু-সুলভ চপলতা ফিরিয়া আসিযাছে।

* * *

আর লুকাইয়া এক তরফা দেখা নহে— এবার চোখে চোখে মিলন। বধূবা অন্ন ব্যঞ্জন, ক্ষীব নবনী, দধি দুগ্ধ, ফল মিষ্টান্ন সজ্জিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মা কন্যাকে ভোজন স্থানে লইয়া আসিলেন। আহারের সরঞ্জাম দেখিয়া ফুলকুমাবী বড় বৌকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এ কি করেছিস্ লো, এত কেন! আমি কি গুরুঠাকরুণ হয়ে এসেছি নাকি?"

বড় বৌ অর্দ্ধ ঘোমটাব মধ্য হইতে আস্তে আস্তে বলিল, "তা নইলে এতদিন পরে বাপেব বাড়ী আসিস্? এখন বোস্, রান্নার যেন নিন্দে না হয়, পাতে পড়ে থাকলেই বুঝব রুচলো না।"

"মরে যাই আমি কি বাক্ষস নাকি? ও কে, বড় বৌ?"

মা তাহার উত্তর-স্বরূপ বলিলেন, "তা জানিস্ নে ফুলি! ও ছোট বৌ। কি করেই বা জানবি, শ্বশুর পোড়ারমুখো হেমেই বিয়েতেও ত একবার পাঠালে না, এত করে বল্লুম—তা একবেলাও না, এমন জানলে কি অমন ঘবে মেয়ে দিই!"

ফুলকুমারী ইত্যবসরে ছোট বৌয়ের নিকটে আসিয়া বলিল,"এই আমাদেব ছোট বৌ! দেখি লো দেখি , মুখ খোল," বলিতে বলিতে সে তাহার ঘোমটা উঠাইল, ছোট বৌ একটু হাসিয়া আবার ঘোমটা টানিয়া দিল। ফুল বলিল, "ওমা বেশ বৌ হয়েছে, দাদা দেখছি ছবির মত বৌ করেছে!" ছোট বৌয়ের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে ফুল এই কথা বলিল, ছোট বৌ হাসিয়া মুখ হেঁট কবিয়া ঘিয়ের বাটী ভাতের থালার কাছে আর একটু সরাইয়া রাখিল।

৩

কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া বিকালে লজ্জাবতী উপরে উঠিতেছে, ফুলকুমারীকে আর একবার দেখিবার জন্য সে তৃষিত, ফুলের সেই প্রফুল্ল ভাব, সহাস্য দৃষ্টি, সাদর মধুব কথা সমস্তক্ষণ তাহাব মনে তরঙ্গ তুলিয়াছে,—লজ্জাবতী নববধুর ন্যায় সলজ্জ আগ্রহে অধরের মৃদু হাসি চাপিয়া অধীর চরণ ধীরে

ধীরে বিক্ষেপ করিয়া দোতলায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন সময় পুটুরাণী আসিয়া বলিল, "মা আমার ফুল কাঁটা দিতে দে, পিসীমা চুল বেঁধে দেবে।" লজ্জাবতী সহসা স্বপ্নরাজ্য হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "সে কি, তোর ফুল কাঁটা ত আমি রাখি নি।" মেয়ে বলিল, "রাখিসনি কি! সেই যখন তুই কুটনো কুটছিলি আমি তোর কাছে রেখে এলুম!"

"কই আমি ত তা জানিনে; আমাকে ত ব'লে আসিস নি?" মেয়ে বলিয়া আসে নাই সেটা ঠিক! কিন্তু মা যে তুলিয়া রাখেন নাই সেটা ত আর তাহার দোষ নহে। সে মুখ ঝামটা দিয়া বলিল, "কাছে রেখে এলুম—তা তার বলে আসব কি! শীঘ্র আমার দড়ি কাঁটা দে।" লজ্জাবতী নিজের দোষটাই মনে মনে মানিয়া লইয়া, তাহাকে আর কিছু না বলিয়া গহনা খুঁজিতে আবার নীচে নামিলেন, —আর ফুলকুমারীকে দেখিতে যাওয়া হইল না।

এদিকে দাসী আসিয়া গৃহিণীকে বলিল, "দিদিমণির বিছানা ত করে এনু—তা গায়ের লেপ কি দেব—একটা দাও।" ফুলকুমারী তখন বড় বৌয়ের ঘরে তাহার সহিত গল্প করিতেছিল গৃহিণী একাকী ছিলেন; দাসীর কথায় তিনি তাহার তলপী তলপা খুঁজিয়া একটি ভাল লেপ পাইলেন না,—সবই ছেঁড়া ছেঁড়া, পাতা চলে, কিন্তু বড় মানুষের বৌকে গায়ে দিতে দেওয়া যায় না। গৃহিণী ভাবিত হইয়া পড়িলেন,—তবে বিপদে পড়িলে যাঁহার বুদ্ধি না যোগায় তিনি স্ত্রীলোকই নহেন; মুহূর্ত্তের মধ্যেই আবিষ্কৃত হইল, দাসীকে বলিলেন, "দ্যাখ, আজ ত হেম পশ্চিমে যাবে, ছোট বৌয়ের গায়ের লেপটা ফুলির বিছনায় দিগে, আর এর একটা আমি বেছে রাখি—এসে তখন ছোট বৌয়ের জন্যে নিয়ে যাস্।"

দাসী চলিয়া গেল, খানিক পরে আসিয়া পরে বলিল, —"এমন আগোছাল বৌও দেখিনি। পুটুরাণী গহনা রাখতে দিয়েছিল— তা হারিয়ে খুঁজতে লেগেছে, তাই তাকে আর বলতে পেনু না; আপনিই লেপটা নিয়ে দিদিমণির বিছানা করে এনু।"

"গহনা হারিয়েছে! কি গহনা?"

"মাথার ফুল গো ফুল। দেখ' মা আমাদের শেষে দয়ে মজিও না। তোমরা সব হারাবে—আর আমরা গরীব মানুষ যেন মারা না যাই"—

গৃহিণী এই খবরে রাগিয়া আগুন হইলেন, আজ আনন্দের দিন, মেয়ে ঘরে আসিয়াছে—আর কিনা পোড়ারমুখী বৌ গহনা হারাইয়া অলক্ষণ করিয়া বসিল! তিনি প্রথমে বড় বৌয়ের ঘরে আসিয়া খবর দিলেন—"শুনেছিস্? ছোট বৌ গহনা হারিয়েছে! এই সেদিন চেলির কাপড় খানা হারালে আবার আজ এই কীর্ত্তি! এমন উড়নচণ্ডী বৌ"—

ফুল বলিল, "মা, তা বৌ ত আর ইচ্ছে করে হারায় নি।"

ফুলকে তাহার পক্ষ লইতে দেখিয়া মায়ের রাগ আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "তুমি ত বাছা বৌয়ের গুণ জান না তাই ওকথা বলছ, দিন কতক থাক তখন বুঝবে! দেখতে মুখখানি অমন—পেটে পেটে দুষ্টুমি, ইচ্ছে করেই হারিয়েছে! আর গহনা ত ওর যাবে না, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন! তুই আজ বাড়ী এসেছিস তাই ইচ্ছে করেই অলক্ষণ করছে।"

বড় বৌ কোন কথা কহিল না; ফুলকুমারী বলিল,—"আচ্ছা দেখে আসি ব্যাপারটা কি হয়েছে?" তিন জনে মিলিয়া তখন ছোট বৌয়ের সন্ধানে চলিলেন। বেশী দূর যাইতে হইল না, ছোট বৌ নীচের সব ঘর খুঁজিয়া উপরে উঠিতেছিল, বারান্দায় দাঁড়াইতেই শ্বাশুড়ীর তীব্রস্বর তাহার কাণে পৌঁছিল—"কি গহনা আবার হারিয়েছিস্! (যেন চিরকাল ধরিয়া সে গহনাই হারাইয়া আসিতেছে।) বাড়ীতে আর লক্ষ্মী রইলো না! পরের বাড়ী মেয়ে পাঠানই বা যাবে কি করে? শ্বশুররা যখন বলবে আমাদের গহনা কি হোল তখন লজ্জায় না মুখ কালী হয়ে যাবে!"

লজ্জাবতী মৃদুস্বরে বলিল, "ওর শ্বশুর-বাড়ীর গহনা নয়; আমার বাবা আমাকে যে ফুল দিয়েছিলেন তাই পরিয়ে দিয়েছিলুম।"

"বটে। তোমার বাবা তোমায় যা দিয়েছেন তাই হারিয়েছে? তা আমরা কথা কয়েছি ঘাট হয়েছে। দোষ করলেই কথা কইতে হয়— তা কথা কইলেই অমনি বাপের বাড়ীর তুলনা। দেখলি বাছা ফুলি, দেখ— একবার তোর মায়ের অপমানটা দেখ"—

বড় বৌ বলিল, "হ'লেই বা বাপের বাড়ীর গহনা, জিনিসটা ত হারাল!"

শ্বাশুড়ী বলিলেন, "হারাক্—হারাক্ সব যাক, আমাদের কথা কয়ে কাজ কি? বলব কি, হবিমোহন ঘোষের মেয়ে আমি—তাই, —অমন বৌ নিয়ে ঘর করছি। নইলে আর কেউ হ'লে বাপ বাপ ডাক ছাড়ত! আয় বাছা, তোরা কেউ কথা ক'স্‌নে।"

শ্বাশুড়ী চলিয়া গেলেন, ঘরে গিয়া সেই কথা লইয়াই গুলজার করিতে লাগিলেন। ছোট বাবু সেদিন কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন; সন্ধ্যাব পর বাড়ী ফিরিয়া মায়ের নিকট বিদায় লইতে গিয়া সেই সকল কথা তাঁহার কাণে উঠিল, মা নানা কথার পর বলিলেন—"বাছা তোদের ত এখন ঘব সংসার হয়েছে, আমাকে ত আর দরকার নেই,—আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে. এখানে থেকে এসব অপমান আমার আর সয় না।" ছোট বাবু ছোট বৌয়ের ব্যবহার শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, গোলযোগের আর ছাই কি দিন ছিল না, আজ বিদেশ যাইবার দিনে যত হেঙ্গাম! তিনি ত গৃহে গিয়াই ছোট বৌকে বকিতে লাগিলেন। কেবল বকিলেই রক্ষা ছিল,—বলিলেন, 'আমি আর এরূপ গোলযোগ সহিতে পারি না, এই চলিলাম আব ফিবিব না।"

স্বামীকে যদি লজ্জাবতী সব খুলিয়া বলে ত এতটা কিছুই হয় না; কিন্তু স্বামীর কঠোর বাক্যে তাহার হৃদয় এত কাতর হইয়া উঠিল যে মুখ দিয়া কথা ফুটিল না! বিদায় দিনে এইরূপ স্নেহসম্ভাষণ জানাইয়া স্বামী যখন চলিয়া গেলেন সে বিছানায় পড়িয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল। তাহা ছাড়া তাহার উপায় কি। যেরূপ স্বভাব লইয়া সে জন্মিয়াছে!

৪

চতুর্দ্দশ বৎসর পরে ফুলকুমারী পিত্রালযে আসিযাছে, তাই আপনার বাডী হইয়াও এ বাড়ীব সবই যেন তাহার চোখে নূতন। মায়ের সে শ্রী নাই, তিনি এখন বৃদ্ধা, বালিকা বড় বৌ এখন গৃহিণী, দাদারা সব বড় হইয়াছেন, ঘরে ঘরে বালক বালিকাব নবমুখ—সকলই তাহাব কাছে নূতন, সর্ব্বাপেক্ষা নূতন লজ্জাবতী, এবং তাহাব প্রতি বাড়ীব ব্যবহাব! সে যেন ছাই ফেলিতে ভাঙাকুলা, তাহাকে যা বকেন, মা বকেন, স্বামী বকেন, মেয়ে পর্য্যন্ত—এমন কি দাসীরা পর্য্যন্ত বকে! তাহার কি দোষ কোন দোষ আছে কিনা ইহা বিচার কবিযা দেখাটাও কেহ আবশ্যক বিবেচনা কবে না, —লজ্জাবতীও কখনও নিজের দোষের প্রতিবাদ কবে না।

ফুলকুমারী অবাক হইয়া গেল —তাহার হৃদয মমতার্দ্র হইযা পড়িল। সে ছোট বৌয়ের পক্ষ হইয়া মাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু দেখিল বৃথা চেষ্টা, মা তাহাতে আবও বেশী রাগিযা যান। এদিকে নিষ্ফল হইযা সে সন্ধ্যাব পর লজ্জাবতীর কক্ষে গমন করিল, যদি কোনরূপে তাহাকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারে। গৃহ-দ্বারে আসিবা মাত্র দাদাব কণ্ঠস্বব তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, ফুলকুমাবী ভিতরে না গিয়া সেইখানেই দাঁড়াইল। তখনই প্রায দাদাকে গৃহের বাহিবে আসিতে দেখিযা বলিল, "দাদা, বৌকে বকছ, আমি ত বৌয়ের কোন দোষ দেখছিনে"—দাদা সহসা দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তবে দোষ কার?"

"দোষ যদি ধরতে হয় ত পুটুরাণীর; নইলে কারো নেই। সে যদি বৌকে গহনার কথা বলে, তাহলে ত আর চুরি যায় না।"

"কিন্তু মায়ের মুখের উপর অমন চোপা করার কি দরকার ছিল?"

ফুলকুমারী একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "দাদা, সেটা ঠিক চোপা নয়, মা যদি বুঝে

দেখতেন, তাহলে তাতে রাগ করতে পারতেন না, তবে এখন বুড়ো হয়েছেন এক বুঝতে আর বুঝে বসেন। কিন্তু তাই বলে তুমিও দাদা ভুল বুঝ না। কি হয়েছে বলি শোন।" কি কথার পর লজ্জাবতী মাকে কি বলিয়াছিল, ফুলকুমারী তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতে কি ওর দোষ পেলে?"

"না।"

"তবে ভেবে দেখ দেখি, বিনা দোষে তুমি পর্য্যন্ত ওরূপ করে বক্‌লে ওর কিরূপ কষ্ট হয়! বিশেষ আজ বিদেশে যাবার দিন ওকে বকে যাচ্ছ, তোমার একটু মায়া করে না দাদা?"

দাদা আব কিছু না বলিয়া আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন; শয্যায় আসিয়া দেখিলেন লজ্জাবতী কাঁদিতেছে, নিকটে বসিয়া কহিলেন, "লজ্জাবতী, তুই কি চিরকাল লজ্জাবতী থাকবি? এতক্ষণ সব খুলে বললেই ত আমি বুঝতুম তোর দোষ নেই। যা হয়েছে তা হয়েছে, ভুলে যা লক্ষ্মীটি, আর কখনও তোকে বকব না; আমায় মাপ কর।" লজ্জাবতী গভীর সুখে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া স্বামীর বুকে মাথা রাখিল।

৫

স্বামী চলিয়া গিয়াছেন—রাত্রি গভীব, —চারিদিক নিস্তব্ধ, কিন্তু লজ্জাবতীর নিদ্রা আসিতেছে না। গভীব কষ্টের পর স্বামীব প্রেমাদব পাইয়া কৃপণের ন্যায় সে তাহা এখনও আস্তে আস্তে উপভোগ কবিতেছে। এক একবাব তাহার আশ্চর্য্য মনে হইতেছে, স্বামী সব কথা কি করিয়া জানিলেন?—কে বলিল? সহসা সে চমকিয়া উঠিল, ফুলকুমারী তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিল, 'বৌ, এখানো বিছানায় যাস্‌নি।" স্বামীকে বহির্বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া আসিয়া সেই যে সে নীচে সতবঞ্চের উপর শুইয়া পড়িয়াছে—আর ওঠে নাই। ফুলকুমারীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি, তুমি এখনও শোওনি?"

'ঠাকুরঝি বলিলেন, আমি শুয়েছিলুম, বিছানা থেকে উঠে তোকে দেখতে এলুম, দাঁড়া প্রদীপটা কাছে আনি, ভাল কবে মুখ দেখা যাচ্ছ না।" ফুলকুমাবী দীপটা নিকটে আনিয়া ভাল কবিয়া জ্বালাইয়া দিয়া নিকটে বসিল, বসিয়া বৌয়ের মুখেব দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিল, "তোর না ভাই বারো বছর বিয়ে হয়েছে? আচ্ছা তখন কি তুই এব চেয়েও ছোট ছিলি? তোকে এখনও এমন ছোট দেখতে! মনে হয যেন কনে-বৌটি!" বৌ একটু হাসিল—ননদ তাহাব হাতটি হাতেব মধ্যে ধরিয়া বলিল, "তুই ভাই অমন কেন?"

"কেমন?"

"যেখানে তোব দোষ নেই সেখানেও কথা ক'সনে?"

"কথা কইতে গিয়ে দেখেছি উল্টো হয, কে জানে আমি কি বকম কবে বলি— সবাই ভুল বোঝে?"

"দাদাও? কেন আমি দাদাকে বুঝিয়ে বলতে ত তিনি সব বুঝলেন?"

তবে ফুলকুমারীই তাহার পক্ষ লইয়া স্বামীকে সব কথা বলিযাছে! তাহার জন্যই সে স্বামীব আদর পাইয়াছে! কৃতজ্ঞতায় লজ্জাবতীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তিনি কিছু বললে আমার বড় কান্না পায়।"

"তাইতে কোন কথা মুখ ফুটে বলা হয় না? বুঝেছি।"

"না তা ঠিক না, তিনি বিরক্ত হ'য়ে তারপর আর জিজ্ঞাসা করেন না।"

"হায়রে আমার অভিমানিনি! কে জানে ভাই তোকে সবাই বকে কি করে! কি করে তোর উপব রাগ করে!"

"দিন কতক পরে তুমিও বকবে। দেখবে আমার উপর রাগ না করে লোকে থাকতে পারে না।"

"কক্ষনো না।"

"যদি দোষ করি?"

"তা হলেও না। তোকে যে সকলেই বকে— আমি আবার কোন প্রাণে বকব!" লজ্জাবতী তাহার হাত দুটি ধরিয়া টিপিয়া বলিল, "তাও নাকি কখনও হয়!"

আনন্দ-সজল নেত্রে খানিক পরে ফুলকুমারী চলিয়া গেলেন, বৌ বিছানায় গেল, কিন্তু কিছুতেই ঘুম হইল না। সে রাত্রির সমস্ত ঘটনা, স্বামীর আদর, ফুলকুমারীর সস্নেহ বাক্য, অকৃত্রিম সখীত্বভাব তাহার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতে লাগিল; সুখের চিন্তায় উত্তেজিত হইয়া সমস্ত রাত্রি সে জাগিয়া কাটাইল।

ভোর বেলা উঠিতে গিয়া দেখিল মাথা বড় ঘুরিতেছে—আবার সে শুইয়া পড়িল। ফুলকুমারী সকালে গৃহে আসিয়া বৌকে তখনও শয্যায় দেখিয়া মশারীর দরজাটা একটু খুলিয়া যখন উঁকি মারিল, লজ্জাবতী তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। লজ্জাবতীকে নিতান্ত বিবর্ণ, ক্লান্ত দেখিয়া ফুলকুমারী বলিল, "বৌ, তোর কি অসুখ করেছে নাকি? অমন দেখাচ্ছে কেন?"

লজ্জাবতী তাড়াতাড়ি বলিল, 'না'।

ফুলকুমারী বলিল, "কিন্তু তুই যে কাঁপছিস্ শীত করছে? গায়ে কাপড় দে না।"

লজ্জাবতী বিছনার এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, "আমার লেপটা কই দেখছিনে ত"—গোলমালে শ্বাশুড়ী দত্ত লেপটি দাসী তাহার জন্য আনিয়া রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

"ওমা, সারারাত লেপ না গায়ে দিয়ে অমনি কাটিয়েছিস্। কেন তোর লেপ কোথায় গেল?"

"জানিনে, ঝি বুঝি শুক'তে দিয়েছিল, তুলে দিতে ভুলে গেছে"—বলিতে বলিতে লজ্জাবতী বিছনার বাহির হইল। ফুলকুমারী তাহার মাথায় হাত দিয়া দেখিয়া বলিল, "সত্যি বৌ, তুই এখন উঠিস্‌নে, শুয়ে থাক, তোর কপালটা যেন গরম গরম মনে হচ্ছে।"

বৌ হাসিয়া বলিল, "এখন শুয়ে থাকলে কি চলে? ও কিছু না, একটু মাথা ধরেছে, স্নান করলেই সেরে যাবে এখন।"

"কেন—চলবে না কেন? আজ বুঝি তোর রাঁধার পালা? তা অসুখ করলেও পালা রাখতে হবে নাকি? আমি রাঁধব এখন।"

লজ্জাবতী জিব কাটিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি—ক্ষেপছ নাকি? সত্যি আমার কিছু হয় নি।" এমন আজগুবি অসম্ভব প্রস্তাব সে যেন জীবনে কখনো শুনে নাই। বলিতে বলিতে সে খাটে বসিয়া পড়িল। ফুল বলিল, "আমার মাথা খাস্ তুই শো,—"

এমন সময়ে দাসী একটা লেপ আনিয়া বিছানায় ফেলিয়া বলিল, "এই তোমার লেপ রইলো গো, —কাল আনতে ভুলে গেছনু—তা উনুন যে বয়ে যাচ্ছে আজ কি আর রান্না বান্না করতে হবে না?"

লজ্জাবতী বলিল, "চল যাচ্চি।"

দাসী গেল, ফুল বলিল, "আমার কথা রাখবিনে, তবু রাঁধতে যাবি!"

বৌ কাতর হইয়া বলিল, "ঠাকুরঝি, তুমি রাঁধবে সে কি করে হবে?"

"কেন তাতে কি হয়! তবে আমি তোর এত পর, —বেশ!" এই কথা বলিয়া ফুল রাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, লজ্জা বলিল, "শোন ঠাকুরঝি—না, তা নয়! কিন্তু মা তাহলে রাগ করবেন, তিনি ভাববেন—"

"তাঁর সঙ্গে বোঝা পড়া সে আমার!"

লজ্জাবতী একটু ভাবিল—ভাবিয়া সেই প্রস্তাবের অসম্ভাব্যতাটা মনে মনে কল্পনা করিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "ছি ছি তাও কি হয়। না ঠাকুরঝি, সে কোন মতে হবে না!"

"কোন মতে হবে না! বেশ তুই রাঁধলে আমি কিন্তু সে রান্না খাব না." ফুল রুষ্ট স্বরে এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল,—লজ্জাবতী ডাকিল—"ঠাকুরঝি!" কিন্তু ফুল আর ফিরিল না। লজ্জাবতী আর পারিল না—সে তাহার ঘূর্ণ্যমান উত্তেজিত উষ্ণ মস্তক লইয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িল। এখনও একদিন যায় নাই ইহার মধ্যে ঠাকুরঝিও তাহার উপর রাগ করিল। সে বুঝিল এ রাগ ঠাকুরঝির স্নেহপ্রসূত, —কিন্তু তবুও তাহাতে তাহার হৃদয় বিদ্ধ হইল, দুঃখে অভিমানে অশ্রু উথলিয়া উঠিল, কাঁদিয়া মনে মনে সে কহিল, ঠাকুরঝিও আমার উপর রাগ করিল! আমার মরণই ভাল!

৬

লজ্জাবতী খানিক পরে নীচে রন্ধনশালায় আসিয়া দেখিল, ফুল উনুনে হাঁড়ি চড়াইয়া বড় বৌকে রান্না সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিতেছে—বড় বৌ কুটনা কুটিতে কুটিতে হাসিয়া উত্তর করিতেছেন। ফুলের বাঁহাতী উনুনে ডালের হাঁড়ি—ডানদিকে কড়ায় তেল ফুটিতেছে—সে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বৌ লো! তেল চড়বড় করে এলো এখন তরকারী গুলো দিই?" বউ হাসিয়া বলিতেছে, "বলি তোমার অমন কাজ না করলেই কি নয়! চড়বড়ানি আগে থামুক্ তখন দেবে—" ফুল বলিল, "ঐ লো বউ ডাল উথলে উঠলো! কি করি আয় আয়—"

লজ্জাবতী বলিল, "এই যে আমি আসছি ঠাকুরঝি।" সে আসিতে আসিতে ডাল উথলিয়া খানিকটা ফুলের পায়ে পড়িয়া গেল। পা পুড়িল ফুলের, তাহার জ্বালা ভোগ করিল যেন লজ্জাবতী, এই ঘটনায় এমনি সে ব্যথিত হইয়া পড়িল। সে শুষ্ক মুখে তাড়াতাড়ি তাহার শুশ্রূষা করিতে বসিয়াছে, এমন সময় শাশুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আসিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা তাই ত! সত্যিই ফুলকুমারী রাঁধছে—আমার বিশ্বাস হয়নি! আবার পা পুড়িয়ে ফেলেছে! বলি সব রাজার ঝিরা! ননদ দুদিন মাত্র থাকতে এসেছে তাকে না পুড়িয়ে মনস্কামনা সিদ্ধি হল না!"

বড় বৌ বলিল, "আমি ত সেই অবধি বারণ করছি, তা ঠাকুরঝি ত শোনে না কি করব? ছোট বৌয়ের অসুখ করেছে না পারে—আমি রাঁধছি, তোর কেন বাবু আসা!"

শাশুড়ী। "ছোট বৌয়ের অসুখ করেছে তাই উনি রাঁধতে এয়েছেন! দেখ ফুলি, আমি আজ মাথামুড় খুঁড়ে মরব। এদিকে আয় বলছি, যাইবি—এমন বৌও তো আমি কখনও দেখিনি।"

বড় বৌয়ের প্রতি ফুল ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মাকে বলিল, "না মা আমি সখ্ করে রাঁধতে এসেছি, আমি এই ডাল আর তরকারীটা রেঁধে যাচ্ছি—তুমি যাও।"

মা বলিলেন, "তুমি রাঁধবে, আর বৌরা পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকবে? আয় বলছি, নইলে আমি রক্ষে রাখব না"—বলিয়া হেঁসেলে উঠিয়া ফুলের হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন, এবং সমস্ত বেলা ধরিয়া তাহাকে এমন চোখে চোখে রাখিয়া দিলেন যে ফুলের আর লুকাইয়াও এ মুখো হইবার যো রহিল না।

৭

লজ্জাবতী তাহার অসুখ শরীর লইয়া নিস্তব্ধে রাঁধিল, কিন্তু রান্নার পর গৃহে আসিয়া সেই যে শুইয়া পড়িল, আর উঠিবার সামর্থ্য রহিল না।

বড় বৌ ফুলের ভাত বাড়িয়া উপরে লইয়া আসিল। পুটুরাণী পিসিমাকে ডাকিল, "পিসিমা ভাত এসেছে খাওসে গো।" মা মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আহার স্থানে আসিয়া ছোট বৌকে না দেখিয়া বলিলেন, "রাজার ঝির বুঝি আর এদিকে আসতে নেই!" পুঁটুরাণী বলিল, "মায়ের বড় অসুখ করেছে সে শুয়ে পড়েছে।"

শাশুড়ী বলিলেন, "সব ভাণ, কাজের নামে অমনি অসুখ।"

তাহার অসুখের কথা শুনিয়া ফুলের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল—বুঝিল বিশেষ অসুখ না হইলে সে এখানে আসিত। সে বলিল, "না, মা, সকাল থেকে তার অসুখ করেছে—রেঁধে ভাল করেনি, একটা বাড়াবাড়ি না হয়।"

মা বলিলেন, "অমনি বাড়াবাড়ি হোল। একটু বুঝি মাথা ধরেছে আর পড়ে আছে। গেরস্থের বাড়ী অত বড়মানুষী কল্লে চলে না।"

ফুল আর কিছু না বলিয়া আহারের পর তাহার গৃহে গমন করিল, মাও তাহার সঙ্গ লইলেন। লজ্জাবতীকে দেখিয়া শ্বাশুড়ীর জ্ঞান জন্মিল যে, সে সত্যই পীড়িত। ফুল তাহার কপালে হাত দিয়া বলিল, "উঃ। আগুন যে। বৌ শীতে কাঁপছে, নেপটা আবার গেল কোথা ? কাল ত বৌয়ের বিছনায় মোটেই নেপ ছিল না— সারা রাত শীতে সারা হয়ে আসলে এ অসুখটা হয়েছে।"

শ্বাশুড়ী বলিলেন, "বড় মানষের ঝি! একটা নেপ দিয়েছিলুম তা ফেরত দেওয়া হয়েছে। গেবস্থঘব এক দিন কি নিজের ভাল নেপটা নইলে চলে না! না হয় ননদকেই গায়ে দিতে দিয়েছিলুম—তার জন্যে একেবারে অসুখ বাধান।"

লজ্জাবতী জানিতই না যে শ্বাশুড়ী তাহার লেপের পরিবর্ত্তে অন্য লেপ তাহাকে দিয়াছেন। সুতরাং সকালে রন্ধন-গৃহে যাইবার সময় বিছানা তুলিতে গিয়া ছেঁড়া লেপখানা দেখিয়া ভাবিল, দাসী লেপটা বদল করিয়া আনিয়াছে—তাই পুটুরাণীকে দিয়া লেপটা ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছিল। ফুল বলিল, "সে যা হোক, এখন একটা নেপ পাঠিয়ে দেও দেখি।" শ্বাশুড়ী চলিয়া গেলেন। ফুল লজ্জাবতীর সেই করুণ কাতর মুখের দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কেন আমি জোব কবে রাঁধলুম না, তাহলে ত তোর অসুখ হোত না।"

লজ্জাবতীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, —সে বলিল, "না আমার রেঁধে অসুখ করেনি। বল দিদি, তোমার আর রাগ নেই—তুমিও ভাই আমার উপর রাগ করলে।"

ফুলকুমারী কাঁদিয়া তাহার গলা ধরিয়া কহিল, "আর আমি কখনো বাগ কবব না—বল ভাই, তুই কিছু মনে করবি নে!"

লজ্জাবতী কোন কথা কহিল না, তাহার মাথা ফুলের বুকে রাখিয়া গভীর প্রশান্তসুখে সে কাঁদিতে লাগিল। প্রাণে প্রাণে এক হইয়া, দুজনে অশ্রুজলে অশ্রুজল মিলাইল!

বুঝিবা লজ্জাবতীর কাঁদিবার সাধ মিটিল! ইহার পর আর সে কাঁদিল না,—স্বামী যে কথা দিয়াছিল, ফুল যে কথা দিয়াছিল তাহা ঠিক রহিল—আর লজ্জাবতীকে তাঁহাদের বকিতে হইল না! —কয়েক দিনের মধ্যেই লজ্জাবতী রোগ-শয্যা হইতে একেবারে চিতা-শয্যায় শয়ন করিল।

শ্বাশুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আহা গেলো গো—নিজেব দোষে প্রাণটা খোয়ালে। রাগ করে নেপটা গায়ে দিলে না গো। রাগ করে বল্লে না যে অসুখ করেছিল।"

দাসী, চাকর, যা, সকলেই এই এক ধুয়া ধরিয়া কাঁদিলেন,—কেবল একটি গভীর শোকক্লিষ্ট, অনুতপ্ত হৃদয় তাহাদের সঙ্গে যোগ না দিয়া নির্জ্জনে মর্ম্মান্তিক দুঃখের অশ্রুবর্ষণ করিয়া মনে মনে কহিল, "হায় হায়, কি করিলাম। কেন তাহার উপর রাগ করিয়াছিলাম। বুঝিবা সে ঐ অভিমানেই গেল—বুঝি আমিই তাকে মারিলাম! একবার মুহূর্ত্তের জন্য ফিরিয়া এস দিদি—একবার প্রাণ ভরিয়া আদর করিয়া লই, —আদরের ভিখারিণি, তোমাকে কেহ আদর করে নাই, আমিও করিলাম না; জীবনে এ দুঃখ শেলের মত মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিয়া থাকিবে।"

নবকাহিনী ও অন্যান্য গল্প

গৃহিণী রোগ

জলধর সেন

আফিস থেকে ফিরতে প্রত্যহই ছ'টা বাজে। আবার যে দিন কাজ চেপে পড়ে, সে দিন আটটা সাড়ে আটটাও হয়। যাঁরা নিম্ন কর্মচারী, তাঁ'রা বলেন, আফিসের বড়োবাবু, মাস গেলে চার শ' খানি টাকা পান— খাটবেন না? আমাদের যেমন দান, তেমনই দক্ষিণা; দশটা পাঁচটা কাঁসি বাজাই —চল্লিশ পঞ্চাশ যা' পাই, বহুৎ আচ্ছা।

এই ত গেল আফিসের কথা। বাড়ির অবস্থা আরও সঙ্গীন। সে কেমন শুনবেন?

এক দিন একটু সকাল সকাল অর্থাৎ অপরাহ্ণ সাড়ে ছ'টার সময় বাড়ি এসে দেখি, উপরে আমার শয়ন-ঘরে আমার গৃহিণী শুয়ে আছেন, মাথার উপরে হু হু ক'রে পাখা চল্‌ছে। বুড়ো ঝি শ্যামার মা গৃহিণীর পায়ের কাছে বসে আছে।

আমাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই শ্যামার মা অতি কর্কশ স্বরে ব'লে উঠল, "যা হ'ক, বাবুর ঘরে আসবার সময় হয়েছে, সে-ও ভালো।"

আমি এমন সুমিষ্ট সম্ভাষণের কোনো কারণ না বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে? উনি শুয়ে রয়েছেন যে? অসুখ—"

আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই শ্যামার মা ঝংকার দিয়ে উঠল, "শুয়ে থাকবে না, কি নেচে বেড়াবে? এই যে এত দিন থেকে বাছার আমার অসুখ, তা'র কি খোঁজ-নেওয়া আছে?"

শ্যামার মা অনেক দিনের ঝি। সে আমার স্ত্রীকে "মানুষ" করেছিল। তাহার পর তিনি যখন আমার গৃহিণী হয়ে এলেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এই ঝি-টিকেও ফাউ পাওয়া গিয়েছিল; শ্যামার মা বলতে গেলে, সেই থেকেই এ বাড়ির অভিভাবিকা,—তা'র উপরে কথা বলে, এমন সাহস কারু হয় না। আর হবেই বা কা'র? বাড়িতে আমি, আর আমার স্ত্রী। একটি মেয়ে, তাকেও বছর দুই হ'ল তালতলার ঘোষদের বাড়ি বিয়ে দিয়েছি; সে সেখানে বেশ সুখে আছে। সুতরাং শ্যামার মা'র ক্ষমতা অব্যাহতই আছে।

শ্যামার মা যে গুরু চার্জ আমার উপর করল, তা' অস্বীকার ক'রে আরও গোলমাল না বাধিয়ে, আমি নিতান্ত ভালোমানুষের মতো বল্‌লাম,— "এমন অসুখ, তা' আমাকে আফিসে খবর পাঠালেই আমি তখনই ছুটে আসতাম, এত দেরি হ'ত না।"

শ্যামার মা উত্তর দিল,— "অসুখ কি আজই হয়েছে? এই মাসখানেক ধ'রেই অসুখ। সেই যে বেলা ১১টার সময় দুটো ভাত মুখে দিয়ে—আহা, বাছার আমার কি সে খাওয়া আছে? ঐ নামমাত্তর পাতের কাছে ব'সেই উঠে এসে সেই যে বিছনায় পড়ে, আর ৫টার আগে উঠতে পারে না। সেই ৫ টার সময় কষ্ট ক'রে উঠে, তাই কি সাধ ক'রে? শুয়ে থাকতে বল্‌লে বলে, 'না, না, বাবুর আসার সময় হ'ল। তাঁকে আমি না দেখলে কে দেখবে?' বাবুর ত সে দিকে দিষ্টি কত। বাছার আমার শরীরে কি পদাখ্খ আছে।"

অসুখ যে কি এবং তাহা যে কেমন গুরু, শ্যামার মা'র এই সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার ত কোনো হদিশই পেলাম না। এত দিনের মধ্যে কোনো দিন কোনো কথা শুনতে পাইনি, দেখতেও পাইনি। কিন্তু আজ যে প্রকার গুরু ব্যাপার, তা'তে সে কথা ত বলা যায় না। সুতরাং নিতান্ত বিনীতভাবে অপরাধ স্বীকার ক'রে যতখানি সহানুভূতি সংগ্রহ করা যেতে পারে, তাই করে বল্‌লাম—"তাই ত, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। সেই গাধার খাটুনি খেটে সন্ধ্যার পর এসে আর কোনো দিকে চাইবার শক্তি থাকে না। তা'রই জন্য ওঁর অসুখ এমন বেড়ে উঠেছে। আমারই অমনোযোগে এমন হয়েছে। যাক, সে কথা

ব'লে দুঃখ করে এখন আর কি হবে। আমি এখনই যাই, ললিত ডাক্তারকে ডেকে আনি।"

গৃহিণী এতক্ষণ নীরবই ছিলেন, ললিত ডাক্তারের নাম করতে যেন তেলেবেগুনে জ্ব'লে উঠলেন, মুখখানি যথাতিরিক্ত বিকৃত করে বললেন, "ললিত ডাক্তার কেন, শ্রীচরণ কম্পাউণ্ডারকে আনলেই হবে। আমার যেমন পোড়া কপাল।"

এই নেও। চার শ' টাকা মাইনের আফিসের বড়ো বাবুর একমাত্র সহধর্মিণীর এমন দারুণ অসুখ, আর আমি কিনা ডাকতে চাইলাম পাড়ার ললিত ডাক্তারকে। যা'র মোটর দূরে থাক, গাড়ি-ঘোড়াও নেই, যে এক টাকার বেশি ভিজিট নেয় না, হয় ত পায়ও না, আমি কি না আমার মহামহিমময়ী গৃহিণীর চিকিৎসার জন্য তা'কে ডাকবার প্রস্তাব করলাম। কি ধৃষ্টতা আমার।

আমি তখন আমার নির্বুদ্ধিতার কৈফিয়ৎস্বরূপ বল্‌লাম, "আরে, ললিতকে কি আর চিকিৎসার জন্য ডাকতে চাইছি। তোমার যে রকম ভয়ানক অসুখ, তাতে বাড়িতে এক জন ডাক্তার সর্বদার জন্য রাখা দরকার। তাই তাকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি এক জন বড়ো ডাক্তার আনতে চাচ্ছি। তোমার চিকিৎসা ললিতকে দিয়ে করাব— আমি কি পাগল হয়েছি?" মনে মনে কি যা' বল্‌লাম, তা' আর লিখে কাজ নেই।

কি আর করি? সেই সন্ধ্যাবেলাতেই আফিসের কাপড় না ছেড়েই এক জন ভালো ডাক্তারের খোঁজে বা'র হলাম. কিন্তু যাই কা'র কাছে? ডাক্তার নীলরতন সরকার কি বিধান রায়ের কাছে গিয়ে আমার গৃহিণীর এবংবিধ দারুণ অসুখের কথা বল্‌লে তাঁ'রা তখনই হয় আমাকে পাগল ব'লে তাড়িয়ে দেবেন, আর না হয়, দয়া-পরবশ হয়ে আমাকে পাগ্‌লা গারদে পাঠাবার জন্য পুলিসের জিম্মা করিয়ে দেবেন।

শেষে মনে পড়ল, ডাক্তার বোসের কথা। শুনেছি, তিনি না কি এই রকম রোগীর চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ত আমার তেমন আলাপ-পরিচয় নেই। দুই তিন বার বন্ধুদের বাড়িতে দেখা হয়েছিল মাত্র। তিনিও আমার নাম জানেন, আমিও তাঁর নাম জানি। পথে-ঘাটে দেখা হ'লে আজকালকার ভদ্রতাসংগত "নমস্কার মশাই" "ভালো ত" এই রকম মামুলী সম্ভাষণের অধিক কোনো কথা কোনো দিন হয় নি— ঘনিষ্ঠতা ত দূরের কথা। তবে অনেকের কাছে তাঁর প্রশংসা শুনেছি। ডাক্তারও বেশ নামওয়ালা। সুতরাং তাঁর কাছে যাওয়াই স্থির করলাম।

ডাক্তার বোসের বাড়ি আমার জানা ছিল। তাঁর বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, তিনি বাড়িতেই আছেন। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করবার পরই ডাক্তারবাবু উপর থেকে নেমে এলেন এবং আমাকে দেখে সহাস্য মুখে বল্‌লেন,—"এই যে বিজয় বাবু। আসুন, আমার বসবার ঘরে।"

তাঁর রোগী দেখবার ঘরের মধ্যে গিয়ে আমাকে বসিয়ে বললেন,"তা'র পর এ অসময়ে একেবারে আফিসের ড্রেসে এসে উপস্থিত, ব্যাপার কি?"

আমি বল্‌লাম,—"ব্যাপার কিছু সঙ্গীন না হ'লে কি এ সময় আপনাকে বিরক্ত করতে আসি? আপনার সময় হবে ত? সব কথা বলতে হয় ত দশ মিনিট লাগবে।"

ডাক্তার বল্‌লেন,—"আমি এখন আর কোথাও বেরুব না, যথেষ্ট সময় আছে। কেউ 'ডিসটার্ব' না করে, দুয়ারটা বন্ধ ক'রে দিই।" এই ব'লে তিনি ঘরের প্রবেশ-দ্বার বন্ধ ক'রে বিজলী বাতি ও পাখা খুলে দিলেন। তা'র পর বল্‌লেন, "এখন বলুন, আপনার ব্যাপারটা কি?"

আমি বল্‌লাম—"আমার স্ত্রীর না কি ভয়ানক অসুখ।"

ডাক্তার হেসে বল্‌লেন—" 'না কি' কথাটা ত বুঝতে পারলাম না বিজয় বাবু।"

আমি বল্‌লাম— "কি যে অসুখ, তা আমি জানিনে। প্রত্যহ সাড়ে ৯টায় আফিসে যাই, সাড়ে ৬টা ৭টায় বাড়ি ফিরি। আমার স্ত্রীকে কোনো দিনই অসুস্থ দেখিনে। আজ আঠারো বছর যেমন দেখে আসছি, তাই-ই দেখি। শরীরেও কোনো বৈলক্ষণ্য দেখিনে। বাড়িতে ছেলেপিলেও নেই যে, হাঙ্গামা

পোয়াতে হয়। একটিমাত্র মেয়ে, তারও দুবছর হ'ল বিয়ে দিয়েছি। সে কখনও এক আধ বেলার জন্য আসে, আবার চ'লে যায়। বাড়িতে চাকর, ঝি, বামুন, সইস-কোচোয়ান সবই আছে। গিন্নীকে শ্রমসাধ্য কোনো কাজই করবার দরকার হয় না। এই ত অবস্থা। আজ এই একটু আগে বাড়ি এসে দেখি, তিনি শুয়ে আছেন। আমি ঘরে প্রবেশ করতেই তাঁর বাপের বাড়ি থেকে আমদানী বুড়ো ঝি শ্যামার মা একেবারে রেগে অস্থির। তাঁর বাছার না কি 'গুরুতর' অসুখ; আর আমি না কি কোনো দিন সে দিকে 'দিষ্টি' দিইনে। আমি ত মশাই, মহা সংকটে পড়লাম। শেষে, অনেক বক্তৃতা ও অনেক ভর্ৎসনার পর শ্যামার মা রোগের যে বিবরণ দিলেন, তা' থেকে আমি এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। আপনি শুনেছি মনস্তত্ত্ববিৎ চিকিৎসক, আপনি যদি কিছু বুঝতে পারেন। শ্যামার মা বল্‌লে যে, তাঁর বাছা অর্থাৎ আমার স্ত্রী বেলা ১১টার সময় প্রত্যহই পাতের কাছে বসেন মাত্র, তার পর উঠেই যে শয্যাগ্রহণ করেন, বিকেলে ৫টার পূর্বে আর সে শয্যা ত্যাগ করতে পারেন না, এমনই তিনি কাতর। আমি ৬টার পর বাড়ি আসি, তখন আর কিছু দেখতেও পাইনে, জানতেও পাইনে; গৃহিণীও কিছু বলেন না। আজ ৫টার পরেও তিনি শয্যা ত্যাগ করতে পারেন নি। এই পর্যন্তই আপনাকে বল্‌তে পারি, ডাক্তার বাবু। কাজেই আমাকে ডাক্তার ডাক্‌তে ছুটে আসতে হ'ল।"

ডাক্তার বোস আমার কথা শুনে হেসে বল্‌লেন—"আপনাকে আর বলতে হ'বে না, আমি আপনার গৃহিণীর ও আপনার অসুখের কথা বুঝতে পেরেছি।"

আমি সবিস্ময়ে বল্‌লাম—"আমার অসুখ! আপনি কি এতক্ষণ সব কথা শোনেন নি? অসুখ আমার স্ত্রীর, আমার নয়। আমি বেশ সুস্থ আছি।"

ডাক্তার বল্‌লেন—"সে পরে বিবেচনা করা যাবে। এখন আমাকে কি করতে বলেন? এখনই কি আপনার রোগীকে দেখতে যেতে হবে?"

আমি বল্‌লাম—"সর্বনাশ! আপনি এখনই যাবেন কি! তা হ'লে কি গৃহিণী আপনাকে আমল দেবেন, না আপনার ব্যবস্থামতো ঔষধ ব্যবহার করবেন? তিনি অমনিই ব'লে বস্‌বেন, বড়ো ডাক্তার না ছাই; ওর মোটেই পসার নেই; বড়ো ডাক্তারদের কি ডাকবামাত্রই পাওয়া যায়? আপনি পণ্ডিত হয়ে কথাটা বুঝতে পারেন নি। আপনি আসছে কাল একটা সময় ব'লে দিন; সেই সময় যাবেন। আমি বাড়ি গিয়ে আপনার এখন সময় হল না, আর আপনার ভয়ানক পসারের কথা সত্য-মিথ্যা বানিয়ে তাঁকে ব'লে আপনার উপর তাঁর শ্রদ্ধা বাড়িয়ে রাখব। তবে ত এ রোগের চিকিৎসা ঠিক হবে। কি বলেন, ডাক্তার বাবু, আমার কথা সঙ্গত কি না?"

ডাক্তার বাবু বল্‌লেন—"সত্যিই আমি অতটা ভেবে দেখিনি, বিজয় বাবু। আপনি দেখছি মনস্তত্ত্ববিষয়ে আমার অপেক্ষাও সূক্ষ্মদর্শী। যাক্‌, তা হ'লে আমি কাল সাড়ে ৯টায় আপনার বাড়িতে যাব; ঠিকানাটা লিখে রাখছি।"

আমি বল্‌লাম—"আর একটু আগে কি সময় হ'তে পারে না, ডাক্তার বাবু; সাড়ে ৯টায় গেলে, হয় কাল আমাকে আফিস কামাই করতে হয়, আর না হয় লেট হয়। তা'তে কাজের ভারি অসুবিধা হবে।"

ডাক্তার বাবু একটু চিন্তা ক'রে তাঁর ডায়েরি বইখানি নেড়ে চেড়ে বল্‌লেন—"বেশ, এক ঘন্টা আগে, সাড়ে আটটায় যাব। কেমন, তা হ'লে ত আপনার অসুবিধে হবে না?"

আমি বল্‌লাম—"না কোনো অসুবিধা হবে না। ঠিক সাড়ে ৮টাতেই যাবেন। ১০ মিনিট আগে গিয়ে যেন না ওঠেন, বরঞ্চ ২ মিনিট দেরি হ'লেও কোনো ক্ষতি হবে না। আগে গেলে কি হবে বুঝেছেন ত? গৃহিণী অমনই মনে করবেন, এ ডাক্তারের হাতে তেমন রোগী নেই।"

ডাক্তার বল্‌লেন—"আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না, আমি বেশ বিবেচনা ক'রে কাজ করব; আমি সব বুঝতে পেরেছি।"

আমি বল্‌লাম—"ডাক্তার বোস, কিছু যদি মনে না করেন, তা হ'লে আর একটা কথা বলতে চাই।"

তিনি বল্‌লেন—"সে কি কথা; আপনি বলুন না।"

আমি বল্‌লাম—"দেখুন, আমি অনেক দিন দেখেছি, আপনি সকালে বা বিকেলে যখন রোগী দেখতে আপনার মোটরে চ'ড়ে যান, তখন আপনার পরনে খদ্দরের ধুতি, গায়ে গরদের পাঞ্জাবী, আর কাঁধের উপর খদ্দরের চাদর দেখতে পাই। পায়ে কি দেন, দেখতে পাই নে, হয়ত চটিই হবে। ও যে শ্বশুরবাড়ি নেমন্তন্নে যাবার পোষাক। ও প'রে আমার বাড়ির রোগিণীকে দেখতে গেলে তিনি আপনাকে আমলই দেবেন না। আপনাকে একেবারে ফিট্‌ফাট্ 'সাহেব' সেজে যেতে হবে, তিনটা বাংলা কথার সঙ্গে দশটা ইংরাজি কথা বলতে হবে। তবে ত রোগীর মনে হবে, হাঁ ডাক্তার বটে। কি যে বিপদে পড়েছি, ডাক্তার বোস, তা আমার এই সব ভদ্রতা-বিরুদ্ধ কথা থেকেই আপনি বুঝতে পারছেন। আমি ফিরে গিয়ে আপনার সম্বন্ধে যে সব কথা তাঁকে ব'লে তাঁর শ্রদ্ধা বাড়িয়ে রাখব, কাল তা'র কিছু গলতি হ'লে কি আর আমার বাঁচোয়া থাক্‌বে। এই এত কথা বলতে হ'ল; আমার অবস্থা বিবেচনা ক'রে ক্ষমা করবেন।"

ডাক্তার বাবু বল্‌লেন—"ও সব কিছু মনে করবেন না; আমাদের অনেক রকম রোগী নিয়ে কারবার করতে হয়, বিশেষ মাথা-পাগলা রোগী নিয়ে আমাকে অনেক সময় থাকতে হয়। তা'দের কথার কাছে, আপনার কথাগুলো তেমন বেশি অসংলগ্ন নয়। বিশেষতঃ, আপনাকে যে রোগী নিয়ে ঘর করতে হচ্ছে, তাতে আপনাকে যে বিশেষ সতর্ক হ'তে হয়, এ ত জানা কথা। তা হ'লে আপনি আসুন। আমি, কাল ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ৮টায় যাব, আর যা যা করতে হয়, করব। কোনো রকম ভুলের জন্য আপনাকে বিব্রত হতে হ'বে না।"

আমি বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, তখন আর একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। আমি বিনীত ভাবে বললাম—"আর একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে। বড়োই বিরক্ত করছি, ডাক্তার বোস, ক্ষমা করবেন।"

ডাক্তার হেসে বল্‌লেন—"আবার কি ভুল হ'ল বলুন।"

আমি বল্‌লাম—"রোগী দেখে আপনি যখন উঠবেন, আমি তখন আপনাকে ষোলোটি টাকা ফি দেব; আপনি অমনি ব'লে বসবেন, আপনার ফি ষোলো নয়, বত্রিশ টাকা। বুঝলেন? এটাও দরকার, ভুলবেন না।"

ডাক্তার উচ্চ হাস্য ক'রে বল্‌লেন—"বিজয় বাবু, আপনি দেখছি, এ সব রোগের আমার অপেক্ষাও পাকা চিকিৎসক। বেশ, বেশ, তাই হবে; আমি বত্রিশ টাকাই চাইব।"

ডাক্তার বোসের নিকট বিদায় নিয়ে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। এসে দেখি, গৃহিণী শয্যাত্যাগ ক'রে ঘরের মেঝেতে বসেছেন; বামুন-ঠাকুর এক বাটি দুধ হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন, আর শ্যামার মা দুধটুকু খাবার জন্য গৃহিণীকে জেদ করছেন। আমাকে দেখেই শ্যামার মা বল্‌ল—"ডাক্তার আস্‌ছে না কি?"

আমি বল্‌লাম—"জান তো কলকাতা সহরে বলবামাত্রই বড়ো ডাক্তার মেলে না।"

আমার গৃহিণী বল্‌লেন—"সে ত ঠিক কথা; বড়ো ডাক্তারদের কত রোগী। তিন দিন ঘুরে তবে এক জনকে পাওয়া যায়।"

মিথ্যা কথা বলতে কোনোদিনই আমার বাধে না। তা' যদি হ'ত, তা' হ'লে আর ত্রিশ টাকার কেরাণী থেকে চার শ' টাকার বড়ো বাবু হতে পারতাম না। সুতরাং গৃহিণীর অনুকূল মন্তব্য শুনে আমার মিথ্যার ভাণ্ডার একেবারে খুলে গেল। আমি আফিসের কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বল্‌লাম—"বুঝলে, এই কলকাতা সহরে বড়ো ডাক্তার হঠাৎ পাওয়া যে কি মুশকিল, তা' আজ আমি হাড়ে

হাড়ে টের পেয়েছি। এই ধর না, এখান থেকে বেরিয়ে প্রথমে ত ঠিকই করতে পারি নে, কা'র কাছে যাই। শেষে ভাবলাম, টাকা আগে, না প্রাণ আগে? এই কথা মনে হ'তেই একেবারে ছুটে গেলাম নীলরতন সরকারের বাড়ি। সেখানে গিয়ে শুনি, তিন দিন থেকে তিনি অসুস্থ; নীচেও নামেন না, রোগীও দেখেন না। তখন আর কি কবি, দৌড়লাম বিধান রায়ের বাড়ি। গিয়ে দেখি, তিনি ব্যাগ সাজাচ্ছেন। কি ব্যাপার। না, এখনই তাঁকে কোন্ নরসিংগড়, না প্রতাপগড়ে যেতে হবে; মোটর প্রস্তুত। এক ঘন্টা পরেই হাবড়ায় ট্রেণ। কি করি, সেই গোলমালের মধ্যেই তাঁকে রোগীর অবস্থা বল্‌লাম। তিনি বল্‌লেন—"এক কাজ করুন। যে রোগের কথা বল্‌লেন, তা'র চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তার বোস খুব উপযুক্ত; তাঁকেই নিয়ে যান। আমি যদি থাকতাম, তা হ'লেও তাঁকে নিয়ে যেতেই আপনাকে পরামর্শ দিতাম।' সেখান থেকে ছুটলাম ডাক্তার বোসের বাড়ি—বিলম্ব ত করা যায় না। তাঁর বাড়ি ঠিক সময়ে পৌঁছেছিলাম। তিনি রোগী দেখতে বেরুচ্ছেন; মোটরে এক পা দিয়েছেন; সেই সময় গিয়ে আমি উপস্থিত। তিনি আর ঘরে ফিরলেন না; তাঁর খুব তাড়াতাড়ি কোথায় যেতে হবে। আমি আমার বিপদের কথা বলতে তিনি বল্‌লেন—'তাই ত বিজয় বাবু, এখন ত যেতেই পারব না। এত রোগী আমার হাতে যে, বাড়ি ফিরতে সেই রাত ১১টা। তখন ত আর যাওয়া যায় না। আচ্ছা দেখছি।' এই ব'লে তাঁর নোটবুক খুলে দেখে বল্‌লেন, 'কাল বেলা ১টায় পূর্বে আর আমার যাওয়ার সুবিধে হবে না।' তখন কি করি, অনেক সাধ্য-সাধনা করলাম, যা চাইবেন, তাই দিতে স্বীকার করলাম। তবুও আজ রাত্তিরে তিনি সময় করতে পারবেন না, বল্‌লেন। অনেক অনুরোধের পর তিনি কাল ঠিক সাড়ে আটটার সময় আসতে স্বীকার ক'রে সেই কথা নোটবুকে লিখে নিলেন। একবার মনে হয়েছিল, জিজ্ঞাসা করি, ফি কত দিতে হবে। তখনই ভাবলাম, টাকা আগে, না প্রাণ আগে? যা চাইবে, তাই দেব। কি বল?"

এইবার গৃহিণীর মুখে হাসি ফুট্‌ল। তিনি বল্‌লেন, "আহা, বড়ো কষ্ট ত হয়েছে। ও রাধি, ও ঠাকুর, বাবুর হাত-মুখ ধোয়ার ঠিক ক'রে দেও। যাও ঠাকুর, এত রাত্তিরে আর জলখাবার দিয়ে কাজ নেই, শীগ্‌গির একেবারে খাবার ঠিক ক'রে দেও।"

যাক্, মিষ্ট কথায় পেট না জুড়োক, শরীর ত জুড়িয়ে গেল। আমি তখন সাহস পেয়ে বল্‌লাম—"হাঁ, ডাক্তার বটে বোস। দেখ দেখি কি পসার, রাত ১১টা পর্যন্ত রোগী দেখতে হয়। কাল ১টার আগে আসতে পারবে না বলে বস্‌ল। শেষে অনেক ক'রে ব'লে তবে সাড়ে ৮টা করলাম। এ ত আর আমাদের ললিত ডাক্তার নয়, এ একেবারে সাহেব, বাংলা কথা বড়ো একটা বলেই না। আর কি প্রকাণ্ড মোটর।"

গৃহিণী বল্‌লেন—"তা আর হবে না। অত বড়ো ডাক্তার যে পাওয়া গিয়েছে, এই আমার সৌভাগ্য।"

যাক্, এতগুলো মিথ্যা কথা একেবারে বৃথায় যায় নি, কাজ হয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম।

পরদিন ৮টা বাজতেই গৃহিণী মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—"ওগো, তুমি নীচের বৈঠকখানায় গিয়ে থাক। কি জানি, বলা ত যায় না। ডাক্তাব সাহেব যদি সাড়ে ৮টার আগেই এসে পড়েন।"

আমি বল্‌লাম—"তুমি বল কি। এ কি যে-সে ডাক্তার যে, আধঘন্টা আগে এসে ব'সে ব'সে গল্প করবে? ডাক্তার ঠিক সাড়ে ৮টায় আসবে, দু'মিনিট আগে আসবারও তার সময় হ'বে না।"

গৃহিণী উল্লসিত হয়ে বল্‌লেন—"তা কি আর আমি জানি নে, তবুও তুমি নীচে গিয়ে অপেক্ষাই কর না।"

আমি ত সবই ঠিক ক'রে এসেছি। তবুও গৃহিণীর আদেশে নীচে যেতে হ'ল।

পূর্বের ব্যবস্থা মতো ডাক্তার সাড়ে ৮টার সময় এলেন—একেবারে আঠারো আনা "সাহেব"। এসেই তাড়াতাড়ি রোগী দেখতে চল্‌লেন। মুখে একটাও বাংলা কথা নেই—খাঁটি বিলাতী বুলি।

গৃহিণী প্রস্তুতই ছিলেন। ডাক্তাব তখন বুক-পিঠ পরীক্ষা করলেন; কতক কথা বাংলাতেই রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কতক বা আমাকে ইংরাজিতে বল্‌লেন। আমি আবার সেই সব কথা তর্জমা ক'বে উত্তর শুনিয়ে দিলাম। ডাক্তাবের সে সব জেরার কথা আনুপূর্বিক ব'লে আর কাজ নেই। অবশেষে তিনি বল্‌লেন, "রোগ কঠিনই বটে। তবে আমি ঠিক এই রকম একটা রোগীকে মাসখানেক আগে ৩ দিনে আরাম করেছি—ছয় ডোজ ওষুধ দিয়ে। এঁকেও বোধ হয়, ৩ দিনেই সারাতে পারব। সেই রোগীর জন্য ব্যবস্থা লিখে দিলাম; তারা কোনো দোকানে সে ওষুধ পেলে না। শেষে কি করি, আমাকেই বেরুতে হ'ল। একটা 'সাহেবের' দোকানে এক শিশিমাত্র ওষুধ ছিল। দশ টাকা দিয়ে তাই নিয়ে এলাম। ছয় ডোজে ছয় ড্রপমাত্র খরচ হ'ল; বাকীটা আমার কাছেই আছে। আপনাকে বেলা সাড়ে ১০টায় একবার আমার বাড়ি যেতে হচ্ছে। আমি এখন বাড়ি ফিবতে পাবছি নে। আপনার ওষুধ দেওযার জন্যই সাড়ে ১০টায আমি পাঁচ মিনিটেব তবে বাড়ি ফিবব। ছয় দাগ ওষুধ দেব। রোজ সকালে-বিকালে এক দাগ খাওয়াতে হবে।আজ এ-বেলা ওষুধ এনেই এক দাগ খাইযে দেবেন। তাব পর পথ্যের কথা। এ রোগে পথ্যই হচ্ছে প্রধান। তা'ব একটু গোল হ'লেই সব মাটি হ'বে, বোগীকে বাঁচান দায় হবে। সুতরাং পথ্য দেওয়ার ভাব আপনাকে নিতে হবে; চাকব-দাসী বা আব কাবও উপব সে ভার দিলে আমি চিকিৎসাব দাযিত্ব নিতে পারব না। এ ৩ দিন আপনাকে আফিস কামাই কবতে হবে শুধু বোগীর পথ্যের ব্যবস্থার জন্য। পথ্য হচ্ছে, বেলা ১২টাব সময ছয আউন্স ডাবেব জল, বেলা ৩টাব সময় চার আউন্স ঘোল, আর রাত সাড়ে ৭টাব সময ছয় আউন্স ছানাব জল। মেজাব গ্লাসে মেপে খাওয়াতে হবে, একটু কম-বেশি হলেই বিপদ; কাজেই এ ভাব আপনাকে নিতে হবে, আর কারও উপর নির্ভব করবেন না। এই ঔষধ আর এই পথ্য আজ, কাল দু'দিন চল্‌বে। পবশু আমি এসে পুনবায় পরীক্ষা ক'রে যদি অন্য কোনো ব্যবস্থার দরকাব হয, তা' করব। আপনি পরশু সকালে খবব দিতে পাবেন ভালো, না হয় আমিই আসব। আমি আব বসতে পাবছি নে, অনেক জাযগায যেতে হবে।" এই বলে ডাক্তার যেই উঠবেন, আমি অমনিই তাঁকে ১৬টি টাকা দিলাম। তিনি টাকাব দিকে চেয়েই বল্‌লেন—"আমার এ সব 'কেসে' ফি ৩২ টাকা।"

আমি তখনই আব ১৬ টাকা দিযে বল্‌লাম—"আপনি ৩২ কেন, তাব ডবল চাইলেও দিতাম।"

ডাক্তার বল্‌লেন—"কোনো ভয় নেই, ৩ দিনেই রোগ সেবে যাবে।" এই বলে তিনি চলে গেলেন।

কি করি—আফিস কামাই করা ছাড়া অন্য কোনো উপায নেই। ১০টাব সময পাশেব বাড়ি থেকে আফিসে বড়ো 'সাহেবের' কাছে টেলিফোন ক'রে আমাব বিপদেব কথা জানালাম এবং আমাব সহকারী বিধু বাবুকে একবার আমার বাড়িতে পাঠাবাব জন্য অনুরোধ কবলাম। 'সাহেব' সব কথা শুনে দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং ৩ দিনের ছুটি মঞ্জুর করলেন।

সাড়ে ১০টার সময় গিয়ে ডাক্তারের কাছে থেকে ছয় দাগ ঔষধ নিযে এলাম। দাম দিতে চাইলাম, তিনি নিলেন না। যেমন যেমন ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই ভাবে ঔষধ ও পথ্য দেওযা গেল। কোনো রকমে দিনমান কেটে গেল, কিন্তু রাত আর কাটে না। ছয় আউন্স ডাবের জল, চার আউন্স ঘোল; আর ছয় আউন্স ছানার জল খেয়ে কি মানুষ দিন রাত কাটাতে পারে? গৃহিণী সন্ধ্যার পব থেকেই ক্ষুধার জ্বালায ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন। কিন্তু উপায় নেই, ডাক্তারেব নিষেধ।

কোনো রকমে রাত কেটে গেল। ভোরে উঠেই আমাকে পাঠালেন ডাক্তাবের কাছে। ব'লে দিলেন যে, কাল দু'দাগ ওষুধ খেয়েই অসুখ সেরে গেছে, ভয়ানক ক্ষুধা হয়েছে; পথ্যেব অন্য ব্যবস্থা করতেই হবে।

ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে সব কথা বলতে তিনি গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন—"ওষুধে যে ফল হয়েছে, তা' বেশ বুঝা যাচ্ছে। যিনি আহারের সময় পাতের কাছে বসেই অমনই উঠে পড়তেন, তাঁর যে যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, এ খুব শুভ লক্ষণ। কিন্তু তাই ব'লে আজই ঔষধ বা পথ্যের কোনো পরিবর্তন

করতে পারছি নে। আজ ঐ ব্যবস্থাই চলবে; কাল গিয়ে, পরীক্ষা করে দেখে, যা' ভালো হয় করা যাবে।"

আমি বল্‌লাম—"আপনি ত ব্যবস্থা ক'রে দিলেন, এ দিকে বাড়িতে যে আমাব তিষ্ঠান ভার হবে, তার উপায় কি?"

ডাক্তার হেসে বল্‌লেন—"এ পাপের শাস্তি আপনাকে ভুগতেই হবে।" কি করব, বাড়ি ফিরে এসে গৃহিণীকে সমস্ত কথা বল্‌লাম। তিনি ত রেগেই অস্থির। শুধু ডাবের জল আর ছানার জল খেয়ে কি মানুষ থাকতে পারে?

উপায় কি? চিকিৎসক যা' বলেছেন, তা প্রতিপালন করতেই হ'বে। সে দিন যে কি কষ্ট গেল, তা আর কহতব্য নয়।

পরদিন ঠিক সাড়ে ৮টার সময় ডাক্তার এলেন; পূর্ব্বের মতো পরীক্ষা করলেন; তাহার পর আমাকে বল্‌লেন—"বৈঠকখানায চলুন; বিশেষ বিবেচনা ক'রে ব্যবস্থা করতে হবে।"

বৈঠকখানায় এসে ডাক্তার বাবু বল্‌লেন—"বিজয় বাবু, আপনার গৃহিণীব আর অসুখ হবে না। এই দু'দিনেই তাঁর যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। তাঁকে আর ওষুধ খেতে হবে না। তিনিও আর পাতের কাছে বসেই উঠবেন না। কিন্তু, একটা গোল রইল। আপনার বোগ ত সারল না? আপনার গৃহিণী যদি মাসেব মধ্যে দু'বার এই ভাবে অসুস্থ হতেন, আর আপনাকে আফিস কামাই কবতে হ'ত, খবচের কথা না হয় না-ই ধবলাম, তা হ'লে এই ভাবে মাস ছয়েব মধ্যে আফিস কামাই করলে মনিবরা বিরক্ত হয়ে আপনাকে চাকবি থেকে তাড়িয়ে দিতেন, তাহ'লে হয় ত—আপনার রোগ সারত। কিন্তু, এই দু দিনে আপনাব গৃহিণী যে শিক্ষা পেয়েছেন, তা'তে তাঁর আব কোনো দিন এ'রকম অসুখ হবে না, আপনাকেও আফিস কামাই করে চাকবি হাবাতে হবে না; সুতরাং আপনার গুরু বোগ থেকেই গেল।"

আমি বল্‌লাম—"আপনি কি বলছেন? আমার ত কোনো বোগই নেই।"

ডাক্তার বাবু হেসে বল্‌লেন—"আপনি বোগের কথা জানবেন কি ক'রে? আমবা ডাক্তার, আমরা মানুষ দেখলেই, তার কি বোগ হয়েছে, তা বলতে পারি। আপনার রোগের ইংরাজি নাম তেমন নেই; তবে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে একটি বোগের কথা আছে, তার সমস্ত লক্ষণই আপনাতে বিদ্যমান। সে রোগেব নাম গৃহিণী বোগ। আপনার সেই রোগ হয়েছে; কিন্তু তাব চিকিৎসা পদ্ধতি আমি জানিনে, বুঝেছেন? ও কি, আজ বত্রিশও নয়—ষোলোও নয়—আজ আমি ফি নেব না। নমস্কার।"

বার্ষিক বসুমতী ১৩৩৩

স্বয়ম্বর

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

পাঁচ বৎসবের মাতৃহীনা কন্যা সুহাসিনীকে লইয়া শশাঙ্কশেখর যখন কাশীবাসী হইযাছিলেন, তখন তাঁহার মনে হয় নাই, ইহজন্মে আবার জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। গৃহলক্ষ্মীকে চিরবিদায় দিয়া শ্মশানবৈরাগ্যপ্রভাব ক্ষীণবল হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি বাটীর বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তার পর ছয় বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিল। তাহাকে সৎপাত্রস্থ করা এখন তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। আত্মীয়-বন্ধুরা ইতিপূর্ব্বে উপযাচক হইয়া চিঠিপত্রে তাঁর ক্ষুদ্র

বিষয়সম্পত্তিটুকুর ভার গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, কিন্তু জামাতা নির্ব্বাচন করিবার গুরুতর দায়িত্ব লইতে কেহ অগ্রসর হইলেন না। কাজেই দেশে প্রত্যাগমন ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না।

কাশীধামের বাঙালীটোলায় যাঁহারা বসবাস করেন, বঙ্গদেশীয় এবং গঙ্গাতীরবর্ত্তীদের সংখ্যা তন্মধ্যে প্রায় সমান। দেশে যেমন ভাষার প্রাদেশিকতা তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বতোমুখ মিলনের অন্তরায়স্বরূপ, এখানেও কতকটা সেইরূপ। কিন্তু তাঁহাদের বালক-বালিকাগণের ভিতর এই ভাষাগত ভেদ আদৌ দেখা যায় না। তাহারা সকলেই কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী ভদ্রসমাজে চলিত "দক্ষিণদেশী" ভাষায় কথা কয় এবং "বাঙাল" বা "রেঢ়ো" কথাবার্ত্তা শুনিলে সমভাবে আনন্দানুভব করে।

শশাঙ্কশেখর রায় পাবনা-জেলার লোক। ছয় বৎসর-কাল কাশীবাস করিয়াও কথাবার্ত্তার ভাষায় জন্মভূমির টানটুকু ভুলিতে পারেন নাই। কিন্তু কন্যা সুহাসিনী (চলিত নাম সুহাসি) দক্ষিণদেশী বাংলায় ও বেণারস-অঞ্চলের হিন্দীতে সমান অভ্যস্ত। বাপের বাঙালে বাক্যভঙ্গী ও উচ্চারণ তার হাস্যরস উদ্রিক্ত করিয়া থাকে। তার উপর সুহাসি একটু রঙ্গপ্রিয়, স্নানের ঘাটে সাঁতার-কাটা ও বাঙাল স্ত্রীপুরুষদের কথাবার্ত্তার হুবহু নকল-ব্যাপারে শিশুমহলে সে অদ্বিতীয়। মা-মরা মেয়ে, সহজেই বাপের বড় আদরের, কেহ তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। তার উপর অনন্যবালিকাসুলভ কতকগুলি গুণের জন্য সে সকলেরই প্রিয়পাত্রী। পাড়ায় কাহারও পীড়ার খবর পাইলে সুহাসি আত্মপরনির্ব্বিশেষে রোগীর শুশ্রূষা করিতে ছুটিয়া যায়। যত কাঁদুনে ও দুষ্ট ছেলেকে ঔষধ খাওয়াইবার কল-কৌশল তার মত আর কেহ জানে না। একাদশীর দিন মধ্যাহ্নে পাড়ার বিধবাদের রামায়ণ-মহাভারত পড়িয়া শুনান তার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য এবং যে বৃদ্ধারা একাকিনী বাস করেন, পরদিন প্রাতে পারণের পূর্ব্বে এই বালিকা তাঁহাদের একবার খোঁজখবর না লইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। তা ছাড়া ইহার ভিতর সুহাসি যেরূপ রাঁধিতে এবং সেলাই করিতে শিখিয়াছে, সচরাচর যুবতীদের পক্ষে তাহা শ্লাঘার কথা। তবে একলাটি ঘুটিং খেলিতে বসিলে তার ক্ষুধাতৃষ্ণা অথবা স্থানকালজ্ঞান বড় থাকে না। কোন ব্রাহ্মণগৃহে ভোজের উদ্যোগ হইলে পল্লীর ঠাকুরাণীরা অতর্কিতে সুহাসির সন্ধানে বাহির হন এবং তাহার দেখা পাইলে ঘুটিং কাড়িয়া লইয়া উৎসবগৃহে ধরিয়া আনেন। তার পর কাপড় ছাড়াইয়া তার কোমরে অঞ্চল জড়াইয়া দিতে পারিলেই তাঁরা নিশ্চিন্ত,—সমস্তদিন সুহাসি রন্ধনে বা পরিবেষণে তন্ময় থাকিবে। হাতের কাজ ফেলিয়া পলাইবে, সে তেমন মেয়ে নহে।

২

শশাঙ্কশেখর গৃহে ফিরিবার সকল বন্দোবস্ত করিয়াছেন, এমন-সময় খবর পাইলেন, তাঁর শ্বশুরকুলের দূর-জ্ঞাতি ভবানীচরণবাবু সপরিবারে তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছেন। ভবানীচরণের একটি বিবাহযোগ্য ছেলে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়ে এবং সে-ও সঙ্গে আসিতেছে জানিয়া, রায়মহাশয় একটু আশ্বস্ত হইলেন। নিতান্ত কর্ত্তব্যানুরোধেই তিনি দেশে ফিরিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন; কিন্তু আসল কথা, শূন্য গৃহমন্দিরে পুনঃপ্রবেশের চিন্তাও তাঁহার অসহনীয়। যাহা হউক, ফাল্গুনমাসে গৃহযাত্রার যে দিন স্থির হইয়াছিল, তাহা বদলাইয়া গেল।

ভবানীচরণবাবু দ্বিতীয়পক্ষের সংসার করিয়া দুইটি পুত্র লাভ করিয়াছেন। বড় ছেলেটির বিবাহে অলঙ্কার ও নগদ টাকায় বেশ দু পয়সা তাঁর লাভ হইলেও, পুত্রবধূটি তেমন মনের মত হয় নাই। সেজন্য যখন-তখন তাঁহাকে গৃহিণীর গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। শশাঙ্কশেখরের সঙ্গে বহুকাল পূর্ব্বে দুই-একবার তাঁহার দেখা হইয়াছিল, দেশে থাকিতে সুহাসির সৌন্দর্য্যখ্যাতির কথা শুনিয়াছিলেন। কাশীধামে পৌঁছিয়া মেয়েটিকে দেখিয়া করণীয় ঘরে ছেলের বিবাহ দিতে তাঁর খুব ইচ্ছা হইল। কিন্তু মেয়েটির সরলহাস্যপ্রদীপ্ত সুলক্ষণা শ্রীতে একটু খুঁৎ ছিল—রং মেমের মত অমন ধবল নহে। সেইজন্য

স্বয়ং গৃহিণী কন্যাদর্শন করিয়া মতামত না দিলে সহসা তিনি রায়মহাশয়কে বাক্যদান করিতে সাহস করিলেন না।

এদিকে শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ওরফে শ্রীমতী ইচ্ছাময়ী দুইদিনের ভিতর বাঙালীটোলার মহিলাবৃন্দকে আপনার রূপ ও গহনার ছটায় এবং শ্বশুর বিশেষত পিতৃকুলের ধনগৌরব-প্রসঙ্গে একেবারে চমকিত করিয়া তুলিলেন। ইহাতে চৌধুরাণী বলিয়া তাঁহার যে নামডাক রটিয়া গেল, বালক-বালিকা-মহলেও তাহা অজ্ঞাত রহিল না। সুহাসিকে দুইতিনবার দেখিয়া তিনি তাহার পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পিতার নিষেধবশত বালিকা তাঁহার সম্মুখে বড় আসিত না, দূরে থাকিয়া এবং অন্য সূত্রে শুনিয়া শুনিয়া সে তাঁর ভাবভঙ্গী ও গল্পগুজবের আখ্যানবস্তু যথাসাধ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। ইহার ফলে বালক-বালিকা-মহলে দিনকতক চৌধুরাণীকে লক্ষ্য করিয়া নূতন রকমের খেলা ও আনন্দের সৃষ্টি হইল এবং বলা বাহুল্য, দুষ্ট মেয়ে সুহাসি তাঁহাকে যেমন নকল করিতে পারিত, আর কেহ তেমন নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে চৌধুরীমহাশয়দের আগমনের ১০।১২ দিন পরে দশাশ্বমেধ-ঘাটে সমবেত স্নানযাত্রী ছেলেমেয়েদের ভিতর সুহাসি যখন চৌধুরাণীর অভিনয় পূর্ণমাত্রায় করিয়া সকলকে হাসাইয়া হাসাইয়া পাগল করিতেছিল, স্বয়ং ইচ্ছাময়ী স্নানার্থ সদলবলে সেখানে উপস্থিত হইয়া স্বকর্ণে তাহার কতক-কতক শুনিলেন। স্বামীর দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি যাহাকে পুত্রবধূ করিবেন ভাবিতেছিলেন, তাহার মুখে নিজের এইরূপ ব্যাখ্যান শুনিয়া তিনি রোষে-অভিমানে জ্বলিয়া গেলেন। তার পর নানা ওছিলায় প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে প্রকাশ্য কলহ করিয়া স্বামীর দীর্ঘকাল কাশীবাসের সঙ্কল্প উড়াইয়া দিলেন। কাজেই পক্ষমধ্যে পত্নীবৎসল ভবানীচরণকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। ছেলে ষোড়শীচরণেব সঙ্গে সুহাসির বিবাহের কথা তিনি আর গৃহিণীর কাছে পাড়িতে পারিলেন না।

৩

এই সম্বন্ধটির উপর রায়মহাশয় পূর্ণমাত্রায় নির্ভর করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন জবাব না দিয়া চৌধুরীমহাশয় অকস্মাৎ অন্তর্হিত হওয়ায় তিনি বুঝিলেন, বিবাহ ঘটিবার নহে। ভিতরের কথা কিছু জানিতে না পারায় তিনি বড় ম্রিয়মাণ হইলেন।

চৌধুরীমহাশয়দের কাশীত্যাগের সপ্তাহখানেক পরে ডাকযোগে নূতন একটি সম্বন্ধ আপনা-আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল। পাত্রের পিতা অনেকদিন পাবনা জেলায় ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টারি করিয়া পেন্‌শন্ লাভ করিয়াছেন এবং তাঁর পুত্রটি রসায়ন-বিজ্ঞানে এম্‌-এ. পাস্ করিয়া কোনরূপ স্বাধীন জীবিকা-অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন। পিতা লিখিয়াছেন,—"বলা বাহুল্য, আমার পুত্র রসায়নশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াই নিশ্চিন্ত নহে, অন্যান্য বিজ্ঞানেও তাহার দৃষ্টি আছে। সেকালের ইংরেজীনবিশ আমরা, সকলই যুক্তির চক্ষে দেখিতাম; কিন্তু আমার পুত্র গিরিজা সম্ভব-অসম্ভব সকল বিষয়েই যেরূপ গবেষণার সহিত অনুবদ্ধ করিয়াছে, তাহাকে বিজ্ঞানই বলুন, কি ভক্তিতত্ত্বই বলুন,—কবিবর সেক্সপীয়রের সেই চরণ-দুটি মনে করিয়া বলিতে হয়, 'যে নামেই ডাক, অন্য নামে গোলাপের সুবাস সমান।' এই সকল মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া সে স্বাধীন জীবিকার পথ খুলিতে চাহে। কিন্তু তাহাতে মূলধনের দরকার। আমার তত সঞ্চয় নাই। শুনিলাম, মহাশয়ের কন্যাটিমাত্র সম্বল এবং বিষয়সম্পত্তি জামাতারই প্রাপ্য। সেইজন্য ছেলেটি মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমিও কাশীবাসী হইব, মনে করিয়াছি।"

"পুনশ্চ।—মেয়েটির জন্মপত্রিকার নকল ও দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ফেরৎ ডাকে পাঠাইতে পারিবেন কি? আমার পুত্রটি একটু-একটু ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা করিতেছে—আশ্চর্য্য তাহার মেধা। মহাশয় একটু সত্বর হইবেন। নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতেছে।"

শশাঙ্কশেখর এরূপ গুণবান পাত্রকে হাতছাড়া করা কর্ত্তব্য বোধ করিলেন না। ফেরৎ ডাকে

রেজেষ্টারি চিঠিতে তিনি কন্যার জন্মপত্রিকা প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন, ভাবী-বৈবাহিক-মহাশয় যদি সপুত্র তাঁর মেয়েটিকে দেখিতে চান, কাশীধামে তাঁহাদের যাতায়াতের ব্যয়ভার তিনি বহন করিতে প্রস্তুত আছেন। যথাসময়ে উত্তর আসিল যে, বড় গরম পড়িয়া গিয়াছে, এ সময়ে তাঁহারা দেশ ছাড়িয়া যাইতে সাহস করেন না। অথচ মেয়েটিকে দেখারও একবার দরকার; পাত্রের মাতা সেজন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। রায়মহাশয়ের পক্ষে বৈশাখের শেষে কি জ্যৈষ্ঠের প্রথমে স্বদেশে আসা কি তেমন কষ্টকর হইবে? প্রত্যুত্তরে শশাঙ্কশেখর লিখিলেন, জ্যৈষ্ঠমাসে তিনি, যেমন করিয়াই হউক, দেশে ফিরিবেন।

৪

রায়মহাশয় যথাসময়ে জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করিয়া শুনিলেন, ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর বিধুভূষণবাবু কলিকাতায় কোন ধনিগৃহে পুত্রের সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। সত্যাসত্যনির্দ্ধারণ জন্য বিধুভূষণবাবুকে পত্র লিখিয়া সপ্তাহ পরে যে জবাব পাইলেন, তাহার অর্থ এইরূপ ঃ—"মহাশয়ের সংবাদদাতা ঠিক কথাই বলিয়াছেন। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ আপনার পৌছানর কথা ছিল, কিন্তু ১৭ই মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত যখন কোন খবর পাইলাম না, আমি ভাবিলাম কি, যে দুরপথ, মহাশয় হয় ত কোন সঙ্কটে পড়িয়াছেন। তাহা ছাড়া আপনার কন্যাটি এগারবছরে পড়িয়াছে, কিন্তু আমার পুত্র বলেন যে আর্য্যজাতি যে নবমবর্ষে গৌরীদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাই বিজ্ঞানসম্মত। কলিকাতার মেয়েটি সাড়ে দশ বৎসরের বটে, কিন্তু তথাপি ছয়-মাসের ছোট। মহাশয়কে অসুবিধায় পড়িতে দেখিয়া আমি এবং আমার পুত্র, উভয়েই বাস্তবিক বড় দুঃখিত, কিন্তু দুঃখপ্রকাশ ছাড়া আমরা আর কি করিতে পারি?" শশাঙ্কশেখর অবশ্য বুঝিতে পারিলেন, ভিতরের কথাটা কি? খাস্ বাংলায় নিত্য নূতন অনেক পরিবর্ত্তনের কথা কাশীধামে থাকিয়া তিনি শুনিতে পাইতেছিলেন, কিন্তু ছয় বছরের ভিতর বঙ্গীয় সমাজবন্ধন এতটা শিথিল হইয়াছে, ইহা তিনি জানিতেন না।

যাহা হউক, তাঁর বাড়ী আসার পর কন্যার সৌন্দর্য্যখ্যাতিগুণে অথবা তদীয় পৈতৃক বিষয়টুকুর লোভে রোজ রোজ নূতন নূতন সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। তাহাতে আর কিছু না হউক, রায়মহাশয়ের গৃহে মিষ্টান্ন-খরচটা বড়ই বাড়িয়া গেল। আর কখন্ কে দেখিতে আসিবে, এইরূপ অনিশ্চয়তায় সুহাসিকে সর্ব্বদা প্রায় সাজিয়া গুজিয়া থাকিতে হইত। কাজেই তাহার ঘুটিং খেলা এবং দৌড়াদৌড়ি কি সাঁতার-কাটায় পূর্ব্বের সে স্বাচ্ছন্দ্য রহিল না। সুহাসি তিক্ত-বিরক্ত হইয়া বাপের কাছে খোট ধরিল, একবার সে মামার বাড়ী যাইবে। কেন না, তাহার সন্নিহিত কালিকাপুর-গ্রামে রথের বড় ধুম, ইহা সকলের মুখেই শুনা যাইতেছিল।

৫

বাস্তবিক কালিকাপুরে রথের বড় ধুম। পদ্মা-যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রকাণ্ড বট এবং অশ্বত্থ বৃক্ষরাজির চারিদিকে ক্রোশব্যাপী শ্যামল ক্ষেত্র 'রথতলা' নামে পরিচিত। আষাঢের প্রথমে আকাশে নবীন জলদরাজি সঞ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি-বৎসর এখানে উৎসব আরম্ভ হইয়া থাকে। বেশীর ভাগ এবার দুর্গাপুরের জমিদার ভবানীচরণবাবু নীলামে কালিকাপুরের দশ-আনা খরিদ করায়, এইখানেই পুণ্যাহ করিবেন, স্থির করিয়াছেন। যমুনার অনতিদূরে নবীন জমিদারের নূতন কাছারি বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। ধুমধামের সীমা নাই,—ঘোড়দৌড় ও আতসবাজির ব্যবস্থা হইয়াছে, কলিকাতা হইতে থিয়েটার আসিবে, জনরব এইরূপ।

দুই দিন হইল, শশাঙ্কশেখর কন্যাটিকে লইয়া শ্বশুরালয় দুর্গাপুরে আসিয়াছেন। শ্বশুরের ভিটা এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ছাড়া সেখানে আকর্ষণের বড়-কিছু লৌকিক-চক্ষে ছিল না, কিন্তু তাহা হইলে

কি হয়, তাহার প্রত্যেক ধূলিকণায় তাঁহার সাধ্বী পত্নীর স্মৃতিমোহ জড়িত ছিল। অন্তিমশয্যায় শয়ানা গৃহিণীর অনুরোধে দুর্গাপুরের যমুনা-তীরে স্বহস্তে চিতারচনা করিয়া প্রেমময়ীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের সকল সুখশান্তি চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছিলেন। আজ প্রায় ছয় বৎসর পরে প্রীতির সে সমাধি-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া শোকে তিনি মুহ্যমান হইলেন।

রথের দিন প্রভাতে ঘনকৃষ্ণ মেঘজালে পদ্মা-যমুনার নতুন জলধারা ছায়ান্ধকাব-পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। রথতলায় জনস্রোতের বিরাম-বিশ্রাম নাই এবং তাহার কল্লোল তটপ্লাবিসমুদ্রগর্জ্জনবৎ বহুদূর পর্য্যন্ত প্রহৃত হইতেছিল। শুনিয়া সুহাসি বথ দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। শশাঙ্কশেখরেব শরীর ও মন ভাল ছিল না, তিনি শ্যালক উমাচরণেব উপর ছেলেমেয়েদের রথ দেখাইবার ভার দিয়া নির্জ্জনে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে চিত্ত সমাহিত করিলেন।

কিন্তু সুহাসিরা কালিকাপুবে চলিয়া গেলে রায়মহাশয় কিছু বিমনা হইলেন। সর্ব্বদা কন্যাকে কাছে-কাছে রাখিয়া তিনি তাহাকে আর ক্ষণমাত্রের জন্য চক্ষেব আড় করিতে পাবিতেন না। সুহাসি রথতলায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তিনি স্নানোদ্দেশে বাহির হইলেন এবং যমুনাতটে সহধর্ম্মিণীর চিতাস্থানে উপবেশন কবিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন কবিতে লাগিলেন।

এদিকে মাতুল উমাচরণ রথতলায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে সুহাসিকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সে ইহাবই ভিতর বিস্তব ভেঁপু ও খাবাব কিনিয়া মামাতো ভাই বোনদের মধ্যে বিতবণপূর্ব্বক অবশিষ্ট গরিবদুঃখীদের ছেলেদের দিবাব জন্য চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কাজেই মাতুলকে গলদঘর্ম্ম হইয়া চঞ্চলা ভাগিনেয়ীব অনুসবণ কবিতে হইতেছিল। মণিহাবীব দোকানগুলোর দিকেই সুহাসিব বেশী ঝোঁক। কেন না, পাড়াগাঁয়ের বধূ ও কন্যারা যেরূপে মুখ বিকট করিয়া বেলওয়ারি চুড়ি ও শাঁখা পরিবাব যন্ত্রণা সহ্য কবিতেছিল, তেমন দৃশ্য ইতিপূর্ব্বে সে আর কখন দেখে নাই। দেখিযা দেখিযা তাহাব ভাবি হাসি পাইতেছিল এবং কাশীতে ফিরিয়া কেমন তাহার খেলার সাথীদের সে অভিনয় দেখাইবে ভাবিতে তাহাব আনন্দেব সীমা ছিল না।

বেলা প্রহর উত্তীর্ণ হইলে পুবাতন জমিদাবগৃহ হইতে লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ মহাধুমধামে আনীত হইয়া রথে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিছুক্ষণ পবে বথটানা সুরু হইল। "জয় জগন্নাথ" রবে আকাশ-প্রান্তর-নদীবক্ষ কম্পিত করিয়া সহস্র সহস্র নবনারী রথরশ্মি আকর্ষণ কবিযা চলিল। ঘোর ঘর্ঘর-ধ্বনি জাগ্রত করিয়া রথচক্রসকল আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কিন্তু সহস্রহস্তপরিমিত স্থান অতিক্রম করিতে না করিতে পুলিসের আদেশে রথেব গতি বন্ধ হইয়া গেল। সুহাসি মাতুলেব নিষেধ অগ্রাহ্য কবিয়া রথটানায় যোগ দিয়াছিল। সহসা রথচলা বন্ধ হওয়ায় তাহার ক্ষোভের সীমা রহিল না। কনেষ্টবলদের লক্ষ্য করিয়া নির্ভয়ে সে বলিয়া উঠিল, "মব, পোড়াবমুখো মিন্সেরা!"

মধ্যাহ্নে সহসা পশ্চিম গগনপ্রান্ত আচ্ছাদিত করিয়া কালো মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড় দেখা দিল। রথের দিনে বৃষ্টিপাতের জন্য সচবাচর লোকে প্রস্তুত থাকে, কিন্তু এরূপ প্রবল বাত্যা বড় দেখা যায না। জনস্রোত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রামাভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

উমাচরণ ছোট একখানি পান্সী করিযা সুহাসিদের রথ দেখাইতে আনিয়াছিলেন। ক্ষুদ্রনদী যমুনার তীরে অশ্বত্থবটের ছায়াস্নিগ্ধ একটু নির্জ্জন স্থান ছিল, ঝড় ও বৃষ্টির প্রাক্‌কালে নিরাপদ জানিয়া সেইখানে তাঁহারা নৌকা লইয়া গেলেন।

ঝড় উঠিবার সময় কেহ লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই যে, পদ্মাগর্ভে একখানি সওয়ারি নৌকা বেগে রথতলার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। মাঝিমাল্লারা প্রাণপণ যত্নে নৌকা যমুনার মোহনায় আনিয়া ফেলিয়াছে, এমন-সময় একটা দম্‌কা বাতাস আসিয়া উহাকে একেবারে উলটাইয়া দিল। মন্দীভূত জনস্রোতের ভিতর সকলেই আপন-আপন প্রাণ লইয়া ব্যস্ত, বিপন্ন নৌযাত্রীদের উদ্ধার করিবার কেহ ছিল না।

৬

শশাঙ্কশেখর রায় প্রায় সমস্তদিন প্রাণাধিকা কন্যাকে না দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। কিছুতে মনঃস্থির করিতে না পারিয়া ঝড়বৃষ্টির পূর্ব্বেই পদব্রজে তিনি রথতলাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং বিপন্ন নৌকাখানি জলমগ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা-যমুনার সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলেন।

তখন পদ্মার ভয়ঙ্কর অবস্থা। রুষিয়া, ফুলিয়া, গর্জ্জিয়া রাক্ষসীর মত সে ঝড়ের সহিত যুঝিতেছিল। সেই অবস্থায় রায়মহাশয় সহসা দেখিলেন, তাঁহার সুহাসির মত কেহ সন্তরণ করিয়া যমুনার তীবাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে—পশ্চাতে অদূরে অর্দ্ধনিমজ্জিত মনুষ্যদেহ, কষ্টে সে বালিকার অঞ্চল ধরিয়া ভাসিয়া আসিতেছে।

শশাঙ্কশেখর নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। ইহা কি সম্ভব যে, উমাচরণ বালক-বালিকা সহ জলমগ্ন হইয়াছে? এই সময়ে ঝড়বৃষ্টির বেগ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইতেছিল। তিনি ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, তাঁহার সন্তরণপটু কন্যা নিমজ্জনোম্মুখ মূর্ত্তিমৎস্কন্দবীরতুল্য যুবকের প্রাণরক্ষা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সুহাসি আর্দ্রকেশ ও আর্দ্রবস্ত্রে পিতার চক্ষে মূর্ত্তিমতী উমারাণীর মত প্রতিভাত হইতেছিল। বাপকে দেখিয়া প্রথমত সে একটু অপ্রতিভ হইল। তার পর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "বাবা, মামাকে লুকিয়ে নৌকোর জান্‌লা দিয়ে কেমন পালিয়েচি দেখ, এখনও হয় ত তিনি জান্‌তে পারেন নি। তা ভাল করিচি কি না, তুমিই বল ত বাবা। দেখলুম একখানা নৌকো ডুবে গেল, কিন্তু সেজন্যে কারু মায়া হলো না,—মামারও নয়। একটুর জন্যে বামুনের ছেলেটি মাবা যেতে বসেছিল আর কি।" শশাঙ্কশেখর দেখিলেন, যুবকের গলদেশে উপবীত জড়িত। সস্নেহে সজলনেত্রে কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তিনি যুবকটিকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। চিনিতে দেবি হইল না। পিতার কণ্ঠে "কে ও ষোড়শীচরণ" উচ্চারিত হইবামাত্র সুহাসি ছুটিয়া পলাইল। তখন তার ভারি লজ্জা হইয়াছিল। কেন না, চৌধুরাণীর কাশীত্যাগের পর এই নাম অনেকবার সে শুনিযাছিল।

ষোড়শীচরণ সন্তরণে একান্ত অপটু নহে। কিন্তু বালিকার অঞ্চলসাহায্য ব্যতীত পদ্মাগর্ভ হইতে সেদিন তার বাঁচিয়া আসার সম্ভাবনা ছিল না। কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া সে শশাঙ্কশেখরেব পদধূলি গ্রহণ করিল। প্রাণদাত্রী বালিকার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিতে পারিল না।

রায়মহাশয় ষোড়শীচরণকে কাছারিবাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিলেন। পুত্রের প্রাণরক্ষাব খবর পাইয়া ভবানীচরণবাবু সস্ত্রীক বাটী হইতে ছুটিয়া আসিলেন। সকল শুনিয়া তাঁহারা শশাঙ্কশেখরের নিকট উপস্থিত হইলেন। চৌধুরাণী মহাশয়ার আদর চুম্বনে সুহাসির কোমল গণ্ড লাল হইয়া উঠিল। হাসিয়া কাঁদিয়া সেই পুণ্যাহ বাসরেই তিনি সুহাসির সঙ্গে ষোড়শীচরণের বিবাহ দিবেন, স্থির করিলেন।

তার পর ষোড়শীচরণ চিরদিনের মত সুহাসিনীর আঁচলে বাঁধা পড়িয়াছেন। শাশুড়ীর বড় আদব এবং স্নেহের বউ হইলেও, সুহাসি মুখ তুলিয়া কখন তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে পারে না। "চৌধুরাণীব বউ" বলিলে তার লজ্জা এবং অভিমানের সীমা থাকে না।

"বঙ্গদর্শন" ঃ ১৩০৯ ২য় বর্ষ—ভাদ্র

মা য়া বি নী

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঈপ্সিত, চিরদয়িত, এস হে। নয়নের মণি, প্রাণের উত্তমার্ধ, কোথায় তুমি। আমি তোমার পথ চাহিয়া, কোথায় তুমি। তুমি শুনিলে না, বুঝিলে না, আমার দিকে চাহিলে না—দেখ, আমি তোমার জন্য অস্থিরচিত্ত হইয়া তোমার পথ চাহিয়া আছি। কখনো তোমায় সকল কথা বলিতে পারি নাই, আজ বলিব। শুন—

এ কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম? কাহার কণ্ঠস্বর আমার শ্রবণকুহরে বাজিতেছিল? কি এ প্রহেলিকা?

স্বপ্নের অপেক্ষা সত্য আরও প্রহেলিকাময়। আকাশে শুক্ল চতুর্দশীর চন্দ্র উঠিয়াছে, পর্বতের উপর দেবদারুবৃক্ষমূলে আমি শয়ন করিয়া রহিয়াছি। পর্বততলে বিশাল হ্রদ বায়ুবিহনে নিস্তরঙ্গ; স্থির নির্মল জলে শত শত চন্দ্রবিম্ব প্রতিবিম্বিত হইতেছে। জলে কুমুদ, কহ্লার, অগণিত লোহিত পদ্ম মুদিত, প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে—চারিদিকে নয়নাভিরাম অতি মনোহর অতুলনীয় দৃশ্য, ঘন নীল মহীরুহ-সমাকীর্ণ, তুঙ্গশিখর পর্বতশ্রেণী, নিম্নে সেই স্নিগ্ধ, শীতল, দুরবগাহ সলিলরাশি, পার্শ্বে গাঢ় হরিদ্বর্ণ, বহুদূর-বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র—সর্বোপরি ফুল্ল জ্যোৎস্নার মায়াময়ী ছায়া। এমন দৃশ্য কখনো দেখি নাই। অতি গোপনে, এই দুস্তীর্ণ পর্বতমালার অন্তরালে প্রকৃতি কৃপণের মতো এত ঐশ্বর্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। যে দিকে চাহিয়া দেখি, সকলই নূতন, সকলই অলৌকিক। এমন পর্বত, নদী, হ্রদ কোথাও দেখি নাই; এমন বৃক্ষ, এমন ফুল কোথাও দেখি নাই; এমন শস্য, এমন তৃণও কোথাও দেখি নাই। এ কোন মায়াপুরে উপনীত হইলাম? শীত এ পর্যন্ত আগত হয় নাই। শীতকালে তুষারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়, তখন এ স্থানে বাস অসম্ভব। অপরাহ্ণে এই স্থানে উপনীত হইয়া পথশ্রান্তি অপনোদন করিবার মানসে এই মনোহর বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছিলাম। শয়ন করিয়া নিদ্রিত হই। নিদ্রাভঙ্গে দেখি, রাত্রি হইয়াছে। অপহৃত দিবালোকের পরিবর্তে জ্যোৎস্নালোকে প্রকৃতি সুষুপ্তির হাসি হাসিতেছে। আমি বিগতনিদ্রালস্যজড়িত চক্ষে সেই অপূর্ব-সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

স্বভাবতঃই সে স্থানে মনুষ্যসমাগম বিরল। এক্ষণে নিশাকালে চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। সহসা দূরাগত ক্ষীণ সংগীতধ্বনি শ্রবণে পশিল। ধ্বনি না প্রতিধ্বনি, না পূর্বশ্রুত গীতের স্মৃতিমাত্র? আবার দূর হইতে গীত শ্রুত হইল, কণ্ঠধ্বনি নিকটে আসিতে লাগিল। চারিদিকে চাহিয়া, কোথা হইতে সংগীতের শব্দ আসিতেছে, প্রথমে স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে দেখিলাম, দূর হইতে তরণী আসিতেছে। হ্রদের স্থির জলে দূরে ছায়া দেখা যাইতেছে। সেই তরণী হইতে সংগীতধ্বনি উঠিতেছে। আমি পর্বত হইতে হ্রদের কূলে অবতরণ করিতে লাগিলাম, তরণী নিকটে আসিতে লাগিল। দেখিলাম, অতি অপরূপসুন্দরী যুবতীগণ ক্ষেপণীহস্তে নৌকা চালিত করিতেছে, মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী বসিয়া গীত গাহিতেছে। তালে তালে ক্ষেপণী পড়িতেছে, তালে তালে চরণে নূপুর শিঞ্জিত হইতেছে, তালে তালে নৌকা চলিতেছে। এক পার্শ্বে এক তেজস্বী পুরুষ বসিয়া অর্ধমুদ্রিত নয়নে সেই রূপভঙ্গ, ক্ষেপণীনিক্ষেপ দর্শন করিতেছে ও আলস্য সহকারে সেই গীত শ্রবণ করিতেছে। পার্শ্বে কয়েকজন অনুচর। স্বর উঠিতেছে, পড়িতেছে, ক্ষেপণী উঠিতেছে, পড়িতেছে, কণ্ঠ কম্পিত হইতেছে, স্থির জলে এবং বায়ুতে যেন স্পন্দন-তরঙ্গ উঠিতেছে। জ্যোৎস্নায় ক্ষেপণীচ্যুত জলবিন্দু জ্বলিতেছে, যুবতীদিগের অঙ্গের অলংকার জ্যোৎস্নালোকে জ্বলিতেছে। নৌকা কখনো বামে কখনো দক্ষিণে যাইতেছে, কখনো ঘুরিতেছে, কখনো জলের উপর নৃত্য করিতেছে, আর সেই নিস্তব্ধ আকাশ

পরিপূরিত করিয়া, দূর পর্বতগুহা প্রতিধ্বনিত করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সংগীতধ্বনি উঠিতেছে।

এই ত কাব্যপরিচিত অপ্সরাপুরী। এই ত ইন্দ্রালয়। হয় ত চিরযৌবনসম্পন্না উর্বশী এবং রম্ভা এই জ্যোৎস্নালোকে মানসসরোবরের বক্ষে গান করিতেছে। হয় ত এই পুরুষ স্বয়ং ইন্দ্র কিংবা অর্জুনতুল্য অতিথি। বিস্ময়ের উপর বিস্ময় উদয় হইতে লাগিল। এমন নৈসর্গিক সৌন্দর্য কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যলোকে এমন রূপও ত কখনো দেখি নাই। কে বলে গন্ধর্বলোক পৌরাণিক উপন্যাসমাত্র? অপ্সরোলোক ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছি!

কৌতূহল-আগ্রহে আমি জলের তীরে দাঁড়াইয়াছিলাম। তরণী আসিয়া সেই স্থানে লাগিল। তরণীতে উপবিষ্ট সেই পুরুষ আমার দিকে কটাক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে?"

কয়েকজন অনুচর ও দাঁড়বাহিনী কয়েকটি রমণী নৌকা হইতে উঠিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

একজন অনুচর ব্যঙ্গস্বরে কর্কশভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?"

আমার পরিধানে গৈরিক বসন, মস্তকে দীর্ঘ রুক্ষ কেশ, এখনও জটা পড়ে নাই। কিছু সঙ্কুচিত, কিছু ভীত হইয়া বলিলাম, "আমি সাধু।" সাধু বলিতে সকল রকম বিরাগী সন্ন্যাসী বুঝায়।

অনুচরবর্গ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাদের দেখাদেখি স্ত্রীলোকেরাও হাসিয়া উঠিল। সংগীতশব্দ যেমন মধুর ও কোমল শুনাইতেছিল, হাস্যধ্বনি আর তেমন শুনাইল না। প্রথম প্রশ্নকর্তা বলিল, "সাধুর ভেকে অনেক চোর বেড়ায়। তোকে ত চোরের মতো দেখাইতেছে।" রমণীগণ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। নৌকায় বসিয়া পুরুষ সস্মিতমুখে রঙ্গ দেখিতেছিল।

আমি বিপদে পড়িলাম। ইহারা কে, কিছু জানি না। আমি সাধু না হই, নির্দোষ পথিক, আমাকে বিদ্রূপ করিয়া ইহাদের কি লাভ? পুরুষ ও স্ত্রীলোক মিলিয়া যেরূপ করিয়া আমাকে ঘিরিয়াছে, তাহাতে পলায়নও অসম্ভব। বলিলাম, "চোর হইলে কি আর এই পর্বতে বসিয়া থাকিতাম? আমি বিদেশী পথিক, এ স্থানে আজই আসিয়াছি। আমাকে তোমরা ত্যাগ কর, এরূপ করিয়া বিদ্রূপ করিও না।"

অনুচরগণ আমাকে আরও বিদ্রূপ করিতে লাগিল, রমণীগণ হাসিতে লাগিল। নৌকায় যে পুরুষ উপবেশন করিয়া ছিল, সে ডাকিয়া বলিল, "উহাকে নৌকায় লইয়া আইস।" অনুচরেরা বলপূর্বক আমাকে ধরিয়া নৌকায় তুলিল। রমণীগণ পূর্বের মতো ক্ষেপণী করিয়া নৌকা গভীর জলে লইয়া চলিল।

যে রমণী গীত গাহিতেছিল, সে আমার পার্শ্বে বসিল। আমার অঙ্গে তাহার অঙ্গস্পর্শ হইল। চারিদিকে অপর রমণীগণ ঘিরিয়া বসিল। রমণীব্যূহের মধ্যে আমি বন্দী হইলাম। সেই পুরুষ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। পুনরায় গীতধ্বনি উঠিল—আলস্য-লালসাপূর্ণ, কাতর প্রণয়সাধনার গীতি—কখন কণ্ঠ বাষ্পপূর্ণ হইয়া রোরুদ্যমান হইয়া ভঙ্গ হইয়া যায়, কখন তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মতো আসিয়া হৃদয়ে আঘাত করে, আবার করুণাকাতর রাগিণীতে হৃদয়ের মর্মস্থানে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে অলংকার-শিঞ্জন, হৃদয়ভেদী দীর্ঘ সুবর্ণশলাকার ন্যায় কটাক্ষ, অথবা কটাক্ষে বিদ্যুতের ক্ষণপ্রভা। থাকিয়া থাকিয়া রোমহর্ষণ অঙ্গস্পর্শ, কখন পার্শ্বে রমণীর করতালিধ্বনি, কখন নূপুরনিক্কণ, কখন ক্ষেপণীর পতনশব্দ, কখন জলের মৃদু মৃদু ভঙ্গরব।

রূপ এবং সংগীতের মোহ আমার চিত্ত হইতে তিরোহিত হইতেছিল। বিস্ময়, বিরক্তি এবং আশঙ্কা হৃদয়কে অধিকার করিতেছিল। এ পুরুষ কে? এই রমণীগণ কেন আমাকে বেষ্টন করিয়াছে? আমি রিক্তহস্ত উদাসীন, আমাকে লইয়া ইহারা কি করিবে? কোথায় আমাকে লইয়া যাইতেছে? কিছু স্থির করিতে না পারিয়া পূর্বের ন্যায় নীরব রহিলাম। কিছু দূর গিয়া হ্রদের তীরে নৌকা লাগিল। তীরে অট্টালিকা। নৌকা ত্যাগ করিয়া সকলে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। আমি

অন্যত্র গমন করিবার মানসে অন্য দিকে গমন করিতে উদ্যত হইলাম। অমনি একটি যুবতী আমার হস্ত ধারণ করিল, বলিল "কোথা যাও?"

আমি বলিলাম, "আমি বিরাগী, এ অট্টালিকায় প্রবেশ করিবার প্রয়োজন কি? আমি ভিক্ষা করিয়া দিনাতিপাত করি। তোমাদের মঙ্গল হউক, আমার হস্ত ত্যাগ কর, আমি অন্যত্র গমন করি।"

সেই যুবাপুরুষ এতক্ষণে প্রথমবার কথা কহিল, মধুর অথচ ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "বিরাগীর পক্ষে অট্টালিকাও যেমন, কুটীরও তদ্রূপ। যেখানে তোমাকে লইয়া যাইবে, সেইখানে গমন করিবে।"

আর এক জন যুবতী দ্বিতীয় হস্ত ধারণ করিল। দেখিলাম, বলপ্রকাশ বৃথা। যদি বলপূর্বক রমণীদিগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ কবি, তাহা হইলে অনুচরগণ আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। আমি বল প্রকাশ না করিয়া রমণীদিগেব সহিত চলিলাম।

অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া দেখি, প্রশস্ত কক্ষসমূহ বহুবিধ বহুমূল্য উপকরণে সজ্জিত। উজ্জ্বল আলোকে গৃহ আলোকিত হইয়াছে। রমণীগণ আমাকে লইয়া গিয়া একটি মনোহর কক্ষে উপবেশন করাইল। সে স্থানে সেই পুরুষ এবং তাহার অনুচরদিগকে দেখিতে পাইলাম না; কেবল কয়েকটি রমণী। তাহারা অত্যন্ত সমাদবপূর্বক আমাকে অভ্যর্থনা করিল। এক জন আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া পার্শ্বের গৃহে হস্তমুখ প্রক্ষালনের নিমিত্ত সুবাসিত জল দেখাইয়া দিল। হস্তমুখাদি ধৌত কবিয়া আমি সেই স্নানাগারের বহির্দ্বার মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলাম। দেখি, দ্বার বাহির হইতে বন্ধ। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি, দুইটি বমণী অন্য দ্বাবদেশে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে, আমাকে ফিরিতে দেখিয়া এক জন কহিল, "তুমি পথ ভুলিয়া গিয়াছ? ও দিকে পথ নয়, এ দিকে আইস।" আমি লজ্জিত হইয়া পূর্বেব গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

গৃহেব মধ্যস্থলে রৌপ্য-থালায় নানাবিধ উৎকৃষ্ট আহার্য সামগ্রী সজ্জিত রহিয়াছে। বমণীগণ আমাকে আহার করিতে অনুরোধ করিল। সমস্ত দিন অনশনে গিয়াছিল, আহাবের জন্য পীড়াপীড়ির প্রয়োজন হইল না। আহারান্তে জল দেখিতে না পাইয়া পানীয় চাহিলাম। একটি রমণী সুরাপাত্র আনযন করিয়া, আমার হস্তে দিল। আমি বিস্মিত হইয়া পাত্র তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলাম, জিজ্ঞাসা কবিলাম, "আমি জল চাহিতেছি, আমাকে সুরা দিলে কেন? সুবা আমাব পানীয় নহে, আমাকে কিঞ্চিৎ শীতল জল দাও।"

রমণী বলিল, "সুবা এবং জল তোমাব পক্ষে তুল্য। যাহা পাইবে, তাহাই পান করিবে।"

আমি কহিলাম, "না, অমৃত এবং গবল তুল্য নহে। আমি কখনও সুবাপান করিব না।"

"তবে শববৎ আনিযা দিই?"

"শুধু জল পাইলেই আমি চবিতার্থ হইব।"

দ্বিতীযবাব গিয়া বমণী শববৎ লইয়া আসিল, জল আনিল না। অগত্যা আমি তাহাই পান করিয়া আচমন কবিলাম। শববৎ মিষ্টি, সুগন্ধ বিশিষ্ট, অত্যন্ত উপাদেয, কিন্তু কিসেব গন্ধ, তাহা স্থিব কবিতে পাবিলাম না। আহারান্তে দুইটি রমণী আমাকে একটি রম্য শয়নগৃহে লইয়া গেল। প্রাসাদের ভিতবে প্রবেশ কবিয়া পর্যন্ত কোনো পুরুষ দেখিতে পাই নাই। ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম; কিন্তু কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই, প্রবৃত্তিও হইতেছিল না। শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া রমণীদ্বয় পর্যঙ্কে আমার জন্য শয্যা রচনা করিয়া দিল। এক জন জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু প্রয়োজন আছে?"

আমি বলিলাম, "না, এখন তোমরা যাও, আমি শয়ন করি।"

দ্বিতীয় রমণী কহিল, "পদ-সংবাহন করিব? তাহা হইলে উত্তম নিদ্রা আসিবে।"

অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া কহিলাম, "না না, কিছু করিতে হইবে না, তোমরা আপন আপন স্থানে গমন কর।"

রমণীদ্বয় বাহিরে গমন করিলে অত্যন্ত সাবধানে দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমি শয়ন করিলাম।

অলক্ষ্যে বাদ্যধ্বনি উঠিল, অতি মৃদু মৃদু, ধীরে ধীরে কোথায় বাদ্য বাজিতে লাগিল। ধীরে ধীরে আমার দেহে যেন মাদকতার মতো সেই শব্দ প্রবেশ করিতে লাগিল। তৎপরে যে অবস্থা উপস্থিত হইল, তাহা নিদ্রা কি তন্দ্রা কিংবা জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্নমাত্র, তাহা এ পর্যন্ত নিরূপণ করিতে পারি নাই। সেই শ্রুতিমধুর শব্দ যেন ক্রমে দূরে যাইতে লাগিল, অবশেষে মিলাইয়া গেল। সহসা চক্ষে যেন তীব্র আলোক পতিত হইল, চক্ষু উন্মীলিত হইল। দেখি, শয়নগৃহ মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রখর আলোকে ঝলসিত হইতেছে। সে আলোকে চক্ষে সহ্য হইল না, চক্ষু মুদিত করিলাম। আবার চক্ষু খুলিলাম—দেখিলাম, আলোকের তেজ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে। ক্রমে জ্যোতি কোমলতর হইতে লাগিল, কভু নীল, কভু লোহিত, কভু হরিদ্রাবর্ণ—আলোক নানা বর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। অকস্মাৎ সেই আলোকে দুইটি অপ্সরাতুল্য কিশোরী নৃত্য করিতে করিতে আমার সম্মুখে উপনীত হইল। পদক্ষেপ এত লঘু যে, ধরণীতে পড়িতেছে কিনা, বুঝিতে পারা যায় না। তাহারা কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল, এরূপ প্রশ্ন আমার মনে একবারও উদয় হইল না। নর্তকীদ্বয় সহসা অদৃশ্য হইল। নির্ঝর-শব্দ শুনিতে পাইলাম, কোথায় যেন ঝরঝর রবে অবিশ্রান্ত জল পড়িতেছে। বিহঙ্গ-কাকলী যেন কাননে শ্রুত হইল। কত পুষ্পের গন্ধ বহিয়া আসিতে লাগিল, কত রূপের ছবি চক্ষের সম্মুখে আসিল, কত আনন্দ-অভিনয় হৃদয়কে পুলকিত করিতে লাগিল। সহসা ঝটিকার সম্মুখে প্রদীপের ন্যায় সমস্ত নির্বাপিত হইয়া গেল। অন্ধকার আমি স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। সে অবস্থাও জাগরণের অথবা সুষুপ্তির, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

গভীর রাত্রে কিংবা রাত্রিশেষে অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। এবার একেবারে সংশয়-রহিত হইলাম। দেখিলাম, মাণিক্যখচিত সুবর্ণপ্রদীপ হস্তে অবগুণ্ঠনবতী রমণী আমার শিরোদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ গালিচামণ্ডিত গৃহতল হইতে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এ রমণী কেমন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল? দ্বার যেমন রুদ্ধ ছিল, সেইরূপ রহিয়াছে, অন্য কোথাও প্রবেশ-পথ দেখিতে পাইলাম না। এমন সময় রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "পথিক, রাত্রে উত্তম নিদ্রা হইয়াছিল?"

দেবী সরস্বতীর পদ্মাঙ্গুলির আঘাতে যেরূপ বীণা ঝংকার দিয়া উঠে, রমণীর বাক্যে আমার হৃদয়ে সেইরূপ ঝংকার উঠিল। মানবকণ্ঠে যে এরূপ মধু থাকে, পূর্বে তাহা জানিতাম না। কেবল স্বর মিষ্ট নহে। যেন সেই কণ্ঠ শুনিবামাত্র কত পূর্বস্মৃতি মনে উঠিতে লাগিল, যেন ভবিষ্যতের স্বর্ণদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল, যেন হৃদয়ের মূলকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি রমণীর কথায় উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?"

অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মনে হইল, রমণী যেন মৃদু মৃদু হাসিল। সেই অমৃতনিস্যন্দিনী স্বরে কহিল, "এ আমার গৃহ। আমার গৃহে যেখানে যখন ইচ্ছা যাইতে পারি। তুমি পর্যঙ্ক ত্যাগ করিয়া ধরণীতে শয়ন করিয়াছিলে কেন?"

প্রশ্নের উত্তরে আমি পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, "তুমি কে?"

উচ্ছ্বসিত জলতরঙ্গের ন্যায় রমণী হাসিয়া উঠিল; কহিল, "আমি গৃহকর্ত্রী। যে প্রশ্ন তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা আমারই জিজ্ঞাসা করা শোভা পায়। তুমি কে?"

"আমি পথিক, ভিক্ষুক। আমাকে বন্দী করিয়া তোমার কি ফল হইবে?"

রমণী আবার হাসিল; বলিল, "বন্দীর কি এইরূপ শয়ন-গৃহ? এ গৃহে কি তোমার সহিত বন্দীর ন্যায় আচরণ হইয়াছে?"

"আমি বৈরাগ্যব্রতাবলম্বী, বিলাস চাহি না। আমাকে বলপূর্বক এ গৃহে লইয়া আসিয়াছে। যদি তুমি এই গৃহের কর্ত্রী হও ত আমাকে মুক্ত করিয়া দাও, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া যাই।"

"আইস, তোমাকে মুক্ত করিয়া দিতেছি," বলিয়া রমণী গৃহের প্রাচীরে হস্তস্পর্শ করিল। তৎক্ষণাৎ প্রাচীরে একটি দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। এ কৌশল না দেখিলে প্রত্যয় করা যায় না। রমণী সেই দ্বার দিয়া বাহির হইল, আমি তাহার পশ্চাৎ নিষ্ক্রান্ত হইলাম। পশ্চাৎ হইতে দেখিলাম, রমণীর আপাদমস্তক বিচিত্র শুভ্র বসনে আচ্ছাদিত, কোমল পদক্ষেপে গমন করিতে লাগিল। কয়েকটি কক্ষ অতিক্রম করিয়া রমণী আর একটা দ্বারের সম্মুখে উপনীত হইল। আমার নিকটে আসিয়া আমার কর্ণে মৃদু মৃদু কহিল, "এই দ্বার খুলিলেই তুমি যথেচ্ছা গমন করিতে পার। যাইবার পূর্বে কোনো কথা বলিবার নাই?"

আমার শরীব পুলকাঞ্চিত হইল। কহিলাম, "একটা কথা—" যাহা বলিতে যাইতেছিলাম, বলিতে পারিলাম না, লজ্জায় অধোবদন হইলাম।

রমণী কহিল, "কি বলিতেছিলে, বল।"

আমি কহিলাম, "সে কথা বলা আমার পক্ষে পাপ। তুমি দ্বার মুক্ত কর, আমি বাহির হইয়া যাই।"

রমণী আবার আমার কানে কানে বলিল, "আমি বলিব? তুমি যাইবার পূর্বে একবার আমার মুখ দেখিতে চাও।"

এই ইচ্ছাই আমার মনে উদয় হইয়াছিল। কোনো কথা কহিতে না পারিয়া আমি মস্তক অবনত করিলাম।

রমণী কহিল,"এই ইচ্ছা তোমার আজ নূতন হয় নাই। এ দিকে দেখ।"

পার্শ্বে একটা দ্বার মুক্ত করিয়া রমণী একটি গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার অনুজ্ঞামতো আমিও সেই গৃহে প্রবেশ করিলাম। রমণী প্রদীপ তুলিয়া দেখাইল, গৃহের প্রাচীরে নানাবিধ বহুসংখ্যক সন্ন্যাসীর বেশ রহিযাছে। রমণী কহিল, "যাহারা এই বেশ ধারণ করিত, তাহারা সকলেই আমার মুখ একবার দেখিতে চাহিয়াছিল। পার্শ্বের গৃহে দেখ।" সেই গৃহের পার্শ্বে আর একটি গৃহ। তাহার প্রাচীরে বহুসংখ্যক বহুমূল্য পরিচ্ছদ রহিয়াছে। রমণী কহিল, "ইহারাও সকলে আমার মুখ দেখিতে চাহিয়াছিল। তুমি আপনার বেশ ত্যাগ করিয়া অন্য বেশ ধারণ কর, পরে আমাকে অবগুণ্ঠন মোচন করিতে বলিও।"

আমি বিনয়পূর্বক কহিলাম, "এরূপ কৌতুহল আমি ত্যাগ করিয়াছি। তোমাকে অবগুণ্ঠন মোচন করিতে হইবে না। দ্বার মুক্ত কর, আমি বাহির হইয়া যাই।"

রমণী কহিল, "এমন কথা আমাকে কেহ বলে নাই। সকলে বেশ পরিবর্তন করিয়াই যে আমার মুখ দেখিতে পাইত, তাহা নয়। কিন্তু তুমি আমার মুখ দেখিবার ইচ্ছাই ত্যাগ করিয়াছ। তোমার কথায় আমি প্রীত হইয়াছি।"

আমি কহিলাম, "তোমার নিকট আমি মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি, অপর কিছু প্রার্থনীয় নাই।"

রমণী আমার হস্ত স্পর্শ করিল—মলয়বাহিত সৌরভের ন্যায় মৃদুস্পর্শ, কিন্তু সেই স্পর্শে আমার আপাদমস্তক তীব্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গে কম্পিত হইয়া উঠিল। মৃদু মৃদু, ঈষৎ কম্পিতস্বরে রমণী কহিল, "তুমি বার বার ঐ কথা কেন বলিতেছ? তুমি ত বন্দী নও যে, মুক্তি প্রার্থনা করিতেছ। আর যদি বন্দীই হও ত রূপের, প্রেমের বন্দী, রমণীর কোমল বাহুলতার বন্দী, সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিতে চাহিতেছ কেন? আমি রূপসী কি কুৎসিতা, না দেখিয়াই চলিয়া যাইবে?"

আমি কহিলাম, "রূপের মোহই যদি অন্বেষণ করিব, তাহা হইলে এ বেশ ধারণ করিয়া এই দূরদেশে ভ্রমণ করিতেছি কেন? তুমি যে সকল কথা কহিতেছ, তাহা শ্রবণ করাও আমার পক্ষে নিষিদ্ধ।"

রমণী কহিল, "তোমার নবীন যৌবন, বৈরাগ্যের কথাই তোমার মুখে কঠোর শুনায়। আমাকে

ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়, আইস, আমি স্বয়ং তোমাকে পথ দেখাইয়া দিতেছি।"

দ্বার মুক্ত করিয়া রমণী প্রদীপ নির্বাপিত করিল। দেখিলাম, বাহিরে অল্প অন্ধকার, প্রভাত আগতপ্রায়। রমণী আমাকে পথ দেখাইয়া অগ্রে চলিল। অল্প দূর গিয়া অতি মনোহর উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। উদ্যানে লতাবেষ্টিত কুঞ্জগৃহের মধ্যে রমণী আমাকে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং পার্শ্বে বসিল।

আমি উঠিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু রমণী হস্ত ধারণপূর্বক আমাকে নিবারণ করিল। তাহার পর মৃদু মৃদু আমার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল। ক্রমশ আমার চিত্ত বিহ্বল হইল। অবশেষে অস্থিরচিত্তে রমণীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলাম, "তোমার অবগুণ্ঠন মোচন কর, তোমার মুখ দেখিব। অতৃপ্তনয়নে কতক্ষণ তোমাব অবগুণ্ঠন দেখিব?"

এই কথা আমি বলিবামাত্র রমণী চকিতের ন্যায় আমার পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইল। মধুর ব্যঙ্গসূচক হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তাহার পর রমণী দ্রুতগমনে চলিয়া গেল।

প্রভাত হইয়াছে, সূর্যোদয়ের সূচনা হইতেছে। অকস্মাৎ মোহভঙ্গ হইয়া অত্যন্ত আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। বেগে পলায়ন করিবার প্রয়াস করিলাম। কোথায় পলায়ন করিব? উদ্যানের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, প্রাচীরের উপর উঠিবার অথবা তাহা লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া উদ্যানের একান্তে উপবেশন করিলাম।

সূর্যোদয়ের কিছু পরে পূর্বরাত্রির পরিচিত একটি যুবতী আমাকে ডাকিতে আসিল। তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "অবগুণ্ঠনবতী এই গৃহকর্ত্রী কে?"

যুবতী হস্তদ্বারা আমার মুখরোধ করিযা কহিল, "ও কথা আর কখনও জিজ্ঞাসা করিও না। যদি নিজে জানিতে পার ত জানিবার চেষ্টা করিও। আর কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিলে বিপদ ঘটিবে।"

যুবতীর মুখ দেখিয়া বোধ হইল, বিদ্রূপ নহে। অগত্যা আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

দিবাভাগে অবগুণ্ঠনবতী রমণীকে আর দেখিতে পাইলাম না। রাত্রি-কালে আমাকে গৃহের বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গেল। আবার সেইরূপ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। অট্টালিকাব সম্মুখে সেই হ্রদ। সোপানশ্রেণীর তলে সেই তরণী রহিয়াছে। সেই পুরুষ সেইরূপ হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাব সংকেতমতো তাহাব পার্শ্বে গমন করিলাম। দুই জনে একত্রে সোপান অবতরণ কবিতে লাগিলাম। পুরুষ কহিল, "তুমি এখনও বেশ-পরিবর্তন কর নাই?"

আমি কহিলাম, "কেন, বেশ কেন পরিবর্তন করিব?"

পুরুষ কহিল, "এখানে যে আসে, সেই করে। তুমি বাদ যাইবে কেন?"

আমি কহিলাম, "বলপ্রয়োগ করিলে আমি নিরুপায়। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক আমি কখনো বেশ পরিবর্তন করিব না।"

পুরুষ কহিল, "মুর্খ, আমিও তোমার মতো এক দিন ঐ কথা বলিয়াছিলাম।"

বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "তুমিও বেশ পরিবর্তন করিয়াছ? তুমিও কি অবগুণ্ঠনবতী রমণীব মুখ—?"

পুরুষের মুখ ভয়ে শুষ্ক ও মলিন হইয়া গেল। আমার কথায় বাধা দিয়া কহিল, "চুপ কর। ও সকল কথার কখনো উল্লেখ করিও না।"

পূর্বরাত্রির মতো জল-বক্ষে আবার সংগীত-ধ্বনি উঠিল। সেইরূপ রূপের উচ্ছ্বাস, সেইরূপ তালের মিলন, তরণীর সেইরূপ আনন্দ-হিল্লোল। অবশেষে তরণী হ্রদের পরপারে উপনীত হইবামাত্র আমি লম্ফ দিয়া তীরে উঠিলাম। কহিলাম, "তোমাদের আনন্দ তোমাদের থাকুক, আমি আর তোমাদের সঙ্গে যাইব না।" বলিয়া উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলাম। পশ্চাতে হাস্যতরঙ্গ উঠিল। ফিরিয়া দেখিলাম, রমণীগণ নৌকা হইতে উঠিয়া হাসিতে হাসিতে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে,

অনুচরগণ বেগে ধাবিত হইতেছে। আমি যথাসাধ্য বেগে ধাবমান হইলাম, কিন্তু পথ আমার অপরিচিত, স্থান বন্ধুর, এরূপ স্থানে যাতায়াতের অভ্যাস নাই। অনুচররা অবলীলাক্রমে বেগে আসিতে লাগিল, তাহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশা ত্যাগ করিতে হইল। কিছু দূর উপরে উঠিয়া দেখি, নিকটেই কয়েকটি কুটির। তখন আমি সহায়তা পাইবার আশায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলাম। অনুচররাও আসিয়া আমাকে ধরিল।

এমন সময় কুটিব হইতে জটাজুটধারী কয়েকটি মহাকায় পুরুষ নির্গত হইলেন। আমার গৈরিক বেশ দেখিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অতি গম্ভীরস্বরে অনুচরদিগকে কহিলেন, "ইহাকে মুক্ত কর।"

তাঁহাদিগের বিশাল মূর্তি দেখিয়া অনুচরগণ আমাকে ত্যাগ করিয়া বিষণ্ণ মুখে ফিরিয়া গেল। আমি সেই পুরুষদিগের অনুবর্তী হইয়া কুটিরে প্রবেশ করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে কুটিরে প্রবেশ করিলাম, তাহার অভ্যন্তরে এক জন সন্ন্যাসী উপবিষ্ট ছিলেন। মুখশ্রী অত্যন্ত প্রশান্ত, চক্ষু অত্যন্ত উজ্জ্বল। তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া আমি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। আমার সঙ্গে যে ক'জন সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহারা যাহা দেখিয়াছিলেন, বিবৃত করিলেন। তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়া আসনস্থ সন্ন্যাসী আমাকে কহিলেন, "কোনো চিন্তা নাই, অদ্য রাত্রে বিশ্রাম কর। কল্য তোমায় সকল কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

অনুচরগণ আরও লোকবল লইয়া আমায় না ধরিতে আইসে, আমি সেই আশঙ্কা প্রকাশ করিলাম। সন্ন্যাসী কহিলেন, "কোনো আশঙ্কা নাই, এ স্থানে উপদ্রুত হইবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম কর।"

অপর সন্ন্যাসীরা আমাকে আর একটি কুটির দেখাইয়া দিলেন। পর্ণশয্যায় শয়ন করিলাম।

প্রভাত হইলে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া নির্ঝরের জলে স্নান করিলাম। স্নানান্তে সন্ন্যাসিপ্রদত্ত ফলমূল ভোজন করিলাম। পূর্বোক্ত প্রধান সন্ন্যাসী সেই কুটিরে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি ইঙ্গিতপূর্বক আমাকে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। আমি উপবিষ্ট হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ব্রহ্মচারী?"

আমি ব্রহ্মচর্য বা অন্য কোনো আশ্রমই গ্রহণ করি নাই। সন্ন্যাসীকে প্রকৃত কথাই বলিলাম। বলিলাম, "এই বেশে ভ্রমণ করিবার সুবিধা, সেই জন্য গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়াছি। আমি নিঃস্ব পথিকমাত্র, নানা দেশে, নানা তীর্থে পর্যটন কবিতেছি। এ পর্যন্ত কিছুই শিক্ষা হয় নাই।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়ঃক্রম অল্প দেখিতেছি, তুমি সংসার ত্যাগ করিলে কেন?

সকল কথা আমি খুলিয়া বলিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আনুপূর্বিক সকল কথা আমি বলিতে পারিব না, আমাকে মার্জনা করিবেন। সংসারে সুখ না পাইয়া, বিরক্ত হইয়া আমি সংসার ত্যাগ করিয়াছি।"

সন্ন্যাসী স্মিতমুখে কহিলেন, "গোপনীয় কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। সুখের সন্ধানই ভ্রম। সংসারের ভিতরেও সুখ নাই, সংসারের বাহিরেও সুখ নাই।"

আমি কহিলাম, "বিষয়ীর অপেক্ষা ত্যাগী যে অধিক সুখী, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তাহা নহে। সুখকে ত্যাগ করিলে তবেই সুখ পাওয়া যায়। সুখ ত বাহিরে নাই। আপনাতেই সুখ। আপনার ভিতরে অনুসন্ধান কর, সুখ পাইবে। সে অনুসন্ধানের ক্ষমতা না থাকে, যথাসাধ্য ইহজীবনের কর্তব্য পালন করিয়া যাও। নিষ্ঠাতেও তৃপ্তি আছে।"

উপদেশের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া আমি নিরুত্তর রহিলাম।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তোমার কি ইচ্ছা? এই আশ্রমে কিছু দিন অবস্থান করিবে, কিংবা অন্যত্র যাইবে?"

আমি কহিলাম, "যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে কিছুদিন আপনাদের আশ্রয়ে থাকি। যে দেশে উপস্থিত হইয়াছি, একা ভ্রমণ করিতে কিঞ্চিৎ আশঙ্কা হয়।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "কেন, আশঙ্কা কিসের?"

পূর্ব দুই দিবসে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, আদ্যোপান্ত কহিলাম। সন্ন্যাসী শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন; কহিলেন, ইহা উপকথার মতো শুনাইতেছে।"

আমি কহিলাম, "যাঁহারা কল্য রাত্রে আমাকে রক্ষা করিযাছেন, তাঁহারা কতক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আমার মুখে যাহা শুনিলেন, তাহা আমি না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "অবগুণ্ঠনবতী রমণী কে?"

"আমি কিছুই জানি না। তাহার মুখ পর্যন্ত দেখি নাই।"

সন্ন্যাসী মৌন হইলেন কিয়ৎকাল পবে কহিলেন, "আমাব সন্দেহ হইতেছে, এই রমণীদ্বাবা বহু অনিষ্ট ঘটিয়া থাকিবে।"

"আমার তাহাই বিশ্বাস।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "ইহার কি কোনো প্রতিকাব নাই?"

আমি কহিলাম, "রাজা না করিলে কে করিবে?"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমরা বলশূন্য, কিন্তু একটা স্ত্রীলোকেব অত্যাচার কি নিবারণ কবিতে পারি না?"

"কি কবিবেন?"

"তাহাই ভাবিতেছি," বলিয়া সন্ন্যাসী মৌন হইলেন।

রাত্রে আমি শয়ন কবিয়া আছি, এমন সময সন্ন্যাসী গাত্র স্পর্শ করিয়া আমাব জাগবিত করিলেন। মৃদুস্বরে কহিলেন, "উঠিয়া আমার সঙ্গে আইস।"

আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। কুটির হইতে বাহির হইয়া সন্ন্যাসী হ্রদের অভিমুখে চলিলেন। হ্রদের সম্মুখে উপনীত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায যাইতেছেন?"

সেই রমণীর গৃহের অভিমুখে। আমাকে পথ দেখাইয়া দাও।"

ভীত হইয়া কহিলাম, "আমি সে দিকে যাইব না। এবার ধৃত হইলে আর পলায়ন করিতে পাবব না।"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কোনো আশঙ্কা নাই, নিশ্চিন্ত হইয়া আমাব সঙ্গে আইস।"

আজ রাত্রে সংগীতের ধ্বনি নাই, হ্রদে তরণীর চিহ্ন নাই। অট্টালিকা কোন্ দিকে আমার স্মরণ নাই। সন্ন্যাসীকে কেমন করিয়া পথ দেখাইয়া দিব?

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছি। তুমি কেবল গৃহ চিনিয়া লইবে।"

সন্ন্যাসী অগ্রে চলিলেন, আমি তাঁহার পদানুসরণ করিলাম। বহুদূর গমন করিয়া দেখিলাম, হ্রদের তীরে বৃহৎ প্রাসাদ জ্যোৎস্নায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি কহিলাম, "এই বাড়ি।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি এই গৃহে প্রবেশ করিব।"

তাঁহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া আমি পিছাইয়া পড়িলাম। সন্ন্যাসী গৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহার যাহাই হউক, আমার সমূহ বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এবং দ্বিতীয়বার ধৃত হইলে কি দুর্গতি হইবে, তাহাও জানি না। সন্ন্যাসীর কথায় আমার ভয় হওয়া বিচিত্র নহে। তিনি স্মিতমুখে কহিলেন, "তোমার মনে যদি শঙ্কা হয় ত গৃহের নিকটে অবস্থান করিও না। দূরে কোনো এমন স্থানে গমন

কর, যেখান হইতে এ গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ ভয়ের কারণ হইলে সহজে পলায়ন করিতে পারিবে। আমার জন্য কোনো চিন্তা করিও না।"

সন্ন্যাসীর কথার শ্লেষ বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু ভয় ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তাঁহার কথামতো কিছু দূর গমন করিয়া এক ছায়াবহুল বৃহৎ বৃক্ষতলে অবস্থান করিলাম। সে স্থান হইতে সে গৃহ দেখিতে পাওয়া যায় এবং পলায়নের পথও অবারিত। ছায়ান্ধকারে আমাকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া সন্ন্যাসী গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বৃক্ষতলে অন্ধকারে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া সেই সমুখস্থিত অট্টালিকানিহিত রহস্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। কোন সাহসে সন্ন্যাসী সেই গৃহে একা প্রবেশ করিলেন? কিরূপেই বা সেই স্থান হইতে মুক্ত হইয়া আসিবেন? কে সেই রমণী? কিসের জন্য এরূপ করিয়া এমন স্থানে বাস করে?

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। পথে পথিক নাই। হ্রদে তরণী নাই। চারিদিকে কেবল ভীতিসাধক অস্ফুট নিশীথধ্বনি। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

অনুমান রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। সহসা অট্টালিকার প্রবেশদ্বার মুক্ত হইল। সেই পথে সন্ন্যাসী বাহিরে আসিলেন। পশ্চাতে অবগুণ্ঠনাবৃতা সেই রমণী। সঙ্গে আর কেহ নাই। তাঁহারা নিষ্ক্রান্ত হইলে গৃহদ্বার পুনর্বার রুদ্ধ হইল। সন্ন্যাসী স্থির অবিচলিত পদক্ষেপে আমার সন্নিধানে আগমন করিলেন। সংকেতপূর্বক আদেশ করিলেন, "আইস।" আমি তাঁহার অনুবর্তী হইলাম। রমণী পূর্বের ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল।

বিস্ময় বর্ধিত হইতে লাগিল। এই রমণী ঐশ্বর্যশালিনী, দাসদাসীপূর্ণ অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া কেন এই সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ আগমন করিতেছে? কিরূপ কৌশলে অথবা কোন বলে সন্ন্যাসী এই নারীকে কিঙ্করীর মতো সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন? সন্ন্যাসীর মুখে কথা নাই। রমণীও নীরব। অন্ধকারে পদধ্বনি শুনা যায়। মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি কোথাও শ্রুত হয় না। বর্ধিত-কৌতূহল হইয়া আমি তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলাম। যে স্থান হইতে সন্ন্যাসী পূর্বে আগমন করেন, সে দিকে ফিরিলেন না। হ্রদের কূল ত্যাগ করিয়া লোকালয়ের অভিমুখ পশ্চাতে রাখিয়া, আর এক দিকে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখি, সম্মুখে অন্ধকার অরণ্য। সন্ন্যাসী নিঃশঙ্কচিত্তে সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। রমণী একবার দাঁড়াইল। কিন্তু সন্ন্যাসী পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করাতে পূর্বের ন্যায় নীরবে তাহার অনুগামিনী হইল। আমি রমণীর পশ্চাৎ অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। রাত্রি অন্ধকার। অরণ্যের বাহিরে অন্ধকার। অরণ্যের ভিতরে অতি গাঢ় সূচিভেদ্য অন্ধকার। পথ আছে কি না, দেখিতে পাওয়া যায় না। পথ থাকিলেও লক্ষ্য হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু সন্ন্যাসী পূর্বের ন্যায় অভ্রান্ত অবিচলিত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রমণী এবং আমি যথাসম্ভব তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম।

কিছু দূর এইরূপ গেল। ক্বচিৎ পেচকরব, বৃক্ষশাখায় বাদুড়ের পক্ষশব্দ, দূর কখনও কোনো নিশাচর শ্বাপদের হৃৎকম্পকারী গর্জন। অকস্মাৎ অনতিদূরে আলোক দেখিতে পাইলাম। নিকটে উপনীত হইয়া দেখি, অতি প্রাচীন ভগ্নাবশিষ্ট মন্দির। পার্শ্বে ভগ্নচূড়া স্তূপাকারে পতিত রহিয়াছে। চারিদিকে অতি বিশাল বটবৃক্ষশ্রেণী। চারিদিকে জটা ভূমিতে পতিত হইয়াছে। মন্দিরের প্রকোষ্ঠে আলোক জ্বলিতেছে। সন্ন্যাসীর সহিত আমরা মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। আলোক প্রদীপের নহে—ভূগর্ভস্থ কোনোরূপ প্রজ্বলিত বাষ্প হইতে আলোক নির্গত হইতেছে। ক্ষীণ নীল শিখা। কখনও ম্লান, কখনও উজ্জ্বল। কখনও নির্বাণোন্মুখ, কখনও জ্বালাময়। মন্দিরের বাহিরের যেরূপ ভগ্নাবস্থা, ভিতরে সেরূপ নহে। আয়তন বৃহৎ। কক্ষ অনেকগুলি আছে, এরূপ মনে হয়। আলোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী কিছুকাল চিন্তা করিলেন। পরে আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তিষ্ঠ", রমণীকে কহিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।" কক্ষে দুইজন প্রবেশ করিলে দ্বার রুদ্ধ হইল। আমি

বাহিরে সেই আলোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আলোকের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ক্রমে চিত্তের বিকৃতি জন্মিতে লাগিল। কোথায় আসিয়াছি, কাহার সহিত আসিয়াছি, সে জ্ঞান ক্রমশঃ লুপ্ত হইল। আলোকে নানাবিধ মূর্তি দেখিতে লাগিলাম। কখনও বালিকার অবয়ব, কখনও তরুণী, কখনও ভয়ংকর নৃশংস পুরুষমূর্তি, কখনও আলোক এবং ছায়ার নৃত্য। ক্রমশঃ দৃষ্টি স্থির হইল। দেখিলাম, সম্মুখে রত্নময় পালঙ্কের উপর সুন্দরী রমণী শয়ন করিয়া রহিয়াছে। পালঙ্কের চারিপার্শ্বে মুগ্ধলোচনে বহুসংখ্যক পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রমণী চক্ষু উন্মীলন করিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ পুরুষদিগকে দেখিয়া অল্প হাসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। আপাদমস্তক বসনে আচ্ছাদিত করিল। বস্ত্রাবরণে তাহার দেহ আন্দোলিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই আবরণ পুনর্মুক্ত হইল। কোথায় সে সুন্দরী নয়নমোহিনী রমণী। শয্যা হইতে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ নিঃশ্বসিতা ফণিনী ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল। আমি চীৎকার করিয়া পশ্চাতে সরিয়া আসিলাম।

সেই সময় কক্ষদ্বার মুক্ত হইল। রমণী বেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভয়ে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। সন্ন্যাসী পূর্বের ন্যায় অবিচলিত, বিশাল দেহ স্থির। অতি গম্ভীর বজ্রস্বরে কহিলেন, "অবগুণ্ঠন মুক্ত কর।"

কম্পিতহস্তে ধীরে ধীরে রমণী অবগুণ্ঠন মুক্ত করিল। আমার মতো কত ব্যক্তি হয় ত বহু যত্ন করিয়াও এই রমণীর মুখ কখনো দেখিতে পায় নাই। এখন সন্ন্যাসীর কঠিন আদেশে তাহার মুখ অনাবৃত হইল। আমি রুদ্ধনিশ্বাসে নির্নিমেষ লোচনে রমণীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

তেমন রূপ আমি কখনো দেখি নাই, কেবল রূপ নহে, চক্ষে সেরূপ তীব্র জ্বালা পূর্বে দেখি নাই। বুঝিতে পারিলাম যে, যাহার এত রূপ, সে ইচ্ছা করিলে বহু অনর্থ ঘটাইতে পারে। পূর্বরাত্রে রমণীর গৃহে যে সকল পরিচ্ছদ দেখিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ হইল।

সন্ন্যাসী একবার রমণীর মুখের দিকে দেখিলেন, আর বার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর রমণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তুমি ঐ রূপ লইয়া অসংখ্য লোকের সর্বনাশ করিয়াছ। এই যুবক সন্ন্যাসিবেশে আসিয়াছিল, তুমি ইহারও বিপদের প্রয়াস পাইয়াছিলে। তোমার মতো নারীবেশে রাক্ষসী আর আছে কি না, জানি না, কিন্তু তোমার এই দুষ্ক্রিয়া যদি রোধ না করিতে পারি, তাহা হইলে বৃথাই আমার সাধনা।"

মন্দিরের বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসী পূর্বের ন্যায় পথ দেখাইয়া চলিলেন। অরণ্য অতিক্রান্ত হইলে রমণীকে কহিলেন, "এখন গৃহে যাও। এখন প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

রমণী রোদন করিতে করিতে চলিয়া গেল।

তখন সন্ন্যাসী আমার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কোমলস্বরে কহিলেন, "বৎস, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। কঠোর সন্ন্যাস-আশ্রম তোমার তরে নহে। তুমি যে রমণীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, সে গুণবতী, তাহাকে লইয়ে তুমি সুখে গৃহস্থ-আশ্রম কর।"

তখন স্বপ্নশ্রুত সেই স্বর আমার শ্রবণে পুনঃ প্রবেশ করিল—"ঈপ্সিত, চিরদয়িত, এস হে।"

সন্ন্যাসী দ্রুতপদে আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। আমি পরদিবস প্রাতে গৃহমুখে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

নগেন্দ্র গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ)

ল্যা ব রে ট রি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নন্দকিশোর ছিলেন লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি থেকে পাস করা এঞ্জিনিয়ার। যাকে সাধুভাষায় বলা যেতে পারে দেদীপ্যমান ছাত্র অর্থাৎ ব্রিলিয়ান্ট, তিনি ছিলেন তাই। স্কুল থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার তোরণে তোরণে ছিলেন পয়লা শ্রেণীর সওয়ারি।

ওঁর বুদ্ধি ছিল ফলাও, ওঁর প্রয়োজন ছিল দরাজ, কিন্তু ওঁর অর্থসম্বল ছিল আটমাপের।

রেলওয়ে কোম্পানির দুটো বড়ো ব্রিজ তৈরি করার কাজে উনি ঢুকে পড়তে পেরেছিলেন। ও-কাজের আয়ব্যয়ের বাড়তি-পড়তি বিস্তর, কিন্তু দৃষ্টান্তটা সাধু নয়। এই ব্যাপারে যখন তিনি ডানহাত বাঁহাত দুই হাতই জোরের সঙ্গে চালনা করেছিলেন তখন তাঁর মন খুঁতখুঁত করে নি। এ-সব কাজের দেনাপাওনা নাকি কোম্পানি-নামক একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট সত্তার সঙ্গে জড়িত, সেইজন্যে কোনো ব্যক্তিগত লাভলোকসানের তহবিলে এর পীড়া পৌঁছয় না।

ওঁর নিজের কাজে কর্তারা ওঁকে জীনিয়স বলত, নিখুঁত হিসাবের মাথা ছিল তাঁর। বাঙালি বলেই তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক তাঁর জোটে নি। নীচের দবের বিলিতি কর্মচারী প্যান্টের দুই ভরা-পকেটে হাত গুঁজে যখন পা ফাঁক করে 'হ্যালো মিস্টার মল্লিক' ব'লে ওঁর পিঠ-থাবড়া দিয়ে কর্তাত্তি করত তখন ওঁব ভালো লাগত না। বিশেষত যখন কাজের বেলা ছিলেন উনি, আর দামের বেলা আর নামের বেলা ওরা। এর ফল হয়েছিল এই যে, নিজের ন্যায্য প্রাপ্য টাকার একটা প্রাইভেট হিসেব ওঁর মনের মধ্যে ছিল, সেটা পুষিয়ে নেবার ফন্দি জানতেন ভালো করেই।

পাওনা এবং অপাওনার টাকা নিয়ে নন্দকিশোর কোনোদিন বাবুগিরি করেন নি। থাকতেন শিকদারপাড়া গলিব একটা দেড়তলা বাড়িতে। কারখানাঘরের দাগ-দেওয়া কাপড় বদলাবার ওঁর সময় ছিল না। কেউ ঠাট্টা করলে বলতেন, 'মজুর মহারাজের তকমা-পরা আমার এই সাজ।'

কিন্তু বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্যে বিশেষ করে তিনি বাড়ি বানিয়েছিলেন খুব মস্ত। এমন মশগুল ছিলেন নিজের শখ নিয়ে যে, কানে উঠত না লোকেবা বলাবলি করছে, এত বড়ো ইমারতটা যে আকাশ ফুঁড়ে উঠল—আলাদিনের প্রদীপটা ছিল কোথায়।

এক-রকমের শখ মানুষকে পেয়ে বসে সেটা মাতলামির মতো, হুঁশ থাকে না যে লোকে সন্দেহ করছে। লোকটা ছিল সৃষ্টিছাড়া, ওঁর ছিল বিজ্ঞানের পাগলামি। ক্যাটালগের তালিকা ওলটাতে ওলটাতে ওঁব সমস্ত মনপ্রাণ চৌকির দুই হাতা আঁকড়ে ধরে উঠত ঝেঁকে ঝেঁকে। জর্মনি থেকে আমেরিকা থেকে এমন-সব দামী দামী যন্ত্র আনাতেন যা ভারতবর্ষের বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে মেলে না। এই বিদ্যালোভীর মনে সেই তো ছিল বেদনা। এই পোড়াদেশে জ্ঞানের ভোজের উচ্ছিষ্ট নিয়ে সস্তা দরের পাতা পাড়া হয়। ওদের দেশে বড়ো বড়ো যন্ত্র ব্যবহারের যে সুযোগ আছে আমাদের দেশে না থাকাতেই ছেলেরা টেক্সট বুকের শুকনো পাতা থেকে কেবল এঁটোকাঁটা হাতড়িয়ে বেড়ায়। উনি হেঁকে উঠে বলতেন, ক্ষমতা আছে আমাদের মগজে, অক্ষমতা আমাদের পকেটে। ছেলেদের জন্যে বিজ্ঞানের বড়ো রাস্তাটা খুলে দিতে হবে বেশ চওড়া ক'রে, এই হল ওঁর পণ।

দুর্মূল্য যন্ত্র যত সংগ্রহ হতে লাগল, ওঁর সহকর্মীদের ধর্মবোধ ততই অসহ্য হয়ে উঠল। এই সময়ে ওঁকে বিপদের মুখ থেকে বাঁচালেন বড়োসাহেব। নন্দকিশোরের দক্ষতার উপর তাঁর প্রচুর শ্রদ্ধা ছিল। তা ছাড়া রেলওয়ে কাজে মোটা মোটা মুঠোর অপসারণদক্ষতার দৃষ্টান্ত তাঁর জানা ছিল।

চাকরি ছাড়তে হল। সাহেবের আনুকূল্যে রেল-কোম্পানির পুরনো লোহালক্কড় সস্তা দামে

কিনে নিয়ে কারখানা ফেঁদে বসলেন। তখন য়ুরোপের প্রথম যুদ্ধের বাজার সরগরম। লোকটা অসামান্য কৌশলী, সেই বাজারে নতুন নতুন খালে নালায় তাঁর মুনাফার টাকায় বান ডেকে এল।

এমনসময় আর-একটা শখ পেয়ে বসল ওঁকে।

এক সময় নন্দকিশোর পাঞ্জাবে ছিলেন তাঁর ব্যবসার তাগিদে। সেখানে জুটে গেল তাঁর এক সঙ্গিনী। সকালে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন, বিশ বছরের মেয়েটি ঘাগরা দুলিয়ে অসংকোচে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত—জ্বলজ্বলে তার চোখ, ঠোঁটে একটি হাসি আছে, যেন শান-দেওয়া ছুরির মতো। সে ওঁর পায়ের কাছে ঘেঁসে এসে বললে, "বাবুজি, আমি কয়দিন ধরে এখানে এসে দু'বেলা তোমাকে দেখছি। আমার তাজ্জব লেগে গেছে।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "কেন, এখানে তোমাদের চিড়িয়াখানা নেই নাকি।"

সে বললে, "চিড়িয়াখানার কোনো দরকার নেই। যাদের ভিতরে রাখবার, তারা বাইরে সব ছাড়া আছে। আমি তাই মানুষ খুঁজছি।"

"খুঁজে পেলে?"

নন্দকিশোরকে দেখিয়ে বললে, "এই তো পেয়েছি।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "কী গুণ দেখলে বলো দেখি।"

ও বললে, "এখানকার বড়ো বড়ো সব শেঠজি, গলায় মোটা সোনার চেন, হাতে হীরার আংটি, তোমাকে ঘিরে এসেছিল—ভেবেছিল বিদেশী, বাঙালি, কারবার বোঝে না। শিকার জুটেছে ভালো। কিন্তু দেখলুম তাদের একজনেরও ফন্দি খাটল না। উলটে ওরা তোমারই ফাঁসকলে পড়েছে। কিন্তু তা ওরা এখনও বোঝে নি, আমি বুঝে নিয়েছি।"

নন্দকিশোর চমকে গেল কথা শুনে। বুঝলে একটি চিজ বটে—সহজ নয়।

মেয়েটি বললে, "আমার কথা তোমাকে বলি, তুমি শুনে রাখো। আমাদের পাড়ায় একজন ডাকসাইটে জ্যোতিষী আছে। সে আমার কুষ্টি গণনা করে বলেছিল, একদিন দুনিয়ায় আমার নাম জাহির হবে। বলেছিল আমার জন্মস্থানে শয়তানের দৃষ্টি আছে।"

নন্দকিশোর বললে, 'বল কী। শয়তানের?"

মেয়েটি বললে, "জানো তো বাবুজি, জগতে সব চেয়ে বড়ো নাম হচ্ছে ঐ শয়তানের। তাকে যে নিন্দে করে করুক, কিন্তু সে খুব খাঁটি। আমাদের বাবা বোম্‌ভোলানাথ ভোঁ হয়ে থাকেন। তাঁর কর্ম নয় সংসার চালানো। দেখো-না, সরকার বাহাদুর শয়তানির জোরে দুনিয়া জিতে নিয়েছে, খৃস্টানির জোরে নয়। কিন্তু ওরা খাঁটি, তাই রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছে। যেদিন কথার খেলাপ করবে, সেদিন ঐ শয়তানেরই কাছে কানমলা খেয়ে মরবে।"

নন্দকিশোর আশ্চর্য হয়ে গেল।

মেয়েটি বললে, "বাবু রাগ কোরো না। তোমার মধ্যে ঐ শয়তানের মন্তর আছে। তাই তোমারই হবে জিত। অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু, তা হলে তুমি ঠকবে।"

নন্দকিশোর হেসে বললে, "কী করতে হবে।"

"দেনার দায়ে আমার আইমার বাড়িঘর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, তোমাকে সেই দেনা শোধ করে দিতে হবে।"

"কত টাকা দেনা তোমার।"

"সাত হাজার টাকা।"

নন্দকিশোরের চমক লাগল, ওর দাবির সাহস দেখে। বললে, "আচ্ছা আমি দিয়ে দেব, কিন্তু তার পরে?"

"তার পরে আমি তোমার সঙ্গ কখনও ছাড়ব না।"

"কী করবে তুমি।"

"দেখব, যেন কেউ তোমায় ঠকাতে না পারে আমি ছাড়া।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "আচ্ছা বেশ, রইল কথা, এই পরো আমার আংটি।"

কষ্টিপাথর আছে ওঁর মনে, তার উপরে দাগ পড়ল একটা দামী ধাতুর। দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর থেকে ঝক্ ঝক্ করছে ক্যারেক্টরের তেজ—বোঝা গেল ও নিজের দাম নিজে জানে, তাতে একটুমাত্র সংশয় নেই। নন্দকিশোর অনায়াসে বললে, 'দেব টাকা'—দিলে সাত হাজার বুড়ী আইমাকে।

মেয়েটিকে ডাকত সবাই সোহিনী ব'লে। পশ্চিমী ছাঁদে সুকঠোর এবং সুন্দর তার চেহারা। কিন্তু চেহারায় মন টলাবে, নন্দকিশোর সে জাতের লোক ছিলেন না। যৌবনের হাটে মন নিয়ে জুয়ো খেলবার সময়ই ছিল না তাঁর।

নন্দকিশোর ওকে যে-দশা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেটা খুব নির্মল নয়, এবং নিভৃত নয়। কিন্তু ঐ একরোখা একগুঁয়ে মানুষ সাংসারিক প্রয়োজন বা প্রথাগত বিচারকে গ্রাহ্য করতেন না। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করত, বিয়ে করেছ কি। উত্তরে শুনত, বিয়েটা খুব বেশি মাত্রায় নয়, সহ্যমতো। লোকে হাসত যখন দেখত, উনি স্ত্রীকে নিজের বিদ্যের ছাঁচে গড়ে তুলতে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করত, "ও কি প্রফেসরি করতে যাবে নাকি।" নন্দ বলতেন, "না, ওকে নন্দকিশোরি করতে হবে, সেটা যে-সে মেয়ের কাজ নয়।" বলত, "আমি অসবর্ণবিবাহ পছন্দ করি নে।"

"সে কী হে।"

"স্বামী হবে এঞ্জিনিয়ার আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনি, এটা মানবধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছড়া বাঁধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি। পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।"

২

নন্দকিশোর মারা গেলেন প্রৌঢ় বয়সে কোন্-এক দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাতে।

সোহিনী সমস্ত কারবার বন্ধ করে দিলে। বিধবা মেয়েদের ঠকিয়ে খাবার ব্যবসাদার এসে পড়ল চার দিক থেকে। মামলার ফাঁদ ফাঁদলে আত্মীয়তার ছিটেফোঁটা আছে যাদের। সোহিনী স্বয়ং সমস্ত আইনের প্যাঁচ নিতে লাগল বুঝে। তার উপরে নারীর মোহজাল বিস্তার করে দিলে স্থান বুঝে উকিলপাড়ায়। সেটাতে তার অসংকোচ নৈপুণ্য ছিল, সংস্কার মানার কোনো বালাই ছিল না। মামলায় জিতে নিলে একে একে, দূর সম্পর্কের দেওর গেল জেলে দলিল জাল করার অপরাধে।

ওদের একটি মেয়ে আছে, তার নামকরণ হয়েছিল নীলিমা। মেয়ে স্বয়ং সেটিকে বদল করে নিয়েছে—নীলা। কেউ না মনে করে, বাপ-মা মেয়ের কালো রঙ দেখে একটা মোলায়েম নামের তলায় সেই নিন্দেটি চাপা দিয়েছে। মেয়েটি একেবারে ফুট্‌ফুটে গৌরবর্ণ। মা বলত, ওদের পূর্বপুরুষ কাশ্মীর থেকে এসেছিল—মেয়ের দেহে ফুটেছে কাশ্মীরী শ্বেতপদ্মের আভা, চোখেতে নীলপদ্মের আভাস, আর চুলে চমক দেয় যাকে বলে পিঙ্গলবর্ণ।

মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গে কুলশীল জাতগুষ্টির কথা বিচার করবার রাস্তা ছিল না। একমাত্র ছিল মন ভোলাবার পথ, শাস্ত্রকে ডিঙিয়ে গেল তার ভেলকি। অল্প বয়সের মাড়োয়ারি ছেলে, তার টাকা পৈতৃক, শিক্ষা এ কালের। অকস্মাৎ সে পড়ল এসে অনঙ্গের অলক্ষ্য ফাঁদে। নীলা একদিন গাড়ির অপেক্ষায় ইস্কুলের দরজার কাছে ছিল দাঁড়িয়ে। সেই সময় ছেলেটি দৈবাৎ তাকে দেখেছিল।

তার পর থেকে আরও কিছুদিন ঐ রাস্তায় সে বায়ুসেবন করেছে। স্বাভাবিক স্ত্রীবুদ্ধির প্রেরণায় মেয়েটি গাড়ি আসবার বেশ কিছুক্ষণ পূর্বেই গেটের কাছে দাঁড়াত। কেবল সেই মাড়োয়ারি ছেলে নয়, আরও দুচার সম্প্রদায়ের যুবক ঐখানটায় অকারণ পদচারণার চর্চা করত। তার মধ্যে ঐ ছেলেটিই চোখ বুজে দিল ঝাঁপ ওর জালের মধ্যে। আর ফিরল না। সিভিল মতে বিয়ে করলে সমাজের ওপারে। বেশি দিনের মেয়াদে নয়। তার ভাগ্যে বধূটি এল প্রথমে, তার পরে দাম্পত্যের মাঝখানটাতে দাঁড়ি টানলে টাইফয়েড, তার পরে মুক্তি।

সৃষ্টিতে অনাসৃষ্টিতে মিশিয়ে উপদ্রব চলতে লাগল। মা দেখতে পায় তার মেয়ের ছটফটানি। মনে পড়ে নিজের প্রথম বয়সের জ্বালামুখীর অগ্নিচাঞ্চল্য। মন উদ্‌বিগ্ন হয়। খুব নিবিড় করে পড়াশোনার বেড়া ফাঁদতে থাকে। পুরুষ শিক্ষক রাখল না। একজন বিদুষীকে লাগিয়ে দিল ওব শিক্ষকতায়। নীলার যৌবনের আঁচ লাগত তারও মনে, তুলত তাকে তাতিয়ে অনির্দেশ্য কামনার তপ্তবাষ্পে। মুগ্ধের দল ভিড় করে আসতে লাগল এদিকে ওদিকে। কিন্তু দরওয়াজা বন্ধ। বন্ধুত্বপ্রয়াসিনীরা নিমন্ত্রণ করে চায়ে টেনিসে সিনেমায়, নিমন্ত্রণ পৌঁছয় না কোনো ঠিকানায়। অনেক লোভী ফিরতে লাগল মধুগন্ধভরা আকাশে, কিন্তু কোনো অভাগ্য কাঙাল সোহিনীর ছাড়পত্র পায় না। এদিকে দেখা যায় উৎকণ্ঠিত মেয়ে সুযোগ পেলে উঁকিঝুঁকি দিতে চায় অজায়গায়। বই পড়ে যে বই টেক্সট্‌বুক কমিটির অনুমোদিত নয়, ছবি গোপনে আনিয়ে নেয় যা আর্টশিক্ষার আনুকূল্য কবে ব'লে বিড়ম্বিত। ওর বিদুষী শিক্ষয়িত্রীকে পর্যন্ত অন্যমনস্ক করে দিলে। ডায়োসিশন থেকে বাড়ি ফেরবার পথে আলুথালুচুলওয়ালা গোঁফের-রেখামাত্র-দেওযা সুন্দরহানো এক ছেলে ওব গাড়িতে চিঠি ফেলে দিয়েছিল। ওর বক্ত উঠেছিল ছম্‌ ছম্‌ ক'রে। চিঠিখানা লুকিযে রেখেছিল জামার মধ্যে। ধরা পড়ল মায়ের কাছে। সমস্ত দিন ঘরে বন্ধ থেকে কাটল অনাহারে।

সোহিনীর স্বামী যাদের বৃত্তি দিযেছিলেন, সেই-সব ভালো ভালো ছাত্রমহলে সোহিনী পাত্র সন্ধান করেছে। সবাই প্রায় আড়ে আড়ে ওর টাকার থলির দিকে তাকায়। একজন তো তাব থিসিস ওর নামে উৎসর্গ করে বসল। ও বললে, "হায় রে কপাল, লজ্জায় ফেললে আমাকে। তোমার পোস্টগ্রাজুয়েটি মেয়াদ ফুবিয়ে আসছে শুনলুম, অথচ মালাচন্দন দিলে অজাযগায, হিসাব করে ভক্তি না করলে উন্নতি হবে না যে।" কিছুদিন থেকে একটি ছেলের দিকে সোহিনী দৃষ্টিপাত করছিল। ছেলেটি পছন্দসই বটে। তার নাম রেবতী ভট্টাচার্য। এরই মধ্যে সায়ান্সের ডাক্তার পদবীতে চড়ে বসেছে। ওর দুটো-একটা লেখার যাচাই হয়ে গেছে বিদেশে।

৩

লোকের সঙ্গে মেলামেশা করবার কলাকৌশল সোহিনীর ভালো করেই জানা আছে। মন্মথ চৌধুরী রেবতীর প্রথম দিককার অধ্যাপক। তাঁকে নিলে বশ করে। কিছুদিন চায়ের সঙ্গে রুটিটোস্ট, অমলেট, কখনও বা ইলিশমাছের ডিমের বড়া খাইয়ে কথাটা পাড়লে। বললে, "আপনি হযতো ভাবছেন আমি আপনাকে বারে বারে চা খেতে ডাকি কেন।"

"মিসেস মল্লিক, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলতে পারি, সেটা আমার দুর্ভাবনার বিষয় নয়।"

সোহিনী বললে, "লোকে ভাবে, আমরা বন্ধুত্ব করে থাকি স্বার্থের গরজে।"

"দেখো মিসেস মল্লিক, আমার মত হচ্ছে এই—গরজটা যারই হোক, বন্ধুত্বটাই তো লাভ। আর এই বা কম কথা কী, আমার মতো অধ্যাপককে দিয়েও কারও স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে। এ জাতটার বুদ্ধি কেতাবের বাইরে হাওয়া খেতে পায় না ব'লে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমার কথা শুনে তোমার হাসি পাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। দেখো, যদিও আমি মাস্টারি করি তবু ঠাট্টা করতেও পারি। দ্বিতীয়বার চা খেতে ডাকবার পূর্বে এটা জেনে রাখা ভালো।"

"জেনে রাখলুম, বাঁচলুম। অনেক অধ্যাপক দেখেছি, তাঁদের মুখ থেকে হাসি বের করতে ডাক্তার ডাকতে হয়।"

"বাহবা, আমারই দলের লোক দেখছি তুমি। তা হলে এবার আসল কথাটা পাড়া হোক।"

"জানেন বোধ হয়, জীবনে আমার স্বামীর ল্যাবরেটরিই ছিল একমাত্র আনন্দ। আমার ছেলে নেই, ঐ ল্যাবরেটরিতে বসিয়ে দেব বলে ছেলে খুঁজছি। কানে এসেছে রেবতী ভট্টাচার্যের কথা।"

অধ্যাপক বললেন, "যোগ্য ছেলেই বটে। তার যে লাইনের বিদ্যে সেটাকে শেষ পর্যন্ত চালান করতে মালমসলা কম লাগবে না।"

সোহিনী বললে, "আমার রাশ-করা টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্ছে। আমার বয়সের বিধবা মেয়েরা ঠাকুরদেবতার দালালদের দালালি দিয়ে পরকালের দরজা ফাঁক করে নিতে চায়। আপনি শুনে হয়তো রাগ করবেন, আমি ও সব কিছুই বিশ্বাস করি নে।"

চৌধুরী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, "তুমি তবে কী মান।"

"মানুষের মতো মানুষ যদি পাই, তবে তার সব পাওনা শোধ করে দিতে চাই যতদূর আমার সাধ্য আছে। এই আমার ধর্মকর্ম।"

চৌধুরী বললেন, "হুর্‌রে। শিলা ভাসে জলে। মেয়েদের মধ্যেও দৈবাৎ কোথাও কোথাও বুদ্ধির প্রমাণ মেলে দেখছি। আমার একটি বি. এস্‌-সি. বোকা আছে, সেদিন হঠাৎ দেখি, গুরুর পা ছুঁয়ে সে উলটো ডিগবাজি খেলতে লেগেছে, মগজ থেকে বুদ্ধি যাচ্ছে উড়ে ফাটা শিমুলের তুলোর মতো। তা তোমাব বাড়িতেই ওকে ল্যাবরেটরিতে বসিয়ে দিতে চাও? তফাতে আর কোথাও হলে হয় না?"

"চৌধুবীমশায়, আপনি ভুল করবেন না, আমি মেয়েমানুষ। এইখানেই এই ল্যাবরেটবিতেই হয়েছে আমার স্বামীর সাধনা। তাঁর ঐ বেদির তলায় কোনো-একজন যোগ্য লোককে বাতি জ্বালিয়ে বাখবাব জন্যে যদি বসিয়ে দিতে পারি, তা হলে যেখানে থাকুন তাঁর মন খুশি হবে।"

চৌধুরী বললেন, "বাই জোভ, এতক্ষণে মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। শুনতে খারাপ লাগল না। একটা কথা জেনে রেখো, রেবতীকে যদি শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি সাহায্য করতে চাও তা হলে লাখটাকারও লাইন পেরিয়ে যাবে।"

"গেলেও আমার খুদকুঁড়ো কিছু বাকি থাকবে।"

"কিন্তু পরলোকে যাঁকে খুশি করতে চাও তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে না তো? শুনেছি তাঁরা ইচ্ছা করলে ঘাড়ে চড়ে লাফালাফি করতে পারেন।"

"আপনি খববের কাগজ পড়েন তো। মানুষ মারা গেলেই তার গুণাবলী প্যারাগ্রাফে প্যারাগ্রাফে ছাপিয়ে পড়তে থাকে। সেই মৃত মানুষের বদান্যতার 'পরে ভরসা করলে তো দোষ নেই। টাকা যে মানুষ জমিয়েছে অনেক পাপ জমিয়েছে সে তার সঙ্গে, আমরা কী করতে আছি যদি থলি ঝেড়ে স্বামীর পাপ হালকা করতে না পারি। যাক গে টাকা, আমার টাকায় দরকার নেই।"

অধ্যাপক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, "কী আর বলব তোমাকে। খনি থেকে সোনা ওঠে, সে খাঁটি সোনা, যদিও তাতে মিশোল থাকে অনেক-কিছু। তুমি সেই ছদ্মবেশী সোনাব ঢেলা। চিনেছি তোমাকে। এখন কী করতে হবে বলো।"

"ঐ ছেলেটিকে রাজি করিয়ে দিন।"

"চেষ্টা করব, কিন্তু কাজটা খুব সহজ নয়। আর কেউ হলে তোমার দান লাফিয়ে নিত।"

"কোথায় বাধছে বলুন।"

"শিশুকাল থেকে একটি মেয়ে-গ্রহ ওর কুষ্ঠি দখল করে বসেছে। রাস্তা আগলে রয়েছে অটল অবুদ্ধি।"

"বলেন কী। পুরুষমানুষ—"

"দেখো মিসেস মল্লিক, রাগ করবে কাকে নিয়ে। জান মেট্রিয়ার্কাল সমাজ কাকে বলে। যে সমাজে মেয়েরাই হচ্ছে পুরুষের সেরা। এক সময়ে সেই দ্রাবিড়ী সমাজের ঢেউ বাংলাদেশে খেলত।"

সোহিনী বললে, "সে সুদিন তো গেছে। তলায় তলায় ঢেউ খেলে হয়তো, ঘুলিয়ে দেয় বুদ্ধিসুদ্ধি, কিন্তু হাল যে একলা পুরুষের হাতে। কানে মন্ত্র দেন তাঁরাই, আর জোরে দেন কানমলা। কান ছিঁড়ে যাবার জো হয়।"

"আহা হা, কথা কইতে জান তুমি। তোমার মতো মেয়েদের যুগ যদি আসে তা হলে মেট্রিয়ার্কাল সমাজে ধোবার বাড়ির ফর্দ রাখি মেয়েদের শাড়ির, আর আমাদের কলেজের প্রিন্সিপল্‌কে পাঠিয়ে দিই ঢেঁকি কুটতে। মনোবিজ্ঞান বলে, বাংলাদেশে মেট্রিয়ার্কি বাইরে নেই, আছে নাড়িতে। মা মা' শব্দে হাম্বাধ্বনি আর কোনো দেশের পুরুষমহলে শুনেছ কি। তোমাকে খবর দিচ্ছি, রেবতীর বুদ্ধিব ডগার উপরে চড়ে বসে আছে একটি রীতিমতো মেয়ে।"

"কাউকে ভালোবাসে নাকি।"

"আহা, সেটা হলে তো বুঝতুম, ওর শিরায় প্রাণ করছে ধুক্‌ধুক্। যুবতীর হাতে বুদ্ধি খোয়াবার বায়না নিয়েই তো এসেছে, এই তো সেই বয়েস। তা না হয়ে এই কাঁচা বযসে ও যে এক মালাজপকারিণীর হাতে মালাব গুটি বনে গেছে। ওকে বাঁচাবে কিসে—না যৌবন, না বুদ্ধি, না বিজ্ঞান।"

"আচ্ছা একদিন ওঁকে এখানে চা খেতে ডাকতে পারি কি। আমাদের মতো অশুচির ঘবে খাবেন তো?"

"অশুচি! না খায় তো ওকে আছড়ে আছড়ে এমনি শুচি করে নেব যে বামনাইয়ের দাগ থাকবে না ওর মজ্জায়। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার নাকি একটি সুন্দরী মেয়ে আছে?"

"আছে। পোড়াকপালী সুন্দরীও বটে। তা কী করব বলুন।"

"না না, আমাকে ভুল কোরো না। আমার কথা যদি বল, সুন্দরী মেয়ে আমি পছন্দই করি। ওটা আমার একটা রোগ বললেই হয়। কিন্তু ওর আত্মীয়েরা বেরসিক, ভয় পেয়ে যাবে।"

"ভয় নেই, আমি নিজের জাতেই মেয়েব বিয়ে দেব ঠিক কবেছি।"

এটা একেবারে বানানো কথা।

"তুমি নিজে তো বেজাতে বিয়ে করেছ।"

"নাকাল হয়েছি কম নয়। বিষয়ের দখল নিয়ে মামলা করতে হয়েছে বিস্তর। যে করে জিতেছি সেটা বলবার কথা নয়।"

"শুনেছি কিছু কিছু। বিপক্ষ পক্ষের আর্টিকেল্‌ড্ ক্লার্ককে নিয়ে তোমার নামে গুজব রটেছিল। মকদ্দমায় জিতে তুমি তো সরে পড়লে, সে লোকটা গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যায় আর কি।"

"এত যুগ ধরে মেয়েমানুষ টিঁকে আছে কী ক'রে। ছল করার কম কৌশল লাগে না, লড়াইয়ের তাগবাগের সমানই সে, তবে কিনা তাতে মধুও কিছু খরচ করতে হয়। এ হল নারীর স্বভাবদত্ত লাড়াইয়ের রীতি।"

"ঐ দেখো, আবার তুমি আমাকে ভুল করছ। আমরা বিজ্ঞানী, আমরা বিচারক নই, স্বভাবের খেলা আমরা নিষ্কাম ভাবে দেখে যাই। সে খেলায় যা ফল হবার তা ফলতে থাকে। তোমার বেলায় ফলটা বেশ হিসেবমতোই ফলেছিল, বলেছিলুম, ধন্য মেয়ে তুমি। এ কথাটাও ভেবেছি, আমি যে তখন প্রোফেসর ছিলুম, আর্টিকেল্‌ড্ ক্লার্ক ছিলুম না, সেটা আমার বাঁচোয়া। মার্করি সূর্যের কাছ থেকে যতটুকু দূরে আছে ততটুকু দূরে থেকেই বেঁচে গেল। ওটা গণিতের হিসাবের কথা, ওতে

ভালো নেই মন্দ নেই। এ-সব কথা বোধ হয় তুমি বুঝতে শিখেছ।"

"তা শিখেছি। গ্রহগুলো টান মেনে চলে আবার টান এড়িয়ে চলে—এটা একটা শিখে নেবার তত্ত্ব বৈকি।"

"আর-একটা কথা কবুল করছি। এইমাত্র তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে একটা হিসেব মনে মনে কষছিলুম, সেও অঙ্কের হিসেব। ভেবে দেখো, বয়সটা যদি অন্তত দশটা বছব কম হত তা হলে খামকা আজ একটা বিপদ ঘটত। কোলিশান ঐটুকু পাশ কাটিয়ে গেল আর কি! তবু বাষ্পের জোয়ার উঠছে বুকের মধ্যে। ভেবে দেখো, সৃষ্টিটা আগাগোড়াই কেবল অঙ্ককষার খেলা।"

এই বলে চৌধুরী দুই হাঁটু চাপড়িয়ে হাহা করে হেসে উঠলেন। একটা কথা তাঁর হুঁশ ছিল না যে, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার আগে সোহিনী দুঘন্টা ধরে রঙে চঙে এমন করে বয়স বদল করেছে যে সৃষ্টিকর্তাকে আগাগোড়াই দিয়েছে ঠকিয়ে।

৪

পবেব দিন অধ্যাপক এসে দেখলেন সোহিনী রোঁয়া-ওঠা হাড়-বের-করা একটা কুকুরকে স্নান করিয়ে তোয়ালে দিয়ে তার গা মুছিয়ে দিচ্ছে।

চৌধুরী জিগ্‌গেসা করলেন, "এই অপয়মন্তটাকে এত সম্মান কেন।"

"ওকে বাঁচিয়েছি ব'লে। পা ভেঙেছিল মোটরের তলায় পড়ে, আমি সারিয়ে তুলেছি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে। এখন ওর প্রাণটার মধ্যে আমারও শেয়ার আছে।"

"রোজ রোজ ঐ অলুক্ষুনের চেহারা দেখে মন খারাপ হয়ে যাবে না?"

"চেহারা দেখবার জন্যে ওকে তো রাখি নি। মরতে মবতে এই যে ও সেরে উঠছে, এটা দেখতে আমাব ভালো লাগে। ঐ প্রাণীর বেঁচে থাকবার দরকারটা যখন দিনে দিনে মিটিয়ে দিই, তখন ধর্ম কর্ম করতে ছাগলছানাব গলায দড়ি বেঁধে আমাকে কালীতলায় দৌড়তে হয় না। তোমাদেব বায়োলজির ল্যাবরেটবির কানাখোঁড়া কুকুর-খরগোশগুলোর জন্যে আমি একটা হাসপাতাল বানাব স্থির করেছি।"

"মিসেস মল্লিক, তোমাকে যতই দেখছি তাক লাগছে।"

"আবও বেশি দেখলে ওটার উপশম হবে। বেবতীবাবুর খবর দেবেন বলেছিলেন, সেটা আরম্ভ করে দিন।'

"আমাব সঙ্গে দূর সম্পর্কে ওদের যোগ আছে। তাই ওদের ঘরের খবর জানি। রেবতীকে জন্ম দিয়েই ওর মা যান মারা। বরাবর ও পিসির হাতে মানুষ। ওর পিসির আচারনিষ্ঠা একেবারে নিরেট। এতটুকু খুঁত নিয়ে ওঁর খুঁতখুঁতুনি সংসারকে অতিষ্ঠ করে তুলত। তাঁকে ভয় না করত এমন লোক ছিল না পরিবারে। ওঁর হাতে রেবতীর পৌরুষ গেল ছাতু হয়ে। স্কুল থেকে ফিরতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে পঁচিশ মিনিট লাগত তাব জবাবদিহি করতে।"

সোহিনী বললে, "আমি তো জানি পুরুষরা করবে শাসন, মেয়েরা দেবে আদর, তবেই ওজন ঠিক থাকে।"

অধ্যাপক বললেন, "ওজন ঠিক রেখে চলা মরালগামিনীদের ধাতে নেই। ওরা এদিকে ঝুঁকবে ওদিকে ঝুঁকবে। কিছু মনে কোরো না মিসেস মল্লিক, ওদের মধ্যেও দৈবাৎ মেলে যারা খাড়া রাখে মাথা, চলে সোজা চালে। যেমন —"

"আর বলতে হবে না। কিন্তু আমার মধ্যেও শিকড়ের দিকে মেয়েমানুষ যথেষ্ট আছে। কী ঝোঁকে পেয়েছে দেখছেন না। ছেলে-ধরা ঝোঁক। নইলে আপনাকে বিরক্ত করতেম কি।"

"দেখো, বার বার ঐ কথাটা বোলো না। জেনে রেখো আজ ক্লাসের জন্যে তৈরি না হয়েই

চলে এসেছি। কর্তব্যের গাফেলি এতই ভালো লাগছে।"

"বোধ হয় মেয়ে-জাতটার 'পরেই আপনার বিশেষ একটু কৃপা আছে।"

"একটুও অসম্ভব নয়। কিন্তু তার মধ্যেও তো ইতরবিশেষ আছে। যা হোক, সে কথাটা পরে হবে।"

সোহিনী হেসে বললে, "পরে না হলেও চলবে। আপাতত যে কথাটা উঠেছে শেষ করে দিন। রেবতীবাবুর এত উন্নতি হল কী করে।"

"যা হতে পারত তার তুলনায় কিছুই হয় নি। একটা রিসর্চের কাজে ওর বিশেষ দরকার হয়েছিল উঁচু পাহাড়ে যাবার। ঠিক করেছিল যাবে বদরিকাশ্রমে। আরে সর্বনাশ। পিসিরও ছিল এক পিসি, সে বুড়ি মরবে তো মরুক ঐ বদরিকারই রাস্তায়। পিসি বললে, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি, পাহাড়পর্বত চলবে না।' কাজেই তখন থেকে একমনে যা কামনা করছি সে মুখ ফুটে বলবার নয়। থাক্ সে কথা।"

"কিন্তু শুধু পিসিমাদের দোষ দিলে চলবে কেন। মায়ের দুলাল ভাইপোদের হাড় বুঝি কোনো কালে পাকবে না?"

"সে তো পূর্বেই বলেছি। মেট্রিয়ার্কি রক্তের মধ্যে হাম্বাধ্বনি জাগিয়ে তোলে, হতবুদ্ধি হয়ে যায় বৎসরা। আফসোসের কথা কী আর বলব। এ তো হল নম্বর ওয়ান। তার পরে রেবতী যখন সরকারের বৃত্তি নিয়ে কেম্‌ব্রিজে যাবে স্থির হল, আবার এসে পড়ল সেই পিসিমা হাউ হাউ শব্দ। তার বিশ্বাস, ও চলেছে মেমসাহেব বিয়ে করতে। আমি বললুম, নাহয় করল বিয়ে। সর্বনাশ, কথাটা আন্দাজে ছিল, এবার যেন পাকা দেখা হয়ে গেল। পিসি বললে, 'ছেলে যদি বিলেতে যায় তা হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরব।' কোন্ দেবতার দোহাই পাড়লে পাকানো হবে দড়িটা নাস্তিক আমি জানি নে, তাই দড়িটা বাজারে মিলল না। রেবতীকে খুব খানিকটা গাল দিলুম, বললুম স্টুপিড, বললুম ডান্স, বললুম ইম্‌বেসীল। ব্যস্, ঐখানেই খতম। রেবু এখন ভারতীয় ঘানিতে ফোঁটা ফোঁটা তেল বের করছেন।"

সোহিনী অস্থির হয়ে বলে উঠল, "দেয়ালে মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে করছে। একটা মেয়ে রেবতীকে তলিয়ে দিয়েছে, আর-একটা মেয়ে তাকে টেনে তুলবে ডাঙায়, এই আমার পণ রইল।"

"পষ্ট কথা বলি ম্যাডাম। জানোয়ারগুলোকে শিঙে ধরে তলিয়ে দেবার হাত তোমাব পাকা— লেজে ধরে তাদের উপরে তোলবার হাত তেমন দুরস্ত হয় নি। তা এখন থেকে অভ্যাসটা শুরু হোক। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সায়ান্সে এত উৎসাহ তোমার এল কোথা থেকে।"

"সকল রকম সায়ান্সেই সারা জীবন আমার স্বামীর মন ছিল মেতে। তাঁর নেশা ছিল বর্মা চুরুট আর ল্যাবরেটরি। আমাকে চুরুট ধরিয়ে প্রায় বর্মিজ মেয়ে বানিয়ে তুলেছিলেন। ছেড়ে দিলুম, দেখলুম পুরুষদের চোখে খটকা লাগে। তাঁর আর-এক নেশা আমার উপর দিয়ে জমিয়েছিলেন। পুরুষরা মেয়েদের মজায় বোকা বানিয়ে, উনি আমাকে মজিয়েছিলেন বিদ্যে দিয়ে দিনরাত। দেখুন চৌধুরীমশায়, স্বামীর দুর্বলতা স্ত্রীর কাছে ঢাকা থাকে না, কিন্তু আমি ওঁর মধ্যে কোনোখানে খাদ দেখতে পাই নি। কাছে থেকে যখন দেখতুম, দেখেছি উনি বড়ো; আজ দূরে থেকে দেখছি, দেখি উনি আরও বড়ো।"

চৌধুরী জিগ্‌গেসা করলেন, "কোন্‌খানে সবচেয়ে তাঁকে বড়ো ঠেকেছে।"

"বলব? উনি বিদ্বান বলে নয়। বিদ্যার 'পরে ওঁর নিষ্কাম ভক্তি ছিল ব'লে। উনি একটা পুজোর আলো পুজোর হাওয়ার মধ্যে ছিলেন। আমরা মেয়েরা দেখবার-ছোঁবার মতো জিনিস না পেলে পুজো করবার পথ পাই নে। তাঁর এই ল্যাবরেটরি আমার পুজোর দেবতা হয়েছে। ইচ্ছে করে এখানে মাঝে মাঝে ধূপধুনো জ্বালিয়ে শাঁখঘন্টা বাজাই। ভয় করি আমার স্বামীর ঘৃণাকে। তাঁর দৈনিক

পুজো ছিল, যখন এই-সব যন্ত্রতন্ত্র ঘিরে জমত কলেজের ছাত্রেরা, শিক্ষা নিত তাঁর কাছ থেকে, আর আমিও বসে যেতুম।"

"ছেলেগুলো সায়ান্সে মন দিতে পারত কি।"

"যারা পারত তাদেরই বাছাই হয়ে যেত। এমন-সব ছেলে দেখেছি যারা সত্যকার বৈরাগী। আবার দেখেছি কেউ কেউ নোট নেবার ছলে একেবারে পাশের ঠিকানায় চিঠি লিখে সাহিত্যচর্চা করত।"

"কেমন লাগত?"

"সত্যি কথা বলব? খারাপ লাগত না। স্বামী চলে যেতেন কাজে, ভাবুকদের মন আশেপাশে ঘুর ঘুর করত।"

"কিছু মনে কোরো না, আমি সাইকলজি স্টাডি করে থাকি। জিগ্‌গেসা কবি, ওরা কিছু ফল পেত কি।"

"বলতে ইচ্ছে কবে না, নোংরা আমি। দু-চাবজনের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে যাদের কথা মনে পড়লে আজও মনের মধ্যে মুচড়িয়ে ধরে।"

"দু-চারজন?"

"মন যে লোভী, মাংসমজ্জাব নীচে লোভের চাপা আগুন সে লুকিয়ে রেখে দেয়, খোঁচা পেলে জ্বলে ওঠে। আমি তো গোড়াতেই নাম ডুবিয়েছি, সত্যি কথা বলতে আমার বাধে না। আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে কবতে প্রাণ বেবিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদীকুন্তীদের সেজে বসতে হয় সীতা-সাবিত্রী। একটা কথা বলি আপনাকে চৌধুরীমশায়, মনে রাখবেন, ছেলেবেলা থেকে ভালোমন্দ বোধ আমাব স্পষ্ট ছিল না। কোনো গুরু আমায় তা শিক্ষা দেন নি। তাই মন্দেব মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে, পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগে নি। কিছু আমাকে আঁকড়ে ধবতে পাবে নি। যাই হোক, তিনি যাবার পথে তাঁর চিতার আগুনে আমার আসক্তিকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন, জমা পাপ একে একে জ্বলে যাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরিতেই জ্বলছে সেই হোমের আগুন।"

"ব্র্যাভো, সত্যি কথা বলতে কী সাহস তোমার।"

"সত্যি কথা বলিয়ে নেবার লোক থাকলে বলা সহজ হয়। আপনি যে খুব সহজ, খুব সত্যি।"

"দেখো, ঐ যে চিঠিলিখিয়ে ছেলেগুলো তোমার প্রসাদ পেয়েছিল, তারা কি এখনো আনাগোনা করে।"

"সেই করেই তো তারা মুছে দিয়েছে আমার মনের ময়লা। দেখলুম, জুটছে তারা আমার চেকবইয়ের দিকে লক্ষ্য করে। ভেবেছিল মেয়েমানুষের মোহ মরতে চায় না, ভালোবাসার সিঁধের গর্ত দিয়ে পৌঁছবে তাদের হাত আমার টাকাব সিন্দুকে। এত রস আমার নেই, তারা তা জানত না। আমার শুকনো পাঞ্জাবি মন। আমি সমাজের আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে প'ড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পাবব না। আমার ল্যাবরেটরির এক পয়সাও তারা খসাতে পারে নি। আমার প্রাণ শক্ত পাথর হয়ে চেপে আছে আমার দেবতার ভাণ্ডারের দ্বার। ওদের সাধ্য নেই সে পাথর গলাবে। আমাকে যিনি বেছে এনেছিলেন তিনি ভুল করেন নি।"

"তাঁকে আমি প্রণাম করি, আর পাই যদি সেই ছেলেগুলোর কান মলে দিই।"

বিদায় নেবার আগে অধ্যাপক একবার ল্যাবরেটরিটা ঘুরে এলেন সোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। বললেন, "এখানেই মেয়েলিবুদ্ধির চোলাই হয়ে গেছে, অপদেবতার গাদ গেছে নেমে, বেরিয়ে এসেছে খাঁটি স্পিরিট।"

সোহিনী বললে, "যা বলুন, মন থেকে ভয় যায় না। মেয়েলিবুদ্ধি বিধাতার আদি সৃষ্টি। যখন বয়স অল্প থাকে মনের জোর থাকে, তখন সে লুকিয়ে থাকে ঝোপেঝাপে, যেই রক্ত আসে ঠাণ্ডা হয়ে, বেরিয়ে আসেন সনাতনী পিসিমা। তার আগেই আমার মরবার ইচ্ছে রইল।"

অধ্যাপক বললেন, "ভয় নেই তোমার, আমি বলছি তুমি সজ্ঞানে মরবে।"

৫

সাদা শাড়ি পরে মাথায় কাঁচাপাকা চুলে পাউডার মেখে সোহিনী মুখের উপর একটি শুচি সাত্ত্বিক আভা মেজে তুললে। মেয়েকে নিয়ে মোটরলঞ্চে করে উপস্থিত হল বোটানিকালে। তাকে পরিয়েছে নীলচে সবুজ বেনারসী শাড়ি, ভিতর থেকে দেখা যায় বসন্তী রঙের কাঁচুলি। কপালে তার কুঙ্কুমের ফোঁটা, সূক্ষ্ম একটু কাজলের রেখা চোখে, কাঁধের কাছে ঝুলেপড়া গুচ্ছকরা খোঁপা, পায়ে কালো চমড়ার 'পরে লাল মখমলের কাজ-কবা স্যাণ্ডেল।

যে আকাশনিম-বীথিকার তলায় রেবতী রবিবাব কাটায় আগে থাকতে সংবাদ নিয়ে সোহিনী সেইখানেই এসে তাকে ধরলে। প্রণাম করলে একেবারে তার পায়ে মাথা রেখে। বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠল রেবতী।

সোহিনী বললে, "কিছু মনে কোরো না বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমি ছত্রির মেয়ে। চৌধুরীমশায়ের কাছে আমার কথা শুনে থাকবে।"

"শুনেছি। কিন্তু এখানে আপনাকে বসাব কোথায়।"

"এই-যে রয়েছে সবুজ তাজা ঘাস, এমন আসন কোথায় পাওয়া যায়। ভাবছ বোধ হয়, এখানে আমি কী করতে এসেছি। এসেছি আমার ব্রত উদ্‌যাপন করতে। তোমাব মতো ব্রাহ্মণ তো খুঁজে পাব না।"

রেবতী আশ্চর্য হয়ে বললে, "আমার মতো ব্রাহ্মণ?"

"তা না তো কী। আমার গুরু বলেছেন, এখনকার কালেব সবসেরা যে বিদ্যা তাতেই যাঁব দখল তিনিই সেরা ব্রাহ্মণ।" •

রেবতী অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "আমার বাবা করতেন যজনযাজন, আমি মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি নে।"

"বল কী, তুমি যে-মন্ত্র শিখেছ সেই মন্ত্রে সমস্ত জগৎ হয়েছে মানুষের বশ। তুমি ভাবছ মেয়েমানুষের মুখে এসব কথা এল কোথা থেকে। পেয়েছি পুরুষের মতো পুরুষের মুখ থেকে। তিনি আমার স্বামী। যেখানে তাঁব সাধনার পীঠস্থান ছিল, কথা দাও বাবা, সেখানে তোমাকে যেতে হবে।"

"কাল সকালে আমার ছুটি আছে, যাব।"

"তোমার দেখছি গাছপালার শখ। বড়ো আনন্দ হল। গাছপালাব খোঁজে আমার স্বামী গিয়েছিলেন বর্মায়, আমি তাঁর সঙ্গ ছাড়ি নি।

সঙ্গ ছাড়ে নি কিন্তু সায়ান্সের চর্চায় নয়। নিজের ভিতর থেকে যে গাদ উঠত ফুটে, স্বামীর চরিত্রের মধ্যেও সেটা অনুমান না করে থাকতে পারত না। সন্দেহের সংস্কার ছিল ওর আঁতে আঁতে। একসময়ে নন্দকিশোরের যখন গুরুতর পীড়া হয়েছিল, তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন, "মরবার একমাত্র আরাম এই যে, সেখান থেকে তুমি আমাকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।"

সোহিনী বললে, "সঙ্গে যেতে পারি তো।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "সর্বনাশ।"

সোহিনী রেবতীকে বললে, "বর্মা থেকে আসবার সময় এনেছিলুম এক গাছের চারা। বর্মিজরা

তাকে বলে ক্লোষাইটানিয়েঙ। চমৎকার ফুলের শোভা—কিন্তু কিছুতেই বাঁচাতে পারলুম না।"

আজই সকালে স্বামীর লাইব্রেরি ঘেঁটে এ নাম সোহিনী প্রথম বের করেছে। গাছটা চোখেও দেখে নি। বিদ্যার জাল ফেলে বিদ্বানকে টানতে চায়।

অবাক হল রেবতী। জিগ্‌গেসা করলে, "এর লাটিন নামটা কি জানেন।"

সোহিনী অনায়াসে বলে দিলে, "তাকে বলে মিলেটিযা।"

বললে, "আমার স্বামী সহজে কিছু মানতেন না, তবু তাঁর একটা অন্ধবিশ্বাস ছিল ফলে ফুলে প্রকৃতির মধ্যে যা-কিছু আছে সুন্দর, মেয়েবা বিশেষ অবস্থায় তার দিকে একান্ত করে যদি মন রাখে তা হলে সন্তানরা সুন্দর হয়ে জন্মাবেই এ কথা তুমি বিশ্বাস কর কি।"

বলা বাহুল্য এটা নর্দকিশোরেব মত নয়।

রেবতী মাথা চুলকিযে বললে, "যথোচিত প্রমাণ তো এখনও জড়ো হয নি।"

সোহিনী বললে, "অন্তত একটা প্রমাণ পেযেছি আমাব আপন ঘরেই। আমার মেয়ে এমন আশ্চর্য রূপ পেল কোথা থেকে। বসন্তের নানা ফুলের যেন—থাক্, নিজের চোখে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল রেবতী। নাট্যের কোনো সরঞ্জাম বাকি ছিল না।

সোহিনী তার বাঁধুনী বামুনকে সাজিয়ে এনেছে পূজারী বামুনের বেশে। পরনে চেলি, কপালে ফোঁটাতিলক, টিকিতে ফুল বাঁধা, বেলের আঠায় মাজা মোটা পইতে গলায। তাকে ডেকে বললে, "ঠাকুর, সময় তো হল, নীলুকে এবার ডেকে নিয়ে এসো।'

নীলাকে তার মা বসিয়ে রেখেছিল ষ্টীমলঞ্চে। ঠিক ছিল ডালি হাতে সে উঠে আসবে, বেশ খানিকক্ষণ তাকে দেখা যাবে সকালবেলাব ছায়ায়-আলোয।

ইতিমধ্যে রেবতীকে সোহিনী তন্ন তন্ন কবে দেখে নিতে লাগল। রঙ মসৃণ শ্যামবর্ণ, একটু হলদের আভা আছে। কপাল চওড়া, চুলগুলো আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে উপরে তোলা। চোখ বড়ো নয়, কিন্তু তাতে দৃষ্টিশক্তিব স্বচ্ছ আলো জ্বল্ জ্বল্ করছে, মুখেব মধ্যে সেইটেই সকলের চেয়ে চোখে পড়ে। নিচে মুখের বেড়টা মেয়েলি ধাঁচের মোলায়েম। রেবতীর সম্বন্ধে ও যত খবর জোগাড় কবেছে তার মধ্যে ও বিশেষ লক্ষ্য করেছে একটা কথা। ছেলেবেলাকাব বন্ধুদের ওর উপরে ছিল কান্নাকাটি-জড়ানো সেন্টিমেন্টাল ভালোবাসা। ওর মুখে যে একটা দুবল মাধুর্য ছিল, তাতে পুরুষ বালকেব মনে মোহ আনতে পারত।

সোহিনীর মনে খটকা লাগল। ওর বিশ্বাস, মেয়েদেব মনকে নোঙবের মতো শক্ত করে আঁকড়ে ধরার জন্যে পুরুষের ভালো দেখতে হওয়ার দরকারই করে না। বুদ্ধিবিদ্যেটাও গৌণ। আসল দরকার পৌরুষেব ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম। সেটা তাব স্নায়ুব পেশীর ভিতরকার বেতাব-বার্তাব মতো। প্রকাশ পেতে থাকে কামনার অকথিত স্পর্ধারূপে।

মনে পড়ল, নিজের প্রথম বয়সের রসোন্মত্ততার ইতিহাস। ও যাকে টেনেছিল কিংবা যে টেনেছিল ওকে, তার না ছিল রূপ, না ছিল বিদ্যা, না ছিল বংশগৌরব। কিন্তু কী একটা অদৃশ্য তাপের বিকিরণ ছিল যার অলক্ষ্য সংস্পর্শে সমস্ত দেহ মন দিয়ে ও তাকে অত্যন্ত করে অনুভব করেছিল পুরুষমানুষ ব'লে। নীলার জীবনে কখন একসময়ে সেই অনিবার্য আলোড়নের আরম্ভ হবে এই ভাবনা তাকে স্থির থাকতে দিত না। যৌবনের শেষ দশাই সকলের চেয়ে বিপদের দশা, সেই সময়টাতে সোহিনীকে অনেকখানি ভুলিয়ে রেখেছিল নিরবকাশ জ্ঞানের চর্চায়। কিন্তু দৈবাৎ সোহিনীর মনের জমি ছিল স্বভাবত উর্বরা। কিন্তু যে জ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক, সব মেয়ের তার প্রতি টান থাকে না। নীলার মনে আলো পৌঁছয় না।

নদীর ঘাট থেকে আস্তে আস্তে দেখা দিল নীলা। রোদ্দুর পড়েছে তার কপালে তার চুলে,

বেনারসী শাড়ির উপরে জরির রশ্মি ঝল্‌মল্‌ করে উঠছে। রেবতীর দৃষ্টি একমুহূর্তের মধ্যে ওকে ব্যাপ্ত করে দেখে নিলে। চোখ নামিয়ে নিল পরক্ষণেই। ছেলেবলো থেকে তার এই শিক্ষা। যে সুন্দরী মেয়ে মহামায়ার মনোহারিণী লীলা, তাকে আড়াল করে রেখেছে পিসির তর্জনী। তাই যখন সুযোগ ঘটে তখন দৃষ্টির অমৃত ওকে তাড়াতাড়ি এক চুমুকে গিলতে হয়।

মনে মনে রেবতীকে ধিক্কার দিয়ে সোহিনী বললে, "দেখো দেখো, একবার চেয়ে দেখো।"

রেবতী চমকে উঠে চোখ তুলে চাইলে।

সোহিনী বললে, "দেখো তো ডক্টর অব সায়ান্স, ওর শাড়ির রঙের সঙ্গে পাতার রঙের কী চমৎকার মিল হয়েছে।"

রেবতী সসংকোচে বললে, "চমৎকার।"

সোহিনী মনে মনে বলেল, "নাঃ, আর পারা গেল না" আবার বললে। "ভিতরে বসন্তী রঙ উঁকি মারছে, উপরে সব্‌জে নীল। কোন্‌ ফুলের সঙ্গে মেলে বলো দেখি।"

উৎসাহ পেয়ে রেবতী ভালো করেই দেখলে। বললে, "একটা ফুল মনে পড়ছে কিন্তু উপরের আবরণটা ঠিক নীল নয়, ব্রাউন।

"কোন্‌ ফুল বলো তো।"

রেবতী বললে, "মেলিনা।"

"ও বুঝেছি। তার পাঁচটি পাপড়ি, একটি উজ্জ্বল হলদে, বাকি চারটে শ্যামবর্ণ।"

রেবতী আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে, "এত করে ফুলের পরিচয় জানলেন কী করে।"

সোহিনী হেসে বললে, "জানা উচিত হয় নি বাবা। পুজোর সাজির বাইরের ফুল আমাদের কাছে পরপুরুষ বললেই হয়।"

ডালি হাতে এল ধীরে ধীরে নীলা। মা বললে, "জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন। পা ছুঁয়ে প্রণাম কর্‌।"

"থাক্‌ থাক্‌" ব'লে রেবতী অস্থির হয়ে উঠল। রেবতী আসন করে বসেছিল, পা খুঁজে বের করতে নীলাকে একটু হাতড়াতে হল। শিউরে উঠল রেবতীর সমস্ত শরীর। ডালিতে ছিল দুর্লভ-জাতীয় অর্কিডের মঞ্জরি, রুপোর থালায় ছিল বাদামের তক্তি, পেস্তার বরফি, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, মালাইয়ের বরফি, চৌকো করে কাটা কাটা ভাপা দই।

বললে, "এ সমস্তই তৈরি নীলার নিজের হাতে।"

সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। এসব কাজে নীলার না ছিল হাত, না ছিল মন।

সোহিনী বললে, "একটু মুখে দিতে হবে বাবা, ঘরে তৈরি তোমারই উদ্দেশে।"

ফরমাশে তৈরি বড়োবাজারের এক চেনা দোকানে।

রেবতী হাত জোড় করে বললে, "এ সময়ে খাওয়া আমার অভ্যাস নয়। বরং অনুমতি করেন যদি বাসায় নিয়ে যাই।"

সোহিনী বললে, "সেই ভালো। অনুরোধ করে খাওয়ানো আমার স্বামীর আইনে বারণ। তিনি বলতেন, মানুষ তো অজগরের জাত নয়।"

একটা বড়ো টিফিন-ক্যারিয়রে থাকে থাকে সোহিনী খাবার সাজিয়ে দিলে। নীলাকে বললে, "দে তো মা, সাজিতে ফুলগুলি ভালো করে সাজিয়ে। এক জাতের সঙ্গে আর-এক জাত মিশিয়ে দিস নে যেন। আর তোর খোঁপা ঘিরে ঐ যে সিল্কের রুমাল জড়িয়েছিস, ওটা পেতে দিস ফুলগুলির উপরে।"

বিজ্ঞানীর চোখে আর্টপিপাসুর দৃষ্টি উঠল উৎসুক হয়ে। এ যে প্রাকৃত জগতের মাপ-ওজনের বাইরেকার জিনিস। নানা রঙের ফুলগুলির মধ্যে নীলার সুঠাম আঙুল সাজাবার লয় রেখে নানা

ভঙ্গিতে চলছিল—রেবতীর চোখ ফেরানো দায় হল। মাঝে মাঝে নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে নিচ্ছিল। এক দিকে সেই মুখের সীমানা দিয়েছে চুনিমুক্তোপান্নার-মিশেলকরা একহারা হার জড়ানো চুলের ইন্দ্রধনু, আর-এক দিকে বসন্তীরঙা কাঁচুলির উচ্ছ্রিত রাঙা পাড়টি। সোহিনী মিষ্টান্ন সাজাচ্ছিল কিন্তু ওর একটা তৃতীয় নেত্র আছে যেন। সামনে যে একটা জাদু চলছিল সে ওর লক্ষ্য এড়ায় নি।

নিজের স্বামীর অভিজ্ঞতা অনুসারে সোহিনীর ধারণা ছিল বিদ্যাসাধনার বেড়া-দেওয়া খেত যে-সে গোরুর চরবার খেত নয়। আজ আভাস পেল বেড়া সকলের পক্ষে সমান ঘন নয়। সেটা ভালো লাগল না।

৬

পরের দিন সোহিনী অধ্যাপককে ডেকে পাঠালে, বললে, "নিজের গরজে আপনাকে ডেকে এনে মিছিমিছি কষ্ট দিই। হয়তো কাজের ক্ষতিও করি।"

"দোহাই তোমার, আরো-একটু ঘন ঘন ডেকো। দরকার থাকে তো ভালো, না থাকে তো আরও ভালো।"

"আপনি জানেন, দামী যন্ত্র সংগ্রহের নেশায় আমার স্বামীর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকত না। মানবদের ফাঁকি দিতেন এই নিষ্কাম লোভে। সমস্ত এশিয়ার মধ্যে এমন ল্যাবরেটরি কোথাও পাওয়া যাবে না, এই জেদ তাঁর মতো আমাকেও পেয়ে বসেছিল। এই জেদেই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, নইলে আমার মোদো বক্ত গাঁজিয়ে উঠে উপচিয়ে পড়ত চার দিকে। দেখুন চৌধুরীমশায়, নিজের স্বভাবের মধ্যে মন্দটা যা লেপটিয়ে থাকে সেটা যাঁর কাছে অসংকোচে বলতে পারি আপনি আমার সেই বন্ধু। নিজের কলঙ্কের দিকটা দেখাবার খোলসা দরজা পেলে মন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।"

চৌধুরী বললেন, "যারা সম্পূর্ণটা দেখতে পায় তাদের কাছে সত্যকে চাপা দেবার দরকার করে না। আধা সত্যই লজ্জার জিনিস। পুরোপুরি দেখার ধাত আমাদের, আমরা বিজ্ঞানী।"

"তিনি বলতেন, মানুষ প্রাণপণে প্রাণ বাঁচাতে চায় কিন্তু প্রাণ তো বাঁচে না। সেইজন্যে বাঁচবার শখ মেটাবার জন্যে এমন কিছুকে সে খুঁজে বেড়ায় যা প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি। সেই দুর্লভ জিনিসকে তিনি পেয়েছেন তাঁর এই ল্যাবরেটরিতে। একে যদি আমি বাঁচিয়ে রাখতে না পারি তা হলেই তাঁকে চরম করে মারব স্বামীঘাতিনী হয়ে। আমি এর রক্ষক চাই, তাই খুঁজছিলাম রেবতীকে।"

"চেষ্টা করে দেখলে?"

"দেখেছি, হাতে হাতে ফল পাবার আশা আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকবে না।"

"কেন।"

"ওঁর পিসিমা যেমনি শুনবেন রেবতীকে টেনেছি কাছে, অমনি তাঁকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবার জন্যে ছুটে আসবেন। ভাববেন, আমার মেয়ের সঙ্গে ওঁর বিয়ে দেবার ফাঁদ পেতেছি।"

"দোষ কী, হলে তো ভালোই হত। কিন্তু তুমি যে বলেছিলে, বেজাতে মেয়ের বিয়ে দেবে না।"

"তখনও আপনার মন জানতুম না, তাই মিথ্যে কথা বলেছিলুম। খুবই চেয়েছিলুম। কিন্তু ছেড়েছি সেই মতলব।"

"কেন।"

"বুঝতে পেরেছি, ও ভাঙনধরানো মেয়ে। ওর হাতে যা পড়বে তা আস্ত থাকবে না।"

"কিন্তু ও তো তোমারই মেয়ে।"

"আমারই মেয়ে তো বটে, তাই তো ওকে আঁতের ভিতর থেকেই চিনি।"

অধ্যাপক বললেন, "কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে কেন যে, মেয়েরা পুরুষের ইন্‌স্পিরেশন জাগাতে পারে।"

"আমার সবই জানা আছে। পুরুষের খোরাকে আমিষ পর্যন্ত ভালোই চলে কিন্তু মদ ধরালেই সর্বনাশ। আমার মেয়েটি মদের পাত্র, কানায় কানায় ভরা।"

"তা হলে কী করতে চাও বলো।"

"আমার ল্যাবরেটরি দান করতে চাই পাবলিককে।"

"তোমার একমাত্র মেয়েকে এড়িয়ে দিয়ে?"

"মেয়েকে? ওকে দান করলে সে দান পৌঁছবে কোন্ রসাতলে কী করে জানব। আমার ট্রাস্ট সম্পত্তির প্রেসিডেন্ট করে দেব রেবতীকে। তাতে তো পিসির আপত্তি হতে পারবে না?"

"মেয়েদের আপত্তির যুক্তি যদি ধরতেই পারব তা হলে পুরুষ হয়ে জন্মাতে গেলুম কেন। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি নে, ওকে যদি জামাই না করবে তা হলে প্রেসিডেন্ট করতে চাও কেন।"

"শুধু যন্ত্রগুলো নিয়ে কী হবে। মানুষ চাই ওদের প্রাণ দিতে। আর-একটা কথা এই, আমার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে একটাও নতুন যন্ত্র আনা হয় নি। টাকার অভাবে নয়। কিনতে হলে একটা লক্ষ্য ধরে কিনতে হয়। খবর জেনেছি, রেবতী ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্ নিয়ে কাজ করছেন। সেই পথে সংগ্রহ এগিয়ে চলুক, যত দাম লাগে লাগুক্-না।"

"কী আর বলব, পুরুষমানুষ যদি হতে তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে নেচে বেড়াতুম। তোমার স্বামী রেল-কোম্পানির টাকা চুরি করেছিলেন, তুমি চুরি করে নিয়েছ তাঁর পুরুষের মনখানা। এমন অদ্ভুত কলমের-জোড়-লাগানো বুদ্ধি আমি কখনও দেখি নি। আমারও পরামর্শ নেওয়া তুমি যে দরকার বোধ কর, এই আশ্চর্য।"

"তার কারণ আপনি যে খুব খাঁটি, ঠিক কথা বলতে জানেন।"

"হাসালে তুমি। তোমাকে বেঠিক কথা ব'লে ধরা পড়ব, এত বড়ো নিরেট বোকা আমি নই। তা হলে লাগা যাক এবার, জিনিসপত্র ফর্দ করা, দর যাচাই করা, ভালো উকিল ডেকে তোমার স্বত্ব বিচার করা, আইনকানুন বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি অনেক হাঙ্গামা আছে।"

"এ-সব দায় কিন্তু আপনারই।"

"সেটা হবে নামমাত্র। বেশ ভালো করেই জান, যা তুমি বলাবে তাই বলব, যা করাবে তাই করব। আমার লাভটা এই যে দুবেলা দেখা হবে তোমার সঙ্গে। তোমাকে যে কী চক্ষে দেখেছি তুমি তো জান না।"

সোহিনী চৌকি থেকে উঠে এসে ধাঁ করে এক হাতে চৌধুরীর গলা জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেয়ে চট্ করে সরে গেল, ভালোমানুষের মতো বসল গিয়ে চৌকিতে।

"ঐ রে সর্বনাশের শুরু হল দেখছি।"

"সে ভয় যদি একটুও থাকত তা হলে কাছেও এগতুম না। এ ররাদ্দ আপনার জুটবে মাঝে মাঝে।"

"ঠিক বলছ?"

"ঠিকই বলছি। আমার এতে খরচ নেই, আপনারও যে বেশি কিছু পাওনা আছে, মুখের ভাব দেখে তা বোধ হচ্ছে না।"

"অর্থাৎ বলতে চাও, এ হচ্ছে মরা কাঠে কাঠঠোকরার ঠোকর দেওয়া। — চললুম উকিলবাড়িতে।"

"কাল একবার আসবেন এ পাড়াতে।"

"কেন, কী করতে।"

"রেবতীর মনে দম দিতে।"

"আর নিজের মনটা খুইয়ে বসতে।"

"মন কি আপনার একলারই আছে।"

"তোমার মনের কিছু বাকি আছে নাকি।"

"উচ্ছিষ্ট অনেক পড়ে আছে।"

"তাতে এখনও অনেক বাঁদর নাচানো চলবে।"

৭

তাব পবদিনে বেবতী ল্যাবরেটরিতে নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত বিশ মিনিট আগে এসেই উপস্থিত, সোহিনী প্রস্তুত ছিল না, আটপৌরে কাপড়েই তাড়াতাড়ি চলে এল ঘরে। রেবতী বুঝতে পারলে গলদ হয়েছে। বললে, "আমাব ঘড়িটা ঠিক চলছে না দেখছি।" সোহিনী সংক্ষেপে বললে, "নিশ্চয়।" একসময় একটু কী শব্দ শুনে রেবতী মনে মনে চমকে উঠে দরজার দিকে তাকালে। সুখন বেহাবাটা গ্লাসকেসেব চাবি নিয়ে এল ঘরে।

সোহিনী জিগ্‌গেসা করলে, "এক পেয়ালা চা আনিয়ে দেব কি।"

রেবতী ভাবলে বলা উচিত, হাঁ। বললে, "দোষ কী।"

ও বেচারার চা অভ্যাস নেই, সর্দিব আভাস দিলে বেলপাতাসিদ্ধ গরম জল খেয়ে থাকে। মনে মনে বিশ্বাস ছিল স্বয়ং নীলা আসবে পেয়ালা হাতে।

সোহিনী জিগ্‌গেসা করলে, "তুমি কি কড়া চা খাও।"

ও ফস্‌ কবে বলে বসল, "হাঁ।"

ভাবলে এ ক্ষেত্রে হাঁ বলাটাই পাকা দস্তুর। এল চা, সেটা কড়া সন্দেহ নেই। কালির মতো বঙ, নিমেব মতো তিতো। চা আনলে মুসলমান খানসামা। এটাও ওকে পরীক্ষা করবার জন্যে। আপত্তি করতে ওব মুখে কথা সবল না। এই সংকোচ ভালো লাগল না সোহিনীব। খানসামাকে বললে, "চা-টা ঢেলে দাও-না মোবারক, ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।"

খানসামার হাতেব পরিবেশন-প্রত্যাশায় রেবতী বিশ মিনিট আগে এখানে আসে নি।

কী দুঃখে যে মুখে চামচ উঠছিল অন্তর্যামীই জানছিলেন, আর জানছিল সোহিনী। হাজার হোক মেয়েমানুষ, দুর্গতি দেখে বললে, "ও পেয়ালাটা থাক্‌। দুধ ঢেলে দিচ্ছি, তার সঙ্গে কিছু ফল খেয়ে নাও। সকাল সকাল এসেছ, বোধ হয় কিছু খেয়ে আসা হয় নি।" কথাটা সত্য। রেবতী ভেবেছিল আজও সেই বোটানিকালের পুনরাবৃত্তি হবে। কাছ দিয়েও গেল না, মুখে রয়ে গেল কড়া চায়েব তিতো স্বাদ আর মনে রয়েছে আশাভঙ্গের তিতো অভিজ্ঞতা।

এমন সময় প্রবেশ করলেন অধ্যাপক; ঘরে ঢুকেই রেবতীব পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, "কী রে হল কী, সব যে একেবারে ঠাণ্ডা হিম। খুকুব মতো বসে বসে দুধ খাচ্ছিস ঢকে ঢক। চার দিকে যা দেখছিস একি খোকাবাবুব খেলনাব দোকান। যাদের চোখ আছে তারা দেখেছে, মহাকালের চেলারা এইখানে আসে তাণ্ডবনৃত্য করতে।"

"আহা কেন বকছেন। না খেয়েই ও বেরিয়েছিল আজ সকালে। এল যখন তখন দেখলুম মুখ যেন শুকনো।"

"ঐ রে পিসিমা দি সেকেণ্ড। এক পিসিমা দেবে এক গালে চাপড়, আর-এক পিসিমা দেবে অন্য গালে চুমো। মাঝখানে প'ড়ে ছেলেটা যাবে ভিজে কাদা হয়ে। আসল কথা কী জান, লক্ষ্মী যখন আপনি সেধে আসেন চোখে পড়েন না; যারা সাত মুলুক ঘুরে তাঁকে খুঁজে বের করে, ধরা দেন তিনি তাদেরই কাছে। না-চেয়ে পাওয়ার মতো না-পাওয়ার আর রাস্তা নেই। আচ্ছা বলো

দেখি মিসেস—দূর হোক গে ছাই মিসেস, আমি ডাকবই তোমাকে সোহিনী ব'লে, এতে তুমি রাগই কর আর যাই কর।"

"মরণ আমার, রাগ করতে যাব কেন। ডাকুন আমাকে সোহিনী ব'লে, সুহি বললে আমার কান জুড়িয়ে যাবে।"

"গোপন কথাটা প্রকাশ করেই বলি। তোমার ঐ সোহিনী নামটির সঙ্গে আর-একটি শব্দের মিল আছে, বড়ো খাঁটি তার অর্থ। সকালে ঘুম থেকে উঠেই হিনি হিনি কিনি কিনি রবে ঐ দুটি শব্দ মিলিয়ে মনে মনে খঞ্জনি বাজাতে থাকি।"

"কেমিস্ট্রির রিসর্চে মিল করা আপনার অভ্যাস আছে, ওটা তারই একটা ফেঁকড়া।"

"মিল করতে গিয়ে মরেও অনেক লোক। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে নেই—ঘোরতব দাহ্য পদার্থ। এই বলে হাঃ হাঃ শব্দে উচ্চহাস্য করে উঠলেন।

"নাঃ, ঐ ছোকরাটার সামনে এ-সব কথার আলোচনা করতে নেই। বারুদের কারখানায় আজ পর্যন্ত ও অ্যাপ্রেন্টিসি শুরু করে নি। পিসিমার আঁচল ওকে আগলে আছে, সে আঁচল নন্‌কম্‌বাস্টিব্‌ল্‌।"

রেবতীর মেয়েলি মুখ লাল হয়ে উঠছিল।

"সোহিনী, আমি তোমাকে জিগ্‌গেসা করতে যাচ্ছিলুম, আজ সকালে তুমি কি ওকে আফিম খাইয়ে দিয়েছিলে। অমন ঝিমিয়ে পড়ছে কেন।"

"খাইয়ে যদি থাকি সেটা না জেনে।"

"রেবু, ওঠ্‌ বলছি ওঠ্‌। মেয়েদের কাছে অমন মুখচোরা হয়ে থাকতে নেই। ওতে ওদেব আস্পর্ধা বেড়ে যায়। ওরা তো ব্যামোর মতো পুরুষের দুর্বলতা খুঁজে বেড়ায়, ছিদ্র পেলেই টেম্পারেচব চড়িয়ে দেয় হু হু ক'রে। সাবজেকট্‌টা জানা আছে, ছেলেগুলোকে সাবধান করতে হয। আমাব মতো যারা ঘা খেয়েছে, মরে নি, তাদের কাছ থেকেই পাঠ নিতে হয। রেবু, কিছু মনে করিস নে বাবা। যারা কথা কয় না, চুপ করে থাকে, তারাই সব চেয়ে ভয়ংকর। চল্‌ দেখি, তোকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। ঐ দেখ্‌ দুটো গ্যালভানোমিটর, একেবারে হাল কায়দাব। এই দেখ্‌ হাই ভ্যাকুয়ম পম্প্‌, আর এটা মাইক্রোফোটোমিটর, এ ছেলে-পাস-করাবার কলার ভেলা নয়। একবার এখানে আসন গেড়ে বোস্‌ দেখি। সেই তোমার টাকপড়া মাথার প্রোফেসর—নাম করতে চাই নে—দেখি কেমন তার মুখ চুন হয়ে না যায়। আমার ছাত্র হয়ে যখন তুই বিদ্যে শুরু করলি আমি তোকে বলি নি কি, তোর নাকের সামনে ঝুলছে যাকে কথায় বলে 'ভবিষ্যৎ'। হেলাফেলা করে সেটাকে ফোঁপরা করে দিস নে যেন। তোর জীবনীর প্রথম চ্যাপটারের এক কোণে আমাব নামটাও ছোটো অক্ষরে লেখা যদি থাকে, সেটা হবে আমার মস্ত গুরুদক্ষিণা।"

দেখতে দেখতে বিজ্ঞানী জেগে উঠল। জ্বলে উঠল তার দুই চোখ। চেহারাটা একেবারে ভিতর থেকে গেল বদলে। মুগ্ধ হয়ে সোহিনী বললে, "তোমাকে যে-কেউ জানে তারা সকলেই তোমার এত বড়ো উন্নতির আশা করে যা প্রতিদিনের জিনিস নয়, যা চিবদিনের। কিন্তু আশা যতই বড়ো, ততই বড়ো তার বাধা ভিতরে বাইরে।"

অধ্যাপক রেবতীর পিঠে আর-একবার দিলে একটা মস্ত চাপড়। ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল তার শিরদাঁড়া। চৌধুরী তাঁর মস্ত ভারী গলায় বললেন, "দেখ্‌ রেবু, যে মহৎ ভবিষ্যতের বাহন হওয়া উচিত ছিল ঐরাবত, কৃপণ বর্তমান চাপিয়ে দেয় তাকে গোরুর গাড়িতে, কাদায় পড়ে থাকে সে অচল হয়ে। শুনছ, সোহিনী, সুহি?—না না ভয় নেই, পিঠে চাপড় মারব না। বলো সত্যি ক'রে, কথাটা আমি কেমন গুছিয়ে বলেছি।"

"চমৎকার।"

"ওটা লিখে রেখো তোমার ডায়ারিতে।"

"তা রাখব।"

"কথাটার মানেটা বুঝেছিস তো রেবি?"

"বোধ হয় বুঝেছি।"

"মনে রাখিস মস্ত প্রতিভার মস্ত দায়িত্ব। ও তো কারও নিজের জিনিস নয়। ওর জবাবদিহি অনন্তকালের কাছে। শুনছ সুহি, শুনছ? কথাটা কেমন বলেছি বলো তো ভাই।"

"খুব ভালো বলেছেন। আগেকার দিনের রাজা থাকলে গলা থেকে মালা খুলে—"

"তারা তো মরেছে সব, কিন্তু—"

"ঐ কিন্তুটুকু মরে নি, মনে থাকবে।"

রেবতী বললে, "ভয় নেই, কিছুতে আমাকে দুর্বল করবে না।"

সোহিনীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল। সোহিনী তাড়াতাড়ি আটকিয়ে দিলে।

চৌধুরী বললেন, "আরে করলে কী। পুণ্যকর্ম না করার দোষ আছে, পুণ্যকর্মে বাধা দেওয়ার দোষ আরও বেশি।"

সোহিনী বললে, "প্রণাম যদি করতে হয় তো ঐখানে।" — ব'লে বেদির উপরে বসানো নন্দকিশোরের মূর্তি দেখিয়ে দিলে। ধূপধুনো জ্বলছে, ফুলে ভরে আছে থালা।

বললে, "পাতকীকে উদ্ধার করার কথা পুরাণে পড়েছি। আমাকে উদ্ধার করেছেন ঐ মহাপুরুষ। অনেক নীচে নামতে হয়েছিল, শেষকালে তুলে বসাতে পেরেছেন—পাশে বললে মিথ্যে হবে, তাঁর পায়ের তলায়। বিদ্যার পথে মানুষকে উদ্ধার করবার দীক্ষা তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন। বলে গিয়েছেন যেন মেয়ে জামাইয়ের গুমর বাড়াবার জন্যে তাঁর জীবনের খনিখোঁড়া রত্ন ছাইয়ের গাদায় হারিয়ে না ফেলি। বললেন, 'ঐখানে রেখে গেলেম আমার সদ্গতি, আর সদ্গতি আমার দেশের।"

অধ্যাপক বললেন, "শুনলি তো রেবু? এটা হবে ট্রাস্ট সম্পত্তি, তোকে দেওয়া হবে তার কর্তৃত্ব।"

রেবতী ব্যস্ত হয়ে বললে, "কর্তৃত্ব নেবার যোগ্য আমি নই। আমি পারব না।"

সোহিনী বললে, "পারবে না! ছি, এ কি পুরুষের মতো কথা।"

রেবতী বললে, "আমি চিরদিন পড়াশুনো করে এসেছি, এরকম কাজের ভার কখনো নিই নি।"

চৌধুরী বললেন, "ডিম ফোটবার আগে কখনও হাঁস সাঁতার দেয় নি। আজ তোমার ডিমের খোলা ভাঙবে।"

সোহিনী বললে, "ভয় নেই তোমার, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।"

রেবতী আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল।

সোহিনী অধ্যাপকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। চৌধুরী বললেন, "জগতে বোকা অনেকরকম আছে, পুরুষ বোকা সকল বোকার সেরা। কিন্তু মনে রেখো, দায়িত্ব হাতে না পেলে দায়িত্বের যোগ্যতা জন্মায় না। একজোড়া হাত পেয়েছে মানুষ তাই সে হয়েছে মানুষ, একজোড়া খুর পেলেই তার সঙ্গে সঙ্গে মলবার যোগ্য লেজ আপনি গজিয়ে উঠত। তুমি কি রেবতীর হাতের বদলে খুর দেখতে পেয়েছ নাকি।"

"না, আমার ভালো লাগছে না। মেয়ের হাতেই যারা মানুষ কোনো কালে তাদের দুধে-দাঁত ভাঙে না। কপাল আমার। আপনি থাকতে আমি আর-কারও কথা কেন ভাবতে গেলুম।"

"খুশি হলুম শুনে। একটুখানি বুঝিয়ে দাও কী গুণ আছে আমার।"

"লোভ নেই আপনার একটুও।"

"এত বড়ো নিন্দের কথা। লোভের মতো জিনিসকে লোভ করি নে?—খুবই করি—"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তাঁর দুই গালে দুটো চুমো দিয়ে সোহিনী সরে গেল।

"কোন্ খাতায় জমা হল এটা সোহিনী।"

"আপনার কাছে যে ঋণ পেয়েছি সে তো শোধ করতে পারি নে, তারই সুদ দিচ্ছি।"

"প্রথম দিন পেয়েছি একটি, আজ পেলুম দুটি। কেবলই বেড়ে চলবে নাকি।"

"বাড়বে বৈকি, চক্রবৃদ্ধির নিয়মে।"

৮

চৌধুরী বললেন, "সোহিনী, তোমার স্বামীব শ্রাদ্ধে শেষকালে আমাকে পুরুত বানিয়ে দিলে? সর্বনাশ, এ কি কম দায়িত্ব। যার অস্তিত্ব হাতড়িয়ে পাওয়া যায় না তাকে খুশি কবা! এ তো বাঁধাদস্তুরের দানদক্ষিনে নয় যে—"

"আপনিও তো বাঁধাদস্তুরের গুরুঠাকুর নন, আপনি যা কববেন সেটাই হবে পদ্ধতি। দানেব ব্যবস্থা তৈরি করে বেখেছেন তো?"

"কদিন ধরে ঐ কাজই করেছি, দোকানবাজার কম ঘুবি নি। দানসামগ্রী সাজানো হয়ে গেছে নীচেব বড়ো ঘরটাতে। ইহলোকস্থিত আত্মা যারা এগুলো আত্মসাৎ করবে তারা পেট ভবে খুশি হবে, সন্দেহ নেই।"

চৌধুবীব সঙ্গে নীচে গিয়ে সোহিনী দেখলে, সায়ান্স-পড়ুয়া ছেলেদেব জন্যে নানা যন্ত্র, নানা মডেল, নানা দামী বই, নানা মাইক্রোস্‌কোপেব স্লাইড্‌স্, নানা বায়োলজিব নমুনা। প্রত্যেক সামগ্রীব সঙ্গে নাম ও ঠিকানা-লেখা কার্ড। আড়াইশো ছেলেব জন্যে চেক লেখা হয়েছে, এক বৎসবেব বৃত্তিব। খবচেব জন্যে কিছুমাত্র সংকোচ করা হয় নি। বড়ো বড়ো ধনীদেব শ্রাদ্ধে যে ব্রাহ্মণবিদায় হয় তাব চেয়ে এর ব্যয়ের প্রসর অনেক বেশি, অথচ বিশেষ কবে চোখে পড়ে না এব সমাবোহ।

"পুরুতবিদায়েব কী দক্ষিণা দিতে হবে, সেটা তো আপনি ধবে দেন নি।"

"আমাব দক্ষিণা তোমাব খুশি।"

"খুশিব সঙ্গে সঙ্গে আপনার জন্যে রেখেছি এই ক্রোনোমিটব। জর্মান থেকে আমাব স্বামী এটা কিনেছিলেন, ববাবব তাঁব রিসর্চেব কাজে লেগেছিল।"

চৌধুবী বললেন, "যা মনে আসছে তার ভাষা নেই। বাজে কথা বলতে চাই নে, আমাব পুরুতেব কাজ সার্থক হল।"

"আব-একটি লোক আছে, আজ তাকে ভুলতে পাবি নে—সে আমাদেব মানিকেব বিধবা বউ।"

"মানিক বলতে কাকে বোঝায়।"

"সে ছিল ওঁর ল্যাববেটরিব হেড মিস্ত্রি। আশ্চর্য তাব হাত ছিল। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজে এক চুল তার নড়্‌চড়্ হত না, কলকব্জার তত্ত্ব বুঝে নিতে তাব বুদ্ধি ছিল অভ্রান্ত। তাকে উনি অতিনিকট বন্ধুব মতো দেখতেন। গাড়ি করে নিয়ে যেতেন বড়ো বড়ো কাবখানাব কাজ দেখাতে। এদিকে সে ছিল মাতাল, ওঁর অ্যাসিস্টেন্টেরা তাকে ছোটোলোক ব'লে অবজ্ঞা কবত। উনি বলতেন, ও যে গুণী, তাব সে গুণ বানিয়ে তোলা যায় না, সে গুণ খুঁজে মিলবে না। ওঁব কাছে তার সম্মান পুরোমাত্রায় ছিল। এর থেকে বুঝবেন কেন যে উনি আমাকে শেষ পর্যন্ত এত মান দিয়েছিলেন। আমার মধ্যে যে মূল্য তিনি দেখেছিলেন তার তুলনায় দোষের ওজন ওঁর কাছে ছিল খুব সামান্য। যে জায়গায় আমার মতো কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েকে তিনি অসম্ভব রকম বিশ্বাস করেছিলেন, সে জায়গায় সে বিশ্বাস আমি কোনোদিন একটুমাত্র নষ্ট কবি নি। আজও মনপ্রাণ দিয়ে রক্ষা করছি। এতটা তিনি আব-কারও কাছে পেতেন না। যেখানে আমি ছিলেম ছোটো সেখানে আমি তাঁর চোখে

পড়ি নি, যেখানে আমি ছিলুম বড়ো সেখানে তিনি আমাকে পুরো সম্মান দিয়েছেন। আমার মূল্য যদি তাঁর চোখে না পড়ত তা হলে আমি কোথায় তলিয়ে যেতুম বলুন তো। আমি খুব খারাপ, কিন্তু আমি নিজেই বলছি আমি খুব ভালো, নইলে তিনি আমাকে কখনো সহ্য করতে পারতেন না।"

"দেখো সোহিনী, আমি অহংকার করে বলব যে আমি প্রথম থেকেই জেনেছি তুমি খুব ভালো। সস্তা দরের ভালো হলে কলঙ্ক লাগলে দাগ উঠত না।"

"যাক গে, আমাকে আর যে লোক যা মনে করুক না, তিনি আমাকে যা মান দিয়েছেন সে আজ পর্যন্ত টিকে আছে, আমার শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে।"

"দেখো সোহিনী, তোমাকে যত দেখছি ততই জানছি, তুমি সে জাতের সহজ মেয়েমানুষ নও যারা স্বামী নামটা শুনলেই গ'লে পড়ে।"

"না, তা নই; আমি দেখেছি ওঁর মধ্যে শক্তি, প্রথম দিন থেকে জেনেছি উনি মানুষ, আমি শাস্ত্র মিলিয়ে পতিব্রতাগিরি করতে বসি নি। আমি জাঁক করেই বলছি, আমার মধ্যে যে রত্ন আছে সে একা ওঁরই কণ্ঠহারে দোলবার মতো, আর কারও নয়।"

এমন সময় নীলা ঘরে এসে ঢুকে পড়ল। বললে, "অধ্যাপকমশায়, কিছু মনে করবেন না, মায়ের সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

"কিছু না মা, আমি এখন যাচ্ছি ল্যাবরেটরিতে। রেবতী কী রকম কাজ করছে দেখে আসি গে।"

নীলা বললে, "কোনো ভয় নেই। কাজ ভালোই চলছে। আমি এক-একদিন জানলার বাইরে থেকে দেখেছি, উনি মাথা গুঁজে লিখছেন, নোট নিচ্ছেন, কলম কামড়ে ধরে ভাবছেন। আমার প্রবেশ নিষেধ, পাছে সার আইজাকের গ্রাভিটেশন যায় ন'ড়ে। সেদিন মা কাকে বলছিলেন উনি ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্ নিয়ে কাজ করছেন, তাই পাশ দিয়ে কেউ গেলেই কাঁটা নড়ে যায়, বিশেষত মেয়েরা।"

চৌধুরী হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, "মা, ল্যাবরেটরি ভিতরেই আছে, ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্ নিয়ে কাজ চলছেই, কাঁটা যাঁরা নড়িয়ে দেন তাঁদের ভয় করতেই হয়। দিগ্‌ভ্রম ঘটায় যে। তবে চললুম।"

নীলা মাকে বললে, "আমাকে আর কতদিন তোমার আঁচলের গাঁট দিয়ে বেঁধে রাখবে। পেরে উঠবে না, কেবল দুঃখ পাবে।"

"তুই কী করতে চাস বল্‌।"

নীলা বললে, "তুমি তো জানই মেয়েদের জন্যে একটা হাইয়র স্টাডি মুভমেন্ট খোলা হয়েছে, তুমি তাতে অনেক টাকা দিয়েছ। সেখানে আমাকে কেন কাজে লাগাও না।"

"আমার ভয় আছে পাছে তুই ঠিকমতো না চলিস।"

"সব চলাই বন্ধ করে দেওয়াই কি ঠিক চলার রাস্তা।"

"তা নয়, তা তো জানি, সেই তো আমার ভাবনা।"

"তুমি না ভেবে একবার আমাকে ভাবতে দাও-না। সে তো দিতেই হবে। আমি তো এখন খুকি নই। তুমি ভাবছ সেই-সব পাবলিক জায়গায় নানা লোকের যাওয়া-আসা আছে, সে একটা বিপদ। জগৎ-সংসারে লোকচলাচল তো বন্ধ হবে না তোমার খাতিরে। আর তাদের সঙ্গে আমার জানাশুনো একেবারেই ঠেকিয়ে রাখবে যে সে আইন তো তোমার হাতে নেই।"

"জানি সব জানি, ভয় করে ভয়ের কারণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। তা হলে তুই ওদের হাইয়র স্টাডি সার্কলে ভরতি হতে চাস?"

"হাঁ চাই।"

"আচ্ছা তাই হবে। সেখানকার পুরুষ অধ্যাপকদের একে একে দিবি জাহান্নমে সে জানি। কেবল একটি কথা দিতে হবে আমাকে। কোনোমতেই তুই রেবতীর কাছে ঘেঁষতে পাবি নে। আর কোনো ছুতোতেই ঢুকবি নে তার ল্যাবরেটরিতে।"

"মা, তুমি আমাকে কী মনে কর ভেবে পাই নে। কাছে ঘেঁষতে যাব তোমার ঐ খুদে সার আইজাক নিউটনের, এমন রুচি আমার?—মরে গেলেও না।"

সংকোচ বোধ করলে রেবতী শরীরটাকে নিয়ে যে রকম আঁকুবাঁকু করে তারই নকল ক'রে নীলা বললে, "ঐ স্টাইলের পুরুষকে নিয়ে আমার চলবে না। যে-সব মেয়েরা ভালোবাসে বুড়ো খোকাদের মানুষ করতে, ওকে জিইয়ে রেখে দেওয়া ভালো তাদেরই জন্যে। ও মারবার যোগ্য শিকারই নয়।"

"একটু বেশি বাড়িয়ে কথা বলছিস নীলা, তাই ভয় হচ্ছে ওটা ঠিক তোর মনের কথা নয়। তা হোক, ওর সম্বন্ধে তোর মনের ভাব যাই হোক, ওকে যদি মাটি করতে চাস তা হলে সে তোর পক্ষে ভালো হবে না।"

"কখন তোমার কী মর্জি কিছুই বুঝতে পারি নে মা। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্যে তুমি আমাকে সাজিয়ে পুতুল গড়ে তুলেছিলে, সে কি আমি বুঝতে পারি নি। সেইজন্যেই কি তুমি আমাকে ওর বেশি কাছে আনাগোনা করতে বারণ করছ, পাছে, চেনাশোনার ঘেঁষ লেগে পালিশ নষ্ট হয়ে যায়।"

"দেখ্ নীলা, আমি তোকে ব'লে দিচ্ছি তোর সঙ্গে ওর বিয়ে কিছুতেই হতে পারবে না।"

"তা হলে আমি যদি মোতিগড়ের রাজকুমারকে বিয়ে করি?"

ইচ্ছা হয় তো করিস।"

"সুবিধে আছে, তার তিনটে বিয়ে, আমার দায় অনেকটা হালকা হবে, আর সে মদ খেয়ে ঢলাঢলি করে নাইটক্লাবে—তখন আমি অনেকটা ছুটি পাব।"

"আচ্ছা বেশ, সেই ভালো। রেবতীর সঙ্গে তোর বিয়ে হতে দেব না।"

"কেন, তোমার সার আইজাক নিউটনের বুদ্ধি আমি ঘুলিয়ে দেব মনে কর?"

"সে তর্ক থাক্, যা বললুম তা মনে রাখিস।"

"উনি নিজেই যদি হ্যাংলাপনা করেন।"

"তা হলে এ পাড়া তাকে ছাড়তে হবে—তোর অন্নে তাকে মানুষ করিস, তোর বাপের তহবিল থেকে এক কড়িও সে পাবে না।"

"সর্বনাশ। তা হলে নমস্কার সার আইজাক নিউটন।"

সেদিনকার পালা সংক্ষেপে এই পর্যন্ত।

৯

"চৌধুরীমশায়, আর সবই চলছে ভালো কেবল আমার মেয়ের ভাবনায় সুস্থির হতে পারছি নে। ও যে কোন্ দিকে তাক করতে শুরু করেছে বুঝতে পারছি নে।"

"চৌধুরী বললেন, "আবার ওর দিকে তাক করছে কারা সেটাও একটা ভাববার কথা। হয়েছে কি, এরই মধ্যে রটে গেছে ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্যে তোমার স্বামী অগাধ টাকা রেখে গেছে। মুখে মুখে তার অঙ্কটা বেড়েই চলেছে। এখন রাজত্ব আর রাজকন্যা নিয়ে বাজারে একটা জুয়োখেলার সৃষ্টি হয়েছে।"

"রাজকন্যাটি মাটির দরে বিকোবে তা জানি, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে রাজত্ব সস্তায় বিকোবে না।"

"কিন্তু লোকের আমদানি শুরু হয়েছে। সেদিন হঠাৎ দেখি, আমাদেরই অধ্যাপক মজুমদার ওরই হাত ধরে বেরিয়ে এল সিনেমা থেকে। আমাকে দেখেই ঘাড় বেঁকিয়ে নিল। ছেলেটা ভালো ভালো বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়, দেশের মঙ্গলের দিকে ওর বুলি খুব সহজে খেলে। কিন্তু সেদিন ওর বাঁকা ঘাড় দেখে স্বদেশের জন্যে ভাবনা হল।"

"চৌধুরীমশায়, আগল ভেঙেছে।"

"ভেঙেছে বৈকি। এখন এই গরিবকেই নিজের ঘটিবাটি সামলাতে হবে।"

"মজুমদার-পাড়ায় মড়ক লাগে লাগুক, আমার ভয় রেবতীকে নিয়ে।"

চৌধুরী বললেন, "আপাতত ভয় নেই। খুব ডুবে আছে। কাজ করছে খুব চমৎকার।"

"চৌধুরীমশায়, ওর বিপদ হচ্ছে সায়ান্সে ও যত বড়ো ওস্তাদই হোক, তুমি যাকে মেট্রিয়ার্কি বল সে রাজ্যে ও ঘোর আনাড়ি।"

"সে কথা ঠিক। ওর একবারও টিকে দেওয়া হয় নি। ছোঁয়াচ লাগলে বাঁচানো শক্ত হবে।"

"রোজ একবার কিন্তু ওকে আপনাকে দেখে যেতে হবে।"

" কোথা থেকে ও আবার ছোঁয়াচ না নিয়ে আসে। শেষকালে এ বয়সে আমি না মরি। ভয় কোরো না, মেয়েমানুষ যদিও, তবুও আশা করি ঠাট্টা বুঝতে পার। আমি পার হয়ে গেছি এপিডেমিকের পাড়াটা। এখন ছোঁয়া লাগলেও ছোঁয়াচ লাগে না। কিন্তু একটা মুশকিল ঘটেছে। পরশু আমাকে যেতে হবে গুজরানওয়ালায়।"

"এটাও ঠাট্টা নাকি। মেয়েমানুষকে দয়া করবেন।"

"ঠাট্টা নয়, আমার সতীর্থ অমূল্য আড্ডি ছিলেন সেখানকার ডাক্তার। বিশ-পঁচিশ বছর প্র্যাকটিস করেছেন। কিছু বিষয়সম্পত্তিও জমিয়েছেন। হঠাৎ বিধবা স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে রেখে মরেছেন হার্টফেল করে। দেনাপাওনা চুকিয়ে জমিজমা বেচে তাদের উদ্ধার করে আনতে হবে আমাকে। কতদিন লাগবে ঠিক জানি নে।"

"এর উপরে আর কথা নেই।"

'এ সংসারে কথা কিছুরই উপরে নেই সোহিনী। নির্ভয়ে বলো, যা হবেই তা হোক। যারা অদৃষ্ট মানে তারা ভুল করে না। আমরা সায়ান্টিস্ট্‌রাও বলি অনিবার্যের এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। যতক্ষণ কিছু করবার থাকে করো, যখন কোনোমতেই পারবে না, বোলো বাস্‌।"

"আচ্ছা তাই ভালো।"

"যে মজুমদারটির কথা বললুম, দলের মধ্যে সে তত বেশি মারাত্মক নয়। তাকে ওরা দলে টেনে রাখে মান বাঁচাবার জন্যে। আর-যাদের কথা শুনেছি, চাণক্যের মতে তাদের কাছ থেকে শত হস্ত দূরে থাকলেও ভাবনার কারণ থেকে যায়। অ্যাটর্নি আছে বঙ্কুবিহারী, তাকে আশ্রয় করা আর অক্টোপসকে জড়িয়ে ধরা একই কথা। ধনী বিধবার তপ্ত রক্ত এই-সব লোক পছন্দ করে। খবরটা শুনে রাখো, যদি কিছু করবার থাকে কোরো। সবশেষে আমার ফিলজফিটা মনে রেখো।"

"দেখুন চৌধুরীমশায়, রেখে দিন ফিলজফি। মানব না আপনার অদৃষ্ট, মানব না আপনার কার্যকারণের অমোঘ বিধান, যদি আমার ল্যাবরেটরির 'পরে কারও হাত পড়ে। আমি পাঞ্জাবের মেয়ে, আমার হাতে ছুরি খেলে সহজে। আমি খুন করতে পারি তা সে আমার নিজের মেয়ে হোক, আমার জামাই-পদের উমেদার হোক।"

ওর শাড়ির নিচে ছিল কোমরবন্ধ লুকোনো। তার থেকে ধাঁ করে এক ছুরি বের করে আলোয় ঝলক খেলিয়ে দিয়ে গেল। বললে, "তিনি আমাকে বেছে নিয়েছিলেন—আমি বাঙালির মেয়ে নই, ভালোবাসা নিয়ে কেবল চোখের জল ফেলে কান্নাকাটি করি নে। ভালোবাসার জন্যে প্রাণ দিতে পারি প্রাণ নিতে পারি। আমার ল্যাবরেটরি আর আমার বুকের কলিজা, তার মাঝখানে রয়েছে এই ছুরি।"

চৌধুরী বললেন, "একসময় কবিতা লিখতে পারতুম, আজ আবার মনে হচ্ছে হয়তো পারি লিখতে।"

"কবিতা লিখতে হয় লিখবেন, কিন্তু আপনার ফিলজফি ফিরিয়ে নিন। যা না মানবার তাকে আমি শেষ পর্যন্ত মানব না। একলা দাঁড়িয়ে লড়ব। আর বুক ফুলিয়ে বলব, জিতবই, জিতবই, জিতবই।"

"ব্র্যাভো, আমি ফিরিয়ে নিলুম আমার ফিলজফিটা। এখন থেকে লাগাব ঢাকে চাঁটি তোমার জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে। আপাতত কিছুদিনের জন্যে বিদায় নিচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে না।"

আশ্চর্যের কথা এই সোহিনীর চোখে জল ভরে এল। বললে, "কিছু মনে করবেন না।" জড়িয়ে ধরলে চৌধুরীর গলা। বললে, "সংসারে কোনো বন্ধনই টেঁকে না, এও মুহূর্তকালের জন্যে।"

ব'লেই গলা ছেড়ে দিয়ে পায়ের কাছে প'ড়ে সোহিনী অধ্যাপককে প্রণাম করলে।

১০

খবরের কাগজে যাকে বলে 'পরিস্থিতি' সেটা হঠাৎ এসে পড়ে, আর আসে দল বেঁধে। জীবনের কাহিনী সুখে দুঃখে বিলম্বিত হয়ে চলে। শেষ অধ্যায়ে কোলিশন লাগে অকস্মাৎ, ভেঙেচুরে স্তব্ধ হয়ে যায়। বিধাতা তাঁর গল্প গড়েন ধীরে ধীরে, গল্প ভাঙেন এক ঘায়ে।

সোহিনীর আইমা থাকেন আম্বালায়। সোহিনী তার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছে, 'যদি দেখা করতে চাও শীঘ্র এসো'।

এই আইমা তার একমাত্র আত্মীয় যে বেঁচে আছে। এরই হাত থেকে নন্দকিশোর কিনে নিয়েছিলেন সোহিনীকে।

নীলাকে তার মা বললে, "তুমিও আমার সঙ্গে এসো।"

নীলা বললে, "সে তো কিছুতেই হতে পারে না।"

"কেন পারে না।"

"ওরা আমাকে অভিনন্দন দেবে তারই আয়োজন চলছে।"

"ওরা কারা।"

"জাগানী ক্লাবের মেম্বররা। ভয় পেয়ে না, খুব ভদ্র ক্লাব। মেম্বরদের নামের ফর্দ দেখলেই বুঝতে পারবে। খুবই বাছাই করা।"

"তোমাদের উদ্দেশ্য কী।"

"স্পষ্ট বলা শক্ত। উদ্দেশ্যটা নামের মধ্যেই আছে। এই নামের তলায় আধ্যাত্মিক সাহিত্যিক আর্টিস্টিক সব মানেই খুব গভীরভাবে লুকোনো আছে। নবকুমারবাবু খুব চমৎকার ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন। ওরা ঠিক করেছে তোমার কাছ থেকে চাঁদা নিতে আসবে।"

"কিন্তু চাঁদা দেখছি ওঁরা নিয়ে শেষ করেছে। তুমি ষোলো আনাই পড়েছ ওর হাতে। কিন্তু এই পর্যন্তই। আমার যেটা ত্যাজ্য সেটাই ওরা পেয়েছে। আমার কাছ থেকে আর কিছু পাবার নেই।"

"মা, এত রাগ করছ কেন। ওঁরা নিঃস্বার্থভাবে দেশের উপকার করতে চান।"

"আচ্ছা সে আলোচনা থাক্। এতক্ষণে তুমি বোধ হয় তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে খবর পেয়েছ যে তুমি স্বাধীন।"

"হাঁ পেয়েছি।"

"নিঃস্বার্থরা তোমাকে জানিয়েছেন যে তোমার স্বামীর দত্ত অংশে তোমার যে টাকা আছে সে তুমি যেমন খুশি ব্যবহার করতে পার।"

"হাঁ জেনেছি।"

"আমার কানে এসেছে উইলের প্রোবেট নেবার জন্যে তোমরা প্রস্তুত হচ্ছ। কথাটা বোধ হয় সত্যি?"

"হাঁ সত্যি। বঙ্কুবাবু আমার সোলিসিটর।"

"তিনি তোমাকে আরও কিছু আশা এবং মন্ত্রণা দিয়েছেন।"

নীলা চুপ করে রইল।

"তোমার বঙ্কুবাবুকে আমি সিধে করে দেব যদি আমার সীমানায় তিনি পা বাড়ান। আইনে না পারি বে-আইনে। ফেরবার সময় আমি পেশোয়ার হয়ে আসব। আমার ল্যাবরেটরি রইল দিনরাত্রির চারজন শিখ সিপাইয়ের পাহারায়। আর যাবার সময় এই তোমাকে দেখিয়ে যাচ্ছি— আমি পাঞ্জাবের মেয়ে।"

ব'লে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ছুরি বের করে বললে, "এ ছুরি না চেনে আমার মেয়েকে, না চেনে আমার মেয়ের সোলিসিটরকে। এর স্মৃতি রইল তোমার জিম্মায়। ফিরে এসে যদি হিসেব নেবার সময় হয় তো হিসেব নেব।"

১১

ল্যাবরেটরির চার দিকে অনেকখানি জমি ফাঁকা আছে। কাঁপন বা শব্দ যাতে যথাসম্ভব কাজের মাঝখানে না পৌঁছয়। এই নিস্তব্ধতা কাজের অভিনিবেশে রেবতীকে সহায়তা করে। তাই ও প্রায়ই এখানে রাত্রে কাজ করতে আসে।

নীচের ঘড়িতে দুটো বাজল। মুহূর্তের জন্য রেবতী তার চিন্তার বিষয় ভাবছিল জানলার বাইরে আকাশের দিকে চোখ মেলে।

এমন সময়ে দেওয়ালে পড়ল ছায়া। চেয়ে দেখে ঘরের মধ্যে এসেছে নীলা রাত-কাপড় পরা, পাতলা সিল্কের শেমিজ। ও চমকে চৌকি থেকে উঠে পড়তে যাচ্ছিল। নীলা এসে ওর কোলের উপর বসে গলা জড়িয়ে ধরল। রেবতীর সমস্ত শরীর থর্‌ থর্‌ ক'রে কাঁপতে লাগল, বুক উঠতে পড়তে লাগল প্রবলবেগে। গদ্গদ কণ্ঠে বলতে লাগল, "তুমি যাও, এ ঘর থেকে তুমি যাও।"

ও বললে, "কেন।"

রেবতী বললে, "আমি সহ্য করতে পারছি নে। কেন এলে তুমি এ ঘরে।"

নীলা ওকে আরও দৃঢ়বলে চেপে ধরে বললে, "কেন, আমাকে কি তুমি ভালোবাস না।"

রেবতী বললে, "বাসি, বাসি, বাসি। কিন্তু এ ঘর থেকে তুমি যাও।"

হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল পাঞ্জাবী প্রহরী; ভর্ৎসনার কণ্ঠে বললে, "মায়িজি, বহুত শরমকি বাৎ হ্যায়ে, আপ বাহার চলা যাইয়ে।"

রেবতী চেতনমনের অগোচরে ইলেকট্রিক ডাকঘড়িতে কখন্‌ চাপ দিয়েছিল।

পাঞ্জাবী রেবতীকে বললে, "বাবুজি, বেইমানি মৎ করো।"

রেবতী নীলাকে জোর করে ঠেলে দিয়ে চৌকি থেকে উঠে পড়ল। দরোয়ান ফের নীলাকে বললে, "আপ বাহার চলা যাইয়ে, নহি তো মনিবকো হুকুম তামিল করে গা।"

অর্থাৎ জোর করে অপমান করে বের করে দেবে। বাইরে যেতে যেতে নীলা বললে, "শুনছেন সার আইজাক নিউটন?—কাল আমাদের বাড়িতে আপনার চায়ের নেমন্তন্ন, ঠিক চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময়। শুনতে পাচ্ছেন না? অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন?" ব'লে একবার তার দিকে ফিরে দাঁড়ালে।

বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে উত্তর এল, "শুনেছি।"

রাত-কাপড়ের ভিতর থেকে নীলার নিখুঁত দেহের গঠন ভাস্করের মূর্তির মতো অপরূপ হয়ে ফুটে উঠল, রেবতী মুগ্ধ চোখে না দেখে থাকতে পারল না। নীলা চলে গেল। রেবতী টেবিলের উপর মুখ রেখে পড়ে রইল। এমন আশ্চর্য সৌন্দর্য সে কল্পনা করতে পারে না। একটা কোন্ বৈদ্যুত বর্ষণ প্রবেশ করেছে ওর শিরার মধ্যে, চকিত হয়ে বেড়াচ্ছে অগ্নিধারায়। হাতের মুঠো শক্ত করে রেবতী কেবলই নিজেকে বলাতে লাগল, কাল চায়ের নিমন্ত্রণে যাবে না। খুব শক্ত শপথ করবার চেষ্টা করতে চায়, মুখ দিয়ে বেরয় না। ব্লটিঙের উপর লিখল, যাব না, যাব না, যাব না। হঠাৎ দেখলে তার টেবিলে একটা ঘন লাল রঙের রুমাল পড়ে আছে, কোণে নাম সেলাই করা 'নীলা'। মুখের উপর চেপে ধরল রুমাল, গন্ধে মগজ উঠল ভরে, একটা নেশা সির্ সির্ করে ছড়িয়ে গেল সর্বাঙ্গে।

নীলা আবার ঘরের মধ্যে এল। বললে, "একটা কাজ আছে ভুলে গিয়েছিলুম।"

দরোয়ান রুখতে গেল। নীলা বললে, "ভয় নেই তোমার, চুরি করতে আসি নি। একটা কেবল সই চাই। জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট করব তোমাকে—তোমার নাম আছে দেশ জুড়ে।"

অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে রেবতী বললে, "ও ক্লাবের আমি তো কিছুই জানি নে।"

"কিছুই তো জানবার দরকার নেই। এইটুকু জানলেই হবে ব্রজেন্দ্রবাবু এই ক্লাবের পেট্রন।"

"আমি তো ব্রজেন্দ্রবাবুকে জানি নে।"

"এইটুকু জানলেই হবে, মেট্রপলিটান ব্যাঙ্কের তিনি ডাইরেক্টর। লক্ষ্মী আমার, জাদু আমার, একটা সই বৈ তো নয়।" ব'লে ডান হাত দিয়ে তার কাঁধ ঘিরে তার হাতটা ধরে বললে, "সই করো।"

সে স্বপ্নাবিষ্টের মতো সই করে দিলে।

কাগজটা নিয়ে নীলা যখন মুড়ছে দরোয়ান বললে, "এ কাগজ আমাকে দেখতে হবে।"

নীলা বললে, "এ তো তুমি বুঝতে পারবে না।"

দরোয়ান বললে, "দরকার নেই বোঝবার।" বলে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে। বললে, "দলিল বানাতে হয় বাইরে গিয়ে বানিয়ো এখানে নয়।"

রেবতী মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। দরোয়ান নীলাকে বললে, "মাজি, এখন চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি গে।" বলে তাকে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার ঘরে ঢুকল পাঞ্জাবী। বললে, "চারি দিকে আমি দরজা বন্ধ কবে রাখি, তুমি ওকে ভিতর থেকে খুলে দিয়েছ।"

এ কী সন্দেহ, কী অপমান। বারবার করে বললে, "অমি খুলি নি।"

"তবে ও কী করে ঘরে এল।"

সেও তো বটে। বিজ্ঞানী তখন সন্ধান করে বেড়াতে লাগল ঘরে ঘরে। অবশেষে দেখলে রাস্তার ধারের একটা বড়ো জানলা ভিতর থেকে আগল দেওয়া ছিল, কে সেই আগলটা দিনের বেলায় এক সময়ে খুলে রেখে গেছে।

রেবতীর যে ধূর্ত বুদ্ধি আছে এতটা শ্রদ্ধা তার প্রতি দরোয়ানজির ছিল না। বোকা মানুষ, পড়াশুনো করে এই পর্যন্ত তার তাকত। অবশেষে কপাল চাপড়ে বললে, "আওরত। এ শয়তানি বিধিদত্ত।"

যে অল্প-একটু রাত বাকি ছিল রেবতী নিজেকে বারবার করে বলালে, চায়ের নিমন্ত্রণে যাবে না।

কাক ডেকে উঠল। রেবতী চলে গেল বাড়িতে।

১২

পরের দিন সময়ের একটু ব্যতিক্রম হল না। চায়ের সভায় চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটেই রেবতী গিয়ে হাজির। ভেবেছিল এ সভা নিভৃতে দুজনকে নিয়ে। ফ্যাশনেবল সাজ ওর দখলে নেই। প'রে এসেছে জামা আর ধুতি, ধোবার বাড়ি থেকে নতুন কাচিয়ে আনা, আর কাঁধে ঝুলছে একটা পাটকরা চাদর। এসে দেখে সভা বসেছে বাগানে। অজানা শৌখিন লোকের ভিড়। দমে গেল ওর সমস্ত মনটা, কোথাও লুকোতে পারলে বাঁচে। একটা কোণ নিয়ে বসবার চেষ্টা করতেই সবাই উঠে পড়ল। বললে, "আসুন আসুন ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনার আসন এইখানে।"

একটা পিঠ-উঁচু মখমলে-মোড়া চৌকি, মণ্ডলীর ঠিক মাঝখানেই। বুঝতে পারলে সমস্ত জনতার প্রধান লক্ষ্যই ও। নীলা এসে ওর গলায় মাল' পরিয়ে দিলে, কপালে দিলে চন্দনের ফোঁটা। ব্রজেন্দ্রবাবু প্রস্তাব করলেন ওকে জাগানী সভার সভাপতি পদে বরণ করা হোক। সমর্থন করলেন বঙ্কুবাবু, চারি দিকে করতালির ধ্বনি উঠল। সাহিত্যিক হরিদাসবাবু ডক্টর ভট্টাচার্যের ইন্টারন্যাশনাল খ্যাতির কথা ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, "রেবতীবাবুর নামের পালে হাওয়া লাগিয়ে আমাদের জাগানী ক্লাবের তরণী খেয়া দেবে পশ্চিম-মহাসমুদ্রের ঘাটে ঘাটে।"

সভার ব্যবস্থাপকেরা রিপোর্টারদেব কানে কানে গিয়ে বললে, "উপমাগুলোর কোনোটা যেন রিপোর্ট থেকে বাদ না যায়।"

বক্তারা একে একে উঠে যখন বলতে লাগল 'এতদিন পরে ডক্টর ভট্টাচার্য সায়ান্সের জয়তিলক ভারতমাতার কপালে পরিয়ে দিলেন', রেবতীর বুকটা ফুলে উঠল—নিজেকে প্রকাশমান দেখলে সভ্যজগতের মধ্যগগনে। জাগানী সভা সম্বন্ধে যে-সমস্ত দাগী রকমের জনশ্রুতি শুনেছিল মনে মনে তার প্রতিবাদ করলে। হরিদাসবাবু যখন বললে, 'রেবতীবাবুর নামের কবচ রক্ষাকবচরূপে এ সভার গলায় আজ ঝোলানো হল, এর থেকে বোঝা যাবে এ সভার উদ্দেশ্য কত মহোচ্চ,' তখন রেবতী নিজের নামের গৌরব ও দায়িত্ব খুব প্রবলরূপে অনুভব করলে। ওর মন থেকে সংকোচের খোলসটা খসে পড়ে গেল। মেয়েরা মুখের থেকে সিগারেট নামিয়ে ঝুঁকে পড়ল ওর চৌকির উপর, মধুর হাস্যে বললে, "বিরক্ত করছি আপনাকে, কিন্তু একটা অটোগ্রাফ দিতেই হবে।"

বেবতীর মনে হল, এতদিন সে যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিল, স্বপ্নের গুটি গেছে খুলে, প্রজাপতি বেরিয়ে পড়েছে।

একে একে লোক বিদায় হল। নীলা রেবতীর হাত চেপে ধরে বললে, "আপনি কিন্তু যাবেন না।"

জালাময় মদ ঢেলে দিলে ওর শিরার মধ্যে।

দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে, লতাবিতানের মধ্যে সবুজ প্রদোষের অন্ধকার।

বেঞ্চির উপরে দুজনে কাছাকাছি বসল। নিজের হাতের উপরে রেবতীর হাত তুলে নিয়ে নীলা বললে, "ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনি পুরুষমানুষ হয়ে মেয়েদের অত ভয় করেন কেন।"

রেবতী স্পর্ধাভরে বললে, "ভয় করি? কখনও না।"

"আমার মাকে আপনি ভয় করেন না?"

"ভয় কেন করব, শ্রদ্ধা করি।"

"আমাকে?"

"নিশ্চয় ভয় করি।"

"সেটা ভালো খবর। মা বলেছেন, কিছুতে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না। তা হলে আমি আত্মহত্যা করব।"

"কোনো বাধা আমি মানব না, আমাদের বিয়ে হবেই হবে।"

কাঁধের উপর মাথা রেখে নীলা বললে, "তুমি হয়তো জান না, তোমাকে কতখানি চাই।"

নীলার মাথাটা আরও বুকের কাছে টেনে নিয়ে রেবতী বললে, "তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই।"

"জাত?"

"ভাসিয়ে দেব জাত।"

"তা হলে রেজিস্ট্রারের কাছে কালই নোটিস দিতে হবে।"

"কালই দেব, নিশ্চয় দেব।"

রেবতী পুরুষের তেজ দেখাতে শুরু করেছে।

পরিণামটা দ্রুতবেগে ঘনিয়ে আসতে লাগল।

আইমার পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। মৃত্যুর আশঙ্কা আসন্ন। যে পর্যন্ত মৃত্যু না হয় সোহিনীকে তিনি কিছুতে ছাড়বেন না। এই সুযোগটাকে দুহাত দিয়ে আঁকড়িয়ে ধরে নীলাব উন্মত্ত যৌবন আলোড়িত হয়ে উঠেছে।

পাণ্ডিত্যের চাপে রেবতীর পৌরুষের স্বাদ ফিকে হয়ে গেছে—তাকে নীলার যথেষ্ট পছন্দ নয়। কিন্তু ওকে বিবাহ করা নিরাপদ, বিবাহোত্তর উচ্ছৃঙ্খলতায় বাধা দেবার জোর তার নেই। শুধু তাই নয়। ল্যাবরেটরির সঙ্গে যে লোভের বিষয় জড়ানো আছে তার পরিমাণ প্রভূত। ওব হিতৈষীবা বলে ল্যাবরেটরির ভার নেবার যোগ্যতর পাত্র কোথাও মিলবে না রেবতীব চেয়ে; সোহিনী কিছুতে ওকে হাতছাড়া করবে না, এই হচ্ছে বুদ্ধিমানদের অনুমান।

এদিকে সহযোগীদের ধিক্কার শিরোধার্য করে রেবতী জাগানী ক্লাবেব অধ্যক্ষতার সংবাদ ঘোষণা করতে দিলে সংবাদপত্রে। নীলা যখন বলত, 'ভয় লাগছে বুঝি', ও বলত 'আমি কেয়াব কবি নে'। ওর পৌরুষ সম্বন্ধে সংশয়মাত্র না থাকে এই জেদ ওকে পেয়ে বসল। বললে, 'এডিংটনের সঙ্গে চিঠিপত্র আমার চলে, একদিন এই ক্লাবে আমি তাঁকে নিমন্ত্রিত করে আনব', ক্লাবেব মেম্বররা বললে 'ধন্য'।

রেবতীর আসল কাজ গেছে বন্ধ হয়ে। ছিন্ন হয়ে গেছে ওর সমস্ত চিন্তাসূত্র। মন কেবলই অপেক্ষা করছে নীলা কখন আসবে, হঠাৎ পিছন থেকে ধরবে ওর চোখ টিপে। চৌকিব হাতাব উপর বসে বাঁ হাতে ধরবে ওর গলা জড়িয়ে। নিজেকে এই ব'লে আশ্বাস দিচ্ছে, ওর কাজটা যে বাধা পেয়েছে সেটা ক্ষণিক, একটু সুস্থির হলেই ভাঙার মুখে আবার জোড়া লাগবে। সুস্থির হবাব লক্ষণ আশু দেখা যাচ্ছে না। ওর কাজের ক্ষতিতে পৃথিবীব কোনো ক্ষতি হচ্ছে নীলাব মনের এক কোণেও সে শঙ্কা নেই, সমস্তটাকে সে প্রহসন মনে করে।

দিনের পর দিন জাল কেবলই জড়িয়ে যাচ্ছে। জাগানী সভা ওকে ছেঁকে ধরেছে, ওকে ঘোরতর পুরুষমানুষ বানিয়ে তুলছে। এখনও অকথ্য মুখ থেকে বেরয় না, কিন্তু অশ্রাব্য শুনলে জোর কবে হাসতে থাকে। ডক্টর ভট্টাচার্য ওদের খুব একটা মজার জিনিস হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে রেবতীকে ঈর্ষায় কামড়িয়ে ধরে। ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরের মুখের চুরট থেকে নীলা চুরট ধরায়। এর নকল করা রেবতীর অসাধ্য। চুরটের ধোঁয়া গলায় গেলে ওর মাথা ঘুরে পড়ে, কিন্তু এই দৃশ্যটা ওর শরীরমনকে আরও অসুস্থ করে তোলে। তা ছাড়া নানারকমের ঠেলাঠেলি টানাটানি যখন চলতে থাকে, ও আপত্তি না জানিয়ে থাকতে পারে না। নীলা বলে, 'এই দেহটার 'পরে আমাদের তো কোনো মোহ নেই, আমাদের কাছে এর দাম কিসের—আসল দামী জিনিস

ভালোবাসা, সেটা কি বিলিয়ে ছড়িয়ে দিতে পারি।' ব'লে চেপে ধরে রেবতীর হাত। রেবতী তখন অন্যদের অভাজন ব'লেই মনে করে, ভাবে ওরা ছোবড়া নিয়েই খুশি, শাঁসটা পেল না।

ল্যাবরেটরির দ্বারের বাইরে দিনরাত পাহারা চলছে, ভিতরে ভাঙা কাজ পড়ে রয়েছে, কারও দেখা নেই।

১৩

ড্রয়িংরুমে সোফায় পা দুটো তুলে কুশনে হেলান দিয়ে নীলা, মেঝের উপরে নীলার পায়ের কাছে ঠেস দিয়ে বসে আছে রেবতী, হাতে রয়েছে লেখন-ভরা ফুলস্ক্যাপ।

রেবতী মাথা নেড়ে বললে, "ভাষায় কেমন যেন বেশি রঙ ফলানো হয়েছে, এতটা বাড়িয়ে-বলা লেখা পড়তে লজ্জা করবে আমার।"

"ভাষার তুমি মস্ত সমঝদার কিনা। এ তো কেমিস্ট্রি ফরমুলা নয়, খুঁত খুঁত কোরো না, মুখস্থ করে যাও। জান এটা লিখেছেন আমাদের সাহিত্যিক প্রমদারঞ্জনবাবু?"

"ঐ সব মস্ত মস্ত সেন্টেন্স আর বড়ো বড়ো শব্দগুলো মুখস্থ করা আমার পক্ষে ভারি শক্ত হবে।"

"ভারি তো শক্ত। তোমার কানের কাছে আউড়ে আউড়ে আমার তো সমস্তটা মুখস্থ হয়ে গেছে।—'আমার জীবনের সর্বোত্তম শুভ মুহূর্তে জাগানী সভা আমাকে যে অমরাবতীর মন্দারমাল্যে সমলংকৃত করিলেন',—গ্রাণ্ড। তোমার ভয় নেই আমি তো তোমার কাছেই থাকব, আস্তে আস্তে তোমাকে বলে দেব।"

"আমি বাংলাসাহিত্য ভালো জানি নে কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছে, সমস্ত লেখাটা যেন আমাকে ঠাট্টা করছে। ইংরেজিতে যদি বলতে দাও কত সহজ হয়। Dear friends. Allow me to offer you my heartiest thanks for the honour you have conferred upon me on behalf of the Jagani Club— the great Awakener ইত্যাদি,—এমন দুটো সেন্টেন্স বললেই বাস্—"

"সে হচ্ছে না, তোমার মুখে বাংলা যে খুব মজার শোনাবে—ঐযেখানটাতে আছে—'হে বাংলাদেশের তরুণসম্প্রদায়, হে স্বাতন্ত্র্যসঞ্চালনরথের সারথি, হে ছিন্নশৃঙ্খলপরিকীর্ণ পথের অগ্রণীবৃন্দ'—যাই বল ইংরেজিতে এ কি হবার জো আছে। তোমার মতো বিজ্ঞানবিশারদের মুখে শুনলে তরুণ বাংলা সাপের মতো ফণা দুলিয়ে নাচবে। এখনও সময় আছে, আমি পড়িয়ে নিচ্ছি।"

গুরুভাব দীর্ঘ দেহকে সিঁড়ির উপর দিয়ে সশব্দে বহন ক'রে সাহেবী পোশাকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ব্রজেন্দ্র হালদার মচ্‌মচ্‌ শব্দে এসে উপস্থিত। বললে, "নাঃ এ অসহ্য, যখনই আসি নীলাকে দখল করে বসে আছ। কাজ নেই, কর্ম নেই, নীলিকে তফাত করে রেখেছ আমাদের কাছ থেকে কাঁটাগাছের বেড়ার মতো।"

রেবতী সংকুচিত হয়ে বললে, "আজ আমার একটু বিশেষ কাজ আছে তাই—"

"কাজ তো আছে, সেই ভরসাতেই তো এসেছিলুম; আজ তুমি মেম্বরদের নেমন্তন্ন করেছ, ব্যস্ত থাকবে মনে ক'রে আপিসে যাবার আগে আধ ঘন্টাটাক সময় করে নিয়ে তাড়াতাড়ি এসেছি। এসেই শুনছি এখানেই উনি পড়েছেন কাজে বাঁধা। আশ্চর্য। কাজ না থাকলে এইখানেই ওঁর ছুটি, আবার কাজ থাকলে এইখানেই ওঁর কাজ। এমন নাছোড়বান্দার সঙ্গে আমরা কেজো লোকেরা পাল্লা দিই কী ক'রে। নীলি, is it fair।"

নীলা বললে, "ডক্টর ভট্‌চাজের দোষ হচ্ছে, উনি আসল কথাটা জোর করে বলতে পারেন না। উনি কাজ আছে বলে এসেছেন, এটা বাজে কথা; না এসে থাকতে পারেন না বলেই এসেছেন,

এটাই একটা শোনবার মতো কথা এবং সত্যি কথা। আমাব সমস্ত সময় উনি দখল কবেছেন ওঁর জেদের জোরে। এই তো ওঁর পৌরুষ। তোমাদের সবাইকে ঐ বাঙালের কাছে হার মানতে হল।"

"আচ্ছা ভালো, তা হলে আমাদেরও পৌরুষ চালাতে হবে। এখন থেকে জাগানী ক্লাব-মেম্বররা নারীহরণের চর্চা শুরু করবে। জেগে উঠবে পৌরাণিক যুগ।"

নীলা বললে, "বেশ মজা লাগছে শুনতে। নারীহরণ, পাণিগ্রহণের চেয়ে ভালো। কিন্তু পদ্ধতিটা কী রকম।"

হালদার বললে, "দেখিয়ে দিতে পারি।"

"এখনই?"

"হাঁ এখনই।"

বলেই সোফা থেকে নীলাকে আড়কোলা করে তুলে নিলে।

নীলা চীৎকার কবে হেসে ওব গলা জড়িয়ে ধরলে।

রেবতীর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল, ওর মুশকিল এই যে অনুকরণ করবাব কিংবা বাধা দেবার মতো গায়ের জোব নেই। ওব বেশি করে রাগ হতে লাগল নীলাব 'পবে, এই-সব অসভ্য গোঁয়াবদের প্রশ্রয় দেয় কেন।

হালদার বললে, "গাড়ি তৈরি আছে। তোমাকে নিয়ে চললুম ডায়মণ্ডহারবারে। আজ সন্ধেব ভোজে ফিরিয়ে এনে দেব। ব্যাঙ্কে কাজ ছিল, সেটা যাক গে চুলোয। একটা সৎকার্য কবা হবে। ডাক্তার ভট্চাজকে নির্জনে কাজ কববাব সুবিধে কবে দিচ্ছি। তোমাব মতো অতবড়ো ব্যাঘাতকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভালো, এজন্যে উনি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন।"

রেবতী দেখলে, নীলাব ছট্‌ফট্ কববাব কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, নিজেকে সে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টামাত্র কবলে না, বেশ যেন আবামে ওব বক্ষ আশ্রয় কবে বইল। ওব গলা জড়িয়ে রইল বিশেষ একটা আসক্তভাবে। যেতে যেতে বললে, "ভয় নেই বিজ্ঞানী সাহেব, এটা নারীহবণের রিহর্সলমাত্র—লঙ্কাপাবে যাচ্ছি নে, ফিবে আসব তোমাব নেমন্তন্নে।"

রেবতী ছিঁড়ে ফেললে সেই লেখাটা। হালদাবেব বাহুব জোব এবং অসংকুচিত অধিকাব-বিস্তারের তুলনায় নিজের বিদ্যাভিমান ওব কাছে আজ বৃথা হয়ে গেল।

আজ সান্ধ্যভোজ একটা নামজাদা রেস্টোরাতে। নিমন্ত্রণকর্তা স্বয়ং রেবতী ভট্টাচার্য, তাব সম্মানিতা পার্শ্ববর্তিনী নীলা। সিনেমাব বিখ্যাত নটী এসেছে গান গাইতে। টোস্ট প্রোপোজ কবতে উঠেছে বঙ্কুবিহারী, গুণগান হচ্ছে রেবতীর আব তাব নামের সঙ্গে জড়িয়ে নীলার। মেয়েবা খুব জোরের সঙ্গে সিগারেট টানছে প্রমাণ কবতে যে তারা সম্পূর্ণ মেয়ে নয। প্রৌঢ়া মেয়েবা যৌবনেব মুখোশ পরে ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে অট্টহাস্যে উচ্চকণ্ঠে পবস্পব গা-টেপাটিপিতে যুবতীদের ছাড়িয়ে যাবার জন্যে মাতামাতিব ঘোড়দৌড় চালিয়েছে।

হঠাৎ ঘবে ঢুকল সোহিনী। স্তব্ধ হয়ে গেল ঘরসুদ্ধ সবাই। রেবতীব দিকে তাকিয়ে সোহিনী বললে, "চিনতে পারছি নে। ডক্টব ভট্টাচার্য বুঝি? খবচেব টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলে, পাঠিয়ে দিয়েছি গেল শুক্রবারে; এই তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কিছু অকুলোন হচ্ছে না। এখন একবাব উঠতে হচ্ছে, আজ রাত্রেই ল্যাবরেটবিব ফর্দ অনুসাবে জিনিসপত্র মিলিয়ে দেখব।"

"আপনি আমাকে অবিশ্বাস কবছেন?"

"এতদিন অবিশ্বাস তো কবি নি। কিন্তু লজ্জাশরম যদি থাকে বিশ্বাসরক্ষার কথা তুমি আর মুখে এনো না।"

রেবতী উঠতে যাচ্ছিল, নীলা তাকে কাপড় ধরে টেনে বসিয়ে দিলে। বললে, "আজ উনি

বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন, সকলে যান আগে, তার পরে উনি যাবেন।"

এর মধ্যে একটা নিষ্ঠুর ঠোকর ছিল। স্যর আইজাক মায়ের বড়ো পেয়ারের, ওর মতো এতবড়ো বিশ্বাসী আর কেউ নেই, তাই সকলকে ছাড়িয়ে ল্যাবরেটরির ভার ওর উপরেই। আরও একটু দেগে দেবার জন্যে বললে, "জান মা? অতিথি আজ পঁয়ষট্টি জন, এ ঘরে সকলকে ধরে নি, এক দল আছে পাশের ঘরে—ঐ শুনছ না হো হো লাগিয়েছে? মাথা পিছু পঁচিশ টাকা ধরে নেয়, মদ না খেলেও মদের দাম ধরে দিতে হয়। খালি গেলাসের জরিমানা কম লাগল না। আর কেউ হলে মুখ চুপসে যেত। ওঁর দরাজ হাত দেখে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের তাক লেগে গেছে। সিনেমার গাইয়েকে কত দিতে হয়েছে জান?—তার এক রাত্তিরের পাওনা চারশো টাকা।"

রেবতীর মনের ভিতরটা কাটা কইমাছের মতো ধড়্ফড় করছে, শুকনো মুখে কথাটি নেই।

সোহিনী জিজ্ঞাসা করলে, "আজকের সমারোহটা কিসের জন্যে।"

"তা জান না বুঝি? অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে তো বেরিয়ে গেছে, উনি জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, তারই সম্মানে এই ভোজ। লাইফ মেম্বরশিপের ছশো টাকা সুবিধেমতো পরে শুধে দেবেন।"

"সুবিধে বোধ হয় শীঘ্র হবে না।"

রেবতীর বুকের মধ্যে স্টীমরোলার চলাচল করছিল।

সোহিনী তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তা হলে এখন তোমার ওঠবার সুবিধে হবে না?"

রেবতী নীলার মুখের দিকে তাকালে। তার কুটিল কটাক্ষের খোঁচায় পুরুষমানুষের অভিমান জেগে উঠল। বললে, "কেমন করে যাই, নিমন্ত্রিতেরা সব—"

সোহিনী বললে, "আচ্ছা, আমি ততক্ষণ এখানে বসে রইলুম। নাসেরউল্লা তুমি দরজার কাছে হাজির থাকো।"

নীলা বললে, "সে হতে পারবে না মা। আমাদের একটা গোপন পরামর্শ আছে, এখানে তোমার থাকা উচিত হবে না।"

"দেখ নীলা, চাতুরীর পালা তুই সবে শুরু করেছিস, এখনও আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবি নে। তোদের কিসের পরামর্শ সে খবর কি আমি পাই নি বলে দিচ্ছ, তোদের সেই পরামর্শের জন্যে আমারই থাকা সব চেয়ে দরকার।"

নীলা বললে, "তুমি শুনেছ কার কাছে।"

"খবর নেবার বিদ্যে থাকে গর্তের সাপের মতো টাকার থলির মধ্যে। এখানে তিনজন আইনওয়ালা মিলে দলিলপত্র ঘেঁটে বের করতে চাও ল্যাবরেটরির দানে কোনো ছিদ্র আছে কি না। তাই নয় কি, নীলু।"

নীলা বললে, "তা সত্যি কথা বলব, বাবার মতোখান টাকা [illegible] থাকবে না, এটা অস্বাভাবিক। সবাই সন্দেহ করে—"

সোহিনী চৌকি থেকে উঠে দাঁড়াল। বললে, "আসল সত্যি [illegible] দিনের। কে তোর বাপ, কার সম্পত্তির শেয়ার চাস। এমন [illegible] মেয়ে এ কথা মুখে [illegible] তোর লজ্জা করে না।"

নীলা লাফিয়ে উঠে বললে, "কী বলছ, মা।"

"সত্যি কথা বলছি। তাঁর কাছে কিছুই গোপন ছিল না, তিনি জানতেন সব। আমার কাছে যা পাবার তা তিনি সম্পূর্ণ পেয়েছেন, আজও পাবেন তা, আর কিছু তিনি গ্রাহ্য করেন নি।"

ব্যারিস্টার ঘোষ বললে, "আপনার মুখের কথা তো প্রমাণ নয়।"

"সে কথা তিনি জানতেন। সকল কথা খোলসা করে তিনি দলিল রেজেস্ট্রি করে গেছেন।"

"ওহে বন্ধু, রাত হল যে, আর কেন। চলো।"

পেশোয়ারীর ভঙ্গি দেখে পঁয়ষট্টি জন অন্তর্ধান করলে।

এমন সময় সুটকেস হাতে এসে উপস্থিত চৌধুরী। বললেন, "তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে আসতে হল। কী রে রেবি, বেবি, মুখখানা যে পার্চমেন্টের মতো সাদা হয়ে গেছে। ওরে, খোকার দুধের বাটি গেল কোথায়।"

নীলুকে দেখিয়ে সোহিনী বললে, "যিনি জোগাবেন তিনি যে ঐ বসে আছেন।"

"গয়লানীর ব্যবসা ধরেছ নাকি, মা।"

"গয়লা ধরার ব্যবসা ধরেছে, ঐ যে বসে আছে শিকারটি।"

"কে, আমাদের রেবি নাকি।"

"এইবার আমার মেয়ে আমার ল্যাবরেটরিকে বাঁচিয়েছে। আমি লোক চিনতে পারি নি; কিন্তু আমার মেয়ে ঠিক বুঝেছিল যে ল্যাবরেটরিতে গোয়ালঘর বসিয়ে দিয়েছিলুম—গোবরের কুণ্ডে আর-একটু হলেই ডুবত সমস্ত জিনিসটা।"

অধ্যাপক বললেন, "মা, তুমি এই জীবটিকে আবিষ্কার করেছ যখন, তখন এই গোষ্ঠবিহারীর ভার তোমাকেই নিতে হবে। ওর আর সবই আছে কেবল বুদ্ধি নেই, তুমি কাছে থাকলে তাব অভাবটা টের পাওয়া যাবে না। বোকা পুরুষদের নাকে দড়ি দিয়ে চালিয়ে নিয়ে বেড়ানো সহজ।"

নীলা বললে, "কী গো সার আইজাক নিউটন, রেজিস্ট্রি আপিসে নোটিস তো দেওয়া হয়েছে, ফিরিয়ে নিতে চাও নাকি।"

বুক ফুলিয়ে রেবতী বললে, "মরে গেলেও না।"

"বিয়েটা হবে তা হলে অশুভ লগ্নে।"

"হবেই, নিশ্চয় হবে।"

সোহিনী বললে, "কিন্তু ল্যাবরেটরি থেকে শত হস্ত দূরে।"

অধ্যাপক বললেন, "মা নীলু, ও বোকা, কিন্তু অক্ষম নয়। ওর নেশাটা কেটে যাক, তার পবে ওর খোরাকের জন্যে বেশি ভাবতে হবে না।"

"সার আইজাক, তা হলে কিন্তু তোমার কাপড়চোপড়গুলো একটু ভদ্র রকমেব বানাতে হবে, নইলে তোমার সামনে আমাকে আবার ঘোমটা ধরতে হবে।"

হঠাৎ আর-একটা ছায়া পড়ল দেয়ালে। পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "বেবি, চলে আয়।"

সুড় সুড় করে রেবতী পিসিমার পিছন পিছন চলে গেল , একবাব ফিরেও তাকাল না।

আশ্বিন ১৩৪৭

আদরের, না অনাদরের?

শরৎকুমারী চৌধুরাণী

মঙ্গল আরতির মঙ্গল ধ্বনিতে জাগিয়া উঠিয়া আপনাকে শরতের মধুর জ্যোৎস্নায় মগ্ন দেখিলাম। পার্শ্বে শায়িতা সুকুমারী বালা আমারই,—আমারই সে—নির্ভয়ে নিস্পন্দে ঘুমাইতেছে। পাছে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়, তাই বড় সাধ হইলেও চুম্বন করিলাম না। মধুর জ্যোৎস্নায়, মৃদুমন্দ বাতাসে, ঈষৎ ঘুমঘোরে দেখিলাম, ধরণী নিজ সন্তান সন্ততি লইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রায় মগ্ন—বুকের কাছে নিঃশঙ্ক চিত্তে বাছারা ঘুমাইতেছে—সকলেই মাতৃস্নেহে, মাতৃআদরে আপ্লুত। হেথায় পক্ষপাতিতা নাই—সকলেই মাতার সমান যত্ন স্নেহের ধন। সুমধুর জ্যোৎস্নাটুকু মায়ের হাসিখানির মত প্রকৃতি জননীকে হাস্যময়ী করিয়া তুলিয়াছে—মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিলাম—ঘুমন্ত প্রকৃতি কি সুন্দর। দেখিতে দেখিতে তখন বহু দিনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—এমনই কত জ্যোৎস্নায় আপনাকে প্রিয়জনে বেষ্টিত দেখিলাম। স্মৃতিতে মধুর জ্যোৎস্না আরও মধুরতর মনে হইতেছিল, মনে পড়িল—"তখন কে জানে কারে, কে জানিত আপনারে, কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপাব।" সহসা তীব্র কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলাম—শুনিতে পাইলাম, আমার বাতায়নের সম্মুখবর্তী পুষ্করিণীর ঘাটে একটা কথাবার্তা আরম্ভ হইয়াছে।

"কে ও?—কেষ্টদাসী, আজ যে বড় রাত থাকতে থাকতে ঘাটে এসেছিস?—কাল রাতে তোদের পাড়ায় শাঁখ বাজছিল, তোদের বৌয়ের কি এবার তবে বেটাছেলেটি হ'ল?

"না গো ছোট কাকী, সে কথা আর ব'লো না—আমাদের যেমন অদৃষ্ট, বৌয়ের আবার বেটাছেলে এ জন্মে হবে! যা হয়, একটা মেয়ে হয়েছে।"

"এবার নিয়ে তিনটে মেয়ে হ'ল বুঝি?"

"হ্যাঁ গো, কাকী, তিনটে হল।"

"তা হ'লে গণ্ডা ভর্তি হবে—তবে যদি বেটাছেলে হয়।"

"হ্যাঁ গো খুড়ী, তারই ত মতন দেখছি। তা মেয়েটা হয়েছে শুনে দাদা বলে—কেষ্ট, আমি আর উঠতে পারি না, আমার গায়ে আর বল শক্তি নেই। মায়ের কাছে ধাই বিদেয় চাইলে, মা আসলে বিছানা থেকে উঠলো না, কথা কইলে না। বৌ মেয়ে তুলবে না; কত বলা কওয়ায় কোলে নিলে, তা বলে যে, গলা টিপে দেবো। আমি এখানে না থাকলে মেয়েটা বোধ করি মাটিতে পড়ে থেকে সদ্য মারা যেত। বাড়ীসুদ্ধ দুঃখেতে যেন কেমন হয়ে গেছে।"

"তা থাকবে বৈ কি, তিন তিনটে মেয়ে, কায়েতের ঘরে বিয়ে দিতে প্রাণ বেরুবে। অভাগী মেয়ের যেমন অদৃষ্ট, দশ মাস গর্ভে ধরে কি না একটা মাটির ঢেলা হ'ল।"

"আহা খুড়ী, পাছে এবার আবার মেয়ে হয় ব'লে বৌ ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেছে। আর পোড়া মেয়েগুলোরও সকলই বিশ্রী কি না, এবার বৌয়ের এমন অরুচি হয়েছিল যে, পেটে জল যেত না। মেয়েটা এই সবে চার বছরের ; খুকী হয়েছে শুনে বলছে, ও ত খোকা নয়, তবে ওকে বিলিয়ে দাও।"

"কচি ছেলে, ওরা যেমন শোনে তাই বুঝে ; একটা একটা কথা পাকা মতন বলে ফেলে, তা আটকৌড়ে হবে ত?"

"তা এখন কি জানি, হয়ত অমনি নিয়ম রক্ষা, আটটি ছেলে ডেকে কুলো বাজিয়ে দেবে। মা এবার কত সাধ করেছিল খোকাটি হবে, আট-কৌড়েতে ভাল করে হাঁড়ি করবে, তবে ষষ্ঠী পূজোতে তেল'সন্দেশ বিলোবে, তা কিছুই হ'ল না, সকলই মিথ্যা হ'ল।"

"তা মেজদিদি নরেশের বিয়ে দিক না। এর হ'ল না হ'ল না করে এত দিন পরে শেষে মেয়ে হতেই চললো। নরেশ একটি ছেলে, কেবল মেয়ে হ'লে নাম রাখবে কে?"

"তা খুড়ী, দাদা কি করবে। এ-কালের ছেলে, ওরা ঝগড়া-ঝাঁটির ভয় পায়। বৌয়ের ছেলে হ'ল না হ'ল না ক'রে মা যখন হেঁদিয়ে দাদার বিয়ে দিতে চেয়েছিল, তখনই দাদা বিয়ে করতে চায় নি, তা এখন ত মেয়ে হচ্ছে—ছেলে হবার আশা হয়েছে। তবে মায়ের কিনা একটি ছেলে, মা তাড়াতাড়ি সকলই চায়। বৌয়ের কিছু এমন বেশী বয়সে মেয়ে হয় নি, বছর আঠারতে বুঝি বড় মেয়েটা কোলে হয়েছে—তা মা একেবারে অস্থির হয়ে বৌকে কত ওষুধ বিষুধ খাইয়েছিল, কত মাদুলি, কত ঠাকুরের দোর ধরা, কত কি করার পর ঐ মেয়ে হ'ল। তা তখন আশা হ'ল, মেয়ে হয়েছে, তা এইবার তবে নাতি হবে—ও মা, বার বার তিন বার, আর কত সহ্য করবে! তা, মা ত বলে যে, বৌয়ের এবার মেয়ে হ'লেই ছেলের আবার বিয়ে দেব। তা দাদা ত রাজী হয় না, নইলে মা কন্যে পর্যন্ত দেখে রেখেছে। আর মাও একটু চিরকাল অধৈর্য আছে। আমরা তাই বলি, অত ভেবে হাতড়ে পাতড়ে বেড়ালে কি হবে, মেয়ে হয়েছে, ছেলেও হবে, তা এবার আর আমাদের কিছু বলবার রইল না।"

এখনও সূর্যোদয় হয় নাই ; উষার ঈষৎ মাত্র আভাস পাওয়া যাইতেছে। এখনও কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ পশ্চিমাকাশে জ্বলজ্বল করিতেছে। মৃদু মৃদু প্রভাতসমীরণ কত দূর হইতে কেয়াফুলের সুমিষ্ট গন্ধ বহিয়া লইয়া আসিতেছে। জনকোলাহল এখনও উত্থিত হয় নাই। এমন সময় আমাদের পরিচিত গৃহিণীর কলকণ্ঠস্বরে পাড়ার সকল লোক জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আমিও উঠিয়া জানালায় গিয়া বসিলাম। একদিকে বাখারির বেড়া এবং তিনদিকে ইমারৎবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র বাগান নামধারী স্থানের মধ্যে একটি ছোট রকম পুষ্করিণী। এখন বর্ষাতে কূলে কূলে জল হইয়াছে। কিন্তু চারি পাশের জল হিংচা, কলমি, সুশুনি শাকে সবুজ—কেবল মাঝখানে খানিকটা জল কতকটা পরিষ্কার আছে। পুকুরটির পাড়ে এক ধারে আম, জাম, জামরুল প্রভৃতি দু-চারিটি ফলবান্ বৃক্ষ—বৃক্ষের তলা কেহ কখনও পরিষ্কার করে না। এক ধারে পাঁচ ছয়টি কলাগাছ—প্রায়ই তাহাদের একটি-না-একটি গাছকে ফলভারে পুকুরের উপর অবনত দেখা যায়। এক ধারে দু-একটি আধ-মরা গাঁদাফুলের গাছ—দু-একটি জীর্ণ গোলাপগাছ—কখনও তাহাতে ফুল হইতে দেখা যায় না। কদাচিৎ দু-একটি কুঁড়ি দেখা যায়, কিন্তু তাহা অর্ধস্ফুট না হইতে হইতে শুকাইয়া যায়। একটি অপরাজিতা লতা, হতাদরে বেড়ার গায়ে লতাইয়া উঠিয়া বেড়ার কঙ্কালের কতক অংশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—মাঝে মাঝে দু-চারিটি ফুলও লতার বুকে শোভা পায়—সে ফুলে দেবপূজাও হয়। রোপণকালে লতাটির কত না আদর ছিল, কিন্তু এখন আর কেহ তাহার দিকে চাহে না—তবুও সে এখনও ধীরে ধীরে নিজ কার্য করিতেছে।

"ও মা, কথা কইতে কইতে যে ভোর হয়ে এল—আজ আর জাহ্নবী নাইতে যাওয়া হ'ল না। তা থাক্—একটু জাহ্নবীর জল পরশ করব এখন—একেবারে তবে পুকুর থেকে চান করেই যাই। ওগো, ও নাতবৌ, এইখানে আমায় একটু তেল দিয়ে যা।" আজ ঘাটের শুভ দিন—ভারি মজলিস — গৃহিণী নহিলে ঘাট ভাল মানায় না।

"তাই ত বলি কেষ্টদাসী, এ-কালের ছেলেপিলে কি মা বাপকে মানে? আমার শ্বশুর বড় গিন্নীর (ইঁহার সপত্নীর) ছেলে হ'ল না ব'লে অমনই আমার সঙ্গে কর্তার বিয়ে দিলেন—তা বাছা, পরমেশ্বর মুখ রক্ষা করলেন তেমনই, বছর দুই বিয়ে হ'তে না হ'তে প্রথমেই আমার রাধানাথ হল—তা আঃ, কোথা গেল আমার সে ছেলে—আমি পোড়াকপালী বসে আছি—ভাগ্যিস্ তার দুটো গুঁড়ো আছে, তাই নিয়ে সংসারে আছি—নইলে পাগল হয়ে কোন্ দেশে চলে যেতুম। তার পর জানিস্ বাছা, তার বছরখানেক বাদে বড় গিন্নীর হরলাল হ'ল। আমার যখন বিয়ে হ'ল, তখন বড় গিন্নীর ছেলে

হবার বয়েস যায় নি—শুনেছি তবে ওর বাপ খুব ছোট বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন—আর কর্তার চেয়ে বড় গিন্নী বছর দুয়ের বয়সে ছোট ছিল—বিয়ের সময় মাথায় প্রায় এক দেখে সুতো ভোঁকা দিয়ে তবে বিয়ে হয়। আমার একটু ডাগর হয়ে বিয়ে হয়েছিল, কর্তার ত আমি দোজপক্ষের মত নই—আমিই সময়কালে বিয়ের পরিবারের মত হলুম। তা সেকালের কর্তারা অত হিসেব-কিতের বুঝতেন না, বললেন বিয়ে কর—এঁরাও অমন এ-কালের ছেলেদের মত মা-বাপের কথা ঠেলতে পারতেন না। আমার শ্বশুর বলতেন, যে আবাগের বেটা কোঁদল করবে, সে বাপের বাড়ী গিয়ে থাকুক—আমার বাড়ী তার ঠাঁই হবে না। তাঁদের [illegible]—কর্তা বাড়ীর ভেতর এলে আমরা কচিকাঁচা বৌ ঝি ত ভয়ে কাঁটা হতুম—গাকলণ সুদ্ধ ভয়ে সারা হতেন। এ-কেলে মেয়েরা যেমন দিবা রাত্রি স্বামীর সঙ্গে মুখোমুখি করে থাকে—জানিস কেষ্ট, আমাদের তা হবার জো ছিল না। রাত্রে সকল নিবৃত্তি হ'লে তবে ঘরে কেউ দিয়ে আসত তবে যেতুম। এক-এক দিন দালানে, কি দালানে ঘুমিয়ে পড়তুম [illegible] ঘরে কেউ যেতে [illegible] ভুলে যেত, তবে সেইখানেই রাত কাটত। বারানায় ছ মাসের হ'লে তবে শাশুড়ী একদিন [illegible] বিছানা ঘরে দিলেন, সেই দিন থেকে যার যেদিন পালা [illegible] সে সেই দিন ঘরে শুতে যেতুম। আমাদের ছেলে হ'লে ছ মাস কর্তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবার হুকুম থাকত না [illegible] তবে একান্ত কিছু দরকার হলে কর্তা লুকিয়ে চুপিয়ে [illegible] ঘরে, কি বাগানের এসে ব'লে যেতেন [illegible] তা বাছা, আমরা দিনের বেলা কথা কইতুম না।, শাশুড়ী টের পেলে গঞ্জনা সইতে হবে এমন কথা নাই বা কইলুম। তা এ-কালে সব রকমই আলাদা দেখে শুনে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।"

মুখে অনর্গল বক্তৃতা চলিতেছে [illegible] হস্ত [illegible] জলসেকে সর্বাঙ্গ সংক্ষালিত হইতেছে। ক্রমে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে অনেকগুলি [illegible] জুটিয়া [illegible] একজনেরই মন গৃহিণীর বক্তৃতার দিকে। সকলেই নিজ নিজ [illegible] কেহ গামছা দিয়া [illegible] শুনিতে [illegible] সকলেই [illegible] হইলেই [illegible] উচ্চ [illegible] পর ছেলে [illegible] দিন চার মাসের পর [illegible] হয়েছে— মেয়েটি এই মেয়ের [illegible]

[illegible] মধ্যে দু একটি [illegible] সুন্দরী বধূ ও কন্যা স্নান করিতেছিল—একটি চতুর্দশবর্ষীয়া কন্যা [illegible] পারিল না। মাতৃ সম্বোধনে বৃদ্ধাকে কহিল,—"তা মা, মামীর মেয়ে হয়েছে ব'লে তোমাদের দুঃখু রাখবার যেন ঠাঁই নেই, তাই ঘাটে এসেও সেই কাহিনী হচ্ছে—তা তুমি যা বল, আমার কিন্তু বাপু তোমাদের কালো কালো ছেলের চেয়ে মামীর মেয়েদের বেশ ভাল লাগে—অমন একটা কালো ছেলের চেয়ে সাতটা সুন্দর মেয়ে ভাল। তোমাদের এক কথা, মেয়ে বুঝি কোন কাজে লাগে না? তুমি এই যে আষাঢ় মাসে এখানে এসেছ, দু [illegible] মাস যে ক'রে দিদিমার সেবা করছ, মামা তেমন করেন? দিদিমাই ত দুঃখ করেন, আমার মেয়ে অসময়ে যত করে, ছেলে আমার তেমন করে না। তার বেলা বুঝি মেয়ের দরকার?—এদিকে মেয়ে হয়েছে শুনলেই সর্বনাশ বাধে। এই যে ও-বাড়ীর ছোট ঠাকুরমা—কাকা ত এক পয়সা আনতে পারেন না—যাই ক্ষেমা পিসি ছিলেন, তিনি খরচপত্র দিচ্ছেন, তবে কাকার সুদ্ধ চলছে। কিন্তু শুনেছি, ক্ষেমা পিসির আগে আর দু বোন হয়, তাই ওঁর নাম ক্ষেমা রেখেছিল।" এমন বিদ্রোহসূচক কথা শুনিয়া ঘাটসুদ্ধ সকলে অবাক্ হইয়া গেল। কাক আর ডাকে না, গাছের পাতা আর নড়ে না। গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন, "ওলো পেব্‌ভা, থাম্ থাম্—যখন তোর হবে, তখন বুঝবি—এখন ছেলেমানুষ কি বুঝবি—ছেলেমানুষের মুখে অত পাকা পাকা কথা ভাল শোনায় না।"

"তা ছোট ঠাকুরমা, সত্যি কথা বলছি—কেন এই ও-বাড়ীর ছোট মামীও বলছেন যে, ওঁর যদি মেয়ে হয়, তাতে কিছু দুঃখু হবে না। মামীও ত মেয়েদের কত ভালবাসেন, কেবল দিদিমার লাঞ্ছনার ভয়েই ত পাছে মেয়ে হয় ব'লে অত ভয় পান। মেয়ে হয়েছে, এখন ছেলে হবাব সাধ হয়, দিদিমার ভয়ে মেয়েদের ভাল করে আদর পর্যন্ত করতে পারেন না। মামাবাবু ভয়ে পূজোর ভাল কাপড় অবধি করতে দিতে সাহস পেলেন না—নইলে মেয়েকে দিতে তাঁর ইচ্ছা হয়—কে জানে বাপু, তোমরা কি বোবা—তোমরা কি মেয়ে নও—?"

"হ্যাঁ গো জ্যাঠাইমা ঠাকরুণ, আমরা মেয়ে বটে, তা আমার কত আদর ছিল জানিস? আমি মায়ের প্রথম সন্তান—দিদিমার আদুরে, ঠাকুরমার আদুরে—ঠাকুরমা বলতেন, ও কি আমার মেয়ে, ও আমার সাত বেটা, তা ব'লে বাপু গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে হওয়া গৃহস্থের অলক্ষণ।"

ক্রমে প্রভার সমবয়স্কা আরও দু-চারিটি কন্যা ঘাটে আসিয়া জুটিল। হরিদাসী কহিল—"কি ঠান্‌দিদি, আজ যে ঘাট জাঁকিয়ে তুলেছ, ব্যাপারখানা কি?"

"কি লো হরিদাসী, এসেছিস? তাই ত বলি, তুই নইলে কি ঘাট মানায? আমবা বুড়ো মানুষ, আমরা আর ঘাট জাঁকাব কি, দুটো দুঃখের সুখের কথা কইছি বই ত নয়। তোদেরই এখন জাঁকের বয়েস—তাই বলছিলুম, বলি হরিদাসী যে এখনও এল না—কাল বাতে বুঝি নাতজামাই এসেছিল?"

"সে আমি কি জানি ঠান্‌দিদি, সে তোমরা জান। আমরা ঘাটে আসতে আসতে পথেব ধারে হরকালী কাকার বাড়ী গেছলুম—তাদের খোকা হযেছে দেখে এলুম ; তাই আসতে একটু দেরি হ'ল।"

"বটে। ওদের কেমন অদৃষ্ট দেখেছিস—এখন সময় ভাল, সব দিকে ভাল হয—বৌয়েদের কেবলই বেটাছেলে হচ্ছে। আর ঘটাও তেমনি করে—এই আটকৌড়েতে হাঁড়ি কবা বে—ষষ্ঠী পূজোয় তেল সন্দেশ দেওয়া রে—ভাতে বোগ্‌নো করা রে—খাওয়ানো বে, দাওযানো বে, সব করে। কেষ্টর মার যেমন অদৃষ্ট—একটা বৌ—কেবল গণ্ডা গণ্ডা মেযে হচ্ছে।"

হরিদাসী। "—তা হলই বা—মেয়ে বুজি ফেল্‌না?"

"ও বাবা। তোদের এ-কালের যে সবই সমান দেখি—পেরভাও ঐ কথা নিয়ে কত মুখনাড়া দিলে—মেয়েছেলে আবার কোন কাজের গা?"

"কোন্ কাজের নয় গা? বাপ মা, স্বামী পুত্র, কারও অসুখ হোক, কারও অনটন হোক, মেয়েতে যত করে, এত কোন্ ছেলেতে করে গা? মাকে মেয়ে যত যত্ন করে, মায়ের দুঃখ যত মেয়েতে বোঝে, এত কি ছেলেতে বোঝে? ওগো, ওগো, স্ত্রীলোক হচ্ছে লক্ষ্মী—হাজাব টাকাকড়ি থাক্, দেখ, যে বাড়ীতে গৃহিণী নেই, সে ঘরকন্না কেমন বেশৃঙ্খল, যে ছেলেদের মা নেই, সে ছেলেপিলের কত অযত্ন। মেয়ে হয়েছে শুনেই তোমরা লাফিয়ে ওঠ, কি না বিয়ে দিতে হবে! তা বাপু, ছেলের জন্য কি কিছু খরচ নেই? সেনেদের বাড়ী দেখতে পাই, ছেলেদেব খাওযা হ'লে তবে সেই পাতে মেয়েদের অমনি যা-তা দিয়ে খেতে দেয়। ছেলেদেব জুতো জামা, সাফ কাপড়, মেয়েদের ময়লা পাঁচী ধুতি। ছেলেদের দু পয়সা ক'রে এক-এক জনের খাবার বরাদ্দ, মেয়েদের এক পয়সার আটার রুটি করে তিন চারটিকে দেয়। ছেলেরা ভাল গদিতে খাটে শোয়—মেয়েগুলি মেঝেতে মাদুরে একটা ছেঁড়া লেপ পেতে শোয়। বড় বড় ছেলেরাও মা-বাপের সঙ্গে শুতে পায়, ছোট বোন দুটি রাঁধুনীর কাছে শোয়।—আহা, তাদের যদি একটু যত্ন আছে। সে দিন ও-বাড়ীর মেজ কাকীর মেয়ে মামার বাড়ী থেকে বাড়ী এসেছে, ঠাকুরমার কাছে সকালে ভাত চেয়েছে, তখনও কেউ খায়নি ব'লে ঠাকুরমা স্বচ্ছন্দে তাকে বললে কিনা, মেয়েমানুষ আগ-দোফের ভাত খাবি কি। এখনও কেউ খায়নি, আগে ভাগে ভাত দাও। আগে বাপ খুড়ো খাগ, তবে সেই পাতে খাস। আহা, সে ছ-সাত

বৎসরের মেয়ে, অত কি জানে, ভাতের জন্য কাঁদতে লাগল, শাশুড়ীর ব্যাভার দেখে মেজ কাকীমা রাগ করে তখনই তাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলে। আমাদের কাছে কত দুঃখু করতে লাগল যে, বাছা একদিন বাড়ী এল, দুটো ভাতেব জন্যে কেঁদে চলে গেল। এ কি মায়ের প্রাণে সয়। তা কে জানে, মেয়ে আদরের না অনাদরের।"

"বাবা, এ-কালের মেয়েগুলোর মুখেব তোড় দেখ, যেন ঝড় বয়ে গেল, যা যা আর জলে পড়ে থাকিস নে, অসুখ হবে।'

যাহা হউক, অল্পবয়স্কারা আর অধিক উত্তর প্রত্যুত্তর করিল না। তাহারা স্নান সমাপনান্তে গৃহে চলিয়া গেল। সকলেই আসিতেছে, অল্পবিস্তর শুনিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু পুষ্করিণী-অধিকারিণীর সেই তৈলমর্দনই চলিতেছে। এমন সময় ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া হরকালীর মায়ের প্রবেশ—কি ব্যাপার!—ইনি ভাবি ব্যস্ত—ইঁহারই গৃহে কাল শাঁখ বাজিযাছে—বধূর পুত্রসন্তান হইয়াছে।

"এ কি—ঠাকুরঝি যে, আজ গঙ্গা নাইতে যাস্‌নি? আমি বলি, আজ কেবল আমারই যাওয়া হয়নি—তা বোন্, কি করি, মেজ বৌমাব কাল রাত্রে বেটাছেলেটি হ'ল—তা ফেলে যাই কি ক'রে? জানিস ত, এ-কালের মেয়েগুলো সব বিবি হযেছে—তাপ সেঁক নেবে না, ঝাল খাবে না। আমি তেমন মেয়ে নই—ঐ জন্যে বৌয়েদের কখনও প্রসবকালে বাপের বাড়ী পাঠাই না। সেজ বৌয়ের বাপ আবার ডাক্তাব, তিনি তাপ নিতে দেবেন না, ঝাল খেতে দেবেন না—মেয়েকে গদি পেতে শোয়াতে চান। জান ঠাকুরঝি, আমাদের যেমন নিয়ম আছে, ডাক্তারে বলেন, ও-সব ফেলে দাও—আমি তেমন মেয়ে নই—এই ব'সে থেকে বৌকে ভাজা ভাজা ক'রে তাপ দিয়ে এলুম, এইবার নেয়ে গিয়ে ঝাল খেতে দেব। ডাক্তার আছেন, তিনি আছেন,—তাঁর মেযে ঘরে এনে কি আমি নিয়মভঙ্গ করব। সে-বাব আঁতুড়ে সেজ বৌয়ের মেয়েটা গেল, ডাক্তার দেখতে এসে বললেন, এই সব স্যাঁতানে জায়গায় পড়ে ব্যায়ারাম হয়েছে,—ব'লে আঁতুড় নাড়তে চান—আমি তা কিছুতে কবতে দিই নি।"

"সে মেয়েটাব কই কি ব্যায়ারাম হয়েছিল, আমি ত শুনি নি—তার উপর না সেই বাবার দৃষ্টি পড়েছিল?"

"তাই ত বলছি ভাই—ওঁরা বড় বোঝেন, শিশি শিশি ওষুধ এল, গেলাতে চান—গিলবে কে?—বাবা মুখ চেপে ধরে আছেন—সে জ্ঞান নেই। ও রোগেব যা, রোজা এনে সব করলুম, তা কিছু হ'ল না। হবে কি—রোজা বললে যে, পোয়াতি চাঁপাফুলের গাছের নীচে গেছল—তাই দৃষ্টি পড়েছে। সাহেবের মেয়ে, বেটী হয়ত কোন গাছতলায়-মাছতলায় গেছল, ও-সব ত মানা হয় না। এবার আমি আর বাপের বাড়ীমুখো হতে দিই নি। সেবার যেন মেয়েটা গেল গেল, কিছু ক্ষতি হ'ল না—এবাব বেটাছেলেটি হয়েছে, একটু ভাল কবে তাপ সেঁক না দিলে কি হয়? পোয়াতি ভাল থাকলে, তবে ছেলের পিত্তেশ—কি বলিস ভাই?"

"তা বই কি, বংশ রক্ষার জন্য বৌয়ের আদব, নইলে পরের মেয়ে ঘবে এনে জঞ্জাল বই ত নয়। তা হোক, বেটাছেলেটি হয়েছে—আটকৌড়েতে হাঁড়ি করিস। তোদের সূতিকাপূজো আছে ত?"

"হ্যাঁ, সূতিকাপূজো হবে বৈকি—তা লক্ষ বামনের পায়ের ধুলো কোথায় পাব,—বারোটি বামনের পায়ের ধুলো দেব—আর পূজা-আশ্রয় সব হবে। আটকৌড়ে যেমন আর সব বৌয়ের ছেলেদের বেলা করেছি, এরও তেমনি হবে—এক হাঁড়ি জলপান, একটি ক'রে সিকি, চারটে ক'রে মেঠাই, এই সব ঘরে ঘরে দেব—আর বাড়ীতে ছেলেরা যারা আসবে, তাদের বেটাছেলেদের দু আনা, মেয়েদের চার পয়সা ক'রে দেব। আর বেঁচেবর্তে থাকে ত ভাতটিও দিতে হবে। যেমন বেটাছেলেটি হয়েছে আহ্লাদের, তেমনি খরচপত্রও হবে। এই ধাইকে নগদ এক টাকা, একটা ঘড়া

কালই দিতে হ'ল—আবাব আসবে বিদেয নিতে। মেযে হ'লে, সেই যা নাড়ীকাটা একটা টাকা ধবা আছে—আব কি।"

"তা পবমেশ্বব দিন দিযেছেন, আমোদ-আহ্লাদ খবচপত্র কববি বই কি। আমাব দু মেযে এখানে আছে, আমাব ঘবে তিনটে হাঁড়ি দিস, আব আমাব সতীন-পো বৌও ভিন্ন হযেছে।"

"হ্যাঁ ভাই, তা বললে ভাল। এই বাড়ী গিযে হাঁড়িব ফর্দ কবতে হবে। আবাব বাজনা আসবে তবে নাচ আসবে, তাব বিদায খবচ ঢেব"—

"শুনেছিস, মিত্তিবদেব বৌযেব আবাব মেযে হযেছে।"

"ও মা, বলিস কি, আবাব মেযে—কে বললে?"

'এই কেষ্ট বাত থাকতে এসেছিল, আঁতুড় ছুঁযেছিল কিনা, সেই কত দুঃখ খেদ কবতে লাগল—তাবই সঙ্গে কথায কথায ত জাহ্নবী নাইতে যাওযা হ'ল না—আমি ভোবে কাপড় কাঁচতে এসেছি, আব কেষ্ট এল।"

"হ্যাঁ ঠাকুবঝি, গঙ্গা তোমাব কাব নাম গা?"

"আমাব ছোট খুড়-শাশুড়ীব নাম 'ফঙ্গামণি', তাই আমবা জাহ্নবী বলি—ঠাকুবদেব নাম আমাদেব প্রায কববাব জো নেই। আমাদেব বৃহৎ পবিবাব সকল নাম বেছে চলতে হয ত—আমবা ত একেলে নই যে, সুদ্ধ শ্বশুব শাশুড়ীব নামটি হদ্দ মেবে কেটে বাছব।"

"তাই ত ঠাকুবঝি, মিত্তিবদেব বৌটো কি গা—এবাব গোটা চাব পাঁচ মেযে হ'ল বুঝি—আমাব বড় বৌমাব যেটেব কোলে এই দুটি, দুটি নষ্ট হযেছে। তাই শত্রুব মুখে ছাই দিযে মেজ বৌমাবও দুটি বেটা, একটা মেযে, তা মেযেটো মামাব বাড়ী থাকে, দিদিমাব আদুবে, মেজ বৌমা বাপেব একটি মেযে কি না। তা ঐ প্রথম মেযে দিদিমাই মানুষ কবেছে, সে মেযেব ভাব আব আমাদেব নিতে হবে না—দিদিমা তাকে হাতেব তেলোয কবে নাচিযে নাচিযে নিযে বেড়াচ্ছে, বেটাছেলে ক'বে কাপড় পবানো হয, হেমন্তকুমাবী নাম তা হেমবাবু বলে ডাকা হয। সে মেযেব আদিখ্যেতা কত। আব সেজ বৌযেব দুটো মেযেব একটা সেই আঁতুড়ে গেছে, আব এই খোকাটি হযেছে।"

"তা বেঁচে থাক্, আমবা সব পাঁচ কর্ম্মে যাব, খাব, নেব। আমাদেব ঘবেব কথা। মেযেগুলো কেবল মিথ্যা বই ত নয। সূতিকাপূজো নেই, আটকড়াই কব আব না কব, ভাত—তা বড় সাধ হয ত পাঁচজনকে এনে খাওযাও। একটু কেবল পেসাদ মুখে দেওযা, তাব ক্রিযা নেই, কর্ম্ম নেই পিতৃপুরুষ এক গণ্ডূষ জল পায না। ঐ যা বিযেব সময একবাব পিতৃপুরুষ জল পান বই ত নয।"

"যাই, এই বেলা বাড়ী যাই, সেজ বৌযেব বাপ হযত এসে এতক্ষণ কত হাঙ্গামা কবছে। ছেলেবা ছেলেমানুষ, তাবা ত কথা কইতে বড় পাবে না—আমি এমন জববদাস্ত না হ'লে বক্ষা ছিল। আব ছেলেগুলোবও ঐ মত—সব একেলে কিনা। তা আমাব উপব বড় কথা কয না বেশী বললেই আমি বলি যে, এখন বড় হযেছিস, আমায মানবি কেন? আমি তোদেব চাবটি নিযে, বিধবা হয়ে কত কষ্ট কবে তোদেব এত বড় কবলুম, এখন আমি পব হলুম শ্বশুবই আপনাব হ'ল। তা ওবা আব বড় কথা কইতে পাবে না। এই ছোট ছেলে— ঐ একটু মুখপোড় আব কোলেব কিনা, আদুবে—ওকে কিছু বলতে পাবি নে, ও আঁতুড়ে মাতুড়ে ছুঁযে পাপে সৃষ্টি কবে। এই আঁতুড় উঠবে আব, বৌগুলোকে দিযে নেপ বালিশ পর্য্যন্ত সব কাচিযে নেব।

"ও কথা আব বলিস্ নে—জাত-জন্ম আব বইল না। এ কালেব ছেলে, ওবা সব এক বকম। আমাব ছোট জামাই অমনি, সে-বাব বিধু প্রসব হতে এখানে এসেছিল, জামাই বোজ দেখতে আসত, সেই বিছানায বসে গল্প-সল্প কবে চলে যেত। প্রথম যে দিন এল—আমি তখন নাইতে গেছি—মালা হাতে কবে দাঁড়িয়েছি, আব আঁতুড় থেকে বেবিযে আমাব খপ্ ক'বে পাযেব ধুলো নিলে। কি কবব, বললুম—'বাবা, আঁতুড় ছুঁযে কি আমায ছুঁতে আছে? আবাব হাতে মালা।' তা অপ্রস্তুত

হয়ে বলে, 'আমার অত মনে ছিল না।' আমি আর কি করব—মালা গেল, আবার পুকুরে নেয়ে মরি। তা জামাইয়ের যে মষ্ট, মেয়েকে সেই মতেই রাখতে হয়—আমি লুকিয়ে দুটো দুটো গুঁড়ো ঝাল দিই—মেয়েগুলোও তেমনি, হাত পেতে নিলে, কতক খেলে, কতক বা না খেলে,—বলে, 'ঝাল খেলে মা কেবল জলতেষ্টা বাড়ে বই ত নয়, তোমরা ত জল দেবে না—সুদ্ধ সাবু খেয়ে থাকলে তেষ্টাও হয় না, জলও চাই না।' কে জানে ভাই, ওদের কেমন কথা। আঁতুড়ে তেষ্টা পায় না—আমাদের এমনি তেষ্টা ছিল যে, অতি ময়লা জলও এক কোষ চুরি ক'রে খেয়েছি। আমাদের কালে ঝাল দিয়ে সুদ্ধ মুখ ধুতে জল দিত। তাতে কি প্রাণ বাঁচে।"

"তা বই কি, আমার এই চারটি গুঁড়ো হয়েছে, ফি বারই আঁতুড়ে মাগীকে পয়সা দিয়ে পায়ে হাতে ধ'রে জল চুরি ক'রে খেয়েছি। এদিকে ভাজা ভাজা তাপ, ওদিকে সরা সরা ঝাল—যেমন তেষ্টা, তেমনি গা'র জ্বালা—ওতেই ত শরীর ঝনঝনে হয়। ঐ গো, বাজনা এসেছে, তবে আজ আসি।" বলিয়া গামছা নিংড়াইতে নিংড়াইতে ভিজা কাপড়ের অঞ্চল স্কন্ধে ফেলিয়া প্রস্থান।

গৃহিণী। "দেখেছিস গয়লা-বৌ, হরকালীর মায়ের তেজ দেখেছিস। অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না, আপনার চার ছেলে ব'লে কেবল জানানো হয়—আমার চারটি গুঁড়ো। যমের জ্বালা ভুগতে হয় নি, তাই অত জাঁক—ছেলে হ'লেই ত হয় না। বাঁচাই মূল। যমে না সর্ব্বনাশ করলে আমিও আদর করব মা।"

গয়লা-বৌ। "তা বই কি মা-ঠাকরুণ যমের জ্বালা বড় জ্বালা। আমার দু ছেলে দু মেয়ে যমকে দিয়েছি, এখন দুটি মেয়ে একটি ছেলে নিয়ে প্রাণ ধরে আছি—বড়টি শ্বশুরবাড়ী গেছে, মা কেঁদে কেঁদে মরছি। মা, আমরা দুঃখী মানুষ, তা বাছারা আমার এমন যে, আমার পয়সা নেই, কেমন বোঝে—পাছে চাইলে না দিতে পারি, তাই এত সোনার সামগ্রী পাড়ায় আছে, কখনও খেতে কিনতে চায় না।"

গৃহিণী। "তোর মেয়েটি না বেশ ভাগ্যিমন্তের ঘরে পড়েছে?"

গয়লা-বৌ। "হাঁ মা, তোমার আশীর্বাদে তারা বড় ভাগ্যিমন্ত, আর আমার নয়নতারাকে খুব যত্ন করে। কিন্তু তা ব'লে কি মায়ের মন বোঝে—আমি যে সকালে এক পয়সার মুড়ি তিনজনকে দিতে পারি না, তাতে যে আমার বুক ফেটে যায়।"

গৃহিণী। "তা কি করবি কাঁদিস নে, চুপ কর্। মেয়েজন্ম পরের ঘরে যা'বার জন্যেই হয়েছে। তাই ত বলি গয়লা বৌ, মেয়েগুলো মিথ্যা। দু দিন বাদে পরের ঘর যাবে—তা ব'লে এ-কালের মেয়েদের কাছে তা বলবার জো নেই।"

গয়লা-বৌ। "তা মা, দু দিন বাদে শ্বশুরবাড়ী যাবে বলেই ত আমার প্রাণ কেমন করে। তাই জন্যেই ত মা, আমি মেয়ে দুটিকে না দেখে থাকতে পারি নে। বেটাছেলে মা, বেঁচে থাকলে ওরা আপনারা আনবে নেবে, বৌ হবে, আদর যত্ন চিরদিন পাবে—আমার প্রাণ ঠাণ্ডা থাকবে। মেয়েদের মা না করলে আর কে করবে? শাশুড়ী ননদ অত করবে না—দু দিন বাদে মেয়েরা আবার মা হবে—আপনার ছানাপোনা নিয়েই ব্যস্ত হবে। আজ যদি মা আমি না আদর করি ত কে আর তাদের আদর করবে?"

গৃহিণী। "তা বই কি। তোর ঢের গেছে কি না, তাই তোর বেশী মায়া—নইলে জগৎ জুড়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের আদর কম। ছেলেটি হয়েছে বলতে দশ হাত বুক হয়—শুনতে কেমন। ঘটাঘটি আমোদ আহ্লাদ হয়। সাত ছেলে হ'লেও অরুচি নেই। মেয়ে প্রথম হ'লে, লোকে বলে, তা হউক—এইবার ছেলে হবে। প্রথম যা হয়েছে, বেঁচে থাক্—জেঁয়াচ বজায় থাকলে তবে ত মঙ্গল। তবে ত ছেলের পিত্যেশ।"

গয়লা-বৌ। "হ্যাঁ মা, যাই—বেলা হ'ল।"

ক্রমে ঘাট শূন্য হইয়া আসিল, স্বপ্নময় মোহমুগ্ধ নয়নে আসিয়াছিলাম, সত্যের তীব্রতা লইয়া ফিরিলাম। প্রকৃতি জননীর আর সেই মধুর স্নেহময় ভাব নাই—এখন চারিদিকে কর্তব্যের ঘোর শাসনকর্তব্য লইয়া সকলে ছুটাছুটি করিতেছে। নয়নে আর সেই মোহ নাই—সূর্যালোকে সকলই পরিষ্কার স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। মনে জাগিতেছে আদরের, না অনাদরের। স্নেহেও পক্ষপাতিতা আছে—শুধু স্নেহে নহে—মাতৃস্নেহেও আছে—মাতাও কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে অধিক স্নেহ ও যত্ন করিয়া থাকেন। ভাবিতে ভাবিতে শয্যাসম্মুখে ফিবিযা আসিয়া দেখিলাম, আমার সে ফুলটি এখনও ফুটিয়া উঠে নাই—আমার চুম্বনের সূর্যালোকে এখনও সে ফুল স্পর্শ করে নাই, তাই এখনও সে ফোটে নাই—নিঃশঙ্ক সুষুপ্ত মুখে যেন লেখা রহিয়াছে পড়িলাম—

"অনুগ্রহ ক'রে এই ক'রো, অনুগ্রহ ক'রো না এ জনে।"

আমি তাহাকে চুম্বন করিলাম—হাসিযা আঁখি মেলিয়া সে আমার মুখেব পানে চাহিল। আমি বুকে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—মা আমাব, তুমি আদরের, না অনাদরেব?—আমি আদরের।

শরৎকুমারী চৌধুরাণীব বচনাবলী।

দূরের আলো

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপূর্ব্ববাবু সাত বছরের ডিপুটি। আমাদেব গ্রামেই বিবাহ কবেছেন। ক্বচিৎ কখনো তাঁব আবির্ভাব হ'ত; ম্যালেরিয়ার ভয়ে তিনদিন কখনো কাটাতেন না। মাথার অসুখ হওযায় কবিরাজের স্মরণ নেন। তিনি বলেছেন—এই সময় দিনকতক নথিপত্র থেকে মাথাটা নড়িয়ে, সহরের ধূলিঘন বায়ুর বাইরে গঙ্গাকূলে—কোন বৃক্ষলতাবহুল শীতল পল্লীতে থাকা, আব প্রাতে নিয়মিত গঙ্গাস্নান। আড্ডা দিতে পারলে আশু ফল পাবে,—অবশ্য দাবা পাশা বাদ, সেরেফ গান গল্প গুড়ুক, হাসি-তামাসা; তাস খেলো ত' এক ঘন্টা,—বাস্, তার বেশী নয়। এই হলেই সেরে যাবে; ঔষধের আবশ্যক নেই। তাই এক মাসের ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ী আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন, যেহেতু আমাদের গ্রামখানি গঙ্গার ওপরেই,—আব বৃক্ষলতাবহুল ত' বটেই।

আমাদের বৈঠকের আড্ডাটা ছিল বিশুদ্ধ। তিনি খোঁজ নিয়ে তাইতেই ভর্ত্তি হয়ে পড়লেন। বেশ মিশুক লোক, দু'তিন দিনেই বেমালুম আপনার লোক ব'নে গেলেন।

আমার "অমৃতবাজার পত্রিকা" আসতো,—একদিনের পুরাতন সংখ্যাখানা দুপুর বেলাটা কাটাবার জন্যে নিয়ে যেতেন। সেদিন ইংরিজি ১৯২২ সনের ২রা জুলায়ের কাগজখানা ফিরিয়ে দেবার সময় বললেন—কতবড় জাত দেখুন—ওরা বড় হবে না তো হবে কে! আকাশে ওড়া, জলের মধ্যে থাকা, হাজার হাজার মাইলে বেতার বার্ত্তার আদান-প্রদান, বৃদ্ধকে যৌবন দান, ইত্যাদি ইত্যাদি অল্পদিনের মধ্যে সেরে ফেললে। এবার দেখছি মৃত্যুর পরপারের পাত্তা লাগিয়েছে। দেখবেন সপ্তলোক ভেদ করতে ওদের সাতটা বছরও লাগবে না,—আয়না বানিয়ে ফেলবে,—ডাক বসিয়ে দেবে।

—বলেন কি? পরলোকের সাড়া কিছু পেলেন নাকি?

—আপনি বুঝি কাগজখানা কেবল নেন—দেখেন না। Sir Conan Doyle-এর (সার কোনান

দয়াল-এর) নাম শুনেছেন তো। তিনি যে-সে লোক নন—তিনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক—এডিনবরার LL. D., লণ্ডনের নামজাদা ডাক্তার, অসাধারণ বক্তা—আবার সাহিত্য-জগতে দশ জনের একজন। যেমনি হাতে বহরে, তেমনি স্বাস্থ্য, তেমনি মাথা। তিনি বিনা প্রমাণে বা চক্ষে না দেখে একটি কথাও বিশ্বাস করবার লোক নন। আজ ১৫।২০ বৎসর তিনি অলৌকিক বা পারলৌকিক রহস্যের পেছনে পড়েছিলেন। এখন প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে অর্থাৎ ভূতের বা সূক্ষ্মদেহের ফোটো নিয়ে আর পারলৌকিক স্ত্রী-পুরুষ ডেকে এনে তাদের কথা শুনে, জগতে সেই বাণী প্রচার করতে দেশবিদেশে বেড়িয়েছেন। অনেক ঘুরে সম্প্রতি আমেরিকায় লেকচার দিচ্ছেন। সর্ব্বত্রই লোকারণ্য—স্থানাভাব—চড়াদরে টিকিট কিনেও লোক দাঁড়াতে স্থান পায় না। তিনি এক পয়সাও ছোঁন না,—সব টাকাটা Psychic (আধ্যাত্মিক) গবেষণার জন্যে দেন।

তাঁর হচ্ছে—মৃত্যুর পর মানুষের জীবন নিয়ে কথা, অর্থাৎ ভৌতিক জীবন এবং তাদের সুখ বা দুঃখানুভূতি সম্বন্ধে*। আর তাঁর প্রধান বাণী হচ্ছে, "এ জীবনে যে কোন বীজ ছড়াবে বা যা বুনবে, পরলোকে তার কড়ায় গণ্ডায় আদায় পাবে বা আদায় নিতে হবে।" **

তিনি বলেছেন—যে বাণী (message) তিনি শোনাচ্ছেন—হয় এটা একটা ভয়ঙ্কর ভ্রান্তি,—মায়া। তার পরই তিনি বলছেন—"আমি যা দেখেছি, আমি যা শুনেছি, আর আমি যা সত্য বলে জেনেছি, সেইটাই শপথ করে জানালুম।" ***

—শুনলেন? কতবড় ব্যাপারটা বলুন দেখি?—ওদের অসাধ্য কিছুই নেই।

বললুম—ওঁর যা বর্ণনা শোনালেন, তাতে মহাপুরুষ বলেই মনে হয়। মানবের এতটা উপকার করছেন—একটি পয়সা নেন না। ওঁর Sherlock Holmes পড়ে ভারি আকৃষ্ট হয়েছিলুম বটে। যা হোক—উনি যে-কথা শুনিয়ে দিয়েছেন—অর্থাৎ এর চেয়ে মহত্তম বাণী মানুষকে কেউ কখনো দেয়নি, তাতেই বোঝা যায়, বিশ্বের সব দেশ সম্বন্ধে ঘোঁটা অভিজ্ঞতা না থাকলে, এতবড় কথা উচ্চারণ করতে পারতেন না। আনন্দের কথা এই,—আমরা সব হারলেও "দয়াল" আমাদের জোটেই, দয়ালের কমতি কখনো হয়নি।

ডিপুটিবাবু একটু অবাক্ হয়ে আমার মুখের ওপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—আপনার ভাবটা বুঝতে পারলুম না।

—কেন—সত্য কথা নয় কি! বরং কবে যে ওঁরা দয়া করে বলে দেবেন—"মৃত মা-বাপের শ্রাদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।" সেই সাইন্টিফিক্ বাণী শোনবার অপেক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে আছি। যখন অতদূর পৌঁছেছেন—দেবেনই একদিন। ওঁরা না বললে বিশ্বাস করতে পারি না যে।

তিনি একটু হেসে বোধ হয় মেনে নিলেন। আমিও আর কথা বাড়ালুম না।

ডিপুটিবাবুর ঝোঁক ছিল গল্প শোনবার। পল্লীর প্রাচীন কথা শুনতে তিনি ভালবাসতেন। একদিন একটা বলেছিলুম, সেইদিন থেকে নিত্যই তাঁর অনুরোধ পেতুম।

বললেন—নির্ম্মলবাবু, আজ আপনাকে এত বড় জিনিসটে শোনালুম—আপনার ত দৃষ্টি এড়িয়েই গিয়েছিল, তার বদলে এমন একটি গল্প শোনাতে হবে যাতে আপনাদের গ্রামের পূর্ব্বেকার ইতর-ভদ্র, ছেলে-বুড়ো দেখতে পাই।

বললুম—সেটা তাহলে গল্পের আইন-কানুন ছাড়িয়ে, পূর্ব্বের পল্লী-পরিচয়ে দাঁড়াবে—আর

---

* Life in the Spirit world and the realization of happiness or woe.

** Whatever is sown in this life will be reaped to the uttermost limit on the other.

*** He says himself-- The message he is delivering is either the greatest ever transmitted to mankind, or it is the most appalling delusion.

I testify to that which I have seen and heard and known to be true.

তার মধ্যে অনেক কিছু ঢুকে পড়বে। সেটা ঠিক গল্প হবে না।

তিনি হেসে বললেন—আপনার বলবার ধরণে সেটা যে গল্প হয়ে দাঁড়াবে সে ধারণা আমার হয়ে গেছে। তা ছাড়া আমি তো নিছক মিছে গল্প শুনতে চাচ্ছি না।

বললুম,—বেশ, তবে তামাকটা সেজে বসি।

১

সে-দিন ছিল শনিবার।

সকাল আন্দাজ ছ'টা হবে। বাড়ীর সামনে ছোট বাগানটাতে পায়চারি করতে করতে দাঁতন করচি। পাড়ার একজন প্রৌঢ়া কলসী-কাঁখে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন; দেখি, একটি ছোট মেয়ে তাঁকে কি জিজ্ঞাসা করায়, তিনি আমার দিকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

মেয়েটি কে? কই কখনো ত দেখিনি। শ্যাম বর্ণ, একখানি ডুরে কাপড় পরা, কোঁকড়া কোঁকড়া রুক্ষ কেশ কপালের ওপর দুলচে, বয়স হবে আট, কিন্তু সঙ্কোচমাখা সুন্দর চোখ দুটির বিনম্রভাব বয়সটাকে যেন অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে,—চোখে চাঞ্চল্যের চিহ্ন মাত্র নাই। অবাক্ হয়ে চেয়ে আছি, মেয়েটি বেড়ার ধারে এসে বললে—আমি যে আপনাব কাছে যাব।

—এস না,—ওই ওখান-দে এস।

মেয়েটি ধীরে ধীরে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার পদদ্বয় স্পর্শ কবে মাথায় দিয়ে, উঠে বললে—আমি বিন্দুবাসিনীতলার মাধব ঘোষের মেয়ে; আপনিই তো আমার বাবার দাদাঠাকুর!

হাসিমুখে বললুম,— হাঁ আমি তোমার বাবার দাদাঠাকুর আবাব দাদাবাবুও। তোমাব বাবা কেমন আছেন?

মেয়েটির মুখ ম্লান হয়ে গেল; সে বললে—আমার বাবার বড় অসুখ জ্যাঠামশাই; কাল ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, আজ আবার দীনেশ-কাকা ডাকতে গেছেন। বাবা আপনার পায়ের ধুলো চেয়েছেন।

শুনেই প্রাণটা দমে গেল। মুখে বললুম—ভয় কি, সেরে যাবেন; চল তোমার সঙ্গেই আমি যাচ্চি,—চাদরখানা নিয়ে আসি।

আমার স্ত্রী শুনে বললেন—মেয়েটিকে বাড়ীর ভেতব আনলে না কেন? হাতে কিছু দিতুম।

—'এরপর দিও' বলেই চাদর নিয়ে বেবিয়ে এসে বললুম, চল—তোমার নামটি কি মা?

—আমার নাম গৌরী।

আজ প্রায় বিশ বৎসর মাধবের সঙ্গে কোন সংস্রব না থাকলেও আমি কোন দিনই তাকে ভুলতে পারিনি। তার নামটি আজ আমার প্রাণে এই প্রভাতের পবিত্রতার মতই পবশ দিলে। প্রাণ যে তার কোন্ অদৃশ্য কক্ষে দুর্লভ স্মৃতিগুলিকে তাদের সত্যরূপ দিয়ে সসম্মানে অথচ গোপনে রাখে তা বলতে পারি না। আজ নাম মাত্রই মাধবকে যেন সর্ব্বাঙ্গে—শুধু অনুভব নয়,—উপভোগ করলুম।

২

মাধব ছিল গয়লার ছেলে। তার বাপের ছিল ৫।৭টি গরু, আব ৯।১০ বিঘে ধানজমি। তাইতেই তাদের বেশ চলে যেত। ঐ একমাত্র ছেলেটিকে হীরু ঘোষ পাঠশালে লেখা-পড়া শিখতে দেয়। মাধব পাঠশালের পড়া শেষ করলে, কিন্তু তার পড়বার ইচ্ছা শেষ হল না। হীরু নিজের জাতের অনেক কথা অনেক বিদ্রূপ সয়ে, তাদের কাছে বিনীত ভাবে মঞ্জুরী আদায় করে আর বাবুদেব অনুমতি নিয়ে, মাধবকে ইংরিজি ইস্কুলে পাঠায়।

মাধব আমাদের ক্লাসে ভর্ত্তি হয়। সে এল যেন ভদ্রলোকের ছেলেদের ভৃত্য, তাদের হুকুম

তামিল করাই তার কাজ। কারুর পেন্‌সিল কি বই পড়ে গেলে মাধব তা কুড়িয়ে দেয়, কারুর মার্ব্বল্ হারিয়ে গেলে কি দূরে গিয়ে পড়লে মাধব তা খুঁজে আনে। কেউ তারে কিছু হুকুম করলে মাধব সেটা সৌভাগ্য বলে নেয়। রোজ সকলের শ্লেট ধুয়ে দেওয়াই ছিল তার কাজ। আমি জানি মার্ব্বল খেলায় মাধবের টিপ্ ছিল খুব সুন্দর। পাঠশালে কোন ছেলে তাকে কোনদিন খাটাতে পারেনি, কিন্তু ইস্কুলে এসে পর্য্যন্ত যদি কেউ দয়া করে তাকে নিয়ে খেলতো —হেরে খাটাটাই ছিল তার কাজ। আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি বাবুদের ছেলেদের সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে ইচ্ছে করেই সে হারতো,—সব খেলাতেই।

ইস্কুলে প্রথম বছরটা তার কি নির্য্যাতনের মধ্যেই কেটে ছিল। বোধ হয় কোন ছেলেই সে-অবস্থায় এতটা দিন টেঁকে থাকতে পারতো না। একটা ভাল কথা কি হুকুম পাবার জন্যে কিরূপ লালায়িত হ'ত, কি সঙ্কোচেই সে আড়ষ্ট থাকতো,—ভয়ে ভয়ে সরে সরে থাকতো পাছে কারুর গায়ে পা ঠ্যাকে, কি কাপড়ে কাপড় ঠ্যাকে। অজান্তে সামান্য স্পর্শেই তাকে শুনতে হোতো—'এই বেটা গয়লার ছেলে—দেখতে পাস্ না।'

আবার দয়াল পণ্ডিতমশাই তার সম্বন্ধে নিজের নামের বিপরীত অর্থটাই বরাবর বহাল রেখেছিলেন। তার বিরুদ্ধে যে যা অভিযোগ কোরতো তিনি নির্ব্বিচারে তাকে শক্ত সপাং মুক্ত হস্তেই দিতেন। আমি তার হয়ে কিছু বলতে গিয়ে তাঁর মুক্ত হস্তের দান প্রায়ই পেতুম। তাতে মাধব যে কতটা কুণ্ঠা বোধ করত আর আড়ালে আমাকে কাতর ভাবে বলত—"দাদাবাবু আপনার পায়ে পড়ি, আমার হয়ে কিছু বলবেন না, আপনাকে মারটাই আমাকে বড় বেশী লাগে।" তার সব চেয়ে বড় গুণ ছিল সে কখনো মিথ্যা কথা কইতে পারত না। এ সাহস ও বয়সের ছেলেদের মধ্যে খুবই বিরল ছিল। বরং মিছে কথা কয়ে মাষ্টারদের ঠকাতে পারলে ভাবি একটা আনন্দ আর বাহাদুরী ছিল। একটা দিনের একটা কথা আজও ভুলতে পারিনি।

নটবর খবর দিলে—বসাকের বাগানে গোলাপজাম পেকেছে। যারা বাগান জমা নিয়েছে দু-এক দিনের মধ্যে পেড়ে হগ্‌সাহেবের বাজারে পাঠাবে। আমাদের গ্রামের জিনিস আমাদের চোখের সামনে-দে বেরিয়ে যাবে আর আমরা হাঁ করে চেয়ে থাকবো—এমনি আমরা অপদার্থ। আমরা কি কেবল গরুর মত গাছে ফুলধরা থেকে ফল পাকা পর্য্যন্ত দেখতেই আছি। ইত্যাদি—

নটবরের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনে বন্ধুবরেরা একবাক্যে রায় দিলে—তা হতেই পারে না, তাতে গ্রামের বদনাম আছে—শুনেছি কর্ত্তারা ঐ বাগানেই মালীদের চেকস দিয়ে—সাত-সাতটা নীচু গাছ নেড়া করে বেড়া ডিঙিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। ওঃ—এক-একজনের জোর ছিল কত। শ্যাম জ্যাঠামশাই পাকা দু কাঁদি মর্ত্তমান কলা দুহাতে ঝুলিয়ে নিমতে থেকে এই চার মাইল ছুটে এসেছিলেন—কোনো বেটা ধরতে পারেনি। ইত্যাদি, ইত্যাদি। পশ্চাতে এত বড় সব tradition থাকায় তখনি পরামর্শ স্থির হয়ে গেল সেইদিন সন্ধ্যার সময় গোলাপজাম পেড়ে আনতেই হবে, তা না তো আমরা অপদার্থ—আমাদের মুখ দেখানো উচিত নয়। একজন এ সংবাদও দিলে—বাগানের লোকেরা সন্ধ্যার সময় গঙ্গা দর্শনে যায়।

কথা হ'ল, কেহ দূরে, কেহ নিকটে পাহারায় থাকবে, আর মাধব বেশ নিশ্চিন্তে গাছে উঠে ডাল সমেত গোলাপজামের তোড়া ছুরি-দে কেটে কেটে তলায় ফেলবে, নটবর আর কার্ত্তিক কুড়িয়ে হাতে হাতে চালান দেবে।

শুনে মাধব যেন নিমেষে শুকিয়ে গেল। সে কাতর চোখে চেয়ে বললে—আপনারা আমাকে মাপ করুন, এ কাজটি আমি পারব না, আমি গরীব ছোটলোক, বাবুদের বাগানে ঢুকতেই আমার পা ওঠে না। আবার বাবার জ্বর দেখে এসেছি, সন্ধ্যের সময় আমাকেই আজ বাড়ী বাড়ী দুধ দিতে যেতে হবে। সাহস ক'রে সে 'চুরি করতে পারব না' কথাটা মুখে আনতে পারলে না —সেইটাই

ছিল তার প্রাণের কথা।

—পারবিনি? আচ্ছা বেটা। ছোটলোকেই ভাল পারে,—ঐ ক'রে খায়,—তাই বলা। তারা আবার কিনে খায় কবে? ভাল চাস্ তো এখনো বলছি।

মাধব কম্পিতকণ্ঠে বললে—আপনারা যখন যা বলেন তখুনি করি, কখনো কি না বলিচি? এ কাজটি আমি পারব না—আমাকে মাপ করুন।

—থাক্ থাক্, দেখ্‌চো না বেটা ধর্ম্মপুত্তুর। ছোটলোকের বাড় দেখেচো। সেক্রেটারী অতুলবাবুই ত এইটি করলেন, দয়াল পণ্ডিতমশাই ঢের বারণ করেছিলেন।

—যা না বেটা কানা গরু, এখানে আর কেন, দূর হ—

মাধব মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল, একবার কেবল অন্যের অলক্ষ্যে আধ-চাওয়া-গোছ আমার দিকে চাইতেই আমি ইসারায় যেতে বললুম। সে যেন ফাঁসির হুকুম পেয়ে ধীরে ধীরে বাড়ী চলে গেল। সে কি করুণ দৃশ্য। তার সেই অবস্থাটা আমাকে ভারি আঘাত করতে লাগ্‌ল। কিন্তু তার হ'য়ে একটি কথাও কইতে পারিনি।

* * *

অভিযান বন্ধ রইল না, কিন্তু সেটা সফলও হ'ল না—সুফলও দিলে না। গোলাপজামগুলি বৃক্ষচ্যুত হ'য়ে ধরাশায়ী হ'ল বটে, কিন্তু বাগানেব লোকেরা এসে পড়ায় একটিও হাতে এল না। আমাদের ছত্রভঙ্গ অবস্থায় যত্র-তত্র পথ দেখতে হ'ল।

পরদিন বেলা ১১টার সময় ঝুড়ি ঝুড়ি গোলাপজাম ইস্কুলে এসে উপস্থিত হ'ল। যারা এনেছিল তারা কেঁদে জানালে, তাদের চাকরি ত' যাবেই, মাইনেও পাবে না। ২।৩ জনকে সনাক্তও কর্‌লে। হেডমাষ্টার দয়াল পণ্ডিতমশায়ের উপর বিচারের ভার দিয়ে গেলেন।

রাতের দেখা সনাক্ত মঞ্জুর হ'ল না। ক্লাসের সব ছেলেদের এক এক করে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, এ কাজ কে করেছে? সবাই একবাক্যে বললে—করেছে মাধব। সে-ই গাছে উঠে কেটে কেটে ফেলে, আমরা তার পরামর্শ মত রাস্তায় ছিলুম ইত্যাদি। কেবল হবিবিহাবী আর আমি বলি—মাধব সে দলেই ছিল না; তার বাপের অসুখ ব'লে বাড়ী চলে গিছলো।

সওয়াল-জবাবের উল্লেখ অনাবশ্যক। মাধব নীববে যে মারটা খেলে, একটা জানোয়ারেও তা পারতো বলে মনে হয় না। স্কুলেই তার জ্বর এলো। মিথ্যা কথা কবার অজুহাতে হরিবিহারী আব আমি যা পেলুম তাতে জ্বরটা শুধু আসেনি।

এক-কুড়ি সেরা সেরা ফল পণ্ডিতমশাই স্বহস্তে বেছে নিয়ে, বাগানের লোকদের বিদায় দিলেন। আশ্বাস দিয়ে বললেন—তোমাদের কোন ভয় নেই, বাবুদের কাছে ইস্কুল থেকে চিঠি পাঠাচ্ছি—আর ফলের এই নমুনো রাখলুম—দর জেনে ফাইনের ব্যবস্থা করাব।

তারা ফলের ঝুড়ি নিয়ে চলে গেল। আর সেই বাছা বাছা "উৎকৃষ্ট এক-কুড়ি"টা দর-যাচাইয়ের জন্যে নটবরের-মারফত্ পণ্ডিতমশায়ের বাড়ী প্রস্থান করলে। সে-দিন তার ছুটি হয়ে গেল।

ঘন্টা শেষ হয়ে গেল। পণ্ডিতমশাই অন্য ক্লাশে চলে গেলেন।

আঘাতগুলোর জ্বালা তখনো জীর্ণ হয় নি। কানে পৌঁছুতে লাগলো, পণ্ডিতমশাই ছোট ছেলেদের জোর গলায় পড়াচ্ছেন—সদা সত্য কথা কহিবে; প্রবঞ্চনা করিয়া পরের দ্রব্য লইবে না। অবিচার করা মহাপাপ। ইত্যাদি—

হরিবিহারীর চোখের জল তখনো হু-হু করে পড়ছে, সে পিঠে হাত বুলোচ্ছিল—খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌ল! সবাই তার দিকে চেয়ে যোগ দিলে। আবার ভাব হয়ে গেল।

মাধব আরো দু'বছর স্কুলে পড়ে। তখন আর ভদ্রছেলেদের তার উপর সে পূর্ব্বভাব ছিল না।

সে ব্যবহারে আর চরিত্রগুণে সকলকে জয় করেছিল। বয়সের সঙ্গে বোধ হয় অনেকে তাকে চিনেও ছিল।

সকলে যে চিনেছিল এমন কথা বলতে পারি না। তার বিনীত আনুগত্য আর সুমধুর ব্যবহারকে কেহ কেহ অবশ্য প্রাপ্য বলেই ভাবতো।

বাপ মারা যাওয়ায়—সংসার, দু'টি অবিবাহিতা ভগ্নী একেবারে তার মাথার ওপর এসে পড়ায়, সে ইস্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়। এই ছাড়াটা তাকে যে কতখানি বেদনা দিয়েছিল, সে যে-দিন সকলের কাছে বিদায় নেয়, সেই দিন সবাই তা অনুভব করেছিল। সে যখন হাত জোড় করে অবনত শিরে—অজ্ঞানে যে-সব অপরাধ হয়ে থাকবে তার জন্যে সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে চোখের জল সামলাতে সামলাতে দীনহীনের মত চলে গেল,—সেই দিন আমরা—ভদ্রলোকের ছেলেরা—ক্লাসে বসে স্পষ্ট অনুভব করেছিলুম—ক্লাসটা যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। তার চরিত্রমাধুর্য্যই আমাদের অনেককেই চরিত্র জিনিসটির মূল্য বুঝিয়ে দিয়েছিল।

তারপর দীর্ঘ দিন চলে গেছে—বোধ হয় বিশ বাইশ বছর। সে বাপের কাজগুলি—চাষ-বাস, গরু-বাছুর দেখা, দুধ জোগানো প্রভৃতি মাথা পেতে নিয়ে সংসারে প্রবেশ করেছে, ভগ্নী দু'টির বিবাহ দিয়েছে, নিজেও সংসারী হয়েছে। সংসারও বেড়েছে।—তার শ্রমের বিরাম নেই, ছুটি নেই; বোধ হয় সে-বেশে সে দেখা কবতে লজ্জাও বোধ করে, তাই বড় একটা দেখাও হয় না। সে সকাল-সন্ধ্যা কাজে ব্যস্ত—আমবা উদয়াস্ত চাকরির পশ্চাতে। দু'তিন মাসে একবার দেখা হলে, সেও পূর্ব্বের মত অবাধে কথা কইতে পারে না।

ভগ্নী দু'টিব বিবাহে সে দীনের মত এসে দাঁড়িয়েছিল। আমরা গিয়ে বন্ধুর মত সব কাজের ভার নি। তাতে সে কি উৎসাহই পেয়েছিল। সে যে আমাদের নিয়ে কি করবে তা ভেবেই পায় না। কি অমায়িক কুণ্ঠামিশ্রিত হাসি।

মধ্যে মধ্যে বাংলা কি ইংরাজী বই চাইতে আস্‌তো। তাকে পেলে ছাড়তে ইচ্ছে হ'ত না, কিন্তু তার কাজে ফুরশৎ কোথায়। "নরোত্তম চরিত" আর The Imitation of Chnst বই দু'খানার সুখ্যাতি তার মুখে ধরত না। তাই ও-দু'খানা আমি তাকে দিয়ে দিয়েছিলুম—সে কণ্ঠস্থ করেছিল। দেখা শোনার দূরত্ব তাকে কি দূরে ফেলতে পারে। সে-যে আদর্শের মত হয়ে, হৃদয় অধিকার কবেছিল। তারপর তো অনেক বড়বাবু, বড় ধনী, বড় বিদ্বান, বড় গুণী দেখেছি—অনেক বড় বড় কথা শুনেছি, কিন্তু তথা-কথিত এই ছোট লোকটির সেই ছোট ছোট বিনীত ব্যবহারগুলির দুর্লভ দীনতার পশ্চাতে কি যে একটা পবিত্র মাধুর্য্য ছিল—যার শীতল সৌন্দর্য্য বড়-বড়র মধ্যে মেলেনি।

৩

মাধব মুখে একটু হাসি এনে বললে—আমি জানি, দাদাবাবু আমাকে পায়ের ধূলো দেবেনই।

বললুম—ব্যাপার কি মাধব, কি হয়েছে, অসুখটা কি?

সেই ভাবেই হাসিমুখে, খুব নীচু গলায় মাধব বললে—এবার বিদেয় নেবার অসুখ দাদাবাবু—তাই আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। জীবনের আরম্ভকালে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আমার জন্যে অনেক নির্য্যাতন স্বইচ্ছায় সয়েছিলেন, এখন বিদায় বেলায় আপনি বই আর কে সইবে দাদাবাবু।

সেই মধুর কণ্ঠ, সেই সুমধুর কথা, কিন্তু আজ তা শুনে আগের মত উপভোগ করতে পারলুম না,—প্রাণটা সহসা ব্যথায় ভরে উঠ্‌লো। বললুম—এ সব তুমি কেন বলচো মাধব,—তুমি নিজে তো আমাকে কখনো ব্যথা দাওনি ভাই,—

এইবার মাধবের দুই চক্ষু জলে ভরে এল,—সে সামলে নিয়ে বললে—সে যে অনেক কথা

দাদাবাবু, আপনার আপিসের বেলা হয়ে যাবে। পরে নিমেষ মাত্র নীরব থেকে বললে—কিন্তু এর পরের জন্যে রাখলে, আমার বেলা যে ফুরিয়ে যাবে! আচ্ছা আমার কথা থাক, দীনেশের কথাটা আপনাকে না বললে তো নয় দাদাবাবু!

—কে দীনেশ?

—আমাদের লক্ষ্মীদিদির ছেলে বললে বুঝতে পাববেন কি? ও পাড়াব হবলাল চাটুয্যে মশায়েব বিধবা পত্নী—লক্ষ্মীদিদি। আমাদের বাঁড়ুযো মশাইদের বাড়ীর মেয়ে। বিধবা হয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন, বড় কষ্ট। ঐ দীনেশ ছেলেটিই তাঁব আশা-ভরসা। ছেলেটি বড় ভাল।

এইবার সে এন্ট্রেন্স দেবে। পূর্ণবাবু বলেছেন, পাশ হলেই তিনি পোষ্ট আপিসে ৩০ টাকায় নিয়ে নেবেন। দিদি বড় দুঃখে কষ্টে মানুষ করেছেন—পাশ সে হবেই দাদাবাবু।

একটু থেমে মাধব বললে—এইবার আর একটু কষ্ট দেব,—আমার শক্তি নেই। দোরেব মাথায় ঐ যে হাঁড়ি কটা আছে তার বাঁ দিকের নীচেব হাঁড়িটা পাড়তে হবে দাদাবাবু,—একটু ভাবি ঠেকবে।

একটু নয়—বেশ ভারি; পেড়ে দেখি টাকা,—আধুলি, সিকি, দোয়ানি, পয়সা আর আধলায় আধহাঁড়ি হবে।

আমি অবাক্ হয়ে মাধবের মুখের দিকে চাইলুম। সে তার সেই পাণ্ডুব মুখে একটু হাসি ছড়িয়ে বললে—অনটনের সংসার, কিছু রাখা তো সম্ভবই নয়, এটা না রাখলে নয়,—তাই যখন যা পেয়েছি চোখ কান বুজে ঐতে ফেলেছি,—ওতে আধলাও পাবেন। ঐ আমাব ৮।৯ মাসেব সঞ্চয়! কত হয়েছে তাও জানি না, আমার চাই অন্ততঃ কুড়িটি টাকা।

আমি গুণতে আরম্ভ করে দিয়েছিলুম। শেষ হলে বললুম—প্রায় ২৩ টাকা হয়েছে।

উত্তেজিত আগ্রহে 'প্রায় ২৩ টাকা হয়েছে' বলবাব সঙ্গে সঙ্গে কি যে একটা আনন্দপ্রবাহ তাব চোখে-মুখে তরঙ্গিত হয়ে গেল, তা প্রকাশ কবা যায় না। তাব পবেই সে চোখ বুজলে,—দুটি চোখেব বাইরের কোণ দিয়ে দুটি ধারা গড়িয়ে পড়লো!

তারপর শীর্ণ মুখখানি হাসিতে উজ্জ্বল করে বললে—পায়েব ধুলোব পরেই—এই হাঁড়িটিব ভার দেবার জন্যেই আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। ঐ যা আছে ওর মধ্যে দীনেশেব এন্ট্রেন্স দেবাব ফি আর পরীক্ষার ক'দিন তার কলকেতায় থাকবার ব্যবস্থাদি আপনাকে করে দিতে হবে। কম পড়ে তো—আপনাকে আর কি বলব দাদাবাবু,—আমার আর তো কিছু নেই।

আমার কথা সরছিল না,—চেষ্টা করে বললুম—কম তো পড়বেই না ভাই, ববং কিছু বাঁচবে। কিন্তু আমি বলি কি—পরীক্ষার এখনো ২।৩ মাস বিলম্ব আছে—সম্প্রতি—

মাধব কাতরভাবে বাধা দিয়ে বললে—না দাদাবাবু, ও আজ্ঞে কববেন না! আমাদেব বাক্স, প্যাঁটরা, লোহার সিন্দুক—সবই ওই হাঁড়ি। যে টানাটানির সংসার—আজই এক সময় সব হাঁড়িকুঁড়ি ওট্‌কাবে। আজ ৮।৯ মাস সংসারকে বঞ্চিত করে অনেক চেষ্টায় ওই যা হয়েছে, ও-থেকে ওষুধে ডাক্তারে দিলে—আমি তো মরবই দাদাবাবু, কিন্তু বড় অশান্তিতে ছট্‌ফট্ করে মরব!

—না মাধব—ও আমি নিয়ে যাচ্ছি ভাই, তোমার ইচ্ছামতই খরচ হবে।

—আঃ, ও সম্বন্ধে আমি এখন সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত হলুম। ও কাজটি আপনার মত আর কে পারতো। আপনাকে দেবতা বলে জানি, আর একটি কথা যদি দয়া করে বলে দেন, আমি বল পাই, সম্পূর্ণ শান্তিতে মরতে পারি। আমি মুখ্‌খু গয়লা, এ-জন্মে কিছু দেখা-শোনার সুযোগ হল না। ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ধ্যান-ধারণা শোনাই রইল, কি করে সকলে দুবেলা দুমুঠো খেতে পাবে এই ধান্ধায় শয্যা ত্যাগ থেকে শয্যা গ্রহণ পর্য্যন্ত চিন্তা আর পরিশ্রমে জীবনটা কেটেছে। শ্রান্ত শরীর শয্যায় পড়লেই রাতটা নিদ্রায় কেটে যেত। 'তোমার সংসারে তুমি আমাকে চাকর রেখেছ, তোমার ইচ্ছামত তুমি আমাকে চালিয়ে নিও,—শক্তি দিও। অপরাধ থেকে রক্ষা কোরো।' এইরূপ একটা মূর্খের

মনগড়া প্রার্থনা নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেছিলুম! আজ যাত্রা শেষে তাঁর সংসার তাঁর হাতে দেবার সময় মনটা এক একবার নড়ে উঠছে—দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে—কষ্ট দিচ্ছে। হাঁ দাদাবাবু—চাকর থাকলে, মনিব একটু নিশ্চিন্ত থাকেন। সে গেলে—তিনি নিজে না দেখে কি থাকতে পারেন?—সব তো তাঁর? চাকরেব দেখাব চেয়ে ঢের বেশী দেখবেন। তিনি ত শুধু মালিক নন—তিনি অনাথনাথ,—নয় কি দাদাবাবু?

তারপরই ম্লান হাসির সঙ্গে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—ভেবে আর কি কবব!

মনটা দমে তো গিছলই,—বুঝলুম মাধব মস্ত একটা অশান্তি ভোগ কবছে,—প্রাণটাও বেদনা-চঞ্চল হয়ে উঠলো। জোব কবে বললুম—যে আজীবন সত্যকে ধবে চলেছে—তিনি নিজে তাকে ধরে থাকেন, তার ধারণা কখন মিথ্যা হয না ভাই! তুমি যা ঠাউরেছ তাব চেযে সত্য আর নেই, এই আমার বিশ্বাস। এব বেশী আমি বুঝি না—তোমাব ভাবনা আসছে কেন?

মাধব কেঁদে ফেললে! বললে—বড় অপবাধ হযে গেছে দাদাবাবু! আমাব মাথা ঠিক থাকচে না, সেই আমাকে ডোবাচ্ছিল। আর নয়—আব হবে না—বলেই সে তাব শীর্ণ হাত দুটি একত্র কবে কপালে ঠেকিয়ে চোখ বুজলে। দুই চক্ষে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিন মিনিট শ্বাস নেই! আমি চঞ্চল হয়ে উঠলুম।

সেই একটি নমস্কাবে বোধ হয সে সর্ব্বস্ব সমর্পণ শেষ কবলে, আব একটা ঝড়েব মত নিঃশ্বাসে বাইবেব সব-কিছু হটিয়ে দিলে—তাবপব আঃ—বলে চোখ খুলে আমাব দিকে হাসি মুখে চেয়ে বললে—এইবাব মন খুলে পায়ের ধুলোটা দিয়ে যান, আফিসের বেলা হল।

সে কি প্রফুল্ল মুখ! চোখেব সামনে যেন পদ্মেব বিকাশ দেখলুম। আমি কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মিনিট দুই কেটে গেল। সে-ই কথা কইলে,—কাল ববিবাব না,—পাবেন তো এদেব একবাব—এই পর্য্যন্ত বলেই—হাসিমুখে বললে—ছিঃ অভ্যাস কি মলেও যাবে না দাদাবাবু! তা আপনাদেব হাত দিয়েই তো তাঁব দেখা দেখি।

বললুম— মাধব, এ-সব তুমি কি বোকচো, তোমাব এমন কি হযেছে? সে তো একদিন সকলেবই আছে,—তোমাব ত ভাই ৯ বিঘে ধান জমি রযেছে,—ভাতেব ভাবনা নেই,—আমাব কথা অসমাপ্ত রইল।

'সে আব নেই দাদাবাবু' বলে আমাব মুখেব ওপব চেয়ে একটু জোবে হাসতে গিযে, তাব কাশি এল, ঘুবে ওপাশ ফিবলে—কি খানিকটে মুখ থেকে বেবিয়ে গেল। বিছানাতেই ফর্শা ন্যাকড়া ছিল, তাইতে মুখ মুছে, সেটা চাপা দিলে।

একটু আগে দীনেশ ওষুধ খাওযাতে আসে, মাধব তাকে বলেছিল—বাবা—ওষুধ আব আমাকে দিসনি,—গঙ্গাজল দিলেই বেশী উপকার হবে। সে ক্ষুণ্ণ হচ্চে দেখে বলে,—আচ্ছা দাও। আব দেখো বাবা—বাড়ীতে খোঁজটা নাও, চাটুয্যে মশায়েব ছেলেব দুধটা গেছে কি না। খোকার দুধটা যেন সকাল সকাল যায়—ভুল না হয়।

ভাবলুম, ওষুধটা উঠে গেল,—আমি বসে রযেছি—তাই কু-দৃশ্যটা চাপা দিলে।

একটু পরে বললুম—সে আর নেই? কি রকম?

—সেই জমিটে?

দেখি, মাধব চোখ বুজে সামলাচ্ছে, সেই অবস্থাতেই বললে—পবে শুনবেন দাদাবাবু।

বুঝলুম সে কষ্ট বোধ করচে—এখন তাকে প্রশ্ন করাটা ভাল হয় নি। মনে মনে অপ্রতিভ হয়ে বললুম—আমি এখন চললুম মাধব, তুমি একটু স্থির হয়ে শোও ভাই, বড় বেশী কথা কওয়া হয়েচে—কাজটা ভাল হয় নি। আমি সন্ধ্যার সময় না হয় কাল সক্কালেই আসব অখন।

মাধব ক্ষীণ স্ববে বললেন—সে যা হয় করবেন—এখন ত পায়ের ধুলো আমার মাথায় দিয়ে

যান, আমি যে নিতে পাচ্ছি না দাদাবাবু!

তার ওই শেষের কাতর কথা কয়টি আমার হৃদয়ে যেন আসন্ন বিপদের ছায়ার মত এসে পড়লো। এতক্ষণ আমি তার কথাগুলির মধ্যে অবসাদমাখা নৈরাশ্যের সান্ধ্য-সুর পেয়ে ব্যথা বোধই করছিলুম, তার পশ্চাতে যে বিদায়ের আয়োজন বিপুল হয়ে উঠেছে—সেটা একবারও মনে উদয় হয় নি।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ছিলুম, তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই রইলুম। সে চোখ বুজেই বললে—কই দাদাবাবু!

আমি যন্ত্রের মত 'এই যে ভাই' বলে, ভগবানকে স্মরণ করে, তাড়াতাড়ি তার মাথায় পায়ের ধুলো দিলুম। আমার রুদ্ধ শ্বাসটা পড়লো, সে বোধ করি জানতে পারলে, তার মুখে একটু হাসির আভাস দেখলুম, কিন্তু আর সে কথা কইলে না। আমারো কিছু জোগালো না। ব্যথাভরা বুকে ধীরে ধীরে দাওয়ায় পা দিতেই—বিপদ-শঙ্কিতা কম্পিতহৃদয়া—সমগ্র বিশ্বের মূর্ত্তিমতী দীনতার মত মলিনাঞ্চলখানি গলায় দিয়ে গৌরীর মা আমার পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে গিয়ে প্রায় লুটিয়েই পড়লো,—দেহ তার হতাশ-শিথিল হয়ে গেছে!

৪

রাস্তায় হরিবিহারীর সঙ্গে দেখা।

হরিবিহারী আমাদের সহপাঠী ছিল। সেও মাধবের জাত, বোধ হয় দূরসম্পর্কও আছে। তারা ২।৩ পুরুষ জমিদার, তাই গ্রামের সকলের সঙ্গে তাদের মেলামেশা সহজ ভাবেই চলে। হরিবিহারীর স্বভাব বরাবরই নিরীহ আর পরোপকারপরায়ণ।

—হাতে হাঁড়ি যে—বিদেয় নাকি? বলে সে হাসলে।

আমার হাসবার মত মনের অবস্থা ছিল না, বললুম—বিদেয় বটে, —মাধব দিলে।

—মাধবকে দেখতে গিছলে নাকি, —কেমন দেখলে—সে আছে কেমন?

—অসুখ তো বটেই, কিন্তু তার অতটা হতাশ হবার মত কিছু তো দেখলুম না। তবে বোধ হল যেন তার ভেতরে কি একটা কঠিন অসুখ আছে, যার ব্যথা তার মর্ম্মে পৌঁছে গেছে—তার উদ্যম উৎসাহ, আশা ভরসা একেবারে মুছে দিয়েছে।

—তোমাকে কিছু বললে?

—না।

—তুমি কিছু শোন নি?

—না।

—সে অনেক কথা, তার পরিবার কামিনী—আমাদের আপনা-আপনির মধ্যে, আমার সঙ্গে কথা কয়— সে-ই আমাকে ডেকে পাঠায়, তা না ত' তার অসুখের খবরও পেতুম না। যাক—গুপী দত্তকে চেন ত'—যিনি আজ তিন বছর হল আমাদের গ্রামে এসে বাস করচেন? ওর জন্ম কেটেচে জমিদারী সেরেস্তায়। সেরেস্তার একটি দক্ষ দানব। মজিলপুর মজিয়ে, আমাদের গ্রামে এসে নতুন করে গজিয়ে উঠেচেন। এই তিন বছরের মধ্যেই মামলা মকর্দ্দমা শতকরা ষাটে পৌঁছে দেছেন। আমাদের ৭।৮ জন প্রজার ১৭ বিঘে ধান জমি সাফ উড়িয়ে নেছেন। তারা নাকি, টাকা ধার নিছলো। তারা বলে ওঁকে চিনিই না। আমাদের সেরেস্তার রামহরি সরকার বলে— এখনও ওঁর পরিচয় পান নি—সবুর করুন। ঐ দত্তটি ব্রজপুরের বাবুদের সত্ত্বকত্ব রেখে আসেন নি। জালে অমন সিদ্ধহস্ত কাল কলিতে জন্মায় নি। কোথাও আবির্ভাবের এক সপ্তাহ মধ্যে উনি লোক চেনাটা সেরে ফেলেন। দেখেন উনি দুটি জিনিস, কারা ভাল মানুষ, তাদের উনি কোন একটি স্বনামখ্যাত পশু বলেই জানেন।

আর দেখেন— সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত বংশের কে কে খুব কষ্টে দিনপাত করচে; তাদের উনি সহানুভূতি দেখিয়ে আপনার জন করে নেন—কখন কিছু সাহায্যও করেন। অর্থাৎ মুঠোর মধ্যে করেন। তাঁরাই ওঁর কার্য্যাদির সাফাই গান, সাক্ষী হন, —অপরের সাক্ষী দিইয়ে তাঁদের কিছু কিছু পাইয়েও দেন।

—সকালে গুপী দত্তর কথা কেন?

—বলছি। মাধবকে আর মারলে কে? আজ দশদিনের কথা—মাধব একখানা রেজিষ্ট্রী করা চিঠি পায়। খুলে দেখে— গুপী দত্তর উকিল উমেশবাবু লিখেচেন—আমার মক্কেল শ্রীযুক্ত গুপীনাথ দত্তের নিকট তুমি হ্যাণ্ডনোটে যে ৩৫০ টাকা দু'বছর সাত মাস পূর্ব্বে কর্জ্জ নিয়েছিলে, সে টাকা মায় সুদ, যেন আজ হইতে সপ্তাহের মধ্যে পরিশোধ করা হয়। নচেৎ আজ হইতে এক সপ্তাহ অন্তে তোমার নামে আদালতে নালিশ রুজু করিয়া উক্ত টাকা আদায় করিতে আমার মক্কেল বাধ্য হইবে। ইত্যাদি —

মাধব ভেবেছিল—চিঠিখানা ভুলক্রমে তার কাছে এসেছে, এ মাধব আর কেউ হবে। দু দিন আগে তার জ্বর হয়েছিল। জরুরী জিনিস ভেবে সেই রাতেই জ্বর গায়ে সে উমেশবাবুর সঙ্গে দেখা করে বলে—এ পত্রখানা বোধ হয় ভুলে তার কাছে গিয়ে পড়েছে, তাই সে দিতে এসেছে। গুপীবাবুকে সে একবার মাত্র দেখেছে, তখন সে তাঁর নামও জানত না। তিনি তাঁর লক্ষ্মী বলে যে গাইটি ৬।।০ সের দুধ দেয়, সেইটি কিছু দিয়ে নিতে চান। তাতে সে হাত জোড় করে বলে— আমি অতি গরীব গয়লা, ঐটির কৃপায় কোন প্রকারে চলে যায়—আমাকে ক্ষমা করুন বাবু।

তিনি তাতে—'বেশ বেশ—লক্ষ্মীকে রাখাই তো পুরুষার্থ হে।' এই বলে চলে যান। আমি ভদ্র লোকের কথা রাখতে না পেরে আর তাঁর কথার ভাব বুঝতে না পেরে—মনটায় বড় অস্বস্তি বোধ করেছিলুম। তারপর তাঁর সঙ্গে আর কখনো কথা হয় নি,—দূরে দূরেই তাঁকে দেখেছি।

উমেশ উকিল মাধবকে জানতেন, তিনি বলেন—তুমি দেখছি আর সে মাধব নেই। তোমার সঙ্গে গুপীনাথ দত্ত মশায়ের যদি আর দেখাই না হয়ে থাকে ত' তোমার এই হ্যাণ্ডনোটখানা তাঁকে দিয়েছিল কে আর টাকাটাই বা তুমি কার হাত থেকে নিয়েছিলে। এই বলে তিনি মাধবের হ্যাণ্ডনোটখানি দেরাজ থেকে বার করে— মাধবকে দেখতে দিয়ে বললেন—এ লেখা কার,— সইটে কার?

মাধব সাগ্রহে দেখতে গিয়ে সহসা যেন ধাক্কা খায়। সাক্ষীরূপে ভগবতী চাটুয্যে মশাই সই করেছেন দেখে চমকে ওঠে। তার মুখের বর্ণটা মুহূর্ত্তে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উমেশবাবুর হাতে কাগজখানা দিয়ে বিমূঢ়ের মত মাথা নীচু করে থাকে। উমেশবাবু বলেন—এখন কি বল? এ হ্যাণ্ডনোট কি তোমার নয়? মাধব কাতরতা মিশ্রিত বিনীত কণ্ঠে বললে—না বলবার তো যো নেই উকিলবাবু!

—তবে কি এ হ্যাণ্ডনোট তোমার নয়?

—নয় তো নিশ্চয়ই কিন্তু সে কথা ত' আপনিও বিশ্বাস করতে পারবেন না উকিলবাবু!

এইবার তিনি সুর বদলে বললেন—*এ কুবুদ্ধি তোমায় কে দিলে? ওসব ফন্দি ছাড়—বিপদে* পড়বে, বুঝলে—

—যে আজ্ঞে, ছাড়লুম।

—হ্যাঁ আদালতে ও সব ট্যাঁকে না, বুঝলে। ধর্ম্মের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না। তা যদি হ'ত ত ধর্ম্ম এতদিন ধৃতরাষ্ট্র হয়ে যেত। তোমার মত অনেকে অনেক চেষ্টা করচে আর করেও, তাতে বাধা দিয়ে ধর্ম্মকে রক্ষা করবার তরেই আদালত আছে আর আমরা আছি—বুঝলে।

মাধবের ও-সব কোন কথাতেই কান ছিল না। উমেশবাবু বলে চললেন,— তুমি গ্রামের লোক,

ভাল লোক বলেও জানতুম—কারুর কুপরামর্শে পড়েছো দেখছি,—যাক্,—টাকা জোগাড় করতে যদি না পার ত' যা বলি তাই করগে, সুবিধে হলেও হতে পারে। গুপীবাবু—মহাশয় লোক—তাঁর কাছে গিয়ে দুখ্খু জানালেই কাজ হবে বলে আমার বিশ্বাস। কিছু ধান জমি আছে না?

—আজ্ঞে—৯ বিঘে।

—তাতে তো অর্দ্ধেকও হয় না হে। আচ্ছা যাও দিকি একবার, তিনি তেমন লোক নন, হাতে-পায়ে ধরলে,—বুঝলে? যাও,—গ্রামের লোক তুমি—না হয় আধঘন্টার মধ্যে আমিও উপস্থিত হচ্ছি, দেখছি সুদটো যাতে,—বুঝলে? যাও।—হবে গয়লা বেটা নিছক খাঁটি জল খাওয়াচ্ছে হে। মোটা হচ্ছি কি ড্রপ্‌সি দাঁড়ালো বুঝতে পারচি না। তোমাদের জাতের উপকার করাই ভুল, তবে শুনেছি তুমি ভাল লোক,—দেখি।—আচ্ছা, আগে গুপীবাবুর কাছে যাও তো, সংসারে নিজের কাজ আগে—শুভস্য শীঘ্রং—বুঝলে,—

মাধব অতিষ্ঠ হ'য়ে শুনছিল, জ্বরটাও যাতনা দিচ্ছিল, সে প্রণাম ক'রে টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে বাঁচে।

* * *

আমাদের বাল্যবন্ধু রাম রায়, উমেশ উকিলের ক্লার্ক্ (মুন্সি) কি না, —সে তখন উপস্থিত হল। জানই ত' সে নকুলে লোক—'শোন শোন বিদুর দুর্য্যোধন সংবাদটা শুনে যাও' ব'লে ডেকে সমস্ত কথাবার্ত্তা যেমন যেমন হয়েছিল, অভিনয়ের মত ক'রে শুনিয়ে শেষ বললে—মাধবের ও ন-বিঘে ত' গেছেই—আবার সুদের বদলে দুধ চাই, ওর লক্ষ্মী ব'লে গরুটাও গিল্‌বে। আমার হাতে ভাই অনেক কাগজ আসে, কিন্তু অন্যের লেখার এমন নিখুঁৎ নমুনো কখনো নজরে পড়েনি। তার গুপীর দৌলতে উকিলবাবুর এখন যথেষ্ট 'রূপী' আস্‌ছে দু'জনে হরিহরাত্মা। কোন উপায়ই ত' দেখি না ভাই?

যাক্, রাম রায় যা যা বলেছিল ঠিক্ তার কথাগুলিই তোমাকে বলেছি। বাদ গেছে কেবল তার ভাব-ভঙ্গি আর কণ্ঠস্বর।

বললাম—মাধব উমেশবাবুর পরামর্শ মত গুপী দত্তের কাছে গিয়েছিল?

—তুমি কি মাধবের প্রকৃতি জান না। সে এই কদর্য্য প্রস্তাব শুনে, অতবড় মিথ্যাটা মাথা পেতে নিতে যেতে পারে? তার চেয়ে সে মরণটাই বরণ ক'রে নিলে দেখছি। এই ব'লে হরিবিহারী উদাস ভাবে একটা নিঃশ্বাস ফেললে।

বললে—জ্বর নিয়ে বেরিয়েছিল রাত ৮টা আন্দাজ, যখন উমেশবাবুর বাড়ী থেকে ফেরে, তখন জ্বর অনেক বেড়ে গেছে। চৌধুরী পাড়া পেরুতে পারে নি, পোলটার উপর শুয়ে পড়ে। সন্ধ্যের আগে ঝড়বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছিল, সব ভিজেছিল, জোলো হাওয়াও দিচ্ছিল। রাত হওয়ায় দীনেশকে বলে পাঠানয় সে খুঁজতে যায়। যখন বাড়ী আনলে, তখন ১২টা বেজে গেছে। মাধবের ভাল সংজ্ঞা ছিল না, দৃষ্টি লক্ষ্যহীন,—কথার মধ্যে—'না, না'—'তা হ'তেই পারে না', কখনো—'ব্রাহ্মণ দেবতা—অত বড় পবিত্র বংশ'—কখনো—'আহা, বড় কষ্টেই পড়ে থাকবেন', কখনো বা—''বড় অভাবেই করে থাকবেন', কখনো 'তাতে কি হয়েছে, ব্রাহ্মণ দেবতা—অভাব যে বুঝি গো, সেই তো মানুষকে ভুল করায়।' 'কার্মিনি খবরদার, ছেলের দুধ না বন্ধ হয়, সকাল সকাল পাঠিয়ে দিও। ওটা অভাবেতে করিয়েচে—অভাবেতে। ওঁর দোষ নেই।' 'উনি করতেই পারেন না—ব্রাহ্মণ যে'; সারারাত এই সব অসংলগ্ন কথাই বার বার বলেছিল। সকালে ঘুমিয়ে পড়ে, জ্বর কমে যায়।

সাত দিনের দিন ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, ডবল-নিউমোনিয়া। কাল থেকে রক্তও দেখা দিয়েছে।

শুনে চমকে উঠলুম, প্রাণটা অবলম্বন খুঁজে পেলে না—হায় হায় করে উঠলো। বুঝলুম—সে 'কু-দৃশ্য' চাপা দেয় নি, আমি না বেদনা-বিচলিত হই, তাই কালের জরুরি ডাকের রক্ত-লিপিখানা ঢাকা দিয়েছিল।

বললুম—হরিবিহারী তুমি ভাই মাধবের কাছ থেকে আর নোড়ো না, আমি এলে তোমার ছুটি। আমার দুর্ভাগ্য, এমন একটা কাজ ফেলে এসেছি আমাকে আপিসে যেতেই হ'বে ভাই। তা ছাড়া চাবিও আমার হাতে,—তুমি গিয়েই মহেন্দ্র ডাক্তার মশাইকে আনতে দীনেশকে পাঠিয়ে দেবে, রাজকুমারবাবুরও থাকা চাই, খরচ সব আমার।

বেশ—তাই হবে। কেবল ব'লে যাও, হাঁড়িটাতে কি?

বললুম। শুনে ম্লান-হাসির সঙ্গে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে বললে—জানো ওর জন্যে সে কি কাণ্ড করেছে। কাপড়, কাপ, কড়াইশুঁটি, আঁব, পান, ইলিশমাছ এ-সব থেকে ও-বাড়ী আজ প্রায় এক-বৎসর বঞ্চিত। গয়লার বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা দুধ খায়নি, —ওই দীনেশ ছেলেটির এন্ট্রেন্স্‌দেবার খরচ সঞ্চয়ের জন্যে, —ওর লক্ষ্মীদিদির দুঃখ দূর হবার আশায়।

পাঁচ দিন আগেও জানতে পেলুম না। অসহায় বালকের মত হাত পা আছড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল, বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি বললুম —হরিবিহারী আর শোনাস্‌নি ভাই, মাধব যাতে বাঁচে তাই কর। মহেন্দ্র ডাক্তার যা বলবেন— ঠিক ঠিক তাই করা চাই—খরচ যতই হোক্। আমার ফিরতে সন্ধ্যে —

তখন কুটার পানসীর চলন কমে গেছে। আমাদের গঙ্গা পার হয়ে, বালী থেকে ট্রেণে কলকাতায় যাতায়াত করতে হয়। মেঘনাদ মাঝি আমাদের পারাপার করে। খালের একটা ঘাটে আমরা উঠতুম নাবতুম। ট্রেণের টাইম বুঝে দুবেলাই নৌকো ছাড়া হত, —এমন দু'তিন বার। আমরা ছিলুম মাসিক বন্দোবস্তের যাত্রী,—অপর কারুর কাজ পড়লে, তাঁরাও আসতেন যেতেন —মানা ছিল না। কোন কোন দিন বাঁধাব্যবস্থার বাবুরা তাতে বিরক্ত হতেন,—বিশেষ করে আপিস যাবার সময়,—বেশী বোঝাই হলে পাছে বেলা হয়, ট্রেণ মিস্ হয়। মেঘনাদ তখন হাত জোড় করে ধীরে ধীরে বলতো—কোথায় এখন ঘুরে বেড়াবেন, কষ্টে পড়বেন, কাজের ক্ষেতি হয়ে যাবে, —আসতে দিন বাবু, আমি খেটে পৌঁছে দেব অখন। পয়সার লোভে নয়, —পয়সা সে ক'রুর কাছেই চাইতে পারতো না। আসল কথা, সে কারেও ক্ষুণ্ণ করতে পারতো না— 'না' বলতে পারতো না।

মেঘনাদ জাতে মালা হ'লেও মালাদের মত তার কোনখানটাই ছিল না। তার স্বভাব-চরিত্র কথা বার্ত্তা ব্যবহার বিনয় লক্ষ্য করলে আশ্চর্য্য হ'তে হ'ত। কোন নেশাই তার ছিল না। গভীর-রাত্রে বা যে কোন সময় তাকে ডাকলে সে বিরক্ত হত না—পার করে দিত, কখনো বলতো না—কি দেবেন? ফল-কথা, এই নিরক্ষর মালার মধ্যে যে-সব সদ্‌গুণ লক্ষ্য করেছি, শিক্ষিত ভদ্রের মধ্যে তা বিরল। তাই সে সম্বন্ধে মেঘনাদের সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখবার আমার একটা ভারি কৌতূহল ছিল, —এতটা বৈশিষ্ট্য তা'তে কোথা হ'তে এলো, —নিশ্চয় সে কোন শক্তিমান গুরু পেয়ে থাকবে। কিন্তু কথাটা পাড়বার আর আমার সুযোগ ঘটত না, ইচ্ছাটাই থেকে যেত।

আজ শনিবার, আফিস থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে কিছু বেদানা, আঙুর আর আপেল নিয়ে ৪।।০ টার ট্রেণ ধরলুম। মহেন্দ্রবাবু নিশ্চয় আশা দিয়ে গেছেন—এতক্ষণ তাঁর ওষুধ বোধ হয় তিন-দাগ পড়ে গেছে।

খালধারে পৌঁছে দেখি, মেঘনাদ নৌকা নিয়ে হাজির আছে। আমার আগেই কে দু'জন নৌকায় উঠে বাইরে গলুয়ের দিকে ব'সেছে।

নৌকায় পা দিয়েই চমকে গেলুম; ভগবতী চাটুয্যে মশাই বললেন—এই যে নির্ম্মল—ভাল আছ বাবা, বাড়ীর সব ভাল? সেই চির-পরিচিত সদ্বংশসুলভ সরল অমায়িক সহজ সুর! কেবল

চক্ষু দু'টি বোধ হল কলুষমত। ঘৃণা আমার ভেতর থেকে ঘুলিয়ে উঠেছিল, সেটা মুখে-চোখে পৌঁছাবার পূর্বেই—আজ্ঞে ভালই আছি, বাড়ীর সব ভাল;—ভেতরে এসে বসুন না, বলতে বলতে হালের দিকে নৌকার ছইয়ের উপরে গিয়ে বসলুম। না—এইখানেই আমরা বেশ আছি বাবা, দেরী ত' হবেই, সন্ধ্যাহ্নিক সেরে নিতে পারবো।

আমার শনিবার-সোমবার ছিল না, স-ছটার ট্রেণেই আসতুম। মেঘনাদের দিকে চাইতে সে বললে—আজ পাঁচটা বিশ মিনিটের গাড়ীতেই বাবুরা সব আসেন, সেইটাই শনিবারের বড় পাড়ি। ভেঁটেল ঠেলে গিয়ে, সময়ে এসে জুটতে পারবো কি? তাড়া আছে কি বাবু?

বাবুদের মেজাজ আমার জানা ছিল পাঁচ মিনিট দাঁড়াতে হলে মেঘনাদকে অনেক কথা শুনতে হবে। সারাদিন খাটুনির পর ক্লান্ত ক্ষুধিত বাড়ীমুখো বাঙালীর মেজাজ ঠিক রাখার আশা করাও অন্যায়। বললুম—তাড়া ত খুবই ছিল মেঘনাদ, কিন্তু উপায় কি,—থাক্।

মেঘনাদ বড় কুণ্ঠায় পড়ে বললে—বলেন তো—

বললুম—না—থাক মেঘনাদ, বিশ পঁচিশ জনকে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে।

মেঘনাদ ব্যস্ত হয়ে বললে—একখানা নৌকা দেখবো কি বাবু? আমি তাকে শান্ত কববাব জন্যে বললুম—না, মেঘনাদ, আমি ওই পাড়িতেই যাব। অনেকদিন থেকে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো করবো করে করা হয় নি, আজ এই ফাঁকে সেইটাই শুনি।

মাধবই মাথার মধ্যে ঘুরছিল। হঠাৎ মেঘনাদের মধ্যে তার ছায়া যেন দেখতে পেলুম। তাই কথাটা মনে পড়ে গেল। ভালই হল, তা না হলে মেঘনাদ সারাক্ষণটা ক্ষুন্ন মনেই ছট্‌ফট্ কবতো।

গুপী দত্ত চাটুয্যে মশায়ের গা ঠেলে—ঠোঁট উলটে ভুরু তুলে বিদ্রূপের হাসি ফলিয়ে বললে—আজ-কালের উদারতা! চুলোয় যাক্, আটটার পরই উমেশ আসবে, আজ তো তোমার পেটেব চিন্তা নেই—ঠোঙা-পোরা খাবার, আর—এই দুটো রাখো। এই বলে চাটুয্যে মশায়ের হাতে কি দিয়ে বগল থেকে নথিপত্রের বাণ্ডিল বার করে—চাটুয্যে মশাইকে কি সব বোঝাতে লাগলেন। সেটা আর শোনা গেল না।

বেশ বোধ হল চাটুয্যে মশাই অনিচ্ছায় একটু ঝুঁকলেন মাত্র, কান আমাদেব দিকেই রইল—

তিনি আমার কাছ থেকে ৪।৫ হাত মাত্র তফাতে ছিলেন। মেঘনাদেব কাছে আমি যা শুনতে চেয়েছিলুম, সেটা নিশ্চয়ই তাঁর কানে গিয়ে থাকবে।

দু-চার-বার ইতস্তত করে মেঘনাদ সহাস্য বিনয়ে বললে—সে শুনলে আপনি হাসবেন বাবু, —বিশ্বাস করবেন না।

বললুম—তুমি মিছে কথা কইবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে মেঘনাদ, তা না তো শুনতে চাইতুম না।

—সে অনেক দিনের কথা বাবু—তখন আমার বয়েস ১৫।১৬, এখন দুকুড়ি চোদ্দ চলছে। ঐ বয়সেই আমি ঃ ম্বা-চওড়া জোয়ান হয়ে পড়েছিলুম। মালা-পাড়ায় কেউ আমার সঙ্গে পারতো না, সবাই ভয় করত। সাঁতার কেটে দু' বেলা ও-পারে গাঁজা খেতে যেতুম, —ছোটলোকের আরো যে সব আয়েব তা ধরতে আরম্ভ করেছিল। এ-পারে ও-পারে সঙ্গীও জুটেছিল তেমনি। এমন সময় আমার কলেরা হল। মধু ডাক্তার মশাই দেখলেন, বাঁচাতে পারলেন না। সন্ধ্যে থেকে ঘবের মধ্যে বড় বড় অচেনা চেহারা আর কুকুর দেখতে লাগলুম। ভয়ে আর কথা কইতে পারলুম না। তাদের একজন বললে—৯টা হয়েছে, আর নয়, এইবার চলে আয়। আমাকে যেন যাদু করলে, —না বলতে পারলুম না, কেবল বললুম—কি করে যাব? আর একজন ধমকে বললে—দেরি হয়ে যাচ্ছে — হাঁ করে চলে আয়। হাঁ করতেই দেখি আমি বাইরে—দেহটা মাদুরে পড়ে। মা-বোনেরা চীৎকার করে কাঁদচে, পাড়ার সবাই ছুটে আসছে, কেউ বলচে অসুর পাত হয়ে গেল, অত বড় জোয়ান

আর দেখবো না, দূরে কেউ কেউ বলাবলি করছে—যে বাড় বেড়েছিল—ও কি থাকে—পাপ গেল।

আমি তখনো আমার ঘরে আর বাড়ীর চাবদিকে ঘুরচি, দেহটাকে ছেড়ে যেতে পারচি না। কোথায় যাব? ঐ তো আমার ঘর। দেহ ছেড়ে থাকবো কোথায়? এমন সময় তারা ধমকে বললে—আয় আমাদের সঙ্গে—তোর থাকবার জায়গায় চল। —একজন বললে—এখানেও আসতে পাবি—এখন আয়। এই বলতেই কুকুরগুলো এগুলো—তার পরই তাদের সঙ্গে আমরাও শূন্যে চললুম। খানিকক্ষণ কিছুই বুঝলুম না। তারপর—সে যে কি তা বোঝাতে পারবো না বাবু,—ভিজে ভিজে কালো স্যাঁতসেঁতে জমাটবাঁধা অন্ধকার,— তা থেকে আবার কোয়াশার মত ধোঁ উঠছে—দম আটকে যেতে লাগলো। লক্ষ লক্ষ দুঃখী অসহায় স্ত্রীপুরুষের হাহাকার একসঙ্গে কানে ঢুকে মাথা বোঁ বোঁ করতে লাগল। ছটফট কবতে লাগলুম। একজন বললে—দুধার বেশ করে দেখতে দেখতে চল। কোন দিকেই দৃষ্টি ছিল না— ভাল করে দেখবার চেষ্টা কবতে গিয়ে শিউরে উঠলুম—ওরে বাপরে—এ কি! আমাদেব দুধারে মিশমিশে কালো—দয়ের মত ঘন নদী চলেছে,—কি দুর্গন্ধ। তাতে সব মানুষ! মাছের মত গিশ্ গিশ্ করছে! কেউ ভাসছে, কেউ এক কোমর, কেউ গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ ডুব দিচ্ছে, কেউ কিনারায়। স্থান নেই! তাদেরি চীৎকারে যেন হাজারটা পাটেব-কল চলছে। তাদের অবস্থা আব কষ্টের কথা বলতে পারবো না বাবু, মাপ করবেন। ৫।৬ জন চেনা লোকও দেখলুম,—উঃ ও-পাড়াব দাদাঠাকুরের কান্না দেখে কেঁদে উঠেছিলুম—তিনি চিনতে পেবে বললেন—মেঘা এলি নাকি, আহা! এই পথ দিয়ে, আহা! তা তোদেব এতটা নয় বাবা, আমি যে ব্রাহ্মণ ছিলুম। আমার কোনটারই মাপ নেই। এই দু বছর তো এসেছি, কি করেছিলুম জানিস তো সব। চৌধুবী মশাই দেশান্তবি হলেন, তারি ফল। একটু এগিয়ে—কেও দেখতে পাবি। অন্তবে আঘাত—উঃ! তোকে এখন আর বলে লাভ কি! তারপরই তাঁর—না বাবু তা মুখে আনতে পাববো না, উঃ কি কষ্ট—কি ভোগ! আর—,এই বলে মেঘনাদ তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে মাপ চাইলে। বললেন—আবও ছ মাস, তারপর আবার ফিবতে হবে।

আমি আর দেখতে পারলুম না। সঙ্গীরা বিদ্রূপ করে বললে—তুই এর চেয়েও বড় জায়গা পাবি। তারা মজা দেখে আনন্দ পায়। তাবাও আগে ভুগেছে কিনা, এখন এই কাজ নিয়েছে, যেমন জেলের কয়েদীরা কেউ কেউ খালাস পেলে জেলেই কাজ করে—জমাদাব হয়। তারাই বেশী নিষ্ঠুর হয়—কষ্ট দেয়।

সবই কষ্টেব কথা, মন্দ কথা, সে আব কি শুনবেন; আরো ঢের আছে—ঢের রকম; সে-সব আপনার শুনে কাজ নেই। আপনার সামনে বলতে পারবো না। বিশ্বাস করেন তো শুনেই হৃদকম্প হবে। সবল বিশ্বাসীদেব সংসার ছেড়ে যায়,—সে এমনি বাবু। কেবল যাতনা, কেবল কষ্ট, আর সকলেই নিজের নিজের অপরাধ নতুন লোক পেলেই চীৎকার করে বলে।

রকম-রকমের পাঁচ-থাক্ পেরিয়ে—বাড়ী ঘর দেখা দিলে,—ইট চুণের নয়, কিসের তা তখন ঠাওরায় কে। প্রকাণ্ড একটা কালো রঙের ফটক—তার মধ্যে আমাকে ঢোকালে। দুধারে বাড়ী,—অনেকটা গিয়ে—সামনেব বড় বাড়ীর ঘণ্টায় তারা ঘা দিলে। শব্দে প্রাণ চমকে উঠলো—কাঁপতে লাগলুম। তারা হেসে বললে—আর কি পৌঁছে গিছিস তো— এইবার আরাম পাবি। দেখি— দুজন ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন—আমাদের চেয়ে দেখতে কিছু বড়—একজন কালো—দেখলে ভয় হয়, একজন গৌরবর্ণ, বেশ ঠাণ্ডা মূর্ত্তি। কালো লোকটি আমার বাপের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমি কাঁপতে কাঁপতে বলতেই তিনি—'এ কি করলি' বলে সঙ্গীদের এমন ধমক দিলেন যে তার ধাক্কায় আমি পড়ে গেলুম। এ তো পে-র ছেলে নয়? কখন বেরিয়েছে?

—৯টা রাতে।

—শীগ্‌গির নে যা, —এখন ১২টা বাজে, দেহ থাকলে হয়—

ঠাণ্ডা মূর্ত্তিটি বললেন—সোজা দেব-পথে যাবি, তা না ত সময়ে পৌঁছুতে পারবিনি,—লোকটির অদেষ্ট ভাল—

—এই জানোয়ারদের দোষে, আসুক ফিরে। জান্ নিয়ে খেলা!

তারা কাঁপতে কাঁপতে বললে—ওবই সঙ্কট অবস্থা ছিল—তাই—

আবার সেই ধমক। তেষ্টায় আমায় সব শুকিয়ে গিছলো, —ভাল লোকটিব দিকে চেয়ে একটু জলের প্রার্থনা করলুম। তিনি কালোটিব দিকে চাইলেন। সঙ্গীদের ওপব হুকুম হল—দক্ষিণ খাড়ী।

তারা আমাকে নিয়ে ছুটলো, —ফটক পার হবার পরই—শিগ্‌গির জল খেয়ে নে বলে একটা খাড়ী দেখিয়ে দিলে। আমি ফিরে এসে বললুম ও যে আব কিসের মত—

—তোর আর ওর বেশী পাবাব নেই,—তেষ্টা নেই বল্। এখানে থাকলে ওই ত' খেতে হবে। আমার দেহটা কেঁপে উঠলো। ওই তো পাবি। সে দিনও আসবে, চল্ এখন—

তারপর কি সুন্দর পথ, কি উজ্জ্বল ঠাণ্ডা আলো, সেখানে বাত নেই। কি বাতাস, কি সুগন্ধ, দুধারে কি ফুল ফল, কি সব পাখী, কি পবিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব লোক। দুধারে যাকে দেখি সবার মুখেই হাসি আর আনন্দ—চিন্তার দাগ একটাও নেই। তাঁবা চাইলেই মনে হয় যেন মা-বাপের চাউনি, ভাই বোনের চাউনি। যেন ভালবাসা আব স্নেহ উপচে পড়চে। কি নদীই দেখলুম! দুধাবে চন্দনের গাছ—হাওয়ায় যেন চন্দন মাখিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। জলে কেউ স্নান করছেন, কূলে কত স্তব-পাঠ চলছে, পদ্মের বন, হাঁসের খেলা, পাখীব গান, সে কি আমি বলে উঠতে পাবি, আপনাবা দেখলে বলতে পারতেন। আমার সে তেষ্টা, জ্বালা ভয় সব জুড়িয়ে গেল। একটা কেমন আবামে-আনন্দে আমার সবটা যেন নতুন হয়ে গেল। আর ফিবতে ইচ্ছা হল না, কিন্তু থাকতে দেবে কে? বললে—তোর বড় ভাগ্যি দু'দিকে দেখে যাচ্ছিস্।

সেই আলো পার হ'তেই আমাকে এক ধাক্কায় এখানে এনে ফেললে। তখন আমাদেব উঠানে লাশ নে যাবার জন্যে সব তয়ের। চালি বাঁধা হয়ে গেছে, লোকেবা কোমব বেঁধে হাজিব; কেবল মা'র জন্যে দেরি হচ্ছিল, তিনি আমাব ওপব পড়ে চীৎকার কবছিলেন, ছাড়ছিলেন না। আমি ঘবে ঢুকতেই তারা বললে—নে—শীগ্গির দেহেব মধ্যে ঢুকে পড়্।

কোত্থেকে আমারও তখন দেহেব মোহ এসে গেল, বললুম— কি কবে ঢুকি? একজন বললে—মুখ দে ঢুকে পড়—মুখ বন্ধ থাকে ত' কান দে। আমি মুখ-দে ঢুকে পড়েই 'মা' ব'লে ডাকলুম।

তারপর যা হয়, সকলে ঘবে ঢুকলো, কেউ ভয় পেলে। কথা কইলুম, তবু বিশ্বাস হ'তে আধ ঘন্টা সময় লেগেছিল। ইন্দির, ভুলু গোপাল, প্রেমচাঁদ, এই সব বড় বড় মোড়ল মালার মত দেওয়ায়, তবে আমার বাঁচা ঠিক হয় বাবু। এত সহজে হ'ত না, যদি না আধঘন্টা পরেই প্রেমচাঁদেব বাড়ী জোর কান্না উঠতো; পঞ্চায়েৎ সেই দিকেই সব ছুটলো। গিয়ে দেখে প্রেমচাঁদেব ছেলে, মদ খেয়ে এসে দাওয়ায় শুয়েছিল, হঠাৎ বুকে ব্যথা ধ'রে সেইমাত্র মোলো, —তার নামও ছিল—মেঘনাদ!

চাটুয্যে মশাই অসীম বিস্ময়ে বলে উঠলেন,—অ্যাঁ—সেই রাত্রেই!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আধঘন্টার মধ্যেই—

গুপী দত্ত রুষ্ট হ'য়ে তাড়নাস্বরে চাটুয্যে মশাইকে বলে উঠলো—আমি কি তোমার চাকর যে সেই পর্য্যন্ত ব'কে যাচ্ছি, আর তুমি শুনচো মালার মুখে ঐ গাঁজাখুরি গল্প।

একে ত গুপী দত্তের ওপর ঘৃণায় রাগে, আমাকে আগে থেকেই বিষাক্ত করে রেখেছিল, তায় মেঘনাদের উপর তার ঐরূপ ইতর ইঙ্গিতে, আমাকে জ্বালিয়ে দিলে। মেঘনাদ সেটা বুঝতে পেরে, আমার পা' দুটো চেপে ধ'রে নিম্নস্বরে বললে—আমাকে মাপ করুন বাবু, উনি আমার নৌকায় এসেছেন।

আমি তার কথাটা বুঝে আর তার কাতর ভাব দেখে, অতি কষ্টে সামলে উঠেই বললুম—হ্যাঁ, তারপর?

—তারপব সেরে উঠলুম। কিন্তু আগের মেঘনাদ্ আব রইল না। যেন বোবা হ'য়ে গেলুম। মা অনেক করে চারটি খাওয়াতেন। ঘাটের ওপবেই ঘর, ঘাটেই বসে দিন-রাত কাটাতো, রাতে নৌকোতেই পড়ে থাক্‌তুম। সকলে 'জড়ভরত' বলতে সুরু করেছিল।

যাবার সময় যা দেখেছিলুম, তা তো আব আপনাকে সব খুঁটিযে বলতে পারিনি, সেই সব চোখেব সামনে থাকতে আর কি বাবু কথা কইতে পারি, না কাজকর্ম্ম করতে পারি। ভয হ'ত যদি মিথ্যে বেরিয়ে যায়, কি কারুব প্রাণে বাজে! তিন কোশেব মধ্যে সংকীর্তন কি কথা হচ্ছে শুনতে পেলেই যেতুম। লুকিয়ে গুরু কবলুম, কণ্ঠি নিলুম। তখন সকলে জোব করে বে দিলে। এত পায়ে ধবলুম—কত কাঁদলুম, কেউ শুনলে না। তাবপব সংসার ঘাড়ে পড়লো। তখন থেকে আপনাদের কাজ নিয়ে, আপনাদেব চরণে পড়ে আছি। যতটুকু পারি কবতে চেষ্টা পাই। ভগবানকে কেবল জানাই—কারুর প্রাণে যেন আঘাত না দিয়ে ফেলি। ওইটিই সর্ব্বনেশে জিনিস বাবু।

আমি মুখ্‌খু ছোটলোক, কিছুই জানি না, আপনাদেব চবণে থাকাব জন্যে এত কথা কইতে পাবলুম। সব সত্যি বলে জানবেন বাবু—এই চোখে দেখা। তাবপব কি আব বাবু লোক মন্দ কাজ কবতে পাবে। কিন্তু পাবলুম কই—কত হয়ে যাচ্ছে—হবে। এই বলে মেঘনাদ বিমর্ষ মুখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। পবে বললে—আহা দাওযানজি-বাড়ীব সেই বুড়ো ঠাকুবদা মশাইকে মনে পড়ে বাবু, —এখানেও যেমন সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, সেখানেও তেমনি দেখলুম। এই নদীব ধাবে একটা কাঞ্চন গাছেব তলায স্ত্রী-পুরুষে বসে জপ কবছেন—এক গাছ ফুলেব নীচে যেন দেবদেবী দেখলুম, সেই হাসি! বললেন—

আর বলা হল না, এই সময পেরো-বাবুবা সব এসে গেলেন। মেঘনাদ নৌকা খুললে খাল পেবিয়ে গঙ্গায় পড়তেই বড়বাজারেব গোল-গজাব ঠোঙাটা টেনে নিয়ে গুপী দত্ত একমুঠো মুখে ফেলে দিয়ে ঠোঙাটা এগিয়ে ধবে চাটুয্যে মহাশযকে বললে—খাও না। তিনি অন্যমনস্কে বললেন— হুঁ।

—হুঁ কি? —আমি ধবে থাকবো নাকি—নাও ধব—এই বলে আর এক মুঠো তুলে গালে দিয়ে, ঠোঙাটা চাটুয্যে মশাযেব শিথিল-হস্তে ঠেকিয়ে ছেড়ে দিতেই তিনি ধবতে না ধবতেই সেটা গঙ্গাব জলে পড়ে গেল। দু'তিন জন আহা—আহা কবে উঠতেই, দত্ত বলে উঠলো—অদেষ্টে থাকলে তো, —ভেতব থেকে কে একজন বললেন—তা বটে—প্রসাদটা—

মেঘনাদ অবস্থাটা বুঝতে পেবে আর তাব শেষটা ভেবে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে—দু তিনটে জোর ঝিঁকি মেবে নৌকা ঘাটে ভিড়িয়ে দিলে।

চাটুয্যে মশাই বহুক্ষণ থেকেই অন্যমনস্ক ছিলেন, তাঁর মন বোধ হয মেঘনাদের সেই কাহিনীর মধ্যে ঘুবছিল। এ সব কথায তাঁর কানই ছিল না। নৌকা জোবে ডাঙায় লাগতে তাঁর হুঁস হল। দত্ত 'এস' বলায় তিনি বললেন—আমার একটু দেরি আছে। আটটার মধ্যে কিন্তু আসা চাই—উমেশ আমার চাকর নয়,—বসে থাকবে না। বলে দত্ত এগিয়ে পড়লো।—চাটুয্যে মশাই বিমর্ষভাবে কেবল বললেন—দেখি। ঘাটে ওঠবার সময় দত্ত আপনা আপনি বলতে বলতে চললো—টাকা দুটো আগে দিয়ে কি কু-কাজই করেছি,—সঙ্গ দোষে আমারও বামুনে বুদ্ধি দাঁড়াচ্ছে দেখছি।

সকলে চলে গেল, আমি শেষে ছিলুম, ঝপ ক'রে একটা শব্দ হওয়ায় ফিরে দেখি—চাটুয্যে মশাই জামা, চটি, চাদর সব সুদ্ধ গঙ্গায় ডুব দিলেন। এক ধারে দাঁড়ালুম। দেখি—মেঘনাদকে বলছেন—মেঘনাদ, বাবা এখন আমি ব্রাহ্মণ, মা গঙ্গার কোলে তুমি আমি দু' জনেই, বাবা ঠিক

বলিস—নির্ম্মলকে যা বলছিলি তা সব সত্যি কথা?

মেঘনাদ হাত জোড় করে বললে—কমই বলেছি ঠাকুর মশাই, সব কি আমি বলতে পারি, তবে যা বলেছি—তা আমার নিজের চোখে দেখা, তার একটুও আমার কাছে মিথ্যে নয়।

—হয়েছে বাবা, বলে ওঠবার আগে, ট্যাক থেকে টাকা দুটো বার করে, গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে, আবার হাত গুটিয়ে ঘাটে উঠতে লাগলেন।

ঘাটে একটি অসহায় গরীব রোগী থাকতো— তার হাতে টাকা দুটি দিয়ে মুক্ত পুরুষের মত দ্রুত স্বচ্ছন্দ গতিতে বাড়ী চললেন।

৬

পরে শুনেছি— *

—চাটুয্যে মশাই শুনেই বেরিয়েছিলেন—রাত্রের কোন উপায় নেই। বাড়ী ঢোকবার আগে সে কথাটা বোধ হয় স্মরণ হওয়ায়, মাথাটা সজোরে নেড়ে বলে উঠলেন—তা হোক্—ব্রাহ্মণদের নারায়ণ আছেন, ভিক্ষা আছে, উপবাস আছে, না হয় মৃত্যু ত আছে,—তা বলে—উঃ, নারায়ণ রক্ষা করছেন—

দালানে পা দিয়েই দেখেন—কা'রা বোশেখ-চাঁপাব বৈকালী পাঠিয়েছে। বিবিধ ফল মূল মিষ্টান্ন —দালানে ধরে না। ছেলেটি আনন্দে হাসিমুখে খবর দিতে ছুটে আসছে। 'হা ভগবান আমি পেটের জন্যে কি করছিলুম' বলেই তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ছেলেটি হক্‌চকিয়ে বাবার কাপড় টেনে বারবার বলতে লাগলো—বাবা তুমি কেঁদ না, দেখ না—তুমি, আমাদের কত খাবার।

ব্রাহ্মণী অন্যত্রে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ছেলেকে কোলে করে ঘরে ঢুকতেই, মাথার কাপড় টেনে ব্রাহ্মণী বলে উঠলেন—ওগো তুমি এ কি করলে, বামন হয়ে দেবতা চিনলে না, —মাধবকে মেরে ফেললে। সে যে আমাদের দুঃখু দেখে আজ তিন বছর দু'বেলা দুধ খাইয়ে মন্টুকে বাঁচিয়ে রেখেছে, বাছা এ-বেলাও যে দুধ পাঠিয়েছে।—নারায়ণ আমার পেরমাই নিয়ে তাকে রক্ষা কর, আমাদের এমন করে মের না ঠাকুর; এই বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

চাটুয্যে মশাই সহসা এই আঘাতে কাঠ হযে গেলেন। অপরাধীব মত জড়িত-কণ্ঠে বললেন— মাধবের অসুখ—সে বাঁচবে না? কে বললে—না—না বলতে বলতে ছেলেকে কোল থেকে নাবিযে দিয়ে 'আমি আসছি' বলেই তিনি বেরিয়ে পড়েন।

* * *

আমি ঘাট থেকে সোজা মাধবের বাড়ী ছুটেছিলুম;—পাড়ায় ঢুকতেই দ্বিধায় বুকটা সহসা বিষম দুলে উঠলো। সামনের সব জিনিস—ঘর-বাড়ী গাছ-পালা আকাশ বাতাস সব যেন থমথমে, নিষ্প্রভ, ঠিক গেরোণ লাগার অবস্থা। দুটি ছেলে ছুটে এসে বললে—শীগ্‌গির আসুন, হরিবিহারীদা

* চাটুয্যে মশায়ের বড় বউঠাকরুণ সেকেলে মাটির মানুষ। সংসার ভিন্ন হয়ে গেলেও নিত্য খোঁজ খবর নিতেন—যতটুকু সম্ভব সাহায্যও করতেন। তিনি জেনেছিলেন—সেদিন রাত্রের কোন ব্যবস্থাই নেই। তাই আঁচল ঢাকা দিয়ে এক সরা মুড়ি ও গোটা ছয়েক নারকেল নাড়ু নিয়ে আসছিলেন। চাটুয্যে মশাইকে বাড়ীর পথে দেখে—পেছিয়ে গা ঢাকা হয়ে দাঁড়ান। ছোট দেবরের কাছে লজ্জার কোনই কারণ ছিল না; কিন্তু দুঃখের অবস্থায় সাহায্য হিসাবে কিছু দিতে যাবারও মস্ত বড় একটা সঙ্কোচ আছে। তাই তিনি তাঁর পেছনে পেছনে বাড়ী ঢোকেন, এবং অন্তরালেই ছোট জা'র জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। পরদিন তিনিই কাঁদতে কাঁদতে এই সব কথা বলেন।

আপনাকে এগিয়ে দেখতে বললেন, কাকা আপনাকে কেবল খুঁজচেন।

বাড়ীর মধ্যে তখন যে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের অপসানির হাহাকার উঠছে, সে সব আমার কানে যায়নি; আমি যেন যন্ত্রের মত হয়ে গেলাম—এক দৌড়ে একেবারে উঠানে উপস্থিত।

সেইখানে তুলসীতলায় শুয়ে মাধব তখন প্রাণটা নিবেদন করছে।

হরিবিহারী চেঁচিয়ে বললে—মাধব, তোমার দাদাবাবু এসেছেন। তখনো সে ছিল—বোধ হয় আমার অপেক্ষায়। ধীরে ধীরে চাইলে। মুখখানা তার হাসি-মাখা হয়ে গেল। মুখের কাছে বসে বললুম—নিশ্চিন্ত হও ভাই, ভগবান তোমার সব ভার আমাদের দিলেন, গৌরীর বে আমার। মাধব আমার চোখে চোখ রেখে চলে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে 'সর—সর, মাধব—মাধব যাসনি বাবা,—শুনে যা—' বলতে বলতে ভিড় ঠেলে ঝড়ের মত চাটুয্যে মশাই এসে পড়লেন।

মাধবকে দেখতে পেয়ে—'অ্যাঁ, —না, শুনতে হবে বাবা' বলেই হাঁটু গেড়ে বসে তার কানে মুখ দিয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলেন—অভাবে স্বভাব নষ্ট হচ্ছিল বাবা, নারায়ণ হতে দেননি—আমি সে ব্রাহ্মণই আছি। বিশ্বাস কব বাবা—আমি ও কাজ হতে দেবো না মাধব—প্রাণ থাকতে না । সংসার দেখার ভার আমার। আমি ভিক্ষা কবে পালবো,—যতদিন থাকবো—এই তোর দাওযায় এসে পড়ে থাকবো। সকলের দিকে চেয়ে প্রফুল্ল মুখে মাথা নেড়ে বললেন—শুনেছে! বল হরি—হরি বোল! চল—

* * *

পাগলের মত হয়ে গেলেও তিনি তাঁর কথা বারবার রক্ষা করে গেছেন, আমরা কিছুতেই তাঁকে নিরস্ত করতে পারিনি।

গৌরীর মা কিছু রেখে, বাকি সমস্তই গোপনে তাঁর বাড়ী দিযে আসতো।

শুনলুম—গুপী দত্ত উমেশ উকিলের কাছে বলেছে—বেটা বেইমান বামুন—শিন্নিও খেলে ভরাও ডোবালে— এই ছ মাসের মধ্যে খুব কম হবে তো ১২।১৩ টাকা খাইয়েছি হে!

* * *

ডিপুটি বাবু নির্ব্বাক হয়ে শুনছিলেন। আমার বলা শেষ হলে দু-তিন মিনিট মাটির দিকে পলকহীন চেয়ে থেকে, রুমালখানা বার করে মুখটা মুছলেন। তাবপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, লাঠিগাছটি নিয়ে ধীরে ধীরে অন্যমনস্কের মত বেরিয়ে গেলেন, একটি কথাও কইলেন না। আমারো কোন কথা এল না,— আস্তে আস্তে উঠে তামাক সাজতে বসলুম।

সহসা ক্ষেত্তর নাপিতের গলা শুনতে পেয়ে চেয়ে দেখি—ডিপুটিবাবু গলিটার মোড়ে দাঁড়িয়ে একাগ্র হয়ে শুনছেন। সে গাইছিল।

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব জমিন্ রইল পড়ি,—
আবাদ কবলে ফলতো সোনা।"

উত্তরা

র হ মা ন

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রথমে তাহার নাম ছিল 'দেল্‌জান্‌', পরে সকলে তাহাকে রহমান বলিত। প্রথমে তাব রুটিব দোকান ছিল, পরে সেটা পানের দোকানে পরিণত হইল। বহুদূর হইতে দেল্‌জানের হাতের রুটি কিনিতে লোকে আসিত। এমন রুটি মোগল বাদশাহের আমলেও কেউ খাইয়াছিল কিনা সন্দেহ। দোকান এখন শ্রীহীন। রুটির পরিবর্ত্তে পানের আস্‌বাব। সরবত্‌ তাহার পার্শ্বে।

দিবা দ্বিপ্রহর। প্রায় এক মাস ধরিয়া দিল্লীনগরে 'লু' চলিতেছিল, আজ অনেকটা শান্ত। একজন পথিক ছাতা মাথায় দিয়া ক্যান্‌ভাসের ব্যাগ-হস্তে দোকানের সম্মুখে কিয়ৎক্ষণ পায়চারি করিল। পরে রহমানের নিকট গিয়া বলিল, "বন্দিগি খাঁ সাহেব। আমাকে মনে পড়ে কি?"

রহমানের স্মৃতিশক্তির সুব্যবহার অনেক দিন হইতে বন্ধ। যখন রুটির দোকান ছিল, তখন তাহার মানস-পটে পুরাতন ও নূতন চিত্রগুলি মধ্যে মধ্যে উদয় হইত। সেকালে সুখ ও দুঃখ নামক দুইটি পদার্থের স্বতন্ত্র অনুভূতি তাহার ছিল। এখন সেই পট এবং সুখ, ও দুঃখ, অনৈতিহাসিক যুগের ইতিহাসের মত কোথায় পড়িয়া আছে, তাহার খবর সে রাখে না। রহমান প্রতিনমস্কারপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম কি 'সুদেল্‌ বাবু'?"

পথিক। "আবার মনে করুন।"

রহমান। "তবে বোধ হয় 'জানকীবাবু'।"

পথিক। "এইবার ঠিক। আমারই নাম সেই। জানকীবাবু—ইতিহাসের অধ্যাপক। আমি আপনাব রুটি খুব পছন্দ করিতাম, কিন্তু দুইমাস আসি নাই, কই রুটিব টুকরি ত আব দেখ্‌ছি না।"

রহমান। "আপনি ত ইতিহাসের ওস্তাদ, এ-সম্বন্ধে আমাকে তালিম দিতে পাবেন? রুটি চিবকাল থাকিবে, এমন কোনো কথা আছে কি? রুটি যে তৈয়াবি করিত সে যেখানে গিয়াছে রুটিও সেখানে—"

পথিক। "কে সে?"

রহমান। "দেল্‌জান্‌।"

পথিক। "আপনিই ত দেল্‌জান?"

রহমান। "দেল্‌জান্‌ স্ত্রীলোক। আমি পুরুষ—মৌলবি রহমান খাঁ। ইচ্ছা ছিল 'দেল্‌জান্‌ ও রহমান মিলিয়া একটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইবে'। এখন আমি একাকী। রহমান—উল-রহমান। আপনি এক পেয়ালা সরবত্‌ খাইয়া ইতিহাস ব্যাখ্যা করুন। আমি পান তৈয়ারি করি।"

একজন টোঙ্গা হাঁকাইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইল।

রহমান। "কি ইয়ার? তুমি এখনও টোঙ্গা চালাও?"

টোঙ্গাওয়ালা। "এক পেয়ালা সরবত্‌ হবে কি?"

রহমান। "নিশ্চয়, তার সঙ্গে পান ও জরদা।"

টোঙ্গাওয়ালা অশ্বের রাস্‌ দোকানের খুঁটাতে বাঁধিয়া বসিয়া পড়িল। ক্রমে সরবত্‌ ও পানে তাজা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দুনিয়াদারির খবর কি?"

রহমান। "ইয়ার! দুনিয়া কি বস্তু তাহার কিনারা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। দুনিয়া চলে, তাহার পিঠে আমরাও চলি। তবে এটা ঠিক যে, কোথায় যায় তাহা কেহই জানে না। শুনিতে পাই, দুনিয়া ও জীব, উভয়েই খোদার দিকে চলে।"

টোঙ্গাওয়ালা। "একদিন একজন বাঙালী বাবু আমার টোঙ্গাতে সওয়ার হইয়া তাহারই উপব

চলিতে সুরু কবিলেন। আমি বলিলাম, 'বাবু সাহেব, এটা অসম্ভব, কেননা টোঙ্গা ছোট, স্থিব হইয়া না বসিলে আপনি পড়িয়া যাইবেন।' তিনি বলিলেন, 'এক জাযগায বসিযা থাকা সম্পূর্ণ অধীনতা, এই জন্য ইতিহাস ক্রমে চলিতে থাকে।"

(গৃহাভ্যন্তব হইতে নিদ্রাতুব জানকীবাবু)। "ওহো! তুমি সেই টোঙ্গাওয়ালা?"

টোঙ্গাওযালা। (উঁকি মাবিযা) "সেলাম-আলেগম্! সাহেব! আজ কাহাব টোঙ্গাতে তস্‌বিফ আনিযাছেন?"

জানকী। "পদব্রজে। যখন যাব যেমন অবস্থা, সেই বকম তাব মতিগতি। দিল্লীব বাদশাহ্ হুমাযুন ও ইন্দ্রপ্রস্থেব বাজা যুধিষ্ঠিব উভযেই এক পথেব পথিক। অথচ ইতিহাস বলে যে, হুমাযুনেব বংশ ভাবতবর্ষে থাকিযা গেল, যুধিষ্ঠিবেব বংশ স্বর্গেব পথেই লোপ পাইযাছিল।"

বহমান। "বিহিস্তেব কোনো তওযাবীখ্ নাই?"

জানকী। "স্বর্গেব ইতিহাস ও ভূগোল কিছুই নাই। আমি একখানা বহি এসম্বন্ধে শীঘ্রই বাহিব কবিব।"

বহমান। "তাহাতে বুঝাইযা দিবেন যে, দেল্‌জান্ যদি বহমানকে ছাড়িযা যায, তবে সেটা দেল্‌জানেব দোষ, না, বহমানেব দোষ।"

সময নষ্ট হয দেখিযা টোঙ্গাওযালা উঠিতেছিল, কিন্তু পবিশ্রান্ত ঘোড়া তাহাব ঐতিহাসিক বিশ্রামেব দাবীস্বরূপ চক্ষুর্দ্বয নিমীলিত কবিযা দাঁড়াইযা বহিল।

টোঙ্গাব পার্শ্বে একটু ছাযা দেখিযা একজন বানবওযালা তাহাব লাল গোদা বানব ও ছাগল লইযা বসিযা গিযাছিল। অবসব পাইযা বানবটা ছাগলেব স্কন্ধ বাহিযা টোঙ্গাব উপব উঠিল ও টোঙ্গা হইতে অশ্বেব পৃষ্ঠে আবোহণ কবিল। ঘোড়া তাহাতেও ভ্রূক্ষেপও কবিল না।

টোঙ্গাওযালা। "কি বেযাদব!"

জানকী। "বানব বেযাদব, না, তোমাব ঘোড়া শান্ত?"

বহমান। "আপনাব ইতিহাস কি বলেন?"

জানকী। "ইতিহাসেব এ সম্বন্ধে একবাক্য। শান্ত বিশ্রামশীল জীব দেখিলেই, অশান্ত ও উপদ্রবশীল জীব তাহাব স্কন্ধে চড়ে। ইহাতে তাহাকে বেযাদব বলা অন্যায। ইহা স্বাভাবিক আদব-কাযদা।"

টোঙ্গাওযালা। (বানবওযালাব প্রতি) " তোমাব বানবকে একবাব নাচিযে দেও ইযাব।"

কথাটা বুঝিতে পাবিযা বানব নিজেই টোঙ্গা হইতে উত্তীর্ণ হইযা তাহাব পোষাক-পবিচ্ছদেব ঝুলিব দিকে দৃষ্টিপাত কবিল।

বানবওযালা। "মদাবি! তৈযাব হও।"

মদাবি (Mandann শব্দেব অপভ্রংশ) প্রভুব ঝুলি হইতে তাহাব সবঞ্জাম বাহিব কবিল। একটু ভিনোলিযা সোপ দিযা মুখ ধুইযা ফেলিল। একটা ভাঙা দর্পণেব সাহায্যে তাহাব দ্বিখণ্ডিত মুখ ও সম্পূর্ণ মুখ পুনঃ পুনঃ চক্ষু উল্টাইযা দেখিল। একখানা চিরুণী দিযা সম্মুখেব মাথাব লোমগুলি যথাসম্ভব ঝাড়িযা, তাহাব মধ্যে যে-কটা উকুণ ছিল তাহা গলাধঃকবণ কবিল। অতঃপব জাঙ্গিযা, লালটুপি ও ওযেস্টকোট সাবধানে পবিধান কবিল, একটা টিনেব ক্ষুদ্র তলোযাব দক্ষিণ দিকে ঝুলাইযা, ইতস্ততঃ তাকাইযা বোধ হয আহার্য্যেব জন্য অপেক্ষা কবিতে লাগিল।

বহমান। "জানকীবাবু! এ-সম্বন্ধে ইতিহাস কি বলেন?"

জানকী। "যতই সভ্য হউক না কেন, পুবাতন অভ্যাস ছাড়া বড় শক্ত।"

বানবওযালা ডুগডুগি-ধ্বনিসহকাবে—"মদাবি মিযা, একবাব পিযা অন্বেষণে বিদেশে যাও।"

বানব বুকে চপেটাঘাত কবিযা জানাইল যে, প্রিযাব বিবহে তাহাব বুক ভাঙিযা গিযাছে। ছাগল,

তাহার সময় হইয়াছে দেখিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিল যে, ভগবান্ সর্ব্বজীবের উপর দয়া করেন।

রহমান অশ্রুসিক্ত নয়নে তাহার ভাব গ্রহণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিল, "হা, দেল্জান্। তোর মনে কি—ইহাই ছিল?"

বানরওয়ালা। "মদারি মিয়া! একবার ছাগলের পিঠে ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ কর। পূজা মানাও। আমি একবার সারঙ্গি বাজাই।"

সারঙ্গি সহযোগে বানরওয়ালা গাইল—ভীমপলশ্রী রাগিণীতে।—

'পিয়ার বিরহে আমি দেওয়ানা'—ইত্যাদি।

বিরহ ঘনীভূত হওয়াতে টিনের তরোয়ালখানা গলায় বসাইয়া আত্মহত্যার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে, প্রভু সেখানা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "বৎস মদারি। আত্মহত্যা করিও না। অনেক প্রিয়া পাইবে, প্রিয়ার দল আসে যায়।"

রহমান। "আমি এ কথা মানি না। ভালবাসা একবারই হয়, গেলে আর আসে না।"

বানরওয়ালা। "বানর ও মানুষে অনেক তফাৎ হয় হুজুর। মানুষের প্রেম পর্দ্দানশীন। বানর গাছে গাছে বেড়ায়, যাহাকে যখন খুসি অবসর মত ভালবাসিতে পারে।"

টোঙ্গাওয়ালা। "আমি অনেকবার প্রেমে পড়িবার মত হয়েছিলাম, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম যে, প্রেম যদি চলে, তবে টোঙ্গা চালান দুষ্কর হইয়া পড়িবে এবং টোঙ্গা যদি না চলে, তবে দিনই চলিবে না।"

বানরওয়ালা। "মদারি! বিবাহ করিলে প্রেমিকের কি রকম অবস্থা হয় একবার দেখাইয়া দাও ত বেটা।"

বানর এক লম্ফে ছাগলের পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া টোঙ্গার নীচে কাঁটা ও চামচ লইয়া চলিয়া গেল এবং সেখানে গিয়া দেখাইল কি করিয়া স্বামী হোটেলে পয়সা খরচ করিয়া খায়, এবং অবশেষে মদিরা পান করিয়া খানায় পড়িয়া যায়।

বানরওয়ালা। "যদি বিবাহ না করে তবে কি রকম অবস্থা হয় বেটা?"

বানর সেখানে চিৎপাৎ হইয়া পড়িয়া গেল ও হাত পা ছুঁড়িয়া আকাশের দিকে তাকাইতে লাগিল।

টোঙ্গাওয়ালা। "অনেকটা বটে।"

রহমান। "হা দেল্জান্! তোর মনে কি এই ছিল?"

জানকী। "খাঁ সাহেব! আর দুঃখ করিবেন না। আপনার দুঃখ আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আজ এইখানে আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করুন। যত খরচ লাগে আমি দিব।"

'বিবাহ করাটা দিল্লীর লাড্ডু। যে খায় সেও পস্তায়, যে না খায় সেও পস্তায়।' এই পুরাতন কথা উচ্চারণ করিয়া ইতিহাসের অধ্যাপক জানকীবাবু রহমান মিয়ার দোকানটা বানরওয়ালা ও টোঙ্গাওয়ালার সাহায্যে সংস্কার এবং পরিষ্কার করিতে বসিয়া গেলেন।

তখন সন্ধ্যা সমাগত। দিল্লী নগরের আকাশে পূর্ণিমার চন্দ্রোদয় হইয়াছে। সরবত্ ও গোলাপের ছড়াছড়ি। দোকানে পেস্তা ও বাদামের বর্ফি, ক্ষীরের লাড়ু ও ডালমুট্ ঘিয়ে ভাজা। হোটেলে চপ্, কট্‌লেট্, চা। দলে দলে দেশী বিদেশী লোক জমায়েত হইয়া স্থানে স্থানে বসিয়া গিয়াছে ও যাহার যতদূর বিদ্যা—তাহা প্রকাশ করিতেছে।

কিন্তু এ-সব দিকে রহমান মিয়ার লক্ষ্য ছিল না। রহমান কেবল দেল্জানের কথা ভাবিতেছিল। দিল্লীর আনন্দ তাহার পক্ষে বিষতুল্য। দেল্জান্ই তার আনন্দের কাঠি।

কতই স্ত্রীলোক চলিয়া গেল সেই পথ দিয়া, কেহই তাহার দেল্জান্ নহে।

রহমানের অবস্থা দেখিয়া টোঙ্গাওয়ালা বলিল, "খাঁ সাহেব, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আমার টোঙ্গায় একটু ঘুরিয়া আসিতে পারেন।"

রহমান। "যদি তাই হয়, তবে আমি নিজেই ঘোড়া চালাইব, আমার সঙ্গে কেহ যাবে না।"

টোঙ্গাওয়ালা। "কোন আপত্তি নেই। খুব ঠাণ্ডা ঘোড়া।"

রহমান অতিথিগণের বসিবার বন্দোবস্ত করিয়া টোঙ্গা আরোহণে দিল্লীর এক নির্জ্জন প্রান্তে চলিয়া গেল।

সে স্থান সমাধিভূমি। দিল্লী নগরের অনেক আমীর ওমরাও ও বেগমের দেহ এককালে সেখানে ধূলার সঙ্গে মিশিয়াছিল। খাঁ সাহেব সেখানে নেমাজ পাঠ করিয়া চিন্তামগ্ন হইল। অশ্ব সবুজ ঘাস পাইয়া চরিতে বসিল।

রহমানের মন পরলোকের দিকে ঝুঁকিয়াছিল। পরলোকের কথা কে জানে? কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে? এই গোরস্থানের নিকটে পরলোকবিদ্ মহাপুরুষ কি কেহ আসেন না? ব্যাকুল হইলে কি ভগবান্ পরলোকেব সন্ধান বলিয়া দেন না?

এইসব কথা ভাবিতে ভাবিতে বহমান্ খাঁ একটা কবর হইতে অন্য কবর ক্রমশঃ যাতায়াত করিতে লাগিল।

অশ্ব মনেব সুখে রসাল ঘাস চর্ব্বণ করিতেছিল। এইবকম প্রায় এক ঘন্টা কাটিয়া গেল, যখন পূর্ণিমার চন্দ্র বৃহৎ বটবৃক্ষের শীর্ষ পাব হইতেছিল—তখন রহমান দেখিল যে, একটি ভগ্ন সমাধিস্তূপের পার্শ্বে দুইটি স্ত্রীলোক বসিয়া।

তাব মধ্যে একটি বৃদ্ধা ও অন্যটি অল্পবয়স্কা। অল্পবয়স্কা ছিন্নবস্ত্রপরিধৃতা, অবগুণ্ঠনাবৃতা। সে বৃদ্ধাব কন্যা। বৃদ্ধা তাহা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আর কতক্ষণ গোবস্থানে কাটাইবি মা?"

কন্যা। "আম্মাজান! যখন এই রাস্তা হইয়া যাইতে হইবে, তখন কালের বিচাব কেন?"

মাতা। "চল্, একবার তোকে দিল্লী লইয়া যাই। হয়ত তার অনুতাপ হইয়াছে নিশ্চয়।"

কন্যা। (জিহ্বা কাটিয়া) "তা কখন হইতে পারে না মা। যে বলিতে পারে, 'তুমি বাটি হইতে দূব হও', সে নিবাসে আমি কেমন করিয়া আবার যাইব মা? যখন সেখানে স্থান নাই তখন দুনিয়াতে আমার স্থান নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম একদিন যে তার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিলাম, সে অন্ধবিশ্বাস আমাব গিয়াছে।"

মা। "তাকে ছাড়িয়া যাইতে মায়া হইবে না?"

কন্যা। "তা হবে না, কেননা আমি তাকে অন্তরে লইয়া যাইব। কিন্তু একটি ঋণ আছে মা। আমাকে সে তিন বৎসর ভরণ-পোষণ করিয়াছিল, আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতে পারি নাই।"

মাতা। "আমার গহনা আছে, তাহা বেচিয়া শোধ করিয়া দিব। এই যে কবব দেখিতেছ, এটা তোমাব মাতামহের।"

কন্যা। "তিনি কে ছিলেন?"

মাতা। "দিল্লীর প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তিনি দিল্লীর ভবিষ্যৎ এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ছন্দে গাহিয়া গিয়াছেন।"

কন্যা কবর উদ্দেশ্য করিয়া অভিবাদন করিল।

*　　　*　　　*

সমাধির আড়াল হইতে রহমান ডাকিল, 'দেল্‌জান্'!

*　　　*　　　*

মাতা ও কন্যা উভয়ে ভীত হইয়া দেখিল যে, একজন পুরুষ মূর্চ্ছিতাবস্থায়।

মাতা। "তুমি ওর মাথায় অঞ্চল দিয়া বাতাস কর। আমি জল আনি।"

দেল্‌জানের অঞ্চলের বাতাস ও তাহার হৃদয়োত্থিত দীর্ঘনিশ্বাস রহমানের পার্থিব চৈতন্য পুনঃসঞ্চারিত করিয়াছিল।

রহমান। "জীবনসর্ব্বস্ব, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

*　　*　　*

অশ্বপ্রবর আরোহীর দেখিয়া প্রথম প্রহরের সুনিদ্রার উদ্রেকে যত্নবান হইয়াছিল। রহমান তাহার স্ত্রী দেল্‌জান্ ও দেল্‌জানের মাতাকে লইয়া দোকানের দিকে টোঙ্গা চালাইয়া দিল।

দোকানে যাহারা প্রতীক্ষা করিতেছিল তাহারা সকলেই অবাক্! দিল্লী সহরের মিষ্টান্ন, চপ ও কট্‌লেটের একত্রিত টুকরিগুলি হাতে করিয়া রহমান কি সত্যই সস্ত্রীক উপস্থিত?

ঠিক তাই। রহমান বলিল, "পিয়া ঘরে এসেছে, তোমরা ভূপালি রাগিণীতে মঙ্গল-গান গাও।"

বানরওয়ালা সারঙ্গি বাঁধিয়া বানরকে বলিল, "মদারি, তোর শুভদিন। অন্ততঃ দশ টাকা তোর অদৃষ্টে নৃত্যশীল।"

টোঙ্গাওয়ালা ঘোড়ার পৃষ্ঠ ঠুকিয়া বলিল, "সাবাস টাট্টু ঘোড়া। তোর প্রপিতামহের প্রপিতামহ দিল্লীর শেষ বাদশা মহম্মদ শাহের আস্তাবলে পেন্সনভোগী ছিল, আজ কর্ম্মস্থলে তোর বংশের পরিচয় পাওয়া গেল! অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকা তোর প্রাপ্য।"

রহমান। (সাহ্লাদে) "আলবৎ।"

অধ্যাপক জানকীবাবু। "দেখ ভাই রহমান, আমি তোমার মেহ্‌মান্, এখন বুঝিতে পারিলাম যে, তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী দেল্‌জান্‌ই পূর্ব্বে রুটি তৈয়ারি করিতেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তোমরা দেল্‌জান্-রহমান কোম্পানী হইয়া রুটির জোরে পয়সা রোজগার কর।"

রহমান। "আমার সেলাম লইবেন জানকী বাবু। দেল্‌জান্ আপনাকে দেখিয়াই রুটি তৈয়ারি করিতে বসিয়াছে।"

জানকী। "কি শুভ কথা। কি আনন্দের কথা!"

দস্তরখাঁ পাত'। ভাই ভাই মিলিয়া বসিয়া খাও। কোথাকার ধনদৌলত? কাহার রুটি কে খায়? দেল্‌জান্! একবার চাহিয়া দেখ। তুমি তোমার প্রিয়তমের ঘরে ফিরিয়াছ, আমাদের আজ কত আনন্দ!

মদারি। তুমি ছাগলের সঙ্গে বসিয়া খাও, ঘোড়াকে খাওয়াও! হে টোঙ্গাওয়ালে! মনের মত প্রিয়া খুঁজিয়া দেখ।

উত্তরা' ঃ বৈশাখ ১৩৩৩

সরস্বতী

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আষাঢ়ের প্রবল বর্ষণে আফিসের ফের্‌তা ঘরমুখো হরিবাবু বড়ো ফাঁপরে পড়িলেন। প্রায় বারো আনা রকম পাড়ি জমাইয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ছাতায় মাথা আট্‌কান যায় না; আজকালকার কালে ভগবানের গড়া মাথা অপেক্ষা চর্মকারের গড়া জুতার দরদই বেশি, কেননা মাথা ভিজিলে সহজে মুছিয়া শুকাইয়া লওয়া যায়, কিন্তু জুতা ভিজিলে ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া পড়ে। অথচ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জামাকাপড়ের বেলায় যা কিছু বাহুল্য থাকুক,

জুতার বেলায় এক প্রস্থব বেশি আর দুই প্রস্থ কপালে জোটে না। জুতা হাতে কবাটাও হালফ্যাশানের ভদ্রলোকের পক্ষে কেমন বেয়াড়া দেখায়। এই জুতা-সমস্যায় পড়িয়া অগত্যা হরিবাবু একটি বাড়িব দরজা খোলা দেখিয়া অসংকোচে দরজার ভিতর গিয়া দাঁড়াইলেন। নীচে লোকজনের সমাগম নাই, কিন্তু উপরেব বাবান্দা হইতে একজন আগন্তুকের দরজায় প্রবেশ লক্ষ্য কবিল। হরিবাবুব উপর-দিকে চাওয়া অভ্যাস ছিল না, সুতরাং তিনি সেটা জানিতে পারিলেন না।

একটু পরে একজন ঝি আসিয়া বলিল, "বাবু, এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে কষ্ট পাবেন? ওপরে গিয়ে বসবেন আসুন।" হবিবাবু সারাদিন কলম পিষিয়া ক্লান্ত হইয়াছিলেন, কোথায বাড়ি গিয়া গা-পা ছড়াইয়া একটু আরাম কবিবেন ও শ্রান্তিহারিণী, তামাকুদেবীর প্রসাদে ক্লান্তি দূর করিবেন, তা' না এই দুর্যোগ উপস্থিত। এমন অবস্থায় তিনি এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, ঝির পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিলেন। উপরে উঠিয়া দেখিলেন, একটি ঘরেব ভিতর দিয়া আর একটি ঘবে যাইতে হয, প্রথম ঘরটিতে বিশেষ বেশি আসবাব নাই, কিন্তু দ্বিতীয় ঘবটির সাজসজ্জা ও গৃহেব অধিষ্ঠাত্রী দেবীব চেহারা দেখিযা হবিবাবু অনুমানে বুঝিলেন এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি যেন দুই পা পিছাইয়া যাইবাব ভাব দেখাইলেন। গৃহস্বামিনী তাহা বুঝিতে পাবিযা তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া বলিল, "আপনি ভদ্রলোক, কষ্ট পাচ্ছেন দেখে' ঝিকে উপবে ডেকে আন্‌তে বলে'ছি। আমাব কোনো কু মতলব নেই। এ ঘবে আস্‌তে যদি আপত্তি থাকে, তা' বেশ ঐ ঘরেই বসুন।"

এই বলিযা সে একখানি সুদৃশ্য ও সুপবিসব গালিচা বিছাইয়া দিল ও বলিল, "আমার গুরুদেবেব ব্যবহাবের জন্যে এই আসন কিনেছি, কোনো দ্বিধা বোধ না ক'বে এই আসনে বসুন।" হবিবাবু একটু অপ্রস্তুতভাবে বমণীব প্রদত্ত আসনে বসিয়া পড়িলেন। বমণী তখন ভরসা পাইয়া বলিল, "আকাশেব যে রকম গতিক, আপনাকে অনেকক্ষণ বস্‌তে হ'বে বোধ হ'চ্ছে। জামাটামা ছাড়ুন, ঝিকে দিয়ে মাজাঘষা পেতলেব ঘটিতে জল আনিয়া দিচ্ছি, হাতমুখ ধুযে ঠাণ্ডা হ'ন। আর তামাক অভ্যাস আছে কি?" হবিবাবু শেষেব কথাটায় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন। তখন রমণী বলিল, "গুরুদেব আস্‌বেন ব'লে নতুন হুঁকো-কল্‌কে কিনে বেখেছি, আপনি তাইতে তামাক সেবা করুন; ঝি সেজে দিচ্ছে। গুরুদেবেব জন্যে আবাব হুঁকো-কল্‌কে আনালেই হবে।"

হরিবাবু না-হুঁ না-হুঁ কবিযাও শেষটা বমণীর নির্দেশমতো সব কাজই করিলেন। তখন আর একটু সাহস পাইযা বমণী বলিল, "আপনার আফিসের কাপড়চোপড় দেখ্‌ছি; সারাদিন খাটুনির পর অবিশ্যিই ক্ষিদে-তেষ্ণা পেয়েছে, যদি অনুমতি করেন, ঝিকে দিয়ে বাজার থেকে ডাব আর সন্দেশ আনিয়ে দিই, একটু জলযোগ করুন।" "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্" বুঝিয়া রমণী ঝিকে ডাকিয়া ভিতরের ঘবে লইয়া গিয়া পযসা দিল ও কি কি আনিতে হইবে বলিযা দিল। এ সব স্থানের ঝি-চাকবের এমন তরিবৎ যে বাদলাবৃষ্টি ঝড়-ঝাপটা বজ্রাঘাতেও তাহারা মনিবের ফরমাস খাটিতে অবহেলা করে না। আর ঝির জুতা ভিজিবারও ভয নাই!

একটু পরে ঝি ফিরিল। হরিবাবু তাহার হাত হইতে সন্দেশ ও মুখকাটা ডাব লইয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা দমন করিলেন ও আর এক কিস্তি গম্ভীরভাবে তামাকুদেবীর আরাধনায় মনোনিবেশ করিলেন।

ক্রমে দুর্যোগের অবসান হইল। তিনিও আস্তে আস্তে উঠিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। যাইবার সময় কেমন বাধ-বাধ ঠেকিল, রমণীকে আতিথ্যের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া ঘটিয়া উঠিল না। রমণী তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা পর্যন্ত গেল ও সপ্রতিভভাবে বলিল, "তবে আসুন বাবু, দেরির জন্যে ঘরের লোকে না জানি কত ভাবছে। আবার কবে আ—" এই পর্যন্ত বলিয়া সে একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "এই দেখুন বাবু, কেমন বদ্ অভ্যেস হ'য়ে গেছে,

কি বল্‌তে যাচ্ছিলাম। যাক্, কিছু মনে কর্‌বেন না।" হরিবাবু হাঁ না কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে ঘাড় গুঁজিয়া দরজার বাহির হইয়া গেলেন।

২

হরিবাবু গৃহে ফিরিলে গৃহিণী একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এত দেরি যে। বৃষ্টিতে আফিসের বা'র হ'তে পারনি বুঝি?" তিনি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "বৃষ্টির জন্যে পথে আট্‌কা পড়েছিলাম।" মোটের উপর সত্য কথাই বলিলেন, কোথায়, কি বৃত্তান্ত, গৃহিণীও জিজ্ঞাসা করিলেন না, তিনিও ভাঙিয়া বলিলেন না। আজ বড়ো ক্ষুধা নাই, একটু রাত্রি করিয়া আহারাদি করিব—এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কাপড় চোপড় ছাড়িলেন, ও হাতমুখ ধুইয়া নুতন করিয়া ধূমপানে মন দিলেন। অমৃতে কি কখনো অরুচি হয়? তাহাতে আবার এক্ষেত্রে তামাকু গৃহিণীব শ্রীহস্তের সাজা। রাত্রে আহারাদির পর গৃহকর্মবিরতা গৃহিণীর সঙ্গে কিছুক্ষণ প্রেমালাপের পর নিদ্রার শরণ লইতে উন্মুখ হইলেন। কিন্তু সুনিদ্রা হইল না। থাকিয়া থাকিয়া অতিথিসেবাপরায়ণা নবপরিচিতার যত্ন-আদর ও অতিথিব নিষ্ঠারক্ষার জন্য আগ্রহ, এই সব কথা মনে পড়িতে লাগিল। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের হাবভাব-সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা ছিল, ইহার চরিত্রে তাহার বিপরীত ধরণ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় সেই রমণীর প্রতি কেমন একটা শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল।

যাহা হউক, প্রাতে উঠিয়া যথারীতি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া ও স্নানাহার করিয়া তিনি আফিসে গেলেন। কিন্তু সেদিন অন্যদিনের মতো চাপিয়া আফিসেব কাজ করিতে পারিলেন না, কেমন যেন অন্যমনস্ক। মনে কেবলই সেই রমণীর আদর-যত্নের কথা উঠিতে লাগিল। মোহেব এই তো প্রকৃতি।

আফিসের ছুটি হইলে অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে ঠিক সেই বাড়ির দরজায় তাঁহার গতিরোধ হইল। আজ দৈবদুর্যোগ নাই, তবুও একবার সেখানে আশ্রয় লইতে মন টানিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি 'ঝি, ঝি' বলিয়া ডাকিলেন। গলার সাড়া পাইয়া ঝি আসিল না, কিন্তু গৃহস্বামিনী বারান্দায় বাহির হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল ও একটু চমকিত হইয়া মৃদু-মধুবস্বরে বলিল, "ওপরে আসুন, ঝি দোকানে গেছে।"

হরিবাবু এই কোমল আহ্বানে উৎসাহের সহিত সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিলেন এবং বরাবর ভিতরের ঘরেই গেলেন। আজ আর রমণী তাঁহাকে গুরুদেবের আসন দিল না, একখানি চেয়ারে বসিতে বলিল। আসন-গ্রহণান্তে হরিবাবু গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "কাল তোমার আদর-যত্নে বড়ো আপ্যায়িত হয়েছি, তখন ধন্যবাদ দিতে পারিনি, তাই আজ সে ত্রুটি শোধ্‌রাতে এসেছি।" রমণী এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া একটু মৃদু হাসিয়া তাঁহাকে হাত-মুখ ধুইতে জলের ঘটি সরাইয়া দিল এবং ধূমপান ও জলযোগের ব্যবস্থা করিল; তবে আজ ঘরের তৈয়ারি খাবার—বাজারের নহে। হরিবাবু খাবার খাইতে একটু মৃদু আপত্তি করিয়া শেষে জিনিসগুলির সদ্‌ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

জলযোগান্তে গৃহস্বামিনীর তৈয়ারি তামাক টানিতে টানিতে শয্যাপার্শ্বে হারমোনিয়ামটা দেখিয়া তিনি একটু আবদারের সুরে বলিলেন, "বাজনাটা দেখে লোভ হচ্ছে একটু গান শুনি। আমার এ অনুরোধটা না রাখ্‌লে অতিথি-সৎকারে ত্রুটি থেকে যাবে কিন্তু।" রমণী দ্বিরুক্তি না করিয়া আবার একটু মৃদু হাসিয়া যন্ত্রে সুর দিয়া কীর্তন ধরিল এবং উপরি-উপরি ৩।৪টি বিরহ গাহিয়া তাহার পর চাবিটা বন্ধ করিয়া দিল।

গানের রেশ যতক্ষণ কানে রহিল, ততক্ষণ হরিবাবু কেমন এক রকম হইয়া থাকিলেন। তাহার পর ধ্যানভঙ্গ হইলে বুঝিলেন, রমণীর অনেকটা সময় লইয়াছেন, তাঁহারও অনেক বিলম্ব হইতেছে,

তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। রমণী বাধা দিল না। কেবল কল্য যে কথাটা 'অর্ধোক্তে' চাপিয়া গিয়াছিল, অদ্য সেই কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিল, "আবার কবে আস্‌বেন?" হরিবাবু জড়িতকণ্ঠে কি একটা জবাব দিলেন তাহা ভালো করিয়া শুনা গেল না।

৩

সেইদিন হইতে প্রায় প্রত্যহই হরিবাবু আফিসের ফেরতা এইখানে 'চিত্তবিশ্রাম' করিতে আসিতেন, দু'দণ্ড বসিতেন, দু'টা গান শুনিতেন, দু'টা মিষ্টালাপ করিতেন, (মিষ্টমুখও কোন্ না করিতেন?) ও পরে বিদায় লইতেন। ক্রমে তিনি রমণীর নাম পরিচয় পাইলেন; নামটিও সার্থক, কেননা পতিতা সরস্বতী দেবী সরস্বতীর কৃপায় গীতবাদ্য-নিপুণা, অর্থাৎ 'রূপে লক্ষ্মী' না হইলেও 'গুণে-সরস্বতী'। রমণীও তাঁহার নাম-ধাম সংসারের কথা সবই জানিয়া লইল। হরিবাবু ঘরে ফিরিয়া অক্ষুধার ও বিলম্বের কি কৈফিয়ৎ দিতেন জানি না, জানিলেও সে মিথ্যাচারের, কৈতববাদের পরিচয় দিতে চাহি না। গৃহিণী আম্‌তা আম্‌তা উত্তর শুনিয়া আকারে-ইঙ্গিতে ব্যাপার বুঝিয়াও, ইহা লইয়া আর খোঁচাখুঁচি করিতেন না, স্বভাব-সুলভ গাম্ভীর্য ও ধীরতার সহিত সহ্য করিয়া যাইতেন।

এইভাবে অনেকদিন সারস্বতকুঞ্জে সুখ-সম্মিলন চলিল। কতদিন কে জানে? 'বৎসরেই কি কালের পরিমাণ হয়?'

তাহার পর একদিন আকাশে মেঘ দেখা দিল, দুর্দিন পড়িল। হরিবাবু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলেন, আফিস যাওয়া বন্ধ হইল, সুতরাং আফিসের ফেরতা গান শোনার পাঠও বন্ধ হইল। কয়েকদিন অদর্শনে সরস্বতী বিমনা হইয়া উঠিল, ঠিকানা জানা ছিল, সে আর থাকিতে না পারিয়া কৌশলে সংবাদ-সংগ্রহের জন্য ঝিকে হরিবাবুদের পাড়ায় পাঠাইল। ঝি আসিয়া যে সংবাদ দিল তাহাতে সে বসিয়া পড়িল। যা' হ'ক্, কতকটা সামলাইয়া লইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে সে নিজেই রোগীর উদ্দেশে যাত্রা করিল। গৃহিণী অপরিচিতা নারীকে শুষ্কমুখে ও ব্যাকুলকণ্ঠে স্বামীর পীড়া-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলেন, হয়তো একটু সন্দেহও করিলেন। কিন্তু যে কালের ছায়া তখন পড়িয়াছে, তাহাতে আর বিস্ময়-বিদ্বেষের বিশেষ অবসর ছিল না, তিনি কোনো প্রশ্ন না করিয়া রমণীর প্রার্থনামতো তাহাকে স্বামীর রোগশয্যাপার্শ্বে লইয়া গেলেন।

হরিবাবু তখন বাক্‌শক্তি হারাইয়াছেন, কিন্তু সরস্বতীকে কাছে পাইয়া তাঁহার রোগক্লিষ্ট বিশীর্ণ বদনমণ্ডলে যে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিল ও পরক্ষণেই দুই চক্ষু দিয়া যে অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া গৃহিণী ব্যাপারটা সবই বুঝিলেন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি তখন আর গৃহিণীর বিরাগ-বিদ্বেষ-রোষ-অভিমানের সময় নহে। সরস্বতী ম্লানমুখে রোগীর শয্যাপার্শ্বে কায়েমিভাবে বসিল এবং সেবার ভার গ্রহণ করিল। চাপাগলায় গৃহিণীকে বলিল, 'দিদি, এখন বেশি কথার সময় নয়। আমি প্রাণপণে এঁর সেবা করব। এমন রুগী ফেলে' রোজ বাড়ি যাওয়া চল্‌বে না। আমাকে দু' বেলা দু'মুঠো দিও। আর যা'তে ভালো ডাক্তার দেখান হয়, তার ব্যবস্থা কর। টাকার জন্য ভেবো না।"

সহরের সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার আনা হইল, চিকিৎসার কিছুই ত্রুটি হইল না, কিন্তু রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ দাঁড়াইল; কেবল কষ্টে বাক্যস্ফূর্তি হইল। হরিবাবু নিঃসন্তানা নিঃসহায়া গৃহিণীর পানে যখনই চাহিতেন তখনই তাঁহার বুক ভাঙিয়া যাইত, দুই চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত, তাঁহার অবর্তমানে গৃহিণীর কি দশা হইবে—শুধু ভদ্রাসন বাড়িখানি ও প্রভিডেণ্ড্ ফণ্ডের কিছু টাকা ভরসা—এই ভাবনা তাঁহার রোগযন্ত্রণাকেও ছাপাইয়া উঠিল। সে কথা তিনি গৃহিণীকে কিছুতেই বলিতে না পারিয়া একদিন গৃহিণীর অসাক্ষাতে সরস্বতীকে বলিয়া ফেলিলেন। সে মৃদুস্বরে বলিল, "ভয় কি? আপনি

সেরে উঠবেন, অত ভাববেন না। আর যদি মন্দটাই হয়, তবে দিদির জন্যে আপনি মন খারাপ করবেন না, সে ভার আমার রইল, এ বিষয়ে তাঁকে কোনও কষ্ট পেতে দেব না।" তখন হইতে রোগীর মুখখানা একটু প্রসন্ন হইল, কিন্তু কালরোগে তাঁহাকে অব্যাহতি দিল না। সেই রাত্রেই পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা গৃহলক্ষ্মীকে ও শিরোদেশে উপবিষ্টা পতিতা সরস্বতীকে কাঁদাইয়া তিনি কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গেলেন।

৪

শ্রাদ্ধাদির পরে শোকের প্রথম বেগ কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে অভাগিনী বিধবা, বিধবা বেশধারিণী সরস্বতীকে বলিলেন, "বোন, আমার ইচ্ছা বাড়িখান বেচে ও আফিসের টাকা তুলে' নিয়ে কাশীবাস করি। তুমি আর কতদিন আমার কাছে পড়ে থাকবে?" সরস্বতী ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "দিদি, তুমি তীর্থযাত্রা করবে, বাধা দেব না। কিন্তু এই বাড়িই আমার মহাতীর্থ, আমি এ বাড়ি ছাড়তে পারব না। দশজন পাড়ার লোক ডেকে বাড়ির ন্যায্য দাম ঠিক কর, আমিই তোমাকে সে দাম দেব। তবে ইচ্ছে ছিল, যে ক'দিন এ পোড়াপ্রাণ থাকবে, তোমার মতো সতীলক্ষ্মীর সেবা ক'রে পূর্বজন্মের ও এ জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব, কিন্তু দয়াল ঠাকুর আমার কপালে তা লেখেন নি!"

কথাটা শুনিয়া বিধবা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। পরে বলিলেন, "বোন্, তুমি যে বল্‌ছ এ বাড়ি আমাদের মহাতীর্থ, তা' বটে। আমারও ইচ্ছে করে, তাঁর চরণ স্মরণ ক'রে এইখানেই প'ড়ে থাকি, কিন্তু আফিসের সামান্য টাকায় তো পোড়া পেট কুলোবে না। আরও কতকাল বাঁচতে হ'বে তা' কে জানে? তাই বাড়ি বিক্রি করতে চাই।" সরস্বতী উত্তর করিল, "দিদি, তোমার যদি এই বাড়িতে থাকা মত হয়, তবে সে জন্যে ভাবতে হ'বে না। আমি তার ব্যবস্থা করব। আমি তো তোমার আশ্রয়েই থাকব, আমার বাড়িখানার আর দরকার কি? সেইখানাই বেচে ফেলি। তুমি এতে অমত করো না, লক্ষ্মী দিদি, সে বাড়ি আমার পৈতৃক—পাপের ধনের নয়। তুমি অনুমতি দাও, সেই বাড়িবেচা টাকা সুদে খাটালে দুটো বিধবার পেট বেশ চ'লে যাবে।"

হয়ত অন্য সময় হইলে বিধবা এ প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতেন; কিন্তু আর মনের জোর নাই। তাহা ছাড়া সর্বদা সরস্বতীর সংসর্গে থাকিয়া তাহার স্বভাবচরিত্র দেখিয়া, তাহার সেবা পাইয়া, তাঁহার মনটা আর তাহার দিকে বিমুখ ছিল না। তিনি গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, "সরি, তুই আর জন্মে আমার বোন ছিলি! তোর যা' ভালো বোধ হয় তাই কর্, আমি কোনও কথা কইব না।"

এই কথাবার্তার পর সরস্বতী পাপের অর্জিত সমস্ত অর্থ অনাথাশ্রমে দান করিল ও বাড়ি বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইল শুধু তাহাই সম্বল করিয়া দুই জনের জন্য পুঁজি করিল। সে যত দিন বাঁচিয়া ছিল, বিধবার নিয়ম পালন করিয়া ও 'দিদি'র সেবা করিয়া কাটাইয়াছিল। তাহার পর একদিন হতভাগিনীর জীবন-বর্তিকা নিভিল; সে 'দিদি'র চরণে মাথা রাখিয়া, তাঁহার ক্ষমা-ভিক্ষা করিয়া, মহাযাত্রা করিল। বিধবা সেই যুগল শ্মশান-স্মৃতি হৃদয়ে বহন করিয়া আরও কিছুদিন দারুণ মনঃকষ্টে জীবন কাটাইয়া শেষে পরলোকে পতির সহিত মিলিত হইলেন। কে জানে সেখানে লক্ষ্মী-সরস্বতীর ন্যায় উভয়েই স্বামি-নারায়ণের পদসেবার অধিকার পাইয়াছিলেন কি না?

'মোহিনী'

চা হা র দ র বে শ

প্রমথ চৌধুরী

বি. এন. আর. যখন প্রথম খোলে, তার কিছুদিন পরেই আমি উক্ত-পথে C P-র কোন সহরে যাত্রা করি।

রেলগাড়ী আমি প্রথম দেখি ও তাতে চড়ি পাঁচ বৎসর বয়েসে। যে গাড়ী গরুতে টানে না, ঘোড়ায় টানে না, আপনি চলে—সে গাড়ী দেখে আমি আনন্দে অধীর হইনি।

তারপর রেলগাড়ীতে অসংখ্য বার যাতায়াত করেছি। কিন্তু এই C.P যাত্রার পথে একটু নতুনত্ব ছিল—সেই কথাই আজ বলব।

কলকাতা থেকে আসানসোল যাই—আর বোধ হয় সেখানেই ই. আই. আর. এর গাড়ী ছেড়ে বি এন. আর.-এর গাড়ীতে চড়ি।

রাত্তিরে কোন হোটেলে এসে ডিনার খেতে পাব—আশা করি। আমি ভোজনবিলাসী নই। চব্বিশ ঘণ্টা উপবাস করলেও আমার নাড়ী ছেড়ে যায় না—এমন কি, পিত্তিও পড়ে না। তাহলেও রাত্তিরে কিছু খাওয়া আমার অভ্যাস ছিল। সেইজন্যই ডিনারের আশায় গাড়ীতে বসেছিলুম।

পুরুলিয়া ছাড়বার ঘন্টা দুয়েক পর আমি গাড়ীর চালচলন দেখে অবাক হয়ে গেলুম। গরুর গাড়ীর চাইতে সে গাড়ীর চলন কিছু দ্রুত নয়। মধ্যে মধ্যে গাড়ীটা পা টিপে টিপে হেঁটে যেতে আরম্ভ করলে। আমি ছিলুম সেকেণ্ড ক্লাশের যাত্রী—আর আমার সহযাত্রী ছিলেন একটি রেল-কর্মচারী। রেলের এই বিলম্বিত চাল সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন—এ দেশের মাটি Black Cotton Soil বলে রেলের রাস্তা আজও Consolidated হয়নি, তাই সাবধানে যেতে হয়।

গরুর গাড়ী যদি রেলগাড়ীর মত দৌড়ায়, তাহলে তার আরোহীদের ভয় হওয়া স্বাভাবিক। অপরপক্ষে রেলগাড়ী যদি গরুর গাড়ীর মন্দগতিতে চলে, তাহলে সে গাড়ীর আরোহীদেরও মন প্রসন্ন হয় না। আমি এই অচল ট্রেনে বসে বসে ঈষৎ কাতর হয়ে পড়লুম। আমার সহযাত্রীটি ছিলেন নিম্নশ্রেণীর ইংরেজ, কিন্তু কথায় বার্তায় ভদ্র। তিনিও একটি ছোট স্টেশনে নেমে গেলেন, যেখানে তাঁর বাসস্থানে তাঁর মেম ছিল ও খানাপিনা ছিল।

তারপর সারা রাত্তির গাড়ী খোঁড়াতে খোঁড়াতে, হাঁপাতে হাঁপাতে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে অগ্রসর হতে লাগল। প্রতি স্টেশনে এঞ্জিনের দম জিরতে ও একপেট জল খেতে অন্তত আধঘন্টা লাগল।

পথিমধ্যে খোঁজ করে জানলুম যে, চক্রধরপুরে অন্তত এক পেয়ালা চা পাব।

তার পরদিন সকালে অর্থাৎ বেলা বারোটায় চক্রধরপুর পৌছলুম। কিন্তু সেখানেও এক পেয়ালা চা মিলল না। আমি চা-খোর নই, কিন্তু সকালে এক পেয়ালা চা না পেলে ভীষণ অসোয়াস্তি অনুভব করি।

সে যাই হোক, চক্রধরপুরে দু'টি ভদ্রলোক এসে আমার গাড়ীতে চড়লেন; তার ভিতর একজন যেমন বেঁটে, অন্যটি তেমনি লম্বা। বেঁটে ভদ্রলোকের গায়ে আলপাকার কোট ও জিনের পেন্টলুন, মাথায় একটি বনাতের গোল-টুপি, হাতে একটি ছোট ব্যাগ। লম্বা ভদ্রলোকের পরণে লংক্লথের চুড়িদার পায়জামা, আজানুলম্বিত গরম কোট আর মাথায় স্বরচিত পাগড়ী। লম্বা লোকটিকে দেখে প্রথমে নজরে পড়ল—তাঁর চোখ। এমন প্রকাণ্ড, এমন হাঁ-করা চোখ মানুষের মুখে ইতিপূর্বে দেখিনি। তারপর মনে হল সে-চোখ আলাপী চোখ—অর্থাৎ কথা কয়। তার পরেই প্রমাণ পেলুম ভদ্রলোক চোখে মুখে কথা কন—আর সে কথার স্রোত আমাদের রেলগাড়ীর চাইতে দ্রুত। তিনি

কামরাতে ঢুকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—কলকাতা।

—কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

—রায়পুর।

—মশায়ের নাম?

আমি আমার নাম বললুম। তিনি তা শুনে বললেন—"চৌধুরী" যে কোন্ জাত তা জানা যায় না।

আমি বললুম—ব্রাহ্মণ।

—ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

তারপর বেঁটে ভদ্রলোকটিকে সম্বোধন করে প্রশ্ন কবলেন ঃ

—মশায়ের নাম?

—পতিরাম পাঞ্জা।

—কি বললেন?

—পাঞ্জা।

—আমি শুনেছিলুম পাঞ্জাবী। আপনাব পাঞ্জাবীর মত চেহাবাও নয়, বেশও নয়। মশায ব্রাহ্মণ?

—না।

—বাঁচালেন। তিন ব্রাহ্মণে একত্র যাত্রা করা নিরাপদ নয়। মশাযেব বাড়ী কোথায?

—বাঁকুড়া জেলায়।

—কি করা হয়?

—ডাক্তারী।

—এম. বি.?

—না, আমি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।

—এই বুনো দেশে ডাক্তারী ব্যবসা চলে?

—চলে ত যাচ্ছে।

—ওষুধ ত আপনাদের হয় এক ফোঁটা জল, নয় তিলপ্রমাণ বড়ি।

—ওষুধের গুণ কি তার পরিমাণের উপর নির্ভর করে?

—অবশ্য নয়। সব গুণী লোক ত তালগাছের মত লম্বা হয় না।

—সে যাই হোক, মশায়ের নাম কি, জিজ্ঞেস কবতে পারি?

—সরদার শরকেল।

—বাঙলা ত আপনি আমাদের মতই বলেন।

—তার কারণ, আমিও বাঙালী।

—আমি ভেবেছিলুম বুঝি পাঞ্জাবী, আপনার চেহারা দেখে ও বেশভূষা দেখে, তারপর আপনাব নাম শুনে—।

—আমার নাম শ্রীধর সরখেল। খোট্টাদের মুখ থেকে শ্রীধর বেরোয় না, তাই ওরা সরদার বলে, আর সরখেলকে বলে শরকেল—

—আপনার বাড়ী কোথায়?

—বর্ধমান জেলায়, কুলীনগ্রামে।

—মশায় ব্রাহ্মণ?

—শুধু ব্রাহ্মণ নয়, একেবারে নৈকষ্য কুলীন। ইচ্ছে করলে ৩৬৫টি বিয়ে করতে পারতুম, আর পুরো বছর ৩৬৫টি শ্বশুরবাড়ী নিমন্ত্রণ খেয়ে কাটাতে পারতুম।

—বিয়ে কটি করেছেন?

—একটিও না। বাঁশবনে ডোম কানা।

—কি করা হয়?

—কিছুই নয়। আমি এখন ভবঘুরে।

—আগে কি করতেন?

—জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। তার অর্থ, কি যে করিনি বলা শক্ত।

—আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছিনে।

—বুঝতে পারবেনও না। আমি ছিলুম পল্টনে।

—সেপাই?

—না। Camp follower।

—তাদের কাজ কি?

—তার কোনও লেখাজোখা নেই। ক্ষেত্রে কার্যো বিধীয়তে। কখনও পাচকব্রাহ্মণ, সেপাইদের বিয়ে-শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য, কখনও রসদ কেনা, কখনও খাতা লেখা—ইত্যাদি ইত্যাদি। একটি শিখ পল্টন আমাদেব গাঁযেব ভিতব দিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমার বয়স চোদ্দ বৎসর। তাদের সঙ্গেই আমি জুটে যাই। আব কুচ করতে কবতে লাহোর যাই। তারপর চল্লিশ বৎসর তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। পল্টনের একটা নেশা আছে, সেই নেশাই আমাকে পেয়ে বসেছিল। এতদিনে সে নেশা ছুটেছে।

—আপনি নেহাৎ ছোকবা বয়সেই পল্টনে ভর্তি হলেন?

—আমি ত ছোকবা, Camp follower-দেব মধ্যে দেদাব স্ত্রীলোক পর্যন্ত থাকে। আব তাদের মধ্যে কেউ কেউ অতি সুন্দরী, তারা কর্ণেল সাহেবদের প্রিয়পাত্রী হয়।

—আপনি এখন বুঝি পেন্‌সন নিয়েছেন?

—আমাব চাকবির পেন্‌সন নেই। চাকবি থাকতে যা রোজগার করতে পাব। আর মাইনে যদিচ নামমাত্র, উপরি পাওনা বে-হিসেবী।

—কি বকম?

—যুদ্ধের সময় লুট, আর শান্তির সময় চুরি। হিন্দুস্থানীতে একটি কথা আছে—সরকারকে মাল, দরিযামে ঢাল। এ দরিয়া হচ্ছে army, আর আমরা Camp-follower-রা সেই বে-হিসেবী খরচেব ভাগ পাই। আমি এই খাতে দেদার রোজগার করেছি।

—তাই আপনারা পেন্‌সনের তোয়াক্কা রাখেন না।

—এই ছুটো চাকবির আয়ও যেমন, ব্যয়ও তেমনি। আমরা মরণের যাত্রী সব বেপরোয়া। ফলে, এখন আমার বিশেষ কিছু নেই। তাই এ জঙ্গলে এসেছি বুনো রাজাদের ঘাড় ভেঙে কিছু আদায় করতে পারি কিনা দেখতে।

—কি কাজ খুঁজছেন?

—এক ডাক্তারী ছাড়া যে কাজ জোটে তাই করতে পারি। এমন কি গুরুগিবি পর্যন্ত। হিমালয়ে যোগ অভ্যাস করেছি।

চক্রধরপুরেও এক পেয়ালা চা পেলুম না, কিন্তু শ্রীধর বাবুর সত্য-মিথ্যা গল্প শুনে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গিয়েছিলুম। শেষটায় তিনি বললেন, আর তিনচার ঘন্টা বসে আঙুল চুষুন—ঝাড়সুগড়ায় গিয়ে চা, রুটি, মাখন সব জোগাড় করে দেব। ষ্টেশন মাস্টার আমাদের রেজিমেন্টে Soldier

ছিলেন—আমরা এক সানখির ইয়ার। লোকটা যেমন অসম্ভব লড়িয়ে, তেমনি অসম্ভব ভাল লোক।

বেলা চারটেয় আমার চব্বিশ ঘন্টার নির্জলা উপবাস শেষ হবে শুনে একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম।

শ্রীধরবাবু বকেই চললেন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে; আর তাঁর কাছে এদেশের রাজাদের বিষয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করলেন। ডাক্তারবাবুর নাকি এই রাজারাজড়াদের মধ্যেই প্র্যাক্‌টিস্ বেশি। কারণ তাঁরা দিনে এক বোতল ব্রাণ্ডি খান—কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক ওযুধ তাঁদেব সহ্য হয় না—বেশি কড়া বলে। আর তাঁরা নাকি সব গরু, গাধা ও বোকা পাঁঠা—আর শিকাব করেন গেরস্তের ঝি-বউ। আর তাঁদের সহায় রাজমন্ত্রী ও রাজ-পুরোহিত।

বেলা চারটেয় গাড়ী ঝাড়সুগড়া ষ্টেশনে পৌঁছল, আর শ্রীধববাবুর আদেশে তাঁর সঙ্গে আমি প্ল্যাটফরমে নামলুম। তিনি বললেন—আপনি খানাকাম্‌রায় ঢুকুন, আমি ষ্টেশন মাস্টারের সঙ্গে একটা কথা কয়ে আসছি।

খানাকাম্‌রায় ঢুকে আমি তাব মাদ্রাজী ম্যানেজারকে চা ও রুটিমাখনেব অর্ডার দিলুম। সে বললে—কিছুই নেই, সব বিক্রী হয়ে গেছে।

আমি অগত্যা শ্রীধরবাবু গোরা ষ্টেশন মাস্টারের সঙ্গে যেখানে কথোপকথন কবছিলেন, সেইখানে গেলুম। তিনি জিজ্ঞাসা কবলেন, চা পেলেন? আমি বললুম, না।

শ্রীধরবাবু ষ্টেশন মাস্টারকে পল্টনী ইংরেজীতে আমার দুরবস্থার কথা বললেন। তিনি তখনই শ্রীধরবাবুকে হুকুম দিলেন, শালা মাদ্রাজীকো কান পাকড়কে লে আও।

শ্রীধরবাবু অমনি খানাকাম্‌রায় ঢুকে ম্যানেজারের কান ধরে নিয়ে এলেন। সাহেব হুকুম দিলেন যে, চা বানাও, আর রুটিমাখন বাবুকে দাও।

মাদ্রাজী বললে—নেই হ্যায়।

—সরদারজী! উস্‌কো এক থাপ্পড় লাগাও, আওব আলমাবী খোল। শালা চোর হ্যায়।

শেষে সবই পেলুম ও খেলুম।

গাড়ীতে ফেববার পথে শ্রীধববাবু বললেন, ষ্টেশন মাস্টারকে জানালুম যে সঙ্গে টিকিট নেই,—গার্ডকে বলে দেবেন—রাস্তায় কেউ যেন উৎপাত না করে। তিনি বললেন, all right। আর ওই মাদ্রাজীটা এক টাকার জিনিস আপনার কাছে দু'টাকা নেবার ফন্দী করেছিল, এক থাপ্পড়ে বিনা পয়সায় হয়ে গেল। এরি নাম পল্টনী কায়দা।

গাড়ীতে ঢুকেই দেখি, দুটি নতুন ভদ্রলোক বসে আছেন। দুজনেরই পরণে ইংরেজী পোষাক;—একজনের চাঁদনির তৈরী, আর একজনের ব্রিচেস-পরা আর হাঁটু পর্যন্ত পট্টি জড়ান।

শ্রীধরবাবু গাড়ীতে উঠেই জেবা সুরু করলেন। তার ফলে আমরা জানলুম একজনের নাম তারক তলাপাত্র—Timber Merchant। আর যাঁর বেশ ঘোড়সোযারেব মত, তিনি হচ্ছেন Forest Officer, নাম সুষেণ সেন। তাঁর পৈতৃক উপাধি ছিল দাস, তিনি অনুপ্রাসের খাতিরে "সেন" অঙ্গীকার করেছেন।

তারপর ঘন্টা তিন চার ধরে শ্রীধরবাবু মজলিস জমিয়ে রাখলেন। এমন অনর্গল বকতে আমি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কখন দেখিনি। তিনি জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করেছেন, তাই তিনি নতুন যাত্রীদের ব্যবসার বিষয় সব জানেন। তিনিও কিছুদিন কাঠের ব্যবসা করেছিলেন,—যেখানে হিমালয়ের গায়ে প্রকাণ্ড শালবন আছে, আর তার মধ্যে মধ্যে ছোটখাটো নদী—যার বর্ষাকালে হয় অসম্ভব তোড়। বড় বড় শালগাছ কেটে সেই নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে হয়, যেখানে গিয়ে সেই গুঁড়িগুলো ঠেকে, সেখানে সেগুলি জল থেকে তুলে বেচতে হয়। এ ব্যবসায় লাভ খুব বেশি। কিন্তু কোন্‌টা কার গুঁড়ি, এই নিয়ে ঝগড়া হয়—আর এই ঝগড়াঝাঁটিতে লাভ সব খেয়ে যায়।

শ্রীধরবাবু বললেন,—তা যদি না হত, তাহলে আমি আজ লক্ষপতি হতুম। একা মানুষ, তাই আমি পয়সার জন্য কেয়ার করতুম না। হিমালয়ের ট্যাকেগোঁজা ছোট-ছোট রাজ্যের রাজারা সব রাজপুত, আর সকলেই আফিংখোর। এদের আদালত আছে, কিন্তু আইন-কানুন নেই। এদের বিচারপ্রার্থী হওয়া ঝক্‌মারি।

তারকবাবু বললেন—লোকে কাজ কি শুধু স্ত্রীপুত্রের জন্যে করে? আমার স্ত্রীপুত্র নেই। ডাক্তারবাবু বললেন, তাঁরও নেই। ফরেস্ট অফিসাব বললেন, তাঁরও নেই।

সহযাত্রীদের কাবও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নেই শুনে শ্রীধরবাবু সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হলেন, তা তাঁর বক্তৃতায় বোঝা গেল না। তিনি শুধু বললেন—আপনারা সকলেই দেখছি চিনির বলদ। টাকার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনিও অবিবাহিত, কিন্তু তাঁর যেমন কামিনী নেই, তেমনি কাঞ্চনও নেই। ভূতের ব্যাগার খাটা তাঁর ধাতে নেই। তারপর তিনি গেবস্ত লোকেব যে বিবাহ কবা উচিত, সে বিষয়ে নানা যুক্তি দেখালেন। তাঁব কথায় কেউ বিশেষ আপত্তি করলেন না। কিন্তু সকলেই আলোচনায় যোগ দিলেন। বিবাহ জিনিসটা এদেশে জন্ম-মৃত্যুর মত নিত্য হয়, এ বিষয়ে যে এত মতভেদ আছে তা জানতুম না। আমি একমনে এই সব তর্ক-বিতর্ক শুনছি, এমন সময়ে বাঁ দিকে একটি বেজায় ফাঁপা ও ফুলো নদী দেখতে পেলুম—তাব নাম বোধহয় মহানদী। বর্ষায় তার এই চেহাবা, গ্রীষ্মে কিন্তু এ নদীতে কোমর-জল থাকে না। ডাক্তারবাবু বললেন যে, রাতভর হয়ত তীরে বসে ঢেউ গুণতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা কবলুম, কেন? তিনি উত্তব করলেন—এ রেলগাড়ী গরুর গাড়ী হতে পারে, কিন্তু জাহাজ নয়। আর ঘোড়া পাওযা যেতে পাবে, কিন্তু তাবা সিন্ধু-ঘোটক নয়।

ডাক্তাববাবু যা বলেছিলেন, তাই ঘটল। রাত্তির প্রায় সাড়ে আটটায় বায়গড় ষ্টেশনে পৌছে শুনলুম যে, সে রাত্তির আর গাড়ি এগোবে না। এর পরের রাস্তা বানের জলে ডুবেছে ও সম্ভবত বিপর্যস্ত হয়েছে। বাস্তা যদি কোথাও বে-মেবামত হয়ে থাকে, আজ রাত্তিরেই তা মেবামত হয়ে যাবে। অগত্যা আমবা কি কবে রাত কাটাব, সেই ভাবনাতে অস্থিব হয়ে পড়লুম।

ষ্টেশন মাস্টার ত্রিলোচন চক্রবর্তী বললেন—আমি দু' একখানা বেঞ্চি জোগাড় করে দিচ্ছি, তাতেই পালা করে রাত কাটাতে পাববেন। অবশ্য আপনাদের কষ্ট হবে! কিন্তু উপায় নেই।

শ্রীধরবাবু বললেন—যাত্রা শুনেও ত সাবাবাত জেগে কাটান যায়। এ যাত্রা আমবা বকে ও গল্প কবে বাত কাবাব করে দেব। কি বলেন বনবিহাবী বাবু?

ফবেস্ট অফিসাব বললেন—তাব আব সন্দেহ কি?

তারপর শ্রীধববাবু ষ্টেশনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন—খাবাব কিছু পাওয়া যায়?

ষ্টেশনবাবু বললেন—দেদার ভুট্টা।

—তাই আনিয়ে দিন।

ডাক্তারবাবু বললেন—পোড়াবে কে?

ফরেস্টবাবু বললেন—আমার চাকব গোপাল।

ভুট্টা এল। পোড়ান হল। শ্রীধরবাবু বললেন—এক বোতল "রম্" থাকলে ভুট্টার চাটের সঙ্গে খাওয়া যেত।

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন—আপনি "রম্" খান নাকি?

—আমি পল্টনে চাকরি করতুম, মদ-মাংস খেয়েই মানুষ। পল্টনে কেউ হবিষ্যি করে না। বিলিতি সভ্যতা পঞ্চ-'ম'কারের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

—তা যেন হল। কিন্তু 'রম্' ত অতি খারাপ জিনিস?

ফরেস্টবাবু বললেন—গোপালের কাছে দু'এক বোতল হুইস্‌কি আছে।

শ্রীধরবাবু বললেন—ব্যোম ভোলানাথ।

গোপাল এক বোতল হুইস্‌কির ছিপি খুললে।

ফরেস্টবাবু বললেন—থাকি একা বন-জঙ্গলে, বাঘভালুকের মধ্যে। বিদ্যের মধ্যে শিখেছি এই হুইস্‌কি খাওয়া।

ডাক্তারবাবু বললেন যে, তিনি হোমিওপ্যাথিক নিয়মে, অর্থাৎ dilute করে খেতে পারেন।

তারকবাবু বললেন, তিনি dilute না করেই গলাধঃকরণ করবেন। কেননা মদ সকলের হাতে খাওয়া যায়, কিন্তু জল নয়।

আমিই একা নির্জলা উপবাস করলুম।

অতঃপর আমার সহযাত্রীরা ধীরে-সুস্থে হুইস্‌কি পান করতে আর মধ্যে মধ্যে ভুট্টা চিবতে লাগলেন।

শ্রীধরবাবু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারেন না। তিনি হঠাৎ প্রস্তাব করলেন যে, আমরা সকলেই অবিবাহিত, অবশ্য বিভিন্ন কারণে। কেন আমরা গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করিনি, তারই ইতিহাস বলা যাক। আমার নিজের কথাই প্রথমে বলছি ঃ

আমি যে বিবাহ করিনি, তাতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। চল্লিশ বৎসর নানা পল্টনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। মধ্যে মধ্যে বেশ পয়সাও রোজগার করি। কিন্তু সে রোজগার অনিশ্চিত। তাই বহু স্ত্রীলোক দেখেছি, কিন্তু তাদের কাউকেও বিয়ে করবার কথা কখনও মনে হয়নি। পল্টনে অবশ্য বিয়ে হয়, কিন্তু সে বিয়ে নিকে ও ঠিকে মাত্র। ও একরকম গান্ধর্ব বিবাহ, যার ভিতর জাতবিচার নেই, দেনাপাওনা নেই। এমন কি সৈনিকের দৈনিক বিবাহও চলে।

আমি কুলীনের ছেলে, বহুবিবাহে আমার আপত্তি নেই। আমরা বিবাহ করি কুলীন-কন্যাদের কুল রক্ষা করবার জন্য, কিন্তু তাতে তাদের শীল রক্ষা হয় না। আমরা বিবাহ করেই খালাস—তারাও তাই। আমাদের ওই শ্রেণীর স্ত্রীদের বিশেষরূপে বহন করতে হয় না। তারা luggage নয়। আর luggage ঘাড়ে করে পল্টনের Camp-follower হওয়া যায় না। এখন বুঝলেন, আমি কিসের জন্য চিরকুমার। বয়স যখন পঞ্চাশ পেরল, তখন আমি পল্টন থেকে আল্‌গা হলুম। কিছু টাকা হাতে করে দেশে ফিরিনি, হিমালয়েই থেকে গেলুম—কখনও ডালহৌসী ও কখনও শিমলায়।

এই সময় আমার এক ভাইপো আমার এক বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠালেন। আমি উত্তরে তাঁকে লিখলুম—গতা বহুতরা কান্তা, স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্বরী।—এই ত শুনলেন আমার ইতিহাস। চৌধুরী মশায়, আপনি অবশ্য এখনও বিয়ে করেন নি। আপনি কলেজের ছোকরা। আমার পরামর্শ শোনেন ত বাড়ী ফিরে গিয়েই বিয়ে করুন।

এর পর ডাক্তারবাবু তাঁর আত্মজীবনচরিত বলতে শুরু করলেন ঃ

আমার বাড়ী বাঁকুড়া জেলায়। আমি ব্রাহ্মণ নই; যদি হতুম ত পাচক ব্রাহ্মণ হতুম। আমাদের পারিবারিক ব্যবসা ডাক্তারি। অ্যালোপ্যাথি নয়, হোমিওপ্যাথি নয়—হাতুড়েপ্যাথি। আজকাল হাতুড়েপ্যাথির ব্যবসা চলে না। তাই কাকার পরামর্শে হোমিওপ্যাথির একখানা বাঙলা বই মুখস্থ করে ডাক্তারি সুরু করলুম। প্রথমে গাঁয়ে। আমাদের একটা বদনাম আছে, আমরা নাকি হামবড়ামি করি। Bailyর ভাই Kelly যে রোগ সারাতে পারে না, আমরা নাকি এক ফোঁটা ওষুধে তা সারাই। কিন্তু আমরা নিজের বিদ্যের বড়াই করিনে, আমাদের ওষুধের গুণগান করি।

আমি ব্যবসা সুরু করলুম। আমারি কাকা আমার বিয়ে স্থির করলেন একজন মোক্তারের মেয়ের সঙ্গে। মেয়ে দেখে আমি ভড়্‌কে গেলুম। কাকা কিন্তু নাছোড়বান্দা—টাকাটা সিকেটার লোভে। মেয়ের হল ওলউঠো—আমি বললুম, আমি এক বড়িতে সারিয়ে দেব। আমিও বড়ি খাওয়ালুম, সেও মারা গেল।

মোক্তারবাবু বললেন যে, আমি বিষবড়ি খাইয়ে তাকে মেরেছি। এর পর গাঁয়ের লোক রটালে

যে, আমি খুনে ডাক্তার। বেগতিক দেখে আমি দেশ থেকে পলায়ন করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলুম। সেই অবধি এই বুনো দেশে আমাদের ছোট-ছোট সাদা বড়ি দিয়ে চিকিৎসা করছি, আর তাতেই খোরপোষ চলে যাচ্ছে। যে যাই বলুন, ঐ নিরীহ বড়ির তুল্য ওষুধ আর নেই।

এক গুলি হোমিওপ্যাথিক ওষুধে যে লোক মারা যায়—এ কথা শুনে সকলেই অবাক হয়ে গেলেন। একমাত্র শ্রীধরবাবু বললেন যে, তিনি এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ওষুধ গিলতে প্রস্তুত।

তারপর তারকবাবু বললেন ঃ

এখন আমার কথা শুনুন। আমার দাদা রেলওয়েতে চাকরি করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন পরমাসুন্দরী। তিনি একদিন হঠাৎ heart-failure-এ মারা গেলেন—কিন্তু দাদাকে ছেড়ে গেলেন না। যখন তখন দাদার সুমুখে এসে উপস্থিত হতেন, কিন্তু কোনও কথা কইতেন না। দাদা তাঁর স্ত্রীর প্রেতাত্মার উৎপাতে প্রায় পাগল হয়ে উঠলেন, আর আমাদের সকলকেই প্রায় পাগল করে তুললেন। আমরা গয়ায় প্রেতশিলায় বৌদিদির শ্রাদ্ধ করলুম। কিন্তু পারলৌকিক বৌদিদি দাদাকে ছাড়লেন না। এমন কি, দাদা ট্রেণে যাচ্ছেন, হঠাৎ তাঁর স্ত্রী এসে তাঁর কাছে আবির্ভূত হলেন। তিনি অমনি ভয়ে চীৎকার করতে সুরু করলেন। শেষটায় তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন, এবং দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলেন। কিছুদিন পরে তিনিও মারা গেলেন। আমি তাঁর সঙ্গেই ঘুরতুম, কিন্তু কখনও তাঁর স্ত্রীর ছায়া দেখিনি। দেখেছি, শুধু দাদার অসাধারণ কষ্ট। ডাক্তাররা বলল যে, দাদার যা হয়েছে তা mental disease। যদি তাই হয় ত mental disease যে কি ভয়ঙ্কর বস্তু, তা বলা যায় না। এই ব্যাপারে আমার মনে যে ধাক্কা লেগেছিল, তাতে বিয়ের নাম শুনলে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। সেই ধাক্কায় আমি চিরকুমার।

শ্রীধরবাবু বললেন ঃ "monogamy তে এই বিপদ; বহুবিবাহের বিপদ নেই। আপনারা বুঝি কুলীন নন, তাতেই আপনার দাদা এই ঘোর বিপদে পড়েছিলেন। অন্য কেউ রা কাড়লেন না।

শেষটায় বনবিহারীবাবু বললেন ঃ

আমার বিয়ে না করবার কারণ আরও অদ্ভুত। আমার বাবা ছিলেন একজন বড় ফরেস্ট অফিসার; তিনি সাহেবদের বলে কয়ে আমাকে এ চাকরিতে বাহাল করেন। আমি ছিলুম Rangaroon ফরেস্টের অফিসার। ঐ প্রকাণ্ড বনের ভিতর একটা ছোট্ট ইনস্পেকশন বাংলো আছে। মধ্যে মধ্যে আমাকে সেখানে গিয়ে দু'তিন রাত কাটাতে হত। সে বাংলোর খবরদারি করত একটি বৃদ্ধ নেপালী, আর তার সঙ্গে থাকত তার একটি নাতনী। অমন সুন্দরী মেয়ে আমি আর কখনও দেখিনি। রং ফরসা, আর নাক চোখ বাঙালীর মত। আমার তখন যাকে বলে প্রথম যৌবন। তাই আমি সেই মেয়েটিকে বিবাহ করব স্থির করলুম। তারপর শুনলাম যে, সে পূর্ব অফিসার দাস সাহেবের মেয়ে। দাস সাহেব হচ্ছেন আমার পিতা। এ কথা শুনে আমি গভর্ণমেন্টের চাকরি ইস্তফা দিয়ে চলে আসি। তারপর এ অঞ্চলের একটি রাজার ফরেস্ট অফিসার হয়েছি। এর পর থেকে বিয়ের নাম শুনলে আমার গা পাক দিয়ে ওঠে।

চার চিরকুমারের চারটি গল্প শুনে শ্রীধরবাবু বললেন—এখানে যদি কোনও লেখক থাকত ত এই চারটি গল্প লিখলে একখানি নতুন চাহার দরবেশ হত।

ডাক্তারবাবু বললেন যে, আমরা ত দরবেশ নই!

শ্রীধরবাবু উত্তর করলেন—যে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে, সে-ই দরবেশ। আমার ও দুই নেই। আপনারা অবশ্য এখনও কাঞ্চন ছাড়েননি। ও শুধু ভুতের ব্যাগার খাটা। শুনতে পাই যে শাস্ত্রে বলে, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। যার গৃহিণী নেই, তার গৃহও নেই। আর যে গৃহহীন, সেই ত দরবেশ।

দেবতার ভর

দীনেন্দ্রকুমার রায়

দেওয়ানগঞ্জের জমিদার ভবকিঙ্কর চৌধুরী কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্যকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া পৈতৃক জমিদারির আয় দ্বিগুণ বর্ধিত করিয়াছিলেন, এ জন্য দেওয়ানগঞ্জ অঞ্চলের জনসাধারণের ধারণা হইয়াছিল, যদি কিঞ্চিৎ 'গোব্যরস' কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্যের পেটে পড়িত, অর্থাৎ ইংরাজি বিদ্যায় তাঁহার একটু দখল থাকিত, তাহা হইলে তিনি সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান স্বর্গীয় কার্তিকেয়চন্দ্র রায় বা রাজীবলোচন রায় অপেক্ষাও অধিক খ্যাতি অর্জন করিতে পারিতেন; এমন কি, তাঁহাব জমিদারকে ডিঙাইয়া সেকাল-দুর্লভ "রায় বাহাদুর" খেতাবও লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি মনিবের ও সেই সঙ্গে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য প্রজাপীড়নের এরূপ নূতন নূতন কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার শাসন ও শোষণ-দক্ষতার পরিচয় পাইয়া সরকার বাহাদুর তাঁহার মনিবকে "জুলুমবাজ" জমিদার নামে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন এবং জেলার ম্যাজিস্ট্রেট খুশি হইয়া তাঁহাকে "স্পেশাল কনষ্টবলে"র পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মনিবের আয়বৃদ্ধির প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকিলেও স্বকীয় স্বার্থের প্রতিও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল এবং এইজন্যই একশত টাকা মূল্যের দেওয়ান হইয়াও তিনি বার্ষিক ছয়হাজার টাকা মুনাফার ভূ-সম্পত্তি অর্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। "বিদ্যাসাগর" বলিলে যেমন দয়ার সাগর, "কাঙাল-বিধবাবন্ধু অনাথের গতি" প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বুঝাইত, সেইরূপ "দেওয়ান" বলিলে এ অঞ্চলে কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্যকেই বুঝাইত। তাঁহার বাসগ্রাম গোবিন্দপুরে এখনও তাঁহার বাসভবন "দেওয়ানবাড়ি", তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অধুনা জীর্ণ ও বিবর্ণ ভগ্নচক্র কাঠের রথ "দেওয়ানের রথ", তাঁহার সুবিস্তীর্ণ আম-কাঁঠালের বাগান "দেওয়ানের বাগান" এবং তাঁহার গৃহবিগ্রহ "রাধামাধব" "দেওয়ানের ঠাকুর" নামে পরিচিত হইয়া অর্ধশতাব্দী পরেও গ্রামবাসিগণের নিকট তাঁহার ঐশ্বর্য ও খ্যাতি-প্রতিপত্তির স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কথিত আছে, কৃষ্ণনাথ দেওয়ান ক্ষমতাদর্পে অন্ধ হইয়া একবার একজন নিষ্ঠাবান্, পরমধার্মিক ব্রাহ্মণ প্রজাকে তাঁহার দেবার্চনার সময়, পূজা সমাধা করিবার অবসর না দিয়াই এক জন পাইক পাঠাইয়া গলায় গামছা দিয়া জমিদারি কাছারিতে হাজির করিয়াছিলেন; ইহাতে অপমানিত মর্মাহত ব্রাহ্মণ উপবীত স্পর্শ করিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, "তুমি নির্বংশ হও, দুশ্চিকিৎস্য রোগে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, তিল তিল করিয়া যেন তোমার প্রাণবিয়োগ হয়।"

ব্রাহ্মণের এই অভিসম্পাত সফল হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র, কন্যা, জামাতা দৌহিত্রাদি সকলের মৃত্যুর পর দুশ্চিকিৎস্য রোগে দীর্ঘকাল অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিনি "সাধনোচিতধামে" প্রস্থান করিয়াছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দেওয়ানজী জীবিত অবস্থায় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর বিধবা দেওয়ান-পত্নী যে কয়েকটি বালককে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদেরও কেহই জীবিত রহিল না। দেওয়ানজী মৃত্যুর পূর্বে পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ স্বগৃহে রাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি রাধামাধবের নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছিলেন। গ্রামের দুষ্ট লোকরা বলিয়া থাকে, ইহাও দেওয়ানজীর একটি "চাল।" তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্থাবর সম্পত্তি কেহ ফাঁকি দিয়া লইতে না পারে, এই উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা।

২

দেওয়ানজীর মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য সহধর্মিণী শ্যামাসুন্দরী রাধামাধবের সেবাইতরূপে জমিদারি পরিচালিত করিতে লাগিলেন। শ্যামাসুন্দরীর বয়স এখন আশি বৎসর। বপুখানি এরূপ স্থূল যে,

তিনটি পরিচারিকার সহায়তা ব্যতীত তিনি নড়িয়া বসিতে পারেন না। তিনি বিশ্বাস করেন, পূর্বজন্মে তিনি অহল্যা বাঈ বা মীরা বাঈ ছিলেন, শাপভ্রষ্ট হইয়া বাঙালীর ঘরে তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। ২০ বৎসর পূর্বে ছানি পড়িয়া তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল; আর একটি চক্ষুতেও বার্ধক্যজনিত দৃষ্টিক্ষীণতা বশতঃ তিনি প্রায় কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহাকে সম্পূর্ণ অন্ধ করিতে পারিলে উপার্জনের পথ প্রশস্ত হইবে বুঝিয়া তাঁহার নায়েব জহরলাল নাগের পরামর্শে তাহার অনুগৃহীতা ও তাঁহার পেয়ারের পরিচারিকা খুদী ঘোষানী প্রত্যহ রাত্রিতে তাঁহার নিষ্প্রভ চক্ষুতে এক প্রকার আরক দুই এক ফোঁটা ঢালিয়া দিয়া পাখার বাতাসে তাঁহার সন্তাপ হরণের চেষ্টা করে। সুতরাং তাঁহার নিঃশেষিতপ্রায় দৃষ্টিশক্তির পরমায়ু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার দিব্যদৃষ্টি ক্রমেই তীক্ষ্ণ হইতেছে। রাম, শিব, লক্ষ্মী, কালী এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে পর্যন্ত সঙ্গে লইয়া প্রতি মঙ্গলবারে রাত্রিকালে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, এবং তাঁহার নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবারণ করেন। ইহার ইতিহাস পরে বলিতেছি।

দেওয়ানজীর মৃত্যুর পর শ্যামাসুন্দরী স্বয়ং জমিদারির পরিচালনাভার গ্রহণ করিলেও তাঁহার স্বামীর আমলের নায়েব হারাধন চাটুয্যেকে পদচ্যুত করেন নাই; কিন্তু হারাধনের কর্তৃত্বে গোমস্তা পদা গাঁড়াল ও মুহুরী অনন্ত অধিকারীর উপরি আয়ের পথ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় তাহারা হারাধনের বিরুদ্ধে এরূপ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলে যে, কিছুদিনের মধ্যেই তাহার অন্ন উঠিল। হারাধনকে বরখাস্ত করিয়া পদা গাঁড়াল ও অনন্ত অধিকারীর উপর আদেশ জারি হইল,— তাহাদিগকে অবিলম্বে একটি সুদক্ষ বিশ্বাসী এবং দুর্দান্ত প্রজাদের শাসনে রাখিতে পারে, এরূপ নায়েব সংগ্রহ করিয়া হুজুরে হাজির করিয়া দিতে হইবে।

অন্যান্য জমিদারের তহশীলদারী, গোমস্তাগিরি বা আমিনী করিয়া জমিদারি কার্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, এরূপ অনেক লোক এই "লুঠের" মহালটির প্রতি লুব্ধদৃষ্টিপাত করিলেও তাহাদের কেহই এই কুড়ি টাকার নায়েবী পদের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না; কারণ, গোমস্তা পদা গাঁড়াল ও মুহুরী অনন্ত অধিকারী বুঝিতে পারিল— তাহাদের কাহাকেও এই পদে নিযুক্ত করিলে উপরিলাভের পথ রুদ্ধ হইবে; তাহারা গাছেরও পাড়িবে, তলারও কুড়াইবে, কেবল আমড়ার আঁটিগুলি গোমস্তা ও মুহুরীর জন্য রাখিয়া দিবে। এ অবস্থায় গোমস্তা ও মুহুরীর সহিত "কাঁধে মেলে" এরূপ লোকের অনুসন্ধানে তাহাদের আহার নিদ্রা বন্ধ হইল।

জহরলাল বহুদিন পুলিসে চাকরি করিয়াছিল; সে ফরিদসিংহ জিলায় পুলিসের হেড্ কনেষ্টবলের পদে নিযুক্ত ছিল, সেই সময় উৎকোচ গ্রহণের অপরাধে তাহাকে চাকুরি হইতে বিতাড়িত হইতে হয়। পুলিসের অনেক কর্মচারীই এই কার্যটি করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের চাকরি যায় না; কিন্তু জহরলালের অপরাধ কিন্তু গুরুতর। সে পুলিস "সাহেবের" বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল। পুলিস "সাহেবের" জন্য মুরগী ও মুরগীর ডিম সংগ্রহ করিয়া ইনস্পেক্টরের নিকটে সে তাহার মূল্যের "বিল" দিয়াছিল; সুতরাং জিলাপুলিসের ধারণা হইয়াছিল, লোকটি অকর্মণ্য। এই ঘটনার কিছু দিন পরে তাহার বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত হয়; এই জন্যই তাহার চাকরি খসিতে বিলম্ব হয় নাই।

জহরলাল গোবিন্দপুরে আসিয়া চাকরির উমেদারিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; কিন্তু খুদী ঘোষানীর প্রতিবেশীরা প্রায় প্রতিদিনই প্রত্যুষে তাহাকে খুদীর ঘর হইতে বাহির হইতে দেখিত। খুদী দেওয়ান-গিন্নীর "ন্যাড়া" মাথায় তৈলমর্দন করিতে করিতে জহরলালকে নায়েবী দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিতে লাগিল। জহরলালও দুই এক দিন পদা গাঁড়াল ও অনন্ত অধিকারীকে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করিল; তাহারা জহরলালের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিল, জহরলালই দেওয়ানজীর "ইষ্টাটে" নায়েবী করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি। একে খুদী চাকরাণীর সুপারিশ, তাহার উপর পদা গাঁড়াল

ও অনন্ত অধিকারী যখন দেওয়ান-গিন্নীকে বলিল, জহরলাল পুলিসের ফেরতা লোক, "দারোগাগিরী" করিয়া বিস্তর আসামীকে জেলে পুরিয়াছে, সে দুর্দান্ত প্রজাদের উপযুক্ত মুগুর হইবে; বিশেষতঃ কর্ত্রী ঠাকুরাণীর মতো তাহারও একটি চক্ষু নাই; সুতরাং সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র; তাহাকে নায়েবী পদে নিযুক্ত করিলে "ইষ্টাটের" কাজ সুন্দররূপে চলিবে এবং জমিদারির উন্নতি হইবে, দেওয়ানগিন্নী তখন তাঁহার দরবারে জহরলালকে হাজির করিতে আদেশ করিলেন।

জহরলাল পরদিন অপরাহ্ণে ফোঁটা-তিলক কাটিয়া, গলায় তিনকণ্ঠী তুলসীর মালা জড়াইয়া, নামাবলী দ্বারা সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, একজোড়া খড়ম পায়ে দিয়া পদা গাঁড়াল ও অনন্ত অধিকারীর সঙ্গে দেওয়ান-গিন্নীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে দেখিল, দেওয়ান-গিন্নী একটি পাকা হেঁড়ে তাল দ্বারা আবৃত জলের জালার মতো সুগুরু দেহভারখানি সুপ্রশস্ত জলচৌকির উপর সংস্থাপিত করিয়া মালা জপ করিতেছেন। তাঁহার উভয় প্রকোষ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা বলয়াকারে সংরক্ষিত, বাহুমূলে রুদ্রাক্ষের তাগা, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ-খচিত স্বর্ণহার, পরিধানে লোহিত গরদ।

জহরলাল দেওয়ান-গিন্নীর পদপ্রান্তে লম্বা হইয়া পড়িয়া জলচৌকির সম্মুখে পাঁচটাকা প্রাণামী দিল এবং গদগদকণ্ঠে বলিল, "কি রূপ দেখালে মা। না জানি, কোন্ পুণ্যে তোমার শ্রীচরণদর্শন ঘটলো। মা, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি শাপভ্রষ্টা, 'কাশীতে অন্নদা তুমি, কৈলাশে ভবানী। মা অন্নপূর্ণা। এই অধম সন্তানের অন্নকষ্ট নিবারণ কর। যে ক'দিন বাঁচি, যেন তোমার 'ছিরিচরণে'র ছায়ার বঞ্চিত না হই।"—তাহার কানা চক্ষু হইতে অশ্রুরাশি বিগলিত হইয়া সিমেন্টের মেঝের উপর লবণাম্বুর স্রোত বহিল।

পদা গাঁড়াল ও অনন্ত অধিকারী কিছু দূরে দাঁড়াইয়া একচক্ষু জহরলালের অভিনয়-পরিপাট্য নিরীক্ষণ করিতেছিল। পদা অনন্তকে বলিল, "দাদাঠাকুর, লাগ মোশায় আমাদেব চেয়েও সরেশ যাবে বোধ হচ্ছে। উনি পূর্বে চাকরি করবার সময় কি কোনো সখের যাত্রা-দলে 'এ্যাক্টো' কবত?"

অনন্ত বলিল, "পুলিস-ফেরতা লোক। কিছু দিন এ সরকারে চাকরি করলে ঠিক গিন্নীব হাতে খোলা দিতে পারবে। শেষে আমাদের রুটি মারা না যায়!"

পদা বলিল, "না সে ভয় নেই। কল কাঠি আমাদের হাতেই আছে; দেখে নেবেন, দাদাঠাকুর।"

দেওয়ান-গিন্নী জহরলালের যোগ্যতার পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া, হাতের ঝুলিটি ললাটস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "ওঠো বাবা। তুমি একচক্ষু দিয়ে দেখে আমাকে যতখানি চিন্তে পেরেছ, এ সংসারের লোক দুই চক্ষুতে দেখেও তা পারে নি, তুমি আমার জমিদারি রক্ষে করতে পারবে। তোমাকেই নায়েবীতে বহাল করা গেল।"

৩

সেই দিনই জহরলাল নাগ দেওয়ানজীর জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবের পদে নিযুক্ত হইল। সে অল্পদিনেই দেওয়ান-গিন্নীর মহালের সুবন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল। রথ, ঝুলন, দুর্গোৎসব, কালীপূজা, কার্তিকপূজা, রাস প্রভৃতি পার্বণগুলি বেশ সমারোহেই সুসম্পন্ন হইতে লাগিল। বিদ্রোহী প্রজারাও তাহার বশ্যতা স্বীকার করিল।

কিছু দিন পরে দেওয়ান-গিন্নী নায়েবকে বলিলেন, "দেখ বাবা, কাল রাত্তিরে রাধামাধব স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়ে বড়ো রাগ করছিলেন। তিনি বললেন, 'বেটী, তুই আমার জমিদারি ভোগ করছিস, আর আমাকে একখান পচা ঘরে ফেলে রেখেছিস। তোর লজ্জা হয় না? তিন মাসের মধ্যে মন্দির গড়িয়ে দে, আমি মন্দিরে বাস করব।' তুমি বাবা রাজমিস্ত্রী ডাকিয়ে বাইরের উঠোনে আমার রাধামাধবের মন্দির তৈয়েরী করিয়ে দাও।"

নায়েব মাথা চুলকাইয়া বলিল, "তাই ত মা। মন্দির গড়তে যে বিস্তর ইটের দরকার; সে দিন

মহামায়ার পুজোয় মবলগ টাকা খরচ করতে হয়েছে, তবিলে টাকা নেই, ইটের জোগাড় করি কি দিয়ে?"

দেওয়ান-গিন্নী বলিলেন, "ধার-কর্জ ক'রে কাজ আরম্ভ কর, পরে কোনো রকমে দেনা শোধ ক'রো। রাধামাধবের হুকুম ত আর অমান্যি করা যায় না।"

নায়েব বলিল, "বেশ তাই করা যাক। রাধামাধবের হুকুম, তাঁর দেনা তিনিই শোধ করবেন।"

গ্রামের একজন জমিদার—ভজহরি ঘোষাল একটি বৈঠকখানা নির্মাণের জন্য লাখখানেক ইট প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি সেই সংকল্প ত্যাগ করেন। ইটের পাঁজা অব্যবহার্য অবস্থায় দীর্ঘকাল পড়িয়া ছিল এবং তাহার উপর কতকগুলো লাল ভেরেণ্ডা ও কালকাসিন্দে গাছ জন্মিয়া একদল শৃগালকে আশ্রয় দান করিতেছিল। রাধামাধবের মন্দিরের জন্য এই ইট ক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইল। ধর্মপ্রাণ জমিদার বিনা লাভেই রাধামাধবের জন্য ইষ্টক বিক্রয়ে সম্মত হইলেন। দেওয়ান-গিন্নীর বাড়িতে প্রত্যহ তিন গাড়ি ও নায়েবের বাড়িতে পাঁচ গাড়ি ইট পড়িতে লাগিল। নায়েব খড়ের বাড়িতে বাস করিত, এত দিন পরে রাধামাধব তাহাকে ইষ্টকালয় নির্মাণের সুযোগ দান করিলেন। মন্দিব-নির্মাণ-খরচের খাতায় উভয় স্থানের ইট জমা হইতে লাগিল। পদা গাঁড়াল ও অনন্ত অধিকারী বখরায় বঞ্চিত হইয়া নায়েবের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করিতেই নায়েব তাহাদিগকে বলিল, "একটা গোলমাল বাধিয়ে দেবতার কাজটি নষ্ট ক'রো না, ভাই; ইটগুলো 'পড়তা-দবে' আট টাকা হাজার পাওয়া গিয়াছে, এখন ইটের বাজার-দর বারো টাকা। বাজার দরেই জমাখরচ করবে, হাজার-করা ঐ চার টাকা তোমবা বখরা কবে নিও।" সুতরাং গৃহ-বিচ্ছেদের আর কোনো কারণ রহিল না।

রাধামাধবের মন্দির-নির্মাণ এবং নায়েবের গৃহ-নির্মাণ একসঙ্গেই আরম্ভ হইল। কিন্তু দ্বার, জানালা, কড়ি-বরগা প্রভৃতি সংগ্রহ কবিতে না পাবিযা নায়েব কিঞ্চিৎ বিপন্ন হইল, তবে রাধামাধবের অনুগ্রহে তাহার অগাধ বিশ্বাস, সে হতাশ হইল না। অবশেষে সুযোগ বুঝিযা একদিন সে কর্ত্রীকে "যুড়ি দুই পাণি" নিবেদন কবিল, "রাধামাধবের কৃপায় মাথা রাখবার জন্যে একখান ছোটোখাটো ইমারৎ আরম্ভ করেছি, কিন্তু দুয়োর-জানালার অভাবে ঘরখানা শেষ করতে পারছিনে। সে দিন কাঁঠালবাগানের জঙ্গল কাটাতে গিয়ে দেখলাম, গোটা দুতিন কাঁঠালগাছ শুকিয়ে গিয়েছে, আপনার হুকুম পেলে সেই গাছ ক'টা কাটিয়ে খানকতক দুয়োব-জানালা বরগা-টরগা করি। এ জন্যে যদি কিছু প্রণামী দিতে হয়, তাতেও রাজি আছি। দেবতার জিনিস, 'মাঙনা' নেওয়া উচিত হবে না, আর তা'তে পাঁচজন দশ কথা বল্‌তেও পারে কি না।"

দেওয়ান-গিন্নী বলিলেন, "বেশ তো শুকনো কাঁঠালগাছ ক'টা কাটিয়ে নাও; বাধামাধবের ভোগের জন্য পাঁচটা টাকা দিও, তাহ'লেই দোষটুকু কেটে যাবে।"

দুই সপ্তাহের মধ্যে নায়েবের বাড়ির আঙিনায় ছয় সাত হাত বেড়ের পাঁচটি কাঁঠালের গুঁড়ি আসিয়া পড়িল। তাহার আগাগোড়া কাঁচা সোনার মতো সার। গোকুল মিস্ত্রী (ছুতোর) সেই কাঠ দেখিয়া অতি কষ্টে লালা সংবরণ করিয়া বলিল, "নায়েব মোশাই, দেওয়ানজীর বাগান থেকে কি জবর জবর হেতেরই কাটিয়ছ। এক একটা গুঁড়ি আমি তিন কুড়ি টাকায় কিনতে পারি।" নায়েব মোটা মোটা ডালগুলি চৌকাঠ-বরগার জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট কাঠ জ্বালানি কাঠের দরে তুষ্টু সেখকে ষাট টাকায় বিক্রয় করিল। তুষ্ট জ্বালানি কাঠের গাড়ি গ্রামস্থ গৃহস্থগণের নিকট আড়াই টাকা হার মুল্যে বিক্রয় করিয়া নায়েবকে ষাট টাকা দিল ও স্বয়ং ত্রিশ টাকা লাভ করিল। রাধামাধব নায়েবের কপাট, চৌকাঠ, কড়ি-ববগার কাঠ জোগাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, করাতী ও ছুতোর মিস্ত্রীর খরচ পর্যন্ত সংগ্রহ করিয়া দিলেন।

কিন্তু ভজহরি ঘোষালের ইট কিনিয়া দেওয়ান-গিন্নী বিপন্ন হইয়া উঠিলেন। ভজহরি পুনঃ পুনঃ

তাগিদ দিয়া টাকা আদায় করিতে পারিলেন না; তখন দেওয়ান-গিন্নীকে তিনি উকিলের চিঠি দিলেন।

নিরুপায় হইয়া নায়েব জহরলাল ভজহরি ঘোষালের সহিত সাক্ষাৎ করিল, কিন্তু নগদ টাকার কোনো ব্যবস্থা করিতে পারিল না। দেওয়ানজী বহু দিন পূর্বে চারি পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে গ্রামের বাহিরে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। দেওয়ানজী এই পুষ্করিণীর জন্য যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিতেন; তাহার জল নির্মল ও গভীর ছিল, এ জন্য তিনি যখন-তখন বলিতেন "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।" তিনি যে পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন, এই পুষ্করিণীটিই তাহার অব্যর্থ প্রমাণ। এই পুষ্করিণীটির প্রতি অনেক দিন হইতেই ঘোষাল মহাশয়ের লোভ ছিল। তিনি নায়েবের নিকট প্রস্তাব করিলেন, এই পুষ্করিণীটি পাইলেই তিনি ইটের মূল্যের দাবী ত্যাগ করিবেন।

নায়েব আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, "বলেন কি ঘোষাল মশায়! আপনার ষাট আর ত্রিশ এই নব্বুই হাজার ইটের দামের বদলে পাঁচ হাজার টাকার অত বড়ো একটা পুকুর—দীঘি বল্‌লেই চলে, আপনাকে বিক্রী কোবলা লেখাপড়া ক'রে দিতে হবে? বিশেষতঃ এ রাধামাধবের সম্পত্তি; কর্ত্রী শুন্‌লে কি বলবেন?"

ঘোষাল বলিলেন, "কিছুই বল্‌বেন না, কারণ, তাঁর টাকা দেওয়ার শক্তি নেই, আর ঐ পুকুরেরও অন্য কোনো খদ্দের নেই। রাধামাধবের মন্দির, আর তাঁর মুখ্য সেবাইৎ—'দেওয়ান-ইন-চার্জের' 'গ্রেহ' নির্মাণের জন্য যে নব্বুই হাজার ইট খরিদ হয়েছে, তার দেনাটা ঠাকুরের জলীয় সম্পত্তি বিক্রয় ক'রে পরিশোধ করলে গিন্নী দুঃখও করবেন না, রাগও করবেন না।"

নায়েব বলিল,"কিন্তু আমার ত একটা দায়িত্ব আছে। সম্পত্তির মূল্য যে চার পাঁচ হাজার টাকা।"

ঘোষাল বলিলেন,"তা বটে, কিন্তু পেটে খেলে পিটে সয়। না হয়, রাধামাধবের প্রণামী ব'লে আরও একশ' এক টাকা নিও।"

নায়েব বলিল, "আজ্ঞে এ যে পুকুর চুরি। একশ' টাকার কর্ম নয়। পাঁচশ' টাকার কম আমি এ 'প্রেস্তাব' মুখেই আনতে পারব না।"

"অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"—বৈষয়িক কার্যে মহাপণ্ডিত জহরলাল অবশেষে আড়াই শ' টাকায় রাজি হইয়া মনিববাড়ি ফিরিয়া আসিল।

৪

নায়েবকে হাসিমুখে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া দেওয়ান-গিন্নী মালা ঘুরাইয়া বলিলেন, "কোনো সুবিদেটুবিদে করে আস্‌তে পারলে? ঘোষাল মিন্‌সে কি বল্‌লে?"

দেওয়ান-গিন্নীর মুখখানি একে তো কালি-পড়া তোলো হাঁড়ির মতো কৃষ্ণবর্ণ, গোল ও গম্ভীর; তাহার উপর প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে তাঁহার মুখে সজারুর ছোটো ছোটো কাঁটার মতো কতকগুলি গোঁফ গজাইয়াছিল। সেই মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিবার সময় নায়েবের বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিত; কিন্তু সেদিন তাহার দৌত্য সফল হইয়াছিল, এইজন্য সে নিঃশঙ্কচিত্তে বলিল, "শাস্তর কি মিথ্যে হবার যো আছে, মা। শাস্তরেই ত আছে— 'জয়স্তে পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দনঃ' একে আপনার মতো সাক্ষেৎ অন্নপুন্নোর আশীর্বাদ, আর তার ওপর শ্রীরাধামাধবজীর কাজ; সে কাজ কি পণ্ড হয়? ঘোষাল ত' নালিশ করতে উদ্যত, আর্জি পর্যন্ত লেখা শেষ; সোমবারেই তা আদালতে দাখিল করতো। আমি তার হাতে পায়ে ধ'রে এক রকম আপোষ ক'রে এসেছি, কেবল আপনার হুকুমের প্রতীক্ষে।"

গিন্নী বলিলেন, "বটে? কি সর্তে আপোষ করলে?"

নায়েব বলিল, "ঐ যে ছুঁচোমারির মাঠে আমাদের একটা এঁদো পুকুর আছে, টোপা-পানায়

আর শ্যাওলায় পুকুরের জল চোখে দেখবার যো নেই, আবার জলেরই বা কি 'সৈরভ', মুখে দিলে অন্নোপেরাশনের ভাত পর্যন্ত উঠে যায়। পুকুরে কর্তার আমলের দু'পাঁচটা মাছ ছিল শুনেছি, কিন্তু ঢেঁকির মতো সাতটা কুমীর সেই পুকুরে বাসা নিয়েছে, মাছগুলো তারাই সেবা করছে। সেই পুকুরটা ঘোষালকে বিক্রী-কবলা ক'রে দিয়ে, ইটের দেনা পরিশোধের 'প্রস্তাবে' তাকে রাজি ক'রে এসেছি। শুধু কি তাই? রাধামাধবজীকে সে পঞ্চাশ টাকা প্রণামী দিতেও রাজি হয়েছে। এত সহজে কার্য-সিদ্ধি হবে—সে আশা ছিল না; কিন্তু শ্রীরাধামাধবজীর ইচ্ছেয় কি না হয়?" (উদ্দেশে প্রণাম)।

গিন্নী খুশি হইয়া বলিলেন, "বেশ ভালোই করেছ। কোবলা রেজেষ্ট্রীর খরচটা কিন্তু ঘোষালের কাছেই আদায় করা চাই।"

দেওয়ান-গিন্নীর মেজাজ ভালো আছে বুঝিযা নায়েব মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "এ হাঙ্গামাটা ত কোনো রকমে চুকলো, কিন্তু ওদিকে যে আর এক বিপদ্ উপস্থিত। লাটের খাজনা দাখিলেব সময় হয়েছে, অথচ তবিলে টাকা নেই; মহালের তৌশীলদার বেটারা লিখেছে— এবার কোনো প্রজা ধান পায়নি, চোতেলী ফসল উঠবার আগে তারা একটি পয়সাও দিতে পারবে না। আমি বলি কি—বাজারের পাশে আমাদেব যে দৌড়ঘরটা পড়ে আছে, কর্তার আমলে দোলে, রথে, 'পুজো পাব্বণে' যাত্রাওযালাদের সেই ঘবে বাসা দেওযা হ'তো। মেরামতের অভাবে ঘরখানা ভেঙে প'ড়েছে, সাপ, ছুঁচো আর চামচিকেব আড্ডা হযেছে; ভাঙা ইমারত, মবলক টাকা খরচ ক'রে মেবামত কবিয়েই বা ফল কি? ঐ সাপেব পুবী কেউ ভাড়া নিতে চায় না। একদিন দুয়োর খুলে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে, ওরে বাপ রে। সাপের কি ফোঁসফোসানি! পালিয়ে এসে বাঁচি। তা বাজারের ঐ কেঁয়ে বেটা,—সাগবমল হনুমানজী—ঐ ঘবখানা পাটের গুদাম করবার জন্যে কিনতে চায়; সে ছ'শো টাকা দর বলেছে। পাগলের মতো কথা!— আমি বলেছি—'হাজাব রূপেয়াব এক আধেলা কম্‌তি হোগা নেই।' বেটার ভাবি গরজ, ঠিক ঐ টাকাতেই রাজি হবে।' ঐ ঘরখানা বিক্রি করলে এবারকাব লাটের হাঙ্গামা চুকিয়ে দিযেও তবিলে কিছু জমে, —তা আপনাব মত না জেনে ত সেই মেড়ো বেটাকে কথা দিতে পারছি নে।"

গিন্নী বলিলেন, "হাজার টাকার ওপরে উঠবে না?"

নায়েব বলিল, "রাধামাধব। ঘরের যে অবস্থা, পাঁচ ছ শো টাকার বেশি দিযে কেউ কিনতো না। গরজে পড়ে মেড়োটা কিছু বেশি দিতেই বাজি হবে। কিন্তু হাজাব টাকার ওপরে উঠবে না।"

গিন্নী বলিলেন, "টাকার দরকার, ভাঙা ঘরের মায়া ক'রে আর কি হবে? হাজার টাকাতেই বাজি হ'যো।"

নায়েবের মনে হইল, "সেদিন সে শিয়াল বাঁ হাতি" করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছিল। সাগরমল হনুমানজী নগদ দেড়হাজাব টাকার সেই অট্টালিকা ক্রয করিতে সম্মত হইল। কিন্তু জহরলালের সহিত বন্দোবস্ত হইল—দলিলে হাজার টাকার উল্লেখ থাকিবে। অবশিষ্ট পাঁচ শত টাকা সে "মফস্বলে" লইবে।

পুষ্করিণী ও 'ইমারত' বিক্রয় করিয়া একমাসে কাণা নায়েবের সাত শত টাকা উপরি আদায় হইল। সে ভাবিল রাধামাধবের দয়ায় তাহার ধুলামুঠা সোনামুঠা হইতেছে।

এই সকল ঘটনার কিছুদিন পরে মুন্সেফী আদালত হইতে দেওয়ান-গিন্নীর নামে এক নিমন্ত্রণপত্র আসিয়া হাজির। তিনি নায়েবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে কি বাবদ নালিশ রুজু করেছে, নায়েব?"

কানা চশমার ভিতর দিয়া এক চক্ষুতে বাদীর আর্জির নকলখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বলিল, "এ একটা উঁড়ো ফ্যাসাদ। আনন্দনগরের মাঠে আমাদের সত্তর আশি বিঘে খড়ের জমি আছে,

কর্তা ওয়াষ্টিন কোম্পানীর কাছে ওটা বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছিলেন; বছরে যে টাকা খাজনা দিতে হয়, খড় বিক্রি ক'রে তার অর্ধেক টাকাও ওঠে না। বছর বছর কেবল লোকসান দিয়ে আসতে হচ্ছে। বাকি খাজনা বাবদ সাহেব কোম্পানি ১৬৫।।/১৭।।০ টাকার দাবীতে নালিশ রুজু করেছে। আমি বলি কি, ও লোকসানী জমা রেখে দরকার নেই। ওটা একতরফা নীলাম হয়ে যাক, আমাদেরও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ুক।"

দেওয়ান-গিন্নী বলিলেন, "বছর বছর লোকসান দিযে ও খড়ের জমি রাখবার দরকার দেখিনে। খাজনার টাকা আমি ঘর থেকে দিচ্ছিনে, কিন্তু কম টাকায নীলেম হ'লে আমাকে আবার বাকী টাকার জন্য দায়িক হ'তে হবে না ত?"

নায়েব মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে আমি দেখে নেব। নীলেমে বাকী খাজনার টাকা উঠ্‌বে। খড়ের জমি কি না, ওর ওপর অনেকেরই 'ঠোক' আছে।"

যথাসময়ে খড়েব জমি নীলাম হইল। জহরলাল তাহার পুত্র পান্নালালের বেনামীতে দুই শত টাকায় নীলাম ডাকিয়া লইল। এই জমির খড় কোনো বৎসর সাত শত, কোনো বৎসব আট শত টাকায় বিক্রয় হইত। কিন্তু কানা নায়েব খাতাপত্রে ক্রমাগত লোকসান দেখাইয়া আসিয়াছে। বার্ষিক গড়ে ছয় শত টাকা আয়ের সম্পত্তি নামমাত্র মূল্যে তাহার হস্তগত হইল। রাধামাধবেব প্রতি তাহার ভক্তিও ক্রমে দুই কূল ছাপাইয়া উঠিল।

৫

কিন্তু এত বড়ো একটা কাণ্ডও দেওয়ান-গিন্নীর গোমস্তা পদা গাঁড়াল ও মুহুবী অনন্ত অধিকাবীব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিবে—তাহার সম্ভাবনা কোথায়? তাহারা এক দিন মুখ ভার করিযা কানা নায়েবকে বলিল, "দাদা, সেই কালেই বলেছিলাম, শেষ রক্ষে করতে পারবে না। আমবা দু'জনে চার চক্ষুতে যা দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, তুমি এক চক্ষুতে তা দিব্যি দেখতে পাচ্ছ, আব দুই হাতে কুড়িয়ে নিয়ে কোঁচড়ে গুঁজছো, এ কি ভালো হচ্ছে? আমরা শালাবা কি বানের জলে ভেসে এসেছি! পূজোপাব্বণগুলো ত আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। একটি উপবি পয়সার মুখ দেখবার যো নেই; আর তুমি ষোলো আনার উপর আঠার আনা পুষিয়ে নিচ্ছো। বেশ, আমবাও দেখে নেব।"

কানা নায়েবের একটু ভয় হইল। সে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ ভাই, তোমাদের কথা কি আমি ভুলতে পারি? এ ত মুলোর ক্ষেত নয়, বেগুনের ক্ষেত, হপ্তায় হপ্তায় তোমাদের হাতেও কিছু কিছু যাতে আসে, আমি তার ব্যবস্থা না ক'রেই কি চুপ ক'রে ব'সে আছি?"

পদা গাঁড়াল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ব্যবস্থাটা কি শুনি!"

অতঃপর দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহাদের পরামর্শ চলিল; পরামর্শ শেষ হইলে পদা ও অনন্ত উভয়েই উৎফুল্ল হইল।

পরদিন প্রভাতে নায়েব দেওয়ান-গিন্নীর চরণবন্দনা করিয়া বলিল, "কাল বাত্তিরে বড়োই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি! সে কথা মনে হওয়ায় সর্বশরীরে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে। কাল চার প্রহব রাত্তিরে রাম, শিব, লক্ষ্মী, কালী—এই চারজন দেবদেবী স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়ে বল্লেন, 'দেওয়ান-গিন্নী পূর্বজন্মের তপিস্যের জোরে ভক্তিডোরে আমাদের বেঁধে রেখেছে। কিন্তু এ জন্মে সে রাধামাধবের পূজোআর্চা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, বিস্তর টাকা খরচ ক'রে সে রাধামাধবের মন্দির 'পিত্তিষ্টে' করল। কিন্তু আমরা যে তার ভক্তিডোরে বাঁধা আছি, সে কথা সে ভুলে গিয়েছে! কথাটা কালই তাকে স্মরণ করিয়ে দিবি। সে হয়ত তোর কথা বিশ্বেস করবে না; কিন্তু আমরা প্রতি মঙ্গলবার রাত্রিকালে

তাকে দেখা দিয়ে তার মনস্কামনা পূর্ণ করব। তোরাও সেখানে উপস্থিত থাকিস; আর আমাদের ভোগের আয়োজন ক'রে রাখতে বলিস।' মা, কাল মঙ্গলবার। কাল থেকেই আপনার উপর দেবতাদের ভর হবে।"

দেওয়ান-গিন্নী রোমাঞ্চ-দেহে এই অদ্ভুত স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া গদ্গদ স্বরে বলিলেন, "বাঁধা পড়েছে! তাই ত বলি, আমার এত দিনের তপিস্যে কি বৃথা হবে? বাবা জহর, দেবদেবীরা আসবেন, তাঁদের ভোগেব আয়োজনে যেন ত্রুটি না হয়। ক্ষীর, ছানা, লুচি-সন্দেশের, নানারকম ফলফুলারীর জোগাড় করবে। টাকার জন্যে ভেব না, টাকার অভাব হয়, আমার ছোটো বাগানখানা বিক্রি করবে।"

পরদিন রাত্রিকালে দেওয়ান-গিন্নীর শয়নকক্ষে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিল; প্রকাণ্ড ধুনুচিতে ধূপ জ্বলিয়া ঘর অন্ধকার করিয়া তুলিল; বিভিন্ন পাত্রে ভোগের উপকরণ সজ্জিত হইল; কোনও পাত্রে ক্ষীব, কোনও পাত্রে ছানা, গোল্লা, রসগোল্লা, গাওয়া ঘিয়ে ভাজা রাশি রাশি ফুলকো লুচি। আয়োজন দেখিয়া পদা গাঁড়াল ও অনন্ত অধিকারীর লালা সংবরণ করা দুরূহ হইয়া উঠিল।

পদা গাঁড়াল দ্বারপ্রান্তে বসিযা মন্দিরা বাজাইতে লাগিল, অনন্ত অধিকাবী একখানি আসনে বসিয়া বিড় বিড় করিয়া নবদূর্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্রের স্তব আবৃত্তি করিতে লাগিল, তাহা রামের স্তব কি ষষ্ঠীপূজাব মন্ত্র, তাহা কাহারও বুঝিবার উপায় ছিল না। দেওয়ান-গিন্নী একখানি কুশাসনে বসিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিতে লাগিলেন, "এসো রাম, সীতাপতি রামচন্দ্রব এসো। একবাব দেখা দাও, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কব। তুমি গুহক চণ্ডালকে কোল দিয়েছ, পাষাণী অহল্যাকে উদ্ধার করেছ; বাঞ্ছাকল্পতরু। একবার তোমার দাসীকে দেখা দাও।" গিন্নীর আকুল কণ্ঠের প্রার্থনায় সেই কক্ষ পূর্ণ হইল।

দপ করিয়া একটা নীল রঙের দিয়াশলাই জ্বলিয়া উঠিল, তাহা নির্বাপিত হইবামাত্র সেই ধূমপূর্ণ কক্ষে জটাবল্কলধারী রামচন্দ্রেব আবির্ভাব হইল। নূপুরের শব্দে দেওয়ান-গিন্নী বুঝিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে। রাম দেখা দিতে আসিয়াছেন।

"এসেছিস্ বাপ! আয়, একবার কোলে আয়, আমাব তাপিত প্রাণ শীতল কব্।" কানা নায়েবই রাম সাজিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। গিন্নীর এই আকুল আহ্বানে সে তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাব কোলের উপব বাখারির ধনুক ও কঞ্চির বাণটি নিক্ষেপ করিল। দেওয়ান-গিন্নী তাহা মস্তকে স্পর্শ করিলেন; কিন্তু ধূমান্ধকাবপূর্ণ কক্ষে দৃষ্টির ক্ষীণতা বশতঃ একটা আবছায়া ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

রামচন্দ্র অদৃশ্য হইলে পদা গাঁড়াল মন্দিরা ফেলিয়া উঠিয়া গেল। দেওয়ান-গিন্নী এবার 'বাবা ভবতারণ! বাবা হরিতাবণ।' বলিয়া শিবকে আহ্বান করিলেন। কয়েক মিনিট পরে পদা গাঁড়াল মুখে দাড়ি-গোঁফ ও মাথায় সুদীর্ঘ জটা বাঁধিয়া, নূপুরধ্বনি করিতে করিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। অনন্ত অধিকারী 'জয় শিব শম্ভু! বোম্ বোম্ মহাদেব' শব্দে শিবের অভ্যর্থনা করিয়া দেওয়ান-গিন্নীকে বলিল, "মা তোমার ভবতারণ এসেছেন।" তৎক্ষণাৎ শিবের জটা চাবুকের মতো গিন্নীর হাতে পড়িল। গিন্নী জটা টিপিতে লাগিলেন, জটা হইতে বিন্দু বিন্দু জল ঝরিতে লাগিল। পতিতপাবনী গঙ্গা জটায় লুকাইয়া আছেন, মনে করিয়া দেওয়ান-গিন্নী জটানিংড়ানো জল ভক্তিভরে মাথায় লইলেন।

শিবের অন্তর্ধানের পর অনন্ত অধিকারী লক্ষ্মীর স্তব আরম্ভ করিল। দেওয়ান-গিন্নী ব্যাকুল স্বরে লক্ষ্মীকে ডাকিতে লাগিলেন। অনন্ত অধিকারী দেওয়ান-গিন্নীর প্রতিবেশী, একটি প্রাচীরমাত্র ব্যবধান। অনন্তের স্ত্রী গুঞ্জমালা কক্ষান্তরে অপেক্ষা করিতেছিল; সে নূপুর বাজাইয়া দেওয়ান-গিন্নীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং তাঁহার ন্যাড়া মাথায় হাত বুলাইয়া, এক গোছা ধানের শিষ তাঁহার

মুখে বুলাইয়া দিল। তাহার পর বিকৃত স্বরে বলিল, "তোর ভক্তিতে আমি চিরদিন তোর ঘরে বাঁধা আছি মা।" মুহূর্তমধ্যে 'লক্ষ্মী' অদৃশ্য হইলেন।

অতঃপর অনন্ত অধিকারী কালীর স্তব আরম্ভ করিল। দেওয়ান-গিন্নী "কোথায় মা কালী। এসো মা কালী। তোমার দাসীকে দেখা দাও" বলিয়া কালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। পদা গাঁড়ালের ভগিনী সুনন্দাও যথাসময়ে আসিয়া অন্য কক্ষে বসিয়াছিল। সে এলোচুলে, গলায় মাটির মুণ্ডমালা পরিয়া, আধ হাত জিহ্বা বাহির করিয়া দেওয়ান-গিন্নীর সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং তাহার হাতের খাঁড়া তাঁহার কোলে রাখিল। খাঁড়ার খানিক 'খুনখারাপি' রং মাখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। দপ্ করিয়া লাল দেশলাই জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোকে দেওয়ান-গিন্নী এক চক্ষুতে মা কালীর নৃমুণ্ডমালিনী মূর্তি মুহূর্তের জন্য নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি খাঁড়ায় হাত দিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ কি, খাঁড়া ভিজে কেন?"

অনন্ত অধিকারী বলিল, "ম্লেচ্ছদেশে যুদ্ধ চল্‌ছে কিনা। মা যবন বধ করছিলেন, আপনাব আহ্বানে আর স্থির থাক্‌তে না পেরে সেই খাঁড়া হাতে নিয়েই চলে এসেছেন। খাঁড়ায় সেই রক্তই লেগে আছে।"

দেওয়ান-গিন্নী সভয়ে বলিলেন, 'যবনেব রক্ত! তাজা রক্ত যে। নাঃ বেটি দেখছি এই রাত্তির কালে স্নান না করিয়ে ছাড়লে না।" তাঁহাকে দাসীরা স্নান কবাইযা দিল। তাহার পব প্রসাদ বিতবণ আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য, প্রসাদের অধিকাংশ পদা গাঁড়াল, অনন্ত অধিকারী ও কানা নাযেব বাড়ি লইয়া গেল। প্রতি মঙ্গলবার রাত্রিতে দেওয়ান-গিন্নীর উপর দেবতাদেব ভর হইতে লাগিল। ভোগরাগের আয়োজনে সেই রাত্রিতে পনের ষোল টাকা ব্যয় হইতে লাগিল বটে, কিন্তু অর্থাভাব হইল না। দেওয়ান-গিন্নী আম-কাঁঠালের ৪০ বিঘার বাগান পাঁচ শত টাকায বিক্রয় করিলেন। কানা নায়েব তাহা তাহার রক্ষিতা এবং দেওয়ান-গিন্নীর পরিচারিকা খুদী ঘোযানীর বেনামীতে কিনিযা লইল। সেই বাগানের মূল্য হাজার টাকারও অধিক।

৬

পল্লীগ্রামে কাহারও সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল হইলে দরিদ্র আত্মীয় প্রতিবেশীরা তাহাব মুখাপেক্ষী হয়, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দেওয়ান-গিন্নীরও মুখাপেক্ষিণী সধবা বিধবা প্রতিবেশীনির অভাব ছিল না। দেওয়ান-গিন্নীর উপর দেবতার ভর হইয়াছে শুনিয়া প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর তাঁহার গৃহে আট দশটি প্রতিবেশীনির সমাগম হইতে লাগিল। দেওয়ান-গিন্নী কি ভাবে প্রতারিত হইতেছেন, তাহা তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না; কিন্তু প্রসাদের লোভে ও স্বার্থের অনুরোধে কেহই এই প্রতারণাপূর্ণ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিল না। সকলেই তাঁহাকে ভাগ্যবতী পুণ্যবতী তপস্বিনী বলিয়া তাঁহার গুণকীর্তন করিতে লাগিল।

দেওয়ান-গিন্নীর কুল-পুরোহিত 'বিশু চাটুয্যে' অর্থাৎ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধর্মনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। শিব আছেন, কালী আছেন, লক্ষ্মী আছেন, তাঁহাদের আবাহনের জন্য অনন্ত অধিকারী মন্ত্র পাঠ করে, আর কি না কুলপুরোহিত মহাশয় তাঁহার ভাগ্যবতী পুণ্যবতী যজমানটির অসাধারণ সৌভাগ্য ও পুণ্যপ্রভাবের পরিচয় পাইলেন না। ইহা ভাবিয়া দেওয়ান-গিন্নীর মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। পুরোহিত মহাশয় এক মঙ্গলবার নিশাকালে দেওয়ান-গিন্নীর গৃহে আহূত হইলেন।

পুরোহিত সকলই প্রত্যক্ষ করিলেন, এবং কানা নায়েব, মূর্খ গোমস্তা ও প্রতারক মুহুরী ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার যজমানটিকে 'জেরবার' করিতে উদ্যত হইয়াছে অথচ এই হুজুগে পূজাপার্বণাদি হ্রাস হওয়ায় তাঁহার উপার্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং জহরলাল পদা ও অনন্তকে ডাকিয়া তিরস্কার করিলেন; বলিলেন, তাহাদের এই বুজরুকি 'ফাঁস'

করিয়া দিবেন, হাটে হাঁড়ি ভাঙিবেন। নায়েব ও গোমস্তা তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিল, "ঠাকুর মশায়, আপনি রাগ করবেন না, শীঘ্রই আপনার প্রাপ্তির ব্যবস্থা কচ্ছি।"—পুরোহিত মহাশয় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন, ক্রোধটাও তিনি তখনকার মতো মুলতুবী রাখিলেন।

দুই দিন পরে নায়েবের উপদেশে খুদী ঘোষানী এক পোয়া দধির সহিত অল্প হলুদ মিশাইয়া সেই পীতাভ তরল পদার্থ রাত্রিকালে গিন্নীর বিছানায় ঢালিয়া দিল।

দেওয়ান-গিন্নীর মস্তিষ্ক এতই বিকৃত হইয়াছিল যে, তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, শিশু যেমন রাত্রিকালে মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়, তাঁহার রাধামাধবও সেইরূপ রাত্রিকালে মন্দির ত্যাগ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করেন, এবং প্রত্যুষে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের পূর্বেই নিঃশব্দে উঠিয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন। তিনি নিদ্রাঘোরে কোনো কোনো দিন রাধামাধবের নূপুরধ্বনি শুনিতে পান। সুতরাং পরদিন প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গে তিনি তাঁহার শয্যায় সেই হরিদ্রাভ দ্রব পদার্থ লিপ্ত দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার রাধামাধবের আমাশয় হয়েছে, বিছানা নষ্ট ক'রে গিয়েছে, এখন উপায়?"

পদা গাঁড়াল বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল, "এ ত ভারি মুশকিলের কথা হ'ল! আমাদের চিন্তাহরণ ডাক্তারকেই ডাকি, না ভগবতীচরণ কবরেজ মশায়কে খবর দিই?"

কানা নায়েব বলিল, "এ কি তোমার আমার আমাশা যে, ডাক্তার কবরেজের ওষুধে আরাম হবে? এ দেবতার রোগ—দৈবকার্য করতে হবে। চাটুয্যে মশায়কে খবর দাও—তিনি শান্তিকার্য করুন।"

পুরোহিত বিশু চাটুয্যে মহাশয় তালপাতের পুঁথি হাতে দর্শনদান করিলেন। ঘন্টাখানেক ধরিয়া তিনি পুঁথির পাতা উল্‌টাইয়া বলিলেন, "শান্তিপ্রকরণে দেবতার আমাশয়াদি রোগের ঔষধের ব্যবস্থা আছে। শান্তিক্রিয়া অবশ্য কর্তব্য। এ জন্য রাধামাধবের মুরলীর অনুরূপ একটি সোনার মুরলীর প্রয়োজন। দুই ভরি সোনাতেই ঐরূপ মুরলী প্রস্তুত হইবে।"

তাহাই হইল। সেইরূপ সোনার বাঁশি নির্মিত হইল, পুরোহিত মহাশয় তদ্দ্বারা শান্তি-কর্ম শেষ করিলেন। দুই ভরি স্বর্ণ ও শান্তি-কর্মের বিবিধ উপকরণ হস্তগত হওয়ায়, রাধামাধবের আমাশয়ের ও পুরোহিতের ক্রোধের শান্তি হইল; তাহার পর তিনিও দলে ভিড়িলেন।

কয়েকদিন পরে গভীর রাত্রিরে দেওয়ান-গিন্নীর হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি শয্যা হাতড়াইয়া রাধামাধবকে পাইলেন না, "রাধামাধব, রাধামাধব। বাবা, কোথায় তুমি।" বলিয়া আর্তনাদ করিলেন।

পদা গাঁড়াল পাশের ঘরে শয়ন করিত; সে উঠিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া বিকৃতস্বরে বলিল, "যা বেটী। তোর আর ভালোবাসা জানাতে হবে না। আমি শীতে থর্ থর্ কাঁপছি, তোর ঘরে বাক্স বোঝাই শাল-আলোয়ান। কোনো দিন একখানা গায়ে দিতে দিয়েছিস?"

দেওয়ান-গিন্নীর বড়োই অনুতাপ হইল। পরদিন প্রভাতে তিনি খুদী ঘোষানীকে চাবি দিয়া বাক্স খুলাইলেন এবং তাঁহার স্বামীর ক্রীত একখানি অব্যবহৃত মূল্যবান্ কাশ্মীরী শাল বাহির করিয়া রাধামাধবের ব্যবহারের জন্য পদা গাঁড়ালের হাতে দিলেন।

পদা সুযোগ বুঝিয়া তাহা বাড়ি লইয়া গেল। সেই শাল ব্যবহার করিলে তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে বুঝিয়া, এক দিন সে তাহা গোপনে 'বিক্রমপুর' প্রেরণ করিল। কিন্তু কানা নায়েবের মুখ চুলকাইতে লাগিল।

৭

আর একটু বাকি আছে। শারদীয়া উৎসবের সময় সরস উপসংহারটুকু বাদ দিয়া রসভঙ্গ করিব না।

আশ্বিন মাস আসিল। দেওয়ান-গিন্নী প্রতি বৎসর মহামায়াকে মহাসমারোহে ঘরে আনেন; কিন্তু সে বার অর্থকষ্টে বিব্রত হইয়া তিনি সংকল্প করিলেন, দুর্গোৎসব বন্ধ রাখিয়া নির্দিষ্ট দিনে কেবল কুমারী পূজা করিবেন। অল্প ব্যয়েই তাহা সুসম্পন্ন হইবে।

তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া পুরোহিত চাটুয্যে মহাশয় মুখ ভার করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার চিরহিতৈষী নায়েব, গোমস্তা ও মুহুরীও প্রমাদ গণিল। মহামায়া ঘরে আসিলে, তাঁহার আশীর্বাদে বিলক্ষণ দশ টাকা ঘরে উঠিত; 'সে গুড়ে বালি' পড়িবার সম্ভাবনায় তাহারা ম্রিয়মাণ হইল। তাহার পর পুরোহিত মহাশয়ের সহিত বকুলতলায় দাঁড়াইয়া তাহাদের কি পরামর্শ হইল, বলিতে পারি না।

প্রতিমা-নির্মাতা মালাকরের নাম ফটিকচাঁদ। ফটিকচাঁদই প্রতি বৎসর দেওয়ান-গিন্নীর চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গা-প্রতিমা নির্মাণ করিত। সেবার দুর্গোৎসব হইবে না, কুমারী-প্রতিমা নির্মাণের জন্য সে মাটিতে জল ঢালিল।

মুহূর্ত পরেই ফটিক মালাকর আর্তনাদ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, সবেগে হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল, তাহার পর চিৎকার করিয়া বলিল, "মেরো না বাবা নন্দী। ভৃঙ্গী মশায, দোহাই তোমাব, আমাকে সিঙ্গী লেলিয়ে দিও না, ওরে বাবা, মস্ত দাঁত। মেরে ফেল্‌লে।"—সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছা।

ফটিকচাঁদকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া সকলে মহাকলবব আবম্ভ করিল। দেওয়ান-গিন্নী অন্দর হইতে সেই চিৎকার শুনিয়া, ব্যাপার কিঁ জানিতে চাহিলেন। তাঁহার আদেশে মূর্ছিত ফটিক অন্দরে নীত হইল। পদা ও অনন্ত তাহাকে ধরিয়া রহিল।

নায়েব ও গোমস্তার বহু চেষ্টায় ফটিকের মূর্ছাভঙ্গ হইল। দেওয়ান-গিন্নী তাহাব আর্তনাদ ও মূর্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে হাত-যোড় কবিয়া বলিল, "আমি কুমাবী-প্রতিমেব জন্যে মাটিতে জল ঢেলেছি,—আর অমনিই মা দুর্গা সিঙ্গীর পিঠে চেপে আমাব সামনে এসে দশ হাত নেড়ে বল্‌লেন—'কি, গিন্নীর এতো বড়ো আস্পর্ধা, আমার পূজো বন্ধ রেখে তার কুমাবীপূজোর সখ! নন্দী, লাগাও সাট; ভৃঙ্গী, ওকে ধ'বে আমার সিঙ্গীর মুখে ফেলে দাও';—বল্‌তে না বল্‌তে সিঙ্গীটা মুলোর মতো লম্বা দাঁতগুলো বের ক'বে—"কথা শেষ না কবিযা ফটিক আসন্ন-ম্যালেবিযার রোগীর মতো প্রচণ্ডবেগে কাঁপিতে লাগিল।

দেওয়ান-গিন্নী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া হাসিমুখে নায়েবকে বলিলেন, "জহর, বেটী আমার বাড়ি এবারও পূজো না খেয়ে ছাড়বে না, তা' বুঝলে ত?—কুমারীপূজো মুলতুবী থাক্; দুর্গোৎসবেরই আয়োজন কর। সকলকে ছেড়ে বেটি আমার কাঁধে ভর করেছে!"

নায়েব মাথা নাড়িয়া বলিল, "ধন্য আপনি! মহামায়ার এ অনুগ্রহ কি আর কারও ওপর হয়? অবিশ্বাসী, পাষণ্ড, নাস্তিক বেটারা তবু বলে গিন্নীমায়ের ওপর দেবতার ভরটর সব মিথ্যে! মিথ্যে কি সত্যি, তা একদিন তিনি জানিয়ে দেবেন।"

পূজার আয়োজন আরম্ভ হইল। নায়েব ষষ্ঠীর কয়েক দিন পূর্বে পূজার বাজাব করিতে কলিকাতায় যাত্রা করিল। ঘি, ময়দাও সে কলিকাতা হইতে সংগ্রহ করিল এবং এক টিন ঘিয়ের পরিবর্তে এক টিন তেল কিনিল। পাঠক-পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে—সেবার কুসুমবীজের তেল খাইয়া কলিকাতার অনেক লোক ভেদবমিতে মৃতকল্প হইয়াছিল। জহরলাল সস্তায় কিস্তী পাইয়া সেই তেল এক টিন কিনিয়াছিল। তৈলের ঐরূপ অসাধারণ গুণের কথা সে তখন জানিত না।

মহাষ্টমীর দিন দেওয়ান-গিন্নী গ্রামের বহু লোককে মহামায়ার প্রসাদ পাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কানা নায়েব ক্যানেস্তারার ঘিয়ের সঙ্গে সেই তেল সপরিমাণে মিশাইয়া তদ্দ্বারা লুচি ভাজাইল। ডাল, তরকারি, আলুর দম প্রভৃতিতেও সেই তৈল ব্যবহৃত হইল।

যথাসময়ে গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা মহামায়ার প্রসাদ পাইলেন; কিন্তু আহারান্তে কাহারও মুখ ধুইবারও তর সহিল না। অনেকে পথের ধারেই বমি করিতে বসিয়া গেল। বড়ো বড়ো উকিল, মোক্তার, ডাক্তার কাছা হাতে করিয়া বাড়ির দিকে দৌড়াইলেন; কিন্তু বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাইতে হইল না। চতুর্দিকে বমনের মিশ্রতান।

দেওয়ান-গিন্নী হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, "জহরলাল, এ কি ব্যাপার? এ যে বড়োই সর্বনেশে কাণ্ড!"

জহরলাল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া অচঞ্চল স্বরে বলিল, "কিছু না যে সকল অবিশ্বাসী নাস্তিক আপনার উপর দেবতার ভরের কথা অবিশ্বাস করে, মা মহামায়া তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন—দেবমহিমায় অবিশ্বাস করলে কি শাস্তি হয়!"

'বার্ষিক বসুমতী' ঃ ১৩৩৩

পা ড়া গেঁ য়ে

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আকাশ বাতাস ও আলোর প্রভাবে রমানাথের জীবন নিতান্ত সহজভাবে প্রকৃতির কোলে ফুটিয়া উঠিতেছিল। জন্মাবধি সে সহরের মুখ দেখে নাই। সহরের ইট-কাঠ-চূণ-সুরকীনির্মিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি, বৈদ্যুতিক গাড়ি, আলো পাখা, কলকারখানা—এ সকলের কথা সে অনেকবার শুনিয়াছিল, কিন্তু এগুলিকে রমানাথ বাস্তবরাজ্যের অন্তর্ভূত বলিয়া মনে করিতে পারিত না। শান্ত বনানীর অসংখ্য শাখাপবিবেষ্টিত, ছায়ালোকমণ্ডিত তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীর ও তাহার আশপাশই রমানাথের বাস্তবরাজ্যের একমাত্র পরিসীমানা ছিল। ইহার বাহিরে যে আর কিছু থাকিতে পাবে, রমানাথ তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারিত না। সে নির্জনে কোকিল, দোয়েল, পাপিয়ার কণ্ঠস্বরে স্বর মিলাইয়া শিস্ দিতে থাকিত, কোঁচড় ভরিয়া শিউলি, চাঁপা, রজনীগন্ধা ফুল তুলিয়া বেড়াইত, নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া সাঁতার কাটিয়া দিন কাটাইত।

রমানাথ আশৈশব পিতৃমাতৃহীন। রমানাথের এক বৃদ্ধা মাসী তাহাকে লালন-পালন করিতেছিলেন।

রমানাথের লেখাপড়া সামান্যই হইয়াছিল। গ্রামের এক প্রাচীন দোকানদারের নিকট সে প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, শিশুবোধ পর্যন্ত পড়িয়াছিল, এবং মাঝে মাঝে সুর করিয়া রামায়ণ পড়িয়া তাহার মাসীকে শুনাইত। অধিকাংশ সময়ই রমানাথ বাঁশঝাড়ের তলায় চঞ্চল রৌদ্রের খেলা দেখিত, মধ্যাহ্নে, উত্তপ্ত-বাতাসে, সুনির্মল আকাশের নীচে যে দু' একখানা মেঘ ভাসিয়া যাইত, তাহাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া ছুটাছুটি করিত,—অনেকদূরে যে গাছটা আর সব গাছগুলার মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়া তাহার উপরকার শাখাপ্রশাখা রৌদ্রে বিছাইয়া দিয়া শান্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহার দিকে হাঁ করিয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিত। সব চেয়ে রমানাথের গাছপালারই সখ্ ছিল;—ছোটো ছোটো গাছ পুঁতিয়া, মাটি খুঁড়িয়া, জল ঢালিয়া তাহাদের বড়ো করার মতো এমন আনন্দ সে আর কিছুতেই

পাইত না। তাহাদের ছোট্ট গ্রামখানির ভিতর এমন শতাধিক বৃক্ষ তাহারই যত্নে বর্ধিত হইয়াছিল।

রমানাথ এক দিন স্নান করিতে গিয়া দেখিল, তীরে একখানি নৌকা বাঁধা আছে। অনেকগুলি বালক জলে নামিয়া কোলাহল করিতেছে। কেহ জল ছুঁড়িতেছে, কেহ কাদা মাখিতেছে, কেহ বা তীরের কাছে হাত-পা ছুঁড়িয়া সাঁতার শিখিতেছে। নৌকার উপর বসিয়া একটি ভদ্রলোক তামাক খাইতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে ছেলেদের কাণ্ড দেখিয়া হাসিতেছিলেন।

হঠাৎ একটি বালক "গেলুম, বাবা রে গেলুম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে বেশী জলে গিয়া পড়িয়াছিল, অথচ ভালো সাঁতার জানিত না। নৌকার ভিতর হইতে স্ত্রীলোকেরা "ওগো, কি হ'ল গো", বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল, ভদ্রলোকটি "ধর, ধর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। রমানাথ মুহূর্তের মধ্যে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বালকটির কাছে গিয়া, তাহাকে টানিয়া তীরের কাছাকাছি লইয়া আসিল।

রমানাথের আদর আর ধরে না। মেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে নানারকম প্রশ্ন করিতে লাগিল। বালকের পিতা রমানাথকে কোলে করিয়া নৌকায় লইয়া আসিলেন, তাহার ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া দিয়া নূতন জামা কাপড় পরাইয়া দিলেন, তাহাকে বসাইয়া খাওয়াইলেন; রমানাথের মুখে তাহার পরিচয় পাইয়া বলিলেন, "তুমি বাবা, আজ থেকে আমাদের ছেলের মতো হ'লে। আমাদের সঙ্গে কলকাতায় চল। তোমার মাসীকেও আমরা নিয়ে যাব।"

ভদ্রলোকটি তখন রমানাথের মাসীকে ডাকাইয়া আনিয়া সব বলিলেন, নিজেরও পরিচয় দিলেন। তিনি কলিকাতায় এক সওদাগর-আফিসে বড়ো চাকরি করেন, নাম নগেন্দ্রনাথ রায়, জাতিতে বৈদ্য। পূজার ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছিলেন। ছুটি ফুরাইয়া গিয়াছে; স্ত্রীর শরীর ভালো নাই, তাই নৌকাপথে হাওয়া খাইতে খাইতে কলিকাতায় ফিরিতেছেন। তাঁহার ছেলেটি রমানাথের প্রায় সমবয়সী, দুইজনে একসঙ্গে বেশ থাকিবে। তিনি সমস্ত ভার লইতে প্রস্তুত। তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "আমার হারু এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে রমানাথকে অনেককালের পুরোণো বন্ধুর মতো করে ফেলেচে—ঐ দেখ না।"—হারু তখন আপনার ব্যাগের জিনিসপত্র রমানাথকে দেখাইতেছিল,—মায়ের কথা শুনিয়া সে একমুখ হাসি লইয়া রমানাথের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমি একে আর ছেড়ে দেব না।"

রমানাথের মাসী কলিকাতায় যাইতে চাহিলেন না। তাঁহার গ্রাম ছাড়িয়া, চাষের জমি ছাড়িয়া যাইতে মন সরিল না। তবে রমানাথকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। মাসী বলিলেন, "রমাকে নিয়ে যেতে চাচ্চ, নিয়ে যাও। আমি বুড়োসুড়ো হয়েছি, কখন কি হয়। ওর যদি একটা উপায় হয় সে ত ভালো কথা।"

আশৈশব পল্লীগ্রামে থাকিয়া রমানাথের মাঝে মাঝে ইচ্ছা হইত, সহর দেখিয়া আসে। তাহাদের গ্রামবাসী দু'একটি লোকের মুখে কলিকাতার বিবরণ শুনিয়া ইদানীং তাহার কলিকাতা দেখিবার ইচ্ছাটা খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এইজন্য, সে তাহার মাসী এবং পল্লীধাত্রীকে ছাড়িয়া যাইতে বিশেষ কোনো আপত্তি করিল না।

সেইদিন অপরাহ্নে যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, রমানাথের মাসী অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেলেন।

২

কলিকাতায় আসিয়া রমানাথ যাহা দেখে তাহাতেই অবাক হইয়া যায়। সে তাহার মাসীর নিকট পরীরাজ্যের গল্প শুনিয়াছিল, তাহার মনে হইল, এ সকল সেই পরীরাজ্যেরই অন্তর্ভূত। তাহার আগ্রহাতিশয্যে তাহার বন্ধু হারাধনেরও দিনকতক আহারনিদ্রা ত্যাগ হইল।

অপরিচিতকে কলিকাতার মধ্যে পরিচিত করিয়া দেওয়াকে হারাধন বিশেষ একটা গৌরবের কাজ বলিয়া মনে করিল। এক একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখায়, আর রমানাথ অবাক হইয়া তাহা দেখে। ঐ দেখ, পাঁচ-ঘোড়ার গাড়ি, ঐ দেখ মনুমেন্ট, ঐ দেখ বড়োলাটসাহেবের বাড়ি—রমানাথ হাঁ করিয়া দেখে। হারু বিজয়ী বীরের মতো উল্লাসে রমানাথকে লইয়া সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল।

কিন্তু হারুর মনে শীঘ্রই ভাবান্তর উপস্থিত হইল। রমানাথ পাড়াগেঁয়ে বলিয়া সময়ে সময়ে বিপদে পড়িত। একদিন অসাবধানতাবশতঃ এক ঘোড়ার গাড়ির সম্মুখে পড়িয়া সে চাবুক খাইল, আর একদিন ট্রাম হইতে নামিতে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল, হারুর সঙ্গে একদিন ফুটবল খেলিতে গিয়া এমন এক ধাক্কা খাইল যে, ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। এইসকল ব্যাপারে রমানাথকে লক্ষ্য করিয়া যে ঠাট্টা বিদ্রূপ চলিত, হারু তাহাতে যোগ দিত। হারু মনে করিত, রমানাথ তাহার বিশেষ সম্পত্তি, এবং তাহার বন্ধুবান্ধবদিগকে হাসাইবার এক আশ্চর্য কল।

রমানাথ বাড়িতে আসিয়া হারুর নিকট প্রায়ই করুণভাবে অনুযোগ কবিত। সে বলিত, "অন্য লোকে হাসে হাসুক, তুমি তাদের সঙ্গে হাস কেন! ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেলুম, তুমি কোথায় আমাকে ধরে তুলবে, না তোমার বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আরও হাসতে লাগলে! সেদিন গাড়োয়ানটা আমায় চাবুক মারলে, তুমি হেসে উঠে বললে, বেশ হয়েছে! ছেলেগুলো সেদিন আমার কান ম'লে দিলে, কত রকম ঠাট্টা করলে, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লে। তোমার কি ভাই এ সব উচিত?"

হারু বলিত, "বাঃ রে, আমিও বুঝি তোমার সঙ্গে ঠাট্টাবিদ্রূপ সহ্য করব—লোকে আমাকে পাড়াগেঁয়ে, বোকা বলুক আর কি!"

রমানাথ বলিত, "আমি হ'লে অমন্ করতুম না।"

রমানাথের একটি প্রধান দোষ ছিল, সে সব সত্যকথা বলিযা ফেলিত। হারু যদি বাপকে লুকাইয়া ঘুড়ি উড়াইত, কিংবা পেটের অসুখের উপর চানাচুর খাইত, অথবা দুপুর বেলায় ইডেন্ গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত,—রমানাথের জন্য সে সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িত। হারু বলিত, "তুমি ত আচ্ছা বোকা। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, আর সব বলে ফেল্লে! আচ্ছা বোকা ত!" রমানাথ বলিত, "আমি কি করব, আমি কি মিথ্যে কথা বলব।"

উত্তর শুনিয়া হারু মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যাইত। ক্রমে ক্রমে সে রমানাথের সঙ্গে বেড়ানো একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। রমানাথ একলাটি এঘর সেঘর করিয়া বেড়াইত।

রমানাথের জন্য হারু তাহার বাপের নিকট প্রায়ই মার খাইত। ইহাতে হারুর মাও রমানাথের উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; বলিতেন, "কি রকম হাবা ছেলে, কেবলই আমার হারুর নামে লাগায়।"

এইরূপে রমানাথ নগেন্দ্রবাবুর গৃহে অনাদরে দিন কাটাইতে লাগিল।

৩

নগেন্দ্র রমানাথকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন, সে হারুর সঙ্গে এক ক্লাশে পড়িত। পড়াশুনায় রমানাথের খুব মন ছিল, এজন্য নগেন্দ্রবাবু তাহাকে খুব ভালোবাসিতেন এবং ভালো ভালো জিনিস কিনিয়া দিতেন। হারুর মনে ইহাতে খুব হিংসা হইত, সে রাতদিন রমানাথকে জব্দ করিবার ফন্দী খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হারু জানিত, রমানাথ খুব গাছপালা ভালোবাসে; সে তাহার কাছে কত রকম গাছের নাম করিত, স্কুলে যাইবার সময় পথে কত রকম গাছ চিনাইয়া দিত, কত রকম ফুলের নাম করিত,—কোন্ ফুল কখন্ ফোটে, কোন্ ফুলের কি রকম রঙ্, তাহাদের বাড়িতে কি কি গাছ আছে, সব

বলিত।

একদিন শনিবারে স্কুল হইতে ফিরিবার সময় হারু রমানাথকে সঙ্গে লইয়া নারিকেলডাঙায় এক বাবুর বাগান-বাড়িতে গেল। মালী ছাড়া আর কেহই তখন সেখানে ছিল না। দুজনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতে লাগিল; কত রকমের ফল-ফুলের গাছ, কত রকমের লতাপাতা,—দেখিয়া রমানাথের আনন্দ আর ধরে না। এত রকমের গোলাপ গাছ সে কখনও চক্ষে দেখে নাই।

হারু বলিল, "এস ভাই, আমরা একটা গোলাপ-গাছ চেয়ে নিই, টবে পুঁতে ছাতে রেখে দেব—কেমন?"

রমানাথের ভারি আনন্দ হইল, সে বলিল, "বেশ ভাই, বেশ!"

হারু বলিল, "তুমি ভাই, তা' হ'লে এখানে একটু দাঁড়াও, আমি মালীর কাছে গিয়ে সব ঠিক করচি।"

রমানাথ দাঁড়াইয়া রহিল। হারু মালীর কাছে গিয়া তাহার হাতে একটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "একটা গোলাপফুলের গাছ দিতে পার?"

মালী টাকা পাইয়া একটার পরিবর্তে দুইটা গাছ আনিয়া হারুকে দিল। হারু তখন রমানাথকে দেখাইয়া দিয়া মালীকে চুপি চুপি কি কহিল; তাহার পর রমানাথের কাছে গিয়া তাহার হাতে দুইটা গাছ দিয়া কহিল, "এই দেখ, কেমন গাছ এনেছি। কাউকে বোলো না ভাই যে, আমি তোমাকে গাছ দিয়েচি। বলবে না ত, এ্যাঁ। তোমার আবার বলে দেওয়া রোগ আছে।"

রমানাথ প্রতিশ্রুত হইল, কাহাকেও সে বলিবে না। উভয়ে বাড়ি ফিরিল; দুইটা ভাঙা মাটির কলসীতে মাটি ভরিয়া, গাছ পুঁতিয়া ছাতে রাখিয়া দিল। মালী তাহাদের পিছনে পিছনে আসিয়া তাহাদের বাড়ী দেখিয়া গেল।

পরদিন নগেন্দ্রবাবু বৈকালে আপিস হইতে আসিলে মালী আসিয়া তাঁহার কাছে গাছ-চুরির নালিশ করিল,—তাঁহারই বাড়ীর এক ছেলে তাহার মনিবের বাগান হইতে গাছ লইয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু, হারু রমানাথ উভয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উভয়ে আসিলে, মালী রমানাথকে দেখাইয়া কহিল, "এই বাবুই আমার গাছ নিয়েচে।"

নগেন্দ্রবাবু অবাক্ হইয়া গেলেন। রমানাথ ত সে রকমের ছেলে নয়! নগেন্দ্রবাবু ভাবিলেন, নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোনো রহস্য আছে, বোধ হয় মালীর দেখিবার ভুল হইয়া থাকিবে।

নগেন্দ্রবাবু রমানাথকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "বল ত রমা, কি হয়েছিল?" রমানাথ প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারিয়াও হারুর নিকট প্রতিশ্রুত বলিয়া কোনো কথাই প্রকাশ করিল না। রমানাথ ছলছলনেত্রে বলিল, "ক্ষমা করবেন, আমি কিছু বলতে পারব না।" নগেন্দ্রবাবু অবাক্ হইয়া গেলেন। রমানাথ কখনও তাঁহার মুখের উপর কথা বলে নাই। নগেন্দ্রবাবু রাগিয়া গিয়া বলিলেন, "সে কি! বলতে পারবে না কি। রমানাথ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমি কিছু বলতে পারব না।" নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা' হ'লে নিশ্চয়ই তুমি গাছ নিয়েচ!" রমানাথ চুপ করিয়া রহিল।

হারু দূরে দাঁড়াইয়া রমানাথের মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল, প্রতিমুহূর্তে তাহার ভয় হইতেছিল, রমানাথ কি বলিয়া ফেলে।

নগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন, বলিলেন, "তা' হ'লে বুঝলুম, তোমার উপর আমার যে বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাসের তুমি সম্পূর্ণ অযোগ্য।"—একটু থামিয়া নগেন্দ্রবাবু আবার বলিলেন, "বুঝেছি, তুমি যে কেবল বিশ্বাসের অযোগ্য তা' নও, তুমি চোর, তুমি প্রবঞ্চক। তুমি আমাকে এতদিন প্রতারণা করে এসেছ!"—নগেন্দ্রবাবু রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বেত লইয়া রমানাথকে উপর্যুপরি আঘাত করিতে লাগিলেন—বেত্রাঘাতে তাহার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া গেল।

হারু সমস্তদিন আর রমানাথের কাছে ভিড়িল না; নগেন্দ্রবাবু রমানাথের সঙ্গে সেদিন কোনো কথা বলিলেন না; বাড়ির কেঁহই রমানাথের কোনো খোঁজ লইল না। নিতান্ত উপেক্ষায়, অনাদরে, বেদনায় রমানাথ আস্তে আস্তে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

হারুর মা বলিলেন, "যা হোক্ বাপু, অমন ছেলেকে বাড়িতে রাখতেও আমাদের ভয় করে।" তাঁহার দিদি বলিলেন, "আমি ত প্রথমেই বলেছিলুম, পাড়াগেঁয়ে ছেলে—পেটে পেটে নষ্টামি বুদ্ধি। ওদের কি বাড়িতে জায়গা দিতে আছে!"

রাত্রে খাবার সময় হারুব মা রমানাথকে ডাকিতে আসিলেন। রমানাথ বলিল, "আমার ক্ষিদে নেই, আমি খাব না।"

মাঝরাত্রে রমানাথ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। জ্বরের তাপে তাহার সর্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছিল, বেদনায় পা হইতে মাথা পর্যন্ত খসিয়া পড়িতেছিল, রমানাথ একাকী একঘরে থাকিত; সে উঠিয়া ঘরময় ছুটাছুটি করিতে লাগিল, তাহার মাসী, তাহার পল্লীভবনের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ভোর হইতে না হইতে রমানাথ দুইটি টাকা সঙ্গে লইয়া, খালিপায়ে খালিগায়ে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

পথের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া, ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কিনিয়া, গাড়ি চড়িয়া, রমানাথ একেবারে তাহার পল্লীবাসভবনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন দ্বিপ্রহরের প্রখর তেজে সমস্ত বনভূমি শুষ্ক, ম্রিয়মাণ; রৌদ্রের দাপটে গাছগুলি লুটাইয়া পড়িয়াছে। রমানাথ দৌড়াইয়া গিয়া, নদীর জলে কাপড় ভিজাইয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া সমস্ত গাছের তলায় জল দিয়া বেড়াইতে লাগিল। এখানে বকুল গাছটি একেবারে মরিয়া গিয়াছে, এখানে শিউলিগাছের সব পাতা খসিয়া পড়িয়াছে, এখানে গোলাপ গাছটি কিসে ভাঙিয়া দিয়াছে। রমানাথ জ্বরগায়ে রৌদ্রে পুড়িয়া পুড়িয়া সব ঠিক করিতে লাগিল।

অপরাহ্ণের দিকে হঠাৎ মেঘ করিয়া টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। দুইজন কৃষক লাঙল কাঁধে করিয়া মাঠে যাইতে যাইতে দেখিল, এক বালক ছোটো একটি সন্ধ্যামণির চারাগাছ নিজের শরীর দিয়া ঢাকিয়া বসিয়া আছে। তাহার কাছে গিয়া দেখিল, বালকটির জ্ঞান নাই—কোনো কথার উত্তর দিতে পারিতেছে না, কেবল মাঝে মাঝে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিতেছে, "একবার রোদে পোড়ায়, আবার বৃষ্টিতে ভেজায়,—এ কি কাণ্ড!"

কৃষকদের মধ্যে একজন রমানাথকে চিনিতে পারিল। সে রমানাথের মাসীকে খবর দিল। মাসী আসিলে সকলে ধরাধরি করিয়া রমানাথকে ঘরে লইয়া গেল। রমানাথের মাথা দিয়া তখন আগুন বাহির হইতেছে, চোখদুটা জবাফুলের মতো লাল হইয়া উঠিয়াছে—সে বিছানায় শুইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মাসীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মাসী কাঁদিতে কাঁদিতে ঘটিতে জল আনিয়া রমানাথের মুখে চোখে দিতে লাগিল, পাখা করিতে লাগিল, সর্বাঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিল। কৃষক দুইজনের মধ্যে একজন ক্ষেতের কাজে চলিয়া গেল, আর একজন পাড়াপ্রতিবেশিনীকে খবর দিতে ছুটিল। মাসী রমানাথকে লইয়া একলা বসিয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরেই নগেন্দ্রবাবু হারুকে লইয়া রমানাথের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হারু রমানাথকে দেখিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি বাবাকে সব বলেছি ভাই, আর কখ্‌খনো এমন করব না—কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো না! চল ভাই, আমাদের বাড়ি ফিরে চল।"

রমানাথ কোনো কথা কহিল না—অনেকক্ষণ নিস্পন্দের মতো থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া, দুইহাতে প্রাণপণে হারুর গলা জড়াইয়া ধরিল, তখনই আবার ছাড়িয়া দিয়া ঘটি লইয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে

লাগিল। সকলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল।

কাঁটা মাড়াইয়া, বনজঙ্গল ভাঙিয়া, রমানাথ সন্ধ্যামণির গাছতলায় আসিয়া ঘটিটি একেবারে উপুড় করিয়া দিল। তখন তাহার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, পায়ে বল নাই, সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না—মাটিতে শুইয়া পড়িল।

সকলে যখন রমানাথের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন শ্রান্ত বালক ঘটিটি হাতে করিয়া সন্ধ্যামণির গাছতলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

'ভারতী' ঃ আশ্বিন ১৩১৮

তী র্থে র প থে

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

মহামায়া বলিল, "তুমি মর।"

যোগমায়া বলিল, "আমি ত অনেকদিন মরিয়াছি। আজ তোর কথায় নূতন করিয়া মরিতে পারিব না।"

মহামায়া বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীব কন্যা। সে তাহার স্বামী রামদয়াল ঘোষালেব সহিত রুগ্ন পিতাকে দেখিতে আসিয়াছিল।

যোগমায়া বিশ্বেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্রী। সে বিধবা। বিশ্বেশ্ববের পরিবারে থাকিয়াই সে ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছিল।

মহামায়ার বয়স উনিশ। যোগমায়া তাহার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়ো হইবে। মহামায়া সুন্দরী, যৌবনের উচ্ছলিত তরঙ্গে তাহার রূপরাশি তরঙ্গিত হইতেছিল। মহামায়ার রূপেব গাঙে ভরা জোয়ার। আর বালবিধবা যোগমায়াকে রূপসী বলিলে হয় ত সঙ্গত হইবে না। কিন্তু তাহার চঞ্চল নয়নের দিকে চাহিলে দৃষ্টি সহজে ফিরিতে চাহিত না। যোগমায়ার যৌবনে এখনও ভাঁটা পড়ে নাই। কিন্তু মহামায়ার মতো তাহার ভরা জোয়ারও নয়; বরং তটপ্লাবিনী খর-বাহিনী বন্যার সহিত তাহার অধিকতর সাদৃশ্য ছিল।

আকৃতির ন্যায় উভয়ের প্রকৃতিও অত্যন্ত ভিন্ন ছিল। মহামায়া গম্ভীর, স্থির, ধীর, আপনাতে আপনি নিমগ্ন। যোগমায়া চঞ্চল, অস্থির, অধীর, আপনার বিফলতায় আপনি অসন্তুষ্ট। বৈধব্যচিহ্নেব সহিত, তাহার রূপের সহিত, এই চাঞ্চল্য শোভা পাইত না। পক্ষান্তরে, মহামায়ার সৌন্দর্য যেন এই যৌবনসুলভ চাঞ্চল্যের অভাবে প্রাণহীন হইয়া থাকিত। মহামায়ার সৌন্দর্য মলিন; যোগমায়ার রূপেও বিশেষত্ব ছিল না। কিন্তু হৃদয়ের কোনও আবেগ, উচ্ছ্বাস যখন সহসা যোগমায়ার মুখে প্রতিবিম্বিত হইত, তখন তাহা মুহূর্তের মধ্যে সূর্যকরসমুজ্জ্বল শিশিরবিন্দুর মতো মনোহর শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

দুই ভগিনীতে কথা হইতেছিল। মহামায়া স্থির, অচঞ্চল। অপরা অস্থির, চঞ্চল,—সমীরসংক্ষুব্ধ তটিনীর মতো আপনার চাঞ্চল্যে আপনি কম্পিত তরঙ্গিত হইতেছিল।

মহামায়া বলিল, "আমার জন্য বলিতেছি না; এখনও বুঝিয়া দেখ।"

যোগমায়া বলিল, "আমি তোমার নিধি কাড়িয়া লইব না।"

মহামায়ার মুখে তাহার হৃদয়ভাব অনুসন্ধান করিলে কেহ বুঝিতে পারিত না, সে ক্রুদ্ধ, বিষণ্ণ, না বিরক্ত। কিন্তু যোগমায়ার হাস্যকিরণদীপ্ত মুখে চোখে কৌতুক উচ্ছলিত হইতেছিল।

যোগমায়া বলিল, "তুই সাবধানে পাহারা দিস্, নহিলে আমি চুরি করিব।"

মহামায়া বলিল, "চুরি করিয়া কোথায় বামাল রাখিবি? আমার জিনিস আমারই থাকিবে, তোর অদৃষ্টে কেবল চোর অপবাদ—"

যোগমায়া বলিল, "সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে।"

অদূরে কাহার পদশব্দ শুনিয়া যোগমায়া চাহিয়া দেখিল, রামদয়াল সেই দিকে আসিতেছেন। সে ছুটিয়া পলাইল।

রামদয়াল সন্নিহিত হইলে মহামায়া বলিল, "তুমি বাড়ি যাও।" রামদয়াল দেখিল, মেঘমেদুর অম্বরে সন্ধ্যার অন্ধকাবের মতো মহামায়ার গম্ভীর মুখে কিসের ছায়া;—তাহা উদ্বেগের না আশঙ্কার, তাহা সে ভালো বুঝিতে পারিল না। কখনও সে তা পারিত না। রামদয়াল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন"?

মহামায়া বলিল, "দু' জনে ঘবসংসার ছাড়িয়া কত দিন এখানে থাকিব? বাবাকে ফেলিয়া আমি ত যাইতে পারিব না, তুমি যাও।"

রামদয়াল বলিল, "তা কি হয়? তোমাকে রাখিয়া রুগ্ন শ্বশুরকে ফেলিয়া চলিয়া গেলে লোকে কি বলিবে?'

মহামায়ার মুখে চোখে একটু হাস্যরেখা ফুটিযা উঠিল। সে হাসি শরতের শুভ্র মেঘের বিদ্যুতেব মতো ক্ষণিক ও ক্ষীণ, কিন্তু বর্ষার বিদ্যুতের মতো তীব্র! বামদযাল কিছু বুঝিতে পারিল না। সে গত কযেক দিবস হইতে কেমন অন্যমনস্ক হইযাছিল, আপনাকে আপনি বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার উপব, মহামায়ার এই প্রহেলিকা দেখিয়া একটু অবাক্ হইয়া আবার অন্যমনস্ক হইতেছিল। এমন সময়ে মহামায়ার কণ্ঠ শুনিয়া সে চকিত হইয়া উঠিল।

মহামায়ার কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছিল, "লোকে কি বলিবে—তাই ভাবিয়া ত তোমার ঘুম হয় না; যোগমায়া কি বলিবে,—তাই—"

ঘনঘটাচ্ছন্ন দুর্যোগে ঘোর নিশীথের গাঢ় অন্ধকারে মুক্ত প্রান্তরে দূরে সহসা বজ্রপাত হইলে পথিক যেমন বজ্রশব্দে চমকিযা উঠে, আর চপলার চকিত আলোকে পলকের মধ্যে তাহার উদ্‌ভ্রান্ত নয়নে এক মুহূর্তের জন্য প্রলয়ংকরী প্রকৃতিব মূর্তি উদ্‌ভাসিত হয়, মহামায়ার এই ক' টি কথা শুনিয়া বামদয়াল তেমনই চকিত হইয়া উঠিল, মহামায়ার কণ্ঠোচ্চারিত যোগমায়ার নামে সে সহসা তাহার জীবনপথের সম্মুখে এক অদৃষ্টপূর্ব অস্পষ্ট ছবির আভাস দেখিতে পাইল।

রামদয়াল আত্মস্থ হইবার পূর্বেই মহামায়া সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। রামদয়াল চাহিয়া দেখিল, মহামায়া দ্রুতপদে চলিযা যাইতেছে। কিন্তু তাহার চর্মচক্ষুর উপর এই প্রকৃত দৃশ্য বিদ্যমান থাকিলেও ইন্দ্রজালমুগ্ধের ন্যায় সে আর এক নূতন ছবি দেখিতেছিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া যোগমায়া যখন ছুটিয়া পলায়, তখন রামদয়াল তাহা দেখিয়াও দেখে নাই; ইহাও সম্পূর্ণ সত্য, তাহা দেখিবার মতো, তাহাও রামদয়ালের মনে হয় নাই। কিন্তু এখন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, পলায়মানা অসংবৃত-কেশবাসা যোগমায়ার চিরপরিচিত মূর্তি নিতান্ত নবপরিচিতের মতো, নিত্যনূতনের মতো, তাহার নয়নপটে অনবরত প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতেছিল।

২

রামদয়াল ইতিপূর্বে মহামায়ার সহিত এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই, এখন তাহা নিতান্ত কঠোর সত্যে পরিণত হইল। মহামায়ার চিরপরিচিত কণ্ঠস্বরে জাগিয়া

সে দেখিল, তাহার হৃদয়ের সিংহাসন শূন্য, সেখানে মহামায়া নাই। আর এক জন বিনা আহ্বানে, অজ্ঞাতসারে, মহামায়ার শূন্য সিংহাসন কখন অধিকার করিয়াছে। সে বিস্মিত বিরক্ত বিচলিত হইল বটে, কিন্তু কি করিবে, স্থির করিতে পারিল না।

একবার মনে করিল, চলিয়া যাই। কিন্তু তাহা সঙ্গত মনে হইল না। পীড়িত শ্বশুরকে ত্যাগ করিয়া যাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। বৃদ্ধের আর কেহ ছিল না; বিষয়-আশয়ের কি বন্দোবস্ত হয়, তাহাও দ্রষ্টব্য বটে।

কিন্তু এ দিকে? রামদয়াল ভাবিল এ হয় ত স্বপ্ন। এ হয় ত ক্ষণিক। এই মরীচিকায় আমি কি সত্যই মুগ্ধ হইব?

রামদয়াল আপনার মনে আপনার মনের মতো বিবিধ যুক্তির রচনা করিল। শেষে সিদ্ধান্ত করিল, এক দিকে সম্ভাবনা, অন্য দিকে কর্তব্য। সম্ভাবনার ভয়ে কর্তব্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব কেন? মন কি এত লঘু? জীবন কি এত অসার? সংযম কি এত কঠোর? মানসিক ব্যাধি কি এত দুঃসাধ্য? তাই যদি হয়, আজ না হয় পলাইয়া বাঁচিলাম; কাল? পৃথিবীতে কোথায় প্রলোভন নাই? কোথায় গিয়া নিশ্চিন্ত হইব?

এই সব তর্কজালের অন্তরালে যে যোগমায়া লুকাইয়াছিল; তাহার কামনা, তাহার দর্শনলালসাই যে রামদয়ালের কর্তব্যবুদ্ধিকে এতটা উৎসাহিত করিতেছিল; যে আত্মসংযমের ভরসায় নির্ভর করিয়া সে আত্মজয়ের আশা করিতেছিল, তাহাই যে অসংযমের নামান্তর, তাহা রামদয়াল বুঝিতে পারিল না।

মহামায়া বুঝিল, কিন্তু উপায় ছিল না। যোগমায়া বুঝিল কিন্তু ফিরিতে পারিল না। রামদয়াল বুঝিয়াও বুঝিল না, আপনাকে আপনি বঞ্চনা করিল। ফলে কিন্তু মরিল মহামায়া।

মুমূর্ষুর অন্তিম-শয্যায়, মৃত্যুচ্ছায়ার আলো-আঁধারে, পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তিন জনের কেহ অবসন্ন হইত না। আশায় নিরাশায়, সংশয়ে যাতনায়, শঙ্কায় ভাবনায়, তিন জনের হৃদয় মথিত হইতেছিল; তিন জনেই নীরবে স্রোতে ভাসিয়া চলিল, কেহ আর কিছু ভাবিল না।

৩

যোগমায়ার চঞ্চলতা কোথায় গেল? তাহার কামনা-পূর্ণ হৃদয় এখন নিস্তরঙ্গ। সেই চঞ্চল নয়নযুগল এখন প্রশান্ত, তাহাতে আর কৌতুকের রশ্মি নাই। সে হাস্যদ্যুতি কোথায় অন্তর্হিত হইল? অতৃপ্তির চাঞ্চল্য গেল, কিন্তু তৃপ্তির সে সান্ত্বনা, সে শান্তি কই? তবু এই পরিবর্তনে যোগমায়া যেন সম্পূর্ণতা লাভ করিল।

মহামায়াও স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য হারাইল। তাহার সৌন্দর্যের সহিত গাম্ভীর্যের যে অসংগতি ছিল, তাহা দূর হইল। মহামায়া এখন প্রায় হাসে, সময়ে সময়ে হাসিয়া আকুল হয়, কেন? জীবনের পরিপূর্ণ তৃপ্তি হারাইয়া সে চঞ্চল হইতেছিল। জীবনের নিষ্ঠুরতায় দলিত পিষ্ট ব্যথিত হইয়াও সে প্রতিজ্ঞা করিল, সুখ যায় যাক্, শান্তি ছাড়িব না।

আপনার ঘর পুড়িতে দেখিয়া যে নিকটে দাঁড়াইয়া হাসে, সে জানে, দু'দশ কলসী জলে এ আগুন নিভিবে না। তবু না কাঁদিয়া সে হাসে কেন? হায় বিড়ম্বনা।

৪

একদিন মুমূর্ষু পিতার শিয়রে বসিয়া মহামায়া ঢুলিতেছিল।—আর জাগিয়া থাকিতে পারে না। মনে করিল, হয় রামদয়ালকে, নয় যোগমায়াকে ডাকিয়া দিয়া নিজে একটু ঘুমাইবে। মহামায়া ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় গেল। রামদয়ালের ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিল, গৃহমধ্যে অন্ধকার।

কথোপকথনের মৃদু অস্পষ্ট শব্দ মহামায়ার কানে আসিতেছিল। সে নীরবে দ্বারে হাত দিল। বুঝিল, দ্বার মুক্ত। দরজা একটু মুক্ত করিয়া দেখিল, ঘোর অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ক্রমে সেই অন্ধকারে দেখিল, গৃহমধ্যে যোগমায়া ও রামদয়াল। মহামায়া না দেখিলেও তাহা বুঝিতে পারিত। তবু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। সেই গাঢ় অন্ধকার তাহার চোখে গাঢ়তম হইয়া আসিতেছিল। অনেক কষ্টে সে আত্মসংবরণ করিবার চেষ্টা করিল। তাহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। মহামায়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিল। সহসা মহামায়ার অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল "বেশ।"

গৃহমধ্যে কণ্ঠস্বব নীরব হইল। মহামায়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া পিতার শয্যাতলে আসিয়া বসিল। তাহার শিরায় শিরায় আগুন জ্বলিতেছিল;—নয়নের সমস্ত অশ্রু ঢালিয়াও তাহার জ্বালা ভুলিতে পারিল না।

মহামায়া সুপ্ত না জাগরিত, তাহা আপনিই বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার একবার মনে হইল, সোপানে কাহার পদশব্দ। তাহাব পর যেন শুনিতে পাইল, কে ধীরে ধীরে সদর-দরজা উন্মুক্ত করিল! সে স্বপ্নোত্থিতের মতো উঠিয়া বসিল. ধীরে ধীরে প্রদীপ হইতে একটি শলিতা জ্বালিয়া লইয়া পার্শ্বেব গৃহের দ্বারে গিয়া দেখিল,—দ্বাব মুক্ত। কম্পিতহস্তে শলিতাটি ধরিয়া ভিতরে চাহিল, সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মন্ত্রমুগ্ধেব মতো সোপানমূলে আসিয়া দাঁড়াইল; এই সময়ে তমোময়ী যামিনীব দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের মতো সহসাগত পবনবেগে শলিতাটি নিভিয়া গেল। অন্ধকারে প্রাচীর ধবিয়া সে নীচে নামিল; অন্ধকারে বাহিব-দবজাব দিকে যাইতে লাগিল। একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল, সেই অন্ধকাব ভেদ করিয়া উন্মুক্তদ্বারপথে একাদশীব চন্দ্রালোক প্রবেশ করিতেছে, সম্মুখে অনন্তপ্রসারিত নক্ষত্রভূষিত গগনেব কিয়দংশ, আর তাহাব নিম্নে আলোক ও আঁধারে অস্পষ্ট গ্রামপথ।

মহামায়া আব দাড়াইতে পাবিল না, ছিন্ন ব্রততীর ন্যায় ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। একবার মনে করিল, এ যাতনা সহি কেন? মরিলে ত জুড়াইতে পাবি। কিন্তু তাহা হইলে পীড়িত পিতাব কি হইবে? আবার ভাবিল, আব একবাব না দেখিয়া মরিব? কিন্তু আর কি দেখা পাইব?

তাহাব পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দ্বাব রুদ্ধ করিল,—কৃতাঞ্জলি হইয়া ঊর্ধ্বমুখে কহিল, "যাও,—মবিবার আগে আব একবার তোমায় দেখিতে ইচ্ছা কবে!"

৫

এগার বৎসর অতীত হইয়াছে। স্বামিপরিত্যক্তা পিতৃহীনা মহামায়া এই কয় বৎসর শোকে দগ্ধ ও দুঃখে জীর্ণ হইয়াও বাঁচিয়া আছে। সংসাবে তাহার কোনও অবলম্বন ছিল না, বন্ধন ছিল না। কেবল এক আশাবৃন্তে তাহার জীবনকুসুম সন্নদ্ধ হইয়াছিল;—মরিবার আগে অভাগীর অদৃষ্টে কি একবার তাঁহার চরণদর্শন ঘটিবে না?

এই সময়ে গ্রামে এক জন পুরুষোত্তম সেথো উপস্থিত হইল। গ্রামে গ্রামে কোলাহল পড়িয়া গেল। সন্নিহিত সাত.আটখানি গ্রামের নরনারী মিলিয়া পুরুষোত্তমতীর্থে দারুব্রহ্ম-দর্শনে যাত্রা করিল।

মহামায়াও তাহার সঙ্গী হইল। মনে মনে ভাবিল, তাঁহার দর্শন পাইলাম না, ঠাকুরের চরণ পাইব কি?

৬

দুর পথ। যাত্রীর দল পদব্রজে যাত্রা করিল। ক্রমে তাহারা মেদিনীপুর পার হইয়া উৎকলের সীমায় প্রবেশ করিল।

যাত্রার দশ দিন পরে যাত্রীর দল একটি চটীতে উপস্থিত হইল। রথের যাত্রী চলিয়াছে, পথে

জনতার সংখ্যা হয় না। মহামায়ার গ্রামস্থ যাত্রীর দল যখন রাসপুরের চটীতে পঁহুছিল, তখন সেখানে বিসূচিকা বড়ো প্রবল। তীর্থযাত্রীর মৃতদেহে ক্ষুদ্র গ্রাম পরিপূর্ণ। পথের ধারে, প্রান্তরে, বৃক্ষতলে, সরোবরতীরে, সর্বত্র মৃতদেহ। কেহ বা অর্ধমৃত, সঙ্গীরা ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। এ পথে কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না। দলের কেহ পীড়িত হইলে সঙ্গীরা তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া যায়। পরিত্যক্ত হতভাগ্য অভীষ্ট তীর্থের পথেই চরম ও পরম তীর্থে চলিয়া যায়।

চটীতে স্থানাভাব। অনেক কষ্টে সন্ধ্যার পর একটি দোকানে মহামায়ার দলস্থ সকলে আশ্রয় লইলেন।

সেই দিন মধ্যরাত্রে সেই দোকানে পূর্বাগত যাত্রীর দলের একজন পুরুষ বিসূচিকায় আক্রান্ত হইল। মহামায়ার গ্রামের দল ভয়ে চটী পরিত্যাগ করিয়া সেই রাত্রেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল।

সকলে বাহিরে সমবেত হইলে দেখা গেল, মহামায়া দলে নাই।

বৃদ্ধ রামহরি চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "মহামায়া কই? মহামায়া!"

একজন বলিল, "সে চটীতে পড়িয়া আছে, তাহার উঠিবাব শক্তি নাই। তাহাকেও রোগে ধরিয়াছে।"

এ পথের এই দস্তুর। কোন্ পথেই বা নয়? আপনাকে বিপন্ন করিয়া কে পরের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিবে? যাত্রীর দল চলিয়া গেল। মহামায়া একাকিনী, অসহায়া, মরণাহতা, সেই চটীতে পড়িয়া রহিল।

চটীর এক প্রান্তে মহামায়া ও অন্য প্রান্তে অপর দলের সেই রুগ্ন যাত্রী—উভয়েরই জীবনবন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছিল। মহামায়াকে দেখিবার কেহ ছিল না, কিন্তু এক বর্ষীয়সী রমণী রোগাক্রান্ত পুরুষের শুশ্রূষায় নিরত ছিল। অপরিচিতার কি প্রাণের ভয় নাই? অথবা যে মৃত্যুশয্যায়, সে ইহার প্রাণাধিক?

মহামায়া যাতনায় অস্থির হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার কাতর স্ববে আকৃষ্ট হইয়া অপরিচিতা প্রদীপহস্তে তাহার শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইল। মহামায়ার মুখের দিকে চাহিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "তোমার অদৃষ্টে জগন্নাথ-দর্শন নাই।"

মহামায়া বলিল, "তাহাতে দুঃখ নাই। মরণেও দুঃখ নাই। কিন্তু তাঁহাকে না দেখিযা—"

অপরিচিতা বলিল, "কাহাকে? মবণেও যদি দুঃখ নাই, তবে তোমার এ দুঃখ কিসের?"

"বড়ো আশায় বুক বাঁধিয়াছিলাম, মরিবার আগে তাঁহাব পদধূলি লইয়া মরিব। মবি, তাতে দুঃখ নাই। তাঁহাকে দেখিয়া মরিলাম কই?"

অপরিচিতা প্রদীপ রাখিয়া মহামায়াকে তুলিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। তখন সে মহামায়ার শয্যা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

মহামায়া মনে করিল, এই শেষ;—বাহিরে ফেলিয়া দিতে যাইতেছে।

সেই গৃহের অপর প্রান্তে, আর এক জন মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে মহামায়ার শয্যা রাখিয়া, অপরিচিতা প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিল। তাহার পর মহামায়াকে বলিল, "দেখ!"

মহামায়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "কি?"

সে বলিল, "তোমার স্বামী।"

মহামায়া চমকিয়া উঠিয়া বসিতে গেল, পারিল না। আবার শয্যায় পড়িয়া সবিস্ময়ে সাগ্রহে বলিল, "সে কি?"

অপরিচিতা কহিল, "তোমার স্বামী রামদয়াল ঐ মৃত্যুশয্যায়। দেখ।"

মহামায়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "আমি যে আর দেখিতে পাই না,—দেখাও, দেখাও,—তুমি কে?

অপরিচিতা মহামায়াকে তুলিয়া ধরিয়া কহিল,—"দেখ। তোমার স্বামীকে দেখ। আমি যোগমায়া—"

মহামায়া চীৎকার করিয়া উঠিল।— যোগমায়া পাষাণ প্রতিমার ন্যায় অবিচল। সে মহামায়াকে শয্যায় শায়িত করিয়া মুখে চোখে জল দিতে লাগিল।

মহামায়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "তাঁর পদধূলি দাও, মরিবার আগে দাও দিদি, আমি সুখে মরি।"

যোগমায়া মুমূর্ষু রামদয়ালের পদধূলি আনিয়া তাহার মাথায় দিল।

রামদয়াল জিজ্ঞাসা করিল, "কি?—কে?"

মহামায়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, নয়নদ্বয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতেছিল। ইঙ্গিতে বুঝাইল, রামদয়ালের শয্যার কাছে লইয়া যাও।

যোগমায়া তাহার শয্যা আরও নিকটে টানিয়া আনিল,—মুমূর্ষুকে বলিল, "চিনিতে পার? মহামায়া—"

রোগী একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। রোগী হস্ত প্রসারিত করিল। যোগমায়া মহামায়ার শীতল হাতখানি লইয়া মুমূর্ষুর শীতল হস্তে সমর্পণ করিল। উভয়ে উভয়ের হাত ধরিয়া অনন্ত পথে যাত্রা করিল।

তাহার পর বহুকাল সেই চটীর পথের ধারে একটা পাগলী বেড়াইত। তাহার মুখে আর অন্য কথা ছিল না, যাত্রীর দল সবিস্ময়ে শুনিত,—পাগলী বিড় বিড় করিয়া বকিতেছে, "বড়ো সুখ। বড়ো সুখ।"

'সাজ'

মো হি নী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফেরি-ষ্টীমারে অবিনের সঙ্গে অনেক বছরের পর দেখা হতেই সে আমাকে একেবারে একখানা ছবি দেখিয়ে বললে—দেখতে পাচ্ছ? তোমার-আমাব মতো হলে প্রথম প্রশ্ন হতো—তুমি কে হে? বা তোমাকে তো চিনলেম না। কিন্তু অবিন, সে কোনোদিনই আমাদের মতো সাধারণ একটা-কিছু ছিল না, সুতরাং সে আমাকে না চিনলেও, সে যে অবিন এটার প্রমাণ পেতে আমার একটুও দেরী হল না। ছবিটার সবটা দেখলেম অন্ধকার ; কেবল নীচে একটা পিতলের ফলকে বড়-বড়-করে লেখা ছিল—'মোহিনী'। আমি সেইটে দেখিয়ে বললেম—মোহিনী বুঝি?

অবিন খানিকটা নিশ্বাস ফেলে বললে,— পেলে না। তবে শোনো।—বলেই আমাকে টেনে মাঝের বেঞ্চে বসালে। তখন শীতের সকাল; কুয়াশা ঠেলে জাহাজখানা আস্তে আস্তে জল-কেটে চলেছে। অবিন সুরু কল্লে—

কলকাতায় আমাদের বাসা-বাড়িখানা অনেক-দিনের। এখন সেটা আমাদের বসত-বাড়ি হয়েছে বটে, কিন্তু সেকালে কর্ত্তারা সে বাসাটা কেবল গঙ্গাস্নান আর কালীঘাট করবার জন্যেই বানিয়েছিলেন। খুবই পুরোনো এই বাসাবাড়ির ঘরগুলো, ঝাড়-লন্ঠন কৌচ-কেদারা ওয়াটার-পেন্টিং অয়েল-পেন্টিং বড় বড় আয়না এবং সোনার ঝালর-দেওয়া মখমলের ভারি-ভারি পরদা দিয়ে যতদূর সম্ভব জাঁকালো এবং মানুষের প্রতিদিন বসবাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী করে কর্ত্তারা সাজিয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে সেকালের সেই ধুলোয় ভরা, পুরোনো মদের ছোপ্-ধরা, সাবেকী আতরের

গন্ধমাখানো এই সব ফার্নিচার তখন কতক বিক্রি করে, কতক ঝেড়ে-ঝুড়ে মেরামত করে, আর কতক-বা একেবারে ফেলে দিয়ে বাড়িখানাকে একালের বসবাসের মত করে নিতে হচ্ছিল। আমি এখনো যেমন, তখনো অবিবাহিত। সেই সময় একদিন এই ছবিটা আমার হাতে পড়ল। খানিকটা কালো অন্ধকারের রং লেপা;—কেবলমাত্র দুটি সুন্দর চোখ—তাও অনেকক্ষণ ধরে ছবিটার দিকে চেয়ে থাকলে তবে দেখা যেত।

জাহাজ এসে কাশীপুরের জেটিতে লাগল। একদল থার্ড ক্লাস যাত্রী মাড়োয়ারী নেমে গেল, এবং তার চেয়ে আরও বড় একদল কলের কুলী, মিলের চিনে মিস্ত্রী উঠে এল। অবিন ডেকের এধার থেকে ওধারে একবার পায়চারি করে নিয়ে ফিরে এসে বল্লে—

এই ছবিটা রাবিস্ বলে নিশ্চয়ই বৌবাজারে পুরোনো জিনিসের সঙ্গে চালান যেতো, কিন্তু যে-ঘরের দেয়ালে এটা খাটানো ছিল, সেই ঘরটার ইতিহাসটা বেশ-একটু রকমওয়ারী রকমের ছিল বলেই সে ঘরটায় আমি কোনো অদল-বদল ঘটতে দিইনি। আমাদের যিনি ছোট-কর্ত্তা তাঁরই সেটা বৈঠকখানা। এই ছোট-কর্ত্তাই আমাদের সেকালের শেষ-ঐশ্বর্য্যের বাতিগুলো দিনের বেলায় ঝাড়ে-লণ্ঠনে জ্বালিয়ে-জ্বালিয়ে নি:শেষ করে দিয়ে গেছেন; এবং নিজের হাতের হীরের আংটির বড়-বড় আঁচড়ে বিলিতি আয়নাগুলোকে সেই সব দিনকে রাত, রাতকে দিন করবার ইতিহাসের সন তারিখ এবং নামের তালিকায় ভরে দিয়ে গেছেন। এই কর্ত্তার বাবুগিরির কীর্ত্তিকলাপের গল্প ছেলেবেলায় আরব্য-উপন্যাসের মতোই আমার কাছে লাগতো; এবং বড় হয়ে যখন আমি এই ঘরের চাবি খুললুম, তখন গোলাপী আতর-মাখানো পুরোনো কিংখাবের গন্ধ-ভরা একটা অন্ধকারের মধ্যে এই ছবির দুটি কালো চোখ আমার দিকে এমনি একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে চেয়ে রইল যে সে-ঘরটায় কোনো অদল-বদল করতে আমার সাহস হল না। কিন্তু সে ঘরটাকে তালাবন্ধ করে ফেলে রাখতেও আমার ইচ্ছে ছিল না। বাড়ির মধ্যে সেই ঘরটা সব-চেয়ে আরামের,—একেবারে ফুল-বাগানের ধারেই; দক্ষিণের হাওয়া এবং পুবের আলোর দিকে সম্পূর্ণ খোলা ঘরখানি! আমি সেইখানেই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব নিয়ে খাস-মজলিস—সেকালের মতো নয়, একালের ক্লাব-রূমের ধরণে—গড়ে তুল্লেম। আমরা সেই সাবেককালের নাচ-ঘরটায় বসে চা-চুরুটের সঙ্গে পলিটিক্স সোসিওলজি থিওলজি এবং জার্ম্মান-ওয়ারের চর্চ্চায় ঘোরতর তর্কযুদ্ধে যখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছি তখন হঠাৎ এক-একদিন এই ছবিখানার দিকে আমার চোখ পড়লেই সেকালের বিলাসিতার সাজসরঞ্জামের মধ্যে, বিলাতী কেতায় আমাদের এই একালের মজলিস এত কুশ্রী বোধ হতো—দুই কালের ব্যবধানটা এমন স্পষ্ট হয়ে দেখা দিত যে আমাদের তর্ক আর অধিক দূর অগ্রসর হতো না। আমাদের মনে হতো এ ঘরের স্বামী যিনি তাঁর অবর্ত্তমানে অনাহূত আমরা একদল এখানে অনধিকার প্রবেশ করে গোলমাল বাধিয়েছি; এখনি যেন বাবুর খানসামা এসে আমাদের এখান থেকে ঘাড়-ধরে বিদায় করে দেবে। মনের এই সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে ও-ঘরখানার মধ্যে আড্ডা জমিয়ে তোলা অসম্ভব দেখে আমার বন্ধুরা বলতে লাগল—ওহে অবিন, তোমার ভাই ওই মোহিনীকে এখান থেকে না নড়ালে চলছে না; ওর ওই ভুতুড়ে-রকমের চাহনিটায় আমাদের এখানে স্থির হয়ে থাকতে দেবে না দেখছি। কিন্তু বন্ধুদের অনুরোধ রক্ষে হল না;—মোহিনী যেখানকার সেইখানেই রইলেন; বন্ধুরা একে-একে সরে পড়তে থাকলেন। এই সময় আমার মনে হতো—একালটা যেন একটা খোলসের মতো আস্তে আস্তে আমার চারিদিক থেকে খসে যাচ্ছে, আর আমার নিজ মূর্ত্তিটা পুরোনো খাপ থেকে ছোরার মতো ক্রমে বেরিয়ে আসছে। আমার মধ্যে যে সেকালটা ছিল, সে যেন দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠছে,—বুঝছি আমার রক্তের সঙ্গে সেকালের বিলাসিতার গোলাপী আতর এসে মিশছে, আমার দুই চোখের কোণে উদ্দাম বাসনার অগ্নিশিখা কাজলের রেখা টেনে দিচ্ছে! এই সময় আমি এক-এক দিন এই ছবিখানার দিকে চেয়ে-চেয়ে সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছি।

ঐ ছবির অন্ধকার ঠেলে ওপারে গিয়ে পৌঁছবার জন্য—ঐ কালোব মাঝখানে যে সুন্দব চোখ তারি আলোক-শিখায় নিজেকে পতঙ্গেব মতো পুড়িয়ে মারবার জন্যে আমার দেহ-মন আবেগে থব-থর-করে কাঁপতো। আমার মনের এই তিমিরাভিসাব বন্ধুরা পাগলামির প্রথম লক্ষণ বলে ধার্য্য করে নিয়ে আমাকে সাবধান কল্লেন, উপহাস কল্লেন, নানাপ্রকাব উত্ত্যক্ত করে ভয় দেখিয়ে শেষে আমার ভবসা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র গমন কল্লেন—যেখানে চায়ের এবং চুরুটেব আড্ডা ভালো জমতে পাবে।

আমি একলা ঘবে; আর আমাব মনেব শিযরে অন্ধকাবেব পরদাব ওপাবে 'মোহিনী'! যবনিকা তখনো সবেনি, চাঁদ তখনো ওঠেনি। এ সেই-সব দিনেব কথা হৃদযতন্ত্রীতে যখন মিনতির সুর অন্ধকাবে লুটিযে পড়ে বিনয কবছে—"এসো এসো দেখা দাও।" একখানা ছবি, তাও আবাব প্রায ষোলোআনাই ঝাপসা—সে যে এমন কবে মনকে টানতে পাবে এটা আমার নিজেবই স্বপ্নের অগোচর ছিল, বন্ধুদেব কথা তো দূবে থাক। বললে বিশ্বাস কববে না, তখন বসন্তকালে ফুলের গন্ধ যদি আসতো, আমার মনে হতো ঐ ছবিখানাব মধ্যে যে আছে তাবি যেন মাথাঘষার সুবাস পাচ্ছি। হাফেজ যে সজীব ছবিটি দেখে দেওয়ানা হয়েছিলেন তাব চেয়ে পটেব অন্দবে লুকিয়েছিল যে 'মোহিনী' সে যে কম জীবন্ত, কম সুন্দবী তা তো আমাব মনে হতো না। নীল ঘেবাটোপ-দেওযা খাঁচার মধ্যে যেন সে আমাব শ্যামা পাখী! তাব সুব আমি শুনতে পাই, তাব দুখানি ডানাব বাতাসে নীল আববণ দুলছে দেখতে পাই। আমাব প্রাণেব কান্না সে গান দিয়ে সাজিযে সুব দিযে গেঁথে আমাকেই ফিবে দেয—কেবল চোখে দেখা আব দুই বাহুব মধ্যে—বুকের মধ্যে এসে ধবা দেওয়ার বাকি!

এতটা বলে অবিন হঠাৎ চুপ কল্লে। তখন আধখানা নদীব উপব থেকে কুয়াশা সবে গিয়ে জলেব গায়ে সকালেব আকাশ থেকে বেলফুলেব মতো সাদা আলো এসে পড়েছে, আব আধখানা নদীব বুকে ভোবেব অন্ধকাব টল্‌টল্ কবছে—এরি মাঝে দুই ডিঙায দুই জেলে কালোব আলোব বুকে জাল ফেলে চুপ-কবে বসে রয়েছে দেখছি। আমাদেব জাহাজ থেকে একটা ঢেউ গড়িযে গিয়ে ডিঙা দুখানাকে খুব-একটা দোলা দিয়ে চলে গেল। অবিন সুরু কল্লে—

শুনেছিলাম তান্ত্রিক সাধকেবা না-কি মন্ত্রবলে জডে জীবনদান, অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলতে পাবেন; আমি আমাব মোহিনীকে মন্ত্রবলে কাছে—একেবারে আমাব চোখেব সম্মুখে—টেনে আনবাব জন্য এমন-এক সাধকেব সন্ধান কবছি, সেই সময আমাব এক আর্টিষ্ট বন্ধুব সঙ্গে দেখা। তাঁব সঙ্গে কথায কথায 'মোহিনী'ব ছবিটা যে কেমন-কবে আমাকে পেযে বসেছে সেই ইতিহাস উঠল। বন্ধু আগাগোড়া ব্যাপারটা আমাব মুখে শুনে বললেন—তোমাব দশা সেই গ্রীস দেশের ভাস্কবটাব সঙ্গে মিলছে দেখছি! আমি বললেম—তাব সামনে তো তবু তার 'মোহিনী' প্রাণটুকু ছাড়া আব-সমস্তটা নিয়ে দাঁড়িযে ছিল কিন্তু আমার 'মোহিনী' যে অবগুণ্ঠনেব আড়ালেই বহে গেছে হে! এব উপায কিছু বাৎলাতে পাব? বন্ধু আমায উপায বাৎলে—বাড়ি গিযে এক শিশি আরক আমাকে দিযে পাঠালেন। সেকালটা যদি আমাকে বাবো আনা গ্রাস করেছিল তবু মনেব এক-কোণে একালের বিজ্ঞানটাব উপরে একটু যে শ্রদ্ধা তা তখনো দূব হযনি। আমি বন্ধুবরের কথামতো ঘড়ি-ধরে হিসাব কবে সেই আরকটা সমস্ত 'মোহিনী'র ছবিখানায় ঢেলে দিলেম। সে আরকটার এমন তীব্র গন্ধ যে আমায যেন মাতালের মতো বিহ্বল করে তুললে। তাবপব কখন যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছি তা মনে এইটুকু মাত্র জানি যে আরক ঢালবার পরে 'মোহিনী'র ছবিখানা ধোঁয়ায় ক্রমে ঝাপসা হযে আসছে আর আমি ভাবছি এইবার মেঘ কাটলো।

একমাস পরে কঠিন রোগশয্যা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আর-একবার এই ছবিখানার দিকে চেয়ে

দেখলেম, সেটার উপর থেকে সেই চাহনিটা সরে গেছে কেবল তার নামটা আঁটা রয়েছে—সোনালী ফলকে, বড়-বড় অক্ষরে।

তখন শিবতলার ঘাটে জাহাজ লেগেছে, আমি তাড়াতাড়ি অবিনকে নমস্কার করে নেমে চলেছি, এমন সময় সে সজোরে আমার হাতে এক ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল—ওহে আর্টিষ্ট। মোছেনি হে, ভয় নেই; ছবিখানা পটের গভীর থেকে গভীরতর অংশে গিয়েই আমার অন্তর থেকে অন্তরতম স্থানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভারতী ঃ চৈত্র ১৩২৩

ব উ - চু রি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে সময়ে নব্য-বঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার একটা ভারি ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, সেই সময়ের কথা বলিতেছি।

মহামায়া বর্দ্ধমান জেলার একটি সুনিবিড় পল্লীগ্রাম। সুনিবিড় অর্থাৎ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কুড়ি মাইল এবং পোষ্ট আফিস হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামের মধ্যভাগে দেবী মহামায়ার একটি বিগ্রহ স্থাপিত আছে—সেই হইতেই ইহার নামোৎপত্তি।

এই ক্ষুদ্র গ্রামটির একটি ক্ষুদ্র জমিদার আছেন তাঁহার নাম বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার মধ্যম পুত্র অনাথশরণ, বি. এ. পরীক্ষা দিয়া কয়েকদিন হইল বাটী আসিয়াছে। ছেলেটির বয়স বাইশ বৎসর হইবে, বেশ পারিপাট্য আছে, চেহারাটি মন্দ নহে। কিন্তু পিতা তাহার উপরে কয়েকটি কারণে অত্যন্ত চটা। প্রথমতঃ সে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিয়া থাকে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ গৃহে যোড়শী স্ত্রী রহিয়াছে, কিন্তু সে তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করে না। তাহার কারণ কি জান? সে বলে, যাহাকে আমি ভালবাসিয়া বিবাহ করি নাই, সে আমার স্ত্রী নহে ভগ্নী। যদি জিজ্ঞাসা কর, উহাকে বিবাহ করিলে কেন? সে বলিবে, যখন বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন আমার এ সমস্ত মতাদি ছিল না। বালিকার দশায় কি হইবে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমরা উভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইব, তাহার পর ব্রাহ্মবিবাহের যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে, সেই আইন অনুসারে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিব। ও তখন ভালবাসিয়া আর যাহাকে ইচ্ছা স্বামিত্বে বরণ করিতে পারিবে।

বিবাহের পর কলিকাতায় গিয়া অনাথশরণের একটি প্রাণের বন্ধু জুটিয়াছিল—তাহার নাম হেমন্তকুমার সিংহ। সে দীক্ষিত ব্রাহ্ম। তাহার সহিত বন্ধুত্ব সূত্রপাতের অল্পকাল পরেই অনাথের মনে ধারণা জন্মিল যে সে হেমন্তকুমারের দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নী নগেন্দ্রবালাকে ভালবাসে। মনের এই চপলতায় প্রথমে অনাথ অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু হেমন্তকুমার তাহাকে সান্ত্বনা দিল। সে বলিল, ভালবাসা একটি ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ, কোনও অবস্থাতেই তাহাতে পাপ স্পর্শিতে পারে না। বিশেষতঃ হেমন্তকুমারের প্রবল বিশ্বাস, প্রেম-সম্পর্ক-বিহীন পূর্ব্বরাগ-বর্জ্জিত বিবাহ বিবাহই নয়। অনাথ মন্দাকিনীকে ভালবাসিয়া বিবাহ করে নাই, সুতরাং সে তাহার স্ত্রী নহে ভগ্নী, এই অদ্ভুত মত হেমন্তই অনাথের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়াছে। নগেন্দ্রবালাও যে

অনাথের প্রতি প্রণয়শালিনী, ইহাও দুই বন্ধু অনুমান করিয়া লইল। এই বিবাহ হইলেই যথার্থ আদর্শ বিবাহ হয়, ইহাই হেমন্তকুমারের মত। কিন্তু অনাথের তথাকথিত স্ত্রী বর্ত্তমানে তাহা অসম্ভব। নগেন্দ্রবালার প্রতি প্রণয় ব্যক্ত করিবার অধিকার পর্য্যন্ত অনাথের নাই। হেমন্ত প্রায়ই বলিত— প্রাণে প্রাণে যোগ, আত্মায় আত্মায় মিলন, ইহাই ভালবাসার চরম সফলতা,—বিবাহ না-ই হইল। কিন্তু নূতন ব্রাহ্মবিবাহ আইন হইবার কথা উঠা পর্য্যন্ত, তাহারা অন্যরূপ পরামর্শ করিয়াছে।

মধ্যাহ্নকাল বিগত প্রায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের আম-পাকান রৌদ্র বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। অনাথশরণ বহির্ব্বাটীর একটি কক্ষে ডেস্কের সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট। এই কক্ষটি তাহার নিজস্ব। এইখানেই রাত্রে শয়ন করে। ভিত্তিগাত্রে কয়েকখানি বিলাতী ছবির সঙ্গে একটি একতারা টাঙ্গানো, প্রভাতে ও সায়াহ্নে এইটি বাজাইয়া সে ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া থাকে। গৃহসজ্জার মধ্যে একটি ক্লক, একটি আলমারি, একটি আলনা এবং শয়নের খাট ছাড়া আর কিছুই নাই।

ডেস্কের ভিতর হইতে অনাথ হেমন্তকুমারের একখানি সদ্যঃপ্রাপ্ত চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার যেখানে যেখানে নগেন্দ্রবালার নাম ছিল, সেখানে সেখানে চুম্বন করিল। চিঠিখানি সম্মুখে রাখিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, কি যেন ধ্যান করিতে লাগিল। ঠং ঠং করিয়া ঘড়িতে দুইটা বাজিযা গেল।

অনাথ তখন ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিয়া, পত্রখানি খামে বন্ধ করিল। এক টুকরা কাগজ লইয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিল ঃ—

"আজ রাত্রি বারটার পর সকলে নিদ্রিত হইলে তুমি একবার আমার ঘরে আসিও।"

লিখিযা কাগজখানিকে পাকাইয়া পাকাইয়া ছোট করিল। পূর্ব্বকথিত খামসুদ্ধ চিঠিখানি ডেস্কে বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখে, অঙ্গন জনশূন্য। প্রথম কক্ষে, তাহার বউদিদি কয়েকজন সখীকে লইয়া তাস খেলিতেছেন। দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, পালঙ্কের উপর জননী নিদ্রামগ্না। কুলুঙ্গীর কাছে তাহার বালক ভ্রাতুষ্পুত্রটি দাঁড়াইয়া, চুরি করিয়া কুল আচার ভক্ষণ করিতেছে। কাকাকে দেখিয়া সে অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া ফেলিল। কাকা তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। তৃতীযটি পূজার ঘর; নারায়ণ-শিলা আছেন। মূর্ত্তিবিদ্বেষবশতঃ ইদানীং অনাথশরণ এই কক্ষে প্রবেশ করিত না। বাহিরে দাঁড়াইযা দেখিল, তাহার স্ত্রী মন্দাকিনী মেঝের উপর বঁটি পাতিযা তেঁতুল কাটিতেছে। দক্ষিণ হস্তের কাছে কলার পাতার উপর কতকটা কাটা তেঁতুল; বঁটির নিম্নে একরাশি কাঁইবীচি ছড়ান। মন্দাকিনীর ওষ্ঠাধর তাম্বুলরাগরঞ্জিত; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম; অঞ্চলাগ্র গলায় জড়ান। মন্দা আপন মনে হেঁট হইয়া তেঁতুল কাটিতেছিল। স্বামীকে দেখিতে পায় নাই। অনাথ প্রায় এক মিনিটকাল বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্ত্রীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল। বিবাহের পর এই সে প্রথম মন্দাকে ভাল করিয়া দেখিতেছে।

উঠানে আমগাছের শাখা হইতে একটা পাকা আম বাতাসে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে মন্দা চমকিয়া বাহিরের পানে চাহিল;—দেখিল বারান্দায় স্বামী দাঁড়াইয়া। তৎক্ষণাৎ সে বঁটি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। আধহাত পরিমাণ ঘোমটা টানিয়া জানালার কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার অঞ্চলবদ্ধ চাবিগুলি ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

অনাথ মৃদুপদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করিল। মন্দাকিনীর পা লক্ষ্য করিয়া পাকানো কাগজখানি ছুঁড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে মন্দা কাগজখানি কুড়াইয়া লইল। প্রথমতঃ দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিল। জানালার কাছে আসিয়া কাগজখানি খুলিয়া পাঠ করিল। তাহার পর একবার বাহিরে চাহিল। একটা আমগাছে কাঁচা পাকা অসংখ্য আম ধরিয়া রহিয়াছে। তাহার ভিতরে বসিয়া কোকিল ডাকিতেছে। অনেক

দূবে ঘুঘু ডাকিতেছে। আবার কাগজখানি পড়িল; আবার আমগাছের পানে চাহিল। গাছের ফাঁকে আকাশ দেখা যাইতেছে। মন্দা কাগজখানিকে বুকে চাপিয়া ধরিল। গলবস্ত্র হইয়া, নারায়ণ-শিলার সিংহাসনের সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিল। উঠিয়া আবার জানালার কাছে গিয়া কাগজখানি পাঠ করিল।

আজ তাহার জীবনের কি দিন? বিবাহের পর এই প্রথম স্বামী তাহাকে সম্ভাষণ করিলেন। জ্বরগায়ে মন্দার বিবাহ হইয়াছিল। ফুলশয্যা হইতে পায় নাই। যে তিনদিন শ্বশুববাড়ীতে ছিল, স্বামীব সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তখন সে তেরো বৎসরেব। মাঝে একবাব আসিয়া কয়েক মাস ছিল, তখন অনাথের নূতন "মতাদি" হইয়াছে। পবিজনবর্গের বহু আকিঞ্চন সত্ত্বেও অনাথ অন্তঃপুরে শয়ন করে নাই। এবার রাগ করিয়া তাহাকে কেহ বাটীব ভিতর আনিবাব চেষ্টা করে নাই। অনাথেব মাতা প্রতিদিনই নবীনাগণকে এ বিষয়ে অনুরোধ কবিতেন। কেহ কর্ণপাত করিত না। এতদিনে স্বামীর কি মনে পড়িয়াছে? মন্দার এ জন্মটা কি তবে বিফল হইবে না? স্বামী থাকিতেও তবে কি তাহাকে বিধবার জীবন যাপন করিতে হইবে না? তাহার আত্মীয়াগণের, সখীদেব, স্বামীব ভালবাসার কথা, সোহাগের কথা, শুনিয়া শুনিয়া তাহাব বুক ফাটিয়া যাইত। মনে হইত, কি পাপ সে করিয়াছে যাহার জন্য ঈশ্বব তাহাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছেন! এইবাব কি সে সব দুঃখ তবে দূব হইবে?

হঠাৎ মন্দাকিনীব চিন্তাস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইল। অর্গলিত দুযাবে বাহিব হইতে কে গুম্ গুম্ কবিযা কিল মারিতেছে।

ব্যস্ত হইয়া মন্দাকিনী দুযার খুলিয়া দিল। তাহার ছোট ননদ হবিমতি। হবিমতি বালবিধবা। আজ পাঁচ বৎসর হইল তাহাব এ দশা ঘটিযাছে। হবিমতি মন্দাব অপেক্ষা তিন বৎসবেব বড়, তবু দুই জনে খুব ভাব। দুই জনে একত্র এক শয্যায শয়ন করে। দুই জনে দুই জনেব সকল সুখ-দুঃখের ভাগী।

মন্দাকে দেখিয়া হরিমতি চমকিয়া বলিল—"তোব কি হযেছে লা?"

মন্দা ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"হবে আবার কি?"

"দোর বন্ধ করে কি কবছিলি?"

মন্দা চুপ করিয়া রহিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া হরিমতির ভাবি সন্দেহ হইল। মন্দাব গলাটি জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হযেছে বলবিনে ভাই?"

"বলব।"

"কখন বলবি?"

"রাত্তিরে।"

"না এখনি বল্।"

মন্দাও বলিবে না, হরিমতিও ছাড়িবে না। শেষে মন্দা বলিল।

শুনিয়া প্রথমটা হরিমতি চুপ করিযা রহিল। তাহার পব অল্প অল্প হাসিতে লাগিল।

মন্দা জিজ্ঞাসা করিল—"হাসছিস কেন ভাই?"

হরিমতি বলিল—"হাসছি তোর বরটিব রকম দেখে। আমি যা ভেবেছিলাম তাই। এবাব এসে অবধি ছোড়দার উস্‌খুস্ করে বেড়ান হচ্চে। বলেও ছিলাম বড় বউদিদিকে।"

"কি বলেছিলি?"

"বলেছিলাম, ওগো, এবার হয়ত ছোড়দার মন হয়েছে। এবার তোমরা চেষ্টা কর দেখি, এবার হয়ত ঘরে আসবেন। তা বউদিদি বল্লেন—মন হয়েছে ত আসুক না। আমি কি বারণ করেছি নাকি? আমি বল্লাম—এতদিন আসেন নি, এখন আপনা হতে কি আসতে পারেন? লজ্জা করে হয়ত। তিনি বল্লেন—সে বার অমন করে আমাদের অপমান করলে, আবাব আমি সাধ্‌তে যাব। আমি

তেমন মেয়ে নই। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। দু মাস ত এখন ছুটি আছে। ভুগুক, জব্দ হোক।"

মন্দা বলিল—"আমি কিন্তু ভাই যেতে পারব না।"

"কেন?"

"সে আমার ভাবি লজ্জা করবে।"

হরিমতি হাত নাড়িয়া বলিল—"ওলো দেখিস! কচি খুকীটি কিনা; ববের কাছে যেতে লজ্জা করবে। কতক্ষণে যাবি, ঘণ্টা গুণছিস, তাই বল্। মুখে আর ন্যাকামো করতে হবে না।"

মন্দা বলিল—"না ভাই ঠাট্টা রাখ্। আমার ভাবি ভয় হচ্ছে।"

"প্রথম দিনটে ভয় হতে পাবে। তা, একদিন বই ত নয়।"

"রোজ বোজ আমি যাব বুঝি? তা হলে একদিন ধরা পড়তে হবে না?"

"ধবা না পড়লে আব উপায কি ভাই? একদিন লজ্জা ত ভাঙ্গতেই হবে।"

"তার চেয়ে তুই ববং বউদিদিকে বল্‌গে আব একবার। তিনি যা হয কববেন।"

"আচ্ছা তা বলব; কিন্তু আজকেব দিনটে চুবি কবেই তোদেব দেখা হোক। দেখিস্ চুরির কাঁচা পেযারাটা আমটাব মতন চুরির সব জিনিসই বড় মিষ্টি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"ছোট বউ, ও ছোট বউ, ঘুমুলি ভাই?"

রাত্রে শয্যায় হবিমতি মন্দাকিনীকে ডাকিল। মন্দাকিনী ধড়মড় কবিয়া উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা কবিল—"বাবোটা হয়েছে?"

"বাবোটা ছেড়ে এই একটা বাজল ছোড়দাব ঘড়িতে।"

"তুমি বুঝি ঘুমিযে পড়েছিলে?"

"নাঃ —আমার চোখে কি আব ঘুম আছে? যত ঘুম তোর। যার বিয়ে তাব হুঁস নেই, পাড়া পড়শীব ঘুম নেই।"

এই কথা বলিয়া হরিমতি প্রদীপ জ্বালিল। আলনা হইতে একখানা ধোযা দেশী শাড়ী পাড়িয়া বলিল—"নে এইখানা পর্।" মন্দা বলিল—"না ভাই,—আব অতশে কাজ নেই।" হরিমতি বলিল—"দুব ছুঁড়ি, এই মযলা কাপড় পবে কি যায?" বলিয়া মন্দাব আঁচল ধরিয়া টান দিল। তখন মন্দা হরিমতিব আদেশ পালন করিতে পথ পাইল না।

কাপড় পরা হইলে হবিমতি বলিল—"বল্ এগিযে দিতে আসতে হবে না কি?" মন্দাকিনী একটা প্রচলিত দেশীয ঠাট্টা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সামলাইয়া লইল। কারণ এ সময় হরিমতিকে রাগানো সুবুদ্ধিব কর্ম্ম হইবে না। সুতবাং বলিল—"নইলে আমি বউ মানুষ একা যাব নাকি?"

দুই জনে দুয়ার খুলিযা বারান্দায় বাহিব হইল। নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রি। মন্দাকিনীর পাযে মল ছিল, ঝম্ ঝম্ কবিতে লাগিল। হরিমতি সে শব্দে চমকিয়া বলিল—"আ মরণ! মল চারগাছা খুলিস্‌নি? ভাবে ভোর হযেছিস্ যে।"

মন্দাকিনী মল খুলিয়া বালিসের নীচে রাখিয়া আসিল। তারপব দুই জনে বৈঠকখানা অভিমুখে চলিল। কাছাকাছি পর্য্যন্ত গিয়া হরিমতি মন্দাকিনীর কানে কানে বলিল—"দোর ভেজিয়ে রাখব; আস্তে আস্তে সাবধানে আসিস এখন।" বলিয়া সে ফিরিয়া গেল।

মন্দা ধীরে ধীরে সিঁড়ি চারিটি ভাঙ্গিয়া স্বামীর ঘরের বারান্দায় উঠিল। দুয়ারের ফাঁক দিয়া দেখিল, আলো জ্বলিতেছে। প্রবেশ করিতে তাহার অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল। বুকটি দুড় দুড় করিতে লাগিল। পা আর উঠে না। শেষে সাহসে ভর করিয়া দুয়ারটি নিঃশব্দে খুলিয়া প্রবেশ করিল।

দেখিল, মাথার শিয়রে বাতি জ্বালিয়া স্বামী নিদ্রা যাইতেছেন।

পিছু ফিরিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া মন্দাকিনী খিল দিল। বাতিটা নিবাইয়া দিল। ঘরে জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়াছিল, এখন তাহা যেন হাসিয়া উঠিল। স্বামীর বিছানায়, স্বামীর মুখে, জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। মন্দা দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ সেই সুপ্ত মুখখানি দেখিল। ভাবিল—ইনি আমার স্বামী। আমার স্বামী বড় সুন্দর।

এইরূপে এক মিনিট অতিবাহিত হইল। মন্দা মনে মনে বলিল—"বেশ মানুষ ত। লোককে ডেকে এনে নিজে দিব্যি করে নিদ্রা হচ্চে।"

কি করিবে কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। শেষে স্থির করিল, কখনও ত পদসেবা করিতে পাই নাই; এই প্রথম সুযোগ ছাড়ি কেন?

তখন সে সন্তর্পণে স্বামীর পদতলে উপবেশন করিয়া, পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। আরামে অনাথশরণের নিদ্রা গভীরতর হইল। জানালা দিয়া মিঠা মিঠা দক্ষিণা বাতাস আসিতেছে। এই ভাবে কিয়ৎকাল—প্রায় আধ ঘন্টা কাটিলে, মন্দা স্বামীর পার কাছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

দুইটা বাজিবা মাত্র অনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চেতনা প্রাপ্তির প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত অনুভব কবিল, তাহার মন যেন কিসের প্রতীক্ষায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। ক্রমে স্মরণ হইল, আজ মন্দাকিনীকে আসিতে বলিয়াছে; যতক্ষণ জাগিয়া ছিল, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। যখন সাড়ে বারোটা হইয়া গেল তখন মন্দাকিনী আসিবে না বুঝিয়া শয়ন করিয়াছে। এই ভাবিতে ভাবিতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। অমনি তাহার পা মন্দাকিনীর গায়ে ঠেকিল। কোমল স্পর্শে অনাথ বিস্মিত হইযা উঠিয়া বসিল। দেখিল মন্দাকিনী ঘুমাইতেছে। জ্যোৎস্না তখন সরিয়া গিয়াছে; মন্দাকিনীব মুখখানির উপর পড়িয়াছে। সেই আলোকে অনাথ সুপ্তিমগ্না নবযৌবনা পত্নীকে দেখিতে লাগিল। বড় সুন্দর বলিয়া মনে হইল। ঠোঁট দুখানি এক একবার কাঁপিয়া উঠিতেছে; মন্দা বুঝি তখন কোনও স্বপ্ন দেখিতেছিল!

স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া অনাথ ভাবিতে লাগিল, এ বড় সুন্দর ত। এ যেন নগেন্দ্রবালার চেযেও সুন্দর। দুই তিন মিনিট এইভাবে কাটিলে অনাথ সহসা মুখ ফিরাইয়া লইল; চক্ষু বুজিযা অস্ফুটস্বরে বলিল—হে ঈশ্বর, আমার হৃদয়ে বল দাও।

চন্দ্রালোক হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আনয়ন করে ভাবিয়া অনাথ ঝটিতি বাতিটা জ্বালিয়া ফেলিল। কেরোসিনের তীব্র আলোকে মনে হইল বুঝি স্বপ্নজড়িমা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দাকিনীর পায়ে হাত দিয়া তাহাকে জাগাইল।

মন্দা উঠিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কাপড়চোপড়গুলা কিছুতেই যেন আব বাগ মানে না। অনেক চেষ্টার পর, রীতিমত ঘোমটা দিয়া অনাথের পানে একবার আড়চোখে চাহিয়া, মুখ নত করিয়া বসিল।

অনাথ ডাকিল—"মন্দাকিনী।"

মন্দা নিমেষমাত্র কাল ঘোমটার ভিতর হইতে অনাথের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার চক্ষু নামাইল।

"মন্দাকিনী, আজ তোমায় কেন ডেকেছি জান?"

মন্দা ঘাড় নাড়িয়া বলিল সে জানে না।

অনাথ বলিল—"তবে শোন। আমার সঙ্গে তোমার কল্‌কাতায় যেতে হবে। যাবে?"

মন্দা উত্তর করিল না।

অনাথ বলিল—"যাবে কি?"

অতি মৃদুস্বরে মন্দা বলিল—"আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানে যাব।"

"আমার বাপ মার অমতে অজান্‌তে। যেতে পারবে?"

মন্দা কোনও উত্তর করে না। অনাথ বলিল—"কথা কও। এখন লজ্জার সময় নয়। যেতে

পারবে? বল।"

মন্দা বলিল—"মা বাপের অজ্ঞানতে কেন? তাঁদের অনুমতি নাও না, এখন ত সকলেই বিদেশে স্ত্রী নিয়ে যাচ্চে।

"সে প্রস্তাব আমি হারু কাকাকে দিয়ে করিয়েছিলাম। বাবার মত নেই। বলেছেন—ওর এখন মতি গতির স্থিরতা কি? নিজে যে চুলোয় ইচ্ছে হয় সেই চুলোয় যাক্। বাড়ীর বউটাকে যে জুতো মোজা পবিয়ে ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে যাবে, সে আমি বেঁচে থাকতে দেখতে পারব না।"

"তুমি আমায় ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে যাবে সত্যি কি?"

"আমরা দুজনে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হব।"

মন্দাকিনী প্রমাদ গনিল। স্বামী কি রহস্য করিতেছেন? বলিল—"আমি ঠাকুর দেবতা মানি, আমি কি কবে ব্রহ্মজ্ঞানী হব?"

অনাথ রীতিমত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল—"ও বিশ্বাস তোমায় পরিত্যাগ করতে হবে। ও সব ভুল। আমি কি করে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি?"

"তুমি লেখাপড়া শিখেছ। আমার কি বুদ্ধি আছে?"

"তোমাকেও লেখাপড়া শেখাব। কল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেব। মেয়েদের ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দেব।"

মন্দাকিনী ঘাড় নাড়িয়ে বলিল—"লেখাপড়া যদি শিখতে হয় তবে আমি তোমার কাছে শিখব। বুড়ো বয়সে আমি ইস্কুলে যেতে পাবর না।"

অনাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ কবিয়া থাকিয়া বলিল—"তুমি ভুল বুঝছ। আমরা দুজনে একত্র এক বাড়ীতে থাকব না ত।"

মন্দাকিনী বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা কবিল—"তবে আমি কোথায় থাকব?"

"সেই ইস্কুলেই; সেইখানে মেয়েরা পড়ে, থাকে, রীতিমত সকল বন্দোবস্ত আছে।"

মন্দা স্থির স্বরে বলিল—"তবে আমি যাব না।"

অনাথ দেখিল, যেখানে রোগ, সেখানে চিকিৎসা হইতেছে না। সকল কথা খুলিয়া বলা আবশ্যক। বলিল—"কেন আমি এতদিন তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিনি তুমি কিছু শুনেছ?"

মন্দা বলিল—"শুনেছি, কিন্তু ভাল বুঝতে পারিনি।"

"তবে বুঝিয়ে বলি, শোন। প্রথমতঃ, আমাদের বিবাহ ভালবাসার ফল নয়। দ্বিতীয়তঃ, তার অনুষ্ঠানাদি পৌত্তলিক মত অনুসারে হয়েছে। এই দুটি কারণে, আমার মতে, আমাদের বিবাহ অসিদ্ধ। সুতরাং তুমি আমার স্ত্রী নও, বোনের মত। বুঝ্‌লে?"

"না।"

"তবে আর একটা কথা খুব স্পষ্ট করে বলি শোন। আমি তোমায় ভালবাসিনে।"

মন্দা বলিল—"তা ত দেখতেই পাচ্ছি।"

"আমি আর একজনকে ভালবাসি।"

"তবে আমায় কল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে কি করবে?"

"দেখ মন্দা, আমি তোমায় ভাল না বেসে বিয়ে করেছি, তাই তোমার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করা হয়েছে। তার ওপর বাকী জীবনটা নিষ্ফল করে দিয়ে আর সর্ব্বনাশ করব না। আমরা দুজনেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করলে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা যাবে। তখন তুমি স্বাধীন হবে, যাকে ইচ্ছে বিবাহ কোরো। এই জন্যে কল্‌কাতায় গেলে আমাদের একত্রবাস অসম্ভব। সব কথা বুঝতে পারলে?"

মন্দাকিনী বেশী করিয়া ঘোমটা দিল। কোনও উত্তর করিল না, প্রশ্ন করিল না, কাঠের পুতুলের

মত বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অনাথ জানিতে পারিল, মন্দা কাঁদিতেছে।

ইহাতে অনাথ মনে ক্লেশ অনুভব করিল। ইচ্ছা করিল মন্দার মুখের আবরণ খুলিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহাকে বাধা দিল। এই রাত্রে, নির্জ্জন গৃহে, যুবতী স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শ করা নীতিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। সুতরাং শুধু বলিল—"মন্দা, কাঁদ কেন? আমি তোমার মঙ্গলের জন্যেই ত বলছি।"

কিন্তু মন্দাকিনী কিছুই বলিল না, তাহাব ক্রন্দনও থামিল না।

অনাথ ডাকিল—"মন্দা!"—এবার স্বর অন্যরূপ; এ যেন আদরের স্বর। এ স্বর শুনিয়া মন্দা বেশী কাঁদিতে লাগিল।

অনাথ বিস্মিত হইয়া ভাবিল—এ কথায় মন্দার এত দুঃখ? এত ক্লেশ? একটা ভাবী পরিত্রাণের আনন্দ সে অনুভব করিল না? আমি ভালবাসি না—ভালবাসিতে পারি না,—তাহা জানে, এ বন্ধন ছিন্ন হইলে, জীবনের সুখময় পথে চলিবার অবসর পাইবে। তথাপি এ প্রস্তাবে এত দুঃখ কেন? তবে কি আমায় ভালবাসে?

এই সময় ঘড়িতে টং টং করিয়া তিনটা বাজিল। মন্দা উঠিয়া বলিল—"আমি যাই।"

অনাথ মন্দাকে স্পর্শ করিল। তাহাব হাতখানি ধবিল,—ধবিযা বলিল—"তোমার মনের কথা আমায় খুলে বল মন্দা।"

মন্দা কম্পিত স্বরে উত্তর করিল—"আমাব এখন মাথার ঠিক নেই।"

"তবে কাল এস। আসবে?"

"দেখব।"

"দেখব না মন্দা, কাল নিশ্চয় এস।" অনাথের কণ্ঠস্বরে একটা আগ্রহ ধ্বনিত হইল। মন্দা বলিল—"আচ্ছা।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন যখন অনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন অনেক বেলা হইয়াছে। প্রথমেই মন্দাকিনীব অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুটি ছবির মত তাহার মনে উদয হইল।

অনাথ উঠিয়া বসিল। দেখিল চুলে পরিবাব একটি সোনার কাঁটা বিছানায পড়িয়া রহিযাছে। সেটি তাড়াতাড়ি বাক্সের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল।

প্রাতে সে প্রতিদিন সঙ্গীত ও উপাসনা করিয়া থাকে। কখনও বাদ যায় না। আজ আর তাহা হইয়া উঠিল না। আজ তাহার মনটা বড় উদ্‌ভ্রান্ত।

গ্রামের বাহিবে নদীতীরে গিয়া অনাথ পদচারণা কবিতে লাগিল। কিযৎক্ষণ পরে দেখিতে পাইল, বাটীর এক জন ভৃত্য মাখন সর্দ্দার ছুটিতে ছুটিতে তাহার অভিমুখে আসিতেছে।

হঠাৎ অমঙ্গল শঙ্কায় তাহার মন চমকিয়া উঠিল। কি হইয়াছে? ও কি আমারে ডাকিতে আসিতেছে? মন্দাকিনীর কিছু হয় নাই ত? অথবা সে কিছু করিয়া বসে নাই ত?

মাখন সর্দ্দার নিকটস্থ হইলে অনাথ দেখিল সে কাঁদিতেছে।

দ্রুতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি মাখন? কি হয়েছে?"

মাখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আর দাদা ঠাকুর, সর্ব্বনাশ হয়েছে। রোজা ডাকতে যাচ্চি। কাটি ঘা।"

কাটি ঘা অর্থে সর্পাঘাত। অনাথ ভাবিল, মন্দাকিনীকে সর্পে দংশন করিয়াছে। মাখন ততক্ষণ অনেক দূরে। কাহার এরূপ হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করা হইল না।

তখনি অনাথ বাড়ী ফিরিল। প্রথমে সহজ পদক্ষেপ আরম্ভ করিয়াছিল, ক্রমে গতির বৃদ্ধি করিল; পরে দৌড়িতে লাগিল।

সদর দরজায় বাড়ীতে আসিতে একটু ঘুরিতে হয়। বাগানের দুয়ার দিয়া প্রবেশ করিল। বাগানে বাগানে বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া কিয়দ্দূরে গাছের আড়ালে হরিমতি ও মন্দাকিনীকে দেখিতে পাইল। তাহারা পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইতেছে। দেখিয়া অনাথ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। উভয়েরই মাথার কাপড় খোলা। মন্দাকিনীর মুখখানি বিষন্নতা মাখা, হরিমতির চক্ষু দুইটি কৌতুকপূর্ণ। প্রথমে হরিমতিরা অনাথকে দেখিতে পায় নাই। কাছাকাছি আসতে দেখিতে পাইল। মন্দাকিনী ত্রস্ত হইয়া ঘোমটা দিল। হরিমতি অনাথের প্রতি যেন গোপনে হাস্য করিতেছে, যেন তাহার চক্ষু দুইটি দাদাকে বলিতেছে—"আমি সব জানি গো, সব জানি।" অনাথ জিজ্ঞাসা করিল—"হরি, কাকে সাপে কামড়েছে?" হরিমতি বিস্মিত হইয়া বলিল—"সাপে কামড়েছে? কই, কাকে তা তা জানিনে।

অনাথ বৈঠকখানায় গিয়া শুনিল, মাখন সর্দ্দারের স্ত্রীকে সর্পদংশন করিযাছে। তখন সে মাখনের বাড়ীর অভিমুখে চলিল। সেখানে গিয়া দেখিল, অনেক লোক জমিয়াছে, রোজাগণ উচ্চ স্বরে মন্ত্র পড়িতেছে। কিন্তু স্ত্রীলোকটি কিছুতেই বাঁচিল না। মাখন যখন রোজা লইয়া আসিল তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই দেখিয়া মাখনের যে কান্না! পাঁচ বৎসরের বালকের মত ভূমিতে লুটাইয়া লুটাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল। অনেকে সেই শোকবহ দৃশ্য সহ্য কবিতে পারিল না, হায়, হায, করিতে কবিতে সে স্থান পবিত্যাগ করিয়া গেল। অনাথও চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিবিল; অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, একজন কৃষকের অশিক্ষিত অমার্জ্জিত হৃদয়ে এত ভালবাসা! ইচ্ছা করিল হেমন্তকুমারকে আনিয়া একবার এ দৃশ্য দেখায়। সে সর্ব্বদা বলিয়া থাকে, পূর্ব্বরাগবর্জ্জিত, মন্ত্রপড়া-বিবাহে ভালবাসা কিছুতেই জন্মিতে পাবে না, তাহা একেবাবেই অসম্ভব।

বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল হেমন্তকুমারের একখানি পত্র আসিয়াছে।

সত্যমেব জযতে কলকাতা
১৭ই জৈষ্ঠ্য, সোমবার

প্রিয় ভ্রাতঃ

গত কল্য তোমাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছি, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। অদ্য একটা সুসংবাদ আছে। কান্তপুরের রাজা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীরঞ্জন বাহাদুর তাঁহার পুত্রের জন্য একটি শিক্ষক অন্বেষণ করিতেছিলেন; বৈকালে দুই ঘন্টা পড়াইতে হইবে। বেতন পঞ্চাশ টাকা। আমি ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। তোমায় তিনি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইবেন। কিন্তু তাহা হইলে তোমায় এক সপ্তাহের মধ্যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব তুমি পত্র পাঠমাত্র পূর্ব্ব পরামর্শ-মত শ্রীমতী মন্দাকিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া চলিয়া আইস। তোমার উত্তর পাইলেই আমি মহিলা বিদ্যালয়ে তাঁহার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব।

আমার সহিত দেখা হইলেই নগেন্দ্রবালা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তোমার প্রতি তাহার প্রেম যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগ্নী মন্দাকিনীকে লইয়া আসা সম্বন্ধে তুমি কিছু মাত্র দ্বিধা বা শঙ্কা করিও না। যদি বাধা প্রাপ্ত হও ত স্মরণ করিও পৃথিবীতে অধিকাংশ শুভকার্য্য সম্পাদনেই বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল; ঈশা স্বীয় প্রিয় ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সর্ব্বমঙ্গল বিধাতা তোমাব সহায় হউন।

ভবদীয়
শ্রীহেমন্তকুমার সিংহ

অনাথ হেমন্তকুমারের পত্রের কোনও উত্তর দিল না। মন্দাকিনীর অশ্রুমাখা মুখখানি কেবল তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যে সম্মত নয়! সে যে ভারি দুঃখিত। কি করিয়া তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে?

অদ্য প্রভাতে মাখন সর্দ্দারের ব্যাপার দেখিয়া তাহার মত ও বিশ্বাসে একটু আঘাত লাগিয়াছে। হয় ত মন্দাকিনী তাহাকে ভালবাসে, তাই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রস্তাবে সে অত দুঃখাতুর। বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয়সঞ্চার না হইলে, পরে যে তাহা হইবেই না, তাহার স্থিরতা সম্বন্ধে অনাথের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় তাহার বালক ভ্রাতুষ্পুত্রটি আসিয়া তাহার হাতে একটি খাম দিয়া সবেগে পলায়ন করিল। খাম আঠা দিয়া বন্ধ, ভিতরে চিঠি রহিয়াছে, অথচ কোনও শিরোনামা নাই। অনাথ খামখানি ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িল; তাহাতে লেখা আছে ঃ—

প্রিয়তমেষু

তুমি আমায় যেখানে লইয়া যাইবে, যাইতে প্রস্তুত আছি। যে দিন যে সময়ে বলিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব। আজ রাত্রে সাক্ষাৎ করিতে পারিব না।

চরণাশ্রিতা দাসী
শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী

এ পত্র পাইয়া অনাথ ভারি বিস্মিত হইল। যাইতে প্রস্তুত? বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে আর দুঃখ নাই?

কয় পংক্তি অনাথ বারম্বার পাঠ করিল। যদি দুঃখ নাই তবে ভালবাসে না। অথচ লিখিয়াছে "প্রিয়তমেষু"—"চরণাশ্রিতা দাসী"—ইহার অর্থ কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির করিল, ওগুলা বাঁধিগৎ, ওগুলার কোনও বিশেষ অর্থ নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে তাহার মনে ব্যথা বাজিয়া উঠিল।

কিন্তু তাহা ক্ষণিক মাত্র। মনকে সে দুই তাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে তোমাকে ভালবাসে না বাসে তাহাতে তোমার কি? মন বলিল—নাঃ—তাহার জন্য আমার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নাই। নগেন্দ্রবালার মানসী প্রতিমাকে সে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বুকে চাপিয়া ধরিল, ভাবিল আর এক দিনও বিলম্ব করা হইবে না। কল্যই মন্দাকিনীকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে। রাত্রি একটার সময় বাহির হইবে। দুই ক্রোশ দূরে রতনপুর গ্রাম; সে অবধি পদব্রজেই যাইবে। সেখান হইতে গোরুর গাড়ি করিয়া ষ্টেশনে যাইবে। তারকেশ্বর দিয়া যাইলে আট ক্রোশ, পাণ্ডুয়া দিয়া যাইলে এগারো ক্রোশ; পাণ্ডুয়া দিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। গ্রামের লোকজনের সঙ্গে দেখা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। একটু দূর হইবে, বিলম্ব হইবে, তা আর কি হইবে? সারারাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা প্রকার কাল্পনিক আয়োজনে তাহার মস্তিষ্ক অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই মন্দাকিনীকে লিখিল ঃ—

প্রিয় ভগ্নি,

আজ রাত্রি একটার সময় যাত্রা করিতে হইবে। ঐ সময় আমার ঘরে আসিও। জিনিসপত্রের মধ্যে দ্বিতীয় একখানি বস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই লইও না।

শ্রীঅনাথশরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রি একটার সময়, স্ত্রীকে চুরি করিয়া অনাথ পলায়ন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দুইদিন পরে বেলা বারোটার সময় যখন পাণ্ডুয়ার বাজারে অনাথশরণ গোশকট হইতে মন্দাকিনীর সহিত অবতরণ করিল, তখন রৌদ্র অত্যন্ত প্রচণ্ডভাব ধারণ করিয়াছে। দুইজনে স্বেদাক্ত কলেবর। গাড়ীভাড়া চুকাইয়া দিয়া অনাথ একটা দোকানে উঠিল। দোকানী অভ্যর্থনা করিয়া মাদুর বিছাইয়া তাহাকে বসাইল। একটা ঝি আসিয়া মন্দাকিনীকে আড়ালে স্ত্রীলোকদের বসিবাব স্থানে লইয়া গেল।

সেই ঘরের সম্মুখেই বারান্দা। বারান্দার নিম্নেই একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। জল বড় নির্ম্মল; মন্দাকিনীর শরীর বড় উত্তপ্ত; পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ। ঝিকে বাজার করিতে পাঠাইয়া মন্দাকিনী স্নান করিতে নামিল। তখনও সে যথেষ্ট বিশ্রাম করে নাই; গায়ের ঘাম পর্য্যন্ত মরে নাই। যতক্ষণ ঝি ফিরিল না, ততক্ষণ—আধঘন্টা হইবে,—মন্দা জলে পড়িয়া রহিল। ঝি আসিলে, উঠিয়া মাথা শ মুছিয়া রান্না চড়াইয়া দিল।

এই অত্যাচারের প্রতিফল পাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। রন্ধন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মন্দা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল।

অনাথ স্নান কবিযা জল খাইয়া ষ্টেশনে গিয়াছিল গাড়ীর খবব লইতে, এবং হেমন্তকুমারকে টেলিগ্রাম পাঠাইতে। ফিরিয়া আসিযা দেখে, এই ব্যাপার। মন্দার গায়ে হাত দিল, গা একবারে পুড়িয়া যাইতেছে। চক্ষু দুইটি জবার মত লালবর্ণ। শীতে হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে।

সঙ্গে না আছে বিছানা বালিস না আছে বাহুল্য বস্ত্র। মন্দা কিসেই বা শয়ন করে, কি বা গায়ে দেয়। অনাথ বলিল—"একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি কম্বল চেয়ে এনে বিছানা করে দিচ্চি।"

মন্দাকিনী বলিল—"তুমি আগে খেতে বস। তোমাকে ভাত বেড়ে দিই, তারপর শোব এখন।"

অনাথ বলিল—"পাগল! এখন ভাত বাড়তে হবে না। তোমাব এমন অসুখ, আমি কি খেতে পারি?"

মন্দা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"আমার অসুখ তা কি? তা বলে' তুমি উপবাসী থাকবে? দুদিনেব কষ্টে তোমাব মুখ শুকিয়ে আধখানি হয়ে গেছে।"

অনাথ দোকানীর নিকট চাহিয়া একখানা বালাপোষ আর খান দুই তিন কম্বল লইয়া আসিল। সেইগুলি দিয়া বিছানা করিয়া মন্দাকে বলিল—"শোবে এস।" মন্দা বলিল,—"ও কি কথা? তুমি না খেলে আমি শোব না।"

অনাথ শুনিল না, মন্দাকিনীকে শয়ন করাইল। বিছানায় শুইয়া মন্দাকিনী দুই তিন বার বলিল—"ভাত বেড়ে নিয়ে খাও তুমি আপনি। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে কষ্ট হবে।" কিন্তু আর বেশীক্ষণ জিদ করিবার শক্তি তাহার রহিল না, অল্পে অল্পে জ্বরঘোরে অচেতন হইয়া পড়িল।

*　　　*　　　*

তিন দিন পরে যখন মন্দাকিনীর জ্ঞান সঞ্চার হইল, তখন সে চক্ষু খুলিয়া দেখিল, বিছানার কাছে স্বামী বসিয়া।

অনাথ জিজ্ঞাসা করিল—"মন্দা, কেমন আছ?"

মন্দা বলিল—"ভাল আছি। তুমি ভাত খেয়েছ?" বলিতে বলিতে আশে পাশে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, সে দোকান নহে, এ গৃহ; পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—"এ কি! আমি এ কোথায় রয়েছি?"

অনাথ বলিল—"মন্দা, তোমাকে যে আর কথা কইতে শুনব, তা ভাবিনি। তিন দিন কেটে গেছে। এ এখানকার জমিদারের বাড়ী।"

মন্দা বলিল—"তিন দিন!"

"হ্যাঁ মন্দা, তিন দিন তুমি অচেতন হয়ে ছিলে। এখন তোমায় যদি বাঁচাতে পারি, তবেই সব সার্থক।"

মন্দা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে বলিল—"তোমায় একটা কথা বলব।"

অনাথ বলিল—"কি মন্দা?"

"আমাকে বাঁচিও না।"

এ কথা শুনিয়া অনাথের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বলিল—"ছি মন্দা, ও কথা কি বলতে আছে? তুমি ভাল হবে, তুমি বাঁচবে।"

মন্দার ঠোঁট দুটি কাঁপিয়া উঠিল। জলভরা চোখ দুইটি অনাথের পানে ফিরাইয়া বলিল—"কি হবে আমার বেঁচে? আমায় যেতে দাও।"

অনাথ বলিল—"না মন্দা, তোমাকে আমি যেতে দেব না।"

"কি করবে আমায় নিয়ে?

"আমি তোমায় ভালবাসব।"

রোগিণীর দুর্ব্বল মস্তিষ্ক চিন্তার ভার আর সহিতে পারিল না। চক্ষু মুদিয়া মন্দা যেন ঘুমাইয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু আসিলেন। অনাথ সহাস্যমুখে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল,— "দুপুর বেলাকার ওষুধটায় বেশ ফল হয়েছে। জ্ঞান হয়েছে। এই কিছুক্ষণ আগে কথাবার্ত্তা কয়েছেন।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"তবে আর ভাবনা নেই। এ জ্বরটুকু দুদিনে সারিয়ে দেব। কিন্তু আপনি যে মারা গেলেন। এ তিন দিন ত এক রকম না খেয়ে আপনি ঠায় বসে আছেন। আপনার মত পত্নীপ্রেমিক স্বামী আমি খুব কম দেখেছি।"

অনাথ মনে মনে বলিল—"খুব কম বটে।" প্রকাশ্যে বলিল—"আমার স্ত্রী, আমি ত স্বভাবতঃই করব। কিন্তু আপনি যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা নেই।"

প্রবীণ ডাক্তার বাবু, আত্মপ্রশংসায় সঙ্কুচিতচিত্ত হইয়া বলিলেন,—"আমি বেশী কি করেছি? আমি যা করেছি সেই ত আমার পেশা, জীবিকা।"

"আপনি যদি বাবুদের বলে বাগানবাড়ী খুলিয়ে না দিতেন, তাহলে দোকানের সে স্যাঁতসেঁতে মেঝেয় কম্বলের ওপর শুয়ে আমার স্ত্রী কদিন বাঁচতেন?"

ডাক্তার বাবু কথা উল্টাইয়া লইয়া, অন্য কথা পাড়িলেন। তাহার পব ঔষধ পথ্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেদিন রাত্রি দশটায় মন্দার জ্বর মগ্ন হইল। সে সারারাত্রি সুনিদ্রা উপভোগ কবিল। তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া অনাথও কয় দিনের পর খুব ঘুমাইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রভাতে যখন ডাক্তার বাবু আসিলেন, তখন মন্দাকিনী তাঁহাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় দিল। জ্বর ছাড়িয়াছে শুনিয়া ডাক্তার বাবু অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, আর কিছু মাত্র ভয় নাই। এখন ইঁহাকে খুব প্রফুল্ল রাখা প্রয়োজন।

ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে, অনাথ মন্দাকে নিয়মিত ঔষুধ পথ্যাদি সেবন করাইল। তাহার পর দুইজনে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

মন্দা বলিল—"এ কদিন কি খেলে?"

"ডাক্তার বাবুদের বাড়ী থেকে খাবার আসত।"

"তবে চেহারা এমন হয়ে গেল কেন? একেবারে শুকিয়ে যে আধখানি হয়ে গেছ। আমিই তোমার যত কষ্টের মূল। আমার জন্যে কেন এত করলে?"

অনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল—"যদি আমার ব্যারাম হয়, তা হলে তুমি আমার জন্যে কর না?"

মন্দা বিছানার দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"আর ব্যারামের প্রার্থনায় কাজ নেই।"

অনাথ মন্দার একখানি হাত ধরিয়া আদর করিয়া বলিল—"প্রার্থনা নাই করলাম, হলে কর কি না?"

"করি না ত কি?"

"কেন?"

অশ্রুবদ্ধ কণ্ঠে মন্দা বলিল—"তুমি যে আমার স্বামী।"

অনাথ মন্দার হাতখানি চাপিয়া বলিল—"তুমি যে আমাব স্ত্রী।"

মন্দা সস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা কবিল—"কবে থেকে?"

"যে দিন তোমায ভালবেসেছি।"

মন্দাকিনী কিযৎক্ষণ চুপ কবিয়া বহিল। শেষে বলিল—"তুমি না ব্রাহ্ম? তুমি না মিছে কথা বল না?"

অনাথ বলিল—"আমি ব্রাহ্ম, আমি মিছে কথা বলিনে, আমি তোমায় ভালবাসি।"

"তবে সে দিন বল্লে 'ভালবাসব'। কেন বলনি 'ভালবাসি'?"

অনাথ নিরুত্তর। বলিল—"তুমি ত আমায ভালবাস না।"

"কিসে জানলে?"

"তুমি ত আমাদেব বিবাহবন্ধন ছিন্ন হতে দিতে সম্মত হযেছিলে তাই ত কলকাতায় যাচ্ছিলে।"

মন্দা হাসিযা বলিল—"তা বুঝি?"

"কি তবে?"

"আমি বুঝি আসতে চেয়েছিলাম? ঠাকুঝিই ত আমাকে পাঠালে।"

"তাব ভাবি ইচ্ছে তোমাব আর একটি বিয়ে হয?"

"হ্যাঁ,—পাত্রও ঠিক কবে দিয়েছিল।"

"কে?"

"যমরাজ।"

অনাথ হাসিতে লাগিল। মন্দা বলিল—"ঠাকুর্ঝি বলেছিল, তোকে যেমন দাদা বাড়ী থেকে চুরি করে নিযে যাচ্চে, তুইও তেমনি পথে তার মন ডাকাতি করবি। না যদি পারিস, তবে—"

অনাথ বাধা দিয়া বলিল—"তবে ঐ বিয়েব বন্দোবস্ত? তা ডাকাতিই করেছ বটে। এদিকে অন্য বিয়ের যোগাড়যন্ত্রটিও বেশ করে তুলেছিলে।"

মন্দা বলিল—"কিন্তু সে ভালবাসার বিয়ে হচ্ছিল না। তাই ব্যাঘাত হল। ঠিক কখন আমি ডাকাতিটে করেছি, শুনতে পাইনে?"

"সে সব পরে বলব।"

"কখন করেছি, সেইটে বল।"

"কখন? যেদিন প্রথম আমার বিছানায় পার তলায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলে, তখন আরম্ভ করেছ আর কি। তার পর সারাপথে।"

চাণক্যপণ্ডিত বুধগণের প্রতি উপদেশ দিয়াছেন, ঘৃতকুম্ভসমা নারী এবং তপ্তাঙ্গারসম পুরুষকে একত্র স্থাপন করিবে না, করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। সেই নরনারী স্বামী স্ত্রী হইলে এবং তরুণ বয়স্ক হইলে কি আর রক্ষা আছে।

মন্দা অল্প হাসিতে হাসিতে বলিল—"পথে তবে কেন আত্মসমর্পণ করনি?"

অনাথ কিছুই না বলিয়া স্ত্রীর মুখেব পানে চাহিয়া রহিল।

মন্দা মৃদুস্বরে বলিল—"নগেন্দ্রবালা? আমার স্বামীকে নগেন্দ্রবালা নেবে, নগেন্দ্রবালার বড় সাধ্যি! চল একবার কলকাতায়, তাকে আমি দেখব।"

অনাথ বলিল—"কলকাতায় ত যাব না। পশ্চিম যাব, তোমার শরীর সারাতে।"

মন্দা এ কথা যেন কানে তুলিল না। জিজ্ঞাসা করিল—"সত্যি সে তোমায় ভালবাসে? তা হলে তার ত ভারি দুঃখ হবে।"

"সে আমায় ভালবাসে কি না, সেই জানে আর ঈশ্বরই জানেন।"

"বলেনি? জিজ্ঞাসা করনি?"

"তার সঙ্গে কখনও এ কথা হয়নি।"

"তুমি ভালবাসতে তা সে জানে?"

"কি করে জানবে?"

মন্দা অভিমান ভরে বলিল—"সে না জানুক, তুমি ত বাসতে।"

অনাথ বলিল—"কৈ আর বাসতাম? তা হলে তুমি এত শীঘ্র এত সম্পূর্ণভাবে আমাকে জয় করলে কি করে? এই ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেল আমি তাকে যথার্থ ভালবাসতাম না। শুধু চোখের ভালবাসা ছিল, অন্তরে প্রবেশ করেনি। তার বিদ্যা, তার বুদ্ধি, তার আচার ব্যবহারের সৌন্দর্য্য, এই সমস্ত আমাকে মুগ্ধ করে ফেলেছিল।"

দুইদিন পরে মন্দা পথ্য পাইল। দুইটি দিন দুই জনে বাগান বাড়ীতে বড়ই আনন্দে যাপন কবিল।

আজ সন্ধ্যায় ডাক্তার বাবুদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইয়া, কল্য প্রভাতের গাড়ীতে তাহাবা মুঙ্গেব যাত্রা করিবে। সমস্ত ঠিকঠাক।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার বাবুর বৈঠকখানায় বসিযা অনাথ হেমন্তকুমারের নিকট হইতে এই পত্র পাইল—

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্

কলিকাতা
২৫ জ্যৈষ্ঠ। মঙ্গলবাব

প্রিয় ভ্রাতঃ

ভগ্নী মন্দাকিনীর অসুস্থতার সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ঈশ্বর শীঘ্র তাঁহার আরোগ্যবিধান করুন।

আজ তোমায় একটা দারুণ দুঃসংবাদ দিব, প্রস্তুত হও। তুমি বলিয়াছিলে, তোমার দৃঢ় বিশ্বাস, নগেন্দ্রবালা তোমাকে ভালবাসেন। আমারও বিশ্বাস তাহাই ছিল। কিন্তু কল্য সন্ধ্যাকালে আমার সে ধারণা চূর্ণ হইয়াছে। শুনিলাম, শরতের সঙ্গে নগেন্দ্রবালার বিবাহ স্থির। আরও, শুনিলাম, দুই বৎসর হইতে তাঁহারা পরস্পরের প্রণয়ে আবদ্ধ। সুতরাং নগেন্দ্রবালার ব্যবহারে তুমি যে অনুমান করিয়াছিলে তোমার প্রতি তিনি প্রণয়রতা, তাহা তোমার ভ্রান্তি মাত্র।

এখন তুমি কি করিবে? এ দুঃসহ শোক কেমন করিয়া বহন করিবে?

তোমার আর একটা ভুল হইয়াছে। হিন্দু মতে যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, নূতন ব্রাহ্ম-বিবাহ আইনের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং তোমরা উভয়ে ব্রাহ্ম হইলেও, সে বন্ধন ছিন্ন করিবার পথও বন্ধ।

তুমি কি কলিকাতায় আসিবে? চারি পাঁচ দিনের মধ্যেও যদি ভগ্নী আরোগ্য লাভ করেন, এখানে আসিতে পার, তাহা হইলেও পূর্ব্বকথিত রাজবাড়ীর সেই কার্য্যটি হস্তান্তরিত হইবে না। কিন্তু আমার পরামর্শ, ভগ্নীকে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া তুমি কিয়দ্দিন হিমালয়ের কোনও নিভৃত প্রদেশে গমন করতঃ তপস্যা ও উপাসনায় চিত্তস্থির ও আত্মশান্তিবিধান করিবে।

ভবদীয়
শ্রীহেমন্তকুমার সিংহ

রাত্রি নয়টার পর ডাক্তার বাবুর বাড়ী হইতে ফিরিয়া অনাথ স্ত্রীকে পত্রখানি দেখাইল। মন্দা পড়িয়া হাসিয়া বলিল,—"তবে আর নগেন্দ্রবালার ওপর আমার রাগ নেই। মুঙ্গেরে না গিয়ে কলকাতাতেই চল, নগেন্দ্রবালার বিয়েটা দেখতে হবে।"

অনাথ বলিল—"তাই চল। মুঙ্গেরে যাবাব আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, আমায় ভুলে যেতে নগেন্দ্রবালাকে অবসব দেওয়া।"

শুনিয়া মন্দাকিনী ভাবি অভিমানেব ভান করিল। বলিল—"তাই তখন মনের কথা খুলে বল্লেই ত হ'ত। বলা হল তোমার শরীর সারাবার জন্যে পশ্চিম যাচ্চি।"

বাহিরে অন্ধকার বকুলগাছে একটা কোকিল বসিযাছিল, সে হয়ত মানবেব ভাষা বুঝিতে পারে। বুঝি মন্দাকিনীর এ ছলনাময় মানকথা শুনিযা সে ভারি আমোদ পাইল। তাই মুহুর্মুহু ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করিল। অনাথ স্ত্রীকে বক্ষের নিকট টানিযা লইয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল—"না গো না,—তা নয়।"

ভারতী : বৈশাখ ১৩১৫

বি লা সী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই। আমি একা নই—দশ-বারোজন। যাহাদেবই বাটী পল্লীগ্রামে, তাহাদেরই ছেলেদের শতকবা আশি জনকে এমনি করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্যন্ত একেবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে, তাহাতে হিসাব করিবার পক্ষে এই কয়টা কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদের সকাল আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতে চার ক্রোশ পথ ভাঙিতে হয়—চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি—বর্ষার দিনে মাথার উপর মেঘের জল ও পায়ের নীচে এক-হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য এবং কাদার বদলে ধূলার সাগর সাঁতার দিয়া স্কুল-ঘর করিতে হয়, সেই দুর্ভাগা বালকদের মা-সরস্বতী খুশি হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি মুখ লুকাইবেন, ভাবিয়া পান না।

তারপরে এই কৃতবিদ্য শিশুর দল বড়ো হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান—তাঁদের চার ক্রোশ-হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা যাদের ক্ষুধার জ্বালা, তাদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু যাঁদের সে জ্বালা

নাই, তেমন সব ভদ্রলোকেই বা কি সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন? তাঁরা বাস করিতে থাকিলে ত পল্লীর এত দুর্দশা হয় না।

ম্যালেরিয়ার কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম। সে থাক্, কিন্তু ঐ চার ক্রোশ-হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া সহরে পালান, তাহার আর সংখ্যা নাই। তার পরে একদিন ছেলে-পুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু সহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।

কিন্তু থাক্ এ-সকল বাজে কথা। ইস্কুলে যাই—দু' ক্রোশের মধ্যে এমন আরও ত দু' তিনখানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে শুরু করিয়াছে, কোন্ বনে বঁইচি ফল অপর্যাপ্ত ফলিয়াছে, কার গাছে কাঁঠাল এই পাকিল বলিয়া, কার মর্তমান রম্ভার কাঁদি কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে ঝোপের মধ্যে আনারসের গায়ে রঙ ধরিয়াছে, কার পুকুরপাড়ের খেজুর-মেতি কাটিয়া খাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, এই-সব খবর লইতেই সময় যায়, কিন্তু আসল যা বিদ্যা—কামস্কট্‌কার রাজধানীর নাম কি, এবং সাইবিরিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে, না সোনা মেলে—এ-সকল দরকারি তথ্য অবগত হইবার ফুরসৎই মেলে না।

কাজেই এক্‌জামিনের সময় এডেন কি জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারসিয়ার বন্দর, আর হুমায়ুনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগ্‌লক খাঁ—এবং আজ চল্লিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও-সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় এক রকমই আছে—তার পরে প্রোমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মতলব করি, মাষ্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি, অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেওয়াই কর্তব্য।

আমাদের গ্রামে একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝে স্কুলের পথে দেখা হইত। তার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে অনেক বড়ো। থার্ড ক্লাশে পড়িত। কবে যে সে প্রথম থার্ড ক্লাশে উঠিয়াছিল, এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না—সম্ভবতঃ তাহা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়—আমরা কিন্তু তাহার ঐ থার্ড ক্লাশটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি। তাহার ফোর্থ ক্লাশে পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেণ্ড ক্লাশে উঠিবার খবরও কখনো পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা ভাই-বোন কেহই ছিল না, ছিল শুধু গ্রামের এক-প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান, আর তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পোড়ো বাড়ি, আর ছিল এক জ্ঞাতি খুড়া। খুড়ার কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা—সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এমনি আরও কত কি। তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো, ঐ বাগানের অর্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল একদিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়—উপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে-কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রান্না করিয়া খাইত এবং আমের দিনে ঐ আম-বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চলিত, এবং ভালো করিয়াই চলিত। যেদিন দেখা হইয়াছে, সেইদিনই দেখিয়াছি ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কখনো কাহারও সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই—বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়। কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে, বই চুরি গেছে, ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঋণ স্বীকার করা ত দূরের কথা, ছেলে তাহার সহিত একটা কথা কহিয়াছে এ-কথাও কোনো বাপ ভদ্র-সমাজে কবুল করিতে চাহিত না—গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।

অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই। একদিন শোনা গেল সে মর মব। আব একদিন শোনা গেল, মালপাড়ার এক বুড়া মাল তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এ-যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেকদিন তাহার অনেক মিষ্টান্নের সদ্ব্যয় করিয়াছি—মনটা কেমন করিতে লাগিল, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তার পোড়ো-বাড়ির প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতবে ঢুকিযা দেখি, ঘবেব দবজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তাপোযেব উপব পরিষ্কার ধপ্‌ধপে বিছানায মৃত্যুঞ্জয় শুইযা আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায় বাস্তবিকই যমবাজ চেষ্টাব ত্রুটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্যন্ত সুবিধা কবিয়া উঠিতে পাবেন নাই, সে কেবল ওই মেয়েটির জোবে। সে শিয়রে বসিয়া পাখাব বাতাস করিতেছিল, অকস্মাৎ মানুষ দেখিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল। এই সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তাহাব বয়স আঠাবো কি আটাশ ঠাহর কবিতে পাবিলাম না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বযস যাই হোক, খাটিয়া খাটিযা আর রাত জাগিযা জাগিয়া ইহাব শরীরে আব কিছু নাই। ঠিক যেন ফুলদানীতে জল দিয়া ভিজাইয়া-রাখা বাসি ফুলের মতো। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝবিয়া পড়িবে।

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনিতে পাবিযা বলিল, কে, ন্যাড়া?

বলিলাম, হুঁ।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, ব'সো।

মেয়েটা ঘাড় হেঁট কবিয়া দাঁড়াইয়া বহিল। মৃত্যুঞ্জয় দুই-চারিটা কথায যাহা কহিল, তাহাব মর্ম এই যে, প্রায দেড়মাস হইতে চলিল সে, শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনেরো দিন সে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায পড়িযাছিল, এই কযেকদিন হইল সে লোক চিনিতে পাবিতেছে এবং যদিচ এখনো সে বিছানা ছাড়িযা উঠিতে পাবে না, কিন্তু আব ভয নাই।

ভয নাই থাকুক। কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম, আজও যাহার শয্যাত্যাগ কবিযা উঠিবাব ক্ষমতা হয নাই, সেই বোগীকে এই বনেব মধ্যে একাকী যে মেয়েটি বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছিল, সে কত বড়ো গুরুভার! দিনেব পর দিন, বাত্রির পর রাত্রি তাহাব কত সেবা, কত শুশ্রূষা, কত ধৈর্য, কত বাত-জাগা। সে কত বড়ো সাহসেব কাজ! কিন্তু যে বস্তুটি এই অসাধ্য-সাধন করিযা তুলিয়াছিল তাহাব পরিচয় যদিচ সেদিন পাই নাই, কিন্তু আব একদিন পাইয়াছিলাম।

ফিবিবাব সময মেয়েটি আর একটি প্রদীপ লইয়া আমাব আগে আগে ভাঙা প্রাচীরের শেষ পর্যন্ত আসিল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই, এইবাব আস্তে আস্তে বলিল, রাস্তা পর্যন্ত তোমায বেখে আসব কি?

বড়ো বড়ো আমগাছে সমস্ত বাগানটা যেন একটা জমাট অন্ধকারেব মতো বোধ হইতেছিল, পথ দেখা ত দূরের কথা, নিজেব হাতটা পর্যন্ত দেখা যায না। বলিলাম, পৌঁছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তে আস্তে সে বলিল, একলা যেতে ভয় করবে না ত? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?

মেয়েমানুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না ত! সুতরাং মনে যাই থাক, প্রত্যুত্তরে শুধু একটা 'না' বলিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল, ঘন-জঙ্গলের পথ একটু দেখে দেখে পা ফেলে যেয়ো।

সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম উদ্বেগটা তাহার কিসের জন্য এবং কেন সে আলো দেখাইয়া এই বনেব পথটা পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল। হয়ত সে নিষেধ শুনিত

না, সঙ্গেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুঞ্জয়কে একাকী ফেলিয়া যাইতেই বোধ করি তাহার শেষ পর্যন্ত মন সরিল না।

কুড়ি-পঁচিশ বিঘার বাগান। সুতরাং পথটা কম নয়। এই দারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয়ে ভয়ে করিতে হইত, কিন্তু পরক্ষণেই মেয়েটির কথাতেই সমস্ত মন এমনি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, ভয় পাইবার আর সময় পাইলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল, একটা মৃতকল্প রোগী লইয়া থাকা কত কঠিন! মৃত্যুঞ্জয় ত যে কোনো মুহূর্তেই মবিতে পারিত, তখন সমস্ত রাত্রি এই বনের মধ্যে মেয়েটি একাকী কি করিত! কেমন করিয়া তাহাব সে রাতটা কাটিত।

এই প্রসঙ্গের অনেকদিন পরের একটা কথা আমার মনে পড়ে। এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। অন্ধকার রাত্রি—বাটীতে ছেলেপুলে চাকর-বাকব নাই, ঘরের মধ্যে শুধু তাঁর সদ্য-বিধবা স্ত্রী, আর আমি। তাঁর স্ত্রী ত শোকের আবেগে দাপা-দাপি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়' তুলিলেন যে, ভয় হইল তাঁহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার বার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কি? তাঁর যে আব তিলার্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদেব ঘবে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষাণ? আর এই রাত্রেই গ্রামের পাঁচজনে যদি নদীর তীবের কোনো একটা জঙ্গলেব মধ্যে তাঁর সহমরণের যোগাড় করিয়া দেয ত পুলিশের লোক জানিবে কি করিয়া? এমনি কত কি! কিন্তু আমাব ত আর বসিয়া বসিযা তাঁব কান্না শুনিলেই চলে না। পাড়ায খবব দেওয়া চাই—অনেক জিনিস যোগাড় কবা চাই। কিন্তু আমার বাহিরে যাইবার প্রস্তাব শুনিযাই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, ভাই, যা হবার সে ত হয়েচে, আর বাইবে গিযে কি হবে? রাতটা কাটুক না।

বলিলাম, অনেক কাজ, না গেলেই যে নয়।

তিনি বলিলেন, হোক কাজ, তুমি ব'সো।

বলিলাম, বসলে চলবে না, একবার খবর দিতেই হবে, বলিয়া পা বাড়াইবামাত্রই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওরে বাপ রে! আমি একলা থাকতে পারব না।

কাজেই আবাব বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ তখন বুঝিলাম, যে-স্বামী জ্যান্ত থাকিতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি-বা সহে, তাঁর মৃতদেহটা এই অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যও সহিবে না।

বুক যদি কিছুতে ফাটে ত সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে।

কিন্তু দুঃখটা তাঁহার তুচ্ছ করিয়া দেখানও আমার উদ্দেশ্য নহে। কিংবা তাহা খাঁটি নয় এ-কথা বলাও আমার অভিপ্রায় নহে। কিংবা একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা জানি, যাহার উল্লেখ না করিয়াও আমি এই কথা বলিতে চাই যে, শুধু কর্তব্য-জ্ঞানের জোরে অথবা বহুকাল ধবিয়া একসঙ্গে ঘর কবার অধিকারেই এই ভয়টাকে কোনো মেয়েমানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটা শক্তি, যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর করার পরেও হয়ত তাহার কোনো সন্ধান পায় না।

কিন্তু সহসা সেই শক্তির পরিচয় যখন কোনো নর-নারীর কাছে পাওয়া যায়, তখন সমাজের আদালতে আসামী করিয়া তাহাদের দণ্ড দেওয়ার আবশ্যক যদি হয় ত হোক, কিন্তু মানুষের যে বস্তুটি সামাজিক নয়, সে নিজে যে ইঁহাদের দুঃখে গোপনে অশ্রু বিসর্জন না করিয়া কোনোমতে থাকিতে পারে না।

প্রায় মাস-দুই মৃত্যুঞ্জয়ের খবর লই নাই। যাঁহারা পল্লীগ্রাম দেখেন নাই, কিংবা ঐ রেলগাড়ির জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন, এ কেমন কথা? এ

কি কখনো সম্ভব হইতে পারে যে অত-বড়ো অসুখটা চোখে দেখিয়া আসিয়াও মাস-দুই আর তার খবরই নাই। তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, এ শুধু সম্ভব নয়, এ-ই হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াসুদ্ধ ঝাঁক বাঁধিয়া উপুড় হইয়া পড়ে, এই যে একটা জনশ্রুতি আছে, জানি না তাহা সত্যযুগের পল্লীগ্রামের ছিল কি না, কিন্তু একালে ত কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে তাহার মরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই, তখন সে যে বাঁচিয়া আছে এ ঠিক।

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কানে গেল, মৃত্যুঞ্জয়ের সেই বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছেন যে, গেল গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল। নালতের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার যো রহিল না—অকালকুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্যন্ত খাইতেছে! গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে ত বনে গিয়া বাস করিলেই ত হয়! কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ একথা শুনিলে যে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ছেলে-বুড়ো সকলের মুখেই ঐ এক কথা। অ্যাঁ—এ হইল কি? কলি কি সত্যই উল্‌টাতেই বসিল!

খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটিবে, তিনি অনেক আগেই জানিতেন তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন; কোথাকার জল কোথায় গিয়া মরে। নইলে পর নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো। তিনি কি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাঁহার কি ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই, এখন দেখুক সবাই। কিন্তু আর ত চুপ করিয়া থাকা যায় না! এ যে মিত্তিরবংশের নাম ডুবিয়া যায়। গ্রামের যে মুখ পোড়ে!

তখন আমরা গ্রামের লোক মিলিয়া যে কাজটা করিলাম, তাহা মনে করিলে আমি আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন নালতের মিত্তিরবংশের অভিভাবক হইয়া, আর আমরা দশ-বারোজন সঙ্গে চলিলাম, গ্রামের বদন দগ্ধ না হয় এইজন্য।

মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়ো বাড়িতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাঙা বারান্দার একধারে রুটি গড়িতেছিল, অকস্মাৎ লাঠিসোঁটা হাতে এতগুলি লোককে উঠানের উপর দেখিয়া ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল।

খুড়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। চট্‌ করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া, সেই ভয়ে মৃতপ্রায় মেয়েটিকে সম্ভাষণ শুরু করিলেন। বলা বাহুল্য, জগতের কোনো খুড়া কোনোকালে বোধ করি ভাইপোর স্ত্রীকে ওরূপ সম্ভাষণ করে নাই। সে এমনি যে, মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেয়ে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না, চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকে দিয়েচে জানো?

খুড়া বলিলেন, তবে রে! ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং সঙ্গে সঙ্গেই দশ-বারোজন বীর-দর্পে হুঙ্কার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ ধরিল চুলের মুঠি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাত-দুটো—এবং যাহাদের সে সুযোগ ঘটিল না, তাহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল না।

কারণ, সংগ্রাম-স্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে অতবড়ো দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে। এইখানে একটা অবাস্তব কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছদেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক দুর্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার একটা কি কথা। সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না। আমরা বলি, যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা সে নর-নারী যাই হোক না কেন।

মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তার পরে একেবারে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্য হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম,

তখন সে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, বাবুরা আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও, আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল-কুকুরে খেয়ে যাবে—রোগা-মানুষ রাতে খেতে পাবে না।

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মতো মাথা কুটিতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং শ্রাব্য-অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্ধ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশেব মঙ্গলেব জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

চলিলাম বলিতেছি, কেন না আমিও বাব বাব সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু কোথায় আমাব মধ্যে একটুখানি দুর্বলতা ছিল, আমি তাহার গায়ে হাত দিতে পাবি নাই। ববঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। সে যে অত্যন্ত অন্যায় করিযাছে এবং তাহাকে গ্রামের বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভালো কাজ কবিতেছি, সেও কিছুতেই মনে কবিতে পাবিলাম না। কিন্তু আমার কথা যাক।

আপনারা মনে করিবেন না, পল্লীগ্রামে উদারতাব একান্ত অভাব। মোটেই না। বরঞ্চ বড়লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য প্রকাশ করি যে, শুনিলে আপনাবা অবাক্ হইয়া যাইবেন।

এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ভাত খাইয়া অমার্জনীয় অপবাধ কবিত, তাহা হইলে ত আমাদের এত রাগ হইত না। আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়েব নিকা—এ ত একটা হাসিযা উড়াইবার কথা! কিন্তু কাল কবিল যে ঐ ভাত খাইয়া! হোক না সে আড়াই মাসেব রুগী, হোক না সে শয্যাশায়ী! কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁঠার মাংস নয়! ভাত খাওয়া যে অন্ন-পাপ! সে ত আব সত্য সত্যই মাফ কবা যায় না। তা নইলে পল্লীগ্রামেব লোক সংকীর্ণচিত্ত নয়। চার-ক্রোশ-হাঁটা বিদ্যা যে সব ছেলের পেটে, তাবাই ত একদিন বড়ো হইয়া সমাজেব মাথা হয়। দেবী বীণাপাণির ববে সংকীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কি করিযা!

এই ত ইহারই কিছুদিন পরে, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশযের বিধবা পুত্রবধূ মনেব বৈরাগ্যে বছর-দুই কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিন্দুকেবা কানাকানি কবিতে লাগিল যে, অর্ধেক সম্পত্তি ঐ বিধবার এবং পাছে তাহা বেহাত হয়, এই ভয়েই ছোটোবাবু অনেক চেষ্টা অনেক পরিশ্রমের পর বৌঠানকে সেখান হইতে ফিরাইয়া আনিযাছেন, সেটা কাশীই বটে! যাই হোক, ছোটোবাবু তাহার স্বাভাবিক ঔদার্যে, গ্রামের বারওয়ারী পূজা-বাবদ দুইশত টাকা দান করিয়া, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণের সদক্ষিণা উত্তম ফলাহাবের পব, প্রত্যেক সদ্‌ব্রাহ্মণের হাতে তখন একটা করিয়া কাঁসার গেলাশ দিয়া বিদায় করিলেন তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমন কি, পথে আসিতে অনেকেই দেশেব এবং দশের কল্যাণের নিমিত্ত কামনা কবিতে লাগিলেন, এমন সব যারা বড়োলোক, তাদের বাড়িতে বাড়িতে, মাসে মাসে এমন সব সদনুষ্ঠানেব আয়োজন হয না কেন?

কিন্তু যাক। মহত্ত্বের কাহিনী আমাদের অনেক আছে। যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লীবাসীর দ্বারেই স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। এই দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লীতে অনেকদিন ঘুরিয়া, গৌরব করিবাব মতো অনেক বড়ো বড়ো ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিযাছি। চরিত্রেই বল, ধর্মেই বল, সমাজেই বল, আর বিদ্যাতেই বল, শিক্ষা একেবারেই পুরা হইয়া আছে ; এখন শুধু ইংবাজকে কসিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলেই দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

বৎসর-খানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবেমাত্র সন্ন্যাসিগিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। একদিন দুপুরবেলা ক্রোশ-দুই দূরের মালপাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ দেখি একটা কুটিরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়। তার মাথার গেরুয়া-রঙের পাগড়ী, বড়ো বড়ো দাড়ি-চুল, গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁতির মালা—কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়! কায়স্থের ছেলে একটা বছরের মধ্যেই জাত দিয়া একেবারে পুরাদস্তুর সাপুড়ে হইয়া গেছে। মানুষ কত শীঘ্র যে

তাহার চৌদ্দ-পুরুষের জাতটা বিসর্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিতে পারে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণের ছেলে মেথরাণী বিবাহ করিয়া মেথর হইয়া গেছে এবং তাহাদের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদ্‌ব্রাহ্মণের ছেলেকে এন্ট্রান্স পাশ করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে দেখিয়াছি। এখন সে ধুচুনি কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শূয়ার চরায়। ভালো কায়স্থসন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ কবিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিযাছি। আজ সে স্বহস্তে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে—তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে, কোনোকালে সে কসাই ভিন্ন আর কিছু ছিল! কিন্তু সকলেরই ঐ একই হেতু। আমার তাই ত মনে হয়, এমন কবিযা এত সহজে পুরুষকে যাহাবা টানিয়া নামাইতে পারে, তাহারা কি এমনই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পাবে না। যে পল্লীগ্রামেব পুরুষদেব সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেবই? শুধু নিজেদেব জোবেই এত দ্রুত নীচেব দিকে নামিয়া চলিয়াছে। অন্দবেব দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?

কিন্তু থাক্‌। ঝোঁকের মাথায় হয়ত বা অনধিকাব-চর্চা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মুশকিল হইয়াছে এই যে, আমি কোনোমতেই ভুলিতে পাবি না দেশেব নব্বুইজন নব-নাবীই ঐ পল্লীগ্রামেবই মানুষ এবং সেইজন্য কিছু একটা আমাদেব কবা চাই-ই। যাক। বলিতেছিলাম যে, দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আমাকে সে খাতির করিয়া বসাইল। বিলাসী পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সে-ও ভারি খুশি হইয়া বার বাব বলিতে লাগিল, তুমি না আগলালে সে রাত্তিরে আমাকে তাবা মেবেই ফেলত। আমার জন্যে কত মারই না জানি তুমি খেযেছিলে।

কথায কথায শুনিলাম, পরদিনই তাহাবা এখানে উঠিয়া আসিয়া ক্রমশঃ ঘব বাঁধিযা বাস কবিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে, এ-কথা আমাকে বলাব প্রয়োজন ছিল না, শুধু তাহাদের মুখেব পানে চাহিযাই আমি তাহা বুঝিযাছিলাম।

তাই শুনিলাম আজ কোথায় নাকি তাহাদেব সাপ-ধবার বাযনা আছে এবং তাহারা প্রস্তুত হইযাছে, আমিও অমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলেবেলা হইতেই দুটা জিনিসের উপব আমার প্রবল সখ ছিল। এক ছিল গোখবো কেউটে সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্র-সিদ্ধ হওয়া।

সিদ্ধ হওযার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করিবার আশায আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সে তাহার নামজাদা শ্বশুবের শিষ্য, সুতবাং মস্ত লোক। আমার ভাগ্য যে অকস্মাৎ এমন সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিবে, তাহা কে ভাবিতে পারিত?

কিন্তু শক্ত কাজ এবং ভয়ের কাবণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি এমনি নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিলাম যে, মাস-খানেকের মধ্যে আমাকে সাগরেদ করিতে মৃত্যুঞ্জয় পথ পাইল না। সাপধরার মন্ত্র এবং হিসাব শিখাইয়া দিল এবং কব্জিতে ওষুধ-সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তরমতো সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্ত্রটা কি জানেন? তাব শেষটা আমার মনে আছে —

ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন —
মনসা দেবী আমার মা—
ওলট-পালট পাতাল-ফোঁড়—
ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে
—দুধরাজ মণিরাজ।
কার আজ্ঞে—বিষহরির আজ্ঞে।

ইহার মানে যে কি, তাহা আমি জানি না। কারণ যিনি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন—নিশ্চয় কেহ না কেহ ছিলেন—তাঁর সাক্ষাৎ কখনো পাই নাই।

অবশেষে একদিন এই মন্ত্রের সত্য-মিথ্যার চরম মীমাংসা হইয়া গেল বটে, কিন্তু যতদিন না হইল, ততদিন সাপ-ধরার জন্য চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি কবিতে লাগিল, হাঁ, ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে! সন্ন্যাসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে ; এতটুকু বয়সের মধ্যে এতবড়ো ওস্তাদ হইয়া অহংকারে আমার আর মাটিতে পা পড়ে না, এমনি জো হইল।

বিশ্বাস করিল না শুধু দুইজন। আমার গুরু যে, সে ত ভালো-মন্দ কোনো কথাই বলিত না। কিন্তু বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এ সব ভয়ংকব জানোয়ার, একটু সাবধানে নাড়াচাড়া ক'রো। বস্তুতঃ বিষদাঁত ভাঙা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলা এমনি অবহেলার সহিত করিতে শুরু করিয়াছিলাম যে, সে-সব মনে পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে।

আসল কথা হইতেছে এই যে, সাপ-ধরাও কঠিন নয়, বরং ধরা সাপ দুই-চাবি দিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙাই হোক আর নাই হোক, কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে, ভয় দেখায়, কিন্তু কামড়ায় না।

মাঝে মাঝে আমাদের গুরু-শিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভেব ব্যবসা হইতেছে শিকড় বিক্রি কবা, যা দেখাইবামাত্র সাপ পলাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত। যে সাপটা শিকড় দেখিযা পালাইবে, তাহাব মুখে একটা লোহাব শিক পুড়াইয়া বার-কযেক ছ্যাঁকা দিতে হয়। তাব পরে তাহাকে শিকড়ই দেখান হোক আব একটা কাঠিই দেখান হোক, সে যে কোথায় পলাইবে ভাবিয়া পায় না। এই কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, দেখ, এমন কবিয়া মানুষ ঠকাইযো না।

মৃত্যুঞ্জয় কহিত, সবাই করে—এতে দোষ কি?

বিলাসী বলিত, করুক গে সবাই। আমাদের ত খাবার ভাবনা নেই, আমবা কেন মিছি মিছি লোক ঠকাতে যাই।

আর একটা জিনিস আমি বরাবব লক্ষ্য কবিযাছি। সাপ-ধরাব বাযনা আসিলেই বিলাসী নানা প্রকার বাধা দিবার চেষ্টা করিত—আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এমনি কত কি। মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত না থাকিলে সে তো একেবারেই ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত নগদ টাকার লোভ সামলাইতে পাবিত না। আর আমার ত একরকম নেশার মতো হইয়া দাঁড়াইযাছিল। নানা প্রকারে তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতাম না। বস্তুতঃ ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথায় ছিল, এ আমাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এই পাপের দণ্ড আমাকে একদিন ভালো কবিয়াই দিতে হইল।

সেদিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়িতে সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী ববাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। মেটে-ঘরের মেজে খানিকটা খুঁড়িতেই একটা গর্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেহই লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে সে—হেট হইয়া কয়েক টুকবা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিল, ঠাকুর একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয়, এক-জোড়া ত আছে বটেই, হয়ত বা বেশিও থাকতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, এরা যে বলে একটাই এসে ঢুকেছে। একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, দেখচ না বাসা করেছিল?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কাগজ ত ইঁদুরেও আনতে পারে।

বিলাসী কহিল, দুই-ই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছেই আমি বলছি।

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল, এবং মর্মান্তিক-ভাবেই সেদিন ফলিল। মিনিট দশেকের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড খরিশ গোখরো ধরিয়া ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার হাতে দিল। কিন্তু সেটা ঝাঁপির মধ্যে

পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় উঃ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উল্‌টা পিঠ দিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

প্রথমটা যেন সবাই হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কারণ সাপ ধরিতে গেলে সে পলাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত হইতে এক হাত মুখ বাহির করিযা দংশন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এই একটিবার মাত্র দেখিয়াছি। পরক্ষণেই বিলাসী চীৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিযা ফেলিল এবং যত রকমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল সমস্তই তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়েব নিজেব মাদুলি ত ছিলই, তাহার উপবেও আমার মাদুলিটাও খুলিয়া তাহাব হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার উর্ধ্বে আব উঠিবে না। এবং আমার সেই "বিষহরিব আজ্ঞে" মন্ত্রটা সতেজে বাবংবাব আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চতুর্দিকে ভিড় জমিয়া গেল এবং এ অঞ্চলেব মধ্যে যেখানে যত গুণী ব্যক্তি আছেন সকলকে খবব দিবাব জন্য দিকে দিকে লোক ছুটিল। বিলাসীব বাপকেও সংবাদ দিবাব জন্য লোক গেল।

আমার মন্ত্র পড়াব আব বিবাম নাই, কিন্তু ঠিক সুবিধা হইতেছে বলিযা মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সমভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু মিনিট পনেবো-কুড়ি পবেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবাব বমি করিযা দিল, তখন বিলাসী মাটিব উপবে একেবাবে আছাড় খাইয়া পড়িল। আমিও বুঝিলাম, বিষহবিব দোহাই বুঝি-বা আব খাটে না।

নিকটবর্তী আবও দুই-চাবিজন ওস্তাদ আসিয়া পড়িলেন, এবং আমবা কখনো বা একসঙ্গে কখনো বা আলাদা তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীব দোহাই পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিষ দোহাই মানিল না, রোগীব অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল ভালো কথায় হইবে না, তখন তিন-চাবজন বোজা মিলিযা বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ কবিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে সে, মৃত্যুঞ্জয ত মৃত্যুঞ্জয়, সেদিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আবও আধঘণ্টা ধ্বস্তা-ধ্বস্তিব পরে, বোগী তাহাব বাপ-মাযেব দেওযা মৃত্যুঞ্জয নাম, তাহার শ্বশুবেব দেওযা মন্ত্রৌষধি, সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন কবিযা ইহলোকেব লীলা সাঙ্গ করিল। বিলাসী তাহাব স্বামীব মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে যেন একেবাবে পাথব হইযা গেল।

যাক, তাহাব দুঃখের কাহিনীটা আর বাড়াইব না। কেবল এইটুকু বলিয়া শেষ করিব যে, সে সাতদিনের বেশি বাঁচিয়া থাকাটা সহিতে পাবিল না। আমাকে শুধু একদিন বলিয়াছিল, ঠাকুর আমার মাথাব দিব্যি বইল, এ-সব তুমি আব কখনো ক'বো না।

আমাব মাদুলি-কবজ ত মৃত্যুঞ্জযের সঙ্গে কবরে গিযাছিল, ছিল শুধু বিষহরিব আজ্ঞা। কিন্তু সে আজ্ঞা যে ম্যাজিস্ট্রেটেব আজ্ঞা নয, এবং সাপেব বিষ যে বাঙালীর বিষ নয, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

একদিন গিযা শুনিলাম, ঘবে ত আর বিযের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা কবিযা মরিয়াছে এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয নবকে গিযাছে। কিন্তু যেখানেই যাক, আমার নিজের যখন যাইবার সময় আসিবে, তখন ওইরূপ কোনো একটা নবকে যাওযার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এইমাত্র বলিতে পাবি।

খুড়োমশাই ষোলো আনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের মতো চারিদিকে বলিযা বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাত-মৃত্যু হবে, ত হবে কার? পুরুষ-মানুষ অমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না, তাতে ত তেমন আসে-যায় না—না হয় একটু নিন্দাই হ'ত। কিন্তু, হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেলি কেন? নিজে মলো আমার পর্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলে এক ফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হ'ল একটা ভুজ্যি-উচ্ছুগ্যু।

গ্রামের লোক একবাক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি। অন্ন-পাপ! বাপ্ রে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে!

ম র ণ - আ লি ঙ্গ নে

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

"মাপ কর, ভাই ... মাপ কর ..." রহমান ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে।

শঙ্কর বল্‌লে—"চুপ কর, ভাই, চুপ কর, কেঁদে আর কি হ'বে বল? এতে আমারও ত দোষ আছে, আমি নিজের কর্মফল ভোগ করছি, তুমি নিমিত্ত মাত্র..."

শঙ্করের কণ্ঠস্বরে অনুতাপ বা সান্ত্বনা বেশ সুস্পষ্ট আকার ধ'রে প্রকাশ পেল না, তার কথাগুলো কেমন ছাড়া-ছাড়া ফাঁকা-ফাঁকা।

রহমান কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মাথা নেড়ে বল্‌লে—"আমার এমন করা উচিত হয় নি ..হাজার হো'ক, তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু! . কিন্তু তুমি যে এত বড়ো মহৎ, তা' আগে জানতাম না..."

শঙ্কর বল্‌লে, "আমাকে যতটা মহৎ মনে করছ, তা' আমি মোটেই নই। তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু, একসঙ্গে খেলা ক'রে বড়ো হয়ে উঠেছি—একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি, এখনও এক পাড়াতেই আমাদের বাস; তোমার প্রতি আমার ত কোনো বিদ্বেষ থাক্‌তেই পারে না; কোনো মুসলমানের প্রতিই আমার বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু যখন আমি শুনলাম, মুসলমানরা কালীবাড়ি ভাঙতে আসছে, তখন আমি আর নিশ্চেষ্ট হয়ে থাক্‌তে পারিনি; তুমি জানো, ঠাকুর-দেবতার প্রতি খুব বেশি বিশ্বাস আর ভক্তি আমার নেই; কিন্তু যে বস্তুকে অনেক লোক শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, তার অপমান সহ্য করায় মনুষ্যত্ব খর্ব হয়; আমি শুনেছি, হিন্দুরা মুসলমানদের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অনেক মসজেদ অপবিত্র করেছে; আমি যদি তখন ভালো থাকতাম, তা হ'লে আমিও মুসলমানদের সঙ্গে মসজেদ রক্ষার জন্য হিন্দুর বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়াতাম। আমি তোমার সঙ্গে আমাদের পাড়ারই আখড়ায় একই ওস্তাদের কাছে লাঠি-খেলা শিখেছিলাম। ওস্তাদের দেওয়া সেই লাঠি কখনো কোনো কাজে লাগে নি। এখন আমার পিতৃ-পিতামহের ধর্মবিশ্বাসের অপমান হ'তে যাচ্ছে দেখে সেই লাঠি অবলম্বন ক'রে কালীবাড়ির সামনে পাহারায় নিযুক্ত হয়েছিলাম। মুসলমানদের আক্রমণ লাঠির চোটে চার-চারবার হটিয়ে যখন আমরা মনে করছিলাম, মুসলমানরা আর আস্‌বে না, তখন পঞ্চম বারে এলে তুমি তাদের দলের নেতা হয়ে। দুই বন্ধুতে অনেক বার মহরমের সময় আপোষে লাঠি খেলেছি, সে দিনও মনে হ'ল, এই লাঠিখেলা দুই বন্ধুর আপোষেই হবে। কিন্তু তোমার লাঠির চোট আমার লাঠি দিয়ে ঠেকিয়েই আমি বুঝতে পারলাম, তুমি বন্ধুভাবে আমাকে আক্রমণ কর নি। যাই হ'ক, বীরে বীরে অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা হচ্ছিল; হঠাৎ আমার মুখের উপর দিয়ে আগুন জ্ব'লে গেল; তখন বুঝলাম, আমি বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করছি না .."

রহমান আপনার কাপুরুষতায় লজ্জায় ও অনুতাপে সন্তপ্ত হয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে কাতর স্বরে ব'লে উঠল—"থাক্, ভাই সে কথা; আমাকে আর লজ্জা দিও না..."

শঙ্কর রহমানের কাতরতা গ্রাহ্য না করেই বল্‌তে লাগল—"আমার মুখে আগুন জ্বলে উঠতেই আমি বুঝতে পারলাম, তুমি আমার মুখের উপর সালফিউরিক অ্যাসিড্ ঢেলে দিয়েছ!"

রহমান আবার কাতর স্বরে ব'লে উঠল—"মাপ কর, ভাই, আমার কসুর মাপ কর..."

শঙ্কর রহমানের কথা যেন শুনতেই পায়নি, এমনই ভাবে ব'লে চল্‌ল—"আমি অনুভব করলাম, আমার দুটো চোখই পুড়ে গেল, সমস্ত মুখখানা চিতায় মুখাগ্নি-করা মড়ার মতন বীভৎস হয়ে উঠল, হয়ত বা এই আমার অন্তিম মুখাগ্নি। তখন তোমার প্রতি আমার মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল, তা'কে বন্ধুত্বের প্রীতি-নাম কিছুতেই দেওয়া যায় না।"

রহমান আবেগভরে ব'লে উঠল—"কিন্তু পবে. .আমার বিচারের সময় তুমি ত বন্ধুত্বের চেয়েও মহৎ ভাবের পরিচয় দিয়েছ।"

এবার শঙ্কর রহমানেব কথার উত্তর দিল—"সেই ভাব হঠাৎ আমাব মনে আসেনি......এ রকম অবস্থায় অদৃষ্টের হাতে মানুষ অকস্মাৎ আত্মসমর্পণ ক'রে হিংসাশূন্য হ'তে পারে না। তখন আমার মনে হয়েছিল, তোমায় হাতের কাছে পেলে নখ দিয়ে তোমার দুটো চোখ উপড়ে ছিঁড়ে তোমার মুখেব চামড়া ছাড়িয়ে ফেলে দিই।"

রহমান কুণ্ঠিত ও কাতরভাবে বল্‌লে—"কিন্তু—"

শঙ্কব বল্‌তে লাগল—"কিন্তু তখনই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম, আর আমি কিছুই করতে পারিনি। তাবপর হাসপাতালেব বিছানায শুয়ে চির-অন্ধকারের মধ্যে আমার যখন ধীরে ধীরে জ্ঞানোন্মেষ হ'ল, তখন অনেকখানি শান্তভাবে সমস্ত ব্যাপাব তলিয়ে ভাববার অবসর পেলাম। তখন আমার চোখের দৃষ্টি ছিল না; তাই মানসদৃষ্টি খুলে গিয়েছিল—দেখলাম, সেই আমাদেব পাড়ায় আমবা দু'টি বালক ধর্ম ও আচাবেব পার্থক্য সত্ত্বেও কেমন পবস্পবেব দিকে আকৃষ্ট হযেছিলাম, তোমার গৌরবর্ণ সুশ্রী মুখের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া কোঁকড়া চুল আব মিষ্টি হাসি আমাকে তোমাব প্রীতির পিয়াসী ক'বে তুলেছিল; আমাদেব বাল্য থেকে যৌবনের বন্ধুত্ব-প্রীতির কত কথাই মনেব মধ্যে ভেসে ভেসে উঠতে লাগল। তখন এও মনে হ'ল যে, সেই সুদর্শন তুমি কেমন ক'বে আমাকে এমন নির্মমভাবে চিরজীবনেব জন্য কুৎসিত বীভৎসদর্শন ক'রে ফেলতে পাবলে!"

রহমান কুণ্ঠিত ও অনুতপ্ত স্ববে বল্‌লে—"আমি তখন ভাবিনি যে, তুমি বেঁচে যাবে। এ বকম হয়ে থাকাব চেযে..."

শঙ্কর বহমানের মুখেব কথা কেড়ে নিযে বল্‌লে—"ম'বে যাওযা ঢেব ভালো ছিল। কিন্তু আমি মবি নি! ক্রমে যখন পোড়া মুখ আর অন্ধ চক্ষু নিয়ে ভালো হয়ে উঠলাম, তখন এল তোমার বিচাবেব পালা! আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায আমাকে দেখে তোমার হৃৎকম্প হযেছিল নিশ্চযই—তোমাব নিজেব হাতেব এই বীভৎস কীর্তি দেখে আব আমাব সাক্ষীতে তোমার দীর্ঘকালেব কারাবাস সুনিশ্চিত জেনে। কিন্তু আমি হাসপাতাল থেকে ভেবে এসেছিলাম, তোমাকে আজীবন কারারুদ্ধ বেখে অথবা ফাঁসী দিযেও আমাব নষ্ট দৃষ্টি আর মুখশ্রী ত ফিবে পাব না।"

রহমান শঙ্কবেব এই কথা শুনতে শুনতে ফুঁপিযে ফুঁপিযে কাঁদতে লাগল এবং ক্রন্দন-বিজড়িত স্বরে বল্‌লে—"তোমাব আশ্চর্য মহৎ চরিত্র! তোমাব সাক্ষীতেই আমি বেঁচে গেলাম। তুমি যখন বল্‌লে,—তোমার চোখে অ্যাসিড্ পড়েছিল, তাই কে তোমায অ্যাসিড্ দিযেছিল, তা' তুমি দেখতে পাও নি, তখন আমার মন অনুতাপে, লজ্জায ও কৃতজ্ঞতায় এমন পবিপূর্ণ হযে উঠেছিল যে, আব একটু হ'লে আমি নিজেব মুখেই দোষ কবুল ক'বে ফেলতাম। কিন্তু আমি আমাব বিহ্বল মনেব চিন্তা গুছিযে নিযে কিছু বলতে পাববার আগেই ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে প্রমাণ অভাবে মুক্তি দিয়ে দিলেন। কিন্তু তোমার মহত্ত্বেব দণ্ড বিচারকের দণ্ডের চেযেও দুঃসহ হযে উঠেছে, আমি যে তোমার বন্ধুত্বেব কৃতজ্ঞতা বরদাস্ত করতে পারছি নে!"

বহমান কাতর হয়ে ক্রন্দন করতে লাগল।

শঙ্কর বল্‌লে—"কেবলমাত্র বন্ধুত্বের টানেই আমি তোমাকে রেহাই দিই নি। তুমি সুন্দর সুপুরুষ; তোমার এই রূপে ভুলিযে তুমি একটি হিন্দুর বিধবাকে কুলত্যাগিনী ক'বে নিকা করেছ। তুমি জেল থেকে কুশ্রী হযে ফিরে এলে তোমার সেই নব-পরিণীতা প্রণয়িনী মনে ক্লেশ পাবে, এই চিন্তাও আমার মনে প্রবল হয়ে তোমাকে অব্যাহতি দিতে প্রবর্তিত করেছিল।"

রহমান তখনও অনুতাপে দগ্ধ হয়ে ক্রন্দন সংবরণ করতে পারে নি।

শঙ্কর বল্‌তে লাগল—"যা হবার, তা হয়ে গেছে, গতস্য শোচনা নাস্তি। আমি তো অন্ধ অকর্মণ্য হয়ে রইলাম, জড়পিণ্ডের মতো ঘরের কোণে প'ড়ে থাকব, আর কখনও তোমার চোখের সামনে পড়বার সম্ভাবনা রইল না। তুমিও আমার কথা একেবারে ভুলে যেও..."

রহমান আবেগ-ভরা স্বরে বলে উঠল, "অসম্ভব! তোমার মহত্ত্ব আমার মনে আমরণ জাগরূক থাকবে।"

শঙ্কর শুষ্ক স্বরে জোর দিয়ে বল্‌লে—"না। মিথ্যা ভাবুকতা ক'রে নিজের জীবনটাকে বিরস ক'রে রেখ না। আজ তুমি একবার আমাকে শেষ আলিঙ্গন ক'রে চিরবিদায় দিয়ে যাও..."

শঙ্করের কুৎসিত পোড়া মুখের কাছে মুখ নিয়ে তা'কে আলিঙ্গন করতে হবে ভেবে রহমানের দেহ ও মন ভয়ে ও ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে কেঁপে উঠল। শঙ্কর এতক্ষণ মুখের উপরে একটা পাতলা রঙিন রেশমের রুমাল ঢাকা দিয়ে কথা বল্‌ছিল, কিন্তু রহমান আদালতে একবার শঙ্করের মুখের যে ভয়ানক ছবি দেখেছিল, তা'র ছাপ সে কিছুতেই নিজের মনের উপর থেকে মুছে ফেলতে পারে নি।

রহমানকে নিরুত্তর দেখে শঙ্কর বল্‌লে—"এখন ত রাত্রি হয়ে গেছে....ঘরে আলো জ্বলছে বোধ হয়...অলোর আভাও আমি আর অনুভব করতে পারি নে...তুমি আলোটা নিবিয়ে দাও...তা হ'লে আমার ভীষণ মূর্তি তোমার চোখে পড়বে না, আমার কাছে আসতে তোমাব ঘৃণা বা ভয় হবে না..."

শঙ্করের কথা শুনে শঙ্করের মূর্তির কদর্যতা আবার রহমানের মনে প'ড়ে গেল; সে আলো নিবিয়ে দিতে পারলে না; ভূতের মতো ভয়ংকরমূর্তি শঙ্করের সঙ্গে এক ঘরে অন্ধকাবে থাকতে তা'র গা ছম্‌ছম্‌ করছিল; তা'তে আবার শঙ্কর তা'কে আলিঙ্গন করতে আহ্বান কবছে।

শঙ্কর যদিও আলোর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছিল না, তথাপি আলোক-নির্বাণের কোনো শব্দ শুনতে না পেয়ে সে আবার বল্‌লে—"আলোটা নিবিয়েই দাও, ভাই। আমি আব আগেকার মতো দর্শনযোগ্য নই, আমার চেহারা ভযংকর রকমে বদলে গেছে। আমার সঙ্গে কোলাকুলি করতে তোমার কি ঘৃণা বা ভয় হচ্ছে?"

রহমান শুষ্ক কণ্ঠে বল্‌লে—"না, না, এই ত আমি তোমার কাছে এতক্ষণ বসে আছি।"

শঙ্কর মৃদুস্বরে বল্‌লে—"আচ্ছা, আর একটু আমার কাছে স'বে এস—তোমার হাতটা আমাব হাতে দাও.......হাঁ, সেই আমার বন্ধুর হাত।"

শঙ্কর এই কথা ব'লে রহমানের হাত একটু জোরে চেপে ধরলে।

রহমান শঙ্করের হাতের চাপে তা'র বন্ধুত্বের প্রগাঢ় প্রীতি অনুভব ক'রে অনুতপ্ত স্বরে বল্‌লে—"আমি এই হাত দিয়ে আমার বন্ধুকে চিবজীবনের জন্য বিশ্রী অন্ধ ক'রে দিয়েছি।"

শঙ্কর দৃঢ়মুষ্টিতে রহমানের হাত চেপে ধ'রে তা'কে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে করতে বল্‌লে—"তোমার হাতের এই আঘাত আমার প্রাণের বন্ধুত্ব-প্রীতির পরিমাণ প্রমাণ করে দিয়ে গেছে!...তোমার হাত কাঁপছে!...আমরা...অন্ধরা চোখে না দেখেও স্পর্শ দিয়ে অনেক ভাব অনুভব করতে পারি।...তোমার ভয় করছে, বন্ধু? তা হ'লে আলোটা আমিই নিবিয়ে দিই, আলোটা আমার হাতের কাছেই আছে..."

শঙ্কর হাত বাড়িয়ে কেরোসিন-ল্যাম্পের প্যাঁচ ঘুরিয়ে আলোটা নিবিয়ে দিল। ঘর ঘন অন্ধকারে ভ'রে গেল।

শঙ্করের মুষ্টির মধ্যে রহমানের হাত আবার কেঁপে উঠল

ক্ষণকাল উভয়েই নীরব। শঙ্কর ধীর স্বরে বল্‌লে —"ভয় নেই, বন্ধু, ভয় নেই, আমি তোমাকে বেশিক্ষণ ধ'রে রাখব না; তুমি আমাকে একবার আলিঙ্গন ক'রে চির-বিদায় দিয়ে যাও।...ঘরটা

াধ হয়, এখন অন্ধকার হয়ে গেছে,...এখনও আমার অন্ধের অনুভবশক্তি সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠে নি, কিছু দিন সময় লাগবে...আমি যেন ছোটো শিশুর মতো পৃথিবীর সঙ্গে নূতন পরিচয় স্থাপন করেছি..."

রহমানকে নীরব থাকতে দেখে শঙ্কর স্বপ্নাবিষ্টের মতো বলতে লাগল—"তুমি যে দয়া ক'রে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ, তা'তে যে কি সুখী হয়েছি, তা ব'লে বোঝাতে পারব না। তোমায় যখন ডেকে পাঠিয়েছিলাম, তখন ভয় হয়েছিল, তুমি হয়ত আসবে না। কিন্তু তোমাকে একবার বুকে চেপে ধরবার জন্যে আমার প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করছিল...আমাদের এত কালের বন্ধুত্ব কি এত সহজে ভোলবার! কিন্তু তোমাকে ডেকে এনে আমি ভালো করি নি..."

রহমান বিব্রত হয়ে প্রতিবাদের স্বরে ক্ষীণভাবে বল্‌লে,—না, না..."

অন্ধকারের মধ্যে শঙ্করের মুখেব উপর দিয়ে হাসি খেলে গেল। সে বল্‌লে—"অস্বীকাব কবা অনর্থক। আমার মুখ যে আর মানুষের মুখ নেই, তা আমি বুঝতে পারি। আমার বন্ধু তুমি, তুমিও আমার এই বিভীষিকামূর্তি দেখে ভয়ে কাঁপছ! আমার এই বিভীষিকা-মূর্তি ভূতের ভয়ের মতো তোমাকে অনেক দিন পেয়ে থেকে পীড়া দেবে...এই সম্ভাবনাতেই আমার কষ্ট হচ্ছে। যাক্‌, আমার কথা আর না তোলাই ভালো।...আমার কাছে অন্ধকাবে ব'সে থাকার দুঃখ চট্‌পট্‌ চুকিয়ে ফেল..."

শঙ্কর রহমানের হাত ধ'রে নিজের দিকে আকর্ষণ করলে।

রহমান আবার কেঁপে উঠল।

শঙ্কর ব'লে উঠল—"ভয়ে কাঁপছ, দোস্ত?"

শঙ্করেব কথার মধ্যে ঈষৎ বিদ্রূপ ধ্বনিত হয়ে গেল।

রহমান তাড়াতাড়িতে বল্‌লে—"না, না, আজকে আমাব কেমন একটু জ্বরভাব হয়েছে..."

শঙ্কর রহমানকে হাত ধ'রে এক টান দিয়ে নিজের বুকের উপরে এনে ফেললে। রহমানের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। কিন্তু সে নিজের কৃতকর্মের গ্লানিতে শঙ্করের প্রতি ঘৃণা ও ভয়ের ভাব ডুবিয়ে দিয়ে তার মুক্ত হাত দিয়ে শঙ্করকে শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রীতির সহিত বেষ্টন কবে ধরলে। কিন্তু যে-ই তার মনে হ'ল যে, শঙ্কবের পোড়া মুখ তার মুখের অত্যন্ত নিকটে এসেছে, অমনই সে ভয়ে ও ঘৃণায় আবার কম্পিত হয়ে উঠল।

শঙ্কর রহমানকে খুব জোরে জড়িয়ে ধরলে।

রহমান বলিষ্ঠ হ'লেও শঙ্করের আলিঙ্গনে নিপীড়িত হয়ে শ্বাসরুদ্ধ স্বরে বল্‌লে—"দোস্ত, হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যাবে যে! এ যেন ধৃতরাষ্ট্রের লৌহভীম আলিঙ্গন!"

শঙ্কর বল্‌লে—"দেখছ ত আমি তোমার চেয়ে ঢের বলবান্‌! সে দিন হঠাৎ তুমি বেকায়দায় অ্যাসিড ঢেলে দিয়ে আমাকে কাবু করেছিলে!"

রহমান শঙ্করের আলিঙ্গন-পাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য চেষ্টা করলে, তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।

শঙ্কর বিদ্রূপ-ভরা স্বরে বল্‌লে—"তোমাকে একবার বুকের কাছে যখন পেয়েছি, দোস্ত, তখন তোমাকে কি সহজেই ছেড়ে দেব?"

শঙ্কর রহমানের যে হাতটা আগে থাকতে চেপে ধরেছিল, সেটাকে বগল-দাবা ক'রে চেপে ধ'রে তার অপর হাতটা সেই হাত দিয়ে আবার চেপে ধরলে এবং তার অপর মুক্তহস্ত পকেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে একটা কাচের শিশি বা'র ক'রে আনলে; শিশির কাচের ছিপি দাঁত দিয়ে খুলে ছিপিটা মাটিতে ফেলে দিলে। কাচের ছিপিটা মাটিতে ঠং ক'রে প'ড়ে দু'খণ্ড হয়ে গেল। শিশি

খোলার ও ছিপি ভাঙার শব্দ শুনে রহমান চম্‌কে উঠল এবং চঞ্চল হয়ে শঙ্করের বাহু-বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল।

শঙ্কর প্রশান্ত নিরুদ্বিগ্নভাবে—"চম্‌কো না, দোস্ত, ছট্‌ফট্ ক'র না। শিশিতে অন্য কিছু নেই, তোমার সেই সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড্ই একটুখানি, বন্ধুত্বের উপহার ব'লে সংগ্রহ করে রেখেছি। বাল্য-বন্ধু আমরা, দু' জনের চেহারা হুবহু এক রকম হয়ে যাবে!...কাঁপছ?...ভয় কি? অল্প খানিকক্ষণ জ্বালা করবে। তা'র পর মুখের এক পরদা চামড়া উঠে গেলে আর চোখদুটো গ'লে গেলে, তোমার আমার সমান দশা হয়ে যাবে।..."

রহমান ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে ছট্‌ফট্ করতে করতে শঙ্করকে মিনতি ক'রে কি বলতে গেল।

রহমানের কণ্ঠ থেকে অস্ফুট স্বর শুনতে পেয়েই শঙ্কর দৃঢ়স্বরে হুকুম করলে—"খবরদার। মুখ বুজে থাক। তোমাকে আমি একেবারে মেরে ফেলতে চাই নে! মৃত্যু হ'লে তুমি ত বেঁচে যাবে! এত সহজেই তোমার অব্যাহতি দেব মনে করেছ!"

শঙ্কর রহমানকে বাঁ-হাতের কনুইয়ের ভাঁজের মধ্যে দৃঢ়ভাবে চেপে ধ'রে বাঁ-হাতের আঙুল দিয়ে তার মুখ চেপে ধরলে এবং ডান-হাত দিয়ে শিশি ধ'বে বহমানের কপালে. চোখে ও গালেব উপর আস্তে আস্তে অ্যাসিড্ ঢেলে দিল। সেই অ্যাসিডের ধারা গড়িয়ে এসে তার নিজের হাতেও লাগল। তথাপি সে মুক্তি-প্রয়াসী রহমানকে চেপে ধ'রে রেখে স্থির স্বরে বল্‌লে—"আর একটু সবুর কর। বড়ো জ্বালা করছে, না? অ্যাসিড্ গায়ে পড়লে এই রকম একটু জ্বালা করে!..পশুর মতো আমাকে কামড়াচ্ছ? তা'তে আর আমার এমন বেশি কি লাগবে, বন্ধু? তুমি কি মনে কবেছ, তোমাকে জখম ক'রে জেল খাটবার জন্য আমি বেঁচে থাকব?"

শঙ্কব এই কথা বলতে বলতেই শিশিব অবশিষ্ট অ্যাসিড্ মুখ হাঁ ক'রে নিজের গলায় ঢেলে দিলে।

যন্ত্রণায় উন্মত্তপ্রায় রহমান প্রাণপণ বলে শঙ্করের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতেই শঙ্করের প্রাণহীন দেহের ভারে সে চৌকির উপর থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং দারুণ যন্ত্রণায় মূর্ছিত হয়ে পড়ল। তখন রহমানের মুখখানা সদ্য ছাল-ছাড়ানো রক্তাক্ত এক-ডেলা মাংসপিণ্ড হয়ে গেছে!

রহমানের যখন চেতনা ফিরে এল, তখন সকাল। সে অনুভব করলে, শঙ্করের প্রাণহীন আড়ষ্ট দেহ তাকে তখনও মরণ-আলিঙ্গনে চেপে ধ'রে পড়ে আছে। সে নিজেকে মড়ার কঠিন আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করবার অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু মড়ার বাহু-বন্ধন ছাড়াতে না পেরে ভয়ে সে আবার মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

বার্ষিক বসুমতী ঃ ১৩৩৩

শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

রাজশেখর বসু

মাঘ মাস ১৩২৬ সাল। এই মাত্র আরমানী গির্জার ঘড়িতে বেলা এগারটা বাজিয়াছে। শ্যামবাবু চামড়ার ব্যাগ হাতে ঝুলাইয়া জুডাস লেনের একটি তেতলা বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। বাড়িটি বহু পুরাতন, ক্রমাগত চুন ও রঙের প্রলেপে লোলচর্ম কলপিত-কেশ বৃদ্ধের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। নীচেব তলায় অন্ধকাবময় মালেব গুদাম। উপরতলায় সম্মুখভাগে অনেকগুলি ব্যবসায়ীর আপিস, পশ্চাতে বিভিন্ন জাতীয় কয়েকটি পরিবার পৃথক পৃথক অংশে বাস করেন। প্রবেশদ্বারেব সম্মুখেই তেতলা পর্যন্ত বিস্তৃত কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশের দেওয়াল আগাগোড়া তাম্বুলরাগচর্চিত—যদিও নিষেধের নোটিস লম্বিত আছে। কতিপয় নেংটে ইঁদুর ও আরসোলা পরস্পর অহিংসভাবে স্বচ্ছন্দে ইতস্তত বিচরণ কবিতেছে। ইহারা আশ্রমমৃগের ন্যায় নিঃশঙ্ক, সিঁড়ির যাত্রিগণকে গ্রাহ্য করে না। অন্তরালবর্তী সিন্ধী-পরিবারের রান্নাঘর হইতে নির্গত হিঙের তীব্র গন্ধের সহিত নবদমাব গন্ধ মিলিত হইয়া সমস্ত স্থান আমোদিত কবিয়াছে। আপিস-সমূহের মালিকগণ তুচ্ছ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিয়া কেনা-বেচা তেজি-মন্দি আদায়-উসুল ইত্যাদি মহৎ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দিন যাপন করিতেছেন।

শ্যামবাবু তেতলায় উঠিয়া একটি ঘরেব তালা খুলিলেন। ঘরের দরজার পাশে কাষ্ঠফলকে লেখা আছে—ব্রহ্মচারী অ্যাণ্ড ব্রাদাব-ইন-ল, জেনার্ল্ মার্চেন্ট্স। এই কারবারের স্বত্বাধিকারী স্বয়ং শ্যামবাবু (শ্যামলাল গাঙ্গুলী) এবং তাঁহাব শ্যালক বিপিন চৌধুরী, বি.এস-সি। ঘরে কয়েকটি পুবাতন টেবিল, চেযাব, আলমাবি প্রভৃতি আপিস-সরঞ্জাম। টেবিলের উপর নানা-প্রকার খাতা, বিতবণেব জন্য ছাপানো বিজ্ঞাপনের স্তূপ, একটি পুরাতন থ্যাকার্স ডিবেক্টরি, একখণ্ড ইণ্ডিয়ান কম্পানিজ অ্যাক্ট, কয়েকটি বিভিন্ন কম্পানির নিয়মাবলী বা articles. এবং অন্যবিধ কাগজপত্র। দেওয়ালে সংলগ্ন তাকেব উপব কতকগুলি ধূলিধূসব কাগজমোড়া শিশি এবং শূন্যগর্ভ মাদুলি। এককালে শ্যামবাবু পেটেন্ট ও স্বপ্নাদ্য ঔষধেব কারবার করিতেন, এগুলি তাহাবই নিদর্শন।

শ্যামবাবুব বযস পঞ্চাশের কাছাকাছি, গাঢ় শ্যামবর্ণ, কাঁচা-পাকা দাড়ি, আকণ্ঠলম্বিত কেশ, স্থূল লোমশ বপু। অল্পবয়স হইতেই তাঁহাব স্বাধীন ব্যবসায়ে ঝোক, কিন্তু এ পর্যন্ত নানাপ্রকার কারবার করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। ই. বি. রেলওয়ে অডিট আপিসের চাকরিই তাঁহার জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায়। দেশে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি এবং একটি জীর্ণ কালীমন্দির আছে, কিন্তু তাহার আয় সামান্য। চাকরির অবকাশে ব্যবসায়ের চেষ্টা করেন—এ বিষযে শ্যালক বিপিনই তাঁহার প্রধান সহায়। সন্তানাদি নাই, কলিকাতার বাসায় পত্নী এবং শ্যালক সহ বাস করেন। ব্যবসায়ের কিছু উন্নতি হইলেই চাকরি ছাড়িয়া দিবেন, এইরূপ সংকল্প আছে। সম্প্রতি ছয় মাসের ছুটি লইয়া নূতন উদ্যমে ব্রহ্মচারী অ্যাণ্ড ব্রাদার-ইন-ল নামে আপিস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্যামবাবু ধর্মভীরু লোক, পঞ্জিকা দেখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন এবং অবসর-মত তান্ত্রিক সাধনা করিয়া থাকেন। বৃথা—অর্থাৎ ক্ষুধা না থাকিলে—মাংসভোজন, এবং অকারণে কারণ পান করেন না। কোন্ সন্ন্যাসী সোনা করিতে পারে, কাহার নিকট দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ বা একমুখী রুদ্রাক্ষ আছে, কে পারদ ভস্ম করিতে জানে, এই সকল সন্ধান প্রায়ই লইয়া থাকেন। কয়েক মাস হইতে বাটীতে গৈরিক বাস পরিধান করিতেছেন এবং কতকগুলি অনুরক্ত শিষ্যও সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্যামবাবু, আজকাল মধ্যে মধ্যে নিজেকে 'শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী' আখ্যা দিয়া থাকেন, এবং অচিরে এই নামে সর্বত্র পরিচিত হইবেন এরূপ আশা করেন।

শ্যামবাবু তাঁহার আপিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া একটি সার্ধত্রিপাদ ইজিচেয়ারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ডাকিলেন—'বাঞ্ছা, ওরে বাঞ্ছা।' বাঞ্ছা শ্যামবাবুর আপিসের বেয়ারা—এতক্ষণ পাশের গলিতে টুলে বসিয়া ঢুলিতেছিল—প্রভুর ডাকে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল। শ্যামবাবু বলিলেন—'গঙ্গাজলের বোতলটা আন্, আর খাতাপত্রগুলো একটু ঝেড়ে-মুছে রাখ, যা ধুলো হয়েছে।' বাঞ্ছা একটা তামার কুপি আনিয়া দিল। শ্যামবাবু তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক লইয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক গৃহমধ্যে ছিটাইয়া দিলেন। তার পর টেবিলের দেরাজ হইতে একটি সিন্দুর-চর্চিত রবার স্ট্যাম্পের সাহায্যে ১০৮ বার দুর্গানাম লিখিলেন। স্ট্যাম্পে ১২ লাইন 'শ্রীশ্রীদুর্গা' খোদিত আছে, সুতরাং ৯ বার ছাপিলেই কার্যোদ্ধার হয়। এই শ্রমহারক যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা শ্রীমান বিপিন। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন—'দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ' এবং পেটেন্ট লইবার চেষ্টায় আছেন।

উক্তপ্রকার নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া শ্যামবাবু প্রসন্নচিত্তে ব্যাগ হইতে ছাপাখানার একটি ভিজা প্রুফ বাহির করিয়া লইয়া সংশোধন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জুতার মশমশ শব্দ করিতে করিতে অটলবাবু ঘরে আসিয়া বলিলেন—'এই যে শ্যামদা, অনেকক্ষণ এসেছেন বুঝি? বড় দেবি হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না—হাইকোর্টে একটা মোশন ছিল। ব্রাদার-ইন-ল কোথায়?'

শ্যামবাবু। বিপিন গেছে বাগবাজারে তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যের কাছে। আজ পাকা কথা নিয়ে আসবে। এই এল ব'লে।

অটলবাবু চাপকান-চোগা-ধারী সদ্যোজাত অ্যাটর্নি, পিতার আপিসে সম্প্রতি জুনিয়ার পার্টনার-রূপে যোগ দিয়াছেন। গৌরবর্ণ, সুপুরুষ, বিপিনের বাল্যবন্ধু। বয়সে নবীন হইলেও চাতুর্যে পবিপক্ক। জিজ্ঞাসা করিলেন—'বুড়ো রাজী হ'ল? আচ্ছা, ওকে ধরলেন কি ক'রে?'

শ্যাম। আরে তিনকড়িবাবু হলেন গে শরতের খুড়শ্বশুর। বিপিনের মাস্তুতো ভাই শরৎ। ঐ শরতের সঙ্গে গিয়ে তিনকড়িবাবুকে ধরি। সহজে কি রাজী হয়? বুড়ো যেমন কঞ্জুস তেমনি সন্দিগ্ধ। বলে—আমি হলুম রায়সাহেব, রিটায়ার্ড ডেপুটি, গভরমেন্টের কাছে কত মান। কোম্পানির ডিরেক্টর হয়ে কি শেষে পেনশন খোয়াব? তখন নজির দিয়ে বোঝালুম—কত রিটায়ার্ড বড় বড় অফিসার তো ডিরেক্টরি করছেন, আপনার কিসেব ভয়? শেষে যখন শুনলে যে, প্রতি মিটিংএ ৩২ টাকা ফী পাবে, তখন একটু ভিজল।

অটল। কত টাকার শেয়ার নেবে?

শ্যাম। তাতে বড় হুঁশিয়ার। বলে—তোমার ব্রহ্মচারী কোম্পানি যে লুঠ করবে না, তার জামিন কে? তোমরা শালা-ভগ্নীপতি মিলে ম্যানেজিং এজেন্ট হয়ে কোম্পানিকে ফেল করলে আমার টাকা কোথায় থাকবে? বললুম—মশায়, আপনার মত বিচক্ষণ সাবধানী ডিরেক্টর থাকতে কার সাধ্য লুঠ করে। খরচপত্র তো আপনার চোখের সামনেই হবে। ফেল হ'তে দেবেন কেন? মন্দটা যেমন ভাবছেন, ভালর দিকটাও দেখুন। কি রকম লাভের ব্যবসা। খুব কম ক'রেও যদি ৫০ পারসেন্ট ডিভিডেণ্ড পান তবে দু-বছরের মধ্যেই তো আপনার ঘরের টাকা ঘরে ফিরে এল। শেষে অনেক তর্কাতর্কির পর বললে—আচ্ছা, আমি শেয়ার নেব, কিন্তু বেশী নয়, ডিরেক্টর হ'তে হ'লে যে টাকা দেওয়া দরকার তার বেশী নেব না। আজ মত স্থির ক'রে জানাবেন, তাই বিপিনকে পাঠিয়েছি।

অটল। অমন খুঁতখুঁতে লোক নিয়ে ভাল করলেন না শ্যাম-দা। আচ্ছা, মহারাজাকে ধরলেন না কেন?

শ্যাম। মহারাজাকে ধরতে বড়-শিকারী চাই, তোমার আমার কর্ম নয়। তা ছাড়া পাঁচ ভূতে তাঁকে শুষে নিয়েছে, কিছু আর পদার্থ রাখে নি।

অটল। খোট্টাটি ঠিক আছে তো? আসবে কখন?

শ্যাম। সে ঠিক আছে, এই রকম দাঁও মারতেই তো সে চায়। এতক্ষণ তার আসা উচিত ছিল।

প্রসপেক্টসটা তোমাদের শুনিয়ে আজই ছাপাতে দিতে চাই। তিনকড়িবাবুকে আসতে বলেছিলুম, বাতে ভুগছেন, আসতে পারবেন না জানিয়েছেন।

'রাম রাম বাবুসাহেব!'

আগন্তুক মধ্যবয়স্ক, শ্যামবর্ণ, পরিধানে সাদা ধুতি, লম্বা কাল বনাতের কোট, পায়ে বার্নিশ-করা জুতা, মাথায় হলদে রঙের ভাঁজ-করা মলমলের পাগড়ি, হাতে অনেকগুলি আংটি, কানে পান্নার মাকড়ি, কপালে ফোঁটা।

শ্যামবাবু বলিলেন—'আসুন, আসুন—ওরে বাঞ্ছা, আর একটা চেয়ার দে। এই ইনি হচ্ছেন অটলবাবু, আমাদের সলিসিটর দত্ত কোম্পানির পার্টনার। আর ইনি হলেন আমার বিশেষ বন্ধু—বাবু গণ্ডেরিরাম বাটপাবিয়া।'

গণ্ডেরি। নোমোস্কাব, আপনের নাম শুনা আছে, জানপহচান হয়ে বড় খুশ হ'ল।

অটল। নমস্কার, এই আপনার জন্যই আমরা ব'সে আছি। আপনার মত লোক যখন আমাদের সহায়, তখন কোম্পানির আর ভাবনা কি?

গণ্ডেবি। হেঁ হেঁ, সোকোলি ভগবানের হিচ্ছা। হামি একেলা কি করতে পারি? কুছু না।

শ্যাম। ঠিক, ঠিক। যা করেন মা তারা দীনতারিণী। দেখ অটল, গণ্ডেরিবাবু যে কেবল পাকা ব্যবসাদার তা মনে ক'বো না। ইংরিজী ভাল না জানলেও ইনি বেশ শিক্ষিত লোক, আর শাস্ত্রেও বেশ দখল আছে।

অটল। বাঃ, আপনার মত লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় বড় সুখী হলুম। আচ্ছা মশায়, আপনি এমন সুন্দর বাংলা বলতে শিখলেন কি ক'রে?

গণ্ডেরি। বহুত বাঙ্গালীব সঙে হামি মিলা মিশা করি। বাংলা কিতাব ভি অনহেক পড়েছি। বঙ্কিমচন্দ, রবীন্দবনাথ, আউর ভি সব।

এমন সময় বিপিনবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। ইনি একটু সাহেবী মেজাজের লোক, এককালে বিলাত যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পবিধানে সাদা প্যান্ট, কাল কোট, লাল নেকটাই, হাতে সবুজ ফেল্টহ্যাট। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ক্ষীণকায়, গোঁফের দুই প্রান্তে কামানো। শ্যামবাবু উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি হ'ল?'

বিপিন। ডিরেক্টব হবেন বলেছেন, কিন্তু মাত্র দু-হাজার টাকার শেয়ার নেবেন। তোমাকে অটলকে আমাকে পরশু সকালে ভাত খাবার নিমন্ত্রণ কবেছেন। এই নাও চিঠি।

অটল। তিনকড়িবাবু হঠাৎ এত সদয় যে?

শ্যাম। বুঝলুম না। বোধ হয় ফেলো ডিরেক্টরদের একবার বাজিয়ে যাচাই ক'বে নিতে চান।

অটল। যাক, এবার কাজ আরম্ভ করুন। আমি মেমোরাণ্ডম আর আর্টিকেল্‌সের মুসাবিদা এনেছি। শ্যাম-দা, প্রসপেক্টসটা কি রকম লিখলেন পড়ুন।

শ্যাম। হাঁ, সকলে মন দিয়ে শোন। কিছু বদলাতে হয় তো এই বেলা। দুর্গা—দুর্গা—

জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ

১৯১৩ সালের ৭ আইন অনুসারে রেজিস্ট্রিত

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

মূলধন—দশ লক্ষ টাকা, ১০ হিসাবে ১০০,০০০ অংশে বিভক্ত। আবেদনের সঙ্গে অংশপিছু ২ প্রদেয়। বাকী টাকা চার কিস্তিতে তিন মাসের নোটিসে প্রয়োজন-মত দিতে হইবে।

অনুষ্ঠানপত্র

ধর্মই হিন্দুগণের প্রাণস্বরূপ। ধর্মকে বাদ দিয়া এ জাতির কোনও কর্ম সম্পন্ন হয় না। অনেকে বলেন—ধর্মের ফল পরলোকে লভ্য। ইহা আংশিক সত্য মাত্র। বস্তুত ধর্মবৃত্তির উপযুক্ত প্রয়োগে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ উপকার হইতে পারে। এতদর্থে সদ্য সদ্য চতুর্বর্গ লাভের উপায়স্বরূপ এই বিরাট ব্যাপারে দেশবাসীকে আহ্বান করা হইতেছে।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত দেবমন্দিরগুলির কিরূপ বিপুল আয় তাহা সাধারণে জ্ঞাত নহেন। রিপোর্ট হইতে জানা গিয়াছে যে বঙ্গদেশের একটি দেবমন্দিরের দৈনিক যাত্রিসংখ্যা গড়ে ১৫ হাজার। যদি লোক পিছু চার আনা মাত্র আয় ধরা যায়, তাহা হইলে বাৎসরিক আয় প্রায় সাড়ে তের লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। খরচ যতই হউক, যথেষ্ট টাকা উদ্‌বৃত্ত থাকে। কিন্তু সাধারণে এই লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত।

দেশের এই বৃহৎ অভাব দূরীকরণার্থে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামে একটি জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি স্থাপিত হইতেছে। ধর্মপ্রাণ শেয়ারহোল্ডারগণের অর্থে একটি মহান্ তীর্থক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে, এবং জাগ্রত দেবী সমন্বিত সুবৃহৎ মন্দির নির্মিত হইবে। উপযুক্ত ম্যানেজিং এজেন্টের হস্তে কার্য নির্বাহের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। কোনও প্রকার অপব্যয়ের সম্ভাবনা নাই। শেয়ারহোল্ডারগণ আশাতীত দক্ষিণা বা ডিভিডেণ্ড পাইবেন এবং একাধারে ধর্ম অর্থ মোক্ষ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

ডিরেক্টরগণ। — (১) অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ বিচক্ষণ ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট রায়সাহেব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। (২) বিখ্যাত ব্যবসাদার ও ক্রোরপতি শ্রীযুক্ত গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া। (৩) সলিসিটর্স দত্ত অ্যাণ্ড কোম্পানির অংশীদার শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দত্ত, M.A., B.L. (৪) বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিস্টার বি, সি, চৌধুরী, B. Sc., A. S. S. (USA) (৫) কালীপদাশ্রিত সাধক ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ শ্যামানন্দ (ex-officio)।

অটলবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—'বিপিন আবার নতুন টাইটেল পেলে কবে?'

শ্যাম। আর বল কেন। পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'রে আমেরিকা না কামস্কাটকা কোথা থেকে তিনটে হরফ আনিয়েছে।

বিপিন। বা, আমার কোয়ালিফিকেশন না জেনেই বুঝি তারা শুধু শুধু একটা ডিগ্রী দিলে? ডিরেক্টর হ'তে গেলে একটা পদবী থাকা ভাল নয়?

গণ্ডেরি। ঠিক বাত। ভেক বিনা ভিখ মিলে না। শ্যামবাবু, আপনিও এখন্‌সে ধোতি-উতি ছোড়ে লঙোটি পিনহুন।

শ্যাম। আমি তো আর নাগা সন্ন্যাসী নই। আমি হলুম শক্তিমন্ত্রের সাধক, পরিধেয় হ'ল রক্তাম্বর। বাড়িতে তো গৈরিকই ধারণ করি। তবে আপিসে প'রে আসি না, কারণ, ব্যাটারা সব হাঁ করে চেয়ে থাকে। আর একটু লোকের চোখ-সহা হয়ে গেলে সর্বদাই গৈরিক পরব। যাক, পড়ি শোন—

মেসার্স ব্রহ্মচারী অ্যাণ্ড ব্রাদার-ইন-ল এই কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্সি লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন—ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁহারা লাভের উপর শতকরা দুই টাকা মাত্র কমিশন লইবেন, এবং যতদিন না—

অটলবাবু বলিলেন—'কমিশনের রেট অত কম ধরলেন কেন? দশ পার্সেন্ট অনায়াসে ফেলতে পারেন।'

গণ্ডেরি। কুছ দরকার নেই। শ্যামবাবুর পরবস্তি অপ্‌নেসে হোয়ে যাবে। কমিশ্‌নের ইরাদা থোড়াই করেন।

এবং যতদিন না কমিশনে মাসিক ১০০০্ টাকা পোষায়, ততদিন শেষোক্ত টাকা অ্যালউয়েন্স রূপে পাইবেন।

গণ্ডেরি। শুনেন অটলবাবু, শুনেন। আপনি শ্যামবাবুকে কী শিখ্‌লাবেন?

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী গোবিন্দপুর গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী দেবী বহু শতাব্দী যাবৎ প্রতিষ্ঠিতা আছেন। দেবীমন্দির ও তৎসংলগ্ন দেবত্র সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সম্প্রতি স্বপ্নাদেশ পাইয়াছেন যে উক্ত গোবিন্দপুর গ্রামে অধুনা সর্বপীঠের সমন্বয় হইয়াছে এবং মাতা তাঁহার মাহাত্ম্যের উপযোগী সুবৃহৎ মন্দিরে বাস করিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী অবলা বিধায় এবং উক্ত দৈবাদেশ স্বয়ং পালন করিতে অপারগা বিধায়, উক্ত দেবত্র সম্পত্তি মায় মন্দির বিগ্রহ জমি আওলাত আদি এই লিমিটেড কোম্পানিকে সমর্পণ করিতেছেন।

অটল। নিস্তারিণী দেবী আবার কোথা থেকে এলেন? সম্পত্তি তো আপনার ব'লেই জানতুম।

শ্যাম। উনি আমার স্ত্রী। সেদিন তাঁর নামেই সব লেখাপড়া ক'রে দিয়েছি। আমি এসব বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে চাই না।

গণ্ডেরি। ভালো বন্দোবস্ত্‌ কিয়েছেন। আপনেকো কোই দুস্‌বে না। নিস্তার্ণী দেবীকো কোন্‌ পহ্‌চানে। দাম কেতো লিচ্ছেন?

অতঃপর তীর্থপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরনির্মাণ, দেবসেবাদি কোম্পানি কর্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং এতদর্থে কোম্পানি মাত্র ১৫,০০০্‌ টাকা পণে সমস্ত সম্পত্তি খরিদার্থে বায়না করিয়াছেন।

গণ্ডেরি। হদ্দ্‌ কিয়া শ্যামবাবু! জঙ্গল কি ভিতর পুরানা মন্দিল, উস্‌মে দো-চার শও ছুছুন্দর, ছটাক ভর জমীন, উস্‌পর দো-চার বাঁশ ঝাড়—বস্‌, ইসিকা দাম পন্দ্র হজার!

শ্যাম। কেন, অন্যায়টা কি হ'ল? স্বপ্নাদেশ, একান্ন পীঠ এক ঠাঁই, জাগ্রত দেবী—এসব বুঝি কিছু নয়? গুড-উইল হিসেবে পনের হাজার টাকা খুবই কম।

গণ্ডেরি। অচ্ছা। যদি কোই শেয়ারহোল্ডার হাইকোর্ট মে দরখাস্ত পেশ করে—স্বপন-উপন সব ঝুট, ছক্‌লায়কে রুপয়া লিয়া—তব্‌?

অটল। সে একটা কথা বটে, কিন্তু এই সব আধিদৈবিক ব্যাপার কেস হয় অরিজিনাল সাইডের জুরিস্‌ডিক্‌শনে পড়ে না। আইন বলে—caveat emptor, অর্থাৎ ক্রেতা সাবধান! সম্পত্তি কেনবার সময় যাচাই কর নি কেন? যা হোক একবার expert opinion নেব।

শীঘ্রই নূতন দেবালয় আরম্ভ হইবে। তৎসংলগ্ন প্রশস্ত নাটমন্দির, নহবৎখানা, ভোগশালা, ভাণ্ডার প্রভৃতি আনুষঙ্গিক গৃহাদিও থাকিবে। আপাতত দশ হাজার যাত্রীর উপযুক্ত অতিথিশালা নির্মিত হইবে। শেয়ারহোল্ডারগণ বিনা খরচায় সেখানে সপরিবারে বাস করিতে পারিবেন। হাট বাজার যাত্রা থিয়েটার বায়োস্কোপ ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের আয়োজন যথেষ্ট থাকিবে। যাঁহারা দৈবাদেশ বা ঔষধপ্রাপ্তির জন্য হত্যা দিবেন তাঁহাদের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকিবে। মোট কথা, তীর্থযাত্রী আকর্ষণ করিবার সর্বপ্রকার উপায়ই অবলম্বিত হইবে। স্বয়ং শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী সেবার ভার লইবেন।

যাত্রিগণের নিকট হইতে যে দর্শনী ও প্রণামী আদায় হইবে, তাহা ভিন্ন আরও নানা উপায়ে অর্থাগম হইবে। দোকান হাট বাজার অতিথিশালা মহাপ্রসাদ বিক্রয় প্রভৃতি হইতে প্রচুর আয় হইবে। এতদ্ভিন্ন by-product recovery র ব্যবস্থা থাকিবে। সেবার ফুল হইতে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হইবে এবং প্রসাদী বিল্বপত্র মাদুলীতে ভরিয়া বিক্রীত হইবে। চরণামৃতও বোতলে প্যাক করা হইবে। বলির জন্য নিহত ছাগসমূহের চর্মট্যান করিয়া উৎকৃষ্ট কিড-স্কিন প্রস্তুত হইবে এবং বহুমূল্যে বিলাতে চালান যাইবে। হাড় হইতে বোতাম হইবে। কিছুই ফেলা যাইবে না।

গণ্ডেরি। বকড়ি মারবেন? হামি ইস্‌মি নহি, রামজী কিরিয়া। হামার নাম কাটিয়ে দিন।

শ্যাম। আপনি তো আর নিজে বলি দিচ্ছেন না। আচ্ছা, না হয় কুমড়ো-বলির ব্যবস্থা করা যাবে।

অটল। কুমড়োর চামড়া তো ট্যান হবে না। আয় ক'মে যাবে। কিহে বৈজ্ঞানিক, কুমড়োর খোসার একটা গতি করতে পার?

বিপিন। কস্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল করলে বোধ হয় ভেজিটেব্‌ল শু হ'তে পারে। এক্সপেরিমেন্ট ক'রে দেখব।

গণ্ডেরি। জো খুশি করো। হমার কি আছে। হামি থোড়া বোজ্ বাদ আপ্‌না শেয়ার বিলকুল বেচে দিব।

হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে কোম্পানির বাৎসরিক লাভ অন্তত ১২ লক্ষ টাকা হইবে এবং অনায়াসে ১০০ পারসেন্ট ডিভিডেন্ট দেওয়া যাইবে। ৩০ হাজার শেয়ারের আবেদন পাইলেই অ্যালটমেন্ট হইবে। সত্বর শেয়ারের জন্য আবেদন করুন। বিলম্বে এই সুবর্ণসুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন।

গণ্ডেরি। লিখে লিন—ঢাই লাখ টাকার শেয়ার বিক্রি হয়ে গেছে। হামি এক লাখ লিব, বাকী দেড় লাখ শ্যামবাবু বিপিনবাবু অটলবাবু সমান হিস্‌সা লিবেন।

শ্যাম। পাগল আর কি! আমি আর বিপিন কোথা থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ হাজার বার করব? আপনারা না হয় বড়লোক আছেন।

গণ্ডেরি। হামি-শালা রূপয়া ডালবো আর তুমি লোগ মৌজ করবে? সো হোবে না। সব্‌কা ঝৌখি লেনা পড়েগা। শ্যামবাবু মতলব সমঝ্‌লেন না? টাকা কোই দিব না। সব হাওলাতী থাকবে। মেনেজিং এজিন্ট মহাজন হোবে।

অটল। বুঝলেন শ্যাম-দা? আমরা সকলে যেন ম্যানেজিং এজেন্টস্‌দের কাছ থেকে কর্জ ক'রে নিজের নিজের শেয়ারের টাকা কোম্পানিকে দিচ্ছি, আবার কোম্পানি ঐ টাকা ম্যানেজিং এজেন্টস্‌দের কাছে গচ্ছিত রাখছে। গাঁট থেকে এক পয়সাও কেউ দিচ্ছেন না, টাকাটা কেবল খাতাপত্রে জমা থাকবে।

শ্যাম। তারপর তাল সামলাবে কে? কোম্পানি ফেল হলে আমি মারা যাই আর কি! বাকী কলের টাকা দেব কোথা থেকে?

গণ্ডেরি। ডরেন কোনো? শেয়ার পিছ তো অভি দো টাকা দিতে হোবে। ঢাই লাখ টাকার শেয়ারে সির্ফ্ পচাস হজার দেনা হোয়। প্রিমিয়ম মে সব বেচে দিব—সুবিস্তা হোয় তো আউর ভি শেয়ার ধ'রে রাখবো। বহুত মুনাফা মিলবে। চিম্‌ড়িমল ব্রোকারসে হামি বন্দোবস্ত কিয়েছি। দো চার দফে হম লোগ আপ্‌না আপ্‌নি শেয়ার লেকে খেলবো, হাঁথ বাদলাবো, দাম চড়বে, বাজার গরম হোবে। তখন সব কোই শেয়ার মাংবে, দাম কা বিচার করবে না। কবীরজী কি বচন শুনিয়ে—

ঐসী গতি সন্‌সারমে যো গাড়র কি ঠাট।
এক পড়া যব গাঢ়মে সবৈ যাত তেহি বাট।।

মানি হচ্ছে—সন্‌সারের লোক সব যেন ভেড়ার পাল। এক ভেড়া যদি খান্দেমে গির পড়ে তো সব কোই উসিমে ঘুসে।

শ্যামবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—'তারা ব্রহ্মময়ী, তুমিই জান। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তোমার কাজ তুমিই উদ্ধার ক'রে দাও মা—অধম সন্তানকে যেন মেরো না।'

গণ্ডেরি। শ্যামবাবু, মন্দিল-উন্দিলকা কোম্পানি যো কর্না হ্যায় কিজিয়ে। উস্‌কি সাথ ঘই-এর কারবার ভি লাগায় দিন। টাকায় টাকা লাভ।

অটল। ঘই কি চিজ?

গণ্ডেরি। ঘই জানেন না? ঘিউ হচ্ছে আস্‌লি চিজ—যো গায় ভঁইস বকড়িকা দুধসে বনে। আউর নক্‌লি যো হ্যায় সো ঘই কহ্‌লাতা। চর্বি, চীনাবাদাম তল ওগায়রহ্ মিলা কর্ বনায়া যাতা। পর্ সাল হামি ঘই-এব কামে পচিশ হজার লাগাই, সাঢ়ে চৌবিশ হজার মুনাফা মিলে।

অটল। উঃ কিস্তর সাপ মেবেছিলেন বলুন।

গণ্ডেরি। আরে সাঁপ কাঁহাসে মিল্‌বে? উ সব ঝুট বাত।

অটল। আচ্ছা গণ্ডাবজী—

গণ্ডেবি। গণ্ডাব নেহি, গণ্ডেবি।

অটল। হাঁ হাঁ, গণ্ডেবিজী। বেগ ইওব পার্ডন। আচ্ছা, আপনি তো নিরামিষ খান, ফোঁটা কাটেন, ভজন-পূজনও কবেন।

গণ্ডেবি। কেনো কববো না? হামি হব্ রোজ গীতা আউব রামচরিতমানস পঢ়ি, রামভজন ভি কবি।

অটল। তবে এমন পাপেব ব্যাবসাটা করলেন কি ব'লে?

গণ্ডেরি। পাঁপ? হামাব কোনো পাঁপ হোবে? বেবসা তো করে কাসেম আলি। হামি রহি কলকত্তা, ঘই বনে হাথবস্‌মে। হামি ন আঁখসে দেখি, ন নাকসে শুংখি—হনুমানজী কিরিয়া। হামি তো সির্ফ মহাজন অছি—রুপয়া দে কর্ খালাস। সুদ লি, মুনাফার আধা হিস্‌সা ভি লি। যদি হামি টাকা না দি, কাসেম আলি দুসরা ধনীসে লিবে। পাপ হোবে তো শালা কাসেম আলিকা হোবে। হামার কি? যদি ফিন কুছ দোষ লাগে—জানে রন্‌ছোড়জী—হামার পুন্‌ভি থোড়া-বহুত জমা আছে। একাদ্‌সী, শিউবাত, বামনওমীমে উপবাঁস, দান-খয়রাত ভি কুছু করি। আট আটঠো ধরমশালা বানোআয়া—লিলুয়ামে, বালিমে, শেওড়াফুলিমে—

অটল। লিলুয়ার ধর্মশালা তো আশরফিলাল ঠুনঠুনওয়ালা করেছে।

গণ্ডেরি। কিযেছে তো কি হইয়েছে? সভি তো ওহি কিয়েছে। লেকিন বানিযে দিয়েছে কোন্? তদারক কোন্ কিযেছে? ঠিকাদার কোন্ লাগিয়েছে সব হামি। আশরফি হমার চাচেরা ভাই লাগে। হামি সলাহ্ দিয়েছি তব্ না রুপযা খবচ কিয়েছে।

অটল। মন্দ নয়, টাকা ঢাললে আশরফি, পুণ্য হ'ল গণ্ডেবিব।

গণ্ডেরি। কেনো হোবে না? দো দো লাখ রুপেয়া হর্ জগেমে খরচ দিয়া। জোড়িয়ে তো কেতনা হোয। উস পব কম্‌সে কম সঁযকড়া পাঁচ রুপয়া দস্তুরি তো হিসাব কিজিয়ে। হাম তো বিলকুল ছোড় দিযা। আশবফিলালকা পুন্ যদি সোলহ্ লাখকা হোয়, মেরা ভি অস্‌সি হাজার মোতাবেক হোনা চাহ্ তা।

অটল। চমৎকার ব্যবস্থা। পুণ্যেরও দেখছি দালালি পাওয়া যায়। আমাদের শ্যাম-দা গণ্ডেরি-দা যেন মানিকজোড়।

গণ্ডেবি। অটলবাবু, আপনি দো চার অংরেজী কিতাব পঢ়িয়ে হামাকে ধরম কি শিখ্‌লাবেন? বঙ্গালী ধরম জানে না। তিস রুপযার নোকরি করবে, পাঁচ পইসার হরিলুঠ দিবে। হামার জাত রুপয়া ভি কামায় হিসাবসে, পুন্ ভি করে হিসাবসে। আপ্‌নেদের রবীন্দরনাথ কি লিখছেন—

বৈরাগ সাধন মুক্তি সো হমার নহি।

হামি এখন চলছি, রেস খেলনে। কোন্ট্রি গেরিল ঘোড়ে পর্ আজ দো-চারশও লাগিয়ে দিব।

অটল। আমিও উঠি শ্যাম-দা। আর্টিকেলের মুসাবিদা রেখে যাচ্ছি, দেখে রাখবেন। প্রস্‌পেক্টস তো দিব্বি হয়েছে। একটু-আধটু বদ্‌লে দেব এখন। পরশু আবার দেখা হবে। নমস্কার।

বাগবাজারে গলির ভিতর রায়সাহেব তিনকড়িবাবুর বাড়ি। নীচের তলায় রাস্তার সম্মুখে নাতিবৃহৎ বৈঠকখানা-ঘরে গৃহকর্তা এবং নিমন্ত্রিতগণ গল্পে নিবত, অন্দর হইতে কখন ভোজনের ডাক আসিবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। আজ রবিবার, তাড়া নাই, বেলা অনেক হইয়াছে।

তিনকড়িবাবুর বয়স ষাট বৎসর, ক্ষীণ দেহ, দাড়ি কামানো। শীর্ণ গোঁফে তামাকের ধোঁয়ায় পাকা খেজুরের রং ধরিয়াছে—কথা কহিবার সময় আরসোলার দাড়ার মত নড়ে। তিনি দৈব ব্যাপারে বড় একটা বিশ্বাস করেন না। প্রথম পরিচয়ে শ্যামবাবুকে বুজরুক সাব্যস্ত কবিয়াছিলেন, কেবল লাভের আশায় কোম্পানিতে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু আজ কালীঘাট হইতে প্রত্যাগত সদ্যঃস্নাত শ্যামবাবুর অভিনব মূর্তি দেখিয়া কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্যামবাবুর পরিধানে লাল চেলী, গেরুয়া রঙের আলোয়ান, পায়ে বাঘের চামড়ার শিং-তোলা জুতা। দাড়ি এবং চুল সাজিমাটি দ্বারা যথাসম্ভব ফাঁপানো, এবং কপালে মস্ত একটি সিন্দুবেব ফোঁটা।

তিনকড়িবাবু তামাক-টানাব অন্তবালে বলিতেছিলেন—'দেখুন স্বামীজী, হিসেবই হ'ল ব্যাবসাব সব। ডেবিট ক্রেডিট যদি ঠিক থাকে, আব ব্যালান্স যদি মেলে, তবে সে বিজনেসেব কোনও ভয় নেই।'

শ্যামবাবু। আজ্ঞে, বড় যথার্থ কথা বলেছেন। সেইজন্যেই তো আমবা আপনাকে চাই। আপনাকে আমবা মধ্যে মধ্যে এসে বিবক্ত কবব, হিসেব সম্বন্ধে পবামর্শ নেব—

তিনকড়ি। বিলক্ষণ, বিবক্ত হব কেন। আমি সমস্ত হিসেব ঠিক ক'বে দেব। মিটিংগুলো একটু ঘন ঘন কববেন। না হয় ডিরেক্টর্‌স্ ফী বাবদ কিছু বেশী খরচ হবে। দেখুন, অডিটাব ফডিটাব আমি বুঝি না। আবে বাপু, নিজেব জমাখবচ যদি নিজে না বুঝলি তবে বাইবেব একটা অবচীন ছোকরা এসে তার কি বুঝবে? ভারী আজকাল সব বুক-কিপিং শিখেছেন। সে কি জানেন—একটা গোলকধাঁধা, কেউ যাতে না বোঝে তাবই চেষ্টা। আমি বুঝি—বোজ কত টাকা এল, কত খবচ হ'ল, আর আমাব মজুদ বইল কত। আমি যখন আমড়াগাছি সবডিভিজনেব ট্রেজাবিব চার্জে, তখন এক নতুন কলেজ-পাস গোঁফকামানো ডেপুটি এলেন আমার কাছে কাজ শিখতে। সে ছোকবা কিছুই বোঝে না, অথচ অহংকারে ভরা। আমার কাজে গলদ ধববার আস্পর্ধা। শেষে লিখলুম কোল্ডহাম সাহেবকে, যে হুজুর, তোমরা রাজার জাত, দু-ঘা দাঁও তাও সহ্য হয়, কিন্তু দিশী ব্যাঙাচিব লাথি বরদাস্ত কবব না। তখন সাহেব নিজে এসে সমস্ত বুঝে নিয়ে আড়ালে ছোকবাকে ধমকালেন। আমাকে পিঠ চাপড়ে হেসে বললেন—ওয়েল তিনকড়িবাবু, তুমি হ'লে কতকালেব সিনিযব অফিসর, একজন ইয়ং চ্যাপ তোমার কদব কি বুঝবে? তার পর দিলেন আমাকে নওগাঁয়ে গাঁজা-গোলার চার্জে বদলি ক'রে। যাক সে কথা। দেখুন, আমি বড় কড়া লোক। জবরদস্ত হাকিম ব'লে আমার নাম ছিল। মন্দির টন্দিব আমি বুঝি না, কিন্তু একটা আধলাও কেউ আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। রক্ত জল কবা টাকা আপনাব জিম্মায় দিচ্ছি, দেখবেন যেন—

শ্যাম। সে কি কথা! আপনাব টাকা আপনারই থাকবে আর শতগুণ বাড়বে। এই দেখুন না—আমি আমার যথাসর্বস্ব পৈতৃক পঞ্চাশ হাজাব টাকা এতে ফেলেছি। আমি না হয় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, অর্থে প্রয়োজন নেই, লাভ যা হবে মায়ের সেবাতেই ব্যয় করব। বিপিন আর এই অটল ভায়াও প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার ফেলছেন। গণ্ডেরি এক লাখ টাকার শেয়ার নিয়েছে। সে মহা হিসেবী লোক—লাভ নিশ্চিত না জানলে কি নিত?

তিনকড়ি। বটে, বটে? শুনে আশ্বাস হচ্ছে। আচ্ছা, একবার কোল্ডহাম সাহেবকে কনসর্ন্ট করলে হয় না? অমন সাহেব আর হয় না।

'ঠাঁই হয়েছে'—চাকর আসিয়া খবর দিল।

'উঠতে আজ্ঞা হ'ক ব্রহ্মচারী মশায়, আসুন অটলবাবু, চল হে বিপিন।' তিনকড়িবাবু সকলকে

অন্দরের বারান্দায় আনিলেন। ³

শ্যামবাবু বলিলেন—'করেছেন কি রায়সাহেব, এ যে রাজসূয় যজ্ঞ। কই আপনি বসলেন না?'

তিনকড়ি। বাতে ভুগছি, ভাত খাইনে, দু-খানা সুজির রুটি বরাদ্দ।

শ্যাম। আমি একটি ফেৎকারিণী-তন্ত্রোক্ত কবচ পাঠিয়ে দেব, ধারণ ক'রে দেখবেন। শাক-ভাজা, কড়াইয়ের ডাল—এটা কি দিয়েছ ঠাকুর, এঁচোড়ের ঘন্ট? বেশ, বেশ? শোধন করে নিতে হবে। সুপক্ক কদলী আর গব্যঘৃত বাড়িতে হবে কি? আয়ুর্বেদে আছে—পনসে কদলং কদলে ঘৃতম্। কদলীভক্ষণে পনসের দোষ নষ্ট হয়, আবার ঘৃতের দ্বারা কদলীর শৈত্যগুণ দূর হয়। পুঁটিমাছ ভাজা—বাঃ। রোহিতাদপি রোচকাঃ পুণ্টিকাঃ সদ্যভর্জিতাঃ। ওটা কিসের অম্বল বললে—কামরাঙা? সর্বনাশ, তুলে নিয়ে যাও। গত বৎসর শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে ঐ ফলটি জগন্নাথ প্রভুকে দান করেছি। অম্বল জিনিসটা আমারও সয়ও না—শ্লেষ্মার ধাত কি না। উস্‌প্, উস্‌প্, উস্‌প্। প্রাণায় অপানায় সোপানায় স্বাহা। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ ভোজনে তু জনার্দনম্। আরম্ভ কর হে অটল।

অটল। (জনান্তিকে) আরম্ভের ব্যবস্থা যা দেখছি তাতে বাড়ি গিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হবে।

তিনকড়ি। আচ্ছা ঠাকুরমশায়, আপনাদের তন্ত্রশাস্ত্রে এমন কোন প্রক্রিয়া নেই যার দ্বারা লোকের—ইয়ে—মানমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে?

শ্যাম। অবশ্য আছে। যথা কুলার্ণবে—অমানিনা মানদেন। অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হ'লে অমানী ব্যক্তিকেও মান দেন। কেন বলুন তো?

তিনকড়ি। হাঃ হাঃ, সে একটা তুচ্ছ কথা। কি জানেন, কোল্ডহাম সাহেব বলেছিলেন, সুবিধা পেলেই লাট সাহেবকে ধ'রে আমায় বড় খেতাব দেওয়াবেন। বার বার তো রিমাইণ্ড করা ভাল দেখায় না তাই ভাবছিলুম যদি তন্ত্রে-মন্ত্রে কিছু হয়। মানিনে যদিও, তবুও—

শ্যাম। মানতেই হবে। শাস্ত্র মিথ্যা হতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ বিষয়ে আমার সমস্ত সাধনা নিয়োজিত ক'রব। তবে সদ্‌গুরু প্রয়োজন, দীক্ষা ভিন্ন এসব কাজ হয় না। গুরুও আবার যে-সে হ'লে চলবে না। খরচ—তা আমি যথা সম্ভব অল্পেই নির্বাহ করতে পারব।

তিনকড়ি। হুঁ। দেখা যাবে এখন। আচ্ছা, আপনাদের আপিসে তো বিস্তর লোকজন দরকার হবে, তা—আমার একটি শালীপো আছে, তার একটা হিল্লে লাগিয়ে দিতে পারেন না? বেকার ব'সে ব'সে আমার অন্ন ধ্বংস করছে, লেখাপড়া শিখলে না, কুসঙ্গে মিশে বিগড়ে গেছে। একটা চাকরি জুটলে বড় ভাল হয়। ছোকরা বেশ চটপটে আর স্বভাব-চরিত্রও বড় ভাল।

শ্যাম। আপনার শালীপো? কিছু বলতে হবে না। আমি তাকে মন্দিরের হেড-পাণ্ডা ক'রে দেব। এখনি গোটা-পনর দরখাস্ত এসেছে—তার মধ্যে পাঁচজন গ্র্যাজুয়েট। তা আপনার আত্মীয়ের ক্লেম সবার ওপর।

তিনকড়ি। আর একটি অনুরোধ। আমার বাড়িতে একটি পুরনো কাঁসর আছে—একটু ফেটে গেছে, কিন্তু আদত খাঁটী কাঁসা। এ জিনিসটা মন্দিরের কাজে লাগানো যায় না? সস্তায় দেব।

শ্যাম। নিশ্চয়ই নেব। ওসব সেকেলে জিনিস কি এখন সহজে মেলে?

* * *

গণ্ডেরির ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের জোরে এবং প্রতিষ্ঠাতৃগণের চেষ্টায় সমস্ত শেয়ারই বিলি হইয়া গিয়াছে। লোকে শেয়ার লইবার জন্য অস্থির, বাজারে চড়া দামে বেচা-কেনা হইতেছে।

অটলবাবু বলিলেন—'আর কেন শ্যাম-দা, এইবার নিজের শেয়ার সব ঝেড়ে দেওয়া যাক। গণ্ডেরি তো খুব একচোট মারলে। আজকে ডবল দর। দু-দিন পরে কেউ ছোঁবেও না।'

শ্যাম। বেচতে হয় বেচ, মোদ্দা কিছু তো হাতে রাখতেই হবে, নইলে ডিরেক্টর হবে কি ক'রে?

অটল। ডিরেক্টরি আপনি করুন গে। আমি আর হাঙ্গামায় থাকতে চাইনে। সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় আপনার তো কার্যসিদ্ধি হয়েছে।

শ্যাম। এই তো সবে আরম্ভ। মন্দির, ঘরদোর, হাট-বাজার সবই তো বাকী। তোমাকে কি এখন ছাড়া যায়?

অটল। থেকে আমার লাভ? পেটে খেলে পিটে সয়। এখন তো ব্রাদার-ইন-ল কোম্পানির মরসুম চলল। আমাদের এইখানে শেষ।

শ্যাম আরে ব্যস্ত হও কেন, এক যাত্রায় কি পৃথক্ ফল হয়? সন্ধ্যেবেলা যাব এখন তোমাদের বাড়িতে,—গণ্ডেরিকেও নিয়ে যাব।

* * *

দেড় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী অ্যাণ্ড ব্রাদার-ইন-ল কোম্পানির আপিসে ডিরেক্টরগণের সভা বসিয়াছে। সভাপতি তিনকড়িবাবু টেবিলে ঘুষি মারিয়া বলিতেছিলেন—'আ—আ—আমি জানতে চাই, টাকা সব গেল কোথা। আমার তো বাড়িতেই টেকা ভার,—সবাই এসে তাড়া দিচ্ছে। কয়লাওয়ালা বলে তার পঁচিশ হাজার টাকা পাওনা, ইটখোলার ঠিকাদার বলে বারো হাজার, তার পর ছাপাখানাওলা, শার্পার কোম্পানি, কুণ্ডুমুখুজ্যে, আরও কত কে আছে। বলে আদালতে যাব। মন্দিরের কোথা কি তার ঠিক নেই—এর মধ্যে দু-লাখ টাকা ফুঁকে গেল? সে ভণ্ড জোচ্চোরটা গেল কোথা? শুনতে পাই ডুব মেরে আছে, আপিসে বড়—একটা আসে না।'

অটল। ব্রহ্মচারী বলেন, মা তাঁকে অন্য কাজে ডাকছেন—এদিকে আর তেমন মন নেই। আজ তো মিটিংএ আসবেন বলেছেন।

বিপিন বলিলেন—'ব্যস্ত হচ্ছেন কেন সার, এই তো ফর্দ রয়েছে, দেখুন না—জমি-কেনা, শেয়ারের দালালি, preliminary expense, ইট-তৈরি, establishment, বিজ্ঞাপন, আপিসখরচ—'

তিনকড়ি। চোপ রও ছোকরা। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।

এমন সময় শ্যামবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—'ব্যাপার কি?'

তিনকড়ি। ব্যাপার আমার মাথা। আমি হিসেব চাই।

শ্যাম। বেশ তো, দেখুন না হিসেব। বরঞ্চ একদিন গোবিন্দপুরে নিজে গিয়ে কাজকর্ম তদারক ক'রে আসুন।

তিনকড়ি। হ্যাঁ, আমি এই বাতের শরীর নিয়ে তোমার ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুরে গিয়ে মরি আর কি। সে হবে না—আমার টাকা ফেরত দাও। কোম্পানি তো যেতে বসেছে। শেয়ারহোল্ডাররা মার-মার কাট-কাট করছে।

শ্যামবাবু কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিলেন—'সকলই জগন্মাতার ইচ্ছা। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। এতদিন তো মন্দির শেষ হওয়ারই কথা। কতকগুলো অজ্ঞাতপূর্ব কারণে খরচ বেশী হয়ে গিয়ে টাকার অনাটন হয়ে পড়ল, তাতে আমাদের আর অপরাধ কি? কিন্তু চিন্তার কোনও কারণ নেই, ক্রমশ সব ঠিক হয়ে যাবে। আর একটা call-এর টাকা তুললেই সমস্ত দেনা শোধ হয়ে যাবে, কাজও এগোবে।'

গণ্ডেরি বলিলেন—'আউর টাকা কোই দিবে না, অপকো থোড়াই বিশোআস করবে।'

শ্যাম। বিশ্বাস না করে নাচার। আমি দায়মুক্ত, মা যেমন ক'রে পারেন নিজের কাজ চালিয়ে নিন। আমাকে বাবা বিশ্বনাথ কাশীতে টানছেন, সেখানেই আশ্রয় নেব।

তিনকড়ি। তবে বলতে চাও, কোম্পানি ডুবল?

গণ্ডেরি। বিশ হাঁথ পানি।

শ্যাম। আচ্ছা তিনকড়ি বাবু, আমাদের ওপর যখন লোকের এতই অবিশ্বাস, বেশ তো, আমরা না-হয় ম্যানেজিং এজেন্সি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার নাম আছে সম্ভ্রম আছে, লোকেও শ্রদ্ধা করে, আপনিই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে কোম্পানি চালান না?

অটল। এইবার পাকা কথা বলেছেন।

তিনকড়ি। হ্যাঁঃ আমি বদনামের বোঝা ঘাড়ে নিই, আর ঘরের খেয়ে বুনো মোষ তাড়াই।

শ্যাম। বেগার খাটবেন কেন? আমিই এই মিটিংএ প্রস্তাব করছি যে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ব্যানার্জি মহাশয়কে মাসিক ১০০০ পারিশ্রমিক দিয়ে কোম্পানি চালাবার ভার অর্পণ করা হোক। এমন উপযুক্ত কর্মদক্ষ লোক আর কোথা? আর, আমরা যদি ভুলচুক করেই থাকি, তার দায়ী তো আর আপনি হবেন না।

তিনকড়ি। তা—তা—আমি চট্ ক'রে কথা দিতে পারিনে। ভেবেচিন্তে দেব।

অটল। আর দ্বিধা করবেন না রায়সাহেব। আপনিই এখন ভরসা।

শ্যাম। যদি অভয় দেন তো আর একটি নিবেদন করি। আমি বেশ বুঝেছি, অর্থ হচ্ছে সাধনের অন্তরায়। আমার সমস্ত সম্পত্তিই বিলিয়ে দিয়েছি, কেবল এই কোম্পানির ষোল-শ খানেক শেয়ার আমার হাতে আছে। তাও সৎপাত্রে অর্পণ করতে চাই। আপনিই সেটা নিয়ে নিন। প্রিমিয়ম চাই না আপনি কেনা দাম ৩২০০ মাত্র দিন।

তিনকড়ি। হ্যাঁঃ, ভাল ক'রে আমার ঘাড় ভাঙবার মতলব।

শ্যাম। ছি ছি। আপনার ভালই হবে। না হয় কিছু কম দিন,—চব্বিশ-শ—দু-হাজার—হাজার—

তিনকড়ি। এক কড়াও নয়।

শ্যাম। দেখুন, ব্রাহ্মণ হ'তে ব্রাহ্মণের দান-প্রতিগ্রহ নিষেধ, নইলে আপনার মত লোককে আমার অমনিই দেবার কথা। আপনি যৎকিঞ্চিৎ মূল্য ধ'রে দিন। ধরুন—পাঁচ-শ টাকা। ট্রান্স্ফার ফর্ম আমার প্রস্তুতই আছে—নিয়ে এস তো বিপিন।

তিনকড়ি। আমি এ—এ—আশি টাকা দিতে পারি।

শ্যাম। তথাস্তু। বড়ই লোকসান হ'ল, কিন্তু সকলই মায়ের ইচ্ছা।

গণ্ডেরি। বাহবা তিনকৌড়িবাবু, বহুত কিফায়ত হুয়া!

তিনকড়িবাবু পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া সদ্যঃপ্রাপ্ত পেনশনের টাকা হইতে আটখানা আনকোরা দশ টাকার নোট সন্তর্পণে গনিয়া দিলেন। শ্যামবাবু পকেটস্থ করিয়া বলিলেন—'তবে এখন আমি আসি। বাড়িতে সত্যনারায়ণের পূজা আছে। আপনিই কোম্পানির ভার নিলেন এই কথা স্থির। শুভমস্তু—মা-দশভুজা আপনার মঙ্গল করুন।'

শ্যামবাবু প্রস্থান করিলে তিনকড়িবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'লোকটা দোষে গুণে মানুষ। এদিকে যদিও হাম্‌বগ, কিন্তু মেজাজটা দিলদরিয়া। কোম্পানির ঝক্কিটা তো এখন আমার ঘাড়ে পড়ল। ক-মাস বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলুম, কিছুই দেখতে পারি নি, নইলে কি কোম্পানির অবস্থা এমন হয়? যা হোক, উঠে-প'ড়ে লাগতে হ'ল—আমি লেফাফা-দুরস্ত কাজ চাই, আমার কাছে কারও চালাকি চলবে না।'

গণ্ডেরি। অপ্‌নের কুছু তকলিফ করতে হোবে না। কম্পানি তো ডুব গিয়া। অপ্‌কোভি ছুট্টি।

তিনকড়ি। তা হ'লে কি বলতে চাও আমার মাসহারাটা—

গণ্ডেরি। হাঃ, হাঃ, তুম্‌ভি রুপয়া লেওগে? কাঁহাসে মিলবে বাতলাও। তিনকৌড়িবাবু, শ্যামবাবুকা কার্‌রবাই নহি সমঝা? নব্বে হাজার রুপয়া কম্প্‌নিকা দেনা। দো রোজ বাদ লিকুইডেশন। লিকুইডেটের সিকিগু কল আদায় করবে, তব্ দেনা শুধবে।

তিনকড়ি। অ্যাঁ, বল কি? আমি আর এক পয়সাও দিচ্ছি না।

গণ্ডেরি। আলবত দিবেন। গবরমিন্ট কান পকড়্‌কে আদায় করবে। আইন এইসি হ্যায়।

তিনকড়ি। আরও টাকা যাবে। সে কত?

অটল। আপনার একলার নয়। প্রত্যেক অংশীদারকেই শেয়ারপিছু ফের দু-টাকা দিতে হবে। আপনার পূর্বের ২০০ শেয়ার ছিল, আর শ্যাম-দার ১৬০০ আজ নিয়েছেন। এই ১৮০০ শেয়ারের ওপর আপনাকে ছত্রিশ শ টাকা দিতে হবে। দেনা শোধ, লিকুইডেশনের খরচা—সমস্ত চুকে গেলে শেষে সামান্য কিছু ফেরত পেতে পারেন।

তিনকড়ি। তোমাদের কত গেল?

গণ্ডেরি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—'কুছ্‌ভি নহি, কুছ্‌ভি নহি! আরে হামাদের ঝড়তি-পড়তি শেয়ার তো সব শ্যামবাবু লিয়েছিল—আজ আপ্‌নেকে বিক্‌কিরি কিয়েছে।'

তিনকড়ি। চোর—চোর—চোর! আমি এখনি বিলেতে কোল্ডহাম সাহেবকে চিঠি লিখছি—

অটল। তবে আমরা এখন উঠি। আমাদের তো আব শেয়াব নেই, কাজেই আমরা এখন ডিরেক্টর নই। আপনি কাজ করুন। চল গণ্ডেরি।

তিনকড়ি। অ্যাঁ—

গণ্ডেরি। রাম রাম!

গড্ডলিকা

সারদা মাতাল

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

সারদা মাতাল আমার বাল্যবন্ধু।

শুধু বাল্যবন্ধুই নয়, আমবা উভয়ে এক গ্রামেব অধিবাসী। ই. আই. বেলেব উত্তবগামী লুপ লাইন যে স্থলে অজয় নদ অতিক্রম কবতে উদ্যত হয়েছে, তার অব্যবহিত পূর্বদিকে নদীব উপকূলে আজকাল যে পাঁচ-সাত ঘব ভগ্ন ও অর্ধভগ্ন কোঠা বাড়ির সমষ্টিরূপে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম দেখা যায়, তথায় সুদূর অতীতকালে আমাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত।

গ্রাম নগণ্য। যে সময়ের কথা বলছি তখন সেখানে, স্কুল ত দূবের কথা, একটা চলনসই পাঠশালা পর্যন্ত ছিল না। আমাদের পাঠগ্রহণ চলত গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় অভিভাবকদের নিকট যৎ-সামান্যর তালে; এবং গৃহের বাইরে সারাদিন অজয়ের তীরে তীরে বনে-জঙ্গলে প্রকৃতিব পাঠশালায় আড়াঠেকার বেয়াড়া ছন্দে। এরূপ শিক্ষাব দ্বারা মানুষ হওয়া যায় যতটা, পুরুষ মানুষ ততটা হওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের বংশের ও গ্রামের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সাবদা এবং আমি বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্যে অল্প বয়সেই বর্ধমান শহরের একটি গৃহে বাসা বাঁধলাম।

বাসা আমাদের জন্য নতুন ক'রে বাঁধতে হয় নি। বহুদিন থেকে এই বাসাটি আমাদের এবং আমাদের আশপাশের দু-তিনখানা গ্রামের অধিবাসীদের জন্য বাঁধা আছে। স্কুল-কলেজের ছাত্র থেকে আরম্ভ ক'রে আপিসের কেরানী, মামলা-মকদ্দমাকারীর দল, বিবাহ-উপনয়নের বাজারকর্তা পর্যন্ত যার যখন এবং যেমন প্রয়োজন এ বাসায় এসে আশ্রয় নেয়; তারপর প্রয়োজন শেষ হ'লে প্রস্থান করে। এন্ট্রান্স পাস ক'রে ফার্স্ট আর্টস পড়তে পড়তে একদিন সারদার এ বাসার প্রয়োজন শেষ

হ'ল। এক সঙ্গে রেলকর্মচারী-দুহিতা আর রেলের চাকরি লাভ ক'রে বাসা ছেড়ে সে চ'লে গেল।

২

বছর পনের পরের কথা। আমি তখন পাটনার দেওয়ানি আদালতে ওকালতি করি। বছর দশেকে পসার একরকম জমিয়ে নিয়েছি।

কোর্ট থেকে ফিরে মুখ হাত ধুয়ে সবে মাত্র জলযোগে বসেছি, এমন সময়ে বাইরে ডাকাত-পড়া-পড়ি চিৎকার, "কিষ্টো। কিষ্টো! কিষ্টোরাম আছিস না-কি রে?"

চকিত হ'য়ে উঠলাম। 'কিষ্টোরাম আছিস না-কি রে' ব'লে পাটনা শহরে আমাকে কে ডাকে! মক্কেলবা কিষণরামবাবু ব'লে ডাকে, বাঙালীরা ডাকে কৃষ্ণরামবাবু, বড় জোর কেষ্টোরামবাবু ব'লে। কিষ্টোরাম ত মথুবার ডাক নয়, এ যে একেবারে ব্রজের ডাক! কণ্ঠস্বরও যেন পরিচিত মনে হচ্ছে, কিন্তু ঠাহর কবতে পারছি নে ঠিক। 'যাই' ব'লে উচ্চৈঃস্বরে সাড়া দিয়ে খাদ্যদ্রব্য অভুক্ত রেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।

গৃহিণী ছিলেন কাছেই; ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন, "ও কি? উঠছ কেন? অসময়ে কে এসে হাজির হ'ল, কতক্ষণ জ্বালাবে, খেয়ে তারপর যেযো।"

বললাম, "ক্ষেপেছ! কোন্ এক ব্রজের বালক এসে ডাক দিয়েছে, কিষ্টোরাম কখনো নিশ্চিন্ত হ'য়ে খেতে পাবে?"

মুচকি হেসে গৃহিণী বললেন, "নামটা তা হ'লে পছন্দ হয়েছে দেখছি!"

"খুব বেশি রকম পছন্দ হয়েছে।" ব'লে দ্রুতপদে প্রস্থান কবলাম।

বাইবে এসে দেখি. সারদা। তার আকৃতি দেখে বিস্মিত হলাম। ছেলেবেলায় সারদা ছিল কৃশ ও দীর্ঘ। পবিহাস ক'বে আমবা ছেলেবেলায় তাকে GL. অর্থাৎ Geometncal Line বলতাম। সেই অতিদীর্ঘতায় কেমন ক'বে, কোথা থেকে একরাশ মাংসের আমদানি হ'য়ে এখন সে হ'য়ে উঠেছে দশাসই। নিকষকৃষ্ণ দেহেব শীর্ষদেশে ভ্রমরকৃষ্ণ হাফ বাববি চুল। পান খেয়েছে বোধকরি একসঙ্গে তিন-চাব খিলি, মুখের দুই কশ বেয়ে পিকের দরানি নেমেছে লাল বঙেব।

হিসাবমতো সারদাকে না চিনতে পারাই উচিত ছিল, যদি না তার অদ্ভুত উজ্জ্বল জ্বলজ্বলে চোখ জোড়া তাকে সনাক্ত করিযে দিত।

সবিস্ময়ে বললাম, "এ কি, হঠাৎ সাবদা কোথা থেকে বে!"

অট্টহাস্য ক'বে উঠে সাবদা বললে, "অবাক হচ্ছিস বটে? জামালপুর থেকে এক লাফ মেরে তোর মাথা ডিঙিযে একেবারে দানাপুবে এসে বসেছি।"

"বদলি হ'যে এসেছিস?"

কুঞ্চিত চক্ষে স্মিত মুখে সারদা মাথা নাড়লে।

"তা এতদিন আসিস নি কেন?"

নিমেষের মধ্যে সাবদাব কুঞ্চিত চক্ষু গোল-গোল হ'য়ে উঠল, "ওই! কেমন বেকুবেব মতো কথা বলে দেখ!" ডান হাতের পঞ্চাঙ্গুলি আমার দিকে স্থাপিত ক'রে বললে, "পাঁচ দিন সবে এসেছি। তার মধ্যে চার দিন গেল সংসার পাততে; পাঁচমা দিনে আপিস কামাই ক'রে তোর কাছে হাজির হযেছি;—আর বলছিস কি-না এতদিন আসিস নি কেন?"

বললাম, "তা হ'লে ঠিক আছে। ব'স্ সারদা, ব'স্।"

দুখানা চেয়ার নিয়ে দুজনে মুখোমুখি উপবেশন কবলাম।

সারদা বললে, "পাটনায় এসে তুই কিন্তু একদম গোরু ব'নে গেছিস কিষ্টোবাম।"

হাসিমুখে বললাম, "কেন রে? আমাকে গোরু খোঁজা কবতে হয়েছিল না-কি?"

সারদা ফুঁসিয়ে উঠল, "উওহ্! সে কথা আর বলিস কেন? যাকে তোর ঠিকানা শুধাই সে-ই মাথা নাড়ে, বলে—জানি নে। শেষকালে বুদ্ধি ক'রে আদালতে গিয়ে বার লাইব্রেরিব কেরানীর কাছ থেকে তোর ঠিকানা নিই। তারপর খুশি হ'য়ে আত্মারামকে সওয়া তেরো আনার সিন্নি চড়িয়ে তোর কাছে হাজির হয়েছি।" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

বললাম, "তা বুঝেছি আত্মারামের মুখ থেকে এখনো সিন্নির গন্ধ ছাড়ছে।"

সারদার মুখে নিঃশব্দ হাস্য উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল; বললে, "খোসবায় পাচ্ছিস না-কি? তবুও তোর ভয়ে একরাশ জর্দা দিয়ে খিলি চারেক পান চিবুতে চিবুতে এসেছি। কিন্তু শাক দিয়ে কি মাছেব গন্ধ ঢাকা চলে রে ভাই? বদ্‌বু ছাপিয়ে খুসবু বেরোবেই।" ব'লে পুনরায় উচ্চ হাস্য ক'রে উঠল।

বললাম, "মদ ধরলি কবে?"

বিস্ময়ে সারদার চক্ষু কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল; বললে, "এই দেখো আহাম্মুকের মতো কথা বলে! ছাড়বার সময় হ'ল, আর বলে কি না—মদ ধরলি কবে? তুই ধরেছিস?"

অনুশোচনার আর্তকণ্ঠে বললাম, "না ভাই, এ পর্যন্ত ধ'বে উঠতে পাবি নি। আমাদের পযসায় ধানের ব্যবস্থা উচিত মতো হ'তে পারে না, তা আবার ধান্যেশ্বরী! তোব মতো তো আর বেলেব কাঁচা পয়সা নয়!"

সন্তোষসূচক ঘাড় নেড়ে সারদা বললে, "সে কথা মিছে বলিস নি। মালবাবু হ'য়ে কাঁটাব পাশে বসতে পারলে দিনান্তে দশ টাকা গালাগাল কিষ্টোরাম, গালাগাল! মাস কাবাবে মাইনেটা ঠেকে উপরির মতো।" ব'লে হা-হা ক'রে হাসতে লাগল।

সারাদিন আদালতে চেঁচামেচি ক'রে ক্ষুধার্ত হ'যে বাড়ি ফিরে খেতে বসব, এমন সময়ে অকস্মাৎ সারদার আবির্ভাব। পেটের মধ্যে দুর্বিনীত ক্ষুধা অসম্ভব রকম দাপাদাপি লাগিযেছে। এর একমাত্র প্রতিকার সারদাকে সরিক ক'রে কিছু খেয়ে নেওয়া। বললাম, "সাবদা, কি খাবি বল্?"

সারদা বললে, "চাট।"

বিস্মিত হ'য়ে বললাম, "চাট? চাট আবার একটা খাবার না-কি?"

সারদা বললে, "এ অবস্থায় ওর চেয়ে ভাল খাবার আব নেই রে ভাই কিষ্টো। ঘোড়া খায় চানা, আর মাতাল খায় চানাচুর।" তারপর কতকটা সুব সংযোগে আবৃত্তি লাগালে,—

"চানাচুর ঘুগনিদানা
নেই তো ঘরে কিনে আনা!
দু-চার আনার কিনে আনা।"

বুঝলাম সারদার নেশার বাতাস লেগেছে, খালি পেটে থাকলে হু-হু ক'রে বেড়ে উঠবে। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে দুজনের জায়গা করালাম। সারদার পাতে চাট থেকে চাটনি কিছুরই অভাব দেখা গেল না। ডজন তিনেক লুচি এবং তদনুযায়ী আনুষঙ্গিকের সদ্ব্যবহার ক'রে বৈঠকখানায় ফিরে এসে চুরুট ধরালে; তারপর একটা বিকট আয়তনের ঢেঁকুর তুলে লাঠি বাগিয়ে ধ'রে ওঠবার উপক্রম করলে।

বললাম, "ওঠবার মতলব না-কি?"

সারদা বললে, "হ্যাঁ ভাই। এক্কাওয়ালার সঙ্গে কড়ার আছে, রাত নটার মধ্যে দানাপুরে ফিরতে হবে।"

বিস্মিত হ'য়ে বললাম, "বরাবর এক্কা আছে না-কি সঙ্গে?"

"আছে বইকি। ঐ এক্কাওয়ালাই ত তোর বাসা খুঁজে বার করলে।"

"এখন বরাবর বাসায় ফিরবি ত?"

মাথা নেড়ে সারদা বললে, "বরাবর বাসাতেই ফিরব, তবে এক জায়গায় মিনিট দশেক বিলম্ব হবে। সওয়া তেরো আনার আর এক দফা সিন্নি চড়িয়ে নোব।"

"কেন, আত্মারাম এখনো ঠাণ্ডা হন নি না-কি?"

হেসে উঠে সারদা বললে, "বেকুবের মতো কথা শোন। আরে, আত্মারাম ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে ব'লেই ত আর এক দফা সিন্নি চড়িয়ে গরম ক'রে নিতে হবে। তবে না পুরো মৌজে বাসায় পৌঁছে আমার এই লাঠিতে আর কাদুব ঝাঁটায় লড়াই চলবে!"

"কাদু কে?"

"কাদু আমার স্ত্রী বটে। পুরো নাম কাদম্বিনী।"

বিস্মিত হ'য়ে বললাম, "তোর স্ত্রী তোর সঙ্গে ঝাঁটা নিয়ে লড়াই করে?"

উচ্ছ্বসিত হ'যে উঠল সারদা, "করবে না?—আলবাৎ করবে। মাল টেনে বাড়ি ঢুকে আমি তার চোদ্দ পুরুষকে উদ্ধার করব, আর সে ছেড়ে কথা কইবে?"

"তবে আবাব লাঠি নিয়ে লড়াই বাধাস কেন?"

সাবদাব মুখে নিঃশব্দ হাস্য ফুটে উঠল। "ওটা বুঝলি নে? লাঠি দিয়ে ভয় দেখাই, আর ঝাঁটা থেকে দেহ বক্ষে করি। তবে মৌকা মাফিক এক-আধ ঘা বসিয়েও যে দেই নি তা নয়।" তারপব জিভ কেটে মাথা নেড়ে বললে, "কিন্তু তাই ব'লে জোবে নয়, আস্তে। আঁটকুড়ীর বেটীকে ভালও বাসি কিষ্টোবাম।" হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর গদ্গদ হ'য়ে এল।

বললাম, "তুই আমাকে কথায় কথায় বেকুব বলছিস, তুইও ত কম বেকুব নোস।"

ভ্রূভঙ্গভরে সারদা বললে, "ক্যানে?"

"তোর বউ আঁটকুড়ীর বেটী কেমন ক'রে হবে?"

সদর্পে আমার প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত ক'রে সাবদা বললে, "ক্যানে, ওর যে একটিও সন্তান হয নি।"

"কিন্তু সে কারণে তোব শাশুড়ীকে আঁটকুড়ী বলছিস কেমন করে?"

সারদাব মুখে-চক্ষে বিস্ময়ের পবিসীমা বইল না; তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, "এই দেখ্, বেকুবের মতো শাশুড়ীকে এব মধ্যে টেনে আনে! আমি কি এ পাপমুখে শাশুড়ীব নাম একবাবও করেছি?"

স্ত্রী আঁটকুড়ীব বেটী হ'লে শাশুড়ীর আঁটকুড়ী না হ'য়ে উপায় নেই, এই অতি-স্থূল যুক্তিটি উপস্থিত যে-ক'বেই হোক সারদাব মস্তিষ্ক থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে; সুতরাং প্রসঙ্গ পরিবর্তিত ক'বে বললাম, "তোব বউয়েব আদৌ সন্তান হয নি না-কি সারদা?"

নিমেষের মধ্যে সারদাব কঠোর মূর্তি মোলায়েম হ'য়ে গেল; সন্তোষস্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, "আদৌ হয় নি কিষ্টো। আব কোনো গুণ না থাকুক, শালীর ঐ গুণটি আছে, আমাকে ঝরঝরে রেখেছে, ঝামেলায় ফেলে নি।" ব'লে হুড় হুড় ক'রে চেয়ার সরিয়ে উঠে পড়ল।

স্ত্রীকে শালী ব'লে উল্লেখ করলে খানিকটা অসঙ্গতিব দোষ হয়, সারদার মস্তিষ্কের বর্তমান অবস্থায় সে কথা উত্থাপন করতে সাহস করলাম না। 'শালীর বোন শালী না হ'য়ে শালা হবে না-কি' ব'লে হয়ত আমাকেই বেকুব বানিয়ে বসত।

রাজপথ পর্যন্ত সারদাকে এগিয়ে দিয়ে এলাম। সারদার এক্কা পথের ওপারে খোলা মাঠে অপেক্ষা করছিল।

৩

এর পর ছুটি-ছাটার দিনে সারদা মাঝে মাঝে আসতে লাগল। আমিও একদিন তার বাসায় গিয়ে বেড়িয়ে এলাম।

তখনকার দিনে বন্ধুপত্নীরা সাধারণত পর্দানশীনই ছিল। দ্বারান্তরাল থেকে দেহের, অথবা অবগুণ্ঠনের তলা থেকে মুখের, যেটুকু পরিচয় পাওয়া যেত, তারই উপর তাদের বিষয়ে ধারণা গ'ড়ে তুলতে হ'ত। সেই রকম ধারণার সাহায্যে সারদার স্ত্রী কাদম্বিনীকে দেখে আমার আকাশের কাদম্বিনীর মতোই মনে হয়েছিল; শুধু দেহের রঙের শ্যামলতাতেই নয়, অবগুণ্ঠনপ্রান্তবর্তী ওষ্ঠাধরের ক্বচিৎ মৃদু স্ফুরণেও।

এরূপ স্ত্রীর উপর সারদার কতটা নেশা ছিল ঠিক বলতে পারি নে; কিন্তু মদ ছাড়া তার আর এক প্রবল নেশা ছিল দাবাখেলার। দাবাখেলায় সে ছিল নিপুণ খেলোয়াড়; বিশেষত বোড়ের খেলা সে এমন সাংঘাতিক ভাবে খেলতে পারত যে, তার বোড়ের সম্মুখেব কোণাকুণি দুটো ঘরে এসে প্রাণ হারাবার আশঙ্কায় প্রতিপক্ষের হাতী ঘোড়া বলগুলো সর্বদা সিঁটিয়ে থাকত। সে বলত, রাজাকে মাৎ করবার সর্বোত্তম মাৎ হচ্ছে বোড়ের চালে মাৎ।

দেখতে দেখতে দাবাখেলা জ'মে উঠল। প্রথমে সাবদা আমাকে নিয়েই খেলতে বসত; তারপর একে একে অনেক খেলোযাড় জুটতে লাগল। ছুটির দিনগুলো সারদা সাধ্যমতো বাদ দিত না। প্রথম দিকে খেলাটা আমার বৈঠকখানার পাশের ঘরেই বসত, কিন্তু ক্রমশ সারদার দাবাখেলার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে, দিকে দিকে তার ডাক পড়তে লাগল।

বৎসর দুই এই ভাবে চলার পর একদিন সারদা তার অফিসে এক অভাবনীয় কাণ্ড ক'রে বসল। পূর্বরাত্রে টানটা বোধ হয় একটু অতিরিক্ত মাত্রায় বেশি হ'য়ে গিয়েছিল, সে যখন অফিস যেতে উদ্যত হ'ল তখনও সম্পূর্ণভাবে খোঁয়াড়ি ভাঙে নি,—শরীর ম্যাজম্যাজ করছে, মন অবসন্ন, শুযে পড়বার জন্য শয্যা অসম্ভব রকম আকর্ষণ কবছে। এ অবস্থায় কাদম্বিনী অফিস কামাই করবাব পরামর্শ দিলে। পরামর্শটা বোধহয় সুপরামর্শই ছিল, কিন্তু অফিসে সেদিন জরুরি কাজ আছে, কামাই করা সারদা সমীচীন মনে করলে না। খোঁয়াড়ি ভাঙবার জন্য সে নূতন ক'রে আর একটু মদ খেয়ে নিলে কাদম্বিনীকে বললে, "কোনো চিন্তা নেই কাদু, ঘন্টা দুইয়ের মধ্যে ধাতস্থ হ'য়ে যাব।"

কিন্তু ঘন্টা দুয়েকের অনেক পূর্বেই সঙ্কট দেখা দিলে। যে জরুরি কাজের জন্য অফিস যাওযা, 'তাই হ'ল কাল। অফিসে পৌঁছবার মিনিট দশেকের মধ্যে ছোট সাহেব হ্যামিল্টনের ঘবে ডাক পড়ল সেই জরুরি কাজের সম্পর্কে। হ্যাঁমিল্টন নূতন লোক, মুড়ি-মিছরির পার্থক্য জানে না, দেহ একটু দুর্বল, মেজাজ কিন্তু চতুর্গুণ কড়া। নূতন মদ্যের কল্যাণে সারদার মেজাজ তখন বেশ একটু রঙিলা হ'য়ে উঠেছে। একজন সহকর্মী বললে, "কোনো ছুতো ক'রে কিছুক্ষণেব জন্য গা-ঢাকা দিন সারদাবাবু, এ অবস্থায় সাহেবের কাছে যাবেন না।"

সারদা বললে, "কেন, মদ খেয়েছি ব'লে? কিন্তু তার বাবার পয়সায় ত খাই নি। নিজের পয়সায় খেয়েছি। তবে অপরাধটা কোথায়?'

মস্তিষ্কের তরল অবস্থায় এই যুক্তিটা সারদার যথেষ্ট জোরালো ব'লে মনে হ'ল; এবং এর দ্বারা হ্যামিল্টনের সন্তুষ্ট না হ'য়ে উপায়ান্তর থাকবে না—মনের মধ্যে এই প্রতীতি ভ'রে নিয়ে ফাইল হস্তে সে হ্যামিল্টনের নিকট উপস্থিত হ'ল। মনে করলে যুক্তিটা তিক্ত অবস্থার জন্য ফেলে না রেখে আগেভাগেই সেরে ফেলা ভাল।

"স্যার!"

মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ ক'রে নির্গত হচ্ছে দেশী মদের উৎকট দুর্গন্ধ।

হ্যামিল্টন একটা ফাইলে নিমগ্ন ছিল; মুখ তুলে চেয়ে দেখে কঠোর স্বরে বললে, "তুমি মদ খেয়েছ?"

কুঞ্চিত চক্ষে শান্ত কণ্ঠে সারদা বললে, "ঠিক সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। খেয়েছি; কিন্তু নিজের পয়সায় খেয়েছি, তোমার বাপের পয়সায় খাই নি।" সারদা মনে করলে, সে মাত্র একটি সরল সত্যের উল্লেখ করছে।

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে হ্যামিল্টন চিৎকার ক'রে উঠল, "What! You dare say like that damn swine?"

ফাইলটা টেবিলে রেখে তেমনি শান্ত কণ্ঠে সারদা জবাব দিলে, "A swine does not drink wine, but a gentleman does."

মারমুখ হ'য়ে হ্যামিল্টন এগিয়ে এল,—"Get out at once, or I kill you!"

কিন্তু হায়! হ্যামিল্টন যদি তখন স্বপ্নেও জানত কোন্ কদর্য বিপদের মধ্যে এগিয়ে আসছে, তা হ'লে এগোনোর পরিবর্তে বোধহয় দু-চার হাত সে পেছিয়েই যেত। ঘুষি পাকিয়ে সে কাছে আসা মাত্র বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দুই বাহু দিয়ে তাকে সাপটে জড়িয়ে ধ'রে সোহাগস্নিগ্ধ কণ্ঠে সারদা ব'লে উঠল, "You come to kill the swine, but the swine will kiss you darling."

মদের বিকট গন্ধ থেকে এবং তদপেক্ষা স্থূলতর বিপত্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্য মস্তক বারংবার যথাসম্ভব পশ্চাতে ও এ-পাশ ও-পাশ সরাতে হচ্ছিল ব'লে হ্যামিল্টন নেশার দ্বারা পুষ্টতর সারদার স্বাভাবিক শক্তিকে পরাভূত করতে বাগ পাচ্ছিল না। উপায়ান্তর না দেখে সে 'চাপরাসী, চাপরাসী' ব'লে চিৎকার করতে লাগল।

উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তার আভাস পেয়ে চাপরাসীরা বারান্দা থেকেই বুঝেছিল, ভিতরে একটা বিতণ্ডা চলেছে! সাহেবের উৎকণ্ঠিত ডাক শুনে দ্রুতপদে ঘরের ভিতরের উপস্থিত হ'য়ে জন-দুই মিলে হ্যামিল্টনের দেহ থেকে সারদাকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিলে।

ক্রোধে ও অপমানে হ্যামিল্টনের মস্তিষ্ক টগবগ ক'রে ফুটছিল। সুযোগ পেয়ে সে উন্মত্ত ভাবে সারদাকে আক্রমণ ক'রে পেটে একটা ঘুষি বসিয়ে দিলে। আঘাতটা হ'ল গুরুতর। কোঁক ক'রে একটা শব্দ ক'রে সারদা মেঝের উপর নেতিয়ে পড়ল; তারপর একটু বাদে অল্প অল্প রক্তবমন আরম্ভ করলে।

চাপরাসীদের মধ্যে একজন ব'লে উঠল, "মর গিয়া সাদাবাবু।" সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অফিস জুড়ে হল্লা উঠে গেল। হ্যামিল্টনের উপরিওয়ালা চীফ এঞ্জিনিয়ার প্রেস্টন ঘটনাস্থলে ছুটে এলেন।

তৃতীয় দিনে সারদা হাসপাতাল থেকে অফিসে এক মাস ছুটির দরখাস্ত আর চাকরিতে ইস্তফার চিঠি দিলে। তার তিন-চার দিন পরে দশ হাজার টাকার ড্যামেজ দাবি ক'রে সারদার পক্ষ থেকে হ্যামিল্টনের নামে আমি রেজিস্ট্রি চিঠি পাঠালাম।

উকিলের চিঠি পেয়ে হ্যামিল্টন ব্যস্ত হ'য়ে প্রেস্টনের শরণাপন্ন হ'ল। প্রেস্টন সারদাকে নিজের গৃহে ডাকিয়ে পাঠিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেবার জন্যে আর ইস্তফার চিঠি প্রত্যাহার করবার জন্য অনুরোধ করলে। বললে, "হ্যামিল্টনের অবশ্য অন্যায় হয়েছিল, কিন্তু প্রথম অপরাধ তুমিই করেছিলে। যাই হোক, হ্যামিল্টন দুঃখিত, আর সে কথা তোমার কাছে প্রকাশ করতে রাজি।"

কাজের লোক ব'লে প্রেস্টন সারদাকে ভালবাসত, চাকরি না ছাড়বার জন্য সে তাকে চেপে ধরলে।

সারদা কিন্তু সম্মত হ'ল না। বললে, "মিস্টার হ্যামিল্টনের আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করবার দরকার নেই; কিন্তু স্যার, চাকরি আর আমি করব না। আমার দুর্বল লিভারে চোট লেগেছে, ডাক্তার বিশেষ সাবধানে থাকতে বলেছে। যে-কোন মুহূর্তে স্রাব আরম্ভ হ'য়ে জীবন সংশয় হ'তে পারে। আমার প্রতি আপনার দয়া অসীম, মেডিক্যাল অজুহাতে আমার হাফ পেনশনের ব্যবস্থা করিয়ে দিন।"

অগত্যা সারদার পেনশন হ'য়ে গেল।

৫

পেনশন নিয়ে কিন্তু সারদা বিপদে পড়ল। নেশায় আর নিদ্রায় রাত এক রকম কেটে যায়, দিন কিন্তু কিছুতেই কাটতে চায় না। অফিসের সময় হ'লে বেলা দশটা থেকে গৃহ যেন কামড়াতে থাকে।

অবশেষে দাবাখেলার নেশার মধ্যে সে খুঁজে পেলে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ। প্রত্যহ বেলা দশটার সময়ে যথারীতি আহার ক'রে দানাপুর থেকে বেরিয়ে প'ড়ে মুরাদপুরে আমার বাসায় উপস্থিত হয়। তখন আমার আদালতে যাবার সময়। সমস্ত দিন খবরের কাগজ আর বই প'ড়ে কাটায়। বেলা চারটে থেকে এক-আধজন ক'রে দাবা-খেলোয়াড় আসতে থাকে; খেলা জ'মে ওঠে। সন্ধ্যার পর অবসর থাকলে আমিও মাঝে মাঝে এক-আধ দান বসি। তারপর রাত আটটা সাড়ে আটটার সময়ে সারদা দানাপুর ফিরে যায়।

এ ব্যবস্থায় কিন্তু জুৎ হয় না। এক্কা ভাড়া আর অন্যান্য অসুবিধার মূল্য দিয়ে খেলার বহর ঠিক পোষায় না। অবশেষে মতলব ঠাউরে সারদা শ দেড়েক টাকা দিয়ে মায় ঘোড়া একটা এক্কা কিনে ফেললে। রামলাল নামে পনের-ষোল বৎসর বয়সের তার এক ছোকবা চাকর ছিল। মাসিক এক টাকা বেতন-বৃদ্ধির দ্বারা উপরন্তু সে হ'ল এক্কার চালক আর ঘোড়ার সইস।

এই নূতন সুযোগের ফলে পদ্ধতিটা একেবারে ঢেলে সাজা হ'ল। রাত চারটেব সময়ে উঠে কাদম্বিনী ডাল ভাত আর তরকারি রেঁধে ফেলে, রামলাল বাজার থেকে দই মিষ্টি কিনে আনে; তারপর সাড়ে পাঁচটার পূর্বেই প্রভুভৃত্যে স্নানাহার সেরে বাঁকিপুরের পথে বেরিয়ে পড়ে। ঘোড়াব গলায় তিন সার সুরেলা ঘন্টি বাঁধা। ঝুনঝুন ঝুনঝুন শব্দ করতে করতে সুদীর্ঘ পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে বেলা সাড়ে ছটা পৌনে সাতটার সময়ে এসে পৌঁছয় বাঁকিপুবে।

সে সময়ে আমি মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত থাকি ব'লে সারদা আমার বাড়ি না এসে অপর কারো গৃহে উপস্থিত হয়। গৃহকর্তার সঙ্গে দেখা হ'লে হাসি-হাসি কাঁচুমাচু মুখে বলে, কি ভাই, এক দান হবে না-কি? গৃহকর্তা হয়ত বলে, না ভাই, কাজ আছে, এখন সুবিধা হবে না। ব্যস্ত হ'য়ে সাবদা বলে, আচ্ছা আচ্ছা, থাক্ থাক্—আর একদিন হবে। কাউকে সে চটাতে চায না। যে খদ্দেব আজ হাতে এল না, আর একদিন আসতে পারে। ঝুনঝুন ঝুনঝুন শব্দ করতে করতে সারদা আর এক গৃহের উদ্দেশ্যে চলতে থাকে।

এই রকমে পাঁচ বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে একজন হয়ত বলে, আচ্ছা, এক দান না-হয় বসাই যাক। মহা খুশি হ'য়ে সারদা রামলালকে ইশারা করে। একটি শৌখিন নরম শতরঞ্জি এনে রামলাল ফরাসের উপর পাতে; তারপর নিয়ে আসে ছক্ দাবা বোড়ে, হান্টলি পামারের বিস্কুটের টিনে তামাক টিকে দেশলাই কলকে, এবং তার সঙ্গে কারুকার্যখচিত একটা মোরাদাবাদী ফরসি। অদূরে মেঝের উপর ব'সে রামলাল তামাক সাজতে আরম্ভ করে। একমাত্র সময়টুকু ছাড়া গৃহকর্তাব আর কোনো সামগ্রী ব্যবহার ক'রে সারদা কৃতজ্ঞতার ভার বাড়াতে রাজি নয়।

প্রাতঃকালীন খদ্দের দুষ্প্রাপ্য হ'লে সারদা আমার গৃহে এসে হাজির হয়। সেখানে তার এবং রামলালের সারাদিনের বিশ্রাম এবং নিদ্রার ব্যবস্থা। সে-সময়ে দানাপুরে কাদম্বিনীও নিদ্রা দিয়ে রাত্রির নির্যাতন এবং নিদ্রাভাবের জন্য প্রস্তুত হ'তে থাকে।

রাত্রি নটা পর্যন্ত আমার গৃহে দাবার আড্ডা জমিয়ে সারদা দানাপুরের জন্য উঠে পড়ে। মধ্যে এক জায়গায় সুরা দিয়ে নিজেকে উত্তপ্ত ক'রে নেয়; তারপর ঝুনঝুন ঝুনঝুন শব্দ করতে করতে পুনরায় দানাপুরের পথে অগ্রসর হয়। এক্কার নিক্কণ শুনতে শুনতে মেজাজের মধ্যে সুরার সুর গমক মারতে থাকে। গৃহের সম্মুখে যখন পৌঁছয়, তখন দস্তুরমতো ধ্রুপদের বাঁট-দুন-চৌদুন আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে।

কড়া নাড়তে নাড়তে সারদা কাদম্বিনীকে বাপান্ত করতে থাকে, তারপর গৃহের মধ্যে প্রবেশ

ক'রে মহরমের কায়দায় লাঠি ঘোরাতে আরম্ভ করে। মত্ত স্বামীকে বাগ মানিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়াতে কাদম্বিনীর বারোটা বেজে যায়। রাত সাড়ে তিনটায় আবার উঠতে হবে; নইলে রামলালকে দিয়ে দুটো উনুনে আঁচ তুলিয়ে চারটের সময়ে ডাল-ভাত চড়ানো যাবে না।

আকাশে চন্দ্র-সূর্যের উদয়াস্তের যে নিয়ম, দানাপুরে সারদা হালদারেরও ঠিক তাই। সকাল সাড়ে পাঁচটার সময়ে ঝুনঝুন ঝুনঝুন করতে করতে পূর্বদিকে গমন, আর রাত্রি সাড়ে দশটায় ঝুনঝুন ঝুনঝুন করতে করতে পশ্চিম প্রান্তে প্রত্যাবর্তন। এর শীত নেই, বর্ষা নেই, ব্যত্যয় নেই, ব্যতিক্রম নেই।

কিন্তু মাস ছয়েক পরে হঠাৎ এক সময়ে ব্যতিক্রম দেখা দিল। উপর্যুপরি তিন দিন সারদার দেখা নেই। এ পর্যন্ত কোনোদিন যে-ব্যক্তি এক ঘন্টা কামাই করে নি, তার এরূপ আচরণে খেলোয়াড়ের দল চঞ্চল হ'য়ে উঠল, আমি হলাম চিন্তিত। অসুখ-বিসুখ করল না ত তার! পরদিন ছুটি ছিল, ঠিক করলাম সকালে দানাপুর গিয়ে খবর নিয়ে আসব।

৬

পৌষ মাসের শীতের রাত্রি তখনও নিঃশেষে শেষ হয় নি, বিকট কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে লেপ ফেলে চকিত হ'য়ে উঠে বসলাম।

"কে?"

বাইরে থেকে উত্তর এল, "কিষ্টোরাম, আমি ভাই সারদা। শীগগির দোর খোল। সব্বোনাশ হঁয়েছে!"

তাড়াতাড়ি দোর খুলে বাইরে এসে দেখি, সারদা দাঁড়িয়ে, মুখে উৎকট মদের গন্ধ।

"কি ব্যাপার?"

"আঁটকুড়ীর বেটী রাত বারোটার সময়ে পালিয়ে গেছে কিষ্টো।"

"পালিয়ে গেছে! কোথায় পালিয়ে গেছে?"

"একেবারে পগার পার।—বুঝছিস নে? মিত্যু হয়েছে তার।" ব'লে সারদা আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল।

বললাম, "বলিস কি সারদা! হঠাৎ কি এমন হ'ল?"

মাটিতে ব'সে প'ড়ে মাথা নাড়তে নাড়তে সারদা বলতে লাগল, "কিছুই হ'ল না রে ভাই, দিন তিনেক সামান্য জ্বর হ'ল, তারপর রাত্রি বারোটার সময়ে দু-চারটে খাবি খেয়ে চোখ বুজল। তুই গিয়ে সৎকার করিয়ে দে ভাই। আমার হাতে একটিও পয়সা নেই, পরশু সেভিংস্ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে তোর দেনা শোধ করব।"

হাতে ধ'রে সারদাকে দাঁড় করিয়ে সহানুভূতির কণ্ঠে বললাম, "বিপদে অধীর হ'তে নেই সারদা, তুই শান্ত হ। তোর কোনো চিন্তা নেই, আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

সারদা বললে, "এবার তা হ'লে আমার ব্যবস্থা কর্।"

"তোর আবার কি ব্যবস্থা?"

ডান হাত এগিয়ে দিয়ে সারদা বললে, "গোটা দুয়েক টাকা দে, মথুর শার দোকানে গিয়ে ঠাণ্ডা হই। বাড়ির বোতলে যেটুকু তলানি প'ড়ে ছিল, তাই খেয়ে এসেছি। তাতে কিন্তু হবে না ভাই, এ বেঁজায় শোক।"

বললাম, "আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি; ঠাণ্ডায় থাকিস নে, ভিতরে গিয়ে ব'স্।"

ঘরে প্রবেশ ক'রে আমার দু হাত চেপে ধ'রে কাতর ভাবে সারদা বললে, "একটা কথা কিষ্টো।"

"কি?"

"চিতেয় সের খানেক চন্দন কাঠ ছড়িয়ে দিস। শালীকে সত্যিই ভালবাসতাম ভাই।" ব'লে পুনরায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে উঠল।

বললাম, "তাই হবে, স্থির হ। তোর সঙ্গে গাড়ি আছে?—এক্কা?"

"আছে। আমাকে কিন্তু মোথরোর দোকানে নামিয়ে দিস ভাই।"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম।

কাদম্বিনীর মৃত্যুর দিন তিনেক পরে সারদা কাশী রওনা হ'ল। সঙ্গে গেল রামলাল। কাশীতে সারদার এক দুবসম্পর্কের মাসী বাস করে, তারই বাসায় উঠে সারদা কাদম্বিনীর পারলৌকিক কার্য সমাপন করবে।

যাবাব সময়ে আমাকে ব'লে গেল, "সংসারধর্ম আর কার জন্যে করব বল্? কাশী গিয়ে এবার সাধুসঙ্গ কবব স্থির করেছি। দানাপুরের বাড়িটা খদ্দের ঠিক ক'রে বিক্রি করবার ব্যবস্থা তুই কবিস। খবর দিলেই আমি দু-তিন দিনেব জন্যে এসে কোবলা ক'বে দিয়ে যাব।"

বিদেশে বাল্যবন্ধু লাভ ক'রে আনন্দেই ছিলাম। বিয়োগ-বেদনার সম্ভাবনায় মনটা বিষণ্ন হ'যে উঠল। কিন্তু কাদম্বিনী যদি নিজের প্রাণ দিয়ে সারদার অধ্যাত্ম সাধনার পথ সুগম ক'রে দিয়ে গিয়ে থাকে, আমি কেন নিজেব সুখ-দুঃখ নিঁযে তার মধ্যে ব্যস্ত হই?

৭

দেওকিলাল নামে আমার এক মক্কেল ছিল, তার বাড়ি দানাপুরে। সারদার বাড়ির কথা তাকে একদিন বললাম। ঔৎসুক্যসহকাবে সে বললে, তার এক আত্মীয় দানাপুরে বাড়ি কেনবার চেষ্টায় আছে, তাকে সে ও-বাড়ির কথা জানাবে।

বাড়ি দেখে দেওকিলালের আত্মীয়ের পছন্দ হ'ল, দর দিলে বারো শো টাকা। ভালই। সাবদা জানিয়ে গেছে হাজার টাকা পেলে বিক্রি করতে রাজি হবে। এ নিজে থেকে দু শো টাকা বেশি বলছে। হয়ত মনে মনে আরও কিঁছু চেপে রেখেছে, চাপ দিলে বাড়তে পারে। দেওকিলালকে বললাম, "দু-চার দিনের মধ্যে সারদাকে চিঠি দিচ্ছি।"

দিন দুই পরে দেওকিলাল আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাশীতে কি চিঠি লিখেছেন ওকীল সাহেব?"

বললাম, "এখনও লিখি নি, আজকালের মধ্যে লিখব।"

"তা হ'লে আর লিখতে হবে না, হালদারবাবু এসে গেছেন; কাল বৈকালে বাজারে তাঁকে দেখেছি।"

"তুমি তাকে চেনো?"

সহাস্যমুখে দেওকিলাল বললে, "আগে থেকেই চিনি, কিন্তু সাহেব উওকুর পর থেকে দানাপুরে কে না তাঁকে চেনে?" একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, "এবার তা হ'লে একটু তাড়াতাডি ওঁর সঙ্গে কথাটা পাকা ক'রে নিন। আবার হয়ত কোনদিন কাশী ফিরে যাবেন।"

বললাম, "আচ্ছা।"

*　　　　*　　　　*

সাবদা ফিরে এসেছে অবগত হ'য়ে মনে মনে খুশি হলাম। পরদিনই গেলাম তার সঙ্গে দেখা করতে!

দানাপুর রেল-স্টেশন থেকে সারদার বাড়ি বেশি দূর নয়। তার বাড়ির কাছ-বরাবর পথে দেখা হ'ল রামলালের সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি রে রামলাল, কবে এলি তোরা?"

সহাস্যমুখে রামলাল বললে, "পরসোঁ ফজিরে।"

"বাবু বাড়ি আছেন?"

"জী হাঁ, বাবু আছেন। আপনি যান না, দর্‌বাজা খোলাই আছে। আমি পান নিয়ে এখনই আসছি।"

সদর-দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলা দিতে খুলে গেল। ভিতরে প্রবেশ ক'রে উঠান পেরিয়ে বারান্দায় উঠে দেখি, ঘরের ভিতর তক্তপোশের উপর পিছন ফিরে ব'সে সারদা নতমুখে নিবিষ্ট মনে কি দেখছে। অপ্রত্যাশিত উপস্থিতির দ্বারা তাকে বিস্মিত ও পুলকিত ক'রে দেবার লোভে সন্তর্পণে একটু অগ্রসর হ'য়ে নিজেই বিস্মিত হ'য়ে গেলাম। শুধু নতমুখ সারদাই নয়, আধ-খেলা দাবা-বোড়ের ছকের অপর দিকে নতমুখী সুন্দরী তরুণী। মুখ দিয়ে আপনা-আপনি বেরিয়ে গেল, "কি ব্যাপার?"

মুখ তুলে আমাকে দেখে মৃদুস্বরে 'এই!' ব'লে আরক্তমুখে তক্তপোশ থেকে অবতরণ ক'রে তরুণী কোণের দিকে স'রে গেল। ঘর ছেড়ে পালাবার উপায় নেই, পথ আগলে আমি দাঁড়িয়ে।

পিছন ফিরে আমাকে দেখে সারদা আনন্দে উচ্ছল হ'য়ে উঠল। "আরে কিষ্টোরাম যে! কি ক'রে সন্ধান পেলি?" তারপর সজোরে নিজের পাশে এক থাপ্পড় মেরে বললে, "ব'স্ ভাই, এখানে ব'স।"

বললাম, "তা না-হয় বসছি, কিন্তু ইনি কে?"

সহাস্যমুখে সারদা বললে, "এত বড় উকিল হ'য়ে এটা আর বুঝলি নে কিষ্টো? এটি মাসীমার দেওর-ঝি হেমাঙ্গিনী, আমার স্ত্রী বটে। কাশী থেকে বিয়ে ক'রে এনেছি।"

বললাম, "তা বেশ করেছিস, কিন্তু কাশীতে ত গেছলি সাধুসঙ্গ করতে! তার কি হ'ল?"

সারদা অট্টহাস্য ক'রে উঠল, "সে কথা আর বলিসে নে ভাই; কাশীতে একটিও আসল সাধুর দেখা পেলাম না, সবাই চিৎহাত সাধু। তাই মাসীর বাড়িতে হেমার দেখা পেয়ে সাধ্বী-সঙ্গ লাগিয়ে দিলাম।"

"দাবা শেখাচ্ছিস?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সারদা বললে, "ক্ষেপেছিস। উ আমাকে শিখাতে পারে। মাসীর বাড়িতে দাবা খেলতে খেলতেই ত কিস্তিমাৎ ক'রে গাঁট বাঁধলে।" ব'লে হেসে উঠল। তারপর ব'লে চলল, "গজের খেলা খেলে বেঁজায়। এক দান খেলে দেখ্ না ক্যানে। যেখানেই তুই তোর রাজা থুবি, দেখবি কোণাকুণি শালীর দুই গজ শুঁড় উঁচিয়ে আছে।"

বললাম, "শুঁড় দিয়ে ওঁর গজ তোর রাজাকে বন্দী করলে আপত্তি নেই, কিন্তু তাকে বন্দী করলে বন্ধুহারা হব।"

সহাস্যমুখে সারদা বললে, "সে ভয় নেই কিষ্টো। আমরা কি মতলব করেছি জানিস?"

"কি মতলব?"

"কাশী যাবার সময়ে ঘোড়াটা বেচে দিয়ে গিয়েছিলাম। এসে অবধি একটা ঘোড়া কেনবার চেষ্টা করছি। ঘোড়া কেনা হ'লেই আবার আগের মতো তোদের পাড়ায় যেতে আরম্ভ করব। তবে এবার আর একা নয়—জোড়ে। আর, ভোরে নয়, বেলা তিনটের সময়ে। হেমাকে তোর বাড়ি থুয়ে দু-চার ঘর সেরে আসব। তারপর সন্ধ্যা থেকে তোর বাড়ি আড্ডা জমিয়ে রাত নটার সময়ে রওনা।"

বললাম, "পথে মোথরোর দোকানে গাড়ি থামবে না তা?"

হা-হা ক'রে হেসে উঠে সারদা বললে, "তার আর উপায় নেই রে ভাই। আঁটকুড়ীর বেটী আমাকে দিয়ে বিশ্বেশ্বরকে সুরা উচ্ছুগ্‌গু করিয়েছে।"

হেমাঙ্গিনী ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। অবগুণ্ঠন কপালের মাঝ-বরাবর। ঈষৎ নত হ'য়ে করজোড়ে আমাকে অভিবাদন ক'রে বললে, "ঠাকুরপো, আপনি যে আমাদের কত আপনার, তা আমার জানতে একটুও বাকি নেই। আপনারা দুজনে খেলতে বসুন,—আমি আপনাদের খাবার ক'রে নিয়ে আসি।"

হেমাঙ্গিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিছন থেকে তাকে দেখতে দেখতে মনে হ'ল, হেমাঙ্গিনী নাম বেমানান হয় নি, কিন্তু সৌদামিনী হ'লে সারদার দুই স্ত্রীর নামের অর্থসঙ্গতি আরও অনেক জোরলো হ'ত।

শ্রেষ্ঠ গল্প

ভুল ভাঙা

অনুরূপা দেবী

কতকটা মূলধন না রাখিয়া ব্যবসা কবা যায় না, কিন্তু কাব্য উপলব্ধির শক্তি না থাকিলেও বাংলা মাসিকপত্রের সম্পাদকতা করা এতটুকু অসম্ভব নহে। এমন ঘটনা যে নিত্যই ঘটিতে পারে এবং ঘটে, ইহার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য কোনো জীর্ণ পুঁথি বা পাথবের নুড়ি ঘাঁটিতে হয না। তবে কথাটা শুনিতে একটু হেঁয়ালির মতোই ঠেকে। মূলধন না রাখিযা ব্যবসা করিতে গেলে দেখা যায়, উঠ্‌তি মুখেই অনেক সময় ব্যবসাটাকে মাথা হেঁট করিতে হয এবং মহাজনের দ্বাবে লালবাতিব রক্তশিখা আপনি জ্বলিয়া উঠে; কিন্তু মাসিকপত্রের পৃষ্ঠে চড়িয়া মা-লক্ষ্মী আপনাব উদাবতা-প্রদর্শনে এতটুকুও শৈথিল্য করেন না। কাব্যরসগ্রহণে অক্ষম সম্পাদকের পরিচালনে পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা ক্রমশঃই বেশ ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠে।

অজিতনাথ কিন্তু এ দলের লোক নয। সে প্রায় বাল্যাবধিই কাব্য-লক্ষ্মীর দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া আছে। লেখক হইবার শক্তি নাই থাক, পরের লেখার ভাবগ্রহণের ক্ষমতার তাহার অভাব ছিল না। স্কুলের পড়া বাঁচাইয়া একখানি ছোটো খাতায় রবিবাবুর ভালো ভালো কবিতাগুলি টুকিয়া লওয়া একটা অবশ্য করণীয় ব্রতের মতোই তাহার জীবন-গ্রন্থির সঙ্গে জোট পাকাইয়া গিয়াছিল। ওই ধরণে কাব্য লিখিয়া অমরত্বলাভের ইচ্ছা বাংলা দেশের কোন্ ছেলেমেয়ের না হয় যে, তাহারও হইবে না? শেষে অনেকগুলি ছোটো বড়ো উমেদারীতেও যখন তাহার এই বলবতী ইচ্ছা অপূর্ণই রহিয়া গেল, কোনো কবিই তাঁহার কবিত্ব-শক্তির অংশ তাহাকে যে কোনো দাম লইয়া বিক্রয় করিতে পারিলেন না, তখন সে কবিযশঃ-প্রার্থনা ছাড়িয়া আবার পরমোৎসাহে দেশী বিদেশী বড়ো বড়ো কবিদের বিখ্যাত রচনাগুলি খাতায় টুকিয়া মুখস্থ করিয়া কাব্যরস-পিপাসার নিবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইল, একটুও দমিয়া পড়িল না।

আজকাল অজিতনাথ "মলয়া" পত্রিকার সম্পাদক। মোটা-সোটা কাগজখানিকে চিত্রে সাজাইয়া মাসের প্রথম দিনেই সে জনসাধারণের চোখের সামনে বাহির করিয়া দেয়। মেয়েমহলের হাতে হাতে ঘুরিয়া কাগজখানা দুই তিন দিনে ঝর-ঝরে কালি-মাখা তৈল-সিক্ত হইয়া প্রমাণ করিয়া দেয়, ইহার পাঠকসংখ্যা বড়ো অল্প নয়। তবে গ্রাহক কতগুলি, সে খবর আমরা না-ই দিলাম। যে দেশে একজন একখানা বই কিনিলে তাহার প্রতিবেশী এবং তস্য ক্রমে এক ডজন প্রতিবেশীর তাহার উপর দখলী স্বত্ব স্বতঃসিদ্ধ, সেখানে পাঠকের সহিত গ্রাহকের সম্বন্ধ খুব নিকট নাও হইতে পারে, আর তাহাতে বিস্ময়ও কিছু নাই।

২

"মলয়া"র লেখক-লেখিকাদলের মধ্যে একজনের নাম আজকাল বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে সর্বত্র সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। গদ্যে পদ্যে এমন দখল প্রায় অল্প লেখকেরই দেখা যায়।—বিশেষ করিয়া কবিতায়। সে কি বিস্ময়-পুলকসঞ্চারী শব্দ-লহরী, বাণীর কোমল মধুর ঝংকার! মৃদঙ্গের-মৃদু-গম্ভীরনাদ! এ সব তাহারই নিজস্ব। এমনটি বুঝি আর কোথাও শুনা যায় নাই।

পূজা আসিয়া পড়িল। পূজার সংখ্যাকে ভালো করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া ঘরের ছোটো শিশুটির মতো পূজার বাজারে বেড়াইতে পাঠাইতে হইবে। অজিত রচনা-নির্বাচনে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সংখ্যায় "সাংখ্য কি নিরীশ্বরবাদ?" "বৌদ্ধ দর্শন নাস্তিক দর্শন অথবা আস্তিক দর্শন?" ইত্যাদি এই সব গুরু গম্ভীর প্রবন্ধ চলিবে না। কবিতায় গল্পে ইহার প্রতি পৃষ্ঠা ভরাইয়া দিতে হইবে। শ্রীমতী কনকপ্রভা বটব্যালের কবিতা এ সংখ্যায় একাধিক ছাপা চাই। তদ্‌ভিন্ন তাঁহার একটি ছোটো গল্প।

কবিতা দুটির নাম দেওয়া হইযাছে, "আগত" এবং "স্বাগত"—আগমনীবই সেই চিরন্তন সুর, কিন্তু কি এক নূতন অশ্রুতপূর্ব নূতনত্বে ভবা, অভিনব ছন্দে নব কলেবর নবীন রূপ ধরিয়া ইহারা দেখা দিয়াছে। সম্পাদক অজিতনাথ মুগ্ধ চিত্তে পড়িল,—

'বক্তজবা-বিল্বদলে ভক্তি-অর্ঘ্য সজ্জিত, হেম-থালি পবিপূর্ণ, সিক্ত-শেফালিকার গাঁথা মালা হাতে শারদ প্রকৃতি তোমাব পথ চাহিযা দাঁড়াইয়া আছে। কাশাংশুকেব চঞ্চল অঞ্চল ঐ মৃদু-মন্দ পবনে ঈষৎ কম্পিত। শ্যাম শৈবালদামবচিত বসন ঐ বক্তপদ্ম চবণ দুটি চুমিয়া আছে। এসো মা—ঐ উন্মুখ আবাহনেব আহ্বান-গীত-রবে অম্বর আজ পরিপূরিত হইয়া উঠিয়াছে। সে গানের তালে তোমার ওই অভয় চবণ ফেলিয়া ভক্ত-হৃদয়পদ্মোপরি অধিষ্ঠিত হইতে এস মা, এস মা। বরাভযদাযিনী বর ও অভয দিতে এই হৃতস্বাস্থ্য ভগ্নপ্রাণ বঙ্গবাসীব বঙ্গবাসে এস মা।'—

এমনি কত ভাবের আবেগে পরিপূর্ণ সেই আগমনীর গান। "স্বাগতে" ও সেই একই বীণার তাবে বিভিন্ন মূর্ছনা।

অজিতনাথের চিত্ত-বীণার তারে তারে সেই ঝংকাব রণিয়া উঠিতে লাগিল। কাশাংশুকপরিধৃতা শেফালি-মাল্য-ধৃতকবা বক্তোৎপলদলশোভিতচবণা শারদজ্যোৎস্নাগঠিতা মূর্তি তাহার মানস-নেত্রে উজ্জ্বল চিত্রে ফুটিয়া উঠিল। নবদূর্বাদলে জবার অর্ঘ্য রচিত, দশভুজা সিংহবাহিনীব অভয়বর-বিতরণকারী চরণতলে ভক্তিবিগলিত স্থিরদৃষ্টি সংস্থাপিত—যেন অভয়ার পার্শ্বচারিণী বীণাপাণি সহসা কি ভাবের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে চাহিয়া দাঁড়াইযা আছেন নাকি?

এ কার মূর্তি! কার এ রূপ! যিনি এ চিত্র মোহনতুলিকায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারই নয় কি?

সে দিব্যচক্ষে দেখিতেছে, সেই সৌন্দর্য-প্রতিমা, কুমারী মূর্তি!

কুমারীমূর্তি! হাঁ, তা নয়তো কি? এ মূর্তি কি কুমারী ভিন্ন আর কাহাকেও মানায়? বিশ্বের রাণী বিষ্ণুজায়া হইলেও সেই সিতাব্জাসীনা লেখ্য-পুস্তক-ধারিণী দেবী সরস্বতীকে কেহ কোনো দিন সে সম্পর্কে আনিবার চেষ্টাও করে নাই। কুমারী তরুণী-মূর্তিতেই তাঁহার চির-আরাধনা। কুমারী কনকপ্রভাও তাঁহার শারীরিণী ছায়া,—তবে তিনিই বা কুমারী না হইবেন কেন? নামের প্রথমে শ্রীমতী না লিখিয়া কুমারী লিখিলেই বেশ মানায়; কিন্তু কি জানি, যদি তিনি বিরক্ত হন! তাই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অজিতের সাহস হয় নাই।

অজিতনাথ রচনাগুলি প্রেসে পাঠাইয়া নিশ্চিন্তচিত্তে কতকগুলা তাহারই পুরাতন রচনা লইয়া বসিল। প্রতি সংখ্যাতেই কনকপ্রভাব কনকাঙ্গুলির ছাপ সোনার অক্ষরের মতোই কালোকালির ছাপার মধ্য হইতে জ্বল-জ্বল করিত। সে সব রচনার বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে কি মায়া, কি মোহ ছড়ান

রহিয়াছে। যোল রাগ ও চৌষট্টি রাগিণী সেখানে চিরবসন্তবন্দিত নন্দনেব অপ্সরাকণ্ঠে চিরধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। অজিতনাথের বুকে পুলকের তড়িৎ খেলিয়া গেল। আহা, সে কত ভাগ্যবান্! এমন একটি হৃদয়াভাণ্ডাবেব অফুরন্ত রত্নৈশ্বর্যের জমার খাতাখানি তাহারই হাতে। সে মুগ্ধচিত্তে পুনঃ পুনঃ পঠিত সেই সব কবিতা আবার পড়িয়া যাইতে লাগিল। এমন সে কত সময়ই করে। এগুলি তাহাব আগাগোড়া প্রায় সবই কণ্ঠস্থ, তথাপি ইহারা কখনও নূতনত্ব হাবায় না। শুনা গিয়াছিল, কি একটা ফল খাইলে, মানুষ যে বয়সে ফল খায়, ঠিক সেই বয়সেই থাকিয়া যায়। এই রচনাগুলির মধ্যে বুঝি সেই ফলের অজ্ঞাত শক্তিটা প্রচ্ছন্ন ছিল?

"কনকলতা" কবিতাটি যেন তাঁহাবই নিজেব ছবিখানি! বিজন অবণ্যেব অন্তবালে সলজ্জ শ্রীমণ্ডিতা ক্ষুদ্র বন-লতাটি উদ্যান-লতাকে পরাভব করিয়া তপোবনেব শোভা সংবর্ধন করিতেছে। ঋষিতনয়া অপরিস্ফুট যৌবনের প্রথম উন্মেষে মানসিক বৃত্তিগুলিব প্রথম বিকাশের অতি গোপন সংবাদ শুধু এই সখী কাননিকাব কানে আভাসে পৌঁছিয়াছে, এ সংবাদ আব কেহ এখনও অবধি পায় নাই। তথাপি পাতায় লতায় আকাশে বাতাসে একটা কানাকানি, একটু হাসাহাসি বহিয়া চলিয়াছে। ভ্রমর ছুটিয়া আসিয়া এই নূতন খববটার জন্য বন লতার কানে কানে অনেক তোষামোদেব কথা শুনাইল, শেষে বাগ করিয়া চলিয়া গেল, বুঝি আব আসিবে না, এমনি কঠোব শাসাইয়া গেল, তথাপি সে নিজেব সর্বস্ব ছাড়িয়াও সখীব বিশ্বাস ভঙ্গ করিল না। কিন্তু প্রিয়-বিবহিত এ জীবন কি বহা যায়? নির্জন কাননতলে একদিন সে শুকাইয়া ধরালিঙ্গন কবিল। কেহই তাহার জন্য কাঁদিল না, নিষ্ঠুব ভ্রমর আব ফিবিয়াও চাহিল না। শুধু বাতাস একবাব হা-হা কবিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তার পব সব শেষ! আহা, না, না! এমন ধারা হইতেই পারে না। কোথাকাব কে কঠিন ভ্রমর তাহার নির্মম অত্যাচাবে স্বর্গের ঐ লতা শুকাইবে? অসম্ভব। সে ইহা সহিতে পাবিবে না। নিশ্চয়ই সে তাহার এই হৃদয়হীনতা হইতে এই কোমল বক্ষখানি অক্ষত বাখিবে।

আবার এক ধারে এ কি উন্মত্ত আবেগময় হৃদয়েব প্রচণ্ড বেগ, ব্যাকুল প্রেমধাবা লইয়া "পদ্মাব সিন্ধু দর্শনে যাত্রা।" কৌমাব-প্রেমমণ্ডিত নারী-হৃদযেব কি সুন্দব প্রকাশ! ওরে সিন্ধু, আবও স্ফীত হ, আজ কোন্ হৃদয়ধারা লইয়া তোব ও লবণাক্ত ফেনিল তবঙ্গগুলার উন্মাদ নর্তনকে শান্ত শীতল করিতে ছুটিয়াছে, তুই তাব কি বুঝিবি রে, ওবে উন্মাদ! ওবে আত্মহারা! ওরে বাতুল।

৩

অজিত নিজের মধ্যে একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল। একটা কিছুকে কেন্দ্র করিয়া যেমন তাহার চারিদিক আবর্তন করিয়া ফেরাই জগতের ধর্ম, তেমনি ঐ কল্পনাময়ী নাবীটিকে মাঝখানে রাখিয়া তাহার সহস্রা কল্পনা তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া ঘুরিতেছিল। পদ্মের মধ্যটিতে মধুলোলুপ মৌমাছির মতো তাহার সাবা চিত্ত ইহারই রচনার ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন, আবদ্ধ। সে তাহাব লেখিকার অমৃতময়ী রচনাকে তাব মাসিকেব প্রাণরূপে দেখিতে দেখিতে তাহাব পবিসর বাড়াইয়া এখন নিজের সঙ্গে এমনি জড়াইয়া ফেলিয়াছে যে, সহস্র ক্ষতি লোকসান সহিয়াও সে এখন এই কাগজখানাকে উঠাইয়া দিতে একান্তই অক্ষম। এজন্য লাঞ্ছনার ঝড় উঠিয়াছে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতৃবর্গের অভিশাপের সঙ্গে নিজের মা-বাপের ক্রোধবহ্নিও ধোঁযাইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু অজিতেব হৃদয় তখন কনকপ্রভার অবলম্বন চাহিয়া ব্যাকুল, তখন সেখানে কোন্ অজ্ঞাত গ্রামের কোন্ এক পাঁইজোর পায়ে, নোলোকপরা ছোটো মেয়ের প্রবেশাধিকার কোথায়? সে এই মানসীর স্বহস্ত-চিত্রিত আলেখ্যগুলি দিয়াই দিব্য নেত্রে তাহাকে দেখিতে পায়। তাহাব সহিত তাহার হতাশকবিত্বের সমুদয় অব্যক্ত কল্পনার যোগ করিয়া সে আপনার জীবন-যৌবন আশা-কল্পনা সমস্তই সফল মনে করে। কখনও মনের মধ্যে নিমেষের জন্য চকিতে একটু দর্শনাকাঙ্ক্ষা যে না জাগে, এমনও নয়। আধতন্দ্রাঘোরে

সহসা কোনো দিন একটা ক্ষুদ্র বাসনা প্রচ্ছন্নতা ছাড়াইয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়া দুই বাহু বাড়াইয়া বলে, "দেখা কি হবে না? ওগো মানসমন্দিরের পুণ্য দেবতা। এ শূন্য সিংহাসনে ও চরণ স্পর্শ কোনো দিন ঘটিবে না কি?"

কিন্তু এ পর্যন্ত সে অবসর ঘটে নাই। ১২।৫ আমহর্স্ট ষ্ট্রীটের একটা কোন্ প্রাসাদভবন হইতে বাহির হইয়া একখানা সরকারী লেফাপামধ্যবর্তী একটুখানি পত্রাংশ মধ্যে মধ্যে তাহার হাতের মধ্যে আত্মনিবেদন করিয়া দেয়। লেখাটুকু মুক্তাপংক্তির মতোই সুন্দর, যেন কুঁদিয়া কাটা পাথরেরই মতো সূক্ষ্ম-শিল্প। প্রায় এইটুকুই শুধু লেখা থাকে—

"সবিনয় নিবেদন,

'অমুক' শীর্ষক কবিতাটি পাঠাইলাম। প্রুফটি ভালো করিয়া দেখার বন্দোবস্ত করিবেন।

শ্রীকনকপ্রভা বটব্যাল।"

হায় পাষাণি! ভালো করিয়া প্রুফ দেখার বন্দোবস্ত তুমি বলিলে তবে করা হইবে! সে যে দুই চক্ষু ঠিক্‌রাইয়া চক্ষের মণি বাহিরে আনিবার যোগাড় করিয়া তুলিয়া সমস্ত প্রুফগুলা বরাবর নিজে দেখিয়া আসিতেছে। তবু প্রতিবারেই এই একই অনুরোধ! তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসে।

৪

এবার পূজার ছুটিতে পাঁচ বন্ধু মিলিয়া কোথাও একটা বেড়াইতে যাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর যাওয়া স্থির হইল, হাল ফ্যাসানের নূতন হাওয়া খাওয়ার জায়গা রাঁচি। কিন্তু তাহার পূর্বে একবার পাঁচজনের সঙ্গে দেখা-শুনাটুকু সারিয়া লওয়া চাই। অজিতনাথ হালিসহরে মামার বাড়ি হইতে কলিকাতা ফিরিতেছিল।

শরতের প্রসন্নোজ্জ্বল সুন্দর প্রভাত। স্বর্ণাভ রৌদ্রে হরিৎ ধান্যশিশুগুলি লঘু নৃত্য করিতেছিল। বর্ষার জমা জলের ধারে কাশের শ্রেণী সারি-বাঁধা বকের মতোই শুভ্র অঙ্গ মেলিয়া দিয়াছিল; বিলের মধ্যে মাছরাঙা মাছ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ঝোপেঝাড়ে ফলটা-ফুলটাও ফুটিয়া ফলিয়া আছে। অজিত সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাশাংশুকা সুন্দরীর কনককান্তিটুকু ধ্যান করিতেছিল। আহা, সেই স্থির-সৌদামিনী-প্রভ কুমারীমূর্তি আজ এই শরতপ্রভাতে কোন পূজাগৃহের আগমনী গানের তানের মধ্যে সুরভিচিত্ত ধূপটুকু জ্বলিয়া দিয়াছে! সে কোন্‌খানে?—ওগো সে গো কোন্‌খানে?

গাড়িখানা থামিয়াই আবার চলিতে আরম্ভ করিল। "পলতা" "পলুতা" শব্দটা ট্রেণের বাঁশির একটা উৎকট চিৎকারের মধ্যেই ডুবিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই প্লাটফর্মের উপর একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। অনেক মোট-মুটরী কুলির মাথায় চাপাইয়া একপাল কাচ্চা বাচ্চা সঙ্গে একদল বেলের যাত্রী,—স্ত্রী পুরুষ লইয়া প্রায় সাত আট জন,—এ ছাড়া দাসী, সরকার, চাকর, গোমস্তা, সেও প্রায় বাড়ির লোকের সম পরিমাণ,—ট্রেণ ধরিবার জন্য হুড়াহুড়ি করিয়া প্লাটফরমে প্রবেশ করিয়াছিল। ট্রেণ এক মিনিট মাত্র থামে। অনেক "লট-বহর"—তাড়াতাড়িতে যে যেখানে পারিল, উঠিয়া পড়িল। দাসীগুলা কচি ছেলে কোলে, কনে বউরা ঘোমটা ফাঁক করিয়া প্রায় ছুটাছুটি করিয়া যে গাড়িতে একদল ডেলি পাসেঞ্জারের সঙ্গে অজিতনাথ বসিয়াছিল, সেইখানেই উঠিয়া পড়িল। বাড়ির কর্তাগোছের একটি স্থূলোদর বাবু মোটা গলায় হুকুম জারি করিতেছিলেন, "ওগো, মেয়েরা এক গাড়িতে ওঠো। গিন্নি, ও গিন্নি—না, না, এইটেতে,—বিন্দি। তো—মাগীর জ্বালায় অস্থির হয়েছি। হাঁ ক'রে দেখছিস্ কি? চট্ ক'রে উঠে পড়্ না।"

একখানি নিকষ-কৃষ্ণ-প্রস্তরের কালীপ্রতিমার ন্যায় বর্ণশালিনী স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে

গাড়ির দরজা কোনোমতে ঠেলিয়া সামনের বেঞ্চে বসিয়া পড়িয়া খুব চিৎকার শব্দে হাঁক-ডাক লাগাইয়া দিলেন, "ওরে নন্দে। ঐ রামফল। ইধার,—ইধার। ওরে আয়-না সব।"

রমণীর কেশ-বিরল মস্তক হইতে গরদের চাদর খসিয়া পড়ায় তৈলরঞ্জিত টাকটুকু সর্বজনগোচর হইয়া পড়ায় সহযাত্রীদের মধ্যে দুই এক জন ঈষৎ ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি হাসিয়া সরিয়া বসিলেন। স্বেদস্রুতিতে নারীর সর্বশরীরের বসন ভিজিয়া গিয়াছিল। উদ্বেগে, পরিশ্রমে সমস্ত শরীর তাঁহার থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

কোলাহলের মধ্যে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। দুইটা কাপড়ের মোট, ছেলেদের দুধের বোতল কয়টা ও জলের কুঁজা প্লাটফরমে পড়িয়া রহিল, আর রহিলেন, তদারকপবাযণ বাবুর সহিত বাড়ির সরকারটি। ছেলেমেয়েরা দাসীগুলার সুরে সুর চড়াইয়া মহা হল্লা জুড়িয়া দিল। গৃহিণী হাঁপানি-যুক্ত গর্জনে ভগ্ন-কাংস্যের স্বর মিশাইয়া গাড়ির কামরা স্তম্ভিত করিয়া হাঁকিলেন, "বিন্দি হতভাগীর জ্বালাতেই তো এই হ'ল! সং-মাগী কল্লা ক'রে যে দাঁড়িয়ে রইলি, তোকে ডাকাডাকি করতেই তো গাড়ি ছেড়ে দিলে। বাড়ি গিয়ে তোকে যদি না জবাব দি তো আমার নাম নেই। বউমা। তোমারই বা কেমন বে-আক্কেলে কাণ্ডটি বাছা। কচিছেলের মা, ছেলের দুধের বোতলটিব ঝক্কি নিতেও কি পার না। এত নবাবী কেন? এখন খাওয়াও ছেলেকে কি খাওয়াবে। দেখ্ বিষ্ণু। এখুনি পড়ে খুন হবি বলচি, শীগ্‌গির সোরে বস্। মা—মা—মা, এদের জ্বালায় কোথাও গিয়েই সোয়াস্তি নেই। বাড়ি ছেড়ে দুদিন মাযেব কাছে জুড়ুতে গেলুম, তা সঙ্গে চল্‌ল কোটি যদুবংশ। এখন এই সব ঝি-বউ, ছাপ্পান্ন কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে শ্যালদায় গিয়ে ব'সে থাকি গে চল। দুজনের একজনও যে উঠ্‌তে পেলে না। জানি, ও নরে হতভাগাটা যখন সঙ্গে এসেছে, তখন একটা কাণ্ড না হ'যে যায় না।—ওকে নিয়ে কখনও কোনো উবগার আছে যে আজ হ'বে?"

রমণী তীব্র তাপযুক্ত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সকলকাব উপরেই অঙ্গজ্বালা বর্ষণ কবিতে লাগিলেন। অজিতের মনে হইতেছিল, এ যেন স্বয়ং মহিষাসুরমর্দিনী ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়া পাষণ্ড-দলনে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। একা তিনি ভিন্ন এ ক্ষেত্রে সকল লোকেই কুড়ে অকর্মণ্য ও অনাবশ্যক বোঝা মাত্র। ইহাদের কার্য করিবার সামর্থ্য কিছুমাত্রও নাই, এবং কার্য পণ্ড কবিবার শক্তি অপবিসীম। ইহারা যখন সঙ্গে আসিয়াছে, তখন এইরূপ একটা কিছু বিভ্রাট ঘটিবে, ইহা যেন নিশ্চিত হইযাই জানা ছিল।

গাড়ির গতির সঙ্গে সঙ্গে সেই রসনার ক্ষুরধারও সমানে বহিয়াছিল। অজিতের ললিত স্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পূর্বাহ্ণের গোলাপী নেশার আমেজটুকু একেবারেই উবিয়া যায নাই। এই কু-দর্শনা কালিন্দীর কর্কশ কণ্ঠ সেই কুসুম-কোমলার পাশে সে কি হাস্যরসই ফুটাইয়া তুলিয়াছে। মনে মনে হাসিয়া কাছেরই একটি ছোট্ট ছেলেকে ডাকিয়া লইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে মনোযোগী হইল। ছেলেটির গায়ের রং ময়লা হইলেও মুখশ্রীটুকু বেশ। কথা কওয়া যায়।

"তোমার নাম কি খোকা? যষ্ঠীপ্রসাদ? বাঃ, বেশ নাম তো। ভালো নাম জ্যোতিরিন্দ্র? ওঃ, বাড়ি কোনখানে?"

ছেলেটি লজেনজেসগুলি মুখে পূরিয়া এ গালে ও গালে লইযা নাড়িতেছিল। একদিক ভারি করিয়া গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, "কল্‌কেতা।"

"কল্‌কেতা? কল্‌কেতার কোন্‌খানে?"

"আমাদের বাড়ি আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে।"

নীল আকাশের বুক চিরিয়া বিনামেঘে বিদ্যুৎ খেলিলে চাতক যেমন উর্ধ্বে চাহে, অজিত তেমন করিয়াই চাহিল, "ক-ক-কত নম্বর? তোমাদের নম্বরটি কত? নম্বর কাকে বলে, জান তো?"

"জানি। ১২।৫ নম্বর।"

রামগিরির যক্ষ প্রথম আষাঢ়ের মেঘকে কুটজ-কুসুমের অর্ঘ্য দিয়া স্বাগত জানাইয়াছিলেন। ওরে, দুর্ভাগ্য অজিত। তুই এ কোমলকান্তি শিশু দূতটিকে কি দিবি? পকেটে একখানা পকেটবুক ও একটি মণিব্যাগে দুই চারিটি টাকা!—সর্বশরীরের পুলকরোমাঞ্চ বোধ করিয়া কম্পিত কণ্ঠ মৃদুতব করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে কবিতে সে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, "কুমারী কনকপ্রভা সেই বাড়িতেই থাকেন বুঝি? তিনি মলয়া কাগজে লেখেন না?"

ছেলেটি ঘাড় নাড়িয়া খুব গাম্ভীর্যেব সহিত কহিল, "হ্যাঁ, লেখেনই তো। একটা বইও ছাপা হয়েছে যে।—আপনি দেখেছেন?"

"হ্যাঁ দেখেছি,—দেখেছি বই কি। তিনি বুঝি বাড়িতে আছেন? বাড়িতে পূজো হয় বুঝি? তাই তিনি পূজোব আয়োজনে ব্যস্ত আছেন? তোমার দিদি—? না, না, তিনি তোমার দিদি হবেন কি ক'বে?—তবে খুড়তুতো কি না—"

অজিত একটু থামিল। হঠাৎ সে কি বলিযা ফেলিতেছিল—এই কালো কুচ্‌কুচে ছেলেটিব সেই বাণীনিন্দিতা সুন্দবী দিদি?—সেও কি কখন সম্ভব!—সে পাগল না কি?

ছেলেটি ভালো বুঝিল না। সে হাসি হাসি মুখে চোখ তুলিযা অদূববর্তিনী রোষক্ষুব্ধা প্রৌঢ়াব দিকে অঙ্গুলি দিযা দেখাইযা কহিল, "ওই যে আমাব ঠাকু-মা এসেছেন। উনি তো লেখেন—ওঁবই নাম ত কনকপ্রভা।"

এঞ্জিনেব সব ধোঁযাটা কেমন কবিযা কামবাব মধ্যে ঢুকিযা পড়িল। অজিতেব চোখ কর্ কব্ কবিযা উঠিল। বহুক্ষণ চক্ষু বগড়াইযা সে যখন আবাব চাহিতে পাবিল, তখন তাহাব মনে হইল, সমস্ত আলোকোজ্জ্বল বাহিবটাই যেন এক নিমেষে কালিমাখা হইযা গিযাছে।

অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ

ন ষ্ট নি ধি

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

যোজন বিস্তাবে সে গ্রাম—তাতে বসতিব অন্ত নাই। গ্রামেব লোকেবা খায় দায়, গান গায়, ঝগড়া কবে, মনেব আনন্দে থাকে। তাদেব অভাব বেশী নাই, তাই সম্পদের অভাব নাই—মোটেব উপব তাবা সুখী।

কিন্তু তাদেব যত ঘর তত মত। কেউ ভাত খায়, কেউ খায় রুটি, কেউ খায় ছাতু, কেউ খায় মাংস, কেউ উত্তর মুখে খেতে বসে কেউ বসে দক্ষিণ মুখে। কেউ পূজা কবে পূর্ব্ব মুখ হ'যে, কেউ করে পশ্চিম মুখে। একজনের যেটা অখাদ্য আব একজনের সেটা শ্রেষ্ঠ খাদ্য। একজনের কাছে যেটা ভাল, আর একজন বলে তাকে মন্দ। তাই তাদেব ভিতব সমাজের গাঁথুনী কোনও দিনই শক্ত হ'য়ে ব'সতে পারেনি।

একদিন একদল বিদেশী এসে আশ্রয় ভিক্ষা চাইলে। তারা তফাতে একটা মাঠের ভিতর তাদের জায়গা ক'রে দিলে; কিন্তু ঘেন্নায় তাদের স্পর্শ ক'রলে না—কেন না তারা বিদেশী, তাদের রকমসকম সবই বেজায় বেয়াড়া।

বিদেশী তারা তফাতে থাকে, তাদের আপনা-আপনির মধ্যে সলা পরামর্শ করে—ঘুরেফিরে বেড়ায়। ক্রমে দেখা গেল, এ লোকগুলি হঠাৎ ফেঁপে উঠলো। তারা প্রকাণ্ড বাড়ী-ঘর গড়লো, নানারকম যানবাহনের আমদানী ক'রলো, রাজাব হালে চলতে লাগলো।

গ্রামের লোক তখন ছুটে গেল তাদের খবর নিতে; দুয়াবে বসে দ্বারোয়ান তাদের তাড়া ক'রলে। কিন্তু তাতে এরা হ'টে গেল না; মাথা নিচু ক'রে গড় হ'য়ে সেলাম ক'রতে ক'বতে তারা ঢুকে পড়লো সন্ধান নিতে। বিদেশীবা মাটী খুঁড়ে সন্ধান পেয়েছিল একটা মণির খনির। খনি থেকে তারা বস্তা বোঝাই ক'রে মণি বের ক'রে রাতেব অন্ধকাবে চালান কবতো বিদেশে। তাই তাবা ফেঁপে উঠেছিল।

এখন গ্রামের লোকে সন্ধান নিতে এসেছে দেখে তাবা বিচলিত হ'য়ে উঠলো। তখন তাদেব মধ্যে একজন চালাক লোক বেরিয়ে এসে গ্রামেব লোকদের ভাবি মিষ্টি কথা বলে একেবাবে জল ক'রে দিলে।

সে তার স্বদেশীদের বল্লে, "মিছে ভয পাচ্ছ সবাই, ওদেব দিয়ে আমাদের বস্তা বহাবাব ভাবি সুবিধা হ'বে।"

হ'লও তাই। গ্রামেব লোক সব পযসা পাবাব প্রস্তাবে ভারি খুসী হ'য়ে উঠলো। মোট বইবাব মজুরী নিয়ে মনেব আনন্দে বিদেশীদের মণিব বস্তা বহন ক'রতে লাগলো। আব টাকাটা সিকেটা নিয়ে গিয়ে ভারি হাসিমুখে গিন্নিদের দেখাতে লাগলে। মোট বইবার জন্য তাদেব মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে গেল। বিদেশীদের কাঁড়ি কাঁড়ি মণি তাদেব দেশে রপ্তানী হ'তে লাগলো।

বিদেশীবা শুনতে পেলে ওবা সন্ধান পেয়েছে যে, বস্তায মণি থাকে। তাবা আবাব বিচলিত হ'যে উঠলো। তখন তাদের বুদ্ধিমান লোকটি ফটকেব সামনে বেখে দিল দু'তিন পবাত ভ'বে মেঠাই।

গ্রামেব লোক সেদিন একরকম ঠিক ক'বেছিল যে বিদেশীদেব কাছ থেকে মণি কেড়ে নেবে। তাব ভিতর অনেক 'কিন্তু' ছিল। সবাবই মনেব তলায ফন্দী ছিল যে মণিগুলো পাওয়া গেলে আব সবাইকে ঠকিয়ে বা ঠেঙ্গিয়ে সেই সবগুলো কেড়ে নেবে। তবু একরকম ঠিকঠাক ক'রে তাবা দল বেঁধে এলো। দেউড়ির সামনে মেঠাইযেব থালা দেখে যে প্রথম এসেছিল সে সবটা আঁকড়ে ধরলে। তখন তার উপর সবাই তাড়া ক'রে এলো—"ভালবে ভাল এতগুলি মেঠাই তুমি একা নেবে? আমরা কি তবে বথ দেখতে এসেছি?"

তুমুল ঝগড়া লেগে গেল। গালাগাল থেকে হ'ল হাতাহাতি, হাতাহাতি থেকে লাঠালাঠি; অনেক মাথা ফাটলো, অনেক রক্তস্রাব হ'ল, তখন বিদেশী মহাজন ছুটে এসে তাদেব থামিযে দিলে আব মেঠাইগুলো তার পছন্দ মত ভাগ ক'রে দিলে। যাদের বেশী ভাগ হ'ল তাবা পায গড়িয়ে পড়ল, যাদের ভাগে কম পড়লো তাবা গজরাতে গজবাতে চ'লে গেল।

সেইদন থেকে রোজ দেউড়িতে পবাতে ক'রে মেঠাই থাকে, রোজ লোক এসে তাই নিযে কাড়াকাড়ি করে। দেশময় হৈ হৈ পড়ে গেল। হাটে মাটে ঘাটে এ ছাড়া আব কথা নেই। নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা মেঠাইয়ের ন্যায়সঙ্গত ভাগ সম্বন্ধে অনেকগুলি বই লিখে ফেললেন। লাঠিয়ালেবা বল্লে, আমরা ন্যায় জানি না, লাঠি জানি। গরীব ও দুর্ব্বল যারা তাবা কোলাহল ক'রে উঠলো যে যেহেতু আমরা গরীব ও দুর্ব্বল এবং আমাদেরই খাবারের দরকাব বেশী, সেইজন্য এব সবটাই আমাদেব পাওনা। মোট বইবার মজুরী পেয়ে লোকে ক্ষেত খামারের কাজ ছেড়েই দিয়েছিল। মণি পাবাব উৎসাহে তারা মেতে উঠেছিল। এখন সে মণির কথাও ভুলে গেল। মেঠাইয়ের ভাগ নিয়ে ঝগড়া করা ছাড়া আর তারা কোনও কথাই কয় না, কোন কাজই করে না।

গ্রামের লোককে আর মোট বইতে পাওয়া যায় না, তখন পাশের গ্রাম থেকে লোক আসতে লাগলো। তারা বেশী বুদ্ধিমান, ধর্ম্মাধর্ম্মের বড় তোয়াক্কা রাখে না। তারা মোটও বইতে লাগলো আর চাকা চাকা মণিও সরাতে লাগলো। তাদের হাত ছাড়ান বিদেশীদের তত সহজ হ'ল না। শেষ পর্য্যন্ত তারা বখরার বন্দোবস্ত ক'রে নিলে।

গ্রামের লোক মেঠাই নিয়েই ঝগড়া ক'রতে লাগলো। শেষে হঠাৎ একদিন তাবা দেখতে পেল যে বিদেশীদের গ্রামের চাবিপাশ ঘিরে একটা প্রকাণ্ড পাথরের দেয়াল উঠে গেছে। তার কোনও দিক দিয়ে প্রবেশের দ্বার খুঁজে পাওয়া গেল না।

দেয়ালটা মণিব খনি সুদ্ধ ঘিবে ছিল, আর তাব শুধু একটা মুখ ছিল সাগবের দিকে যেখানে জাহাজ বোঝাই হ'য়ে মণি চালান হ'ত বিদেশে।

তখন গ্রামবাসী চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। তখনও মেঠাইয়ের থালা রোজ সাজান থাকতো, কিন্তু তার পরিমাণ বড় কমে গিয়েছিল। তাদেব বড্ড রাগ হ'ল বিদেশীদেব অন্যায় ব্যবহারে, তারা ছুটে গিয়ে সেই পাথবের প্রাচীবে কিল ঘুসি মারতে লাগলো। পাথরেব পাঁচিল সে কিল খেয়ে খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। তখন যে যাব হাতা বেড়ী খুন্তি, ছুঁচ যা পেলে তাই নিয়ে ছুটলে। সব ভোঁতা হ'যে গেল।

ক্ষেত খামাব যখন তাদেব চুলোয় গেছে, মোট বইবাব মজুবীও আব জোটে না, মেঠাইয়ের থালা কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়েছে, তখন ক্ষিদেব চোটে তাদেব বুদ্ধি সাফ হ'য়ে গেল।

তখন তাবা সবাই মিলে কোদাল নিয়ে সুরঙ্গ খুঁড়তে লাগলো। লক্ষ লোক একজোট হ'য়ে দিন বাত কাজ ক'বতে লাগলো। দেখতে দেখতে সুবঙ্গ শেষ হ'যে গেল, তাবা হৈ হৈ ক'বে বিদেশীদেব ঘবেব ভিতব গিয়ে উঠলো।

গিযে দেখলে সব শূন্য—কোথাও কেউ নেই। পাগলেব মত ছুটে গেল তাবা খনিব দিকে। সেখানে কেউ নেই, কিছু নেই। মণিব খনিব শেষ গুঁড়োটুকুও বিদেশীবা নিঃশেষ ক'রে নিয়ে গেছে।

ঘাটের ধাবে গিয়ে তাবা দেখতে পেলে দূবে বিদেশীদেব শেষ জাহাজেব একটু ধোঁয়া মাত্র আকাশে ভাসছে।

তাদেব লক্ষ্মীব ভাণ্ডাব উজাড় হ'যে গেল, তাবা টেব পাবাব আগেই।

প্র ত্যা খ্যা ন

নিরুপমা দেবী

ত্রিতলস্থ গ্যাসালোকিত কক্ষে বসিয়া স্বামীস্ত্রীতে কথোপকথন করিতেছিল। চারিদিকে ঔজ্জ্বল্যের অজস্র সমাবেশ! উজ্জ্বল কক্ষ, বিচিত্র উজ্জ্বল গৃহসজ্জা, দর্পণে দর্পণে আলোকের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব চক্ষু ঝলসিত করিয়া ফেলে। সর্বোপরি দম্পতির উজ্জ্বল সৌন্দর্য, উজ্জ্বল যৌবনে অতুলনীয় শোভা। কিন্তু তাহাদের ললাটে ঘনান্ধকার ছায়া!

সহসা স্ত্রীর ভাবান্তব হইল। সে ললাটেব ছাযা যেন সজোরে অপসারিত করিয়া বিশাল নয়নে হাসির ছটা আনিয়া সাদরে স্বামীব হাত ধরিযা বলিল, "আমার দিব্য, আব অমত ক'রো না; কখনও তোমায় কোনও অনুরোধ করিনি, এই প্রথম, এই শেষ, এইটি রাখ।" স্বামী মুখ তুলিলেন। সনিঃশ্বাসে বলিলেন, "এই অনুরোধ কি উচিত প্রফুল্ল?" "কেন উচিত নয়? গুরুজনের মনস্তাপ, এত বড়ো বংশ-লোপ, এতেও কি এ অনুরোধ করা যায় না? আমিই কি এত বড়ো যে আমার জন্য এমন কাজ হবে? বাপ মা চোখের জল ফেল্‌ছেন দেখ্‌ছ, এতেও কি তুমি এ কাজ উচিত মনে কর না?"

"শুধু কি তোমারি জন্য প্রফুল্ল, আমার নিজের অশান্তি কি এতে নেই?" "হ'লই বা, এত

কর্তব্যের অনুরোধেও যদি তুমি নিজে এটুকু সহ্য না কর, তো তুমি পুরুষ কিসের?" "কিন্তু আর একটা যুক্তি তো আছে, পোষ্য পুত্র নিতে আপত্তি কেন কর?" "আবার সেই কথা আমি একটি নিজের ছেলে চাই, পরের ছেলে কি তেমন হয়?"

"তবে আর কোনও উপায় নেই প্রফুল্ল?" "উপায় কিসের? বেশ একটি ছোটো বোন আস্‌বে, আমার দোসর হবে, এতে আবার চিন্তা কি?" স্বামী তারাচরণ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তারপরে? সতীনকে স্বামীর ভাগ দিতে পারবে তো? তাতে হিংসা হবে না?" "হিংসা হবে! আমার ধনে সে বড়ো মানুষ হবে আমি তার হিংসা করব, আমি কি এমন দরিদ্র?" তারাচরণ স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন। "ওতে আর আমি ভুল্‌ছি না; বল, বিয়ে করবে বল? কালই আমি মাকে বল্‌ব।" "আর দুদিন যাক্ প্রফুল্ল!" "আর একদিনও যেতে দেওয়া নয়।"

২

গৃহিণী কর্তাকে সুসংবাদ দিলেন পুত্রের বিবাহে মত হইয়াছে। আরও বলিলেন, "বৌমা বললেন তাঁর বাপের বাড়ির কাছে একটি গরিবের মেয়ে আছে, বাপ নেই, মেয়েটি নাকি বেশ সুশ্রী শান্ত শিষ্ট; সেই মেয়েটি ঠিক কর।"

প্রফুল্লমুখী হাসিতে হাসিতে স্বামীকে গিয়া সংবাদ দিল। তারাচরণ নীরবে রহিলেন। প্রফুল্ল দুই হাতে স্বামীর মুখ তুলিয়া বলিল, "অত মুখ ভারি কেন? আমাকে সুখী দেখেও কি আনন্দ হচ্চে না?" "এখনো বোঝ প্রফুল্ল, বড়ো ভুল কব্‌ছ।" "কিসের ভুল, মিছে ব'কো না।"

"দেখ যাকে বিয়ে কর্‌ব তার ওপরেও তো একটা কর্তব্য আছে, তার ওপরেও একটু মায়া করা উচিত, সে যে নির্দোষী বালিকা।"

"কেন তুমি তাকে আমারি মতো ভালোবাসবে!"

"তুমি পাগল। মানুষ কি কখনো দুদিক সমান রাখ্‌তে পারে?"

"না রাখ্‌তে পার তুমি সেই দিকেই ভার দিও। আমি তাতে রাগ করব না।"

বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। আমোদের বিবাহ নয়, ধুমধাম হইবে না। এ বিবাহে কর্তা গৃহিণী হইতে মায় চাকর দাসী পাড়া প্রতিবেশী পর্যন্ত দুঃখিত। ক্রমে বিবাহের দিন নিকট হইল। মাথায় টোপর দিয়া গম্ভীর মুখে ফেটিঙে চড়িয়া তারাচরণ বিবাহ করিয়া আসিল।

বর কনে ছানলাতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বরণ কবিতে আসিলেন। অগ্রে অগ্রে বানারসী-পরা আপাদমস্তকমণ্ডিতা হাস্যধারা প্রফুল্লমুখী। সমাগতা আত্মীয়াগণও দেখাদেখি চোখ মুছিতেছিল। প্রফুল্ল অগ্রসর হইয়া প্রথমে নব-বধূর মুখ দেখিল। তাব পরে নিজ গাত্র হইতে বহুমূল্য অলংকারগুলি উন্মোচন করিয়া সপত্নীকে সাজাইয়া দিতে লাগিল। চারিদিকে তুমুল ধ্বনি উঠিল, "ওমা একি! এ যে সত্যি কাল! মেয়েমানুষে কি সতীনকে এমন করতে পারে?—" বাধা দিয়া হাস্যমুখে প্রফুল্ল বলিল, "কেন তোমরা বারে বারে সতীন্ সতীন্ বল্‌ছ, কল্যাণী আমার ছোটো বোন!" গৃহিণী বলিলেন, "ও বাবা তারা, যাস্‌নে, বরণটা করে নিই অলক্ষণ হবে, ও বাবা!"— তারাচরণ বাহিরে চলিয়া গেলেন।

তার পরে বধূ দেখা হইল। সকলে নীরবে রহিল। বধূ যদিও বেশ সুশ্রী কিন্তু, প্রফুল্লের মতো নয়। কেবল গৃহিণী বলিলেন, "বেশ শ্রী, চোখ দুটি বড়ো শান্ত। পাকা চুলে সিঁদুর পর মা। আর যার জন্য তোমায় আনা, সেই আশা আমার পূর্ণ কর মা। আর কিছু চাই না।" সকলেই গৃহিণীর কথায় সহানুভূতি প্রকাশ করিল, "তা বইকি মা, তোমার অমন সতীলক্ষ্মী দুর্গার মতো বউ থাক্‌তে কি সাধ ক'রে এ কাজ করলে? তা যা হবার হয়েছে এখন প্রাতঃ বাক্যে বলি, একটি খোকা হোক্,

তাহলেই সৃষ্টি রক্ষা পায়, নইলে বৌয়ে দরকার কি মা? ছেলের জন্যেই তো?"—ইত্যাদি।

পাকস্পর্শাদি হইয়া গেল। তারাচরণ নিজ কক্ষে বসিয়া কি পড়িতেছিলেন। প্রফুল্ল গিয়া বলিল, "মুখটা একবার তোল," তারাচরণ ব্যাপার কি বুঝিতে পারিয়া পুস্তকে দ্বিগুণ মনঃসংযোগ করিলেন। "এত ভয়? চেয়েই দেখ না, আমি তোমায় মন্দ জিনিস দিইনি।" তারাচরণ নীরবে রহিলেন। "চাইবে না?" তারাচরণ চেয়াব হইতে উঠিয়া পড়িলেন, "কাজ আছে, আমি নীচে চল্লাম।"—হাত ধরিয়া ফেলিয়া সহাস্য মুখে প্রফুল্ল বলিল, "আর পালিয়ে কাজ নেই, যাকে এত ভয় সেই যাচ্ছে; যাও ত কল্যাণ। অন্ন ঠাকুরঝির কাছে যাও।" বলিতে কল্যাণী চলিয়া গেল। "নাও এখন, ব'স, সব কাজেই কি বাড়াবাড়ি?"

"আমার না তোমার।"

"বটে, বিয়ে করেছ! কথা কবে না?"

"সে তো তোমার সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে, তার দায়ী তুমি।" মৃদু হাসিয়া স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া প্রফুল্ল বলিল, "কেন আব কাউকে পছন্দ হয় না নাকি?" "না"—বলিয়া তারাচরণ পত্নীর মুখচুম্বন করিলেন।

৩

অন্ন ঠাকুরঝি একজন কুটুম্ব-কন্যা, বিধবা; চিরকাল সে সেইখানেই পালিত; নব-বধূ কল্যাণী দ্বিতলের একটি নিভৃত কক্ষে তাহার নিকটে শয়ন করিত। অন্নও তাহাকে সকলের অপেক্ষা একটু বেশি মমতা করে, অন্ততঃ কল্যাণীর তাহাই বিশ্বাস।

সুখও নাই, দুঃখও নাই, এমনি ভাবে কল্যাণীর দিনগুলা কাটিয়া যায়। গরীবেব মেয়ে, কাজকর্ম কবিতে না জানে এমন নয়; প্রভাতে অন্ন ঠাকুরঝিব সঙ্গে কুট্‌নো কুটিতে গেলে প্রফুল্ল আসিয়া হাত ধবিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। "ছিঃ বোন! তুমি কেন কাজ কববে।" কল্যাণী মৃদু স্বরে বলিল, "তবে কি করবো?" "কি আর করবে? তোমার ঝিকে ডেকে দিই, ব'সে গল্প কর, তাস টাস খেল।"

ঝি ঘর ধুইতেছে, কল্যাণী ঝাঁটা লইতে যাওয়ায় সে হাসিয়া গলিয়া পড়িল। গৃহিণী শুনিয়া বলিলেন, "তোমার করতে নেই মা, তুমি উপরে থাক গে।" কল্যাণী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। রন্ধন গৃহে বামনদিদি রাঁধিতেছেন, কল্যাণী গিয়া নিকটে বসিল। বামনদিদি আস্তে আস্তে তাহাব হাত ধরিয়া তুলিল, "সে কি ছোটো বৌ। ধোঁয়া লেগে অসুখ করবে যে!" অন্ন ঠাকুরঝি সস্নেহ কণ্ঠে বলিল, "এখানে ওসব করে না, তুমি তোমার দিদির কাছে রেশম কি জরি বোনা শেখগে।" কল্যাণী প্রফুল্লের কাছে আবেদন করিলে সে, হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার এসব কষ্ট ক'রে কিছু শিখ্‌তে হবে না বোন! আমি যা জানি তাতেই তোমার হবে; তুমি এখন শুধু একটি খোকা দিতে পারলেই আমাদের সব কষ্ট দূরে যায়। তোমার আর কিছু করবার বা শিখ্‌বার দরকার নেই বোন্।" কথাগুলা অবশ্য খুব ভালোবাসারই, কিন্তু নির্বোধ কল্যাণী হয়ত তাহা বুঝিতে পারে না, তাই নীরবে ম্লান মুখে নিজের কক্ষের কোণটিতে গিয়া বসে।

কাজও নাই, কর্মও নাই; একটু ভুলিয়া থাকিবার কোনো উপায় নাই; তাই কেবল মায়ের সেই স্নেহভরা মুখ মনে জাগিয়া উঠে। স্নেহপ্রার্থী তৃষিত বালিকা-হৃদয় তাই কেবলই হাহাকার করিতে থাকে।

বৈকালে চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে প্রফুল্ল বলিল, "মুখ অত শুক্‌নো কেন, কল্যাণী!" কল্যাণী কি উত্তর দিবে? তাই চুপ করিয়া রহিল। তাহার যে মুখ শুক্‌নো সে ত তা বুঝিতে পারে না। চুল বাঁধা হইলে প্রফুল্ল বলিল, "একটু ব'স তো, আমি আসছি।" প্রফুল্লের প্রস্থানের পর দাসী জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ছোটো বউদি। দাদাবাবুর সঙ্গে তোমার ভাব হয়েছে?" কল্যাণী সলজ্জ ভাবে মস্তক

অবনত করিল। "বল না, লজ্জা কি? কি কথা হয়েছে?" কল্যাণী মৃদু স্বরে বলিল, "আমি ঠাকুরঝির কাছে থাকি।" "তা দাদাবাবু তোমায় একদিনও ডেকে কথা কন নি?" "না।" দাসী প্রীতভাবে বলিল, "আহা, তিনি কি সাধে বিয়ে করেছেন? ছেলে না হওয়াতেই তো এমনটা ঘট্‌ল; অমন স্ত্রী থাক্‌তে কি আর কাউকে স্ত্রীর মতো কেউ ভাব্‌তে পারে, না, তাই ভদ্দরের কাজ!" তা ত সত্যই! কল্যাণী নির্বোধ হইলেও তাহা বুঝিতে পারে। সে নীরব নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিল।

৪

রাত্রি দশটার পরে তারাচরণ শয়নকক্ষে গিয়া দেখিলেন, প্রফুল্ল তখনো আসে নাই। অর্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল; বিরক্ত হৃদয়ে তিনি শয্যার দিকে ফিরিয়া সহসা দেখিলেন, দ্বারের নিকটে অবগুণ্ঠনবতী বেপমানা বালিকা! তারাচরণের বুকের মধ্যে অনেকখানি রক্ত চট্‌ করিয়া যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিল। বুকের মধ্যে কি রকম শব্দ হইতে লাগিল। কি করিবেন, স্থিব করিতে না পারিয়া, তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কল্যাণীও রহিল।

কিছুক্ষণ পরে তারাচরণ বলিলেন, "প্রফুল্ল কোথায়?" কল্যাণী উত্তব দিল না। "প্রফুল্ল কোথায়?" অস্ফুট শব্দ হইল, "নীচে!" তাবাচরণ কিছুক্ষণ পবে বলিলেন, "তোমায সেই বুঝি পাঠিয়েছে?" "হ্যাঁ।" "তুমি নীচে যাও গিয়ে তাকে ডেকে দাও গে।" কল্যাণী চলিয়া গেল। বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে তখন কি হইতেছিল, কে জানে? তাবাচরণও একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিমনা ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পার্শ্বের কক্ষ হইতে অল্প হাসি-মুখে অথচ গম্ভীর ভাবে প্রফুল্ল আসিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল,—"ছিঃ ছিঃ। এ কি অন্যায়; জান ও তোমার স্ত্রী। ওকে আমবা সুখ দেব বলে এনেছি, কষ্ট দিতে নয়, তোমার এমন তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। ছেলেখেলাব জন্যে তো আমি এমন কাজ করিনি; তুমি জান কি কর্তব্যের জন্য তুমি বিয়ে কবেছ; সেই জন্য আমি আমার সর্বস্ব—তোমার অংশও তাকে ছেড়ে দিয়েছি, আর তুমিও সেই কর্তব্য মনে ক'বে তাকে ভালোবাসবে না? আদর করবে না?" তারাচরণ নির্বাক রহিলেন। তখন স্বামীর গলা ধরিয়া আদবের স্বরে প্রফুল্ল বলিল, "রাগ করেছ?"

"না প্রফুল্ল, সত্যই তুমি আজ আমায় উপদেশ দিলে, আমি তোমাব আদর্শে চল্‌ব।" স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রফুল্ল বলিল, "আমার আদর্শ? অমন কথা বলো না। তোমায় সত্য কথা বলি। আমি যতটা দেখাই সত্যই আমি কল্যাণীকে তত ভালোবাসি না। সত্যই আমি তাকে যে আমার পঞ্জরভেদী দীর্ঘশ্বাসেব মতো ভাবি না সে শুধু কর্তব্যের জন্য, আমাব নিজের জন্য, তোমার জন্য। তোমার ভালোবাসার অটল শিখরে দাঁড়িয়ে আছি বলে তার দিকে আমি একটু দয়া দেখাতে চাই। আমার একটু স্নেহকণায় যদি একটা জীবন উঁচু হয়ে ওঠে তো সেটুকু দেওয়াতে কষ্ট কি? বরং তাতে আনন্দ নয় কি? তুমি তাকে আর তাচ্ছিল্য ক'রো না।"

তারাচরণ পত্নীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "যাব এমন মন্ত্রী পাশে, তার বুদ্ধির ভাবনা কি? তাই হবে।"

কক্ষান্তর হইতে কল্যাণী তখনো পলাইতে পারে নাই। নীচে যাইতে লজ্জা করিতেছিল। এইবার সে ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

পরদিন রাত্রে তারাচরণ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শয্যায় কল্যাণী ঘুমাইতেছে। তারাচরণ দ্বার রুদ্ধ করিলেন, সন্তর্পণে শয্যার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। বালিকা অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। মসৃণ ক্ষুদ্র ললাটে দিবালোকে বিষাদের কুঞ্চন রেখা ফুটিয়া উঠে, এখন তাহা নির্মল সমতল। তারাচরণের মনে পড়িল সেই অতি শান্ত অব্যক্ত বিষাদ মাখা সুন্দর চক্ষু দুইটি; অস্ফুট

স্বরে ডাকিলেন, "কল্যাণী।" নিজের কর্ণে নিজের স্বর প্রবেশ করায় তারাচরণ লজ্জিত ক্ষুব্ধ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। "ছিঃ ছিঃ! প্রফুল্লের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা।" গৃহের গ্যাসালোকে চাবি টিপিয়া দিলেন, গৃহ অন্ধকার হইল। শয্যার উপরে বসিতে পালঙ্ নড়িয়া উঠিল, নিমেষে কল্যাণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, ডাকিল, "ঠাকুরঝি।" কোনো উত্তর আসিল না। "ঠাকুরঝি এসেছ! বড়ো অন্ধকার, আলো কি নিবে গেল?" স্বর বড়ো করুণ, ভীতিজনক; বালিকা অস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল, নিকটে একজন লোক, অথচ উত্তর দেয় না। "দিদি কি?" উত্তর নাই। সভয়ে বালিকা বলিল, "ও মা—" তারাচরণ ভীতা বালিকার হস্ত স্পর্শ করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "ভয় কি? আমি!" কল্যাণী শিহরিয়া উঠিল। মনে পড়িল প্রফুল্ল তাহাকে এই ঘরে আনিয়া গল্প করিতে আরম্ভ করে। কল্যাণী শয্যা হইতে নামিতে চেষ্টা করিল। "অন্ধকারে পড়ে যাবে, শুয়ে থাক।" কল্যাণী দ্বার খুলিতে চেষ্টা করিল, পারিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারাচরণ পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া বলিলেন "অনেক রাত্রি হয়েছে, উঠে এসে ঘুমোও।" বহুক্ষণ পরে অগত্যা কল্যাণী গিয়া শয্যাপ্রান্ত গ্রহণ করিল।

তার পরে ধীরে ধীরে বৎসর ঘুরিয়া গেল। এক রকমে সকলেরি দিন কাটিতে লাগিল। প্রফুল্লের প্ররোচনায় কল্যাণী মধ্যে মধ্যে স্বামীর শয্যাভাগিনী হইত। তারাচরণেরও তাহাকে ক্রমে সহিয়া গেল।

৫

মহা ধুমধাম। সুবৃহৎ গেটের দুই পার্শ্বে মঙ্গল কলস ও কদলীবৃক্ষ। মধুর রাগিণীতে নহবত বাজিতেছে। দলে দলে কাঙালীরা নববস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া কোলাহল করিতেছে। দুর্গাচরণ বাবুর অদ্য সফল জীবন, তারাচরণের পূর্ণমনস্কাম, সকলের প্রাণে আনন্দের তুফান তুলিয়া অদ্য তাঁহাদের একটি বংশধর জন্মিয়াছে। কল্যাণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে।

প্রসূতির কিন্তু বড়ো সংকটাপন্ন অবস্থা। সন্তানপ্রসবের পরেই দুর্বলতায় সে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞানোন্মেষের পরেও তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলে শঙ্কিত হইল। প্রফুল্ল আঁতুড় ঘরে গিয়া নবপ্রসূত সন্তানকে কোলে লইয়া বসিল। নিভৃতে তারাচরণকে ডাকাইয়া পুত্র দেখাইয়া প্রফুল্ল হাসিমুখে বলিল, "কেমন হয়েছে?" তারাচরণও তেমনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেশ, বড়ো সুন্দর মানাচ্চে।"

"কিসে?"

"তুমি কোলে নিয়ে আছ বলে। মনে হচ্ছে যেন তোমারি হয়েছে—"

"নয় কিসে?" ঈষৎ গম্ভীরমুখে তারাচরণ বলিলেন, "তা'হলে আর দুঃখ কিসের ছিল।?" শায়িতা ক্লিষ্টা কল্যাণী অবগুণ্ঠনের অন্তরালে একবার স্বামীর পানে চাহিতে চেষ্টা করিল। প্রফুল্ল হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার বড়ো ছোটো মন!"

ধুমধামে ষষ্ঠীপূজা হইয়া গেল। কল্যাণী অনেক যত্নে কিছু সুস্থ হইল বটে, কিন্তু বড়ো দুর্বল বলিয়া ডাক্তারে ধাত্রী দ্বারা সন্তান পালনের ব্যবস্থা দিল। শাশুড়ী বলিলেন, "কেন আমার বড়ো বৌমা মানুষ করবে। সে কোল ওরই।" প্রফুল্লের ক্রোড়ে নবকুমার কমল-কলিকার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বৈকালে কল্যাণী নিজ কক্ষে শুইয়াছিল। নিকটে বসিয়া অন্ন ঠাকুরঝি ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছিল। মস্তিস্ক তাহার সর্বাপেক্ষা দুর্বল—দাঁড়াইতে গেলে মাথা ঘোরে। খোকাকে লইয়া প্রফুল্ল সে কক্ষে প্রবেশ করিল। পশ্চাতে ব্যজনী হস্তে দাসী। "দ্যাখ্ কল্যাণী, খোকা কত হাস্‌ছে! ওমা এর মধ্যে এত হাসতেও শিখেছে, দ্যাখ্ দ্যাখ্!" কল্যাণী চাহিয়া বলিল, "হু।" "আচ্ছা অন্ন-ঠাকুরঝি, খোকার ঠিক ওঁর মতো মুখ হয়নি?" "অনেকটা হয়েছে বটে।" "এই নিয়ে আমার সঙ্গে রোজ তর্ক হয়—খোকা ঠিক ওঁর মতো হবে।" দাসী বলিল, "হ্যাঁ তেমনি মুখ, তেমনি ভাগ্যিমানের

মতো মস্ত কপাল।"—প্রফুল্ল শিশুকে চুম্বন করিল। অন্ন বলিল, "হ্যাঁ তবে এখন মা-টি ভালো হলেই হয়,—হয়ে অবধি মার অসুখ, একদিন মাই খেতে পেলে না। প্রফুল্ল হাসিতে হাসিতে বলিল, "তাতে কি ওর কিছু কষ্ট হয়েছে ঠাকুরঝি? ও কি এখন কে মা, কে নয়, তা বুঝেছে?" অন্ন অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না না তাকি বলছি, ছোটো বউ'র কি তোমার মতো যত্ন কত্তে সাধ্যি হ'ত, তা নয়—" বাধা দিয়া দাসী বলিল, " পেটে হলে কি হয়, বড়ো বৌদিই তো হ'ল আদত মা, ছেলের জন্যেই তো ছোটো বৌদিদিকে আনা—ও তো খোলস বই নয়। ভগবান না করুন ছোটো বৌদির ভালো মন্দতে কি ওর ভাগ্যি ছোটো হবে?" প্রফুল্ল ঈষৎ রুষ্ট ভাবে বলিল, "কি বলিস্ তার ঠিক নেই, বালাই।" তারপরে কল্যাণীর মস্তকে হস্ত দিয়া বলিল, "আজ কেমন আছ কল্যাণী?"' "ভালো আছি।" "ক্রমশঃই ভালো হবে। খোকাকে একটু নেবে কল্যাণী?" "না, আপনার কোলেই থাক।"

৬

তখন সূর্য অস্ত যাইতেছে। বারান্দাটি নির্জন, বড়ো শান্তিপূর্ণ। রেলিং ধরিয়া কল্যাণী নীরবে কত কি ভাবিতেছিল। চারি মাস খোকা হইয়াছে, ইহার মধ্যে সে একবারও স্বামীর মুখ দেখিতে পায় নাই। এতটা যে অসুখ গিয়াছে, তিনি একদিনও দেখিতে আসেন নাই। অসুখের জন্য যদিও এমন কেহ চিন্তিত হয় নাই, তথাপি দেখিতে তো সকলে আসিত। কল্যাণীর মনে হইল, সামান্য একটা দাস দাসীরও ব্যারাম হইলে স্বামী তাহার তত্ত্বাবধান করেন। ধীরে ধীরে তাহার নাসাপথ হইতে একটা মৃদু অথচ দীর্ঘকালবাহী নিঃশ্বাস বহিয়া গেল। অন্য মনে কল্যাণী রেলিং ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল। সহসা কাহার কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিল। থমকিয়া দাঁড়াইয়া কল্যাণী গবাক্ষপথে গৃহমধ্যে চাহিয়া দেখিল, একখানা কৌচের উপর বসিয়া তারাচরণ, তাঁহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া প্রফুল্ল অর্ধশায়িতাবস্থায় বসিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া হাসিতেছিল। তারাচরণ প্রেমভরে তাহার মুখখানা দুই হাতে ধরিয়া মুখের কাছে রাখিয়াছেন। দুই জনে কত কথা হইতেছিল ; তাহার ছত্রে ছত্রে বর্ণে বর্ণে ভালোবাসা যেন উছলিয়া উঠিতেছে। লুব্ধ তৃষিতনয়নে কল্যাণী চাহিয়া রহিল। তাহার ক্ষুদ্র বক্ষের মধ্যে রক্তটা তোলপাড় করিয়া তুলিতে লাগিল। নিম্নে উদ্যান হইতে বাহিত মৃদুল সুবাস তখন চারিদিকে দুরাশার স্বপ্ন সৃষ্টি করিতেছিল।

দাসী কক্ষ মধ্যে আসিয়া খোকাকে দিয়া গেল। পতি-পত্নীতে শিশুকে আদর করিতে লাগিল। প্রফুল্ল বলিল, "কল্যাণী আজ ভালো আছে, জ্বরটা হয়নি।" তারাচরণ কিছু বলিলেন না। "আচ্ছা খোকার কি নাম হবে? ভাতের তো আর বেশি দেরি নেই।"

"তুমি পছন্দ কর না।"

"অমূল্যকুমার বেশ নাম নয় কি! বেশ অমু অমু বলে ডাকব।"

"বেশ নাম, তাই রেখো। বড্ড তো হাস্‌তে শিখেছে, দ্যাখ, দ্যাখ।" উভয়ে যুগপৎ শিশুকে চুম্বন করিলেন। তার পরে তারাচরণ ফিরিয়া প্রফুল্লকে চুম্বন করিলেন। প্রফুল্ল হাসিয়া উঠিল। কল্যাণী সরিতে চেষ্টা করিল, পারিল না।

প্রফুল্ল বলিল, "এইবার বোধ হয় কল্যাণী সার্‌বে। মধ্যে মধ্যে যে ভাবনাটা হ'ত।" তারাচরণ একটু থামিয়া বলিলেন, "এমন বেশি ভাবনার কথা কি? আমাদের যার প্রয়োজন ছিল তাতো পাওয়া গেছে।"

"ছিঃ ছিঃ, এমন কথা কি বল্‌তে আছে?"

কল্যাণী ধীরে ধীরে রেলিং ধরিয়া ধরিয়া নিজ কক্ষে ফিরিয়া গেল। কক্ষ-মধ্যে তখন অন্ধকার। উপুড় হইয়া সে শয্যার উপরে শুইয়া পড়িল, হায় মানবের অভাব। তুমি যে যথার্থ কি, তাহা বুঝিলাম না। প্রফুল্ল যখন ক্রোড়স্থ শিশুকে দোলাইতে দোলাইতে স্বামীর বক্ষে মাথা রাখিয়া ভাবিতেছিল,

"কল্যাণী কি ভাগ্যবতী।" তখন অন্ধকার কক্ষে শয্যার উপরে লুটাইয়া কল্যাণী অপরের সৌভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল।

পরদিন প্রফুল্লকে অন্ন বলিল, "রাত্রে ছোটো বৌ'র বড়ো জ্বর হয়েছিল।—এখনো ওঠেনি।"

৭

উপযুক্ত সমারোহের সহিত খোকার অন্নপ্রাশন হইয়া গেল। নাম হইল অমূল্যকুমার।

কল্যাণী ক্রমশঃ শয্যায় সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল। ডাক্তার দেখে, ঔষধ খায়, সুনিয়মে চিকিৎসা হয় তথাপি অসুখ সারে না। সকলে ভাবে, "অতি সুখ বুঝি মানুষের সয় না। নইলে যারা ভাগ্যিমানি, তারাই ব্যারামে বেশি ভোগে কেন?"

অন্ন নীচে কার্যান্তরে নিযুক্তা। কল্যাণী নিজ কক্ষে একেলা শুইয়াছিল। জানালা দিয়া বাতাস আসিয়া রোগপাণ্ডুর মুখের উপর ছড়ানো রুক্ষ চুলগুলো লইয়া খেলা করিতেছিল। মুদিত চক্ষে কল্যাণী শুইয়াছিল। সহসা ললাটে কাহার শীতল হস্ত স্পৃষ্ট হইল,—চাহিয়া দেখিল স্বামী।

নিকটে বসিয়া তারাচরণ বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন; তার পরে মৃদুস্বরে বলিলেন, "কেমন আছ, কল্যাণী?" কল্যাণীর অভ্যস্ত "ভালো আছি"—উত্তর আজ মুখে আসিল না। কল্যাণীর বোধ হইল, স্বরটা বড়ো স্নেহসিক্ত। একবার বিস্ফারিত চক্ষে স্বামীর মুখের পানে চাহিল, চক্ষু নত হইয়া গেল, সঙ্গে দর দর ধারে জল গড়াইয়া পড়িল। ব্যথিত প্রশ্ন হইল, "কাঁদ কেন কল্যাণী? ডাক্তার বলেছে শীগ্‌গিরই ভালো হবে।" নিঃশ্বাস ফেলিয়া কল্যাণী বলিল, "আর ভালো হয়ে কি হবে?"

"কেন কল্যাণী—ভালো হবে বই কি।"

"না—না আর নয়, আমার কাজ তো ফুরিয়েছে, আর বেঁচে কি হবে?" তারাচরণ চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কল্যাণীর শীর্ণ হস্ত নিজ হস্তে ধরিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন "ও কি কথা কল্যাণী! ও কথা কেন বল্‌ছ?" কল্যাণী পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া শুইল; চোখে বড়ো জল আসিয়াছিল। সাদরে তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে তারাচরণ বলিলেন, "কল্যাণী, অমন ক'রে রয়েছ কেন? বড়ো কি কষ্ট হচ্চে?" "হ্যাঁ"। "কি কষ্ট হচ্চে?" অতি কষ্টে কল্যাণী বলিল, "মাথাটা বড়ো কেমন কচ্চে।" "এই গন্ধটা শোঁক দেখি, মুখ ফিরিও না গন্ধটা নাকে যাক্।" মস্তিষ্ক-স্নিগ্ধকর মধুর সুবাসে কল্যাণী অনেকটা প্রকৃতিস্থা হইল। মৃদুস্বরে বলিল, "আর না এখন ভালো হয়েছে।" কল্যাণী হাত দিয়া শিশিটা একটু ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেই তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া তারাচরণ স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন, "সরিয়ে দিও না। আমার এই সামান্য সেবাটুকু আজ নাও তুমি!"—কল্যাণী পূর্ণ চক্ষে স্বামীর পানে চাহিল। নির্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপে একি অজস্র স্নেহধারা নিষেক? মরণোন্মুখ লতায় কেন আর এই শীতল বারি বর্ষণ? কল্যাণী চোখ বুঁজিল। "নাও কল্যাণী, আমার এই প্রথম তোমায় একটু দিতে আসা—নেবে না?" কল্যাণী সজোরে চক্ষু মেলিল। উচ্চ কণ্ঠে বলিল,—"না না—নেব না। তুমি যাও—তুমি যাও, এখন আর কেন তুমি এসেছ? আর তো আমাকে দরকার নেই।" উচ্ছ্বাসের আবেগে শীর্ণদেহা দুর্বল-মস্তিষ্কা কল্যাণী মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

৮

ক্রমশঃ কল্যাণী দিনে দিনে নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল। আর বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। বেশি কথা কহিতে পারে না। সন্ধ্যার পর মৃদু আলোকে অন্ন বসিয়া কল্যাণীর জন্য গ্লাশে ঔষধ ঢালিতেছিল। কল্যাণী সহসা মোহের ঘোরে বলিয়া উঠিল, "আর এসো না—আমি আর চাই না।" "কি বল্‌ছ কল্যাণী?" "তিনি বুঝি চলে গেলেন ঠাকুরঝি? রাগ করে গেলেন?"

"ওকি বল্‌ছ কল্যাণী—অমন করছ কেন? ওষুধ খাও।"

"ওষুধ? আর পারি না ঠাকুরঝি।" "না খেলে কি অসুখ সারে?" "অসুখ? অসুখ আর সারানো হবে না ঠাকুরঝি।—আমাকে যে আর দরকার নেই বলে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছি—আর বাঁচিও না।"

"বালাই তোমার কিসের দুঃখ, তুমি রাজরাণী রাজমাতা।"—কল্যাণী মৃদু হাসিল।

দ্বিপ্রহর রাত্রে কল্যাণী বড়ো ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। অন্ন সভয়ে গিয়া গৃহিণী ও প্রফুল্লকে ডাকিয়া আনিল।

প্রফুল্ল আসিয়া কল্যাণীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিল। গৃহিণী বাতাস করিতে লাগিলেন। কল্যাণীর চঞ্চলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। "কেন দিদি অমন করছ?" কল্যাণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "বড়ো কষ্ট।" কর্তাকে ডাকানো হইল। ডাক্তার আনিতে লোক ছুটিল। বাড়িতে একটু সোরগোল পড়িয়া গেল। প্রফুল্ল বলিল, "কল্যাণী অমুকে কোলে নেবে?" "না দিদি!" গৃহিণী ভগ্ন কণ্ঠে বলিলেন, "আনুক না; মা নাও একটু!" কল্যাণী একটু জোরে বলিল, "না দিদি, আমায় একটু শান্তিতে মরতে দাও। তার কথা একটু ভুলতে দাও দিদি! সে কেন তোমার পেটে হ'ল না?"

"কল্যাণী, থাম।"

"ছোটো থেকে, যেদিন এ বাড়িতে পা দিয়েছি, শুনে আস্‌ছি তার জন্যেই তোমরা আমায় স্নেহ কর, কেন, আমি কি কেউ নই দিদি? আমায় তোমরা ভালোবাস না? আমায় তোমরাই তো এনেছ? আমি কিসে দোষী দিদি?" গৃহিণী অশ্রুপূর্ণ চক্ষে বলিলেন, "ষাট্ বালাই! তোমায় কে ভালোবাসে না মা? তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী।"

"না না, আমি কেউ নই, আমি কেউ নই!"—ডাক্তার আসিয়া বলিল, "পূর্ণ বিকার। প্রলাপ হইয়াছে।" গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "অন্ন, তারাচরণকে ডাক্।" অন্ন কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। কল্যাণী ক্ষণে ক্ষণে দ্বারের দিকে চাহিতেছিল; জ্ঞান তখন ভালো ছিল না।

"দাদাবাবু এলেন না, জ্যাঠাইমা!—নীচে চলে গেলেন।" গৃহিণী অশ্রু মুছিলেন। দাসী আসিয়া ডাকিল, "বৌদি! খোকা বড়ো কাঁদ্‌ছে থামাতে পাচ্চি না শীগ্‌গির এসো।" প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কল্যাণী প্রলাপ ঘোরে বলিল, "দিদি! দিদি। কই এলেন না? তিনি যে এসেছিলেন—আমি যেতে বলেছি, তাঁকে ডাকো আর যেতে বলব না।" কেহ আসিল না।

অন্ন মুখের উপর পড়িয়া বলিল, "কল্যাণী কল্যাণ—কি বল্‌ছ?"

অর্ধস্ফুট স্বরে কল্যাণী বলিল, "এস, আর যেতে বলব না, এস।"

'শালেয়া'

ঠা কু র ঝি

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নীরজা রান্নাঘরে ঝোল সাঁৎলাইতেছিল, শিবপ্রিয়া পা টিপিয়া অলক্ষ্যে আসিয়া তাহার মুখে খানিকটা মোহনভোগ পুরিয়া দিল। নীরজা ঘাড় ফিরাইয়া অনুযোগের সুরে কহিল, "ও কি ভাই ঠাকুরঝি!"

শিবপ্রিয়া হাসিয়া কহিল, "কিছু মুখে দাও দেখি। নিজে থেকে ত কখনও খাবার ফুরসৎ হতে দেখলুম না!"

নীরজা হাত ধুইয়া ধোয়া জল কড়ায় ঢালিয়া সরিয়া আসিল, কহিল, "এই যে ঝোলটা নাবিয়ে রেখেই খেয়ে নিচ্ছি।"

"বাসি রুটি ত! সে আর তোমায় খেতে দিচ্ছি না। কেন বল ত—আমি খাব লুচি, মোহনভোগ, আর তুমি বাড়ীর বৌ, একটি বৌ, তুমি কতকগুলো বাসি রুটি গিলবে। কেন? মার সঙ্গে এই নিয়ে আজ খুব একচোট হয়ে গেছে, আমার।"

নীরজা ম্লান নেত্রে শিবপ্রিয়ার পানে চাহিল। সে দৃষ্টিতে করুণ মিনতি যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে দৃষ্টির অর্থ, কেন তুমি আমার হইয়া ঝগড়া কর, ভাই? তাল সামলাইতে আমার যে এদিকে প্রাণ বাহির হইয়া যায়। শিবপ্রিয়া তাহা বুঝিত; তাই সে কহিল, "আমি এবার তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। দেখি, মা তোমায় কেমন কিছু বলে!"

নীরজা শিহরিয়া উঠিল, কহিল, "না ভাই, না ঠাকুরঝি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

শিবপ্রিয়া একদৃষ্টে নীরজার পানে চাহিয়া রহিল। নীরজার সুন্দর মুখে ঘামের বিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছে; কপালের উপর মুক্ত কেশগুলা সে ঘামে ভিজিয়া বসিয়া গিয়াছে; আগুনের তাপে মুখ তাহার রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। শিবপ্রিয়া কহিল, "আজ থেকে আর একলা তোমায় রাঁধতে দিচ্ছি না। আমিও রান্নায় যোগ দেব।" বলিয়া শিবপ্রিয়া উনানের দিকে অগ্রসর হইল।

নীরজা বাধা দিয়া কহিল, "না ভাই, তোমার সহ্য হবে না, অসুখ করবে।"

শিবপ্রিয়া সজোরে কহিল, "ওগো, না গো না, আমি মোমের পুতুল নই যে আগুন-তাতে গলে যাব!"

নীরজা কহিল, "তুমি দুদিনের জন্যে এখানে জিরুতে এসেছ—"

শিবপ্রিয়া কোপের ভান করিয়া কহিল, "বটে, আমার বাপের বাড়ী আমি এসেছি কুটুম, না? তাই আমি সিংহাসনে দিবা-রাত্তির বসে থাকব, কুটোটি অবধি নাড়তে পাব না! ইস লো। না, আমার হাতের রান্না খেলে তোমাদের জাত যাবে? ওগো, তোমার ঠাকুরজামাই অখাদ্যি খেলেও সে মোছনমান নয়—বুঝলে?"

নীরজা জানিত, শিবপ্রিয়াকে ঠেকাইয়া রাখা দায়! সে যাহা ধরিবে, তাহা করিবেই। বিশেষ নীরজার কষ্ট এতটুকুও লাঘব করিবার জন্য শিবপ্রিয়া মায়ের উগ্র রোষানল হাসিমুখে মাথায় তুলিয়া লইতে পারে। বড়লোকের ঘরে সে পড়িয়াছে,—বাপের বাড়ী বড় একটা আসিবার সুবিধা তাহার ঘটে না। এক বৎসর পরে কয়দিনের কড়ারে এবার সে বাপের বাড়ী আসিবার অনুমতি পাইয়াছে। মা মেয়েকে পাইয়া কোথায় রাখিবেন, কি পাঁচটা ভাল জিনিস তাহাকে খাওয়াইবেন, তাহা ভাবিয়া অস্থির আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। পূর্বে যেখানে শুধু স্নেহ ছিল, এখন সেখানে মন জোগাইবার পালা পড়িয়াছে। হোক পেটের মেয়ে, তবু সে আজ বড়লোকের বৌ। এই কথাটাই মায়ের মনে সকলের চেয়ে বেশী জাগিতেছিল। তাই মা মেয়ের জন্য অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মেয়ে কিন্তু দেখিতে পাইল, তাহার আদরের ঘটায় বেচারী নীরজার পরিশ্রমের সীমা নাই। আবার শুধু তাহাই নয়। মুখ টিপিয়া এতখানি যে খাটিয়া সারা হইয়া যাইতেছে, তাহার উপর জুলুমেরই কি অন্ত আছে! আবার শুধুই জুলুম? শিবপ্রিয়া নারী—সে জানে, সংসারের কাজে নারী যতই খাটিয়া সারা হোক না কেন, সে খাটুনি কিছুই তাহার গায়ে লাগে না, যদি এ-সকল খাটুনির পিছনে স্বামীর ভালবাসায় জুড়াইবার একটা আশ্রয় থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নীরজার ভাগ্যে তাহারও অভাব। প্রবল-প্রতাপ ভাই তাহার স্ত্রীর ভালবাসার ধার মোটেই ধারিত না। বৌ যখন গভীর রাত্রে পরিশ্রমান্তে জুড়াইবার জন্য ঘরের কোণে গিয়া আশ্রয় লয়, ভাই শ্রীপতি তখন নীচ ও জঘন্য আমোদ-প্রমোদের চেষ্টায় বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়। মার ত সেদিকে শাসন মোটেই নাই, বরং তিনি ছেলেকে এ বিষয়ে একরূপ প্রশ্রয় দিয়াই আসিতেছেন।

বহুদিন পরে ভাইয়ের সংসারে আসিয়া এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া শিবপ্রিয়ার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে ভাবিল, দূর হোক, এখনই চলিয়া যাই। কিন্তু না, বেচারী নীরজা। নীরজার প্রতি সুগভীর মমতাই তাহাকে এখানে আটকাইয়া রাখিল। সে ভাবিল, নীরজার সম্বন্ধে একটা কিছু ব্যবস্থা করিয়া তবে সে এখান হইতে নড়িবে! এমন লক্ষ্মী বৌ—তাহার এমন দুর্দশা। ঘরের লক্ষ্মী যেখানে কাঁদিয়া দিন কাটায়, সে সংসারের উচ্ছেদ হইতে কতক্ষণ!

তাই বৌয়ের পক্ষ লইয়া মায়ের সহিত সে ঝগড়া সুরু করিল। স্বামী-সৌভাগ্যের দুর্জয় বর্ম তাহাকে বিপুল শক্তিশালিনী করিয়া তুলিয়াছিল। মাকে সে স্পষ্টই বলিল, "তোমার আস্কারাতেই ত দাদার এতখানি বাড় হয়েছে!"

মা বলিলেন, "তা যা বল বাপু, শ্রীপতি আমার এ-কালের ছেলেদের মত বেহায়া নয় যে, বৌকে মাথায় তুলে নাচবে!"

শিবপ্রিয়া রাগিয়া বলিল, "নাঃ, বৌকে দু'পায়ে থ্যাংলানোটাই ভাবী পৌরুষের লক্ষণ!"

মা বলিলেন, "বৌ বৌই আছে, খাচ্ছে পরছে—ব্যস! আবার কি। কিসের তার আর অভাব রইল শুনি! মেমেদের মত সোয়ামীর হাত ধরে গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে বেড়াবে না কি। না, পাঁচটা মজলিশে ধেই ধেই করে নাচতে ছুটবে?"

বৌ-সম্বন্ধে মাতার এই আশ্চর্য ধারণার কথা শুনিয়া শিবপ্রিয়া অবাক হইয়া গেল, কিন্তু দমিল না। সে ভাবিল, কিছুতেই ছাড়া হইবে না—এ গাঙ্গে তরী যখন ভাসাইয়াছে, তখন শক্ত করিয়া হাল ধরিয়া কূলে সে পৌঁছিবেই। ভাইকেও একদিন কাছে পাইয়া সে বেশ চড়া রকমের দশটা কথা শুনাইয়া দিল। ফলে দাঁড়াইল এই যে, শ্রীপতি পূর্বে দুই বেলা দুই মুঠা ভোজন করিবার জন্যও অন্দরে আসিতেছিল, এখন ভগ্নীর কড়া কথা শুনার পর হইতে সে পুরে সে একান্তই দুর্লভ হইয়া উঠিল।

এই ঘটনায় মায়ের যত রাগ পড়িল নীরজার উপর! সে-ই ত এ ব্যাপারের মূল! তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই ত শিবপ্রিয়া কঠিন বচনের চাকাখানা ঘুরাইয়া দিয়াছে! আর সেই চাকা তাঁহাকে ও শ্রীপতিকে মাড়াইয়া পিষিয়া সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে! কতদিন পরে মেয়ে আসিল—কোথায় দুই দণ্ড তাহাকে কাছে রাখিয়া সুখ-দুঃখের দুইটা কথা কহিবেন, তাহার অবকাশ-মাত্র না দিয়া মেয়েটা বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পাঁচটা বাজে ছুতা খুঁজিয়া মার সঙ্গে কোঁদল বাধাইতেছে। মুখ টিপিয়া থাকিলে কি হয়, বৌয়ের হাড়ে ভেল্কি খেলে! তাই বৌয়ের উপর তাঁহার আক্রোশ সীমা ছাপাইয়া উঠিল। বৌকে অন্তরালে পাইলেই মনের জ্বালার বেশ দুই-চারিটা তীব্র ছিটা তিনি তাহার উপর নিক্ষেপ করিতে ভুলিলেন না।

নীরজা চোখের জল মুছিয়া ভাবিল, হায়, ঠাকুরঝি এ করিল কি! মধু পাইবার প্রত্যাশায় মধু-চক্রে খোঁচা দিয়া মধু ত পাওয়া গেলই না, এখন হুলের বিষে তাহার যে প্রাণ যাইবার জো হইয়াছে।

মনে সুখ ত তাহার ছিলই না; স্বস্তি একটু ছিল। সে স্বস্তিটুকুও ঠাকুরঝি আজ দূর করিয়া দিতেছে! হায়, সে দুই দিনের স্নেহ, দুই দিন পরেই দূরে চলিয়া যাইবে; কিন্তু সে বুঝিতেছে না, এ দুই দিনে সংসারটায় যে দারুণ ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করিয়া যাইতেছে, সে ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়িয়া নীরজার পক্ষে টিকিয়া থাকা কতখানি কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

২

রান্নাঘরে মেয়ের গলার সাড়া পাইয়া মা পা টিপিয়া তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৌয়ের পানে রক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "ননদের সঙ্গে গানে-গল্পে ঝোল্‌টা শেষে পুড়িয়ে ফেলো না যেন। ও কোথায় দু দিনের জন্য এল বাপের বাড়ীতে জিরুতে, না, দিবা-রাত্তির ওকে ধরে ফুস্‌লোনো হচ্ছে। শেষে রান্নাঘরে এই উনুনের পাশে আগুন-তাতে অবধি ওকে টেনে আনা হয়েছে!"

নীরজা মাটির পানে চাহিয়া রহিল। শিবপ্রিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল, "ও কেন ডাকতে যাবে? আমি নিজে এসেছি। সকাল থেকে মানুষটা কিছু না খেয়ে রেঁধে সারা হচ্ছে,—কি খেলে না খেলে, সেদিকে কারও নজরই নেই—তাই ওর মুখে জোর করে একটু মোহনভোগ পুরে দিলুম।"

মা বলিলেন, "বড়লোকের মেয়ের মুখে বুঝি রুটি আর রোচে না!"

শিবপ্রিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা—!" সে স্বরে মা চমকিয়া থামিয়া গেলেন। শিবপ্রিয়া বলিল, "তুমি ওকে যা খুসী বক্‌তে পারো, কেন না ও তোমার বৌ, এখন ওকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছ। কিন্তু তাই বলে ওর বাপের নামে খোঁটা দিয়ো না বলছি, খবর্দার! ও ভাল মানুষ, তাই চুপ করে সহ্য করছে! আমায় যদি কেউ এমনি করে আমার মরা বাপের নামে খোঁটা দিত, তাহলে আমি কি করতুম, জানো? নখে করে তাকে ছিঁড়ে ফেলতুম—তা সে আমার যত-বড় গুরুজনই হোক না কেন! স্বামী হলেও রেহাই দিতুম না।"

মেয়ের কথায় মা ভড়কাইয়া গেলেন। শিবপ্রিয়ার চোখ দুইটা আগুনের মত জ্বলিতেছিল—রাগে সর্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। মা বলিলেন, "এখন আয় বাপু—রান্নাঘর থেকে চলে আয়—তোর মাথা গরম হয়ে উঠেছে। এখনই আবার ফিট্-টিট হয়ে পড়বে! কত করে ত ফিট বন্ধ হয়েছে—আয়, চলে আয়।" মা মেয়ের হাত ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিলেন।

শিবপ্রিয়া কহিল, "না, আমি যাব না। ছাড়ো আমায়। আমি আজ রাঁধব—বৌকে রাঁধতে দেব না। তুমি যাও। আমায় রাগিয়ো না, বলছি,—তাহলে অনর্থ বাধবে!"

মা ভয়ে সরিয়া গেলেন। যাইবার সময় বৌয়ের পানে যে দৃষ্টি হানিয়া গেলেন, তাহাতে যেন আগুন ঠিকরিয়া বাহির হইতেছিল।

নীরজা কাঠের পুতুলের মতই নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার যেন চেতনা ছিল না। চোখের সামনে এই যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, ইহা কি সত্য! যখন জ্ঞান হইল, তখন সে দেখে, শিবপ্রিয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া কানি দিয়া কড়ার আংটা ধরিয়া উনান হইতে ঝোলের কড়া নামাইতেছে। সে ছুটিয়া গিয়া ডাকিল, "ঠাকুরঝি—"

শিবপ্রিয়া তখন একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। সহজভাবেই সে বলিল, "দে ত ভাই ঐ কাঁশিখানা—ঝোলটা ঢেলে রাখি। কেমন, এই হয়েছে ত? দেখ, আর থাকলে ঝোলটা মরে একেবারে কাই হয়ে যাবে, না?"

যন্ত্র-চালিতের মত নীরজা কাঁশি আগাইয়া দিল। শিবপ্রিয়া কাঁশিতে ঝোল ঢালিয়া রাখিয়া খুন্তি দিয়া কড়া চাঁচিয়া ফেলিল; পরে কড়ায় জল ঢালিয়া ভিজা ন্যাতা দিয়া কড়ার গা রগড়াইয়া জলটা বাহিরে নর্দমার ধারে ঢালিয়া আসিয়া কহিল, "এই কড়াতেই অম্বলটা চড়িয়ে দি, তাহলে—কেমন? তুই ভাই মশলাটা ঠিক করে দে। আমি ততক্ষণে চাল্‌তা কটা ছেঁচে নি।"

৩

কড়ারের তখনও কয়দিন বাকী ছিল, শিবপ্রিয়ার শাশুড়ী লিখিয়া পাঠাইলেন, হঠাৎ তাঁহার গৃহে তাঁহার এক দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন উপস্থিত; বীরেন যাইয়া কাল শিবপ্রিয়াকে লইয়া আসিবে। শিবপ্রিয়ার মনটা অস্থির হইয়া উঠিল। সে নীরজার পানে চাহিল। নীরজার মুখে-চোখে করুণ বেদনার একটা ছায়া পড়িয়াছিল। ঠাকুরঝি চলিয়া যাইবে! হায়, স্নেহের দেওয়াল তুলিয়া এই যে কঠিন বাক্য ও মিথ্যা তিরস্কারের হাত হইতে এতদিন তাহাকে সে আগুলিয়া রাখিয়াছিল—সে দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ঠাকুরঝি চলিয়া গেলে বাহিরের রুদ্র গর্জন নিমেষে যে তাহাকে দ্বিগুণ প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিবে। এখন সেগুলার আক্রোশ যে ভীষণতর হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। হায়, কেন সে আসিল—কেন সে এমনভাবে ঘাঁটাইয়া শাশুড়ীর চিত্তের আগুনটাকে এতখানি গাঢ় তীব্র করিয়া দিল! এখন তাহার উপায়!

শিবপ্রিয়াও ঠিক এই কথাটা ভাবিতেছিল। সে ভাবিল, রুদ্র ভাব ধরিয়া সে ভাল করে নাই; শান্তভাবে কথাগুলা পাড়িয়া গৃহে শান্তি আনিবার চেষ্টা করিলে বোধ হয় কিছু ফল হইত। তাহার অনুপস্থিতিতে নীরজার অসহায় ভাব কল্পনা করিয়া সে ব্যথিত হইয়া পড়িল। সে ভাবিল, দাদাকে একবার পাইলে হয়, নরম কথায় তাহাকে একবার সে বুঝাইয়া দেখিবে। কিন্তু শ্রীপতি আজ কয়দিন আর বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াইবারও অবকাশ পায় নাই!

কাল সকালে বীরেন আসিয়া শিবপ্রিয়াকে লইয়া যাইবে। মেয়ে চলিয়া যাইবে, মা তাই পূর্বরাত্রে তাহার ভোজনের জন্য একটু বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। অনেক রাত্রে সংসারের লেঠা চুকাইয়া নীরজা যখন শুইতে আসিল, তখন তাহার মাথাটা খুবই ধরিয়া উঠিয়াছে। শিবপ্রিয়া আসিয়া কহিল, "আজ আমি তোর কাছে শোব, ভাই—" শিবপ্রিয়া বিছানায় পড়িয়া নীরজাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল। সে চমকিয়া উঠিল। এ কি, গা যে তাহার পুড়িয়া যাইতেছে। শিবপ্রিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া কহিল, "তোর যে জ্বর হয়েছে, বৌ!" পরে তাহার কপালে হাত দিয়া কহিল, "না—বেশ জ্বর! গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে! আর এই জ্বরে আগুন-তাতে সারাক্ষণ বসে সব তুই করলি কর্মালি। তাই বুঝি আমাকে আজ ওধারে আর ঘেঁসতেও দিলিনি? বললি, না ভাই, কাল তুমি চলে যাবে, মার কাছে আজ থাকোগে। আমিও যেমন নেকী, কিছু বুঝলুম না।"

শিবপ্রিয়া উঠিয়া মার ঘরে গেল, ডাকিল, "মা—"

মা তখন মনে মনে জ্বলিতেছিলেন। আহারের এতখানি আয়োজন করা গেল, তা শ্রীপতি তাহার কিছুই মুখে দিল না! সাধে কি শিবপ্রিয়া এত কথা শুনাইয়া দেয়! কেন বাপু, তুই ঘরের ছেলে, তোর এমন রাগ করিয়া বাহিরে পড়িয়া থাকা কেন! যুক্তি তর্কের পর রাগটা পড়িল, বৌয়ের উপর! সেই সর্বনাশীই ত যত নষ্টের মূল! এমন বৌকে বিদায় করিলেই না হাড়ে বাতাস লাগে।

মেয়ের ডাক শুনিয়া মা কহিলেন, "আয়, শুবি আয়।"

শিবপ্রিয়া কহিল, "শোবার কথা হচ্ছে না। বৌয়ের খুব জ্বর হয়েছে! এখনই কাউকে একজন ডাক্তার ডাকতে পাঠাও।"

আবার সেই বৌয়ের হইয়া ওকালতি। মা জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "হাঁ, দেউড়ীতে আমার পাঁচটা পাইক-বরকন্দাজ বসে আছে—এই যে এতেলা পাঠাই।"

শিবপ্রিয়া মুহূর্তে কঠিন হইয়া উঠিল। এই সে একটু পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর কঠিন হইবে না। কিন্তু উপায় নাই! সে কহিল, "আর তোমার ছেলের কি মেয়ের যদি অসুখ করত আজ?"

সে কথার জবাব না দিয়া মা পাশ ফিরিয়া শুইলেন, কহিলেন, "যা তোর খুসী হয়, করগে না, বাছা। সারাদিন পরে ঘুমিয়ে যে একটু আরাম পাব, তারও জো নেই!"

শিবপ্রিয়া নিরাশ নিরুপায় চিত্তে নীরজার ঘরে ফিরিয়া আসিল; বাক্স হইতে অডিকলোনের

শিশি বাহির করিয়া তাহাতে রুমাল ভিজাইয়া নীরজার কপালে পটি আঁটিয়া দিল। সারারাত্রি জাগিয়া বসিয়া সে নীরজার শুশ্রূষা করিল। নীরজা কতবার কহিল, "ও কি ভাই ঠাকুরঝি, অত কেন? আমি ত বেশ আছি, তুমি ঘুমোও—"

ভোরের দিকে নীরজা জ্বরের ঘোরে কেমন আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। শিবপ্রিয়া অস্থির হইয়া পড়িল। এ বাড়ীর কাহারও কাছে কোন সাহায্য পাইবে না সে। বীরেন আসিলে যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিতে পারিবে ভাবিয়া বীরেনের আশাপথ চাহিয়াই সে নীরজার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

সকালে মা আসিয়া ঘরের দ্বারে উঁকি পাড়িলেন। মা হাঁকিলেন, "এখনও নবাব-পুত্রীর ঘুম ভাঙ্‌ল না! আজ বীরেন আসছে, খাবার-দাবারের একটু উদ্‌যোগ-সুদ্‌যোগ করতে হবে, তা হুঁসই নেই।"

শিবপ্রিয়া কহিল, "তোমার ভয় নেই মা। এ বাড়ীতে সে জলগ্রহণও করবে না—তার ব্যবস্থাও আমি করব'খন। তোমার কোন ভাবনা নেই, তুমি ঘুমোওগে যাও।"

মেয়ের মুখের কাছে মা দাঁড়াইতে পারিতেন না। অগত্যা তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

৪

যথাসময়ে বীরেন আসিয়া বাহিরে হাঁকিল, "দাদা—"

শিবপ্রিয়া ঝিকে কহিল, "তোর জামাইবাবু এসেছে রে। এইখানে ডেকে নিয়ে আয় ত—"

বীরেন আসিলে শিবপ্রিয়া কহিল, "তোমার গাড়ী আছে, এখনই একজন ডাক্তার ডেকে আনো। বৌয়ের কাল রাত্তির থেকে খুব জ্বর!"

বীরেন আসিয়াই এ ভাব দেখিয়া কেমন ভড়কাইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল।

ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "বড় সুবিধে মনে হচ্ছে না। টাইফয়েড হতে পারে বলেই আশঙ্কা হচ্ছে। আজ তিন-চারদিন থেকে বোধ হয় জ্বরটা হয়েছে?" ডাক্তার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বীরেনের পানে চাহিল।

শিবপ্রিয়ার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। ঘোমটার অন্তরাল হইতে মৃদু স্বরে সে কহিল, "কাল রাত্রে আমরা জ্বর জানতে পেরেছি।"

প্রেসকৃপ্‌সন লিখিয়া ভিজিটের টাকা পকেটে পূরিয়া ডাক্তার বিদায় গ্রহণ করিলে শিবপ্রিয়া কহিল, "আমায় নিতে এসেছ বুঝি?"

বীরেন কহিল, "হাঁ। সবোর ছেলের ভাত হবে কাল। মা কিছু লেখেন নি?"

শিবপ্রিয়া কহিল, "লিখেছেন, কিন্তু কি করে যাই, বল। আমি গেলে বৌটো বিনা চিকিৎসাতেই মারা যাবে। যা ওর যত্ন-আত্তি! এসব জানলে এ বাড়ীতে আমি এবার পা দিতুমই না মোটে।"

বীরেন কহিল, "তোমার দাদা কোথায়?"

শিবপ্রিয়া কিছু বলিতে পারিল না। বলিতে লজ্জা হইল যে, দাদার গুণের সীমা নাই! স্বামী-সৌভাগ্য পূর্ণ মাত্রায় যে লাভ করিয়াছে, সে-ই জানে, এ কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও কতখানি বাধে! অনুমানে বীরেন ব্যাপার কতক বুঝিল। সে কহিল, "বাড়ীতে সে ফিরবে কখন?"

শিবপ্রিয়া কহিল, "সে-ই জানে। আজ ক'দিন ত চুলের টিকিও দেখতে পাচ্ছি না। তা যাক্, তুমি ত সব দেখলে। গিয়ে মাকে বলো, এ অবস্থায় কেমন করে আমি যাই! ঠাকুরঝিকেও দুঃখ করতে বারণ করো। দেখে ত যাচ্ছ! বলো, নেহাৎ নিরুপায়!"

বীরেন কহিল, "তা ত দেখছিই। এ অবস্থায় কেমন করেই বা তোমায় নিয়ে যাই! মোদ্দা ডাক্তার

ডাকা, হাঙ্গাম পোহানো, তুমি এ সব পারবে কি? রোগটাও ত সহজ নয়, বিশেষ তোমার শরীরে যদি না সহ্য হয়—"

শিবপ্রিয়া হাসিল, হাসিয়া কহিল, "সে ভাবনা তোমার নেই। তোমায় আবার ফিরে লগ্ন দেখতে হবে না।"

বীরেন কহিল, "তা বুঝি। কিন্তু সে কথা হচ্ছে না। তুমি মেয়েমানুষ, সামলাতে পারবে কেন? তার চেয়ে আমি গিযে ববং সনাতনকে পাঠিয়ে দি।"

শিবপ্রিয়া আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "তাহলে ত ভালই হয়। তবে এ রোগের বাড়ীতে তার খাওয়া-দাওয়া দেখবার সুবিধে হবে না কিন্তু।"

বীরেন কহিল, "সে তার ব্যবস্থা করে নেবে'খন। সে ত আর এখানে কুটুম্বিতে করতে আসছে না। আমি তার ব্যবস্থাও করে দেব।"

শিবপ্রিয়া কহিল, "তাহলে তুমি যাও। গিয়ে যা দেখলে, মাকে বলো।"

বীরেন কহিল, "মার সঙ্গে একবাব দেখা করে যাই।"

শিবপ্রিয়া কহিল, "দেখা করতে চাও, দেখা করগে। আমায আর বকিয়ো না।"

বীরেন গিযা শাশুড়ীব সঙ্গে দেখা কবিয়া তাঁহাকে প্রণাম কবিল। শাশুড়ী আনন্দে সারা হইয়া উঠিলেন। বড়মানুষ জামাই "মা" বলিয়া ডাকিযাছে, ইহাই যথেষ্ট! তাহার উপর আবাব প্রণাম! শাশুড়ী কহিলেন, "রান্না এখনই চাপিয়ে দিচ্ছি। দুটি খেযে যাও, বাবা।"

বীরেন কহিল, "না মা, তার জন্য ভাববেন না। বৌদি সারুক, এসে ওরই হাতে একদিন তখন খেয়ে যাব। আমার এখন ঢের কাজ, দাঁড়াবার সময নেই।"

বীরেন চলিয়া গেল। শাশুড়ী বুঝিলেন, এ শিবপ্রিযারই কাজ! সে-ই জামাতাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছে যে—এখানে আহার করিয়ো না! নিশ্চয। কিন্তু কেন এ নিষেধ! ইহারও মূলে ঐ বৌ! তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। এমন সর্বনাশীকেও তিনি ঘবে আনিয়াছিলেন যে, মুহূর্ত শান্তি নাই। ইহারই জন্য ছেলে তাঁহার ঘর ছাড়িয়া গেল, মেয়ের মুখ সদাই অপ্রসন্ন! শুধু অপ্রসন্ন! মাব উপব মেয়ের মন একেবারে তাতিয়া রহিযাছে। তিনি ফুঁসিযা মনে মনে ভাবিলেন, বৌয়েব যদি এখন ঘটনাক্রমে একটা ভাল-মন্দ কিছু ঘটিয়া যায়, তবেই মঙ্গল! নিজের্ব ছেলে ও মেয়েকে আবাব তিনি ফিরাইয়া পাইবেন! আহা, তেমন দিন কি হইবে!

বিশ্বের ভগবান বুঝি এ প্রার্থনা শুনিয়া সে দিন শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন!

৫

চারদিন জ্বর-ভোগের পর সেদিন দুপুর বেলায় নীবজা চোখ মেলিয়া ডাকিল, "ঠাকুরঝি—"

তাহার হাত দুইটা শিবপ্রিয়ার কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল। সনাতন আসিয়া ঘবের বাহিরে ডাকিল, "বৌমা—"

শিবপ্রিয়া কহিল, "কেন বাবা?"

"হোয়েটুকু এনেছি মা। খাওয়াতে পারবে?"

শিবপ্রিয়া উঠিয়া গিয়া ক্যাপ্ লইয়া আসিল, নীরজাকে ডাকিল, "বৌ—" নীরজা ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিল, "কেন ভাই?"

"এইটুকু খেয়ে নাও—"

"আর কেন ঠাকুরঝি?" নীরজার চোখের কোলে জল গড়াইয়া পড়িল।

শিবপ্রিয়া আঁচল দিয়া সে অশ্রু মুছিয়া লইল। পরে হোয়ের ক্যাপ্ নীরজার মুখে ধরিয়া কহিল, "এটুকু খাও, ভাই।"

নীরজা আপত্তি না করিয়া পান করিল; কহিল, "ঠাকুরঝি, তোমার ভাই বড় কষ্ট হচ্ছে।"

শিবপ্রিয়া কহিল, "এখন সে কষ্টটুকু সার্থক কর দেখি—"

নীরজা কিছু বলিল না, উদাস ম্লান নেত্রে বাহিরেব পানে চাহিয়া রহিল। শিবপ্রিয়া তাহাকে বাতাস করিতেছিল। দৃষ্টি তাঁহার নীরজার মুখের পানে। যে মুখ এত দুঃখেও সর্বক্ষণ সে হাসি-ভরা দেখিত, সে মুখ আজ বাসি ফুলের মতই শুষ্ক মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহার কপালের উপব দুই-চারিগাছি কেশেব গুচ্ছ উড়িয়া পড়িয়াছিল। বেশমেব মতই কোমল কেশ! সেগুলা হাত দিয়া সরাইয়া নীরজার মুখের কাছে মুখ আনিয়া শিবপ্রিয়া কহিল, "কি ভাবছ?"

নীরজার চোখ জলে ভরিযা ছিল; বাহিবেব এই করুণ সমবেদনা-মাখা প্রশ্নেব ঘা খাইয়া মুহূর্তে তাহা ঝরিয়া পড়িল। নীরজা বালিশে চোখ মুছিয়া ডাকিল, "ঠাকুবঝি—" তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

শিবপ্রিয়া কহিল, "কি ভাবছ, বল।"

একটা তীব্র নিশ্বাস ফেলিযা নীবজা কহিল, "আজও বাড়ী আসেননি? আমাব জন্যে শেষে বাড়ী আসা ছেড়ে দিলেন?"

শিবপ্রিযাব বুকেব ভিতবে একটা ভীষণ বেদনা ঠেলিযা উঠিল। সে কহিল, "দাঁড়া, তোব বুঝি ভাগ্য ফিরেছে। একটু আগে যেন দাদাব গলার সাড়া পেলুন।"

নীবজাও সেই সাড়া পাইয়াছিল—তাই সে চোখ খুলিযাছে!

শিবপ্রিয়া বাহিবে গেল। দালানে বসিযা শ্রীপতি তেল মাখিতেছিল। মা নিকটে দাঁড়াইয়া। শিবপ্রিযা গিযা সহজ স্ববে ডাকিল, "দাদা—"

শ্রীপতি ভগ্নীকে দেখিযা শিহরিযা উঠিল; কিন্তু গলাব স্ববে আশ্বস্ত হইল। সে কহিল, "কি বলছিস্, শিবু?"

শিবপ্রিযা কহিল, "তোমাব চান হযে গেলে একবার এ ঘরে এসো। বৌযের বড় অসুখ—"

মা কহিলেন, "অসুখ, তা ও গিযে কি কববে? ও কি ডাক্তাব?

শিবপ্রিযা সে কথা কানে না তুলিযাই কহিল, "তোমায একবারটি সে দেখতে চায়। মেয়েমানুষেব মন, বোঝে না, কি কববে বল! তবে ভয নেই, তোমাদের হাড়ে বাতাস লাগবে শীগ্গিব—তারই সে বন্দোবস্ত করেছে এবাব।"

মা বলিলেন, "তোব আস্কাবাতেই ত ওব এত বাড় হয়েছে! নাহলে অসুখের ভান করে এতখানি ঘটা বাধাতে পাবত!"

শিবপ্রিয়া কোন কথা বলিল না। তাহার মনেব মধ্যে যে আগুন জ্বলিতেছিল, ইচ্ছা থাকিলে সে আগুনে এখনই সে সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে ইচ্ছাও আজ ছিল না। তাই সে আবার শ্রীপতিকে কহিল, "চান কবে এসো একবার, দাদা, লক্ষ্মীটি! নাহলে একটা মানুষকে চিরদিনের মনস্তাপ নিয়ে চলে যেতে হয়। তুমিও মানুষ ত, এটুকু মনে বেখো!"

শিবপ্রিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কথার যে প্রচ্ছন্ন হুলটুকু সে শ্রীপতির মনে ফুটাইয়া দিয়া গেল, বহুক্ষণ ধরিয়াই তাহা শ্রীপতির মনে খচ্-খচ্ করিতে লাগিল। স্নান সারিয়া সে আহাবে বসিল। মা সম্মুখে বসিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। মা কহিলেন, "এবার শিবুকে পেয়ে এমন সোহাগ হয়েছে যে, দেখে আর বাঁচি না। মেয়েটাকে একেবারেই পর করে দিলে। আমার কাছে ঘেঁস দিতেই চায় না মেয়ে। ছেলের শোধ মেয়ের উপর দিয়ে নিলে। কি অশুভ ক্ষণেই যে শিবু আমার এবার শ্বশুরবাড়ী থেকে পা বাড়িয়েছিল।"

আহার করিতে করিতে শ্রীপতি ভাবিল, আহার সারিয়া একবার সে নীরজাকে দেখিয়া আসিবে। তবে দেখা হইলে কি বলিবে, ইহাই মহাভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বিধাতা তাহাকে সে দায় হইতে খুব রক্ষা করিলেন। আহার সারিয়া সে মুখ ধুইতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল, যতীশবাবু গাড়ী লইয়া হাজির—তাঁহার বাগানে আজ ভারী ধুম। কাজেই আর বসা বা নীরজার সহিত দেখা করা ঘটিয়া উঠিল না। ডিবা-ভরা পান পকেটে ফেলিয়া সাজিয়া-গুজিয়া সে বাহিব হইয়া গেল।

দাদার কাণ্ড দেখিয়া শিবপ্রিয়া ঘরের মধ্যে গর্জাইতেছিল। এই ভাইযেব বোন্ সে! ধিক তাহাকে!

মা আসিয়া ডাকিলেন, "শিবু, খাবি আয়।"

শিবপ্রিয়া বর্তাইয়া গেল। মনেব ঝাল কতকটা এবাব সে মিটাইতে পাইবে! মার উপর তর্জন করিয়া সে কহিল, "আমার ভাত একধারে ঠেলে বেখে তুমি ক্ষুধা-নিবৃত্তি কব গে। আমার জন্য এ-বাড়ীর কাকেও ভাবতে হবে না।"

"পরের বৌকে ঘরে এনে এ কি দায়ে পড়লুম গা—" বলিতে বলিতে মা চলিযা গেলেন। তাঁহার মনে হইল, বৌটাকে ধরিয়া দুই হাতে যদি তাহাকে একবার পিটিতে পারিতেন, তবেই বুঝি এ প্রাণের জ্বালা কতক জুড়াইত!

শাশুড়ী ও ননদেব কথা নীবজা সকলই শুনিল। শাশুড়ী চলিযা গেলে শিবপ্রিয়াকে সে কহিল, "তুমি যাও ঠাকুরঝি, খেযে নাওগে। আমি ত বেশ আছি, এখন যাও ভাই।"

শিবপ্রিয়া কিছু বলিল না! বাগে সে কাঠ হইযা বসিযা বহিল। নীবজা আবাব কহিল, "যাও না ভাই, খেয়ে এসোগে—"

নীরজাব মাথায় আইস্‌ব্যাগ চাপিযা শিবপ্রিযা কহিল, "এ বাড়ীতে জলগ্রহণ কবতে বল তুমি—?"

নীরজা এ কথায় বড় আবাম বোধ কবিল না। সে কহিল, "যে কটা দিন আব আছি ভাই, একটু শান্তিতে কাটতে দাও! আমাকে নিয়ে এ খেচাখেচি—"

শিবপ্রিয়া বুঝিল, নীরজার প্রাণেব কোন্‌খান্‌টায কি ব্যথা বাজিতেছে। সে কহিল, "তুই সেবে ওঠ্ ভাই, প্রাতর্বাক্যে কামনা করছি, তুই সেবে ওঠ্! তাবপর আমি তোকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। দেখি, কে তাতে বাধা দেয়! যদি আজ তোব মা বেঁচে থাকতেন ত যেমন কবে পাবতুম, তোকে নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতুম—"

"তাই দাও ভাই—আমাব মার হাতেই আমাকে তুলে দাও। আমারও আব সহ্য হয না।"

শিবপ্রিয়া দেখিল, এ কথাগুলা তোলা ঠিক হয় নাই। রোগীব উত্তেজনা ইহাতে বাড়িতে পাবে। তাই সে কহিল, "তুমি তা হলে চুপ করে শুয়ে থাকো। ববফের ব্যাগ মাথায চাপানো থাক্—আমি চট্ করে মুখে কিছু দিয়ে আসি, কেমন?"

"হাঁ, তুমি যাও। ভয় নেই। এর মধ্যে আমি মরে যাব না।" বলিয়া নীরজা হাসিল। শিবপ্রিয়া চোখ চাহিয়া সে হাসি দেখিল। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। এ হাসি,—সেই দীপ নিবিবার পূর্বে যেমন একবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনই যে! মনে মনে মা-কালীকে ডাকিয়া নীরুজাব রোগ-পাণ্ডু মুখে সে একবার হাত বুলাইল। এ স্পর্শে সব গ্লানি তার মুছিয়া যাক্! তারপর বাক্স হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া নীরজার মাথায় ছোঁয়াইয়া সেটিকে আঁচলে বাঁধিয়া সে ঘব হইতে বাহির হইয়া গেল।

৬

সেদিন শেষরাত্রে নীরজা কেমন অস্থির হইয়া পড়িল। চোখের চাহনিও কেমন এলোমেলো। বিছানায় পড়িয়া সে ছটফট করিতেছিল। ভিতর হইতে কেমন একটা জ্বালা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। প্রাণ

যেন হাঁপাইয়া উঠে।

শিবপ্রিয়া তাহারই বালিশে মাথা রাখিয়া সবে-মাত্র একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কাতর কণ্ঠে নীরজা ডাকিল, "ঠাকুরঝি—"

শিবপ্রিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। ঘরের কোণে বাতিটা জ্বলিয়া শেষ হইয়া আসিয়াছে। সে ক্ষীণ আলোকে শিবপ্রিয়া চাহিয়া দেখে, নীরজার মুখে কে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে। বুঝি এ মৃত্যুর করাল ছায়া! তাড়াতাড়ি আর একটা বাতি জ্বালিয়া সে ঘরের বাহিরে আসিল, ডাকিল, "সনাতন—"

সনাতন বাহিরের দালানে পড়িয়া একটু গড়াইয়া লইতেছিল; কহিল, "কেন মা?"

"শীগ্‌গির একবার ডাক্তারবাবুর কাছে যাও, তাঁকে ডেকে আনো, বাবা—অবস্থা আমি ভাল বুঝছি না।" সনাতন উঠিয়া ডাক্তারের উদ্দেশে ছুটিল।

শিবপ্রিয়া আসিয়া মালিশ, পথ্য প্রভৃতির নানা আয়োজন বাধাইয়া তুলিল। কিন্তু হায়, নিবানো দীপে তৈল দিয়া আর কি ফল! ভিতর হইতে পুড়িয়া জীবন তাহার পূর্ব হইতেই যে ছাই হইয়া গিয়াছে, বাহিরের কাঠামোটা কোনমতে খাড়া আছে বৈ ত না! আজ এ রোগের প্রবল ধাক্কায় বুঝি সে কাঠামোখানাকেও আর বজায় রাখা যায় না! শিবপ্রিয়া কাঁদিয়া ফেলিল অসহায় দুর্বল নারী সে,—তাহার এমন কি সাধ্য যে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এই অবহেলিতা উপেক্ষিতা প্রাণীটিকে তাহার গ্রাস হইতে সে ছিনাইয়া লয়!

সহসা রোগীর ঠোঁট নড়িল—ভিতর হইতে মিনতির সে যেন এক করুণ অস্ফুট আবেদন! নীরজার শুষ্ক ওষ্ঠে শিবপ্রিয়া এক চামচ বেদানার রস ঢালিয়া দিল—নীরজা সাগ্রহে তাহা পান করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তারপর ধীরে ধীরে অতি ধীরে সে চোখের পাতা মেলিল; দুই হাতে হাতড়াইয়া কিসের যেন সন্ধান করিল! হায় রে, পাথেয় যে তাহার বহুকাল হারাইয়া গিয়াছে! কি সম্বল লইয়া এখন এ দীর্ঘ পথে সে যাত্রা করে!

শিবপ্রিয়া ঔষধ ঢালিয়া নীরজাকে পান করাইল। নীরজা কহিল, "আঃ—" পরে শিবপ্রিয়ার পানে স্থির দৃষ্টিতে সে চাহিল। শিবপ্রিয়া আদর করিয়া দুই হাতে তাহার মুখখানি ধরিয়া চুম্বন করিল, কহিল, "কি চাচ্ছ, ভাই, বল?"

নীরজা কোন কথা বলিতে পারিল না—তাহার দুই চোখ বহিয়া শুধু ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সারা জীবনের উপেক্ষার বেদনা আজ এ কাতর অশ্রুর মধ্য দিয়া অজস্রধারে ঝরিয়া পড়িয়াছে! শিবপ্রিয়া ভাবিল, হায় বোন, এতদিন যদি নীরবে সব সহিয়া আসিলি,—আপনার তেজে এ উপেক্ষা গ্রাহ্যও করিলি না, তবে এ নিদান-সময়ে কিসের জন্য এ দুর্বলতা! সে দুর্বলতা আর কেনই বা দেখাস দিদি! তোর পানে কেহই যখন চাহিয়া দেখিল না, তখন তুইই বা কাহার জন্য আজ এতখানি কাতর হইতেছিস্!

ডাক্তার আসিয়া ইঞ্জেকসন দিলেন। কিছুক্ষণ পরে রোগী যেন একটু শক্তি পাইল। ডাক্তার বাহিরে বসিয়া রহিলেন—শিবপ্রিয়া তাঁহার দুই পা জড়াইয়া কাঁদিয়া কহিল, "আপনি আজ দয়া করে থাকুন—যত টাকা চান, দেব—" তারপর সে সনাতনকে কহিল, "তোমার বাবুকে একবার শীগ্‌গির ডেকে নিয়ে এসো, সনাতন। গাড়ী করে ছুটে যাও। বলগে, বড় বিপদ এখানে!" সনাতন বীরেনের উদ্দেশে ছুটিল।

নীরজা আর একবার কথা কহিল, "ঠাকুরঝি—"

শিবপ্রিয়া বর্তাইয়া গেল। তবে এ ধাক্কা কাটিল বুঝি! সে কহিল, "বল্, তোর যা কিছু বলবার আছে, সব খুলে বল্। আমি এই তোকে আগ্‌লে বসে রইলুম। দেখি, আমার কাছ থেকে কে আজ তোকে ছিনিয়ে নেয়!"

সতীর মুখে তেজের একটা দৃপ্ত রেখা ফুটিয়া উঠিল। একবার সে কোন্ যুগে সতীর মুখে এমনই তেজ দেখিয়া যমের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। আজও এ-যেন রাজেন্দ্রাণী জগদ্ধাত্রী মূর্তিতে আর-এক সতী নীরজাকে রক্ষা করিবার জন্য বুক দিয়া দাঁড়াইয়াছে। দুর্জয় তেজে প্রাণ তাহার বলীয়ান হইয়া উঠিল।

নীরজা অতি-কষ্টে থামিয়া থামিয়া কহিল, "সতী-লক্ষ্মী তুমি, আশীর্বাদ কর, ফিরে জন্মে যেন তোমার মত বরাত নিয়ে পৃথিবীতে আসি—এ বড় কষ্ট ভাই, সওয়া যায় না।"

হায়রে, তবু সে সকলই সহিয়া আসিয়াছে। আর কাহারও প্রাণ হইলে কবে বুঝি ভাঙ্গিয়া যাইত—কিন্তু এ যে নারীর প্রাণ, বড় কঠিন। সব সয়, ভাঙ্গিতে জানে না।

কিন্তু তবু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। নীরজার প্রাণ সে সীমার একেবারে কিনাবায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকেও আর ধরিয়া রাখা গেল না। সেদিন সন্ধ্যার সময় ঘবে ঘরে যখন মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, ঠিক সেই সময় তাহার সকল অকল্যাণ হইতে নীরজা মুক্তি লাভ করিল। সংসার তাহাকে বিদায় দিয়া আঁধারে ভবিয়া গেল।

৭

শাশুড়ী জামাতার কাছে মিনতি জানাইয়া শিবপ্রিয়াকে আরও কয়দিন আপনার গৃহে ধবিয়া রাখিল; কিন্তু মা ও মেয়ের মধ্যে কথা ছিল না। শত সাধ্য সাধনা করিয়াও মেয়েব মুখে মা একটু জল অবধি দেওয়াইতে পাবিলেন না। তাঁহার তখন আশঙ্কা হইল, পরের মেযেব প্রতি যে পাপ করিয়াছেন, তাহার ফলে বুঝি আজ নিজের মেয়েটিকে হারাইতে হয়! তাই তিনি সনাতনকে কহিলেন, "তুমি ভাই বীরেনকে খবর দাও—সে এসে ওকে নিয়ে যাক্। না হলে দেখছ ত, এখানে রাখলে ওকে বাঁচানো যাবে না!"

সনাতন অগত্যা বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল।

বহুদিন পরে শ্রীপতিও আজ ঘরে ফিরিয়াছিল। বাড়ীতে পা দিযাই সে বুঝিল, সেখানে মস্ত একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। সারা বাড়ীটা যেন আজ তাহাকে গিলিবাব জন্য হাঁ কবিযা রহিয়াছে! নীরজার প্রতি তাহার একটা আন্তরিক টান না থাকিলেও বাড়ীটা আজ তাহাব কাছে নিতান্তই শূন্য বোধ হইতে লাগিল। সব থাকিলেও যেন আজ কিছু নাই, এমনই ভাবখানা বাড়ীটার প্রত্যেক ইষ্টক-খণ্ডে, প্রত্যেক প্রত্যঙ্গটাতে অবধি লাগিয়া রহিয়াছে। বাড়ীতে যেন এক মুহূর্ত তিষ্ঠানো যায় না!

না যাক্, বাড়ীর প্রতি কোন দিনই তাহার মায়া ছিল না—আজও নূতন করিয়া মায়া পড়িল না। তবে আজ মার কাছে প্রয়োজন ছিল; গোটাকয়েক টাকা চাই—বাগানের আমোদে এ-দফায তাহারই উপর খরচের ভার পড়িয়াছে। না দিলে মান থাকে না। সেই টাকা কয়টা লইয়া কোনমতে এখন সরিয়া পড়িতে পাবিলেই সে বাঁচিয়া যায়।

ভিতরে পা দিতেই মা ছেলেকে দেখিয়া শোকে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ছেলে আসিয়া মার কাছে বসিল—মা তখন সপ্তমে সুর চড়াইলেন। শিবপ্রিয়া ব্যাপার বুঝিবার জন্য সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে আজ কোন কথা নাই, দৃষ্টি স্থির, মূর্তি রুক্ষ। কে যেন পাথরে খোদা প্রাণহীন একটা পুতুলকে আনিয়া সেখানে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। উপেক্ষিতা নীরজার স্মৃতির মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া তপশ্চারিণী সর্বত্যাগিনীর মতই একটা ভাব তাহার মুখে-চোখে আঁটিয়া গিয়াছে।

কাঁদিতে কাঁদিতে ইনাইয়া বিনাইয়া মা কহিলেন, শূন্য গৃহ পাষাণের মতই তাঁহার বুকে বসিতেছে। পুত্রের এ লক্ষ্মীছাড়া দীন বেশও তিনি আর চক্ষে দেখিতে পারেন না। ও পাড়ার পার্বতী একটি মেয়ের কথা বলিতেছিল—পুত্রের কোন আপত্তিই তিনি কানে তুলিবেন না।

শিবপ্রিয়ার সারা অঙ্গ বহিয়া বিদ্যুতের একটা তীব্র দাহ ছুটিল। তাহার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তবু ঝড় আসন্ন দেখিয়াও জীর্ণ গৃহের অধিবাসী যেমন আকাশের পানে হতবুদ্ধিভাবে চাহিয়া থাকে, তেমনই ভাবে মা ও ভাইয়ের পানে সে চাহিয়া রহিল—চোখ পলকহীন, অচঞ্চল!

শ্রীপতি বুঝিল, টাকা-আদায়ের চমৎকার সুযোগ মিলিয়াছে। নত মুখে গাঢ়স্বরে সে কহিল, "তোমার কথা আমি কবে ঠেলেছি মা, বল—"

দুইখানা চঞ্চল মেঘে ঠোকাঠুকি হইলে অশনি যেমন গর্জিয়া উঠে, শিবপ্রিয়া ঠিক তেমনই ভাবে গর্জিয়া উঠিল। সে ডাকিল, "সনাতন—"

কয়দিনের রুদ্ধ বাণী নিমেষে যেন এক প্রলয়-হুঙ্কারে মুক্ত হইয়া গেল। মাতা-পুত্র উভয়েই সে স্বরে শিহরিয়া শিবপ্রিয়ার পানে চাহিলেন।

সে স্বরে চমকিয়া প্রভু-গৃহ-গমনোদ্যত সনাতন আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল—চাহিয়া দেখিল, মার কি এ করালিনী মূর্তি! চোখে যেন প্রলয়েব আগুন জ্বলিতেছে!

শিবপ্রিয়া কহিল, "সনাতন, এখনই গাড়ী নিয়ে এসো। আমি চলে যাব, এখনই চলে যাব। এ বাড়ীতে আর এক মুহূর্তও থাকব না। এ বাড়ীতে যদি আর কখনও জলগ্রহণ করি ত আমি বাপের বেটী নই!"

কথাটা বলিয়া বিদ্যুতেব মতই সেখান হইতে সে সরিয়া গেল। মা ও শ্রীপতি বজ্রাহতেব মত স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

প্রবাসী ঃ ১৩২০

বে লো য়া রী টো প

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

ঢেঁকিব উপব বসিয়া চা খাইতেছিলাম।

চা জিনিসটা অপবিত্র, ম্লেচ্ছেব খাদ্য, খাওযাটা ম্লেচ্ছাচরণ এবং তৈরী চা অস্পৃশ্য জিনিস এই হৃদযবিদারক নিদারুণ মিথ্যা অপবাদ দিয়া পিসিমা তাহাকে বাড়ী হইতে একেবারে বাহির করিয়া দিতে প্রাণপণ করিযাছিলেন, কিন্তু আমার শ্লেষ্মা বৃদ্ধির ভয়ে নিতান্তই সে অসাধ্য সাধন করিতে না পাবিয়া তাহাকে সরঞ্জাম সহ পঞ্চাশ হাত দূরবর্ত্তী ঢেঁকিশালায় নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন। উপকরণ—চা, চিনি, দুধ, জল স্বতন্ত্র ভাবে যেখানে সেখানে রাখো, তাহাতে পিসিমার আপত্তি নাই, কিন্তু ঐ দ্রব্যগুলি মিশাইয়া সজল ও উষ্ণ করিয়া তুলিলেই সেটা 'খ্রেষ্টানী কাণ্ড'। নেহাৎ লাথি সহ্য করিতে হয় বলিয়াই বোধ করি পিসিমার হিন্দু ঢেঁকি আমার এই খ্রেষ্টানী কাণ্ডটা নীরবে সহ্য করিত ; সে ক্রুদ্ধ হইয়া লেজ তুলিয়া গা-ঝাড়া দিলেই আমি আস্তাকুঁড়ে যাইয়া পড়িতাম।

যাই হোক, চা খাইতেছিলাম। সম্মুখের উঠানে বসিয়া পিরুদাস একদৃষ্টে বাছুরের ঘাস খাওয়া দেখিতেছিল। আমি তাহাকে সকৌতুকে প্রশ্ন করিলাম,—আচ্ছা, পিরু, আমাদের এই গ্রামের নাম পোড়াবৌ হ'ল কেন? এমন সব ভাল ভাল নাম থাক্‌তে কিনা পোড়াবৌ!—কাঞ্চনপুর, সুবর্ণগ্রাম, রতনপুর, রামচন্দ্রপুর, হরিহরনগর কেমন প্রাণভরা চমৎকার সব নাম ; ভোরবেলা উঠে গ্রামের নাম করলেই কত পুণ্যি! সব থাকতে কিনা পোড়াবৌ ; আর লোকে গ্রামের নাম করে না, বলে—হাঁড়ি ফাটে। বলিয়া হাসিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম, পিরুদাস আমার দিকে খানিকটা সরিয়া আসিয়া

যেন থ হইয়া বসিয়া আছে।

পিরু বলিল,—এ গাঁয়ের নাম পূর্ব্বে পোড়াবৌ ছিল না, বাবু ; কেন হ'ল তা যদি শোনেন ত' নিবেদন করি।

আমি চায়ের পেয়ালার তিন-চারটা ঘন ঘন চুমুক দিয়া বলিলাম,—বল পিরু, শুনি।

পিরু নতচক্ষে খানিক নিঃশব্দ থাকিয়া আমার দিকে চোখ তুলিয়া বলিতে লাগিল,—মানষের মনের দিশে পেলাম না বাবু, এত বয়েস হ'ল। মানুষ যে কি চায় আর কি না চায় তা' আজও আমার ঠাহর হ'ল না—বলিয়া পিরু ম্লানচক্ষে বাছুরটির দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি শ্রোতা হিসাবে খুবই সহিষ্ণু ; পিরুর কথায় একটা হুঁ দিয়া পেয়ালা নামাইয়া বিড়ি দিয়াশলাই বাহির করিলাম।

পিরু বলিতে লাগিল,—এই যে বাছুরটা চর্‌ছে দেখ্‌ছেন, পেট ভরানো ছাড়া এর আর কোনো কাজ কি আছে? নাই ; পেট ভরলেই এ নিশ্চিন্দি, কিন্তুক বাবু, মান্‌ষের খাই-খাই আর মেটে না; ভরা পেটেও যেমন তার খাই-খাই, খালি পেটেও তেম্‌নি ; একদণ্ড সে নিশ্চিন্দি না ; কত যে খাবে, তার কত যে ক্ষিদে তা' যেন সে নিজেই জানে না : সে স্ত্রাতিব সর্ব্বস্ব খায, নিজের মাথা খায়, পরের পরকাল খায়, তবু তাব আশ মেটে না। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

আমি সংশয়ের সঙ্গে বলিলাম,—হ্যাঁ।

কিন্তুক আর একটা কথা ভাবুন বাবু, পেটের ক্ষিদেয় মানুষ যত পাগল না হয়, চোখেব ক্ষিদেয় আর মনের ক্ষিদেয় হয় তার চতুগুণ। মান্‌ষেব এই মন নিয়েই ত' যত মারামারি, কাটাকাটি, পাপের কায্য। আবার এ কথাটাও ভাবুন বাবু, ভগমান চোখ আর মন দিয়েছেন—তাতে দিয়েছেন, ক্ষিদে; তেমনি আবার বুদ্ধি দিয়েছেন, বিবেচনা দিয়েছেন যে, মানুষ যেন র'যে স'যে কাজ্র করে। কিন্তু ক'জনে তা' করে বাবু?

আমি বলিলাম,—খুব কম লোকেই তা কবে।

—তাই। তা' হলে দেখুন, মানুষ উঠ্‌তে বস্‌তে ভগমানকে একরকম অপমানই করে ; ভগমান তাতে নারাজ হয়ে যান, মান্‌ষের তাতে ভাল হয় না। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ।

পিক বলিল,—ভাল যে হয না তারই প্রমাণ এই পোড়াবৌ গাঁ। বলিযাই পিরু চম্‌কিযা উঠিল ; কর্কশ জিহ্বা বাহির করিয়া বাছুরটা তার পিঠের ঘাম চাটিতে সুরু করিতেছিল।

বাছুরটিকে ঠেলিয়া দিয়া পিরু বলিতে লাগিল, মান্‌ষের কথা আবারও বলি বাবু। আট আনা মণ ধান দেখেছি, তখনো মানুষ যেমন ছিল, ছয় টাকা মণ এখন, এখনো মানুষ ঠিক তেম্‌নি আছে, তখনো লোকের হাহাকার ছিল, এখনো আছ। তখনকার দর আর এখনকার টাকা হ'লে তবেই হ'ত সুখ ; তখন জিনিস ছিল বেশী, টাকা ছিল কম ; তাই তখনো দেশে আকাল হ'ত, এখনো হয়। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ। বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠে যা পড়েছি, তা' যদি সত্যি হয় তবে সে-ও বড় কঠিন দিনই ছিল।

—ছিল বৈকি, কঠিনই ছিল ; তখনো এমন লোক ছিল যে, খেতে পেত না। আমি বলছি পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা—এ গাঁয়ের নাম তখন ছিল লক্ষ্মীদিয়া। এ গাঁয়ের লোক তখনো ক্ষিদেয় দুঃখু পেয়েছে। কিন্তুক একটা কথা আমি ভুল বলেছি বাবু, মাপ করবেন। তখন মান্‌ষের কষ্ট ছিল সত্যি, কিন্তুক সে কষ্ট সকলের না, আর রোজকার না ; এখন যেন সকলেরই রোজই নাই-নাই। আর তখনকার দিনে গণ্ডগাঁয়ের কেমন একটা ছিরি ছিল, এখন তা' দেখ্‌তে পাইনে। তখনকার কেউ যদি আজ এ গাঁয়ে আসে তবে গাঁয়ের চেহারা দেখে, চিন্‌তেই পারবে না যে এই

সেই লক্ষ্মীদিয়া কি পোড়াবৌ, যা-ই বলুন। সে ছিরি আব নাই। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

পূর্ব্বের সঙ্গে তুলনায় এ গ্রামের শ্রী ঋদ্ধি কিরূপ পরিবর্ত্তিত বা অবনত অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা তখনকার লোকেই এখন বলিতে পারে। আমি মাত্র তেইশ বছর আগেকার মানুষ, তাই গ্রামের ষাট বছর আগেকার রূপটা ধ্যান করিয়া লইয়া আন্দাজের উপরেই বলিলাম,—হ্যাঁ, কই আর তেমন শ্রী। মাঠের, মানুষের আর গরুর চেহারা ঠিক এক রকম দাঁড়িয়েছে, সবই যেন পোড়া-পোড়া।

—পোড়া-পোড়া বৈ কি, সে চেহাবা আর নাই। তখনকার দিনে মানুষের উঠোনে দুব্ব গজ্জাত না বাবু, ধান মাড়াইয়ের চোটে ; এখন সব উঠানেই জঙ্গল। যাক্ সে কথা। আমি যখনকার কথা বল্‌ছি, তখন গাঁয়ের মানুষ বিদেশে বেরুতে কেবল লেগেছে। এখন যেমন সবাই বিদেশে, আর বিদেশ এসেছে কাছে, তখন ত এমন ছিল না ; তখন বিদেশ ছিল দূর, আর বেরুত লোক কমই—একটা দুটো ক্কচিৎ ভবিষ্যৎ। তখন ত' রেল ছিল না যে হু হু শব্দে তিন দিনের পথ দিন ডণ্ডে নিয়ে ফেলবে একেবারে নিভ্‌ভয়ে। তখন নদী থাক্‌ত বারমাস বওতা, খাল-বিলেও বারমাসই জল থাক্‌ত, যাওয়া-আসা সবই চল্‌ত নৌকয় করে, আর ভয়ে প্রাণটা হাতে করে ;—ঝড় তুফোন আব ডাকাত, এরাই ছিল নৌকব যম। ডাকাতের ভয়ে নৌক সব বহর বেঁধে চল্‌ত, দলছাড়া একলা নৌক পেলেই ডাকাতে তাকে মারত। তা যা হোক বাবু, এ কথা মিছে না যে মানুষের পযসা তখন ছিল কম। এখনকার মত লোকে বোজই ভাতে না মলেও কাঁচা পয়সার মুখটা তেমন দেখ্‌তে পেত না। ঐ কাঁচা পযসার লোভেই তখন মানুষে বিদেশে বেরুতে লেগেছে—দিনাজপুব, বংপুব, জলপাইগুড়ি ঐ সব উত্তর অঞ্চলে। আমাদের এই লক্ষ্মীদিয়ার হরিশ ঠাকুর কাঁচা পয়সার লোভেই হঠাৎ নেচে উঠে একদিন বৌ ছেলে নিয়ে যাত্রা ক'রে নৌকয় উঠ্‌ল ; তখন বর্ষাকাল। এই নদী দেখ্‌ছেন ময়না, সেউলি আর ঘাসে ভরা, ছোঁড়ারা লাফ্ দিযে দিয়ে এপাব ওপার কবে—তখন ময়নাব এমন হাড়চাটা চেহারা ছিল না। আপনাদের ঐ চরের জমিব মোট্‌টাই মযনার পয়স্তি ; ওপারের ঠিক্ অতখানি ; নদী তাহ'লে কত চ্যাওড়া ছিল তা একবাব ভেবে দেখনু। বর্ষাকালে তার জলের ডাকে কান পাতা যেত না, এমনি হু হু শব্দ। যা হোক্, কাঁচা পয়সার টানে হরিশ ঠাকুর বৌ-ছেলে নিয়ে নৌকয় উঠ্‌ল, বাড়ীতে রেখে গেল বিধবা মেযে যোগেশ্বরীকে, যোগেশ্বরীর বছর তিনেকের একটা মেয়ে মিন্মই, আর তার বছব দেড়েকের একটা ছেলেকে।

হরিশ ঠাকুরের যাওয়ার সময় যোগেশ্ববী কেঁদে বল্‌ল,—বাবা আমাদের কি উপায় হবে?

হরিশ বল্‌ল,—তোমাদের উপায়? তোমাদের উপায় বেখে গেলাম ঐ গোলাবন্দী কবে, আর ঐ ঢেঁকি থাক্‌ল, ধান ভান্‌বে আর খাবে। বলে সে মেয়েকে পায়ের ধুলো দিয়ে নিষ্কাতরে যেয়ে নৌকয় উঠ্‌ল। কিন্তুক হরিশ ঠাকুবের মত মানুষ বোঝে না বাবু, যে যাবার সময় মানুষকে অমন করে গোলা দেখিয়ে যাওয়া তাকে অপমান করা। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ।

—তা-ই। বিশেষ যখন কেবল যাচ্ছ বলেই কষ্টে আর একজনের বুক ফাট্‌ছে।...এদিকে মা আর মেয়ের কান্না আর শেষ হয় না। নৌক খোল্‌বার সময় বয়ে যায়, দাঁড়ি বেটা কাছি খুলে ফেলেছে, কিন্তুক মেয়ে মাকে আর ছাড়ে না,—হরিশ নৌকর উপর থেকে দাঁত খিচিয়ে তজ্জন ক'রতে লাগল। মেয়েটা হালে বিধবা হয়েছিল। বাপ তাকে ফেলে রেখে বিদেশ যাচ্ছে দেখে তার সোয়ামীর শোকটাই উথ্‌লে উঠ্‌ল বেশী করে ;—সোয়ামী যদি বেঁচে থাক্‌ত তবে ত এমন করে চ'খে আঁধার দেখ্‌তে হ'ত না। হরিশ ঠাকুর কেমন যেন একটা দুম্মুখ চোয়াড় ধরণের লোক ছিল ; চিরদিন একটা মিষ্টি কথা ভুলেও সে মেয়েকে বলে নাই, যাবার সময়ও দুখিনী মেয়েটাকে একটা মনবুঝান কথাও বলে গেল না। কাজটা কি তার উচিত হয়েছিল? বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—না, তার উচিত হয়নি।

—তা যাই হোক্, হরিশের বাস্তনী মেয়েকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রেখে ছেলে ভারতকে নিয়ে নৌকয় উঠল। নৌক ছেড়ে দিল, হরিশ ঠাকুর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দুগ্গা দুগ্গা করতে লাগল, জলের টানে নৌক তীরের মত ছুটে চল্ল ; যোগেশ্বরী চোখের জল মুছে ছেলেটাকে কাঁখে করে মেয়েটার হাত ধরে ফিরে এল। কিন্তুক আমরা সেখানে দাঁড়িয়েই থাক্লাম সেই চলন্ত নৌকর দিকে চেয়ে, মনটা কেমন খালি হ'য়ে গেল। চলে যাওয়ার একটা দুঃখু আছে, বাবু, যা নিতান্ত নিম্পরেরও বাজে। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ, তা ত বাজেই।

—বাজে বৈকি। তারপর বর্ষার ঐ ভরা নদী। আমরা যেন বুঝতে পাবলাম বাবু, নদীতে যেমন জল ধরছে না, বিধবা এই মেয়েটির বুকের চার পাশ তেম্নি ভরা-জলের ধাক্কায় ভাঙছে। নদীর বাঁক ঘুরে নৌক চলে গেল, যখন আব একেবাবেই দেখা গেল না তখন আমবা ফিরে এলাম, খানিক এসেই একবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখ্লাম, নদীর ঘাট যেন খা-খা কর্ছে।

হরিশ বিদেশ গেল কি করতে তা' সে-ই জানে। মেয়েটা কিন্তুক ভাত-কাপড়ের দুঃখু কোনদিন পায় নাই। তখনকার দিনে মান্যে মান্যে আপন আপন একটা ভাব ছিল। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ, ছিল বলেই মনে হয়।

—ছিল বৈকি, কিন্তুক এখন তা নাই। নিজেরই মন দিয়েই বুঝতে পারি বাবু, তেমন আপন আপন যেন আর কাউকে লাগে না। যাই হোক্, যোগেশ্বরী ছেলে-মেয়েকে মানুষ করতে লাগল; গাঁয়ের দশজনই তাকে নিজের মা-বোনের মত চ'খে চ'খে রাখে, পাহারা দেয়, খোঁজ তল্লাস করে, বাজার-হাট ক'রে দেয়, দরকার হ'লে বদ্যি ডেকে আনে, ক্ষেতের আফর ঘরে তুলে দেয় ; এম্নি ক'রে গাঁয়ের লোকই তাকে আগলে রাখে।... হবিশ ঠাকুর বর্ষার দিনে আসে, আবার বর্ষা থাক্‌তে থাক্‌তেই চলে যায়। আমরা হরিশেব মুখে শুনি দেশ-বিদেশেব গল্প, কবে কাব নৌক কেমন ক'রে ডাকাতে মেরেছিল তারই কথা, বিদেশী লোকের রীত-বেরীতের কথা, আর লোকেব মুখে শুনি হরিশের টাকার কথা—হরিশের টাকার নাকি অন্ত নেই ; শুন্‌লাম, হরিশ সেই বিদেশেই উত্তরেই পাকা ঘর-বাড়ি কবেছে, সেইখানেই সে থাকবে ; এমনও নাকি হরিশ বলেছে শুন্‌লাম যে, মেয়ের ছেলেটা যদি মানুষ হ'য়ে দেশের বাড়ী রাখ্‌তে পারে বাড়ী থাক্‌বে, না পারে বাড়ী যাবে। শুনে আমার মনে বড় কষ্ট পেলাম। বাপ-ঠাকুদ্দার বাস্তুর মায়া কাটিয়ে হরিশ সেই মুলুকে থাকতে চায় কোন্ প্রাণে কিন্তুক অবশেষ কালে হলও তাই।—প্রথম প্রথম সে বছব বছর আস্ত, তারপর দু'তিন বছর পর পর তারপর একেবারেই আসা ছেড়ে দিল। আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, হরিশ বলেই এমন কাজটা পার্‌ল, আর কেউ পার্‌ত না। কিন্তুক্ এখন দেখ্‌ছি বাবু, সবাই তা' পারে। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ। এখন ত বিদেশেই ঘর-বাড়ী করে আছে অধিকাংশ।

—আছে বৈকি বাবু, আছে ; তা' না থাক্‌লে আর গাঁয়েব এমন অরাজক হা-দশা হবে কেন! তা' যাক্, এখন হরিশের কথাই শেষ করি। হরিশ আর গাঁয়ে আসে না, এম্নি করেই দিন যায়; হঠাৎ একদিন একপহর বেলা আছে, এমন সময় যোগেশ্বরীরই গলার মড়া কান্না শুনে আমরা দশে-বিশে দৌড়ে এলাম—বলি ব্যাপারটা কি। এসে শুন্‌লাম, হরিশ ঠাকুর মারা গেছে ; সে যেদিন মারা গেছে তাব একদিন পরেই তার বাস্তনীও মারা গেছে—দু জনেই ঐ এক কলেরাতেই ; ছেলে ভারত ভালই আছে। তখন গাঁয়ে গাঁয়ে ডাকের আপিস ছিল না, এ গাঁয়েও ছিল না ; উ-ই নিধিরামপুর থেকে, আড়াই কোশ্ দূর থেকে, হরকরা এসে, মঙ্গলবারে মঙ্গলবারে ডাকের চিঠি দিয়ে যেত। আমরা চিঠি পড়ে হিসেব কবে দেখ্‌লাম, হরিশ ঠাকুর মারা গেছে আজ দশ দিন।...

যা' হোক্, সেদিকে যা' হবার তা' হল।

কিন্তুক এর মধ্যে আর দুটো ঘটনা ঘটে গেছে—মিন্মই আর ভারতের বিয়ে। তখনকার দিনে, বাবু, বিয়েব ছেলে ছিল সস্তা, মেয়ে ছিল আক্রা, টাকা দিয়ে মেয়ে নিতে হ'ত। এই টাকা চাওয়া আর দেওয়া নিয়ে কথা-কাটাকাটি চল্তে চল্তে মিন্মইর বয়েস দশ উৎরে এগার হয়ে গেল। এখন ঘরে ঘরে সতর আঠার বছরের আইবুড়ো মেয়েরা বেশ স্বস্ছন্দে আছে ; বড় হয়েছে বলে তাদের বাপ মার কি তাদের নিজের কোনো ভাবনাই যেন নেই। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ। তা ত আছেই।

—আছে বৈকি। কিন্তুক তখন দশ উৎরে এগারোয় পড়লে মান্ষের হাত মাথায় উঠে যেত। আর তার গঞ্জনা ছিল কি কম! গঞ্জনার জ্বালায় লোকে গলায় দড়ি দিতে দৌড়ত। যোগেশ্বরী ছিল, বোকাসোকা আর বেজায় ঢিলে মানুষ। বিধবা আর একা হলেও যে কাজটা সে পার্ত তা-ও যেন তার ভুল হয়ে যেত। ছেলের ঘর বাছ্তে বাছ্তে, মেয়েব দর কষ্তে কষ্তে, হবে হচ্ছে, এটা নয় ওটা করতে করতে মিন্মই এগারোয় পড়ল ; তখন লেগে গেল হুড়োহুড়ি তাড়াতাড়ি। লোকের গঞ্জনায় যেন পাগল হয়ে যোগেশ্বরী মিন্মইর বিয়ে দিল এক তেকেলে বুড়োর সঙ্গে। তাতে দেশের লোকের মাথার পোকা মরল, কিন্তুক দেশেব লোকের আশীর্ব্বাদ পেয়েও বুড়ো বেশি দিন টিক্ল না ; মিন্মই বিধবা হ'য়ে মায়ের কাছে এল—তখন সে বারো উৎরে মাত্তর তেরোয় পড়েছে। আর একটা কথা, বাবু : তখনকার দিনে বিধবা হওয়াটা কেমন ধাত-সওয়া মত ছিল, কিন্তুক আজকাল সেটা যেন কারুরই ধাতে সয় না। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

পূর্ব্বে বৈধব্য সকলেরই ধাতে সহ্য হইত, এবং এখনও পূর্ব্ববৎ সহ্য হয় কিনা তাহা সহসা অনুমান করিতে না পাবিয়া পিরুব প্রশ্নের উত্তরে কিছুক্ষণ নিরুত্তরই রহিলাম। খানিক ভাবিয়া বলিলাম,—তা' হবে।

পিরু বলিল,—তা-ই। বুড়ো বুড়ো বিধবাবও এখন বিয়ে হয শুনি ; কিন্তুক তখনকার দিনে আঁতুড়ে মেয়ে বিধবা হলেও তার আবার বিয়ের কথা লোকে মনে আন্তেও পাব্ত না।

হিন্দুর সনাতন শাস্ত্র এবং সনাতন প্রথার প্রতি আমার মনের টান নাই, তাদের বিরুদ্ধে আমার আক্রোশও নাই ; বাহিরের জিনিস বলিয়া নির্লিপ্ত চিত্তে ঐগুলিকে বাহিরেই রাখিয়া দিযাছি। শাস্ত্রে প্রথার গরমিল, শাস্ত্রে শাস্ত্রে পদে পদে গরমিল, কাজে কথায় গবমিল—চারিদিককার অসংখ্য সেই গরমিলের গোলোকধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করিবার অনিচ্ছাতেই আরও দশজনের মত আমিও হিন্দুর, এমন কি মানুষেরই ধর্ম্মাধর্ম্ম আচার বিচার বিষযে একেবারে নিঃস্পৃহ। ধর্ম্ম মনে, আর যাহাতে মানুষের দুঃখের হ্রাস হয়, তাহাই কর্ত্তব্য—এই শেষ সিদ্ধান্ত করিয়া আমি বসিয়া আছি। পিরুর কথার উত্তরে অনেক কথাই বলিবার ছিল—বৈধব্য কেহ সহিতেছে না তারও হেতুর মর্ম্মের কথাটা বলিতে পারিতাম ; কিন্তু পথে চলিতে চলিতে গুরুভার অথচ অনাবশ্যক যে বস্তুটিকে অক্লেশে এড়ান যায় তাহাকে ধাক্কা দিয়া দিয়া সঙ্গের সাথী করিয়া লওয়া নির্ব্বুদ্ধিতা।

বলিলাম,—তারপর মৃন্মীয়দের কি হ'ল?

পিরু কাঁধের গাম্ছাখানা ডান দিক হইতে বাঁ দিকে আনিয়া বলিতে লাগিল,—তারপর অনেক দিন যোগেশ্বরী মন খুব খারাপ ক'রে থাকল ; মেয়ের মুখের দিকে চাইলেই তার চোখ ছল্ ছল্ করে। কেঁদে কেটে ভারতকে সে চিঠি লিখ্ল—বৌটিকে নিয়ে একবার আয় ভাই ; তাকে আমি দেখি নাই ; যদি তোদের মুখ দেখেও আমার বুকের আগুন নেবে।... বৌ নিয়ে ভারত দেশের বাড়ীতে এল। এসেই বল্ল, মাস ছয়েক থাক্ব—বেশিদিন থাকবার যো নেই ; সেখানে কাজ বিস্তর, জোত্, জমা, তেজারতি, কত কি। দেখ্লাম ছেলেটি বেশ সুপুরুষ, তার বাপের মত কাটখোট্টা হ্যাঙ্গামে নয় ; বৌটাও চমৎকার লক্ষ্মী। বাড়ীতে শুনলাম, বৌটার সন্তান হবে, এই তিন মাস।

যোগেশ্বরী ভাই আর ভাজ পেয়ে যেন হাতে স্বগ্গ পেল, মিন্মইও তাই ; মায়ে ঝিয়ে একেবারে অস্থির হয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল, তাদের কি খাওয়াবে, কেমন করে তুষ্ট করবে। রক্তের টান ত ছিলই, তার উপর তারা গরীবের বৌ ঝি, ওরা বড়লোক, ওদের অন্নেই মিন্মইর মা মানুষ ; দয়া ক'রে ওরা এসেছে যদি, কষ্ট পেয়ে না যায়।

ভারত সময়-মত খায়-দায় আর বৌটিকে নিয়ে মত্ত হয়ে থাকে।

ভারতের ছ'মাসের দু'টি মাস এমনি করেই কাট্‌ল, কিন্তুক তারপরই এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল; যার দুঃখু এখনো আমার যায় নাই, বাবু। কাণ্ডটা ঘট্‌ল সত্যিই, কিন্তুক না ঘট্‌লেও তা কারু কিছু হানি হ'ত না। যদি বলেন, ঘটালেন ভগমান—কিন্তুক সেটা বড় শক্ত কথা, বাবু; সে-কথার ফয়শালা আমরা করতে পারিনে! ...

পিরু খানিক চোখের পলক ফেলা বন্ধ রাখিয়া নিঃশব্দ থাকিয়া বলিতে লাগিল,—যেদিন ঘটনাটা ঘট্‌ল, বাবু, সে দিন বড় বিষ্টি; সন্ধ্যে রাত, অন্ধকার, আর তেম্‌নি গলদ্‌ধারে বিষ্টি। যোগেশ্বরী তার হবিষ্যি ঘরে বসে জপ করছিল, তার ছেলেটি একধারে বসে ইস্কুলের পড়া করছিল। ভারতের বৌ গিরিবালা রান্নাঘরে মাছভাত রাঁধছিল; হঠাৎ কি দরকারে সে ভারতের শোবার ঘরে উঠে চৌকাঠে পা দিয়েই দেখ্‌ল—

পিরু থামিল। আমি সোৎসুকে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম; এবং পিরু আর কথা কহে না দেখিযা উপরন্তু জিজ্ঞাসা করিলাম,—ভারতের বৌ কি দেখ্‌লে?

উত্তরে পিরু অত্যন্ত বিষণ্ণ সুরে বলিল,—বাবু, আপনি আমার মনিব। আপনি ছেলেমানুষ, কিন্তুক গোখ্‌রোর বাচ্চা গোখ্‌রোই। মনিবের মুখের সামনে কথাটা উৎচারণ করব কি না তাই ভাব্‌ছি।

আমি মুরুব্বির মত সদয় কণ্ঠে অভয় দিয়া বলিলাম,—বল।

পিরু সাবধানে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিযা গলা খুব খাটো করিযা বলিল,—দেখ্‌ল ভারত মিন্মইর মুখখানা তুলে ধরে' হেসে হেসে—

আমার কল্পনা ছুটিতেছিল; লাফাইয়া উঠিলাম,—বল কি?

পিরু কথা কহিল না।

বহুক্ষণ নতমুখে নিস্তব্ধ থাকিয়া যখন সে কথা কহিল, তখন তার কণ্ঠস্বর ক্লেশে যেন ভাঙা ভাঙা। বলিল,—মান্‌ষের মন কি যে চায় আজও তার দিশে পেলাম না, তা আগেই বলেছি। ভগমান ধম্ম দিয়েছেন, অধম্মও দিয়েছেন, আর মন দিয়েছেন বুঝে নেবার। কিন্তুক মানুষ তা' বুঝ্‌ল না, বাবু। সব ডুবিয়ে দিয়ে, সব ভাসিয়ে দিয়ে মানুষ ঐ কাজটিকে কেন বড় করে' তুলেছে তা' অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারি নাই, বাবু। জিনিসটা আছে সত্যি, আর সে ছুটবেই, কিন্তুক তার ওজন নাই কেন তা' জানিনে। মানুষ ইচ্ছা কল্লেই জিনিসটাকে বশে আন্‌তে পারে—দুনিয়ার সব যদি মিছে হয় তবু এ-কথা মিছে নয়, বাবু, এ আপনাকে আমি বল্‌ছি। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ।

—আপনারা ত' তা' বলবেনই ভদ্দরলোক, লেখাপড়া শিখেছেন; আমরা চাষামানুষ, আমবাও তাই বলি।

—তারপর কি হ'ল?

—বৌটি তাই দেখে যেমন গিয়েছিল তেম্‌নি শব্দটি না করে চুপ্‌চাপ্‌ ফিরে এল। কিছুক্ষণ পরেই ও-ঘরের বারান্দা থেকে যোগেশ্বরী ডেকে বল্‌ল,—ভাত পুড়ে যে ছাই হয়ে গেল বৌ, ঘুমুলি নাকি? অনেকবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে যোগেশ্বরী ভারতকে ডেকে রান্নাঘরে তদারকে পাঠিয়ে দিল; ভারত এসে দেখ্‌ল, বৌ খালি খুঁটি ঠেস দিয়ে ঠায় বসে আছে, উনুনের উপর হাড়ি চাপান।...

মানুষের মনের ভাব আমরা ভাল বুঝিনে বাবু, বৌটার তখন মনের কি ভাব হ'ল তাও জানিনে; আর কি ক'রে যে ওদের অভিযোগ ঘট্‌ল তাও জানিনে। মিন্নই সোমত্ত মেয়ে; মামীর সুখ দেখে তার সুখের লোভ হ'তে পারে না এমন নয়। কিন্তুক ভারত তাকে গায়ে পড়ে টেনেছিল, এ নিশ্চয়। ছোঁয়া দিয়ে, ছুঁয়ে, চাউনি দিয়ে, হাসি কেড়ে সোমত্ত মেয়েকে পাগল ক'রে তোলা কিছু কঠিন ত' না। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ

—আমার মনে হয় কি জানেন বাবু? তাই-ই ঘটেছিল। আপ্‌না-আপ্‌নির মধ্যে গা ঘেঁষাঘেঁষিতে যাদের ধম্মজ্ঞান নেই আর আপন-পর হুঁস নাই তারা ত' ঐ কাজ করবেই—ইচ্ছে করেই ঘেঁষে আসবে। যোগেশ্বরী বুঝ্‌-সুঝের তালসামালী লোক ছিল না; সে এম্‌নিধারা আল্‌গা মানুষ ছিল যে, যা চোখে দেখ্‌ত তাও যেন তার মনেব নাগাল পেত না; বাইরের হাবভাব লক্ষণ দেখে ভিতরেব খবর পাওয়া ত' তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। ..

বৌয়ের ভাবগতিক দেখে ভাবতেব কেমন সন্দেহ হ'ল; সে সাবধান হ'ল, কিন্তুক সকল দিকে সাবধান হ'লে তবেই সব দিক বাঁচত।—মিন্নই হঠাৎ একদিন মামাকে মামা ব'লে ডাকা ছেড়ে দিল; তা' ত' দিলই, এমন কি সে ভাবতেব সাম্‌নে যেন আসতেই চায় না এমনি লজ্জা। তাই দেখে যোগেশ্বরী রেগে রুখে উঠে বল্‌ল,—মেনি, তোব হ'ল কি লো? মামার সাম্‌নে বেরুস্‌নে যে?

যোগেশ্ববীর ভয় হ'ল, মিন্নই এই হঠাৎ গুটিয়ে আসাতে অনাদব হ'ল মনে ক'রে ভারত রাগ না কবে। কিন্তুক একেবারে ভুল বাবু, সব একেবাবে ভুল। মিন্নইব এ লজ্জা যে কিসেব লজ্জা তা' বোঝবাব সাদ্যি যোগেশ্ববীব ছিল না। এ লজ্জা তাব পুরুষেব কাছে প্রথম লজ্জাত্যাগের লজ্জা। এর পর মিন্নইব মুখে মামা ডাক্‌টা আব তেমন ক'বে ফুট্‌লই না। যোগেশ্বরী তাকে বক্‌তে লাগ্‌ল; বক্‌তে বক্‌তে হঠাৎ একদিন যোগেশ্বরীর মাথায় বাজ ভেঙে পড়্‌ল, যাব আগুনে তার ভিতর বা'ব পুড়ে' একেবাবে ছাব হয়ে গেল। পাপ আব পাবা বেরুবেই বাবু। মাস চাব-পাঁচ পবে যোগেশ্ববী ধরে ফেল্‌ল যে—কথাটা স্পষ্ট ক'বে না-ই বল্‌লাম বাবু। লোকে বলে মরার বাড়া বিপদ নাই; কিন্তুক এ বিপদ যে মরার বাড়া ও কত বড় বিপদ তা' যেন আমাব শত্তুরকেও কখন না জান্‌তে হয় বাবু। যোগেশ্বরী কোণায় কোণায় কেঁদে বেড়াতে লাগ্‌ল, খাওযা-দাওযা একেবারে ছেড়ে দিল। নিজের মনেই ভেবে দেখুন বাবু, এই পাপ আর এই লজ্জা গোপন কবতে কত বড় একটা পাপকায্যেব দরকাব। যোগেশ্বরী একেবারে পাগলের মত বেঠিক হ'য়ে উঠ্‌ল।

বাবু, কথাটা ভাবতেও যেন দম বন্ধ হযে আসে।... সব্বনাশ যে এতদূর এগিযে গেছে বৌটা তখনই তা' জানতে পাবে নাই; তবে খুব বেশিদিন অজানাও তাব থাক্‌ল না।

ভারত ফাঁকে ফাঁকে বেড়ায়—ছিপ্ ফেলে' মাছ ধবে, পাড়ায় পাড়ায় দাবা, পাশা খেলে—যেন সে কিছুর মধ্যেই নেই। মেয়েব মুখে সব জানতে পেরেও যোগেশ্বরী ভাইকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না। কিন্তুক ভাবুন বাবু, এইটে যদি ঠিক্ উল্টো হয়ে ঘট্‌ত? খুন হোক্ না হোক্, ভারত তার বৌকে ত্যাগ করত কি না? বলুন বাবু, ত্যাগ কর্‌ত কি না?

—করতই ত'। বলিয়া আমি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলাম। জোয়ান পুরুষ আমি এবং সেই হিসাবে ভারতেবই সমধর্ম্মী ; ইহারই অকারণ একটি লজ্জা যেন জোর করিয়া আমার মুখ ঠেলিয়া অন্য দিকে ফিরাইয়া দিল—পিরুর কণ্ঠস্বরে এমনি একটা ক্ষমাহীন আক্রোশের তেজ ছিল।

পিরু বলিতে লাগিল,—সোয়ামী এত বড় দাগাটা তাকে দিল, এমন অবিশ্বাসের ইতর কাজটা সোয়ামী করল; বৌটা শুধু কেঁদে কেঁদে চক্ষু দুটি অন্ধ ক'রে ফেল্‌ল, একটি কথা সে বল্‌ল না যে তুমি এ কাঁজ করলে কেন, কি আর কিছু।

তারপর যে ব্যাপার ঘট্‌ল তা' আমি বল্‌ব আপনাকে, কিন্তুক তার আগে সেই সতীর উদ্দেশে দণ্ডবৎ ক'রে নেব। বলিয়া পিরু উপুড় হইয়া পড়িয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া সতীর পায়ে গভীর শ্রদ্ধার একটা প্রণাম নিবেদন করিল।

যখন সে মুখ তুলিল তখন তার চোখ ভিতরকার জলের ঝাপটায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। রক্তবর্ণ চক্ষে সোজা আমার দিকে চাহিয়া পিরু বলিতে লাগিল,—দু'তিন দিন চুপ করে' থেকে চোখের জল ফেলে' ফেলে' আটমাস পোয়াতী বৌটা একদিন দরজায় খিল এঁটে দিয়ে নিজেরই কাপড়ে আগুন লাগিয়ে দিল। তখনই কারো নজরে পড়ে নাই, আগুন কিছুক্ষণ জ্বলবার পর হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে ধোঁয়া আর ধোঁয়ার সঙ্গে মানুষ পোড়ার দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে দেখে, কি হ'ল, কি হ'ল দেখ্‌, দেখ্‌, করতে করতে এসে যখন দরজা ভেঙে লোকজন ঘরে ঢুক্‌ল তখন পোড়া শেষ—বৌটা খাবি খাচ্ছে।... সেই থেকে এ গাঁয়ের নাম পোড়াবৌ। বলিয়া পিরু নিশ্বাস ছাড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল; গামছা দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিতে বলিতে গেল,—বেশ করে—লোকে এ গাঁয়ের নাম করে না। ...

'উত্তরা'

মুক্তি

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

আমি একটি সামান্য জীবনের ছেঁড়া-একটুকরা ইতিহাস বলিতে বসিয়াছি। হয়তো গল্পের আসর ইহাতে জমিবে না।

মুক্তি গৃহস্থ-ঘরের বৌ হইয়া যেদিন কলিকাতা সহরের সদর-রাস্তায় পানের খিলি বেচিতে বসিল, সেদিন তার সঙ্কোচ ততটা হয় নাই যতটা সে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। বারো বৎসর বয়সে বিবাহিত হইয়া আসিয়া স্বামীর সহিত মুক্তি কলিকাতার একটা সাঁৎসেতে গলির মধ্যে সেই-যে প্রবেশ করিয়াছিল, তারপর ছয় বৎসরের মধ্যে একটিবারও আর বাহির হইতে পায় নাই। সেই ছোট্ট অন্ধকার ঝুপ্‌সী ঘরটির মধ্যে দিনরাত আবদ্ধ থাকিয়া তার এম্‌নি অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, জগতের কোথাও যে আলো আছে, বাতাস আছে, তা তার মনেই পড়িত না। আজ হঠাৎ একেবারে এতটা আলোর মধ্যে আসিয়া পড়িয়া সে যেন দিশেহারা হইয়া গিয়াছিল;—তার অন্ধকার-অভ্যস্ত চোখ আলোর পানে সে ভালো করিয়া মেলিতেই পারিতেছিল না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, গৃহস্থ-ঘরের অন্তঃপুরিকা হইয়া মুক্তির পক্ষে বাজারের পানওয়ালি হওয়া কেমন করিয়া সম্ভব হইল? অনেকে কথাটাকে হয়ত আজগুবি মনে করিবেন, কিন্তু তা নয়। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আমি সাক্ষী ডাকিতে রাজি আছি;—মুক্তিকে কলিকাতা সহরের অনেকেই পান বেচিতে দেখিয়াছে।

অত্যন্ত অনাদরে ও অবহেলায় মুক্তি মানুষ হইয়াছিল। এক গরিবের ঘরের মেয়ে, তার উপরে সে যখন খুব কচি, তখন তার মা মারা যায়—কাজেই আদর তার ভাগ্যে জোটে নাই।

কচি মেয়ের দোহাই দিয়া মুক্তির বাপ আবার বিবাহ করিয়াছিল বটে, কিন্তু মেয়ের তাতে বিশেষ কিছু সুবিধা হয় নাই। কারণ সতীনের মেয়েকে ভালোবাসিতে পারে এতটা উদারতা মুক্তির সৎমায়ের ছিল না।

মুক্তি ভয়ে-ভয়েই দিন কাটাইত,—যতদূর সম্ভব আপনাকে গোপন করিয়া চলিত—কারণ যেখানে যতটুকু সে সংসারের চোখে পড়িত, সেইখানেই তার শাসন ছিল,—আদর ছিল না। নিজেকে এই গোপন করিয়া চলাটা মুক্তির এমন স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল যে স্বামীর কাছে সে নিজের হৃদয়টিকে মেলিয়া ধরিতে পারে নাই, স্বামীও তাহাকে পাইবার জন্য কোনোদিন তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। বেচারাকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সে-জিনিসটা তার ধাতেই ছিল না।

মুক্তির স্বামী কলিকাতায় কোন অপিসে অল্প-মাহিনায় সামান্য চাকরি করিত। সে এ সংসারে বেশি-কিছু চাহিত না, অল্পতেই খুসি ছিল এবং সেই অল্পটুকুও না পাইলে বিরক্ত হইয়া উঠিবার মতো তেজ তাহার ভিতরে ছিল না। সে ছিল নিরীহ ভালোমানুষ। তার এই নিরীহতা এতটা বিরাট ছিল যে কোনোরূপ উত্তেজনাই তাহাকে আদপেই চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারিত না। তার উপরে সে ছিল নকলচাঁদ বাবাজীর শিষ্য, এমন গুরুভক্ত শিষ্য কলিকালে দুর্লভ। সে চিত্ত স্থির করিবার জন্য গুরুর উপদেশে প্রতিদিন ঘন-ঘন গঞ্জিকা সেবন করিত। তার গাঁজার মাত্রা ক্রমেই এমন বাড়িয়া উঠিতেছিল যে লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, কোন্ দিন বা চিত্ত-স্থির-রাখা বিষয়ে অতবড় মহাত্মা নকলচাঁদ বাবাজীকেই সে ছাড়াইয়া উঠে।

নকলচাঁদ বাবাজী চক্ষু মুদিয়া উপদেশ দিতেন—কামিনী-কাঞ্চনের মোহ বড় ভয়ঙ্কর! মাছ যেমন জালে আটকায় এবং তাহাতেই মরে, মানুষ তেমনি এই কামিনী-কাঞ্চনের মায়াজালে পড়িয়া নরকে ডুবিয়া মরিতেছে!

মুক্তির স্বামী গুরুর এই অমূল্য উপদেশ গদগদচিত্তে জোড়হাত করিয়া বসিয়া শুনিত এবং তাহা পালন করিবার বিধিমত চেষ্টা করিত। কাঞ্চন-সম্বন্ধে সে একরূপ নিশ্চিন্ত ছিল,—তার দায় বড় ছিল না, কারণ সে-জিনিসটা আসিবার পথেই অন্তর্দ্ধান করিত এবং অধিকাংশ সময়েই তার আসিবার বালাইও ছিল না। কিন্তু কামিনী তো তেমন নয়—সে যে দিনরাত্রি চোখের সামনে জাজ্বল্যমান হইয়া আছে। সেই মুক্তির স্বামী যতক্ষণ বাড়িতে থাকিত চিত্ত স্থির-রাখিবার মহৌষধ ভক্তিভরে সেবন করিত। সে মনে-মনে তারিফ করিত—কি আশ্চর্য্য দ্রব্যগুণ! মানুষের এত বড় শত্রু যে কামিনী, তাও এই দ্রব্যগুণে একমুহূর্ত্তে চোখের সামনে হইতে সাফ্ পরিষ্কার হইয়া যায়,—তার চিহ্নমাত্রও থাকে না! এমন সুলভ জিনিস থাকিতে মানুষ কেন যে সংসারের পাঁকে ডুবিয়া মরে সে ভাবিয়া পাইত না। এ কি সামান্য কথা! যোগ-সাধনের চরম অবস্থা যে সমাধি তাহাই এই দ্রব্যগুণে মুহূর্ত্তের মধ্যে করায়ত্ত হয়। কোনো সাড়া নাই, শব্দ নাই—এত বড় জগৎখানাই কোথায় তলাইয়া যায়। ভাগ্যে সে নকলচাঁদ বাবাজীকে পাইয়াছিল, তাই তো এ-যাত্রা রক্ষা পাইয়া গেল; নয় ত তার কি দুর্দ্দশাই হইত; সে ভাবিত মানুষগুলো কী বোকা! এমন সাধু মহাত্মা জলজ্যান্ত থাকিতে লোকে কিনা হা-অন্ন হা-বস্ত্র করিয়া কাঁদিয়া মরে। নকলচাঁদ বাবাজীর পায়ে আসিয়া পড়িলেই তো সব গোল চুকিয়া যায়।

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে তার মন যখন বিশ্বসংসারের মানব-জাতির দুর্দ্দশায় কাতর হইয়া উঠিত, সে তখন দূর-হোক্-গে ছাই বলিয়া বেশি করিয়া চিত্তস্থির করিবার আয়োজনে বসিয়া যাইত।

এমনিতর ছায়ার মানুষ লইয়া মুক্তিকে ঘর করিতে হইত। স্বামীর যে একটা অস্তিত্ব আছে তাহা সে অনুভব করিবারই সুযোগ পাইত না। স্বামীর আদর তো ছিলই না, অত্যাচারটাও যদি থাকিত, তা হইলেও না-হয় সেই অত্যাচারের আঘাতে স্বামীর একটা ছাপ তার উপরে পড়িবার অবসর পাইত। কিন্তু যেখানে কেবল অবহেলা, সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো সম্বন্ধই জমিয়া উঠিতে পায় না। তা ছাড়া, মুক্তি ছিল একলা ঘরের একলা মানুষ। আর পাঁচজনকে লইয়া যে

তার হৃদয়ের ছন্দ উঠিবে পড়িবে তারও জো ছিল না। কাজেই সে আপনার মধ্যে আপনি এতটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়া থাকিত যে তার সেই দুঃখী-ঘরের আসবাবহীন ফাঁকা জায়গাও সে বেশি করিয়া জুড়িতে পারিত না। দিনের পর দিন কাটিয়া যাইত, প্রতিদিনের কর্ত্তব্যগুলি সে একটির পর একটি করিয়া সারিয়া রাখিত, তাহাতে তার আনন্দও ছিল না, দুঃখও ছিল না। সে যেন কলের পুতুলের মতন চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইত।

হঠাৎ একদিন একটি সামান্য মানুষের হৃদয় তার লাভ হইয়া গেল। সে বামার মা। সে ছিল ঠিকা-দাসী। যে দুঃখী-পাড়ায় মুক্তিরা থাকিত, এই বামার মা ছিল সেই পাড়ার একমাত্র দাসী। সে সকাল-বিকাল দু-বেলা সদর রাস্তার ধারে বসিয়া পান বেচিত, দুপুর-বেলা ঝড়ের মতো পাড়ার মধ্যে আসিয়া ঘরে ঘরে নির্দ্দিষ্ট মতো কাজ করিয়া দিয়া চলিয়া যাইত; কেউ যদি একটুখানি অতিরিক্ত ফরমাস করিত তো অমনি গর্জ্জন করিয়া উঠিত। তার সেই মারমূর্ত্তি দেখিয়া কেউ আর দ্বিরুক্তি করিবার সাহস পাইত না।

বামার মার সঙ্গে পাড়ার কারুরই আর-কোনো সম্পর্ক ছিল না, এক কাজের সম্পর্ক ছাড়া। কাজ সারা হইলেই সে ছুটিয়া পলাইত, কাহারো পানে ফিরিয়া তাকাইত না—দুদণ্ড দাঁড়াইয়া কথা কহিবার অবসর পর্য্যন্ত তার ছিল না। কাজেই বহুদিন ধরিয়া মুক্তির নিঃসঙ্গ জীবনের উপর বামার মাও নিজের ছায়াটুকু পর্য্যন্ত ফেলিতে পারে নাই। কিন্তু একদিন সে ধরা পড়িয়া গেল।

মুক্তির জ্বর হইয়াছিল। সে একলাটি পড়িয়া ছিল। সেদিন তার স্বামীর ছুটির দিন, কিন্তু গুরুজীর আড্ডায় ভারি এক মোচ্ছব, কাজেই সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছিল, মুক্তির দিকে ফিরিয়া তাকাইবার সময় হয় নাই। তার পর দুইদিন একেবারে অদৃশ্য। উৎসবের উল্লাসে বাবাজীর শিষ্যেরা এতটা চিত্ত স্থির করিয়া ফেলিযাছেন যে তাহা দেখিয়া আশপাশের লোকেদের চক্ষুস্থির হইবার উপক্রম হইয়াছিল;—দুদিন মাটি ছাড়িয়া উঠিবার সামর্থ্য কাহারো ছিল না।

মুক্তি অন্ধকার ঘরের মধ্যে মলিন বিছানায় একা চুপটি করিয়া পড়িয়া ছিল। তৃষ্ণায় তার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু উঠিয়া জল খাইবে এমন শক্তি ছিল না। সে নীরবে, শুষ্ক কণ্ঠ ও শুষ্ক আঁখি-পল্লব তুলিয়া উপর দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া ছিল।

বামার মা কাজ করিতে আসিয়া অনেক ডাকাডাকির পর যখন কোনো সাড়া পাইল না, তখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মুক্তি তাহাকে দেখিল, কিন্তু জল দিবার ফরমাসটুকু করিতে সাহস করিল না। নিজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কাহারো নিকট কিছু চাহিবার অধিকার যে আছে এমন কথাও সে ভাবিতে পারিত না। সে হয়ত মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জল না চাহিয়া চুপ করিয়া থাকিত, কিন্তু বামার মার একটি ব্যবহারে সে একটু সাহস পাইল।

বামার মা মুক্তির শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল,—"ও-মা, অসুখ করেছে বুঝি!" বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি নিজের ভিজে হাতখানা খপ্ করিয়া আঁচলে মুছিয়া মুক্তির কপালের উপর পাতিয়া দিল।

মুক্তির বোধ হইল সেই স্পর্শটিতে তার সমস্ত দেহটি যেন জুড়াইয়া গেল। কী স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শ! মুক্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া চোখ বুজিয়া রহিল। তার মনে হইতে লাগিল, এই স্পর্শের মধ্য দিয়া সে এমন একটি জিনিস পাইল, যাহার স্বাদ সে জীবনে কখনো পায় নাই। বামার মা হাত তুলিয়া লইবার পরও অনেকক্ষণ মুক্তির কপালের উপর সেই স্নিগ্ধ স্পর্শটুকু লেপিয়া রহিল।

মুক্তি এতক্ষণে বামার মার কাছে জল চাহিল; কিন্তু কণ্ঠ এত শুষ্ক হইয়া আসিয়াছিল যে কথা বাহির হইল না,—শুধু ঠোঁটের একটি আকুল কম্পন সেই শীর্ণ মুখখানির উপর দিয়া খেলিয়া গেল।

বামার মা বুঝিতে পারিল; বলিল—"জল খাবে বাছা?"

মুক্তি একটু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বামার মা তাড়াতাড়ি জল গড়াইয়া আনিল। তার হাত হইতে ঘটি লইবার যেন তর সহিতেছে

না—এমনিভাবে মুক্তি উঠিয়া বসিল; এক নিশ্বাসে সমস্ত জলটা খাইয়া শুইয়া পড়িল। বামার মা একটা জোর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—"বাছারে আমার! মুখে একটু জল দেবারও কেউ নেই গা।"

সেইদিন হইতে আর বামার মা মুক্তির বাড়ির কাজ সারা হইলেই ছুটিয়া পালাইতে পারিত না; কাজের পর দু-দণ্ড সময়ের বৃথা অপব্যয় তার নিত্যই ঘটিতে লাগিল।

বামার সঙ্গে মুক্তির চেহারাব কোনোই সাদৃশ্য ছিল না, কিন্তু তবুও বামার মার কেমন মনে হইতে লাগিল যেন মুক্তি ঠিক বামাবই মতন। ভারি আশ্চর্য্য মিল! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই কথা,—সেই সব! বামা আজ কতকাল হইল তাহাকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেছে, তার চেহারা এখন ভালো করিয়া মনেই পড়ে না। মুক্তিকে সে কতদিন ধরিয়া দেখিতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্য, এতদিন তো এটা চোখে পড়ে নাই যে মুক্তি তাব বামাবই মতন! হঠাৎ সেই অসুখেব দিন হইতে এইটে তার কাছে কেমন করিযা এমন স্পষ্ট হইয়া উঠিল কে জানে! প্রথম প্রথম পবস্পবেব চেহারাব মধ্যে যে একটু-আধটু অনৈক্যের রেখা দেখা দিত, তাহাও ক্রমে মুছিয়া যাইতে লাগিল। মুক্তিকে যতই দেখে বামাব মার ততই মনে হয—বামা তো আমাব এত বড়টাই গো! এমনিই ত! এমনি করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বামা যে তার নাই একথা বামার মা ভুলিয়া যাইতে বসিল।

বামার মাকে পাইয়া মুক্তিব হৃদয-কুঁড়িটি একটু-একটু কবিযা বিকশিত হইযা উঠিতে লাগিল এবং তাবই সৌবভ তাব অন্তবেব অলিগলিব ভিতব ঘুবিয়া-ঘুবিযা তাব সমস্তটাকে জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। বামাব মার কাছে মুক্তিব এখন আব কোনো সঙ্কোচ নাই—সে যা-খুসি তাই আবদার করে, কাজের সময বহিয়া গেলেও তাব আঁচল টানিযা বসাইয়া বাখে, দেবী কবিযা আসিলে বাগ করে, এবং চলিযা যাইতে চাহিলে অভিমান কবে।

বামাব মাও মুক্তিব কাছে একেবারে বাঁধা পড়িয়া গিযাছিল। সে যে মুক্তিকে লইয়া কি কবিবে খুঁজিযা পাইত না। তাব কেবলই ইচ্ছা হইত মুক্তিকে তার বুকের ভিতবে কবিযা বাখে। তাব নিজেব সেই সামান্য সমস্তটুকু উপুড় কবিযা দিযাও তার তৃপ্তি হইতেছিল না। সে আবও দিতে চাহিত, আবও দিতে চাহিত। যে কথাটি কানে শুনিত, মুক্তিকে না বলিলে তাব প্রাণ ঠাণ্ডা হইত না; যে জিনিসটি চোখে লাগিত, সেটি মুক্তিব জন্য না আনিতে পারিলে ভাবি দুঃখ থাকিয়া যাইত।

হাবানো ধন ফিবিযা পাইলে তাব যত্ন বাড়ে। বামাব জন্য যতটা না করিতে পারিযাছিল, তার চেয়ে ঢেব বেশি সে মুক্তিব জন্য কবিতে লাগিল। এমন কি, মুক্তিব কাছে বেশিক্ষণ থাকিতে পায় না বলিয়া সে দু-এক ঘরেব কাজ ছাড়িয়া দিল এবং যে কযেক ঘরের কাজ বজায রহিল তাহাতেও শৈথিল্য পড়িয়া গেল। কাবণ মুক্তির উপবই তার মন পড়িয়া থাকিত। যখনই সময় পাইত একবাব মুক্তিকে না দেখিযা গেলে তাহার চলিত না, এবং যাই যাই করিয়া উঠিতে উঠিতে এতটা কাজেব সময বহিয়া যাইত যে তার জন্য তাহাকে ঘরে ঘবে তিরস্কার সহিতে হইত। বিকাল বেলাব দিকটায় তার অনেক কাজ ছিল, তবু সে যেমন কবিযা পাবে একটু সময় কবিয়া মুক্তির চুলটা বাঁধিয়া দিয়া যাইত। এবং তাব পানের দোকানে যখন খরিদ্দার থাকিত না, তখন পাযেব বুড়া আঙুলে একটা দড়ি বাঁধিয়া মুক্তির জন্য চুলের গুছি তৈরি করিত;—তাহাতে সময় সময় এমন তন্ময় হইয়া থাকিত যে খরিদ্দার হাঁকাহাঁকি কবিলে তবে চমক ভাঙিত।

মুক্তির উপর বামাব মার ভালোবাসার অত্যাচারও ছিল। সে চুল বাঁধিবার সময় মুক্তির মাথা এতটা তেল-জ্যাব্‌জেবে করিয়া দিত, এতটা নীচে অবধি পেটো পাড়িয়া দিত, চুলের গোড়া এতটা শক্ত করিয়া বাঁধিত যে ইহার কোনটাই সুখের ছিল না। কিন্তু এইগুলাই মুক্তির বিশেষ করিয়া ভালো লাগিত। চুল ভালো থাকিবে বলিয়া বামার মা যখন চুলের গোড়া কড়্‌কড়ে করিয়া বাঁধিয়া দিত, তখন মুক্তির সমস্ত মাথাটা টন্‌টন্ করিয়া উঠিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইটাতেই সে আনন্দ বোধ

করিত। এবং এইরূপ আনন্দের প্রতি একটা লোভ মুক্তির মনে দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল।

সন্ধ্যাবেলাটি ভারি চমৎকার কাটিত। বামার মা অনেক রূপকথা জানে; মুক্তি প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তার কাছে বসিয়া সেই সকল কথা শুনিত। স্বপ্নপুরীর সেই সব কাহিনী সন্ধ্যার আবছায়ার উপরে একটা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়া তুলিত। সেখানকার ভয়-ভাবনা, আশা-ভালোবাসা মুক্তির হৃদয়টাকে লইয়া দোলের পর দোল খাওয়াইতে থাকিত। নানা বিপদেব পর পক্ষিরাজ ঘোড়ায় করিয়া তরুণ রাজকুমার তার প্রিয়তমা রাজকুমারীকে লইয়া পলাইতেছে—পক্ষিরাজেব উদ্দাম গতিতে ভীত রাজকুমারী দুই বাহু দিয়া রাজপুত্রের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে—এই সব কথা যখন শুনিত তখন মুক্তি তাহাতে এমনি ডুবিয়া যাইত যে তার মনে হইত যেন সে নিজেই সেই রাজকুমারী। তার কল্পনার রাজকুমারের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিতে গিয়া তার বুক দুর্‌দুর্ করিতে থাকিত। আবার রাজকুমারী যখন রাজকুমারের বিরহে বনে বনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে, তখন সেই রাজকুমারীর কান্না মুক্তির বুকের ভিতর হইতে আপনি গুমরিয়া উঠিত। তারপর সব শেষে, মিলনের দিনে রাজপুত্র রথে করিয়া আসিয়া যখন বলিত—রাজকুমারী এস। তখন মুক্তির হৃদয় আগেভাগে সেই রাজপুত্রের রথের উপরে উঠিয়া বসিয়া থাকিত। মুক্তি যখন একলাটি থাকিত, এই সমস্ত কাহিনী মনের পৃষ্ঠা হইতে উল্টাইয়া পাল্টাইযা বার বার করিযা পড়িত—এর নূতনত্ব কিছুতেই ঘুচিত না।

এমনি করিয়া সুখে দুঃখে মুক্তির দিন একরকম কাটিতেছিল; কিন্তু হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে সব ওলটপালট হইয়া গেল।

গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না—এই প্রবাদটা যখন নকলচাঁদ বাবাজীকেও বাদ দিল না, তখন বাবাজীর বড় বিপদ হইল। প্রতিদিন তার আয় কমিতেছিল। শেষে এমন হইল যে যে-সব ভক্তেবা রোজ কেবল প্রসাদটুকু পাইয়া কৃতার্থ হইবাব জন্য আসিত, তাদেরও গাঁজার ববাদ্দের উপর টান পড়িল। চিত্ত আর তেমন স্থির হইতেছে না, ভজন-সাধনেব ব্যাঘাত হইতেছে—এই বলিয়া ভক্তেরা দলে দলে অন্য মহাপুরুষের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল। নূতন খবিদ্দারও জোটে না, পুরাতন খরিদ্দারও ভাঙিয়া যাইতেছে—এমন করিয়া আর ক'দিন চলে? কাজেই নকলচাঁদ বাবাজী জাল গুটাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মুক্তির স্বামী কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ছিল,—সে বাবাজীব পা কিছুতেই ছাড়ে নাই। চিত্তস্থির হইবাব ব্যাঘাত ঘটিতেছে বলিয়া তারও মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিত বটে কিন্তু বাবাজীকে ছাড়িয়া যাইতে মন সরিত না। ইহকাল তো কিছুই নয়—পরকালের জন্যই তো ভাবনা! সেইজন্য এই পবকালের গতিসম্বন্ধে তার ভারি একটা লোভ ছিল। সে ভাবিত, বাবাজীর কৃপায় যখন স্বর্গেব অর্দ্ধেক পথ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছি তখন শেষ পর্য্যন্ত যাইতেই হইবে;— বাবাজীকে ছাড়া নয়।

বাবাজীরও তাহাকে না হইলে চলিত না। সে বাজার হইতে ঘি আটা আনিয়া দেয়, ধুনীর আগুন জ্বালে, ফাইফরমাসটা খাটে, সকাল সন্ধ্যা পদসেবাটাও বেশ করে। এই সব আরাম বাবাজী অনেক দিন হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছে, চট্ করিয়া তাহা ত্যাগ করা তার পক্ষে শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই এই চেলাটি যাহাতে হাত-ছাড়া না হয় সেদিকে তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সে একদিন এই ভক্তটির কাঁধের উপর বার দুই তিন থাপ্পড় দিয়া বলিল—"বাচ্ছা, আমি দেখচি তোরই ভিতর খাঁটি চিজ আছে; ভণ্ড যারা, তারা সব ভেগেছে। এখন চল্, তোর উপায় করে দি।"

মুক্তির স্বামী গুরুজীর এই কথায় একেবারে গদগদ হইয়া গেল। সে তো আগে হইতেই জানিত যে মহাপুরুষেরা কঠোর পরীক্ষার পর তবে স্বর্গে যাইবার গুপ্ত পথের সন্ধানটি ফাঁস করেন; সেই জন্যই তো সে এমন করিয়া এতদিন বাবাজীর পা-ধরিয়া পড়িয়াছিল। এখন এই মহা কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে মনে করিয়া তার গর্ব্ব হইতেছিল। গুরুজীর কৃপা হইয়াছে—

এই আনন্দে সে অনেকক্ষণ ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া দুই হাত দিয়া গুরুজীর পা জড়াইয়া রহিল।

তারপর একদিন গা-ময় ভস্ম মাখিয়া গুরুদেবের তল্পিতল্পা ঘাড়ে করিয়া, সে গুরুজীর পিছন পিছন কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। মুক্তির কথাটা হঠাৎ একবার মনে হইয়াছিল; কিন্তু সে যে তার ধর্ম্মপথের প্রতিবন্ধক—মুক্তিলাভের অন্তরায়। এই জন্য তার কথাটা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টায় তৎক্ষণাৎ গাঁজার কলিকায় কষিয়া একটা দম দিতে বসিয়া গেল। যাইবার খবর মুক্তির কাছে নিজে দিতে গেলে পাছে কোনো ফ্যাসাদে জড়াইয়া পড়ে, সেই ভয়ে সে যাইবার সময় মুক্তির সহিত দেখা করিতে গেল না,—একটা উড়ো লোক দিয়া খবরটা পাঠাইয়া দিল।

মুক্তির স্বামী আছে, বামার মা শুধু এইটুকুই জানিত; এ-পর্য্যন্ত তার সহিত কোনো পরিচয় হয় নাই। সে যখন মুক্তির কাছে আসিত তখন প্রায়ই তার স্বামী বাড়ি থাকিত না; দৈবাৎ কখনো দেখা হইলে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইত। কাজেই মুক্তির স্বামী যে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে এ সন্দেহটি পর্য্যন্ত বামার মাব মনে আসিতে পারে নাই।

মুক্তিও কিছু বলে নাই—বলিবার কোনো তাগিদও তার মন হইতে উঠে নাই। তার মনটি ছিল এমনি ভীরু যে সকল রকম অবস্থাকে নিঃশব্দে মানিয়া লওয়াই তার ধর্ম্ম ছিল। কোনো দুঃখ যখন তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত, সে জড়সড় হইয়া তাব পানে কেবল চাহিয়া থাকিত;—তাবপব সেটা যখন তার মাথার ঝুঁটি ধরিয়া নাড়া দিতে থাকিত তখনও সে এমনি ভয়ে-ভয়ে থাকিত যে একটা আর্ত্তনাদও করিতে পারিত না। সমস্ত দুঃখকে বুকেব মধ্যে চাপিযা সে কাঠ হইয়া থাকিত।

স্বামী যে তাব একটা সহায় এমনভাবে স্বামীকে দেখিবাব অবকাশ মুক্তির কখনো হয় নাই, কাজেই স্বামী যখন তাহাকে পবিত্যাগ কবিয়া চলিযা গেল, তখন সে নিজেকে যে খুব নিঃসহায় মনে কবিল তা নয়;—বামাব মার সঙ্গে তাব যেমন দিন কাটিতেছিল তেমনি কাটিতে লাগিল। কিন্তু এক জাযগায় একটু বাধিল। স্বামী চলিয়া যাইবার দিন দুই-চাব পবে বামাব মা বাজারেব পয়সা চাহিলে মুক্তি বলিল—"বাজার কববাব দরকার নেই।"

বামাব মা অবাক্ হইয়া মুক্তির পানে চাহিয়া রহিল।

মুক্তি আর কথাটি কহিল না। তার বলিবাব কথা সমস্ত যেন ঐখানেই শেষ হইযা গেছে। পয়সা নাই তাই বাজার হইবে না—এব আগে কিম্বা এব পবে যে কোনো কথা আছে তাহা তাব মন ভাবিতেই ছিল না।

বামাব মা কিন্তু এত সহজে ব্যাপারটা উড়াইয়া দিতে পারিল না—সে প্রশ্নের পব প্রশ্ন করিয়া আসল কথাটা জানিয়া লইল।

কিন্তু বামার মাব মনে কেমন খট্‌কা লাগিতেছিল—খাম্‌কা একটা মানুষ নিজেব স্ত্রীকে এমন করিয়া ফেলিয়া পালায় কেন? তাই সে বাববার মুক্তিকে প্রশ্ন করিতে লাগিল—"বল না কিছু ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে বুঝি?"

মুক্তি যতই বলে "না", বামার মা কিছুতেই সে কথা কানে তুলিতে চাহে না। সে চাহিতেছিল, মুক্তি বলুক —"হাঁ।" নইলে সে যে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না।

তারপর দিনের পর দিন চলিয়া গেলে বামার মার আপনা হইতেই যখন দৃঢ়বিশ্বাস হইল যে, মানুষ ঝগড়া করিয়া কখনো এতদিন ঘর ছাড়িয়া থাকে না, তখন সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুক্তির পাশে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সে সময়ে তার নিজের জীবনের কথাই মনে পড়িতেছিল। সে যে ভুক্তভোগী, তার বামাকে বুকে ধরিয়া সে যেদিন একা নিঃসহায় অবস্থায় পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেদিনকার কথা তার মনে পড়িতে লাগিল;—সে কী ভীষণ অসহায়তা!—কোনো দিকে যেন কূল নাই। আজ যে মুক্তিরও সেই অবস্থা;—এই কথা মনে করিয়া তার বুক কাঁপিয়া উঠিল। একটা মিথ্যা সন্দেহে তার স্বামী যখন তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছিল, তখন স্বামীর উপর

সে তেমন করিয়া রাগ করিতে পারে নাই—হাজার হউক স্বামী তো বটে। সে-দিন সে স্বামীকে ধিক্কার দেয় নাই, নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিয়াছিল। কিন্তু আজ মুক্তির এই অবস্থা দেখিয়া সে পৃথিবীর সমস্ত স্বামীর উপরে হাড়ে চটিয়া গেল এবং তাহাদের সকলকার মুখাগ্নির ব্যবস্থা করিল।

বিবাহ হইয়া গেলে মুক্তির বাপের বাড়ি হইতে কেউ আর তার কোনো খবর লয় নাই। মুক্তির সৎমা নূতন সংসার বেশ করিয়া জমাইয়া বসিয়াছিল। নিজের ছেলেমেয়েদের লইয়া সে সমস্ত-সংসারটা এমন করিয়া জুড়িয়া বসিয়াছিল যে মুক্তির জন্য এতটুকু স্থান পড়িয়া থাকে নাই। তাব উপরে অনটনের সংসার! যাহাকে বাহিরে ঠেলিয়া বাখা যায়, এমন লোককে ডাকিয়া নিজের ভাতের ভাগ দেবার মতো উদারতা সাধু-সমাজেই দুর্লভ—মুক্তির সৎমা তো কোন্ ছার।

বাপের বাড়ির দিকে মুক্তির কোনো টান ছিল না। সেখানে তার এমন-কিছুই ছিল না যাহাকে সে আপনার বলিতে পারে। সেই জন্য বামার মা যখন সেখানকাব কথা তুলিল তখন মুক্তি অবলীলাক্রমে বলিয়া ফেলিল—"সেখানে আমাব কেউ নেই বামার মা।"

বাপেব বাড়ির কথা উঠিতেই মুক্তির ব্যাকুল হাতখানা বামার মার আঁচলটা জোবমুঠিতে আঁকড়াইয়া ধরিল।

মুক্তির ঘরে সঞ্চয় ছিল না, গায়ে অলঙ্কারও ছিল না,—এযোতি-নাম বক্ষা কবিবার জন্য হাতে দুগাছি পিতলের চুড়ি ছিল মাত্র। বামার মাবও যে আয ছিল তাতে তাব একলার পেটটি কষ্টে চলিত। তাব উপর ইদানীং মুক্তির জন্য তাহাকে আয়েব পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে হইয়াছিল। কাজেই তার একার উপর নির্ভব করিয়া দুজনেব দিন চলা ভাব হইয়া উঠিল। বামাব মা মনে-মনে বলিত, আমি তো অনেক উপবাস কবিয়াছি—উপবাস আমাব খুব গা-সহা। এই বলিয়া সে মাঝে মাঝে উপবাস দিতে লাগিল। মুক্তি জিজ্ঞাসা কবিলে বলিত—"আজ যে মা অন্ন খেতে নেই।" তারপর হঠাৎ একদিন মুক্তি আবিষ্কার করিল যে, পাঁজিতে যেদিন উপবাসের বিধান নাই সে-দিনও বামার মা উপোস কবিযাছে। তখন সে ভারি আপত্তি করিতে লাগিল। সে বলিল—"তুমি যদি অমন কবে উপোস কর তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে উপোস কবব।"

বামার মা জিব কাটিয়া বলিল—"ওমা সেকি হয! তুমি হলে এয়োস্ত্রী! আমার যে উপোস করা দরকার মা। তাতে শরীব ভালো থাকে। বুড়ো-মানুষ বেশি খেলে গতর মাটি হবে।"

বামার মার অন্ন খাইতে হইতেছে বলিয়া পাছে মুক্তি নিজেব অদৃষ্টকে ধিক্কাব দেয় সেই জন্য বামার মা মুক্তিকে শুনাইয়া রাখিত যে, সে যাহা দিতেছে তাহা ধার বলিযাই দিতেছে—জামাই যখন ফিরিয়া আসিবে তখন সুদসুদ্ধ আদায় করিয়া তবে ছাড়িবে।

কিন্তু অবস্থা ক্রমেই সঙিন্ হইয়া উঠিতে লাগিল। শুধু পেটেব অন্ন লইয়া যদি কথা হইত তাহা হইলে না হয এক-রকম-করিযা চলিয়া যাইত—কিন্তু তা তো নয়, অভাব যে চারিদিকে। মুক্তিব পরণের কাপড় সেলাই করিয়া, তালি দিয়া নানা-রকমে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া ছেঁড়া-বাঁচাইয়া কোনো রকমে লজ্জা নিবারণ হইতেছিল, শেষে তাও আর চলে না; ঘরেব ভাড়ার জন্য তাগাদার পর তাগাদা আসিতেছে; স্বামীর হাত-চিঠায় মুদির দোকানে যে দেনা আছে তার জন্য মুদি আসিয়া মুক্তিকে যাচ্ছেতাই শোনাইয়া যায়; কলের জল অশুচি বলিয়া তার স্বামী গঙ্গাজল খাইত, তার ধার আছে বলিয়া একদিন একটা উড়ে ভারী ঘর হইতে জলের ঘড়াটা জোর করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। এমনিতর কতদিকে যে কত উৎপাত তার ঠিক নাই;—নিরুপায় বলিয়া কেহ তাহাকে ক্ষমা করিত না। মুক্তি মুখটি বুজিয়া সমস্ত সহ্য করিত।

শেষে আর উপায় না দেখিয়া বামার মা একদিন মুক্তিকে বলিল—"মা, এক কাজ করবি, আমার সঙ্গে পান বেচতে যাবি?"

সকালে অপিসের সময় বামার মার পানের দোকানে ভারি ভিড় হইত। সে একলা সকলকে

পান জোগাইয়া উঠিতে পারিত না। তাড়াতাড়ির সময়,—বাবুরা যে দুদণ্ড দাঁড়াইয়া পান লইবে তা হইত না, কাজেই অনেক খরিদ্দার ফিরিয়া যাইত। সেই জন্য বামার মার মনে হইতেছিল যদি এই সময়ে মুক্তি আসিয়া একটু সাহায্য করে তো অনেকটা সুসার হয়।

যে লোক ডুবিতেছে সে যেমন করিয়া কুটাকে আশ্রয় করে, মুক্তি পান বেচিবার প্রস্তাবটি তেমনি করিয়া গ্রহণ করিল।

বড় রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ির গায়ে ছোট্ট একটু রক—তারই এক কোণে ছিল বামার মার পানের দোকান। দোকানের সরঞ্জাম বিশেষ কিছু ছিল না;—একটি দড়ি দিয়া বাঁধা ভাঙা টিনের বাক্স এবং তার ভিতরে কয়েকটি গোল-গোল টিনের কৌটা। বামার মার পাশে একটুখানি জায়গা করিয়া মুক্তি সেই দোকানে আসিয়া বসিল। মুক্তির ছিন্ন মলিন বস্ত্র, কপাল অবধি ঘোমটাটুকু টানা। তার সেই শুষ্ক করুণ মুখখানির উপরে টানা-টানা দুইটি চোখ স্থির হইয়া ভাসিতেছে—শুধু এইটুকুই দেখা যাইতেছিল।

মুক্তি স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে পথের পানে চাহিয়া বসিয়া ছিল। তার মনটা চারিদিককার নূতন জিনিস দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তার অনভ্যস্ত চোখ মনের সেই ঔৎসুক্যকে নিজের মধ্যে কিছুতেই জাগাইয়া তুলিতে পারিতেছিল না;—তার চোখ যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল; এবং তার অলস দৃষ্টির সেই নীরব করুণ নীরবতার উপরে তার বোবা হৃদযটির আভাস থাকিয়া-থাকিয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল।

মুক্তি এমন জড়সড় হইয়া ছোট্টটি হইয়া বসিয়া ছিল যে রাজপথের চারিদিকের ব্যস্ততা ও বিশালতার মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া দায়। কিন্তু তাহাতেই আশেপাশে চারিদিকে একটা চঞ্চলতার ঢেউ বহিয়া গেল। অনেকের উৎসুক দৃষ্টি তার উপরে বারে বারে পড়িতে লাগিল। আপিসের বাবুরা দোকানের ধারে এমন ভিড় করিয়া দাঁড়াইল যে, সেই ভিড় দেখিবার জন্যই লোকের ভিড় জমিয়া গেল। মুক্তির হাত হইতে পান লইবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। সেদিন বাবুদের অপিস যাইবার তাড়াতেও একটু শৈথিল্য দেখা গেল। পান না লইয়া কেহ নড়িল না, এবং পান হাতে লইয়াও বন্ধুর জন্য অপেক্ষার অছিলায় অনেকে দাঁড়াইয়া রহিল। এমনও হইল যে অপেক্ষা করিতে করিতে হাতের পান ফুরাইয়া গেলে আবার পান লইতে হইল। তাহাতে সময়ের এবং অর্থের যে অপব্যয় হইল তার জন্য তাহাদের এতটুকু ক্ষোভ প্রকাশ করিতে দেখা গেল না।

মুক্তি এত জনসমাগমে একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু সে ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই যে তারই জন্য এই কাণ্ড;—সে ভাবিতেছিল বুঝি এমনি ধারাই রোজ হয়।

দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া খরিদ্দাররা নানারূপ জল্পনা করিতেছিল; মুক্তির কানে তার গুঞ্জনধ্বনি প্রবেশ করিতেছিল। সে মুখ নীচু করিয়া পান সাজিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ একটা উচ্চকণ্ঠের হাসি বা কথার শব্দে সে চমকিয়া উঠিয়া তার সেই টানাটানা অস্ফুট চোখ তুলিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিতেছিল। তার সেই দৃষ্টিটুকুকে সকলে এমনিভাবে গ্রহণ করিতেছিল যেন সেটি তাদের পরম আরাধনার ধন!

তারপর মুক্তির হাতে যখন কাজ রহিল না, সে অলস দৃষ্টিতে রাস্তার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। একটি মানুষের সঙ্গে ধরিয়া যতদূর পারে সে তার দৃষ্টিটিকে বহিয়া লইয়া যাইতেছিল, তারপর সে-মানুষটি অদৃশ্য হইয়া গেলে আবার নূতন মানুষের সঙ্গে দৃষ্টিকে বাঁধিয়া দিতেছিল। এমনি করিয়া সে মানুষের পর কেবল মানুষই দেখিয়া যাইতেছিল। তারপর সে-রাত্রে সে যখন নিদ্রা গেল তখন তার মাথার ভিতরে কেবল মানুষের মুখ বিজ্‌বিজ্‌ করিতেছে।

পথের লোক যে তার পানে ফিরিয়া-ফিরিয়া চাহিয়া যায় এটা অল্পদিনের মধ্যেই মুক্তির নিকট ধরা পড়িল। যেদিন এই খবরটি একটি মানুষের চোখ দিয়া তার মনের মধ্যে প্রথম পৌঁছিল সেইদিন

হইতে দেখিল তার দিকে লোকের চাহিবার যেন আর অন্ত নাই! সে অবাক হইয়া গেল।

কিন্তু যে-লোকটির দ্বারা এই খবর সে প্রথম পাইল, স্মরণ-পথে সে অক্ষয় হইয়া রহিল।

তার সঙ্গে মুক্তির যখন প্রথম চোখের মিলন হয় তখন ঠিক্‌-দুপুর বেলা। রাস্তার গোলমাল প্রায় থামিয়া আসিয়াছে, দু-একটিমাত্র লোক চলাচল করিতেছে। মনে হইতেছিল যেন একটা প্রকাণ্ড অলসতা রাস্তার এধার-ওধার জুড়িয়া গা-মেলিবার আয়োজন করিতেছে। মুক্তির মনের ভিতরেও এতটা অলসতা ধোঁয়ার আকারে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। সে আপনার মনে বসিয়া ধীরে ধীরে পান সাজিতেছিল। হঠাৎ একবার চোখ তুলিয়া দেখে দূরে একটি অনিমেষ দৃষ্টি তার মুখের উপরে পড়িয়া আছে। মুক্তি প্রথমে কোনো খেয়াল করিল না, সে চোখ নামাইয়া লইল। খানিকক্ষণ পরে তার চোখ যখন অন্যমনস্কভাবে আবার সেই দিকে গিয়া পড়িল তখনও দেখিল সেই দৃষ্টি সেই এক-ভাবেই রহিয়াছে। তার মনে হইতে লাগিল যেন এই দৃষ্টিটি কতদূর হইতে কতদিন ধরিয়া তারই উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া আজ এইমাত্র তার হৃদয়ের তীবে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

আপিসের বাবুরা যখন পানের দোকানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইত তখন মুক্তি চোখ তুলিবার বড় অবসর পাইত না;—যেটুকু উপর দিকে চাহিত তাহাতে শুধু ভিড়টাই নজরে পড়িত—আলাদা করিয়া মানুষ চোখে পড়িত না। কিন্তু দুপুরবেলাকার সমস্ত অলসতা ও নির্জ্জনতাব উপরে সেই যে একটিমাত্র দৃষ্টি জাগিয়া থাকিত তাহাই মুক্তির কাছে তখন বিশ্বের মাঝে একমাত্র দৃষ্টি বলিয়া মনে হইত। রাস্তায় সে এত লোক দেখিত যে কাহাকেও মনে রাখা সম্ভব নয়—কিন্তু এই-যে একটি লোক সমস্ত মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রতিদিন একলা আসিযা দাঁড়াইত তাহাকে ভুলিবাব অবসব কোথায়? আর-সমস্তকে ছাড়াইয়া সে মুক্তির নির্জ্জন মনের উপরে দিন দিন চাপিয়া বসিতে লাগিল।

মুক্তির দুবেলা দু-মুঠা জুটিতেছে, পরণের কাপড় মিলিয়াছে, ইহাতে বামার মা খুসী ছিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মুক্তিকে দেখিয়া তার ভাবনা হইত—এমনি করিয়াই কি মেয়েটা ঘরছাড়া ছন্নছাড়া হইয়া থাকিবে। এক-এক সময় তার মনে ভারি ক্ষোভ হইত—হযত বা তারই অদৃষ্টে মেয়েটার এমন দশা হইল। সে হতভাগিনী যেখানে গিয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহাই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। মুক্তির কথা ভাবিয়া তার চোখে জল আসিত।

বামার মা চুপ করিয়া থাকিতে পারে নাই। সে গোপনে মুক্তির স্বামীব সন্ধান কবিতেছিল। নকলচাঁদ বাবাজীর যে-সব শিষ্য ছিল তাহাদের বাড়ি হাঁটাহাটি করিয়া অনেকবার বিফল মনোরথেব পর সে নকলচাঁদ বাবাজীর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়াছিল; তারপর আধা-লেখা-পড়া-জানা একটা লোককে ধরিয়া অনেক খোসামোদের পর মুক্তির স্বামীকে একখানা চিঠি লেখাইয়া সেই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছিল। এখন সে উত্তরের অপেক্ষা করিতেছে।

মুক্তির সেই মনের মানুষটি মনের মধ্যেই রহিয়া গিয়াছিল। সে যে কোনো দিন আসিয়া মুক্তির সামনে দাঁড়াইয়া কথা কহিবে তাহা মুক্তি কল্পনাও করিতে পারে নাই।

একদিন দুপুরবেলা বামার মা বাজারে পান কিনিতে না কি-করিতে গিয়াছিল—মুক্তি একলাটি বসিয়া ছিল, সে হঠাৎ আসিয়া বলিল—"মুক্তি এস!"

মুক্তি মুখ তুলিয়া চাহিল।

তার মনে হইল "মুক্তি এস!"—এই কথাটি সে যেন স্বপ্নে শুনিল—একটি সহজ সরল পরিচিত ডাকের মতন। স্বপ্নে মানুষ যেমন অসহায় হইয়া যায়,—ঘটনাস্রোত কোথায় লইয়া চলিয়াছে তার যেমন হিসাব থাকে না, মুক্তির ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছিল। কোথায় যাইতে হইবে—কেন যাইতে হইবে—এই সকল প্রশ্নের সংশয় তার সেই স্বপ্নাবিষ্ট কাঁচা মনের জড়তার উপরে কোনো আঘাত দিতে পারিল না। তার কানে গেল শুধু সেই আহ্বানের সুর; সে-সুরের নেশা তার মনে গিয়া লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল এই ডাক যেন বামার মার মুখে শোনা সেই রূপকথার রাজপুত্রের

ডাকের মতন—"রাজকুমারী এস!" অনেক দিনের বিরহের পর, অনেক দুঃখের পর, রাজপুত্র তো এমনি করিয়া আসিয়া অহ্‌াগিনী রাজকন্যাকে ডাক দিয়াছিল! মুক্তির চোখের সামনে জ্বল্‌জ্বল্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল সেই রাজপুত্র—সেই রাজপুত্রের রথ। তার মন আর বিলম্ব সহিতে পারিল না; তার দুরুদুরু হৃদয় রাজপুত্রের রথের উপরে গিয়া বসিল—মুক্তি দোকান ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল।

তারপর বৈকালে যখন চৌ-রাস্তার মাথায় একলা দাঁড়াইয়া চারিদিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছিল, তখন কোথায় তার সেই রাজপুত্র, কোথায় বা তার রথ! তার চোখের উপরে পৃথিবীর আলো ম্লান হইয়া আসিতেছিল। রাজপুত্রের রূপ ধরিয়া এ কোন্ মায়াবী রাক্ষস তাহাকে ভুলাইয়া গেল। তার সমস্ত শরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল।

তারপর যখন বামার মার দোকানে আসিয়া পৌঁছিল তখন যেন বাণবিদ্ধ পাখীব মতো সে লুটাইতেছে।

বামার মা একলাটি দোকানে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। আজ সে মুক্তির স্বামীব চিঠি পাইয়াছে; সে লিখিয়াছে—তীর্থধর্ম্ম-করা তার আর পোষাইতেছে না, বাড়ি ফিরিবাব মন আছে, কিন্তু হাতে পয়সা নাই, ভিক্ষা কবিয়া-করিয়া পথ-খরচের জোগাড় করিতেছে, টিকিটের দামটা জমিলেই সে বাড়ি ফিবিয়া আসিবে। বামার মা ভাবিতেছিল টিকিটের দামটা কত? এবং কষ্টেসৃষ্টে কোনোবকমে সেটা এখান হইতে পাঠানো যায় কি না। এমন সময় মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। বামার মা তার দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা কবিল—"কোথায় গিয়েছিলি মা?"

মুক্তি তার সেই বড-বড় চোখ দুটো হইতে আগুন ঠিকরাইয়া বলিয়া উঠিল—"যমের বাড়ি।"

বামার মা হতভম্ব হইয়া মুক্তির সেই জ্বলন্ত চোখেব পানে চাহিয়া রহিল। মুক্তির স্বামীর চিঠি তাব হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল।

এমন সময় একজন খবিদ্দাব জোব গলায় হাঁকিল—"এক পযসার পান।"

জী ব ন - সু ধা

দীনেশরঞ্জন দাশ

দুই মাসের ভাড়া দিতে পাবি নাই বলিয়া, বাড়ীওয়ালা বাড়ী ছাড়িয়া দিতে জুলুম কবিতেছে। বাড়ীওয়ালা জানে, ভাড়া দিতে না পারাতে আমার কোনও হাত ছিল না। মাসকাবারে টাকা পাইযাই আমি বাড়ীভাড়ার টাকা আলাদা কবিয়া একটি কাগজে মোড়ক করিয়া রাখিয়া দিতাম। কিন্তু সে-মাসে ছোট ছেলেটির ঠাণ্ডা লাগিয়া সামান্য কাশি-সর্দ্দি হয়, তখনও ভাবিয়াছিলাম, ভাড়ার টাকা দিতে পারিব। কিন্তু খোকার জ্বর বাড়িল, গলায় ঘড়-ঘড় শব্দ আরম্ভ হইল, বুকে-পিঠে ব্যথা, ডাক্তার ডাকিতে হইল। নিরুপায়—ডাক্তারেব দর্শনী ও ঔষধ-পথ্যে দিন পনেরর ভিতরই বাড়ীভাড়ার টাকা উবিয়া গেল। কাজেই সে মাসের টাকা বাকী পড়িল। মাসখানেক পর খোকা ভাল হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার পথ্য জোগাইতে আমার ক্ষুদ্র সংসারের প্রতিদিনের খরচের হিসাবের বাহিরে খরচ হইতে লাগিল। খোকার জন্য সুপথ্য চাই। পুঁইশাক, চিংড়ির ছানা বা কড়াইর ডাল তাহার পক্ষে তখন বিষতুল্য। তাহাকে মুগের ডালের যুশ্, মাগুর মাছের ঝোল ও ছাগলের দুধ, বেদানার রস প্রভৃতি দিতে হইত। তাহাতে দিনে একটি করিয়া টাকা চোখের পলকে খরচ হইয়া যাইত। বাড়ীওয়ালা তাগাদা শুরু করিল। অতিষ্ঠ হইয়া এক একদিন মনে হইত, খোকা আমার

ছেলে না হইয়া যদি বাড়ীওয়ালার ছেলে হইত। দ্বিতীয় মাসেও এই সব কারণে বাড়ীভাড়ার টাকা বাকী পড়িল। বাড়ীওয়ালা তাগাদা, গালমন্দ, সবই করিল, কিন্তু আমার শত চেষ্টাতেও কেহ ঐ সামান্য কয়টি টাকা ধার দিল না। কি দেখিয়া দিবে?

বড়লোক আত্মীয়ের কাছে কখনও কোনও দিন সাহায্য চাই নাই। যারা গরীব তাদের অভিমান বড় বেশী। সদাই তাদের মনে হয়, বুঝি তাহাকে গরিব জানিয়াই সকলে অপমান তাচ্ছিল্য করে। এ ভাবটা আমার মনেও ছিল। তাই বড় লোক জানা-শোনা বা আত্মীয়ের কাছে বড় একটা ঘেঁষিতাম না।

এবারে নেহাৎ বিপদে পড়িয়াই এক ধনী আত্মীয়ের কাছে টাকা চাহিলাম। তিনি একখানি নূতন মোটর কিনিয়াছেন—প্রতি মাসে তাহার টাকা শোধ করিতেই সব খরচ হইয়া যায় এই কথা বলিয়া আমাকে তাঁহারই মোটরে চড়াইয়া আমায় বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিলেন।

বাড়ীওয়ালা যথেচ্ছা গালাগাল করিয়া তিন দিনের ভিতর বাড়ী ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিল। তিন দিন পথে, গলিতে ঘুঁজিতে হাঁটিয়া সহরের এক প্রান্তে একখানি বাড়ী ভাড়া পাইলাম। ভাড়া মাসে পনেরো টাকা। দুইখানি ঘর ও বারান্দায় একটি রান্না করিবার জায়গা—দরমা দিয়ে ঘেরা। তাহাই স্বীকার হইলাম।

চাকরী আমার পাকা। দৈনিক পত্রিকার আফিসে কাজ করি। প্রথমে ঢুকিয়াছিলাম এক মাসে পনেরো টাকায়, এখন ক্রমান্বয়ে বাড়িতে বাড়িতে পঁয়ত্রিশ টাকা হইয়াছে। তাহা ভিন্ন গল্প লেখায়ও আমার একটু-আধটু হাত আছে। নিতান্ত কষ্টে-সৃষ্টে গল্প লিখি, মাসিক পত্রিকার আফিসে দেই, মনোনীত হইলে পাঁচ দশ টাকা পাইয়া থাকি। তাহাও গড়পড়তায় দু মাসে হয়ত একটি গল্প লেখা চলে বা মনোনীত হয়। কিন্তু তাহাতেও সসম্মানেই এতদিন চালাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু এবারে বড় বিপদ জুটিল।

আর একদিন মাত্র বাকী। বাড়ী ছাড়িতে হইবে। বাংলামাসের শেষ। পাওনাদার মুদী, বাড়ী হইতে বাহিরে যাইবার সময় আমার দিকে এমন করিয়া তাকায় যে ইচ্ছা করে তখনি তাহার টুঁটিটা চাপিয়া ধরি। কিন্তু টাকা কই যে তাহার পাওনাগণ্ডা তাহাব নাকেব উপব ছুড়িয়া দেই। মাথা নীচু করিয়া চলিয়া যাই।

সেদিন বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি, কোথাও হইতে গোটা পাঁচেক টাকা জোগাড় করিতে পারি কি না তাহারই চেষ্টায়। বাড়ী উঠিতেও ত কিছু খরচ আছে। ভাবিতে ভাবিতে কিছুদূর চলিয়া আসিয়াছি, সম্মুখেই ডাকপিয়ন বলিল, বাবু আপনার দুখানা চিঠি। আমি চিঠি হাতে করিয়া আগাইয়া যাইব, লোকটা আমার মুখের দিকে তাকাইয়া ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। আমি কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিছু বলবে?

সে মাথাটা একটু নীচু করিয়া সবিনয়ে বলিল, হুজুর, আগে আগে সব পূজাতেই কিছু পেতাম, এবারে হোলিতে পেলাম না, দুর্গাপূজায়ও পাইনি, আমাদের—

তাহার কথা আর সে শেষ করিল না। আমি মিনিট দুই ভাবিলাম, তাহাকে কি বলিব? বাড়ী ছাড়িব শুনিলে সে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িবে।

অনেক ভাবিয়া বলিলাম, বাড়ীর সামনের ঐ মুদির কাছে তোমাদের এ 'বিটের তিন জনের বক্‌শিস্ রাখিয়া দিব, তাহার কাছে চাহিলেই পাইবে। আমি ত সর্ব্বদা বাড়ীতে থাকি না। আমার সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে।

এই কথাগুলির মধ্যে বাড়ী যে ছাড়িয়া চলিয়াছি, এই কথাটাই মাত্র গোপন করিয়াছিলাম, কিন্তু সত্য সত্যই ভাবিয়াছিলাম মুদীর টাকা মিটাইবার সময় পিয়নদের তিন জনের পার্ব্বণী-বাবদ চার আনা হিসাবে বার আনা পয়সাও তাহার কাছে রাখিয়া যাইব।

আমি চলিতে চলিতে চিঠি দুইখানি খুলিয়া একবার করিয়া চোখ বুলাইয়া লইলাম। দেখিতে না পাইয়া পথের একটা গ্যাশপোস্টের সঙ্গে মাথাটা ঠুকিয়া গেল। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠিল, চোখে সব ঘোর হইয়া আসিল। শুনিলাম আশেপাশে লোকেরা বলাবলি করিতেছে, বাবুর এত কাজের তাড়া যে পথে-ঘাটে চিঠি না পড়লে চলে না, মাথা তো ঠুক্‌বেই। গরুর গাড়ীর তলায় পড়েন নি তাই ভাগ্য।

মন জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল, মাথাটা ফাটিয়া ফুটিয়া চৌচির হইয়া যাইত। প্রাণপণ চেষ্টায় আবার চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর গিয়া যখন চোখের আবছা ভাবটা কাটিয়া গেল, তখন দেখি আমাব গায়েব চাদব ও জামা রক্তের দাগে ভরিয়া গিয়াছে! চাদরটিকে ঘুরাইয়া বেশ করিয়া দাগগুলি চাপা দিলাম।

দুইখানি চিঠিব একখানি আসিয়াছিল এক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের নিকট হইতে। লিখিয়াছেন, দিন পাঁচেকেব মধ্যে একটি ছোট গল্প লিখিযা দিতে পারিলে আমার উপযুক্ত পাবিশ্রমিক তখনই পাইব। মনে ভাবিলাম, পারিশ্রমিক! আমাদের এত কষ্টের লেখার দাম মাত্র পাঁচ দশ টাকা! কিন্তু ও সব ভাবিবাব আর সময় নয়। লেখা চাহিয়াছে এই যথেষ্ট। এ সময়ে ঐ কয়টি টাকা পাইলেই আমার পক্ষে লাখ্ টাকা। গল্প যেমন করিয়া হউক লিখিয়া দিতেই হইবে। টাকা কযটা পাওযা যাইবে ত!

ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি কি লইয়া গল্প লিখিব, এমন সময় পথে আমার এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বহুকাল পরে দুজনেব দেখা। সে এখন বড় একটি কলেজের প্রফেসার। ছেলেবেলায় রোগা ছিল, এখন দিব্যি নাদুস্‌নুদুস্ চেহাবা হইয়াছে।

দেখা হইতেই সে খুব আন্তরিক প্রীতিব ভাবেই বলিল, কি হে সাহিত্যিক, আজকাল ত তোমার নাম শুনে শুনে কানে তালা ধবে গেল। গল্প লেখায় ত তোমার পোযাবারো! তার পব বেশ হচ্ছে-টচ্ছে ত?

আমাকে বাধ্য হইয়া হাসিমুখে বলিতে হইল, হ্যাঁ একবকম চলে যাচ্ছে। তাবপর কবে এলে, কোথায আছ, কদিন থাক্‌বে?

সে সব কথাগুলির উত্তব দিয়া মাঝখানে বলিল, উঠেছি—ভাই, এক হোটেলে। গুচ্ছেব পয়সা নেয কিন্তু খাবাব-দাবার মুখে ওঠে না। তোমাব ঠিকানাটা জানা থাক্‌লে তোমার বাড়ীতেই উঠ্‌তাম। তোমাব বাড়ীটা কোথায বল ত?

বন্ধু খুব আনন্দেব সহিতই এ প্রস্তাবটি করিলেন, কিন্তু চট্ করিযা তাহার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারিলাম না।

বন্ধু বলিল, চল তোমার বাড়ীটা দেখে আসি।

আমি আব বলিতে পারিলাম না টাকাব খোঁজে বাহির হইয়াছি।

হঠাৎ বন্ধুটি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলিল,—তোমার কপাল যে কেটে গেছে। কি করে লাগ্‌ল বলত?

তাহার এই কথাটি শুনিয়া আমার মাথাটা যেন ঘুরিযা গেল। বন্ধুরই কাঁধের উপর হাত দিয়া ভর করিয়া বলিলাম—ও কিছু না, মৃগী।

বন্ধু সস্নেহে বলিল,—মৃগী? মৃগী কি? তোমায় কি ঐ ব্যায়রামে ধরেছে নাকি?

আবার মিথ্যা বলিলাম। এবার আর মুখে না, শুধু ধীরে ধীবে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলাম।

সব ভাবনা আবার মাথায় আগুনের হল্‌কার মত একবার চকিতে ছড়াইয়া পড়িল, চোখে অন্ধকার দেখিলাম, বন্ধুকে জড়াইয়া ধরিয়া অতিকষ্টে বলিলাম,—আমাকে কোথাও বসিয়ে দাও।

যখন জ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম তখন আমি আমারই বাড়ীতে শুইয়া আছি। আমার মাথার কাছে

আমার স্ত্রী, খোকা বুকের কাছে বসিয়া আছে। চারিদিক তাকাইয়া বন্ধুকে দেখিতে পাইলাম না। তাহার বুকের উপরই যে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা মনে ছিল।

স্ত্রী আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, সেই ভদ্রলোকটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। কিছুতেই ভেতরে বস্‌লেন না।

নিজের উপর অত্যন্ত ধিক্কার আসিল। এত অক্ষম আমি! স্ত্রীকে আস্তে আস্তে বলিলাম, ঘরে যা আছে, তাই দিয়ে এ বেলার খাবারের বন্দোবস্ত কর। ও আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু অমৃত।

খোকাকে পাঠাইয়া দিলাম, কাকাবাবুকে ডেকে নিয়ে এস।

অমৃত এল। তার মুখে চিন্তার চিহ্ন, আমার কাছে ধীরে ধীবে আসিয়া বসিল।

আমিও উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু বড় দুর্ব্বল লাগিতেছিল।

বন্ধু বলিল, শরীরটা ত তোমার বড় খারাপ হয়ে গেছে। কিছুদিন আমার সঙ্গে থাকবে চল।

আমার হাসি পাইল। যাবার কি আমার পথ আছে। পাওনাদাব গিস্‌গিস্ করিতেছে, বাড়ীভাড়া বাকী। খবরের কাগজের আপিসের চাকরী—একদিন ছুটি নেই।

যাহোক্ করিয়া সে বেলার মত বন্ধুর সেবা করিয়া কৃতার্থ হইলাম। অমৃতও প্রকৃত বন্ধুর মত পরম সমাদরে আমার গৃহের সামান্য দুটি অন্ন ব্যঞ্জন গ্রহণ কবিল। আহার করিতে কবিতেই ভাবিতেছিলাম তাহার পর কি হইবে বেলা ত পড়িয়া আসিল। এ বেলার মধ্যেই বাড়ী ছাড়িতে হইবে।

আহারের পব অমৃতকে সে কথা বলিলাম। সে আগ্রহের সহিত বলিল, বেশ ত, তোমাব কিছু করে দরকার নেই। আমিই মুটে ডেকে সব ব্যবস্থা করছি। তুমি একটুও নড়বে না। বৌদি আব আমি সব বন্দোবস্ত করতে পারব।

সবই ত বন্দোবস্ত হইতে পাবে কিন্তু টাকার ব্যবস্থা কেমন কবিযা হয়।

এমন সময় বাহিব হইতে মুদী ডাকিল, বাবু বাড়ী আছেন?

সে বাড়ীর ভিতরেও আসিত। পাছে সে ভিতবে আসিয়া পড়ে এই ভাবিয়া আমাব স্ত্রী খোকাকে সঙ্গে লইয়া চোখের পলকে সদর দরজায় চলিয়া গেলেন।

এর পরিণাম কি আমার বুঝিতে বাকী রহিল না। কিছুক্ষণ পরেই শুনিলাম, মুদীটা আমাব সম্বন্ধে চীৎকার করিয়া অতিশয় অপমানজনক কথা বলিতেছে।

আমি নিষেধ করিবার পূর্ব্বেই অমৃত উঠিয়া গেল।

আমার স্ত্রী ও খোকা ভিতরে চলিয়া আসিলেন।

একটু পরেই শুনিলাম মুদীটা বলিতেছে, আমি কি আর জানি বাবুব অসুখ। আমি জানি, বাবুব টাকা যাবে কোথায়? কোনোদিন বাকী রাখেন না, ধারে খান্ না। এবার না হয পেতে দেরী হয়েছে। তাই ত আমি ভাব্‌ছিলাম।

বুঝিতে পারিলাম, মুদী টাকা পাইয়া চলিয়া গেল। অমৃত তবুও ভিতরে আসিল না। ভাবিতেছিলাম সে গেল কোথায়? এ ঋণ তাহার কেমন করিয়া শুধিব?

কয়টা মুটে বকর বকর করিতে করিতে অমৃতের সঙ্গে আসিল। অমৃত আমাকে একটি কথা বলিবার অবসর দিল না। বাঁধা ছাঁধা যাহা ছিল সে একে একে মুটের মাথায় চাপাইতে আরম্ভ করিল। মোট চাপান হইয়া গেলে সে আমার নিকট হইতে নূতন বাড়ীর ঠিকানাটা লিখিয়া মুটে সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেল।

আমার স্ত্রী বারান্দার পিল্‌পেটা ধরিয়া একদৃষ্টে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। খোকা তাহার খেল্‌না পাতি গুছাইতে ব্যস্ত! বাড়ীতে বহুকাল হইতে একটা বিড়াল ছিল, বিড়ালটা একবার ঘর, একবার বাহির করিতে লাগিল।

বৃথা ভাবিয়া কি করিব, উঠিয়া পড়িলাম। কাগজ খাতা পত্র যতদূর সম্ভব গুছাইয়া লইলাম। বিছানাটা জড় করিয়া বাঁধিতে বসিলাম। হাতে আর যেন শক্তি নাই! একদিকে আমার স্ত্রী, একদিকে আমি। টানাটানি করিয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলাম না। হঠাৎ দুজনের চোখে চোখ পড়িল, আমিও হাসিয়া ফেলিলাম, আমার স্ত্রীও হাসিয়া উঠিলেন।

যাহা হউক, অমৃতের সাহায্যে বাড়ী বদল করা হইল। নূতন বাড়ীটিতে দুইখানি ঘর। বাড়ীর পিছনদিকে একটি জলবিরল ডোবা। ডোবার ওধারে একঘর গয়লার বাস। তাহার পরেই দিগ্‌দিগন্তবিস্তৃত শস্যহীন শুষ্ক মাঠ।

কিছুদিন থাকিয়া অমৃত তাহার কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল।

সপ্তাহখানেক পরেই আমাদের কাগজের সম্পাদক রোগে পড়িয়া শয্যা লইলেন। তাঁহার কার্য্যাদি তখন আমাকেই সম্পন্ন করিতে হইত। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে প্রায় প্রতিদিনই একবার করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতাম। বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রী ও একটি বিধবা কন্যা। কন্যাটির বয়স অতিশয় অল্প। অনেক খরচ করিয়া একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু বৎসর দুই পরেই কন্যাটি বিধবা হইল।

সম্পাদক মহাশয়ের রোগ বাড়িল। প্রায় মাসখানেক রোগভোগ করিয়া তিনি দেহমুক্ত হইলেন।

লোকজন জোগাড় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গেলাম। শ্মশানটি একটি নদীর তীরেই। মৃতদেহ চিতার উপর দাহ হইতেছে। আমি একটু সরিয়া গিয়া নদীর ধারটিতে বসিয়া আনমনে কি ভাবিতেছিলাম। হঠাৎ কোথায় কাছেই একটি কোকিল ডাকিয়া উঠিল। এস্থানে কোকিলের ডাক বিশ্বাস হইল না। প্রথম কয়েকবার ডাক শুনিয়া মনে হইয়াছিল, কোনও বালক হয়ত আমোদ করিয়া কোকিলের ডাকের অনুকরণ করিতেছে। আবার যখন ডাক শুনিলাম, তখন ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, শ্মশানের একধারে একটি দেবমন্দির, দরজা তালা দিয়া বন্ধ, মন্দিরের বাহিরটা ইট্ সাজাইয়া মাটি লেপিয়া বেশ সুন্দর একটু বসিবার স্থান করা হইয়াছে। মন্দিরের এক কোণ দিয়া ভিত্তিগাত্র ভেদ করিয়া একটি ছোট অশ্বত্থ গাছ মাথা গলাইয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়াছে। সেই অশ্বত্থ গাছেরই ডালে ছোট খাঁচায় একটি কোকিল ডাকিয়া মরিতেছে।

শবদাহ শেষ হইল। সকলে বাড়ী ফিরিলাম। আমি বরাবর সম্পাদক মহাশয়ের বাড়ীতেই গেলাম। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাটি তখনও মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছেন।

রাত্রিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের কিছু খাওয়াইতে পারিলাম না।

কি বলিয়া বাড়ী ফিরিব তাহাই ভাবিতেছি, এমন সময় সম্পাদক মহাশয়ের স্ত্রী নিজেই বলিলেন, আমাদের জন্য বসে থেকে আর কি করবেন। সারা-জীবনই ত এখন এভাবেই সহায়হীন হ'য়ে কাটাতে হবে। আপনি বাড়ী যান। যদি পারেন কাল একবার দেখা ক'রে যাবেন।

বাড়ীতেও আমার স্ত্রী এবং খোকা একলা। যাহা-হউক আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। তাঁহাদেরই দূর আত্মীয় একটি ছেলে সে রাত্রির মত তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিল।

রোজকার মত সকালে উঠিয়া বাজার করিয়া আনিলাম, স্নান করিলাম, আহার করিলাম। মনের ভিতর এই অসহায় পরিবারের কথা ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া উঠিতেছিল। মানুষ বোধ হয় এত দেখিয়া বুঝিয়াও এমনি না ভাবিয়া পারে না।

আপিসে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের বাড়ী গেলাম। তখন বেলা দুপুর। বাড়ীর জানালা দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে। বুঝিলাম, মানুষের ক্ষুধা তাহাকে তাহার আহার সংগ্রহের ব্যবস্থায় নিয়োজিত করিতেছে।

অতি সন্তর্পণে বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। ঘর দুয়ার বেশ করিয়া ধোয়ান হইয়াছে। আমরা নূতন বাড়ীতে আসিয়া যেমন করিয়া আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া ঘর দ্বার ধোয়াইয়া নূতন সংসার পাতিয়া

বসিয়াছিলাম, এও প্রায় তেমনি। সেই সংসারই প্রয়োজন মত নূতন করিয়া যেন পাতান হইল।

সম্পাদক মহাশয়ের বিধবা কন্যাটি আসিয়া আমার সম্মুখে হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমি কাহাকেও কখনও সান্ত্বনা দিতে জানি না। তাই কোনও কথা বলিয়া তাঁহাদের এই প্রত্যক্ষ ক্ষতি ও শোককে ভুলাইতে চেষ্টা করিলাম না।

সম্পাদক মহাশয়ের স্ত্রীকে এই প্রথম বিধবার বেশে দেখিলাম।

তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া আবার সন্ধ্যার সময় আসিব বলিয়া আমার আপিসে গেলাম। আপিসে বসিয়া সম্পাদক মহাশয়ের জীবন সম্বন্ধেই কল্পনা ও বাস্তব লইয়া প্রবন্ধ লিখিতেছিলাম, বেয়ারা খবর দিল বড়বাবু ডাকিতেছেন।

বড়বাবু আমাদের এই পত্রিকা চালান, তাঁহারই অর্থে এই পত্রিকার মূলধন। তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। মনে একটু ভয় হইল। যাহারা অভাবে দুঃখে কাটায়, তাহাদের শঙ্কা অকারণেও আসে। বড়বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইতে তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, কালকের কাগজে সম্পাদকের নামের স্থানে আপনার নাম ছাপা হইবে। আপনার মাহিনা ষাট টাকা হইল।

একটু দাঁড়াইয়াছিলাম, কিছু বলিবার ছিল না, বড়বাবু কাজ করিতেছিলেন। আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু বল্‌বার আছে।

কি বলিব, আমার আর কি বলিবার থাকিতে পারে। সম্মুখেই কর্ত্তার মাথার উপরে দেয়ালে টাঙান দেবমূর্ত্তির ছবির দিকে চোখ পড়িল। কিছু না বলিয়া নিতান্ত অভিভূতের মতই কর্ত্তার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

আপিসের সকলেই একে একে আমার ঘরে জড় হইল। সবাই উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিল, কিছু কি ব্যবস্থা হোল?

আমি সরল ভাবেই নূতন ব্যবস্থার কথা বলিলাম। সকলে খুসী হইয়া আমাকে তাহাদের শুভকামনা জানাইল।

সন্ধ্যা হইয়া গেলে রাখালবাবুর বাড়ীর দিকে চলিতে মন কেমন করিতেছিল। আশ্চর্য্য মনের এই সময়কার অবস্থা!

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রাখালবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে ভবিষ্যতের বিলি-ব্যবস্থার সম্বন্ধে কথা হইল। সেদিনও কিছু বিশেষ ঠিক হইল না। কিন্তু এতক্ষণ থাকিয়াও আমার পদোন্নতির সংবাদটি তাঁহাদের নিজমুখে বলিতে পারিলাম না।

বাড়ী ফিরিয়াও স্ত্রীকে এ কথা বলিতে পারিলাম না। অন্য ব্যাপারে এরূপ সুদিন আসিলে হয়ত ছুটিয়া আসিয়া প্রথমে তাঁহাকে বলিতাম। কিন্তু আজ তাহা পারিলাম না।

রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া মৃতের ঋণ পরিশোধ ও অন্যান্য খরচ-পত্রের হিসাব করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

বৎসর কাটিয়া গেল। রাখালবাবুর স্ত্রী পিত্রালয়ে কন্যাসহ চলিয়া গিয়াছেন। পিত্রালয়েও সহায় সম্বল বড় কেহ নাই। তাঁহার মাও বিধবা। একটি মাতৃ-পিতৃহীন ভাগিনেয় আছে, সে ই বাড়ীতে পাহারা। ছেলেটি কাজকর্ম্ম কিছু করে না, পাড়ায় আড্ডা ও আখড়া লইয়া কাটায়। কিন্তু তবুও পুরুষ মানুষ সম্বল ত?

আমার স্ত্রী প্রথম যেদিন আমার এই পদোন্নতির কথা শুনিতে পান, সেদিন তাঁহাকে দেখিয়াও যেন একটু আশ্চর্য্য মনে হইল। এমন সংবাদ শুনিয়া তাঁহার খুব খুসী হইবারই কথা, কিন্তু তিনি এমন মুখ করিয়া রহিলেন, তাহাতে আমার মনে হইল, আমি যেন কাহারও সম্পত্তি অপহরণ করিয়া আনিয়াছি আর সে ধন তিনি ভোগ করিতে উৎসুক নন্।

নিদারুণ অভাবে পড়িয়া স্ত্রীর যে কয়েকখানা গহনা ছিল তাহা একে একে বিক্রয় করিতে

হইয়াছিল, তাহা পুনরায় গড়াইয়া দিবার উপায় ছিল না। একদিন আফিস হইতে পথে এক মাসিক কাগজের আফিসে আমার একটি গল্প মনোনীত হইয়াছে কি না নিতান্ত উদাসীন ভাবেই খোঁজ করিতে গেলাম। সম্পাদক দেরাজ খুলিয়া পনেরটি টাকা আমাকে দিয়া বলিলেন, গল্পটি বেশ সুন্দর হইয়াছে, এবং আগামী মাসেও আর একটি গল্প পাইলে তিনি অত্যন্ত বাধিত হইবেন।

এবার খুসীতে সত্যই মন ভরিয়া গেল। টাকাগুলি পকেটে লইয়া ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিতেছি, দেখিলাম, পথের ধারেই একজন লোক একটি কাঁচের বাক্স পাতিয়া নানাপ্রকারের আংটি, কানের দুল, ব্রোচ্ প্রভৃতি বিক্রী করিতেছে। বেশী কিছু না ভাবিয়াই বাছিয়া বাছিয়া একজোড়া পাথর বসান কানের দুল্ এক টাকা চারি আনা দিয়া কিনিয়া ফেলিলাম।

বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীকে দিলাম। তিনি সানন্দে তাহা গ্রহণ করিলেন। চোখের দৃষ্টিতে তাঁহার যে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইল তাহারই আলোকচ্ছটা যেন দুল-জোড়ার পাথরের উপর চক্‌মক্ করিয়া উঠিল। তিনি কেবল মাত্র বলিলেন, এখুনি এত দাম দিয়ে দুল না কিনিলেও চলিত।

নিত্যকারের মত আমি পরদিন আপিসে গেলাম। কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখি আমার স্ত্রী চুপটি করিয়া বিছানায় শুইয়া আছেন। অন্য দিনের মত আমি ঘরে আসিলেও উঠিয়া বসিলেন না।

কাছে যাইয়া অসুখ করিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম, কোনও উত্তর পাইলাম না। কি হইয়াছে বুঝিতে না পারিয়া মনটা একটু অস্থির হইল।

খোকা ঘুমাইয়াছিল, আমার কথাবার্তায় জাগিয়া উঠিয়াই বলিল, বাবা, তুমি মাকে ঠকিয়েছ! গয়লা-বউ বল্‌লে, ও আসল সোনার দুল নয়, গিল্টী করা। কত তারা হাস্‌লে, মাকে কত ঠাট্টা করলে। বললে, এর দাম বড় জোর বার আনা হতে পারে।

দুলের কথা আমার মনেই ছিল না, এবার সব কথা এক সঙ্গে মনে পড়িল। কিন্তু আমার মনের কথা কেমন করিয়া বুঝাইব। কতদিন যে আমার স্ত্রীকে কিছু গহনা দিতে পারি নাই, তাহা ভাবিয়া মনে কত কষ্ট পাইয়াছি। তিনি কখনও আমার কাছে কিছু চাহেন নাই, তবুও তাঁহার দুই হাতে দু'গাছি শাঁখা দেখিয়া আমার মন দুর্ভাগ্যের ইতিহাস স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিত। ভাবিয়াছিলাম, দুল জোড়া এখন এ রকমই দিই, তা'র পরে আর কিছু টাকা হইলেই, তাঁহার হাতের এক জোড়া বালা গড়াইয়া দিব।

খোকার কথা শুনিয়া মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। কিছু আর বলিতে পারিলাম না।

আমার স্ত্রী খোকাকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, বাজু, এবার ঘুমোও বাবা। আমি বাবাকে খেতে দিই।

খোকা ঘুমাইয়া পড়িল। আমি মুখ হাত ধুইয়া ভাবিতেছিলাম, স্ত্রী ধীরে ধীরে আসিয়া নিতান্ত অপরাধিনীর মত বলিলেন, খাবার দিয়েছি।

তাঁহার মুখে চোখে একটা দারুণ ক্ষোভের চিহ্ন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া আমি আর কোনও কথা তুলিতে পারিলাম না।

পরদিন আপিসে যাইবার সময় দুল-জোড়া চাহিয়া সঙ্গে লইয়া গেলাম। তাহা দিয়া কি করিব তাহা কিছুই ভাবিয়া ঠিক করি নাই।

এক মাসের ভিতরেই খোকার আবার জ্বর সুরু হইল। পাড়ার ডাক্তার দেখাইলাম। তিনি বলিলেন ম্যালেরিয়া মকরধ্বজ খাওয়ান্। সঙ্গে কুইনাইন্ চলিল।

দিন কয়েক কাটিয়া গেল। মকরধ্বজ কিনিবার পয়সা জুটিল না। মাসকাবারে মাহিনা পাইয়া পথেই এক কবিরাজের দোকানে উপস্থিত হইলাম।

আমি দোকানে ঢুকিতেই কবিরাজ মহাশয় তাঁহার সম্মুখে স্থিত কাঠের হাত-বাক্সটি একটু সরাইয়া রাখিয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চাই আপনার?

এরূপ অপ্রত্যাশিত সম্ভাষণ শুনিয়া আমি একটু স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমি যত আস্তে কথা বলি তিনি তত তারস্বরে চেঁচাইতেছেন। কিছুক্ষণ পরে সকল তথ্য জানিয়া লইয়া আর একটি লোককে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, ওঁর কাছে যান্।

তাঁর কাছে যাইতে তিনি ফরাস্-বিছান চৌকীতে বসিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাও চেঁচাইয়া। ব্যাপাব কি আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পাবিলাম না। এক কোণে একটি লোক উবু হইয়া বসিয়া একটি পাথরের বাটিতে বড়ি পাকাইয়া পাকাইয়া রাখিতেছিল, তাহার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিলাম। যদি একটু সহানুভূতি পাই। তিনি বোধ হয় মনে করিলেন, এতক্ষণ যে সকল কথা-বার্ত্তা হইয়াছে আমি তাহা ভাল কবিযা কিছুই শুনিতে পাই নাই, তিনি তাই অনুগ্রহ করিয়া আরও উচ্চস্বরে বলিলেন, একটু বসুন, মাত্রা ঠিক করে দেওযা হচ্ছে।

আমি কথা বলা বন্ধ করিয়া হাত নাড়িযা বুঝাইলাম, আমি বুঝিয়াছি। ফল যাহা হইল, তাহাতে এবার হাসি পাইল।

যিনি বড়ি পাকাইতেছিলেন, তিনি কবিবাজ মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া ধীবে ধীবে বলিলেন, ভদ্রলোক একেবারে বদ্ধ কালা।

শুনিয়া ত আমি অবাক্। আমি বোকার মত তাঁহাদেব দিকে তাকাইতে তাঁহাবা যেন আবও বিপন্ন বোধ কবিলেন। যিনি ঔষধ মাপিতেছিলেন, তিনি আমাব কাঁধে হাত দিযা নাড়িয়া ঝাঁকুনি দিয়া আমাকে আশ্বস্ত কবিলেন যে আব মিনিট দুযেকেব মধ্যেই আমি ঔষধ পাইব। তাহাব পব কয়েকটি পুবিয়া মোড়ক বাঁধিযা আমাব হাতে দিলেন। এক টুক্‌রা কাগজ টানিযা লইয়া পেন্‌সিল দিযা খস্-খস্ কবিয়া লিখিলেন,—"মূল্য ৮ মাত্রা এক টাকা।"

আমি কথাবার্ত্তা না বলিয়া পকেট হইতে একটি টাকা বাহিব কবিয়া বিবক্তিব সহিত ফেলিয়া দিলাম।

উঠিয়া যখন দবজা দিয়া বাহির হইতেছি—তখনও শুনিলাম, কবিবাজ মহাশয বলিতেছেন, আমি লোকটিব চাহনি দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, ভদ্রলোক কানে অত্যন্ত কম শোনেন। নাড়ী পবীক্ষা ভিন্নও বাহ্যিক অবয়ব দ্বারা—

কথা শেষ হইবাব পূর্ব্বেই আমি পথে পড়িয়াছিলাম। নিজেব মনেই খুব হাসিযা উঠিলাম। খেয়াল ছিল না, একটি লোকের গায়ে সামান্য একটু ধাক্কা লাগিয়া গেল। সে অমনি রাগিযা চেঁচাইয়া উঠিল, আচ্ছা পাগল ত, লোকের গাযে ধাক্কা মেরে পথ চলা এ কোন্ দেশী পাগ্‌লামী বাবা?

সেই সন্ধ্যার অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া আমাব আবও হাসি পাইল। এ যেন হাসির তোড় আসিল, অনেক চেষ্টা করিযাও বিরত হইতে পারিলাম না। এক নিমেষে যেন এক আবদ্ধ হাসির স্রোত আমার বক্ষ ভাঙিয়া অবিশ্রান্ত ধাবায় বাহিব হইয়া আসিল।

হাসিতে হাসিতেই বাড়ী চলিলাম। যে দেখে সেই চুপি চুপি বলে, লোকটা পাগল। আমি শুনি, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কোন চেষ্টাই করিলাম না।

হাসিতে পারিলে বোধ হয় লোকের চেহাবা উজ্জ্বল হইয়া উঠে। খুব সম্ভব আমার মুখও কিছু উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। আমার স্ত্রী আমাকে দেখিয়া প্রীতিভবে উপহাস করিয়া বলিলেন, কি ব্যাপার? ঘোড়া যে দানা দেখেই হেসে মল।

আমি তাঁহার আচরণে সুখী হইলাম। দুল্ কেনাব অপরাধ জনিত বিরক্তি আর তাঁহার মুখে নাই। মনটা সত্যই একটু সুস্থ হইল।

কাপড় ছাড়িয়া বসিয়াছি, তিনি হঠাৎ হাসিয়া উঠিলেন। আমার চমক ভাঙিল। আমি ভাবিলাম এ আবার কি? আবার কিছু নূতন নাকি। আজ সন্ধ্যে বেলাটা যে ভাবে কাটিয়াছে।

স্ত্রী হাসিতে হাসিতে আমাব কাছে আসিয়া বলিলেন, আজ তোমাকে লোকের কাছে একেবারে

নির্ব্বোধ বানিয়ে ছেড়েছি।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ওরা সব আজকে আবার তাই নিয়ে ঠাট্টা করতে এসেছিল, আমি তা' শুনব কেন? গরীব যে আমরা, তা' আর আমাদের ত অন্যকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। ওরা যেমন কথা তুল্ল, অমনি আমি মুখখানি ভারি ক'রে বল্লাম, ওঁর কথা আর বলো না ভাই। কেবল লেখা—আর পড়া। এই করেই ত মাথাটা একেবারে গেছে। কত লোক যে ঠকিয়ে গেল। সংসারের কিছু কি খবর রাখেন? দুল্-জোড়া কোন্ হতভাগা নিশ্চয় আসল ব'লে ওঁর কাছে বিক্রী করেছে। কথা ক'টি বেশ কাজে লাগ্ল। সবাই তখন বলতে লাগ্ল, আহা তাইত, তাইত, এতগুলি টাকা জলে গেল।

তাদের মুখ দেখেই আমি বুঝ্লাম, তারা 'কাৎ'। সময় আর অবস্থা বুঝে বললাম, ত' গেছে গেছে, যে সব জোচ্চোরের পাল্লা, চুরির দায়ে যে পড়তে হয়নি এই ঢের।

আমি স্ত্রীর মুখে সকল কথা শুনিয়া আরও লজ্জায় পড়িলাম। তিনি ছুটিয়া গিয়া একখানা চিঠি আনিয়া আমার হাতে দিলেন।

চিঠিখানি না পড়িয়াই আমি বলিলাম, কেন ওরকম করে বল্তে গেলে?

স্ত্রী অমনি একটু বিদ্রূপ করেই বললেন, যেমন তোমরা সমাজের কর্ত্তা, তেমনি তোমাদের সমাজে আমরা যদি অক্ষম ব'লে ঝুটো গয়নাই পরি, তাতে লোকের কি যায় আসে বাপু। ঝুটো গয়না পরেই যদি আমরা সুখ পাই

বহুকাল স্ত্রীকে আদর করিয়া কথা বলিবার অবকাশ পাই নাই। দীর্ঘকাল দারিদ্র্য ও ব্যাধির সহিত লড়িয়া লড়িয়া মনটা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, আজ আমার স্ত্রীর এই কথাগুলি শুনিয়া মনে হইল, এমনি করিয়া একজন আর একজনের বোঝা হাসিয়া মাথায় করিয়া লয় বলিয়াই পৃথিবীর এই দুঃখ-সংঘাতের মধ্যে সরসতা সৃষ্টির ধারাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।

চিঠিখানি পড়িয়া দেখিলাম, রাখালবাবুর স্ত্রী ও কন্যার অত্যন্ত দুরবস্থা। রাখালবাবুর শাশুড়ীও মারা গিয়াছেন। এখন তাঁহারা অভাবে, বান্ধবহীন অবস্থায় নিরতিশয় কষ্টে কাল কাটাইতেছেন।

স্ত্রীর সঙ্গে ঠিক করিলাম, সামনের শনিবারে তাঁহাদের আমি গিয়া এখানে লইয়া আসিব। ভগবানের ইচ্ছায় যদি সম্ভব হয়, তাঁহারা আমাদের সঙ্গেই চিরকাল বাস করিবেন।

অমৃত টাকা পাইয়া চিঠি লিখিয়াছিল, ঋণ পরিশোধ হয় নাই, আমি যেমন করিয়া তোমাদের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তোমাদের সে ঋণ আমি কেমন করিয়া শোধ করিব? এত দুঃখের দিনেও তোমরা যেমন করিয়া আমাকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে সে ঋণ শুধিবার নয় তাই লিখিতেছি, তোমরা আমার অর্থের ঋণ পরিশোধ করিয়াছ, কিন্তু আমি তোমাদের আত্মীয়তা-ঋণ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিব না।

খোকা আমাকে হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়া বলিল, বাবা, বাবা, দেখ, ঐ আমগাছের ঝোপের আড়ালে বসে একটা কোকিল ডাকছে।

শ্মশানের সেই কোকিলের ডাক আমার মনে পড়িল।

উত্তরা ? চৈত্র ১৩৩২

ক বি র মে য়ে

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

বৎসর দুই-একের মধ্যে আমাদের দলের তিন-চারিজন আড্ডাধারী যখন সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেল, তখন আমরা দস্তুরমত শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম। গেরুয়া না পরিলেও ত্যাগে আমরা গেরুয়াধারী অপেক্ষা কম ছিলাম না। আর এই পার্থিব জগতে আড্ডা দেওয়া হইতে যে অপার্থিব সুখ আর নাই, এ কথার ব্যবহারিক পরিচয় দিয়া অনেক গৃহবিমুখ সন্ন্যাসীকেও আমরা আড্ডামুখী করিয়া তুলিয়াছি। এ-হেন আড্ডা ছাড়িয়া লোক কি সুখে সন্ন্যাসী হইতে চাহে, এ সমস্যার মীমাংসা কিছুতেই করিতে না পারিয়া আমরা সকলেই মন-মরা হইয়া দিন কাটাইতেছিলাম, এমন সময় একদিন সংবাদ পাওয়া গেল যে, আরও একটি বড় স্তম্ভ খসিয়া গিয়াছে; অর্থাৎ কিনা আমাদের দীনবন্ধু হঠাৎ সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে।

ভাঙা আড্ডা কোনরূপে চলিতে লাগিল। বছর দুই-তিন আশায় আশায় থাকিয়া পলাতক আড্ডাধারীদের ঘরে ফেরা সম্বন্ধে যখন আমরা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি, এমন সময় একদিন দীনবন্ধু হৈ-হৈ করিয়া আড্ডায় উপস্থিত।

সংবাদ কি?

কোথায় ছিলি এতদিন?

গেরুয়া গেল কোথায়?

ওয়ারেন্ট বেরিয়েছিল বুঝি?

চারিদিক হইতে তাহার উপরে সহস্র প্রশ্নের বাণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

দীনবন্ধু বলিল, সন্ন্যাসী হয়েছিলুম ভাই।

সুরেশ বলিল, সে তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু সন্ন্যাসীই যদি হলি তবে ফিরলি কেন?

দীনবন্ধু বলিল, ওরে বাবা! সংসারীর চেয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার ফ্যাসাদ বেশি।

মহেন্দ্র-দাদা বলিল, সেইজন্যেই তো পৃথিবীতে সংসারী লোক বেশি, আর সন্ন্যাসী কম। এই কথাটা বোঝবার জন্যে অত কষ্ট করলে কেন? আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই তো এর উত্তর পেতে।

দীনবন্ধু বলিল, মহেনদা, উত্তরের অভাব হ'লে নিশ্চয়ই তোমার কাছে যেতুম, কিন্তু তখন আমার যা প্রয়োজন হয়েছিল, তা উত্তরের একেবারে বিপরীত। আর সে জিনিস অন্তত তোমার কাছে পাওয়া যেত না।

মহেন্দ্র বলিল, কি হয়েছিল, বল তো?

দীনবন্ধু বলিল, পৈতৃক বাড়িখানা বাঁধা পড়েছিল, জান তো? পাওনাদাররা নালিশ ক'রে বাড়িখানা বিক্রি ক'রে নিলে। এর পরে আর সংসারে টান থাকে? তুমিই বল?

মহেন্দ্রদা বলিল, সংসার-সমুদ্রে অর্থই হ'ল সব থেকে বড় নোঙর, তারই শেকল যখন ছিঁড়ে গেল, তখন কিসে আর ধ'রে রাখবে, বল। কিন্তু আবার ফিরে এলে কিসের টানে, বল দেখি? ছোট ছোট নোঙর কোথাও ফেলবার চেষ্টায় আছ নাকি?

দীনবন্ধু হাসিয়া বলিল, না দাদা, আর নোঙরে কাজ নেই। এই রকম ভেসে ভেসেই বেড়াব।

সুরেশ বলিল, আচ্ছা, বেরিয়েই বা গেলে কেন, আর ফিরেই বা এলে কেন?

দীনবন্ধু বলিল, বেরিয়ে যাবার কারণ তো বলেছি। অবিশ্যি ফিরে আসবারও কারণ একটা আছে।

দীনবন্ধুকে সকলে চাপিয়া ধরিলাম, কারণ বলিতেই হইবে। তাহারও বিশেষ আপত্তি ছিল না।

সে আরম্ভ করিল—

তোমাদের তো আগেই বলেছি, পৈতৃক আর স্বোপার্জ্জিত পাওনাদাররা মিলে ভিটেখানা বিক্রি কবালে। তখন আমার হাতে আছে মোট তিপ্পান্ন টাকা আর কয়েক আনা পয়সা। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ব'সে ব'সে ভাবলুম, কি করা যায়! যেমন বাজার, তাতে চাকরি-বাকরির সুবিধে কোথাও হবে না। ওদিকে তিপ্পান্ন টাকা ফুরোবার আগে যে উদরযন্ত্রের দাবিও ফুরিয়ে যাবে, এমন কোনও আশা নেই। এই সব নানা দিক ভেবে ঠিক ক'রে ফেললুম, সন্ন্যাসীই হওয়া যাক। যাঁহাতক মনে হওয়া, অমনই আনা-দুয়েকের লাল মাটি কিনে এনে দুখানা ধুতি গেরুয়া রঙে ছেপে ফেলা গেল। তার পরদিন দুপুরবেলায় হরিদ্বারের গাড়িতে সন্ন্যাস-যাত্রা।

হরিদ্বারে গিয়ে তো পৌঁছলুম, কিন্তু গুরু আর খুঁজে পাই না। অনেকে পরামর্শ দিলে যে, হিমালয়ে অনেক ভাল ভাল সন্ন্যাসী আছেন, সেখানে গিয়ে কারুব কাছ থেকে দীক্ষা নাও।

হিমালয়ের দিকেই যাত্রা করা গেল। সমস্ত দিন চলি আর বাত্রে কোন চটিতে আশ্রয় নিই। পথে লোকজনেব সঙ্গে দেখা হ'লে জিজ্ঞাসা কবি, ভাল সন্ন্যাসী কোথায আছে? তাদের নির্দ্দেশমত কোনও মঠে গিয়ে উঠি। কোথাও বা যাওয়ামাত্র তাড়িয়ে দেয়, কোথাও বা দু দিন বাদে ব'লে দেয়, তোমাকে দীক্ষা দেব না। সেখান থেকে বেরিয়ে আবাব চলতে আরম্ভ কবি।

এই রকম প্রায় মাসখানেক পাহাড়ে ঘুবে ঘুবে একদিন এক সন্ন্যাসীব আস্তানায গিয়ে উপস্থিত হলুম। এঁর নাম জ্ঞানানন্দ। হবিদ্বাবে থাকতেই খুব উচ্চদবেব সাধক ব'লে এঁব নাম শুনেছিলুম। ছোট্ট একটি উপত্যকাব মধ্যে এঁব মঠ। তিন-চাবিখানি ঘব, তাতে গুটি দুযেক শিষ্যকে নিযে তখন বাস কবছিলেন।

সন্ন্যাসীকে গিয়ে প্রণাম ক'বে বললুম, বাবা, আমাব মনে বড় অশান্তি তাই আপনাব আশ্রয়ে এসেছি।

সন্ন্যাসী স্মিত হাস্যে বললেন, বেশ করেছ, এখানে থাক। শান্তিময এই স্থান, শান্তি পাবে।

সেখানে দু-তিন দিন থাকাব পব একদিন বিকেলবেলা তাঁকে একলা পেযে আমি ব'লে ফেললুম, বাবা, আমি সন্ন্যাসী গ্রহণ কবব ব'লে বাড়ি থেকে বেবিয়েছি, আপনি আমায় দীক্ষা দিন।

আমাব কথা শুনে সন্ন্যাসীব চোখ দুটো হঠাৎ লাল টকটকে হযে উঠল। আমি তাঁব পদসেবা কবছিলুম, তিনি পা গুটিয়ে নিযে উঠে ব'সে জিজ্ঞাসা কবলেন, কি বললে?

স্বামীজীকে হঠাৎ অমন উত্তেজিত হতে দেখে আমি থতমত খেযে গিযেছিলুম। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি, কি বললে?

এবাব আমি সাহস সঞ্চয ক'বে ব'লে ফেললুম, আপনাব কাছে আমি দীক্ষা নিতে এসেছি। আমি সংসাব ত্যাগ—

স্বামীজী সেই সুবেই বললেন, কে তোমাকে সংসাব ত্যাগ কবতে বলেছে? আমাব কাছে আসতেই বা কে বলেছে?

কোনও জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী আবার বললেন, আমি মনে করেছিলুম, তুমি এখানে বেড়াতে এসেছ, কিছুদিন থেকে মনটা ভাল হ'লে ফিরে যাবে। এই ভেবেই তোমায় আশ্রয় দিয়েছিলুম।

জানই তো, এ রকম ধরনের কথা কোন দিনই সহ্য করা আমার অভ্যেস নেই। তবুও, সন্ন্যাসী লোক, তাকে কিছু বলব না মনে ক'রে এতক্ষণ চুপ ক'রেই ছিলুম। কিন্তু আর সহ্য করা সম্ভব হ'ল না। ব'লে ফেললুম, আশ্রয়ের আমার এমন অভাব হয় নি যে, সেজন্যে এই পাহাড়-পর্ব্বত ভেঙে আপনার কাছে আসতে হবে।

আরও একটু কড়া কথা বলতে যাচ্ছিলাম; কিন্তু স্বামীজী তার আগেই একটি প্রকাণ্ড ধমক

ছেড়ে বললেন, তবে ওঠ্। এই মুহূর্ত্তেই এখান থেকে দূর হয়ে য়া।

চীৎকার শুনে শিষ্য দুজন ছুটে এল। স্বামীজী তাদের বললেন, এখুনি একে মঠের চৌহদ্দি পার ক'রে দিয়ে এস।

আমি তখনই উঠে পড়লুম। শিষ্য দুজন আমাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে একটা রাস্তা দেখিয়ে বললে, এই পথ ধ'রে যাও, কেদারে পৌছবে। রাস্তা দুর্গম, একটু সাবধানে যেও। পথে যাত্রী দেখলে তাদের সঙ্গ নিও, অসুবিধে হবে না।

শিষ্যরা চ'লে গেলে আমি সেই পথ ধ'রে হাঁটতে আরম্ভ করলুম। অনেকক্ষণ চলবার পর বিপরীত দিক থেকে একজন লোক আসছে দেখে, তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, চটি কত দূরে?

সে বললে, এখানে চটি কোথায়? দশ মাইল দূরে একটা চটি আছে বোধ হয়।

লোকটার কথা শুনে আমি একেবারে ব'সে পড়লুম। একে তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, অন্ধকারে পথও চিনতে পারি না; মঠে যাবার পথ চিনি বটে, কিন্তু সেখানে ফেরবার পথ নিজেই নষ্ট ক'রে এসেছি। এই রাত্রিতে দশ মাইল পাহাড়ে-পথ অতিক্রম ক'রে চটিতে পৌছবার আশা বিড়ম্বনামাত্র। বাইরের অন্ধকার ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল। অন্তরের আশার শিখাও স্তিমিত। একমাত্র ভরসা আমার দুর্জ্জয় সাহস। সেই সাহসে ভর ক'রে আমি অগ্রসর হতে লাগলুম।

রাত্রি এক প্রহর কেটে যাবার পর আকাশে একটু চাঁদের আলো দেখা দিলে। ক মাইল পথ চ'লে এসেছি, তা ঠিক করতে পারলুম না, তবে যতদূর মনে পড়ে, একটা ছোট আর একটা বড় উপত্যকা পার হয়ে হাঁপিয়ে পড়েছিলুম। স্থির করলুম যে, এক জায়গায় ব'সে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার চলতে শুরু করব।

একটা গাছের তলায় ব'সে বিশ্রাম করছিলুম, কখন যে সুযুপ্তির কোলে চ'লে পড়েছি, তা জানতেই পারি নি, হঠাৎ খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস আমায় ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিলে।

জেগে দেখি, চাঁদের আলোতে চারিদিক ভেসে গেছে। আমার চারিদিকে ছোট থেকে বড়—একটার পর একটা পাহাড় থাকে থাকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। দূরে, সবার পেছনে একটা পাহাড় আর সকলের মাথা ছাড়িয়ে নীল আকাশ ভেদ ক'রে উঠেছে। বাতাস অতি মৃদুভাবে তার গায়ে মেঘের চামর বুলিয়ে দিচ্ছে। কি স্থির আর কি শান্তভাবে তারা কাল-সমুদ্রের বুকে অনন্তের নোঙর পেতে প'ড়ে আছে!

আমার মনে হতে লাগল, পাহাড়গুলো যেন এই শব্দহীন, অন্তহীন নীল চাঁদোয়ার নীচে ব'সে মহাপ্রলয়ের দিন কে কি কাজের ভার নেবে, তারই পরামর্শ করছে। সেই বিরাট মহান প্রকৃতির সামনে মাথা আপনি নুয়ে পড়ল।

মাথা তুলতে না তুলতে শুনতে পেলুম, চল, এত রাতে আর এখানে ব'সে থাকে না।

পেছনে ফিরে দেখি, স্বামীজী তাঁর দুই শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ফিরতেই তিনি বললেন, তুই তো ভারী অভিমানী ছেলে! চ'লে যেতে বললুম ব'লেই কি চ'লে যেতে হয়?

স্বামীজীকে প্রণাম ক'রে বললুম, প্রভু, আপনি তাড়িয়ে না দিলে এ দৃশ্য আমি দেখতে পেতুম না। চ'লে যেতে ব'লে ভালই করেছিলেন।

স্বামীজী আমার একখানি হাত ধ'রে বললেন, চল, ফিরে চল। রাগ করিস নি।

সেই রাত্রিতে আবার মঠে ফিরে এলুম। বোধ হয়, চার দিন পরে স্বামীজী আমায় দীক্ষা দিলেন। আমার সংসারী নাম ঘুচে গিয়ে নাম হ'ল—অরূপচৈতন্য।

মঠে বেশ আনন্দেই দিন কাটতে লাগল। সকালে স্বামীজী আমাদের ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন। দূরে দু-তিনখানা গ্রাম ছিল, তারই বাসিন্দারা আমাদের আহার্য্য যোগাত, মধ্যে মধ্যে স্বামীজীর ধনী শিষ্যরা ভেট পাঠাত। শক্ত কাজের মধ্যে ছিল ঝরনা থেকে জল নিয়ে আসা। জ্যোৎস্না-রাত্রি হ'লেই আমি

পাহাড়ে বেরিয়ে পড়তুম, ঘন্টার পর ঘন্টা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লে মঠে এসে শুয়ে পড়তুম।

বাইরের যে পৃথিবীটার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে চ'লে এসেছিলুম, মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্ত্তে তার আহ্বান আমার হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিয়ে আমাকে আকুল ক'রে তুলত। কিন্তু নির্জ্জনতার মধ্যেও একটা মাদকতা আছে। তার নেশা ধরতে দেরি লাগে বটে, কিন্তু সে মৌতাত একবার অভ্যেস হয়ে গেলে আর ছাড়া মুশকিল। আস্তে আস্তে এই একলা থাকার মৌতাতে আমি মশগুল হয়ে উঠছিলুম, এমন সময় কি একটা বিশেষ প্রয়োজনে স্বামীজীকে বোম্বাইয়ের দিকে চ'লে যেতে হ'ল।

মঠে তখন আমরা তিনজনমাত্র শিষ্য ছিলুম। স্বামীজী একজনকে সঙ্গে নিলেন, একজনকে পাঠিয়ে দিলেন প্রয়াগ-অঞ্চলে, আর আমায় বললেন, তুই নিজের দেশে যা। সন্ন্যাস গ্রহণ কববার পব একবার দেশে যেতে হয়।

মঠ ছেড়ে কোথাও যেতে আর আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু গুরুব আগ্রহে আমায় বেরুতে হ'ল। তিনি আমাদের দু'জনকে ব'লে দিলেন, দু বছর পরে আমি এইখানে ফিরব।

বেরিয়ে পড়তে হ'ল। বাড়ি থেকে যখন বেবিয়েছিলুম, তখন হাতে আর কিছু না থাক, রেলভাড়াটা ছিল, এখন একেবারে বিক্ত। বিনা টিকিটেই বেলে উঠে পড়া গেল। টিকিট নেই শুনে কেউ বা সন্ন্যাসী দেখে ছেড়ে দেয়, আব কেউ বা ঘাড় ধ'বে নামিয়ে দেয। তখনকাব মত নেমে পড়ি, পরদিন আবাব ট্রেনে উঠে চলতে থাকি।

এই বকম ক'বে অগ্রসব হতে হতে একদিন মধুপুব বেল-স্টেশনে একজন কর্ম্মচাবী আমাব টিকিট নেই দেখে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলে। আমি মনে কবেছিলুম, আমাকে নামিয়ে দিয়েই সে নিশ্চিন্ত হবে, আমিও আবাব অন্য গাড়িতে চড়ব। কিন্তু তা হ'ল না, স্টেশন থেকে গাড়িখানা চ'লে যাবার পর সে ব্যক্তি আমাকে একেবাবে বেল-পুলিসের জিম্মায সমর্পণ কবলে। এবকম ফ্যাসাদে এব আগে আর কখনও পড়ি নি। প্রায় আট-দশ দিন টানা-প'ড়েন থানা-পুলিস হতে হতে ব্যাপারটা আদালত অবধি গড়াল। আমি আন্দাজ কবেছিলুম, এই সুযোগে জেলে যাওযাব অভিজ্ঞতাটা বোধ হয় হয়ে যাবে। কিন্তু অবোধ হাকিম কোম্পানির সমস্ত কথা শুনে আমায বললে, যাও, এমন কাজ আর ক'রো না।

সন্ন্যাসীর নামে মামলা হওয়ায় সেখানে হৈ-চৈ প'ড়ে গিয়েছিল। আমি মুক্তি পেতেই শহরেব একজন ধনী আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। কলকাতায় যাব শুনে তাবা বেলেব টিকিট কিনে দিতে চাইলে। কিন্তু বেলে উঠতে আমার আব প্রবৃত্তি হ'ল না। আমি সেখান থেকে হেঁটেই রওনা হলুম।

মধুপুব থেকে কলকাতা অবধি বেশ ভাল হাঁটা-পথ আছে। সেই বাস্তা ধ'বে কলকাতাব দিকে এগিয়ে চলেছি। তখন বর্ষাকাল, মাঝে মাঝে বৃষ্টিতে কষ্ট দেয়, আর পাহাড়ে নদীগুলো ভ'রে ওঠায় কোন কোন জায়গায় পাবের জন্যে একটু মুশকিলে পড়তে হয়। তা না হ'লে সন্ন্যাসীব পক্ষে পথ চলায় কোনও কষ্ট নেই।

মাসখানেক পথ চ'লে বাংলায় এসে পৌছলুম। বৃষ্টি তখনও থামে নি, বরং আরও বেড়েছে। মাঠ-ঘাট সব জলে ভর্ত্তি, রাস্তাও আর তেমন শুকনো নয়, মধ্যে মধ্যে ভারী কাদা।

একদিন—সেদিন আর কোন গ্রামের মধ্যে ঢুকি নি। রাস্তা বেয়ে তাড়াতাড়ি চলেছি; কোনও রকমে কলকাতায় গিয়ে পৌছতে পারলে হয়। কতবার বৃষ্টি এল, আর কতবার যে ভিজে কাপড় গায়েই শুকিয়ে গেল, তার ঠিকানা নেই। সমস্ত দিন চ'লে চ'লে সন্ধ্যের সময় একটা গাছতলায় আশ্রয় নিলুম। পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম, তার ওপরে জলে ভিজে ভিজে কদিন থেকেই শরীরটা জ্বর-জ্বর করছিল।

সন্ধ্যের কিছু পরেই আবার বৃষ্টি শুরু হ'ল। মনে করেছিলুম, রাত্রিটা এখানে কোনও রকমে কাটিয়ে সকালে আবার চলা শুরু করব। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতে আকাশ যেন ভেঙে পড়ল, গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল।

আমি যে গাছের নীচে আস্তানা করেছিলুম, তার একটু দূরেই একটা রাস্তা গ্রামের দিকে চ'লে গিয়েছে। এই দুর্য্যোগে কোনও রকমে কোনও গৃহস্থের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হতে পারলে নিশ্চয় রাত্রির মত একটু আশ্রয় পাওয়া যাবে—এই ভবসায় গাছের তলা থেকে দৌড় দিলুম।

দৌড়—দৌড়—দৌড়। কিছুক্ষণ দৌড়ুই, আবার কিছুক্ষণ হাঁটি। এই রকম ক'রে চলতে চলতে দূরে একটা আলো দেখতে পেলুম। ছুটতে ছুটতে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেটা একটা মুদীর দোকান; ছোট্ট একটি চালাঘর। মুদী সেখানে আশ্রয় দিলে না, তবে সে দয়া ক'রে গ্রামেব রাস্তাটা আমায় দেখিয়ে দিযে বললে, গাঁয়েব ভেতবে যাও, সেখানে আশ্রয় পেতে পার।

গাঁয়ের মধ্যে ঢুকলুম। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তার ওপরে কালো মেঘের ছায়া ধরণীব যা কিছু সব যেন নিকিয়ে নিয়েছে। চোখে কিছুই দেখতে পাই না। অন্ধকার, কাঁটা আর কাদায় মিলে সে একটা বীভৎস ব্যাপার হয়ে রয়েছে। তার ওপর দিয়ে এক রকম গড়াতে গড়াতে চলতে লাগলুম।

গ্রাম একেবারে নিষুতি। একে এই দুর্য্যোগ, তার ওপরে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, গ্রামবাসীবা যে যার শুযে পড়েছে। মানুষ তো ছার, একটা কুকুরের ডাক পর্য্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। এরই ভেতর দিয়ে আমি পিছলে পিছলে টলতে টলতে চলেছি। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কাঁটায ক্ষতবিক্ষত হযে গিয়েছে, তবুও চলেছি। এমন সময অনেক দূবে একটা ক্ষীণ আলো দেখা গেল।

প্রায় আধঘন্টা সেই আলো লক্ষ্য ক'বে গিয়ে আমি একটা একতলা জীর্ণ বাড়িব সামনে উপস্থিত হলুম। একটা খোলা জানালা দিয়ে ক্ষীণ একটু আলোর বশ্মি দেখা যাচ্ছিল। একটু ঘুবে বাড়িব দরজার কাছে গিযে দাঁড়ালুম। দরজা ভেজানো ছিল, ধাক্কা দিতেই খুলে গেল বটে, কিন্তু কেউ নেই সেখানে। আমি ডাক দিলুম, বাড়িতে কে আছেন? বাড়ির ভেতবে বমণীকণ্ঠ শোনা গেল, ওরে, দেখ, বোধ হয ডাক্তারবাবু এলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই একটি কিশোরী একটা লণ্ঠন হাতে নিযে ভেতর থেকে বেবিযে এল। কিশোরী প্রথমে আমাকে দেখতে পায় নি। সে লণ্ঠনটা তুলে 'কে?' ব'লে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

আমাকে সেই অবস্থায় দেখে তার মুখ দিযে কোনও কথা বেরুল না। কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে লণ্ঠনটা ঠক ক'বে নামিয়ে রেখে সে ভেতরে চ'লে গেল।

একটু পরেই একজন বিধবা রমণী 'কে?' ব'লে ভেতর থেকে বেরিযে এলেন। তাঁব পেছনে গুটি দুই-তিন ছেলেমেয়ে।

আমি একটু এগিয়ে এসে বললুম, আমি অতিথি। এই দুর্য্যোগে বড় বিপদে পড়েছি; রাত্রির মত একটু আশ্রয় চাই।

রমণী স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তোমার বাড়ি কোথায় বাবা?

বললুম, সন্ন্যাসীর আবার বাড়ি কোথায মা!

ও, তুমি সন্ন্যাসী। তা গেরুয়া দেখেই মনে হয়েছিল। এস বাবা, ভেতরে এস। ভগবান তোমায পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বাড়ির ভেতরে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে কাপড়খানা নিংড়ে পরলুম। শরীর একেবারে ভেঙে আসছিল; শোবার জন্যে জায়গা খুঁজছি, এমন সময়ে সেই বিধবা আমায় বললে, বাবা, আমাদের বড় বিপদ। তাই দেখেই বোধ হয় ভগবান এত রাত্রে তোমাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ঘুম-টুম সব ছুটে গেল। জিজ্ঞাসা করলুম, কি বিপদ বলুন? আমার যদি সাধ্য থাকে—

তিনি বললেন, আমার বড় মেয়েটি আজ ছ মাস ধ'রে জ্বরে ভুগছে। আজ সন্ধ্যেবেলায় কাসতে

কাসতে কি রকম অজ্ঞানের মত হয়ে পড়েছে, এখনও ভাল ক'রে জ্ঞান হয় নি। এ গ্রামে কোনও ডাক্তার নেই; ভিন গাঁয়ে ডাক্তার ডাকতে পাঠানো হয়েছে। তা এই দুর্য্যোগে সে বোধ হয় আর এল না।

চলুন, তাকে দেখে আসি।

এই ব'লে উঠলুম। বিধবা আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরেব এক দেওয়ালেব গায়ে লাগা এক খাটে বোগিণী শুয়ে আছে। এই ঘবেবই খোলা জানালা দিয়ে যে ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছিল, তাই লক্ষ্য ক'বে আমি এসেছি। বোগিণীব বযস বোধ হয কুড়িব কাছাকাছি। দেখতে হযতো সুন্দবীই ছিল, কিন্তু নির্ম্মম বোগ তাব সমস্ত সৌন্দর্য্যই গ্রাস করেছে।

অনেকক্ষণ বিছানাব ধারে দাঁড়িয়ে মুখ দেখলুম। চোখ বুজে সে প'ড়ে আছে। জিজ্ঞাসা কবলুম, এব নাম কি?

ললিতা।

রোগিণীব তপ্ত ললাটে হাত দিয়ে মৃদুস্বরে ডাকলুম, ললিতা!

ডাকামাত্র তাব নিমীলিত চোখ দুটো খুলে গেল। সে আস্তে আস্তে পাশ ফিরে শুল।

বোগিণীব মা বললে, সন্ধ্যেব আগে একবাব বমি ক'বে সেই যে চোখ বুজেছিল, আর এই খুলল। তোমাকে কি বলব বাবা—

আমি বললুম, আপনি গিয়ে শুযে পড়ুন। আব কোন ভয নেই। কাল ডাক্তাব এলে যা হয ব্যবস্থা হবে।

রোগিণীব ঘরেব বাইবে একটা চওড়া দাওযা। তাবই এক কোণে আমাব শোবাব ব্যবস্থা হ'ল।

পাশেব একটা ঘবে ছেলেমেয়েদেব মৃদু কণ্ঠস্বব শোনা যাচ্ছিল, ললিতাব মা আমাকে শুইয়ে সেই ঘরে ঢুকে গেলেন।

তখনও বৃষ্টি থামে নি। বৃষ্টিব সেই অখণ্ড ঘুম-পাড়ানিয়া গানে গ্রামেব সমস্ত প্রাণীই নিদ্রিত। আমাব চোখ থেকে কিন্তু ঘুম ছুটে গিয়েছিল। চোখ বুজলেই পাশেব ঘবেব সেই রুগ্ন মেয়েটিব জীর্ণ মুখ চোখেব সামনে ভাসতে থাকে। তাব কথা ভাবতে ভাবতে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আমাকে তাব দিকে টানতে লাগল।

ঘবেব মধ্যে গিয়ে দেখি, বাতিটা তখনও মিটমিট কবছে। কোণে এক বৃদ্ধা ঝি প'ড়ে অঘোবে নিদ্রা দিচ্ছে। খাটেব দিকে চেয়ে দেখলুম, ললিতা আবাব চিত হয়ে শুয়েছে। সেই স্তিমিত আলোতে তাব মুখ ভাল ক'বে দেখা যাচ্ছিল না, আমি খাটেব ধাবে গিয়ে ঝুঁকে তাব মুখখানা দেখতে লাগলুম।

একদৃষ্টে তাকে দেখছি। নিশ্বাস এত ক্ষীণ যে, তা পড়ছে কি না, বুঝতে পাবা যাচ্ছে না। তাব একখানা হাত তুলে নাড়ী দেখতে লাগলুম। জীবন-প্রবাহ অতি ক্ষীণ, যে কোনও মুহূর্ত্তে তা বন্ধ হয়ে যেতে পাবে। হঠাৎ রুগ্নাব চোখ দুটো খুলে গেল। আমাকে দেখেই সে ব'লে উঠল, কে? কে তুমি?

আমি তাড়াতাড়ি তার হাতখানা নামিয়ে বেখে বললুম, কোনও ভয নেই। আমি সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী! ও, তুমিই বুঝি বোজ ঐ জানালাব ধারে ব'সে থাক? আজ এত কাছে এসেছ যে?

আমি বললুম, তুমি ঘুমোও। বেশি কথা বললে অসুখ বাড়বে।

কিন্তু তুমি এত কাছে এসেছ কেন? আমাকে বুঝি নিয়ে যাবে? না না, আমি যাব না, তুমি যাও।

স্পষ্ট বুঝতে পাবা গেল যে, বিকাবেব ঘোবে সে ভুল বকছে। আমি তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম, তুমি চোখ বোজ, ঘুমোও।

মেয়েটি আর একবাব দৃষ্টিহীন চাউনিতে আমার দিকে চেয়ে চোখ বুজল।

একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। তার সেই শীর্ণ মুখ আর অসহায় অবস্থা দেখে তার প্রতি করুণায় আমার মনটা আর্দ্র হয়ে উঠতে লাগল। আমি ব'সে ব'সে ললিতাকে পাখার বাতাস করতে লাগলুম। গুরুদেবের শিক্ষা একেবারে বিফলে যায় নি। তোমাদের সত্যি বলছি, সেখানে ব'সে ব'সে আমার মনে হতে লাগল যে, এর মধ্যে ভগবানের নিশ্চয় কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। তা না হ'লে কোথাকার লোক আমি, আর আজ এই শেষরাতে কোথায় ব'সে কাকে বাতাস করছি! আশ্চর্য্য দৈবের খেলা।

সূর্য্যের রথখানা তখনও উদয়াচলের শিখরে এসে পৌঁছে নি। অন্ধকাব একটু ফ্যাকাশে হয়েছে মাত্র, এমন সময় ললিতার মা ঘরে ঢুকে আমাকে ঐ অবস্থায় ব'সে থাকতে দেখে বললেন, সারারাত্রি এইখানে ব'সে আছ বাবা? তুমি আর-জন্মে নিশ্চয়ই আমাদের কেউ ছিলে। তা না হ'লে—

তাঁকে বাধা দিয়ে বললুম, আপনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না। সেবাই আমাদের ধর্ম্ম।

আমাদের কথা শুনে ললিতার ঘুম ভেঙে গেল। সে চোখ চেয়ে অবাক হয়ে আমার দিকে চাইতে লাগল। তার মা কাল রাত্রির সমস্ত কথা ব'লে আমার সঙ্গে তার পরিচয় কবিয়ে দিলেন। সে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে শুয়ে শুয়েই হাতজোড় ক'রে আমাকে নমস্কার করলে।

সকালবেলা ক্রমে ক্রমে ললিতাদের বাড়ির অবস্থা জানতে পারলুম। ললিতার বাবা ছিলেন একজন কবি, কাজেই দরিদ্র। চাকরি-বাকরির চেষ্টা চার-পাঁচ বার করেছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি কোথাও বনিবনা হয় নি। অতি সামান্য আয় আছে, তাতে কষ্টে দুবেলা খাওয়া চলে। জাতে তাঁরা ব্রাহ্মণ। বছরখানেক আগে ললিতার বাবা তিন দিনের জ্বরে মারা গেছেন। ললিতা ছাড়া আরও একটি মেয়ে আছে, তার নাম অমিতা। দুটি ছেলে, তারা মেয়েদেব চেয়ে ছোট। মেয়েদের কারও বিয়ে হয় নি। ললিতার বিয়ের চেষ্টা হচ্ছিল, এমন সময় তার বাবা মারা গেলেন। তাবপরে আজ ছ মাস সে জ্বরে জ্বরেই সারা হচ্ছে। কাল বিকেলে সে রক্তবমি ক'বে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। ভিন গাঁয়ে ডাক্তার থাকে, রাতে লোক পাঠানো হয়েছিল, লোকও ফেবে নি, ডাক্তারও আসে নি।

ললিতার মার বয়সও বেশি নয়, চল্লিশের কাছাকাছি হবে। সংসাবেব কাহিনী বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেললেন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, ললিতা বাঁচবে তো? কর্ত্তার বড় আদরের মেয়ে ও।

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম। বললুম, না বাঁচবাব তো কোন কাবণ দেখছি না, ও সেরে উঠবে।

তিনি বললেন, তুমি কটা দিন এখানে থাক বাবা, তোমায় দেখে আমাব ভরসা হচ্ছে।

মাসখানেক ধ'রে হেঁটে হেঁটে আমিও ক্লান্ত হয়েছিলুম, বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন ছিল। তাঁর কথা শুনে বললুম, বেশ, আমি আছি।

ললিতার মা সংসারের কাজে ব্যাপৃত হলেন, আমি আবার ললিতার বিছানার পাশে গিয়ে বসলুম। তার মনটা একটু প্রফুল্ল করবার জন্যে বললুম, ললিতা, গল্প শুনবে?

সে উৎসাহিত হয়ে বললে, হ্যাঁ, বলুন, শুনব।

একটা গল্প বললুম। সে শুনে বললে, এ গল্প আমি জানি। আর একটা বললুম, সে বললে, এও আমি জানি।

সকালবেলা গল্প ক'রে কাটল। দুপুরবেলা ডাক্তার এলেন। হাতুড়ে ডাক্তার, কলকাতার কোন এক স্বদেশী ডাক্তারী কলেজে বছর ছয়েক প'ড়ে পাঁচটি অক্ষর উপাধি পেয়েছিল। কিন্তু ললিতার যে রোগ, তা ধরবার জন্যে দিগ্‌গজ ডাক্তার না এলেও চলে। ডাক্তার রোগী পরীক্ষা ক'রে দুটি টাকা নিয়ে আমায় আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, রাজযক্ষ্মা হয়েছে, দুটো ফুসফুসেই আর কিছু নেই, যে কোন মুহূর্ত্তেই মৃত্যু হতে পারে।

বিকেলবেলায় ললিতার খাটের পাশে ব'সে আছি। অস্তোন্মুখ রবির এক টুকরো ম্লান রশ্মি

খোলা জানালা দিয়ে বিছানার ধারে এসে পড়েছিল। ললিতা অনেকক্ষণ সেই আলোটুকুর দিকে চেয়ে চেয়ে বললে, সন্ন্যাসী, ডাক্তার কি ব'লে গেল, আমি আর বাঁচব না?

আমি বললুম, সে কি! কে বললে তোমাকে? ডাক্তার বললে, তুমি শিগগির সেরে উঠবে। ওসব কথা ভাবে না, লক্ষ্মীটি।

আমার কথা শুনে ললিতার শীর্ণ মুখ খুশিতে ভ'রে উঠল। সে বললে, না না সন্ন্যাসী, আমি তো সে কথা ভাবি না। আমি দিনরাত বাঁচবার কথাই ভাবি। শুধু ভাবি, কবে ভাল হয়ে উঠব। এখন আমি মরতে চাই না। আমার এই উনিশ বছর বয়েস, এই বয়েসে কি মরতে ইচ্ছে হয়? আমার অনেক আশা আছে, অনেক—অ—নে—ক—

এই অবধি ব'লে সে ভয়ানক হাঁপাতে লাগল। পাছে আবার সেই প্রসঙ্গ ওঠে, এই ভয়ে তাকে বললুম, ললিতা, গল্প শুনবে?

ললিতা একটু হেসে বললে, না, গল্প নয় ঐ তাকের ওপর কবিতার বই আছে, নিয়ে এসে আমায় শোনাও না।

তাকের ওপরে সারি সারি ইংরেজী, বাংলা কবিতার বই সাজানো ছিল। একখানা বাংলা বই নিয়ে এসে বললুম, কোন্‌টা পড়ব?

ললিতা বললে, যেটা ইচ্ছে পড়।

আমি পড়তে লাগলুম, আর ললিতা চোখ বুজে রইল। একটার পর একটা প'ড়ে যাই, তার আর ক্লান্তি নেই। ঝি এসে আলো দিয়ে গেল, মা এসে কাছে বসলেন, অমিতা এসে খাইয়ে গেল, মা অন্য কাজে গেলেন, পড়ার আর বিরাম নেই। একবার সে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে ক'রে আমি পড়া বন্ধ করলুম, কিন্তু তখনই সে চোখ চেয়ে বললে, কই, পড়ছ না?

আবার পড়তে শুরু করা গেল। একবার ললিতার দিকে চেয়ে দেখলুম, তার দুই চোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

তার সেই অবস্থায় মনের ওপর কোন চাপ পড়া উচিত নয় ভেবে পড়া বন্ধ করলুম। ললিতা তখনই চেয়ে বললে, থামলে যে?

আমি বললুম, আজ এই অবধি থাক, আবার কাল হবে। কি বল?

ললিতা বললে, আচ্ছা।

তাকে বইখানা রেখে এসে তার কাছে বসামাত্র সে বললে, সন্ন্যাসী, তুমি বড় ভাল। বড় সুন্দর পড়তে পার তুমি। আমার বাবাও খুব সুন্দর পড়তে পারতেন। আমাতে আর বাবাতে বই হাতে ক'রে কখনও চ'লে যেতুম সেই নদীর ধারে, কখনও বা ঐ বড় মাঠটা পেরিয়ে সেই প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে, সমস্ত দিন আমরা সেখানে ব'সে ব'সে কবিতা পড়তুম। এই ভাদ্র মাসে আমরা ভাই-বোনে মিলে মাঠে-ঘাটে কত খেলাই করেছি! আজ প্রায় ছ মাস হ'ল বাড়ি থেকে বেরুই নি। প্রাণটা আমার হাঁপিয়ে উঠছে। কতদিনে আমি ভাল হয়ে উঠব, বলতে পার, সন্ন্যাসী?

ললিতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম, তুমি শিগগির সেরে উঠবে। সেরে উঠলে আবার আমরা তেমনই ক'রে খেলতে যাব। তোমার শরীরটা একটু ভাল হোক।

আমার কথা শুনে সে সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি তাকে বাধা দিয়ে বললুম, তুমি ঘুমোও, লক্ষ্মীটি, তা না হ'লে আবার অসুখ বাড়বে।

ললিতা আর কিছু না ব'লে চোখ বুজে ফেললে।

সে রাত্রিতে ললিতার অসুখ ভয়ানক বেড়ে উঠল। রাত্রি বারোটা কি একটার সময় সে কাসতে আরম্ভ করলে। কিছু পরেই তার মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতে লাগল। আমি ছুটে গিয়ে তার মাকে খবর দিলুম। ললিতার মা আর তার বোন অমিতা এসে আর্তের পাশে দাঁড়াল। যন্ত্রণায়

সে ছটফট করতে লাগল। বাতাস করতে করতে একটু যদি যন্ত্রণা কমে তো অমনই কাসি শুরু হয়, তারপরেই দু ঝলক লাল টকটকে রক্ত। একটুখানি নিশ্বাস নেবার জন্যে সে কি চেষ্টা। শতচ্ছিদ্র ফুসফুসের সে যে কি ভীষণ যন্ত্রণা, তা যক্ষ্মা-রুগীকে যে না দেখেছে সে বুঝতে পারবে না। আমার মনে হতে লাগল, আজ রাত্রিতে বোধ হয় শেষ। কিন্তু মানুষের প্রাণ পৃথিবীর সমস্ত পাওনা চুকিয়ে না দিয়ে তো মুক্তি পায় না। সারারাত্রি সেই যন্ত্রণা সহ্য ক'রে শেষ রাত্রির দিকে ললিতা যেন ঝিমিয়ে পড়ল। আমরা তিনজনে সারারাত তার বিছানার পাশে ব'সে ব'সে কাটালুম।

ললিতাদের গ্রামের ধার দিয়েই গঙ্গা ব'য়ে গিয়েছে। আমি রোজ নদীতে গিয়ে স্নান করতুম। সকালবেলা একটুখানি ঘুমিয়ে স্নান সেরে এসে দেখি, ললিতা জেগেছে আর বেশ প্রফুল্লভাবেই তার ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে গল্প করছে। একটি ভাই আদর ক'বে তার দিদিব পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমি ঘরে ঢুকতেই ললিতা আমায় জিজ্ঞাসা করলে, সন্ন্যাসী, তুমি স্নান কবতে গিয়েছিলে বুঝি?

হ্যাঁ।

এখন গঙ্গার দু কূল ভ'রে উঠেছে, না?

হ্যাঁ।

আচ্ছা সন্ন্যাসী, গঙ্গাব ধারে সেই যে বড় বটগাছটা, সেটা দেখেছ?

হ্যাঁ।

তারই একটি মোটা শেকড় মাটি থেকে ধনুকের মত হয়ে উঠে আবার মাটিব মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, সেটা দেখেছ?

কই, তা তো দেখি নি!

তা হ'লে সেটা জলে ডুবে গিয়েছে। আর কতদিনে যে গঙ্গার সে রূপ আবাব দেখতে পাব।

ললিতা তার ক্লান্ত চোখ দুটো বন্ধ করলে। কিছুক্ষণ পবে ললিতাব মা, অমিতা ও তাব ছোট ভাই দুটিকে খাবার জন্যে ডেকে নিয়ে গেলেন।

ভাই-বোনেরা চ'লে যাবার পর ললিতা চোখ মেলে আমায় বললে, সন্ন্যাসী, এই সময মাঠে খুব কাশফুল হয। আমার জন্যে কাল এক গোছা তুলে আনবে?

আমি বললুম, কাল কেন, আজই বিকেলে তোমাব জন্যে কাশ নিয়ে আসব। মাঠে অনেক কাশ দেখেছি।

ললিতা এতক্ষণ বেশ হাসিখুশিই ছিল, হঠাৎ তার চক্ষু দুটি সজল হযে উঠল। অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে বললে, সন্ন্যাসী, আমার যেন মনে হচ্ছে, মাঠ-ভরা কাশের সেই শোভা, বর্ষার গঙ্গার সেই আপন-ভোলা উদ্দাম স্রোত, শরতের সকালে সেই মিষ্টি রোদ—এই শেষ—সব শেষ। আর দেখতে পাব না।

ললিতার কণ্ঠে এমন একটা অসহায় ও উদাস সুর বাজতে লাগল যে, চোখের জল সংবরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু তখনও সন্ন্যাসীর অভিমান আমার যায় নি। নিজের মনকে ধমক দিতে লাগলুম, ছি, এত কোমল তুমি!

ললিতাকে বললুম, ললিতা, ওসব কথা ভেবে নিজের অসুখ বাড়িয়ে কেন আমাদেব দুঃখ দিচ্ছ? তুমি ঘুমোবার চেষ্টা কর।

ললিতা আবার আমার মুখের দিকে তাকালে। সেই সজল দৃষ্টি। এবার সে বললে, সন্ন্যাসী, আমার জন্যে তোমার দুঃখ হয়? আমি যদি ম'রে যাই, আমার কথা কি তোমার মনে থাকবে? আমি ম'রে গেলে তুমিও তো এখান থেকে চ'লে যাবে। তারপর তুমি কত দেশে দেশে ঘুরবে, কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হবে, তারই মধ্যে সজনে কি নির্জ্জনে পাড়াগাঁয়ের এই ললিতার কথা,

যার সঙ্গে দুদিনের জন্যে তোমার ভাব হয়েছিল, তার কথা কি মনে থাকবে?

আমার কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছিল। কোনও রকমে গলাটি পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললুম, থাকবে ললিতা। তোমাকে কখনও ভুলব না।

ললিতা যেন একটা আশ্বাসের নিশ্বাস ফেলে বললে, আ সন্ন্যাসী, তুমি বড় ভাল।

ললিতাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তার মাকে নির্জ্জনে ডেকে বললুম ললিতার অবস্থা ভাল নয়, বোধ হয় দু-একদিনের বেশি বাঁচবে না।

কথাটা শুনে তিনি চমকে উঠলেন। সন্তানের মৃত্যু-সম্ভাবনার সংবাদে মায়ের সে চমকানি, তার বর্ণনা করবার ভাষা আমি জানি না। তিনি কোন কথা না ব'লে নীরবে কাঁদতে লাগলেন। সদ্যোবিধবা সেই নারীকে সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা আমার যোগাল না। ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলুম, মৃত্যু এ সংসারে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, কিন্তু ধরণীর এই অতি-পুরাতন অতিথি প্রতি গৃহে প্রতি বারেই দেখা দেয়। সকলেই জানে, এর কোন প্রতিকার নেই, তবুও তারা শোকে কাতর হয়। সকলেই জানে, সান্ত্বনার কোন মূল্য নেই, তবুও সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে মরে। ললিতার মার অশ্রু দেখে আমিও দু-চারটে সান্ত্বনার বাঁধা গৎ আওড়াতে লাগলুম। কিন্তু ছেলেরা সেখানে এসে পড়ায় তাড়াতাড়ি সেখান থেকে স'রে গেলুম।

বিকেলবেলা অমিতা ও তার ভাই দুটিকে নিয়ে মাঠ থেকে কয়েক গোছা কাশফুল তুলে নিয়ে এলুম। বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ললিতা কি রকম বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। ফুলগুলো দেখে তার মুখে আবার ম্লান হাসি ফুটে উঠল। সে একটি গোছা ফুল নিয়ে নিজের মুখের ওপর বুলোতে আরম্ভ করলে।

সেদিন সন্ধ্যের দিকে ললিতা ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুম ভাঙল একেবারে রাত্রি বারোটা কি একটায়। এর মধ্যে তাকে একবার জাগিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল। আমি তার পাশে ব'সে ছিলুম, সে আমার একখানা হাত ধ'রে বললে, সন্ন্যাসী, ঠিক ক'রে বল তো আমি বাঁচব কি না? দেখো, আমার কাছে গোপন ক'রো না। যদি আমি আর না বাঁচি, তা হ'লে তোমায় একটা কথা ব'লে যাব। সে কথা তোমাকে বলবার আগে আমি ম'রে গেলে আমার ক্ষোভের আর সীমা থাকবে না। সে দুঃখ তুমি বুঝতে পারবে না। বল বল, আমি কি আর বাঁচব না?

ললিতার সে অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। ব'লে ফেললুম, তোমার অবস্থা খুবই খারাপ, যে কোনও মুহূর্ত্তে মৃত্যু হতে পারে।

আমার কথা শুনে সে একটা আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলে বললে, বড় উপকার করলে তুমি আমার। এ কথাটা তোমায় না বললে ম'রেও আমি শান্তি পেতুম না। শুনবে সে কথা?

বল, শুনি।

আমি তোমায় ভালবাসি।

অ্যাঁ। আমার সন্দেহ হ'ল যে, বিকারের ঝোঁকে সে বুঝি ভুল বকছে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম, ললিতা, ঘুমোও তুমি। বেশি কথা কইলে—

ললিতা আমার কথা গ্রাহ্য না ক'রে ব'লে যেতে লাগল, দেখ সন্ন্যাসী, জীবনে আমার সব সাধই মিটেছে, কিন্তু আমি কখনও কারুকে ভালবাসি নি। আমার বুকে ভালবাসার যে সম্পুটখানি আছে, ধনী যেমন যত্ন ক'রে নিজের বুকের মধ্যে মহামূল্য রত্নকে আগলে রাখে, আমিও তেমনই আমার কুমারী-ধর্ম্ম দিয়ে আমার সেই ভালবাসাটিকে আগলে রেখেছিলুম, আমার স্বামীর হাতে অক্ষুণ্ণ সেই পাত্রটিকে তুলে দেবার জন্যে। আজ আর সময় নেই, আমি তোমার হাতে আজ সেই রত্ন তুলে দিচ্ছি। সন্ন্যাসী, শোন, আমি তোমায় ভালবাসি।

আমার মনের অবস্থাটা একবার তোমরা কল্পনা ক'রে দেখ। বাক্‌পটুতার জন্যে তোমাদের কাছে

কত প্রশংসাই না পেয়েছি! কিন্তু সেই মুমূর্ষু দু দিনের পরিচিতার প্রেম গ্রহণ করবার মত ভাষা আমি খুঁজে পেলুম না। স্তম্ভিত হয়ে তার পাশে ব'সে রইলুম।

ললিতা আবার বলতে আরম্ভ করলে, সন্ন্যাসী, এদিকে ফেরো, আমার দিকে চাও।

আমি তার দিকে চাইলুম। সে বললে, তুমি? তুমি আমায় ভালবাস?

আমি কি বলব! তাকে ভালবাসার কোনও কল্পনা তখনও পর্য্যন্ত স্বপ্নেও আমার মনের মধ্যে উঁকি দেয় নি। কিন্তু তার জীবন-মরণের মাঝে সেই ক্ষীণ ব্যবধানটুকু প্রত্যাখ্যানের লজ্জা আর দুঃখে ভরিয়ে দেবার মত সত্যনিষ্ঠা আমার নেই। ব'লে ফেললুম, বাসি ললিতা, বাসি। তুমি কি বুঝতে পার না?

ব'লেই মনে হ'ল, মিথ্যা কথা বলতে শেখা আমার সার্থক হয়েছে। মিথ্যার অতখানি সদ্ব্যবহার করবার অবসর বোধ হয় জীবনে আর পাব না।

ললিতা আমার কথা শুনে বললে, বুঝতে পারি। সেইজন্যেই তো তোমাকে ভালবেসেছি।

আমি বললুম, ললিতা, গতজন্মে তোমার সঙ্গে নিশ্চয় আমার কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সেবার বোধ হয়, আমি তোমাকে এমনই ক'রে ফাঁকি দিয়েছিলুম, এ জন্মে তুমি আমায় ফাঁকি দিলে।

ললিতা একটু হেসে বললে, শোধবোধ হয়ে গেল। এবার যখন মিলব, তখন আর ছাড়াছাড়ি হবে না। যাবার আগে—

ললিতা আর বলতে পারলে না। আমি নীচু হয়ে তার জ্বরতপ্ত অধরে তার কুমারী-জীবনের প্রথম প্রেমের চুম্বন এঁকে দিলুম।

ললিতা জিজ্ঞাসা করলে, তোমার নাম কি সন্ন্যাসী?

আশ্চর্য্য! এতদিন সে আমার নাম পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করে নি। আমাকে সন্ন্যাসী ব'লেই ডাকত। আমি বললুম, আমার নাম দীনবন্ধু।

সে বললে, না না, ও নাম ভাল নয়। ও আবার কি নাম!

বললুম, তা হ'লে তুমি আমার একটা নাম দাও।

ললিতা আবার সেই ম্লান হাসি হেসে বললে, সেই বেশ। তোমার নাম তরুণ। কেমন?

আমার হাসি পেল। বললুম, তোমার যে নাম ইচ্ছে, সেই নাম ধ'রেই আমায় ডেকো।

সে বললে, দূর, তোমার নাম বুঝি আমায় ধরতে আছে?

একটু চুপ ক'রে সে আবার বললে, ওগো, তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় একটু দাও না।

আমি তাই দিলুম। একটু হাঁপিয়ে গিয়ে সে বললে, আর একবার, ওগো, আর একবার।

আবার তার তৃষিত অধর চুম্বনে ভরিয়ে দিতে হ'ল। চুমুতে তার যেন সাধ আর মিটছিল না। সে আমার একখানা হাত চেপে ধ'রে রইল। সেই অবস্থাতে আমাদের প্রথম প্রেমের বাসর-রাত্রি অবসান হ'ল।

পরদিন সন্ধের সময় ললিতা ইহলোক থেকে বিদায় নিলে।

দীনবন্ধুর কাহিনী শুনিয়া আমরা নীরব রহিলাম। মহেন্দ্র-দাদা জিজ্ঞাসা করিল, গেরুয়া ছাড়লে কোথায়?

দীনবন্ধু বলিল, শ্মশানঘাটে স্নান ক'রে নতুন কাপড় পরবার সময় গঙ্গার জলে গেরুয়া ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি।

স্বর্গের চাবি

ক্ষে মী

কিরণশঙ্কর রায়

ক্ষেমী ছিল আমার পিস্‌তুত ননদ। আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমাব বয়স ছিল বারো, তার বয়স পাঁচ। একে তো বয়সে ছোটো, তাবপর শাসন ও শিক্ষার গুণে তার দেহ-মন বয়সের চেয়েও ছোটো মনে হ'ত। আমার পিস্‌শাশুড়ী প্রায় সমস্ত জীবনই বাপেব বাড়িতেই কাটালেন—ক্ষেমীরও জন্ম হয়েছিল আমার শ্বশুরবাড়িতে এবং এখানেই সে মানুষ হয়েছিল। ক্ষেমীর না ছিল রূপ, না ছিল কোনো গুণ। রং কালো, মাথায় চিরুণী বড়ো একটা পড়তই না—হাতের নখগুলো যেমনি বড়ো তেমনি ধারালো এবং ময়লায় পবিপূর্ণ—কাপড় নোংরা, হাতে দু'গাছা কাচেব চুড়ি—এই ত রূপ। গুণেরও সীমা ছিল না। দুবেলা খাবার সময়ে ছাড়া তাকে বাড়িতে দেখা যেত না। কোথায যে সে ঘুরত—কোন আমবাগানে, কাদের কুলগাছের তলায, কোন অজাত-কুজাতের ঘরে, তা আমরা জানতাম না এবং জিজ্ঞেস কবলেও সে তাব কোনো জবাব দিত না, তবে মাঝে মাঝে আমটা জামটা সঞ্চয় ক'রে বাড়ি ফিবত। বাড়িতেও তার দুবন্তপনার অন্ত ছিল না। শুনতাম ক্ষেমী নাকি ঠাকুরঝিদের পুতুল খেলনা চুরি করত—রোদে দেওযা কাপড় ছিঁড়ে দিত। শাশুড়ী বলতেন—ও মেয়ে ভাবি বজ্জাত। ওর পেটে কেবল শয়তানি বুদ্ধি, ও আমার সুরো-নিবোব (ঠাকুবঝিদের) ভালো কাপড় ভালো জামা দেখলে হিংসেতে জ্বলে। মনে আছে আমেব দিনে ঠাকুরঝিরা আম খেতে বসেছে—আমি জল থালা এগিযে দিচ্ছি, শাশুড়ী আম টুকরো টুকরো ক'বে ঠাকুরঝিদেব থালায় দিচ্ছেন। ক্ষেমী পাড়া বেড়িয়ে এসে চুপচাপ ক'বে পাশে বসল, তারপর যখন দেখল তার আম পাবার কোনো আশু সম্ভাবনা নেই তখন নিজেব আঁচল থেকে কাঁচা অর্ধেক খাওযা একটা আম বেব ক'রে তাই খেতে লাগল এবং মাঝে মাঝে আড় চোখে ঠাকুবঝিদেব আম খাওযা দেখতে লাগল। ওপাড়া থেকে বোসেদের বড়োবৌ এসেছিলেন, তাঁর মেজ জা'র সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া হযেছে সেই কথা বলতে। তিনি বললেন,—হ্যাঁলো, কাকেও কিছু খেতে দেখলে অমন ক'বে তাকিযে থাকিস কেন? অমন কবতে নেই। বড়ো জা বল্‌লেন—ওর স্বভাবই ঐ। যে যখন খাবে ওব ব'সে ব'সে দৃষ্টি দেওযা চাই, যেন ওকে কেউ কিছু খেতে দেয় না। ক্ষেমী উঠে বাগানের দিকে চল্‌ল। শাশুড়ী ডাকলেন—ক্ষেমী আয়, আয়, এই আমটা নিয়ে যা। ক্ষেমী সেদিকে দৃক্‌পাত না ক'বে ধীব পদবিক্ষেপে অন্দবেব বাগানেব দিকে চলে গেল। শাশুড়ী বললেন—ভয়ানক জেদী মেযে—একগুঁয়েব হদ্দ। পাবিবারিক বিগ্রহের সমস্ত কাজই পিসিমা কবতেন এবং দিনের সমস্ত সময়ই তিনি ভোগেব দালানেই কাটাতেন—শাশুড়ী সেদিকে কটাক্ষ ক'রে বললেন—এই নিয়ে একটা কান্নাকাটিব ধুম পড়বে এখন।

চাবিদিককার শাসনে ক্ষেমীর মনে সদাই একটা সন্দেহের ও বিদ্রোহের ভাব জেগে থাকত। এমন অনেকদিন হয়েছে যে তাকে কিছু খেতে দিতে গেলে সে হাত থেকে খাদ্যব ছিনিয়ে নিয়ে গেছে অথবা নিয়েই আঁচলে লুকিয়েছে—পাছে শেষ পর্যন্ত তাকে জিনিসটা দেওযা না হয় এই ভয়ে। আবার এমনও হয়েছে যে যেটা তাকে খেতে দেওয়া হয়েছে সেটা তখন না খেয়ে পরে লুকিয়ে ঢেঁকিশালায় বা বাগানে ব'সে চেখে চেখে সেটাকে খেয়েছে—এজন্যে অনেকদিন চুরির অপবাদ তার ঘাড়ে পড়েছে—তবু তার অভ্যাস বদলায়নি। মাঝে মাঝে তার সেই চাপা বিদ্রোহ হিংস্র আকারে ফেটে বেরিয়ে পড়ত এবং সেদিন তার আর রক্ষা থাকত না। আমাব ছোটো ননদ নিরুপমা ক্ষেমীর চেয়ে বছর খানেকের বড়ো। একদিন সে কি নিয়ে ক্ষেমীকে খুব গালাগালি দিল এবং দু একটা কিল-চড়ও দিল। আগে আগে ক্ষেমী পিসিমার কাছে নালিশ করত। তিনি বলতেন—

ভাচ্ছা তুমি যাও, বাইরে যাও, ওদের সঙ্গে ঝগড়া কোরো না। ক্ষেমী বুঝেছিল সেদিকে কোনো প্রতিকারের আশা নেই। সেই থেকে বাড়ির কেউ সামনে না থাকলে সেও ঠাকুরঝিদের দু'চার ঘা দিতে ছাড়ত না। সেদিনও সে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে থেকে হঠাৎ নিরুর চুল ধ'রে তাকে মাটিতে লুটিয়ে দিল। নিরু চীৎকার ক'রে উঠল আর অমনি বাড়ির সমস্ত লোক হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এল—ওমা এমন দস্যি মেয়ে—আর একটু হলে নিরু বারান্দা থেকে নিচে পড়ে যেত, তাহ'লে কি আর ও মেয়ে রক্ষা পেত। নিরু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ক্ষেমী সেই যে লোক সমাগমে নিরুকে ছেড়ে দিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল, সেইখানেই অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, একটা কথা ব'লেও নিজের দোষ স্খালন করবার চেষ্টা করল না। পিসিমা এসে তাকে মারলেন, বললেন—পাজি মেয়ে, আমায় একদণ্ডও শান্তিতে থাকতে দিবি না—রাতদিন তোর জন্যে আমার অশান্তি, মরেও না হতভাগী। পিসিমার দুই চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। একমাত্র আমি সমস্ত ব্যাপারটা দেখেছিলাম। আমি জানতাম ঠাকুরঝিই প্রথম মেরেছে। সে কথা প্রকাশ করতেই সবাই বললেন—তুমি বৌ মানুষ, তোমার সব কথায় কথা বলবার দরকার কি? আর না-হয় দুটো কিলই দিয়েছে, তাই বলে অমন ক'রে চুল ধ'রে মাটিতে শুইয়ে দেবে? একটা কিলের বদলে যে ঠিক কি করা উচিত ছিল সেটা ধার্য না হ'লেও সবাই ঠিক জানলেন যে ক্ষেমী একদিন কাউকে না কাউকে খুন করবে। ক্ষেমী কিন্তু সমস্ত চেঁচামেচি গালাগালি অগ্রাহ্য ক'রে যেমন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। তখন শাশুড়ী বললেন—দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি—একবার ডাক ত সুরেনকে। সুরেন আমার দেওর, এ বাড়িতে সর্বপ্রকার শাসন কার্য তাঁর দ্বারা সম্পাদিত হ'ত, তিনি এই দ্বিতীয়বার এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে বসেছিলেন। ঠাকুরপো এসে ক্ষেমীকে জিজ্ঞেস করলেন—কিরে, নিরুকে মেরেছিস্ কেন? ক্ষেমী কোনো জবাব দিল না—নিস্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইল। অনেক কিল চড় খেল—তবু একটা কথা বললে না—কেবল তার চোখ-দুটো জলে ভরে এল আর ঠোঁট দুটো ফুলে ফুলে কাঁপতে লাগল। ঠাকুরপো বলতে লাগলেন—বল্ আর কখনও মারবি? আর কখনও করবি? পিসিমা কাতর হয়ে বললেন—আর করবে না সুরেন, ও আর করবে না, এখন ওকে ছেড়ে দে। ঠাকুরপো বললেন—না পিসিমা, অমনি করেই তো তুমি ওর মাথা খেয়েছ। তারই আঁচল দিয়ে তার হাত বেঁধে ঠাকুরপো তাকে বাইরে নিয়ে গেলেন—যেন শিক্ষাকার্যে কোনো বাধা না পড়ে। সেদিন এক মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি বাড়ির বৌ, আমার মনে হয়েছিল—আমি যদি পুরুষ হতাম তবে—থাক, সে আক্ষেপ ক'রে আজ কোনো লাভ নেই—তবু আজ সেই সব কথা মনে প'ড়ে কেবলি চোখে জল আসে—কেবলি মনে হয় যদি এমন না হয়ে অমন হ'ত তবু তো একটা সান্ত্বনা পাওয়া যেত।

বাড়িতে ক্ষেমীর ভাব ছিল দাসদাসীদের সঙ্গে। গুরুজনেরা বলতেন—যেমন স্বভাব তেমনি সঙ্গী। তার ভাব ছিল আমার সঙ্গে। আমার বিয়ের কথা মনে পড়ে। বিয়ের আনন্দ কোলাহল ও বাড়ির জনতা কমে এল। যাঁরা বিয়ে দেখতে এসে অসুখে পড়েছিলেন, তাঁরা আরাম হয়ে দেশে ফিরে গেলেন—আমার শাশুড়ীর মাসতুত বোনের মেয়ে নিস্তারিণী ঠাকুরঝির সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছিল—তাঁর একটি ছেলে হয়ে আঁতুড়েই মারা গেল—এমনি ক'রে যখন সকল হাঙ্গাম চুকল, ছুটির শেষে স্বামী কলকাতার মেসে ফিরে গেলেন এবং আমার কাজ শিক্ষার সময় এল, তখন এই ভাসুর দেওর জা' ও নানারকম ননদে ঠাসা বাড়িটাতে এক একদিন হাঁপিয়ে উঠতাম। কার সঙ্গে কথা বলতে হবে, কার সামনেই বা বের হওয়া নিষেধ, বৌ মানুষের দ্রুত চলা উচিত কিনা, হাসা উচিত কিনা, পিতার অভাবে মাতার অত্যধিক আদরে আমার চরিত্রে কি কি দোষ ঘটেছে—এসব কথা শুনতে শুনতে এক-একদিন মন একেবারে উদ্ধত হয়ে উঠত। বাস্তবিকই মিত্তিরদের বাড়ির বৌ হবার যোগ্যতা আমার ছিল না। তবে একথা স্বীকার করতেই হ'বে যে চেষ্টার ত্রুটি

হয়নি। মিস্ত্রিরদের সরিক-বাড়ির একটি নতুন বৌ গান গাইতে জানত ব'লে শাশুড়ী আমার স্বামীর জন্য গান-জানা মেয়ে খুঁজেছিলেন। আমি একটু আধটু গান গাইতে পারতাম—আমার পুরোনো হারমোনিয়ামটা আমার সঙ্গে এসেছিল—কিন্তু গান গাওয়া দূরে থাকুক, হারমোনিয়াম বাজান আমার পক্ষে নিষেধ ছিল। একদিন ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে গোপনে হারমোনিয়ামটা আস্তে আস্তে একটু বাজিয়েছিলাম। তার পরদিন থেকে হারমোনিয়ামের চাবি শাশুড়ী নিজের কাছে রেখে দিলেন। স্বামীর কাছে ঘন ঘন পত্র লেখা নিষেধ, মায়ের কাছে পোষ্টকার্ড ভিন্ন লেখা নিষেধ ;—এ সবই হয়েছিল এবং ফল যে কিছুই হয়নি একথা বলতে পারি না। শাসন বল, উপদেশ বল, শিক্ষা বল, প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি, কিন্তু স্বামী ছাড়া আর কারো কাছে না পেয়েছি ক্ষমা, না পেয়েছি একটু আদর, অথচ বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির অপরিচিত লোকের মধ্যে একটুখানি আদর পাবার জন্য মনটা উন্মুখ হয়ে থাকত। মনটা যখন বেশি উগ্র হয়ে উঠত—কিছুতেই বিরক্তি দূর করতে পারতাম না—তখন পিসিমার কথা ভাবতাম—তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলা নিষেধ ছিল। আমিও তাঁকে এড়িয়েই চলতাম, তাঁর কাছে গেলে তিনি ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, পাছে আমরা তাঁর কোনো জিনিসপত্তর ছুঁয়ে দি,—কারণ, তিনি জানতেন যে, একান্ত বিশুদ্ধতার জন্যে দিনের মধ্যে যতবার স্নান করা, অন্তত কাপড় ছাড়া, অবশ্য কর্তব্য, আমার সে-সব হয়ে উঠত না ; কিন্তু পরে দেখেছি পিসিমা এসব প্রশ্ন একেবারেই তুলতেন না। পিসিমা একদিন হঠাৎ আমার স্বামীর নাম করে বললেন, বৌ, তাকে আমি নিজ হাতে মানুষ করেছি। তুমি আমার সঙ্গে কথা বোলো—আমায় দেখে অত লজ্জা কববার দরকাব নেই—আমি আবার একটা মানুষ! সেইদিন বুঝলাম পিসিমা কত বড়ো একটা ব্যথা নীরবে বহন কবছেন। যখনই ছোটোখাটো অত্যাচাবে অধীর হয়ে পড়তাম তখনই তাঁর কাছে গিযে বসতাম। দুপুরবেলা বাইরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে, কার্ণিশের উপব থেকে পায়বার ডাক শোনা যাচ্ছে। পিসিমা ভোগের দালানে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ ক'রে দিয়ে মেজেতে আঁচল বিছিয়ে শুতেন। আমি একখানা খবরের কাগজের উপর সুপুরি কেটে জমা করতাম। পিসিমা হেসে বলতেন, পাগলী, আমরা যে মেয়েমানুষ—আমাদের কি সহ্য না ক'বে উপায় আছে? ঐ ত—ঐ কথাটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না। মেয়েমানুষ হয়েছি বলেই কি ন্যায় হোক অন্যায় হোক সব মাথা পেতে নিতে হবে? পিসিমা বলতেন—পূর্বজন্মে পাপ না করলে স্ত্রীজন্ম হয় না। আবার এক একদিন পিসিমা তাঁর শ্বশুরবাড়িব গল্প করতেন—তাঁদেব টিনের ঘর, তাঁদের মস্ত পুকুর, পিসেমশায় ঘন দুধ খেতে ভালোবাসতেন, একবার তিনি বাজি বেখে একটা কাঁঠাল একাই খেয়েছিলেন,—এই সব বলতে বলতে পিসিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একটু চুপ করতেন, তাবপর দেখতাম তাঁর হাতের হাতপাখাখানা টলে মেজেতে প'ড়ে যেত, তাঁর নাক একটু একটু ডাকতে শুরু করত। আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে দোতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতাম। মনে হ'ত সূর্যের প্রচণ্ড তাপে গ্রামটা যেন মূর্ছিতের মতো পড়ে রয়েছে—দূরে গ্রামের পথ দিয়ে ক্বচিৎ একটি দুটি লোক অবেলায় স্নান সেরে ভিজে গামছা মাথায় দিয়ে চলেছে, অন্দরের পুকুরে সবুজ-সর-পড়া জল একেবারে স্থির, পুকুরের ধারে একটা নারিকেল গাছের উপর একটা শঙ্খচিল মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ সুরে ডেকে উঠছে। রান্নাঘরের উঠানে এঁটো বাসনের সামনে দু' তিনটে কুকুর ভাত খেতে খেতে মাঝে মাঝে পরস্পরকে তাড়া করছে। কাছে পাঁচিলের উপর এক সার কাক ব'সে আছে—মাঝে মাঝে এক একটা কাক এসে এঁটো ভাত নিয়ে উড়ে পালাচ্ছে। তারপর দেখতাম ক্ষেমী বাগানে গাছতলায় কি কুড়ুচ্ছে। আমিও নেমে বাগানে যেতাম। সেখানে গাছের ছায়ায় ব'সে ক্ষেমীর সঞ্চিত নুন দিয়ে কাঁচা আম খেতে খেতে খবর পেতাম—দত্তদের বাড়ি তাদের নতুন গরুর একটা বাছুর হয়েছে, বাগদীরা একটা মস্ত শুয়োর মেরেছে—আরও কত কি। আমি বলতাম—তুই যে অমন ক'রে যেখানে সেখানে যাস, একদিন বাগ্‌দীরা তোকে ধ'রে নিয়ে যাবে। ক্ষেমী বলত ইস!

এক একদিন উত্তেজিত হ'য়ে স্বামীকে বলতাম। স্বামী বলতেন—তুমি ওসব গোলমালের মধ্যে যেও না। জানতাম স্বামীকে ব'লে লাভ নেই। তিনি কলেজে পড়েন, কোনো অত্যাচার দমন করা তাঁর সাধ্য ছিল না এবং অত্যাচার নিবারণ করবাব চেষ্টা করলে অত্যাচার কমা দূরে থাক বাড়বারই সম্ভাবনা ছিল। এক-এক সময় ভাবি, যদি স্বামী আমার পক্ষ অবলম্বন ক'রে কিছু বলতেন, তবে না জানি মিত্তির পরিবারে কি বিপ্লবই উপস্থিত হ'ত। অপবিচিত নয়, অন্য নয়, নিজের স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করা—মিত্তির পরিবারে যা কখনও হয়নি আজ নাকি তাই হ'ল—এমন মেয়েও ঘরে এনেছিলাম!—এমন ধরণের কথা নিশ্চয়ই উঠত। গল্প শুনেছি কিছুদিন পূর্বে এই মিত্তির বাড়িতেই কার যেন ছেলের কলেবা হয়েছিল। কিন্তু ছেলেব বাপ তো নিজে ছেলের চিকিৎসা করাতে পারবে না—বিশেষত নিজের বাপ বর্তমানে, অথবা সে কথা নির্লজ্জেব মতো তাঁকে বলতেও পারেন না। এই সব গোলে ডাক্তার যখন এল তখন ডাক্তার না আনলেও ক্ষতি ছিল না। আমার শ্বশুর ছিলেন বাড়ির কর্তা। দু'বেলা খাওয়া ও রাত্রে শোওয়া ছাড়া বাড়ির ভিতরেব সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। জমিদারি দেখা ও পূজা-আচ্চা নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। তিনি অত্যন্ত মনভোলা বেখেয়ালী মানুষ ছিলেন। কিন্তু বাড়ির যিনি কর্তা তিনি বেখেয়ালী হ'লে চলে না। এই যে পিসিমার প্রতি নানাবিধ অত্যাচার উপেক্ষা হ'ত সে সবের প্রতিকার করা কি তাঁর উচিত ছিল না? যারা ছোটো—কর্তব্য কর্মে ভুল হওয়ামাত্র যাবা শাস্তি পেত—তাদের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে ঢেব লোক ছিল, কিন্তু যাঁরা কর্তব্য পালন না করলে সংসারে শত অশান্তির সৃষ্টি হ'ত তাঁরা কর্তব্য স্মরণ করা নিষ্প্রয়োজন মনে কবতেন। পিসিমার কথাই ভাবি। তাঁর যখন বিয়ে হয়েছিল তখন ছেলে দেখবার আবশ্যকতা কেউ বোধ কবেনি। যাঁর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল তাঁর আর্থিক সচ্ছলতা না থাক বংশের উচ্চতা ছিল। বাড়িব পুরোনো চাকর মাধু ছেলে দেখতে গিয়েছিল। সে বললে এমন ছেলে হয় না, যেন সাক্ষাৎ কার্ত্তিক, তাদের তিন-চারখানা টিনের ঘব, পুকুরে মাছ, দেশে দুধ ঘি সস্তা, কিন্তু তা কেনবার কড়ি ছিল না। পিসেমশায় পিসিমাব চেয়ে বছব কুড়ি বড়ো ছিলেন। অবশ্য তাতে কোনো আপত্তি হবার কারণ ছিল না। বিয়েব কিছুদিন পবেই তাঁবা এসে আমার শ্বশুরের আশ্রয়ে এই বাড়িতেই বাস করতে লাগলেন। ভায়েব অন্নে প্রতিপালিত হতে পিসিমাব লজ্জা হ'ত এবং মাঝে মাঝে তিনি শ্বশুরবাড়ি যাবার প্রস্তাব করতেন, কিন্তু এখানকার দুধ তামাক কাঁঠাল প্রভৃতি ছেড়ে যেতে পিসেমশায় কোনো মতেই বাজি ছিলেন না। বস্তুত খাওয়া ও দেবদ্বিজে ভক্তি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে তাঁর বিশেষ সুনাম ছিল না। চার পাঁচটি ছেলেপিলে হয়েছিল, কিন্তু একটিও বাঁচল না—এক ক্ষেমী ছাড়া। তারপর পিসেমশায়ের মৃত্যু হ'ল। ক্ষেমীকে কোলে নিয়ে পিসিমা যখন বিধবা হ'লেন তাঁর বয়স ত্রিশের নীচে। তারপর থেকে কত অপমান আব ক্ষুদ্র অবহেলার মধ্য দিয়ে ক্ষেমীকে মানুষ করেছিলেন। বিধবা হয়ে পরের বাড়িতে থাকতে যে কি অসাধারণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাব দরকার হয় তা পিসিমাকে দেখলে বোঝা যেত, কিন্তু পিসিমা এ সবকে নিতান্ত সাধারণ ভাবেই নিতেন, বলতেন অদৃষ্ট। যেন শেষ মীমাংসা হয়ে গেল—অদৃষ্ট যখন, তখন আব কি, দাঁতে দাঁত চেপে নীরবে সহ্য কর।

ক্ষেমীর সঙ্গে ভাব হ'তে আমার বেশি সময় লাগেনি। ঠাকুরঝিবা আমাব চিঠি খুলে আমার নামে নালিশ ক'রে অস্থির ক'রে তুলত। পরীক্ষাব বছর স্বামীর কাছে চিঠি লেখা নিষেধ ছিল। হয়ত দরজা বন্ধ ক'রে গোপনে তাঁর কাছে চিঠি লিখছি, ফস্ ক'রে খড়খড়ি খুলে ঠাকুরঝি বললে—ফের বৌদি, মেজদার কাছে চিঠি লেখা হচ্ছে বুঝি? মাকে ব'লে দেবো কিন্তু। নানারকম ঘুষ দিয়েও তাদের মুখ বন্ধ করতে পারতাম না। চিঠি ডাকে দেবার, টিকিট কেনবার পক্ষে ক্ষেমীই ছিল আমার সহায়। দুপুর বেলা হয়ত বাক্স খুলে এটা ওটা গোছাচ্ছি ক্ষেমী পেছন থেকে হঠাৎ ঝুপ ক'রে আমার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল—আঃ ক্ষেমী, লাগে, ছাড়। সে ছেড়ে দিয়ে স্থির হয়ে বাক্সর কাছে বসল,

তারপর ফের এটা ওটা টেনে বেব ক'রে অস্থির ক'রে তুলল। আমি বলতাম—যা, আমি তোর সঙ্গে কথা বলব না। অমনি সে অনুতপ্ত হয়ে উঠত। আমার সঙ্গে এই ছিল তার ব্যবহার; মাঝে মাঝে তার চুল বেঁধে কপালে টিপ পরিয়ে দিতাম, তার মলিন কাপড়ে একটু এসেন্স মাখিয়ে দিতাম। এই নিয়ে শেষ পর্যন্ত উভয়েই গঞ্জনা পেতাম। প্রথমত ক্ষেমীকে চোব সাব্যস্ত কবা হ'ত; তারপর আমি যখন বলতাম যে আমি দিয়েছি, তখন শাশুড়ী বলতেন—নিজের ননদের সঙ্গে ঝগড়া আর পরের সঙ্গে ভাব!

ক্রমে ক্ষেমীর বয়স বাড়ল। তার বিদ্রোহেব ভাব কখন যে অলক্ষ্যে দূর হয়ে গেল তা বোঝাই গেল না। আব সে পাড়া বেড়াতে যায় না। মাঠের ধারেব জামগাছ আর রায়েদের কুলগাছেব সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘুচে গেল। তাব মুখে কোমলতা আব চোখে লজ্জার আভাস দেখা গেল। কুশ্রী ক্ষেমীকে সহসা সুশ্রী বলেই মনে হ'ত। তার বয়স চোদ্দ হ'ল, অথচ বিয়ের খোঁজ নেই—এ অবস্থায় পিসিমার গলা দিয়ে কি ক'বে যে ভাত গলে তা গ্রামেব লোকেরা বুঝতেই পারত না। বাড়িব সমস্ত গিন্নি বৌবাও বিরক্তি বোধ করতে লাগলেন। শাশুড়ী একদিন খাবাব সময়ে আমার ভাসুবকে বললেন—আচ্ছা উপেন, ঐ যে যদু দত্ত আমাদেব কি কাজ করে, তাব একটি ছেলে আছে, তাব সঙ্গে ক্ষেমীর সম্বন্ধ হয় না? ভাসুর দুধটুকু নিঃশেষ ক'রে খেয়ে দুধেব বাটিটাতে খানিকটা জল ঢেলে সেটাও পান ক'বে বললেন—রাম বাম, সে ছোঁড়া আট টাকা মাইনেতে মুহুরিগিরি কবছে। তাব উপব গাঁজাটা-আশটাও চলে। তাব সঙ্গে কি ক্ষেমীর বিয়ে হয়! শাশুড়ী বললেন—তা তোবা একটা উপায় কবে দিস। বিয়ে হ'লে ক্ষেমীকে, ক্ষেমীব স্বামীকে তোবা তো ফেলে দিতে পাববি নে। পিসিমাব আপত্তিতে কথাটা কিন্তু বেশি দূব এগোতে পারল না। আর যদি কখনও বিয়েব কথা উঠত শাশুড়ী বলতেন—আমি তাব কিছু জানি না বাপু, যাঁর মেয়ে তাকে জিজ্ঞেস কর। অবশেযে বাজপুর থেকে সম্বন্ধ এল। বাজপুব আমাদেব গাঁ থেকে মাইল পোনেবো দূরে। তাঁরা মেয়ে দেখা নিয়ে বেশি গোলমাল করলেন না, তবে হাজাব দুই টাকা চাইলেন। শেযটা পোনেরো শ' টাকায় কথা পাকা হ'ল। ইতিপূর্বেই আমাব স্বামী ডেপুটি হয়েছিলেন এবং আমিও পূর্বেব মতো কনে-বউটি ছিলাম না। অতএব একবকম করে টাকাটা উঠল। বিয়ে হয়ে গেল। জামাই দেখে পিসিমা খুশি হলেন। জামাইটিব বয়স অল্প, বি-এ পড়ছে, দেখতেও ভালো, বেশ নম্র শান্ত। শুনেছিলাম—অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, একেবারে কিছু নেই বললেই হয। তা হোক, জামাই দেখে ভাবলাম অভাগী ক্ষেমীব এবাব বুঝি কপাল ফিবল। জামায়ের নাম দীনেশ। খবব পেলাম—সে যে কেবল নিঃস্ব তা নয়, তাব বাপ মা ভাই বোন আপনার বলতে কেউ ছিল না। বাজপুবে বামনিধিবাবু পাটের ব্যবসা ক'রে অনেক টাকা উপার্জন করতেন, তাঁরাই দীনেশকে মানুষ করেছিলেন। রামনিধিবাবুর ছেলেরা কলকাতায় কলেজে পড়ত, দীনেশও সেইখানে থাকত, বামনিধিবাবু ও তাঁর সমস্ত পরিবাব বাজপুরে থাকতেন। ক্ষেমীকে তাঁরা সেইখানে নিয়ে গেলেন। এক কাঙালের ভার আব এক কাঙালের উপর পড়ল—এই ভেবে বিয়ের সময়েই মনটা একটু খারাপ হয়েছিল; তবু এই আশা কবেছিলাম যে ক্ষেমী অনেক কষ্ট পেয়েছে, ভগবান তাকে আর কষ্ট দেবেন না। বিয়ের কিছুদিন পরে সে যখন শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছুদিনের জন্যে ফিরে এল তখন তাব আশ্চর্য পরিবর্তন দেখলাম। অনেক ফর্‌সা হয়েছে, শরীরটাও আগের চেয়ে অনেক ভালো। সিঁথির সিঁদুরে কাপড়-চোপড়ে তাকে বেশ দেখাচ্ছিল। স্বামীর প্রেম তার সমস্ত দেহে যেন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছিল। সেই দুষ্টু পাগলী মেয়েকে একেবারে অপূর্ব লক্ষ্মী-শ্রী মণ্ডিত ব'লে মনে হচ্ছিল। সে আর সেই দুর্দান্ত ক্ষেমী নয়, সে স্বামীর প্রণয়িনী, গৃহের গৃহলক্ষ্মী। রাজপুর থেকে সে যেদিন এল তার পরদিনই তার কাছে একখানা চিঠি এল। রঙিন খামের উপর লেখা—শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি লো ক্ষেমী, আবার জ্যোৎস্না হলি কবে? সে জবাব দিল না, মুখ নীচু ক'রে একটু একটু হাসতে

গল্প। আজও যেন ছবির মতন সেই সব দিনকার ঘটনা আমার চোখের সামনে ভাসছে। এতটুকু বয়েস থেকে যাকে দেখলাম সেই মেয়ে বড়ো হয়ে একদিন ঘরের কল্যাণী গৃহিণী হ'ল, আজ সে নাই একথা হঠাৎ কেমন অসম্ভব ব'লে মনে হয়। হ্যাঁ—তারপর বছরখানেক তার সঙ্গে দেখা হয়নি, কারণ আমি স্বামীর সঙ্গে বাংলা দেশের জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, সেও আর শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে আসে নি। তবে মাঝে মাঝে তার চিঠি পেতাম। এই-রকম চার পাঁচ মাস চলল তারপর চিঠিও বন্ধ হ'ল।

ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি স্বামীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে ছুটি নিয়ে দেশে ফিরে যাওয়া হ'ল। পিসিমার কাছে শুনলাম তিনিও অনেক দিন হ'ল ক্ষেমীর চিঠি পান নি। রামনিধিবাবুর স্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে কোনো জবাব পেলাম না। এমন সময়ে দীনেশের এক চিঠি পেলাম, তাতে লেখা ছিল—ক্ষেমীর খুব অসুখ এবং চিঠির ভাবে বুঝলাম সেখানে চিকিৎসা যত্ন কিছুই হচ্ছে না। দীনেশের ইচ্ছা আমরা তাকে নিয়ে আসি। লোক পাঠালাম তাকে আনতে—তাঁরা বললেন এমন বিশেষ কিছু নয়, ঠাণ্ডা লেগে একটু কাশি হয়েছে। কিন্তু ছাড়লাম না। শাশুড়ী একটু আপত্তি করেছিলেন। বললেন—তাঁদের বৌ, তাঁরা যদি উচিত বিবেচনা না করেন।—শ্বশুরকে বললাম—তিনি নিষেধও করলেন না, উৎসাহও দিলেন না। স্বামীর ডেপুটিত্বে পরিবারের মধ্যে আমার প্রতিপত্তি কিছু বেশি ছিল,—সেই জোরে নিজেই জোগাড় ক'রে তাকে আনালাম। পালকী এসে যখন অন্দরের উঠানে নামল—দেখলাম ক্ষেমীর ওঠবার সামর্থ্য নেই। পাংশু শীর্ণ মুখের মধ্যে কেবল চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। ডাক্তার বললে—যক্ষ্মা। মনে জানতাম বাঁচবে না—তবু—হায়রে, মানুষের মনের এই তবু! সংসারের শত উপেক্ষার মধ্যে যে মানুষ হয়েছিল, আজ যেমনি সে জীবনোৎসবের দ্বারে এসে দাঁড়াল অমনি কি মৃত্যু তাকে স্মরণ করল। রোগের যে ইতিহাস পাওয়া গেল সে হচ্ছে এই—রামনিধিবাবুর একটি মেয়ে কিছুদিন হ'ল ঐ রোগে মারা যায়, তার অসুখের সময়ে ডাক্তার রোগীর পরিচর্যা সম্বন্ধে শুশ্রূষাকারীদের বিশেষ সাবধান ক'রে দিয়েছিল। অতএব রামনিধিবাবুর স্ত্রী ক্ষেমীকে দিয়ে তার শুশ্রূষা করিয়েছিলেন। যদি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হ'ত তবে হয়ত এমন সর্বনাশ হ'ত না। আবার ভাবি, অদৃষ্ট—বারেবারেই সেই অদৃষ্ট। একদিন যেমন মানুষের আচরণ বুঝতাম না ব'লে অদৃষ্ট ব'লে চুপ ক'রে থাকতাম—আজও তেমনি চুপ ক'রে রইলাম। শুনতে পেলাম ক্ষেমী সাবধান হবার চেষ্টা করলে রামনিধিবাবুর স্ত্রী বিরক্ত হতেন। দীনেশ জানত—কিন্তু সে যে তাঁদের খেয়েই মানুষ।

ক্ষেমী আমাদের এখানে এসে মাসখানেক ছিল। ডাক্তারি কবরেজি মুষ্টিযোগ কিছুতেই কিছু হ'ল না। অনেক রাতে সমস্ত বাড়ি নিদ্রায় মগ্ন—ঘরের সমস্ত জানলা খোলা—ক্ষেমী বিছানায় বিলীন হ'য়ে থাকত। মাঝে মাঝে একটু কাশি, তাও আস্তে। ঘরের নিস্তব্ধতা ঘড়িটার শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। বারান্দায় লণ্ঠনটা জ্বলছিল। আমি একটু একটু বাতাস দিচ্ছিলাম। পিসিমা মেঝেতে শুয়ে ছিলেন, হঠাৎ ধড়মড় ক'রে উঠে বললেন—কি? কি বৌ, কি? আমি বললাম—কই পিসিমা, কিছু নয়ত। আপনি ঘুমোন, আমি আছি। সে রাত্রে তার বুকের ব্যথাটা একটু বেড়েছিল।

ক্ষেমী বললে—বৌদি।

কি ক্ষেমী?

আমি বাঁচব না, না?

আমি বললাম—কে বললে তুমি বাঁচবে না? তুমি ভালো হবে, তবে একটু দেরি হবে।

না বৌদি, আমি বুঝতে পারছি আমি বাঁচব না।

আমি বললাম—লক্ষ্মীটি, একটু ঘুমোও।

ঘুম যে পাচ্ছে না, বৌদি।

একটু চেষ্টা ক'রে দেখ।

সে বললে—না, ঘুম পাচ্ছে না। তার চেয়ে তুমি একটু কথা বল। দেখ বৌদি, এই রাত্তিরগুলো যেন যেতেই চায় না। রাত্তির আমার ভালো লাগে না। কী চুপচাপ, একটা শব্দ পর্যন্ত নেই।

চুলগুলো কাটতে দেয়নি ব'লে বেণী বেঁধে দিয়েছিলাম। মনে হ'ত সে যেন সেই ছোট্ট মেয়েটি রয়েছে, আমার উপর তেমনি নির্ভর, আমার কথার উপর তেমনি বিশ্বাস। জীবনের শেষ কয়েকটা দিন বুদ্ধিহীনা ক্ষেমীর বুদ্ধি যেন অকস্মাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। প্রায়ই সে মৃত্যুর কথা বলত। মৃত্যুকে যে সে ভয় করত এমন মনে হয় না, তবে মাঝে মাঝে দেখেছি চোখের পাতা জলে ভিজে। জিজ্ঞেস করলে কিছু বলত না, চিরকালই তার ঐ রকম চাপা স্বভাব। মনে হত—ওপারের সে এত কাছাকাছি পৌঁচেছে যে সেখানকার অনেক রহস্য সে যেন বুঝতে পারত। একদিন সে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা বৌদি, মরলে কি লোকে পৃথিবীর কথা ভুলে যায়? আমি কি বলব, আমি সামান্য মেয়েমানুষ, আমি সে সব কথার কি জানি। একদিন রাত্রে সে বেশি অস্থির হয়ে পড়ল। পিসিমাকে বলল,—মা, আমায় একটু কোলে নে। পিসিমা দুইহাতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। স্বামীকে ডেকে নিয়ে এলাম। ক্ষেমী বললে—মেজদা, আমি আর বাঁচব না, সবাইকে ডাক, একবার সবাইকে দেখি। স্বামী বললেন—ক্ষেমী, একটু স্থির হয়ে শোও তো। সে বিছানায় স্থির হয়ে শুল। বললে—মেজদা, ভয় করছে। স্বামী কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে বললেন—ভয় কি? এই ত আমি আছি। আমি তোব কাছে বসছি, নে, তুই আমার হাত ধ'রে থাক। সে ছোটো মেয়েটির মতো তাঁর হাত ধ'রে কোলেব কাছে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি আর ঘরে থাকতে পারলাম না। বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালাম। আকাশের দিকে তাকালাম, চাঁদ তখন অস্ত গিয়েছে, পাথরের মতো কঠিন কালো আকাশে তারাগুলো জ্বল জ্বল করছিল। বাইরে বাগানের গাছগুলো স্তব্ধ কালো। ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ, অন্ধকারে সেই প্রকাণ্ড বাড়িটা কেমন যেন রহস্যপূর্ণ। তারি মাঝখানে ক্ষেমী—আমাদের সেই ছোট্ট ক্ষেমী—এ কোন্ অন্ধকারের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। আমি যেন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম—আকাশে, গাছগুলোয়, এই বাড়িটার মধ্যে কি যেন ইঙ্গিত খেলে গেল। তারা যেন এই ঘরটার পানে চেয়ে কিসের প্রতীক্ষা করছে। কেবল মানুষের সেদিকে খেয়াল নেই। তারা খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিচ্ছে। একবার মনে হ'ল চেঁচিয়ে সবাইকে ডাকি—ওগো তোমরা ওঠ ওঠ, একটা প্রাণ শেষ হয়ে যাচ্ছে।

যেদিন তার মৃত্যু হ'ল, সেদিন সকাল বেলা সে ভালোই ছিল। আমায় ডেকে বললে—বৌদি, তাকে একটা টেলিগ্রাম কর। দীনেশ তার আগের দিনই ফিরে গেছল। তার কলেজ খোলা, তাই তাকে আর টেলিগ্রাম করা হ'ল না। চিঠি লিখে দেওয়া হ'ল। সেদিন দুপুর বেলা সে একটু ঘুমোল। বাইরে বারান্দায় রোদের তাপ নিবারণ করবার জন্যে চিক ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আমি কাছে বসে ছিলাম। তার ঘুমের মধ্যে যে নিশ্বাস প্রশ্বাসটুকু চলত সে এত আস্তে যে মনে হ'ত এই বুঝি বন্ধ হয়ে গেল।

একটা মাছি উড়ে উড়ে ক্রমাগত তার মুখে চোখে বসছিল, আমি আঁচল দিয়ে সেটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম। বাড়ির পুরুষেরা জুতো খুলে পা টিপে টিপে এসে এক একবার দেখে যাচ্ছিলেন। বাইরে বাড়ির কোলাহল যথাসম্ভব সংযত রাখা হয়েছিল, তবু মাঝে মাঝে শুনতে পেলাম—বামনঠাকুর, খোকাবাবুকে আর একটু ঝোল দাও, কর্তার ভাত ফুটছে নাকি? ভাসুর তাদের শাসন করে গেলেন—আস্তে, আস্তে চেঁচিও না। বাইরে জীবনের স্রোত তেমনি চলছিল।

সেই দিনই বিকেলে তার মৃত্যু হ'ল। তাকে নিয়ে গেল রাঙা শাড়ি পরিয়ে, কপালে সিঁদুর দিয়ে। পিসিমা উঠানের উপর উপুড় হয়ে পড়ে চিৎকার ক'রে কাঁদতে লাগলেন। আমরা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার বৃথা চেষ্টা করলাম না। দুই হাতে কান বন্ধ ক'রে বসে ছিলাম। তবু শুনতে পেলাম

দূরে বহুদূরে হরিবোল হরিবোল। ঝি চাকরেরা বড়ো জায়ের তত্ত্বাবধানে গোবর জল ছিটিয়ে ঘর-বারান্দা ধুয়ে ধুয়ে বাড়ি থেকে মৃত্যুর অশুচি স্পর্শ দূর ক'রে দিচ্ছিল। সন্ধ্যা হয়ে এল। তার শূন্য ঘরের দরজা-জানালাগুলো খোলা পড়ে রইল। সে রাত্তিরটা আমার বেশ মনে আছে—ফুটফুটে জ্যোৎস্না, বসন্তের বাতাস মাঝে মাঝে উদ্‌বেলিত হয়ে উঠছিল। চৈত্র সংক্রান্তি তখন আসন্ন। বহুদূরে একটা ঢাক বাজছিল, বাগানের কোন্ গাছে একটা কুক পাখি ক্রমাগত ডাকছিল। শাশুড়ী বললেন—রামা, পাখিটাকে তাড়িয়ে দে ত। পিসিমার কান্নাও কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে এসেছিল। খোলা বারান্দায় ব'সে ব'সে হঠাৎ আমার স্বামীর জন্যে কি একটা আশঙ্কায় মনটা হু হু করে উঠল, চাকরকে ডেকে বললাম—একবার তাঁকে এখানে শুনে যেতে বলগে।

পরদিন সকাল থেকে মিত্তির-বাড়ির প্রকাণ্ড রথ আবার সেই বাঁধা রাস্তায় মন্থরগতিতে চলল। আবার সেই সকালে উঠে দুপুরের খাওয়ার আয়োজন—বিকেলে রাত্তিবের খাওয়াব ব্যবস্থা। .সই কারও জন্যে আতপ চাল, কারও জন্যে মোটা চাল। কেবল ভোগের দালানেব কঠিন ভিজে মেঝের উপর পড়ে পিসিমার চোখের জলের আর শেষ ছিল না। ক্ষেমীর কথা যে আর উঠত না, তা নয়—সবাই বলত—সিঁথির সিঁদুর নিয়ে গেল, এমন ভাগ্যি কি সকলেব হয়!

'সপ্তপর্ণ'

এ গ জা ম্প ল

বিজয়রত্ন মজুমদার

পৃথিবীতে যাহারা চক্ষু মেলিয়া দেখে ও কান পাতিয়া শোনে, তাহাদের কাছে অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব কিছু থাকিতে পারে না।

সরসী কলেজে আসিত। তাহার শাড়ীর নিত্য নূতন বর্ণ, নিতুই নব শব্দ; জুতার বৈচিত্র্য অনন্ত; যে সুগন্ধিটুকু সে ব্যবহার করিত, তাহাব গন্ধ চিরদিন অম্লান।

সহপাঠিনীদের সঙ্গে সরসীর ভাবও ছিল না, ভাবের অভাবও ছিল না; সহপাঠিদেব কাহাকেও যে উপেক্ষা করিত, তাও নয়, কাহারও সহিত আলাপও যে করিত, তাও নয়। শিক্ষকগণ আসিতেন, বক্তৃতা দিতেন, চলিয়া যাইতেন। সরসী বোধ হয় সব শুনিত, সব বুঝিত, কিন্তু কখনও কথা বলিত না, কোনো প্রশ্ন করিত না এবং কদাচিৎ প্রশ্নের উত্তর দিত। তবে সে যে ক্লাসে ঘুমাইত না, সেটা সবাই দেখিত।

কলেজের ষ্টীমার-পার্টির চাঁদার খাতায় সব শেষ ও সব চেয়ে মোটা অঙ্ক সহি করিত সরসী। কিন্তু যথাসময়ে জেটি পরিত্যাগ করিবার পূর্বে ষ্টীমার বংশীধ্বনি করিয়া গলা ধরাইয়া ফেলিল, সবাই আসিল, সরসী আসিল না। পর দিন, সহপাঠিনীরা সহপাঠিগণের প্ররোচনায় কৈফিয়ৎ চাহিলে, সরসী মৃদু হাসিল, কথা কহিয়া জবাব সে দেয় না।

শেক্সপীয়ার প্লে—ছাত্র-ছাত্রীরা অভিনয় করিবে, ইংরেজ শিক্ষক রিহার্সাল দিতেছেন, বিরাট সমারোহ, লাট ও লাটপত্নী উপস্থিত থাকিবেন, সাজসজ্জাব মহা আয়োজন চলিতেছে। চাঁদার খাতা সরসীর কাছে গেল, এবার যুবকগণই চাঁদা সাধিতে বাহির হইয়াছেন। সরসী সর্বপ্রথমেই সহি করিল এবং এমন একটা স্থুল অঙ্ক বসাইয়া দিল যে, যে লিখিল ও যে দেখিল, দুজনেই বুঝিল যে সে অঙ্কের কাছেও কেহ পৌঁছিবে না। ভাবে ও ভঙ্গিমায় অপার সন্তোষ প্রকাশ করিয়া মধুপের দল

গুঞ্জন করিল, আসতে হবে কিন্তু; ষ্টীমার পার্টির মতো ফাঁকি দিলে চলবে না।

সরসী বাক্যে নয়, শুদ্ধ মৃদু হাস্যে জবাব দিল। পুনরায় সনির্বন্ধ অনুরোধ, বলুন আসবেন?

হাসির যদি অর্থবোধ সম্ভব হয়, তাহা হইলে ইহারা নিশ্চিত বুঝিল, সরসী আসিবে।

অর্থ ভুল, কারণ সে আসিল না। ছাত্র এবং ছাত্রীমহলে তাহার না আসা লইয়া দীর্ঘ আলোচনা, বহু মন্তব্য, অনেক প্রিয় ও অপ্রিয় কথা হইল; এবং শেষে রেজোলিউসন হইল, কেহ তাহাকে কোনো প্রশ্ন করিবে না। সে যে আসে নাই, ইহারা যেন তাহা লক্ষ্যই করে নাই, এই ভাবটা ফুটাইতে হইবে।

বড়ো কঠিন। মেয়েরা যদিবা পারিল, ছেলেরা পারিল না। চিন্ময় অভিনয় রজনীতে সরসীর জন্য একখানি ও তাহার পাশে আর একখানি চেয়ার অতি কষ্টে রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিল; সরসী যে গন্ধ ব্যবহার করে, সেই গন্ধ দিয়া সে রুমাল, শার্ট, গেঞ্জি সিক্ত করিয়া আসিয়াছিল; হগ মার্কেটে অর্ডার দিয়া একটি বিশেষ রূপের ও আয়তনের বোকে তৈয়ার করাইয়া আনিয়াছিল, একখানি প্রোগ্রামে আতর মাখাইয়া রাখিয়াছিল। বেচারার অনেকগুলি টাকা এইসব কাজে কর্জ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে দুঃখ ছিল না; কিন্তু ব্যর্থতার দুঃখ অন্তরে অস্বীকার করা যায় না। পূর্ববর্ণিত রেজোলিউসন তাহার অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু পেন্সিল কাটিতে কাটিতে যে সময়ে সরসী ক্লাসের বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, পানের পিচ্ না ফেলিলে চলে না বলিয়া চিন্ময়ও সেই সময় বারান্দায় আসিয়া পড়িল।

উভয়ের মধ্যে ব্যবধান এক হাত, আস্তে কথা বলিলে শোনা যায়। চিন্ময় বলিল, কাল প্লেতে এলেন না যে!

পেন্‌সিলের শিষটা যাহাতে সূচের মতো হয়, আবার ভাঙিয়াও না যায়, সেই জন্য সরসীকে বিশেষ যত্ন লইতে হইতেছিল, কথা কহিবার অবকাশ ছিল না, মৃদু হাসিল।

—আমরা কিন্তু বড্ড ডিসাপয়েন্টেড্ হয়েছি।

অন্যের ডিসাপয়েন্টমেন্টে দুঃখ প্রকাশ করা নিয়ম, সরসী সকল নিয়মের বহির্ভূত, ঈষৎ হাস্য করিল।

ক্লাস হইতে অনেকেই বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল. চিন্ময় থামের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া ছিল, তাহাকে দেখা যায় না, কিন্তু সরসীর মুখের মৃদু হাসি দেখিয়া দর্শকগণ বুঝিয়া লইতেছিল যে, কেহ-না-কেহ সেখানে আছে এবং প্রশ্ন করিতেছে। সেই কেহ কে হইতে পারে ভাবিতে গিয়া অনেকেই শিক্ষকের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইল এবং লেকচার তাহাদের কানে শব্দহীন হইয়া পড়িল।

পেন্সিলের শিষ সরু হইল এবং ভাঙিল না, সরসী ক্লাসের মধ্যে স্বস্থানে আসিয়া বসিল। চিন্ময় রুমাল দিয় ঠোঁটের পানের দাগ উঠাইতে উঠাইতে ক্লাসে ঢুকিল। মেয়েরা নিজেদের মধ্যে চোখের ভাষায় বলিল, হ্যাংলা। ছেলেরা ভাবিল, ক্লাস কি আজ অফুরন্ত পরমায়ু লইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু পরমায়ু অফুরন্ত নয়। ঘন্টা পড়িয়া গেল। ছেলেরা মেয়েরা না দেখিতে পায় ও না বুঝিতে পারে, এমন ভাবে চিন্ময়কে ঘিরিয়া বসিল ও দাঁড়াইল। সমবেত প্রশ্ন, কেন আসেনি, কি বললে?

উত্তর, কথা বললে না, শুধু হাসলে। সেই পেটেন্ট হাসি।

অনেকক্ষণ পরে প্রশ্নকারীদের মনে হইল, চিন্ময় রেজোলিউশন-বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছে। তাহাকে ধমক দেওয়া হইল। ধমকে উগ্রতা ছিল না, তাই চিন্ময়ও উগ্র হইল না; নতুবা সে উগ্র হইত। সে অপমান সহিয়াছে, আঘাত সহিবার ক্ষমতা ছিল না।

ক্লাস বসিবার পূর্বে একটি তরুণী অভিমানভরে বলিয়া গেল, কথা রাখতে পারলেন না ত!

ক্লাস তখন ভাঙিয়া গেল, তখন সেই মেয়েটি আবার পাশ দিয়া যাইতে যাইতে বলিল, ঐ ক'রেই ত ওঁর দেমাক আপনারা বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

লজ্জাভ্রষ্ট মুখ তুলিবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিবার জন্য মুখ তুলিতে হইল এবং দেখা গেল

যে, সরসী ছাড়া সব ক'টি তরুণীই তাহার পানে গম্ভীর মুখভাব ও সুগম্ভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। জবাব দেওয়া হইল না।

প্রিন্সিপ্যালের বিদায়-সম্বর্ধনা। থার্ড ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহই বেশি। কার্যকরী সমিতি গঠনের পরই প্রস্তাব হইল, সরসীর নিকট হইতে চাঁদা লইয়া আত্মসম্মানের গণ্ডে পাদুকাঘাত করা হইবে না। পরের প্রস্তাবে, চিন্ময়কে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল।

খাতা সকলের কাছে গেল। সবসীর কাছে গেল না। সরসী দেখিল, বুঝিল এবং একটু হাসিল। এই হাসিটা অধরে ফুটিল না, ঠোঁটে ফুটিয়া ঠোঁটেই মিলাইল।

চিন্ময় অতিরিক্ত একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র লইয়া গোপনে সরসীর মোটর চালকের হাতে দিয়া আসিল।

বিদায় সম্বর্ধনা সভা বসিয়াছে, বক্তৃতার দামোদরবন্যা ছুটিয়াছে, প্রিন্সিপ্যাল মহোদয়ের প্রশংসাব কুতুবমিনার আকাশ স্পর্শ করিতেছে, একটি লোক রৌপ্য-আধারে সজ্জিত স্বর্ণাঙ্কিতকলেবব পুস্তকরাশি আনিয়া টেবিলের উপরে রাখিয়া দিল। আধারের গায়ে একটি টিকিট ঝুলির্তেছিল, হাজার দুগুণে দু'হাজার চোখের দৃষ্টি সেইদিকে ছুটিল। খুব ছোটো অক্ষবে ছোটো একটি নাম তাহাতে লেখা ছিল, সবসী দে, থার্ড ইয়ার ক্লাস, আর্টস।

বিশ্বাসঘাতক কোনো সময়েই বিশ্বাস রক্ষা করিতে পাবে না। চিন্ময় এক ফাঁকে সবসীকে বলিল, কত প্রেজেন্ট্ ই তো এসেছিল, আপনাব শেক্সপীযাব সেট্ সকলের উপবে গেছে।

যে হাসিতে শব্দ নাই, বোধ হয কোনো বিশেষ ভাবও প্রকাশ করে না এবং যাহাব অর্থ হয না, সেইরূপ একটুখানি হাসি সবসী হাসিল।

—নিজে এসে দিলে ডক্টর আলেকজাণ্ডার খুব খুশি হতেন কিন্তু।

আবার অর্থহীন সেই হাসি।

—আমি কিন্তু আশা কবেছিলুম—

—থ্যাঙ্ক ইউ ফর দি ইন্‌ভিটেশন।

পরীক্ষা হইয়া গেল। সরসী পাস করিল, ফোর্থ ইয়াবে উঠিল, কিন্তু কলেজে আসিল না। মেয়েরা বলাবলি করিল, এক-আধটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস কেহ বা চাপিয়াও ফেলিল, কেহ অন্তরে খুশি হইল, বুঝিল, সরসীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে বা বিবহ আশু হইয়াছে।

চিন্ময় চিন্তিত হইল; অন্য ছেলেরা চিন্তিত হইল না বটে, তবে গবেষণা কবিতে লাগিল।

চিন্ময় যত পান খাইত, তাহার অর্ধেক খাইত দোক্তা। কলেজের আফিস-ঘবে একজন কেরাণী খুব পান খাইতেন, হঠাৎ চিন্ময় তাঁহাকে মুঠা মুঠা পান উপহার দিতে লাগিল এবং অল্প দিনেই দোক্তাতেও পোক্ত করিয়া আনিল।

ইহার প্রয়োজন ছিল। সরসীর ঠিকানাটা কেহ জানিত না। সে কাহাকেও বলে নাই, প্রশ্ন করিয়াও নিরর্থক হাসি ছাড়া কোনো জবাব কেহ পায় নাই। তাহার মোটরগাড়িগুলির নম্বর দেখিয়া মোটর-ডাইরেক্টরী খুঁজিলে পাত্তা পাওয়া সম্ভব হইত বটে, কিন্তু কেন জানে নাই তা জানি না, তবে তরুণদেব মাথায় বুদ্ধিটা জাগে নাই।

চিন্ময় ঠিকানাটা পাইল। পাইল, কিন্তু কাহাকেও বলিল না।

গেটে দারোয়ান কহিল, দিদিবাবু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না। দারোয়ানগুলি বিশিষ্ট ভদ্রলোক, কথায় নড়চড় করিল না, এক দিনেও না, এক মাসেও না। মাসাধিককাল হাঁটাহাঁটি করিয়া চিন্ময় যাহা দেখিল, শুনিল এবং জানিল, তাহা এই ঃ—

এই বাড়িতে কর্তা বা গৃহিণী নাই, অর্থাৎ দিদিবাবুই সর্বেসর্বা। বাড়িটি সুপ্রকাণ্ড, আধুনিক কালের

রাজপ্রাসাদ বলা চলে। দিদিবাবুর বিবাহ হয় নাই, হইবেও না; কারণ তিনি বিবাহ করিবেন না। এই প্রাসাদাভ্যন্তরে কোনো পুরুষ মানুষের গতিবিধি নাই। বাড়ির মধ্যে চাকর-বাকর নাই, চাকরাণী ও বাকরাণী আছে এবং অনেকগুলিই আছে। তিনখানি—বড়ো, মাঝারি ও ছোটো—মোটরগাড়ি আছে।

এই রহস্যাচ্ছাদিত বাড়িটার রহস্যভেদে অসমর্থ হইয়া চিন্ময় আবার কলেজ ও পাঠ্যপুস্তকাদিতে মনোনিবেশ করিয়াছে। যেদিন কলেজ থাকে না ও পাঠ্যপুস্তকে অরুচি হয়, সেদিন এবং যে-রাত্রে ঘুম হয় না এবং গরম বোধ হয় সে-রাত্রে চিন্তা করে। সকালে উঠিয়া গরম গরম সিঙাড়া ও চা খায় এবং খবরের কাগজের ওয়ান্টেড্ পাঠ করে. কোন চাকরিটা তাহাকে দিলে যোগ্যতার সহিত করিতে পারে, তাহারও বিচার-বিতর্ক করে। একদিন ওয়ান্টেডের পার্শ্বে দেখিল, সরসী দে নাম্নী এক ভদ্রমহিলা একখানি মোটরলঞ্চ কিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্তারিত বিবরণ-সহ সাক্ষাৎ করিতে বলা হইয়াছে। ঠিকানা, সেই বটে।

চিন্ময় পাঠ্যপুস্তকগুলাকে ঠেলিয়া রাখিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দারোয়ান এবার ফটক পার হইতে দিল এবং একটি সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল।

একটু পরে সরসী ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল।

চিন্ময় চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে বসিতে বলিল। চিন্ময় বসিলে, বলিল, কই, কি পার্টিকিউলার্স এনেছেন দেখি?

চিন্ময় বলিল, কিসের পার্টিকিউলার্স?

—মোটর লঞ্চের।

—ওঃ সেটা আনা হয় নি।

—তবে?

—আপনাকে দেখতে এলুম। আপনি কলেজ ছেড়ে দিলেন?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—ভালো লাগল না।

—আমিও ছেড়ে দোব।

—কেন?

—ভালো লাগছে না। আপনার পাস্ট টেন্স. আর আমার প্রেজেন্ট পারফেক্ট। আসলে আমরা এক।

সরসী বসিতে উদ্যত হইয়াছিল, চেয়ার ঠেলিয়া দিল।

চিন্ময় বলিল, আমি বলছি কি, আমরা এক মত পোষণ করি।

সরসী প্রস্থানোদ্যত হইয়া, হাত তুলিয়া নমস্কার করিতে যাইতেছিল, চিন্ময় বলিল, কাল কি সব পার্টিকিউলারর্স নিয়ে আসব?

—থ্যাঙ্কস্, আনবেন। নমস্কার।—সরসী পর্দা ঠেলিয়া চলিয়া গেল।

সমস্ত দুপুর ঘুরিয়া মোটর-লঞ্চের সন্ধান ও বিস্তারিত বিবরণ লইয়া চিন্ময় বাসায় ফিরিল। বাসাটা মেসের, কেহ কৈফিয়ৎ চায় না। মাসিক খরচ বাকি না পড়িলে ও অসুখে শয্যাশ্রয় না করিলে কে কা'র খোঁজ করে?

অনেকগুলি মোটর-লঞ্চের অনেকগুলি ছবি, মূল্যের তালিকা, কলকব্জার বিবরণ, এক-কথায় যাহাকে ফুল পার্টিকিউলার্স বলে, তাহা লইয়া চিন্ময় সরসীর সম্মুখীন হইল।

কাগজপত্রগুলো দেখিয়া সরসী কহিল, আপনি বিজ্ঞাপনটা বুঝতে পারেন নি ব'লে মনে হচ্ছে।

—ইংরেজিতে লেখা বিজ্ঞাপন, বুঝতে পারব না এরকম মন হওয়াটা কি ঠিক?

—ইংরেজি ভুলেও যেতে পারেন ত!—সরসী মুখ নীচু করিয়া একটু হাসিল, বলিল, নতুন লঞ্চ ত আমি কিনতে চাই নি।

চিন্ময় হাসিয়া বলিল, ওঃ, এই কথা। সেটা আমার সংস্কার। মহিলারা, অন্ততঃ আমাদের দেশের মেয়েরা, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড জিনিস ব্যবহার করেন না এই হচ্ছে আমার সংস্কার।

—কেন, তা'তে দোষ কি? সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড কি ভালো জিনিস পাওয়া যায় না?

—হয়ত যায়, নয়ত যায় না; কিন্তু কথা তা নয়। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ডে তাঁদের অরুচি, এই আমি দেখে এসেছি। দোজবরে বর যতই ভালো হোক, মেয়েরা বিয়ে করতে চায় কি?

সরসী মুখটা ফিরাইয়া হাস্যগোপনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

চিন্ময় কহিল, আপনি রাজি থাকলে সেকেণ্ড, থার্ড, ফোর্থ, মেনি হ্যাণ্ড দেখাতে পারি।—সেও মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল।

সরসী অন্যমনস্কের মতো কাগজপত্রগুলা পুনরায় টানিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, কত দাম পড়বে বলছেন?

চিন্ময় অঙ্ক দেখাইয়া দিয়া বলিল, ঐ যে। আটাশ হাজার টাকা।

—বড্ড বেশি।

চিন্ময় বলিল, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড নিলে অনেক কমে হয় কিন্তু।

সরসী সে কথাটা যেন শুনে নাই, কহিল, নূতন অথচ কিছু সস্তা ক'রে দেয় না?

চিন্ময় ঢোঁক গিলিয়া কহিল, দেয়; কিন্তু গরিবের কমিশনটা মারা যায়। তা আপনি যদি বলেন—

—আমি এমন অন্যায়ই বা বলব কেন! আপনি এত কষ্ট করছেন—

—কষ্ট। কষ্টটা কি করলুম!

—এই আনাগোনা—

—সে ত দু-মাস ধরে করেছি, আপনার দারোয়ানদের জিজ্ঞেস করুন না।

—দু-মাস ধরে? মোটর-লঞ্চের বিজ্ঞাপন ত এই চার দিন হ'ল বেরিয়েছে।

—তা ঠিক।

—তবে? আপনি দু-মাস—

—সে আমার অন্য দরকার ছিল।

—কি দরকার?

—বলতেই হবে?

—না বলবেন কেন?

—না বলবার কোনো কারণ নেই। অভয় দিলেই বলতে পারি।

সরসী অভয়বাণী উচ্চারণ করিল না। তাহার নীরবতাকে অভয় মনে করিয়া চিন্ময় কহিল, হঠাৎ কলেজ ছেড়ে দিলেন। কলেজে যেতেন, আর কিছু না হোক, চোখের দেখাও ত দেখতে পেতুম—

সরসী বাধা দিয়া বলিল, তিন নম্বরের মডেলটা আমার পছন্দ। দামটা একটু বেশি বটে—

চিন্ময় কহিল, ঐ মডেলেরই সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড একখানি লঞ্চ আছে—

—তা বেশি হ'ক, আমি ঐটেই নোব।

—তা আমি জানি। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড আপনাদের জন্যে নয়। নেহাৎ যাদের জোটে না, এই যেমন, যারা মেয়ের বিয়ে দিতে পারে না, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বর তারাই খোঁজে।

—কবে ডেলিভারি পাওয়া যাবে?

—যবে চাইবেন।

—যত শীঘ্র হয়।

—বেশ, তাই হবে।

—আপনাদের লোক এসে ট্রায়াল দিয়ে যাবে ত?

—নইলে দাম দেবেন কেন?

—সই টই করতে হবে?

—করলে ভালো হয়।

দিন-আষ্টেক পরের কথা। চিন্ময় আসিয়া বসিয়া আছে। সরসীর দাসী খবর দিয়াছে, মেম-সাব স্নান করিতেছেন। সুতরাং অপেক্ষা করিতেই হইবে। ইত্যবসরে চা, চুরুট আসিয়াছে, চিন্ময় চা খাইয়া ফেলিয়া অন্য বস্তুটিব ঘন ঘন সদ্ব্যবহার করিতেছে।

গুড্ মর্ণিং, এই নিন্ চেক্।—সরসী চেক্ হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল।

চিন্ময় চেক্ লইতে ভুলিয়া গেল। স্নানের পর মেয়েদের বড়ো ভালো দেখায়—অবশ্য স্নানেব অঙ্গ হিসাবে স্নানের পরে যে মেয়েরা প্রসাধন করিতে জানে।

সরসী বলিল, আপনার কমিশন পেয়েছেন?

চিন্ময় কহিল, চেক জমা দিলে পাব।

—কত পাবেন?

—দশ পাবসেন্ট, তা শ-আড়াই টাকা হবে। বাবো পারসেন্টের চেষ্টা করব।

—মন্দ কি!

চিন্ময চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, মন্দ আবার! আপনি যদি মাঝে মাঝে এমনই সব জিনিস কেনেন, দরখাস্ত বগলে ক'রে আপিস আদালত চযে বেড়াতে হয না।

—আপনাব কাছে আর কিছু কিন্তে ইচ্ছে নেই।

—আমার অপরাধ?

—"কালবোশেখী" দেখেছেন?

—অনেক। ছেলেবলায় পাড়াগাঁযে থাকতাম, কালবোশেখী দেখি নি আবার!

—সে কালবোশেখী নয, ঐ নামের কাগজ!

—কাগজ! না, দেখি নি। নেটিভ্ কাগজ আমি পড়ি নে।

—যা-তা লিখেছে?

চিন্ময় চটিযা লাল হইয়া উঠিয়া বলিল, কি লিখেছে? আমি চুরি করেছি? দাম বেশি নিয়েছি? তা আব বলতে হয় না। মার্শাল কোম্পানী, ইউবোপীয়ান ফার্ম, তারা ছেঁচড়ামি করে না। দাঁড়ান-না আপনি, ঐ সব যদি লিখে থাকে, মার্শাল কোম্পানী কালই দশ লাখ টাকার ড্যামেজ চেয়ে হাইকোর্টে মামলা রুজু করবে, বাছাধনরা তখন মজা বুঝবেন। ভালোই হ'ল, আপনি বলেছেন, আমি যাবার সময় এ্যাস্প্ল্যানেডের মোড় থেকে একখানা, কি নামটা বললেন, কালবোশেখী না?—কালবোশেখী নিয়ে যাচ্ছি, আজই লায়ন সাহেবকে ট্র্যানস্লেট্ ক'রে দেব। কালই দেখবেন, কেস্ ফাইল হয়ে গেছে।—ইউরোপীয়ান ফার্ম, ওরা বাপকেও রেয়াদ করে না। অন্ততঃ খুব কম হ'লেও দশ লাখ।

—না, না, সে সব লেখেনি।

—তবে? তবে কি লিখতে পারে? খারাপ লঞ্চ, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ডকে নিউ ব'লে বেচা হয়েছে, সে ত একই কথা৷ সেম্ ড্যামেজ।

—না, না তাও নয়। তারা কোম্পানীর বিরুদ্ধে কিছু লেখেনি।

—আমার বিরুদ্ধে? কি লিখেছে শুনি? আমি জোচ্চুরি করছি। বেশি কমিশনের লোভে-

—তাও না।

—তবে?

—আপনাকে কাগজটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি পড়ে দেখুন। সরসী চলিয়া গেল, যাইবার সময় তাহার পাতলা ঠোঁটে হাল্কা একটু হাসি ঝিলিক মারিয়াছিল।

কাগজ আসিল. পড়া হইল, রাগে চিন্ময়ের মাথামুড় খুঁড়িতে ইচ্ছা হইল না বরং সে যেন লেখাটা উপভোগ করিল। অনেকবার খবর পাঠাইতে সরসী আসিলে, চিন্ময় বলিল, এই! আমি ভেবেছিলুম না-জানি কি গালাগাল মন্দ করলে।

—এ ত গালাগালেরও বেশি।

চিন্ময় অবাক হইয়া কহিল, গালাগালির বেশি! কি বলছেন আপনি।

—সে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে পারব না।

—তা সত্যি। আপনারই লজ্জা হচ্ছে।—বলিয়া চিন্ময লজ্জায় জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং সবিনয় নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

কয়েকদিন পরে মার্শাল কোম্পানীর এক চিঠি চিন্ময়ের কাছে গেল, তাহাতে লেখা, যে-মহিলাটি মোটর-লঞ্চ কিনিয়াছেন তিনি সেলিং এজেন্টকে ডাকিয়াছেন। কোম্পানী লিখিয়াছে—কোম্পানীব পণ্য বহুবিধ। আর কিছু অর্ডার আনিলে এজেন্টকে শতকরা কুড়ি পারসেন্ট কমিশন দিলেও কোম্পানীর আনন্দের সীমা থাকিবে না।

চিন্ময় গেল এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল, আমাকে সোজা চিঠি লিখলে আমি ধন্য হতুম।

—আপনার ঠিকানা কোথা পাব? আপনি ত ঠিকানা রেখে যান নি।

—সেটা আমার দোষ বটে। কিন্তু ঠিকানা দিই কোন্ সাহসে বলুন, আপনার দবোয়ানরা আমায বুঝিয়েছিল, পুরুষ মানুষের লেখা বইও আপনি বাড়িতে ঢুকতে দেন না।

—না, না, ওসব বাজে কথা।

—আর একখানা লঞ্চ কিনবেন? থার্ড হ্যাণ্ড, অর্থাৎ তেজবরে বটে কিন্তু ইন্ এক্সেলেন্ট্ কণ্ডিসান্।

—তার জন্যে ডাকি নি।

চিন্ময় দুঃখিত ভাবে বলিল, আমি ভাবলুম, গরিবের ভাগ্যে আবার কিছু কমিশন প্রাপ্তিযোগ আছে।

—কালবোশেখী বড়ো জ্বালাচ্ছে।

—আবার লিখেছে?

—হ্যাঁ।

—তাদের নামে কেস ক'রে দিন।

—করতে হলে আপনাকে করতে হয়।

—আমার গ্রাউণ্ড কি?

—সে আপনি জানেন।

—উহুঁ আমি ভেবে দেখেছি, আমার কোনো গ্রাউণ্ড নেই, কেননা যা লিখেছে, তা সত্যি হ'লে আমি বেঁচে যাই।

—তার মানে?

আপনার সঙ্গে আমার—আপনি আমাকে—যদি আপনি—ঠিক বলতে পাচ্ছিনে বটে, কিন্তু

আপনি বুঝতে পাচ্ছেন ত, আমি যা বলতে চাইছি।

—আমি বিয়ে করব না, তা জানেন?

—শুনিছি।

—কার কাছে?

—আপনার দরোয়ানদের কাছে।

—তাদেব সঙ্গে আপনার খুব ভাব বুঝি।।

—গরজে গয়লা চেলা বয়। আপনার দরোয়ান, তাই তারা আমার প্রিয়।

—দেখুন, আমি বিয়ে করব না, ঠিক।—আমাদের একটা কি দোষ ছিল, তাই আমি আর আমাব বাবা সমাজ-টমাজ ছেড়ে, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে বরাবর একলা থাকি। বাবা মারা গেলেন, তবুও একলা রইলুম এবং শেষ দিন পর্যন্ত তাই থাকব। বিয়ে আমি করব না। অধীনতা স্বীকার—

—ঠিক বলেছেন, বঙ্কিমবাবুব কবিতাতেও আছে—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়?

—ওটা বঙ্কিমবাবুর কবিতা নয়, হেমবাবুর কিংবা রঙ্গলালের। ঠিক মনে নেই।

—ও একই কথা, কবিতা কবিতা, বঙ্কিমবাবুরও যা রবিবাবুরও তাই, হেমবাবুরও তাই, রঙ্গলালেরও তাই। হ্যাঁ যা বলছিলুম, আজকাল মেয়েরাও চান্ না স্বামীর অধীন হ'তে, পুরুষরাও চায না, হেন্‌পেক্‌ড্ হতে। পুরুষবা ঐ কথাটাকে ডিক্সনাবি থেকে তুলে দেবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে, তা বোধ হয় জানেন। এখন ইকোয়াল ষ্ট্যাটাস্। বিয়ে হ'লেও উভয় পক্ষ থেকে সেটা মেনটেন্ করা যায়।

—কি ক'রে?

—বলছি। আপনার দাসীকে একটু চা দিতে বলবেন? থ্যাঙ্কস্। ধরুন, সমাজ বলছে বিয়ে কর—বেশ করলুম। কাল বলছে, কেউ কারও বশ্যতা স্বীকার ক'রো না। বেশ, আলাদা থাকলুম। তবে যদি বলেন, বিয়ে করা তা হ'লে কেন? তার উত্তরে আমি বলব, সংস্কার একটা চলে আসছে, মাত্র সেইটেব প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ।

—সংস্কার ত অন্য অনেক কথাও বলে।

—কি? ঘর-সংসার করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। বলুক, সব মানা যায় না। যেমন দেখুন, আপনাদের শাস্তর বলে আট-ন-বছরে মেয়েদের গৌরীদান কর। কে তা মানে বলুন? নীতিকথায় আছে, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ। পরের জিনিস ঢিল পাটকেল মনে ক'রে ফেলে দিন বা পকেটে পুরে ফেলুন দেখি, তখনই হাতে হাতকড়ি।

—আপনি ওরকম বিয়ে করতে পারেন?

—বাই জোভ্। ওরকম পাইনি বলেই এতদিন করি নি। যেদিন পাব, সেইদিনই মালা-বদল।

—তারপর?

—তারপর আমি কলেজ যাব—না, কলেজ আর যাব না, এজেন্সি করব, আর তিনি তাঁর যা ইচ্ছে, করুন, আই কেয়ার এ ফিগ্। আসল কথা কি জানেন? আমি যদি বেবাক্ বিয়ে না করি, লোকের কাছে গুণে, হাজার লক্ষ কোটি কৈফিয়ৎ দিতে হবে, আর হাজার জন হাজার রকম ভাববে, বলবে, চাই কি কাগজেও লিখবে। আর, বিয়ে ক'রে যদি বাস না করি, লক্ষ কোটি লোকেরও লক্ষ কোটি রকম ভাববার উপায় নেই। পরের জন্য মাথা না ঘামিয়ে যারা কিছুতেই থাকতে পারে না, তা'দেরও ভাবতে হ'লে একটি কথাই ভাবতে হ'বে যে, এদের বনিবনাও হয় না, তাই আলাদা থাকে। তা ছাড়া ভাববার আর কিছুই কেউ পাবে না। ওঃ, বড্ড চিনি দিয়ে ফেলেছে চা'টায়। আপনি

বুঝি একটু বেশি চিনি খান্। না, না, বদলাতে হবে না। কি আর হয়েছে এতে. আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। কখনো কখনো চা'য়ে আমি বেশি চিনি খেয়ে থাকি।

—যাক্, দেখা গেল যে বাংলা দেশে এমন একজন লোক অন্ততঃ আছেন, যিনি ট্র্যাডিসান ভাঙ্গবার জন্যে প্রস্তুত।

—হ্যাঁ, আমি সেই কালাপাহাড়ই বটে।

সরসী হঠাৎ বাহিরে রৌদ্রালোকিত বাগানের পানে চাহিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, ওঃ অনেক বেলা হয়ে গেল দেখছি।

—হাঁ। আচ্ছা, নমস্কার। যদি কিছু দরকার হয় খবর দেবেন, এই আমার ঠিকানা। নমস্কার।

কালবোশেখীর ঝড় বড়ো ভয় দেখায়।

পরের সপ্তাহে চিন্ময় চিঠি পাইল, একবার আসিবেন।

আসিল।

সরসী বলিল, আপনার জন্যে একটি কনে ঠিক করেছি। কণ্ডিসনাল ম্যারেজ। আপনার মত বদলায়নি ত?

—না। আমার গায়ের রং আর মত, দুইই অপরিবর্তনীয়।

—বিয়ের পরেই আপনি কনেকে ছেড়ে চ'লে যাবেন ত?

—পরদিন কালরাত্রি, সে দিনটা যাব না, ফুলশয্যার পরদিন যাব, আর আসব না।

—তা হ'লেই হবে।

—ক'নে কোথায়?

—আছে, তার জন্যে ব্যস্ত কেন? কত টাকা চাই বলুন দেখি?

—শ খানেক হলেই হ'বে। একটা সিল্কের কাপড়, সিল্কের জামা ও চাদর আর দু-চার ছড়া মালা বা গোড়ে।

—অত কমে রাজি হবেন না। আমি বলছি মেয়েটির কিছু টাকাকড়ি আছে।

—আমার সেটার অভাব। কিন্তু টাকার জন্যে বিয়ে করা আমি কাপুরুষের কাজ ব'লে মনে করি।

—ডাওরী—

—আমি ষ্টুডেন্টস্ এ্যান্টি-ডাওরী লীগের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট।

—তবেই ত মুশকিলে ফেললেন।

—ঠিক মুশ্‌কিল।

—মেয়ের মত হচ্ছে, কিছু টাকাকড়ি না দিলে তার এক রাতের স্বামীর ওপর সুবিচার করা হবে না।

—ঐ ত নিচ্ছি এক-শ টাকা।

—বড্ড কম।

—আচ্ছা পাঁচ-শ। রাজি?

—আচ্ছা, তা এক রকম হ'তে পারে। মেয়েটির সম্বন্ধে কিছু জানতে চান? তাকে দেখতে চান?

—তাড়াতাড়ি কি! চারি চক্ষুর মিলন ত হবেই। আর জানবার বাকিই বা কি রইল?

—কি জানলেন? কিছুই ত বলিনি।

—যা বলেছেন তাই যথেষ্ট। মেয়েটি বিয়ে করতে রাজি, ঘর করতে অরাজি; আমিও বিয়ে করব, ঘর করব না, বেশ মিলেছে।

—মেয়ে এস্‌টাব্‌লিশ করতে চায় যে, স্ত্রীলোক হ'লেই যে জীবন-যাত্রায় পুরুষের গললগ্ন হ'তে হবে তার কোনো মানে নেই।*

—একজ্যাক্টলি। পুরুষও দেখাতে চায় যে স্ত্রীলোক ছাড়াও জীবন যাপন করা যায়।

সরসী বলিল, শুনুন তা হ'লে সত্যি কথাটা বলি আপনাকে। পুরুষ জাতটার বড়ো দম্ভ, তাদের বাদ দিয়ে নারীর জীবনযাত্রা নাকি অচল। এ পর্যন্ত, দেখাও তাই গেছে বটে। আমি নতুন একটা এগ্‌জাম্পল সেট্ করতে চাই যে—না, তা নয়। ভগবান স্ত্রী ও পুরুষকে যেমন আলাদা ক'রে সৃষ্টি করেছেন, তারা আলাদা থাকতেও পাবে। আমার কেউ নেই, আমি একা, কাজেই সমাজের ভয় দেখাবার বা জাতে ঠেলবার লোকও নেই। বাবার রেখে যাওয়া কিঞ্চিৎ আছে, তাই নেড়েচেড়ে বেশ থাকব। সেই জন্যেই কিছুদিন কলেজে পড়েছিলুম, ইংরেজি নভেল-টভেলগুলো বুঝতে পারি, ব্যাঙ্কের হিসাব কষতে পারি, সেইটুকুই আমাব যথেষ্ট। কলেজে কারও সঙ্গে কথা কয়েছি কোনোদিন?

চিন্ময় বলিল, সেই ত করেছিলেন মুশ্‌কিল! কথা কইতেন না বলেই ত কথা কইবার জন্যে সবাই ছট্‌ফট্ কবত। দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের দিকেই লোক বেশি আকৃষ্ট হয়, তা জানেন ত! সে কথা যাক! আপনি যেমন আপনার কথা বললেন, আমিও তেমনি আমাব কথাটা বলি। বিয়ে করবার ইচ্ছে আমারও নেই। দশ-পনের বছর আগে বিয়ে কবাব দবকার লোকেব হ'ত; এখন সে দরকারই কমে গেছে। যে রকম স্ত্রী-স্বাধীনতার হাওয়া বইছে—

সরসী ছি ছি কবিয়া উঠিল।

চিন্ময় বলিল, আমাব কথাটা আগে শেষ কবি, তাবপর ছি ছি করবেন, যা খুশি করবেন। আমি বলছি, আগেকার কালে মেয়েবা ছিলেন পুরুষদেব কাছে রূপকথার রাজকন্যেব মতো। তাঁদের মেঘবরণ চুল, আর কুঁচবরণ রঙের কথাই শোনা যেত, চোখে দেখা যেত না। তাই তাঁদেব একটিকে পাবার জন্যে লোকের আগ্রহের সীমা থাকত না। এখন পথে ঘাটে ট্রামে বাসে দেখে দেখে অভিনবত্ব আব কিছু নেই। তাই আকর্ষণও কমে গিয়েছে। আপনি আমার কথাগুলো বুঝতে পারছেন না না? আর একটু খুলে বলি, তা হ'লে?

বলিয়া সে একটি সিগারেট ধরাইল; ধবাইয়া গোটা কতক টান্ মারিয়া ধোয়া ছাড়িয়া বলিতে আবম্ভ কবিল, একটা দৃষ্টান্ত দিই, শুনুন। সেকালে নিয়ম ছিল, স্বামী-স্ত্রীতে দিনেব বেলা দেখাই হ'ত না। গভীর রাত্রে দেখাশুনো হ'ত। সমস্ত দিন পবস্পরের মন পবস্পরেব দিকে টানত, অহরহ দেখা না-হওয়ায় টানটা গভীর এবং আন্তরিক থাকত। রাত্রের মিলনটা সুখের হ'ত। এখন দিনে রাতে উঠ্‌তে বসতে খেতে শুতে এ ওব সঙ্গে লেপ্‌টে থাকেন, ফলে স্ত্রীর মধ্যে যে আকর্ষণের বস্তু, তা ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এরই ফলে পুরুষরা নারীর অভিনবত্ব ভুলে যাচ্ছে, তার খোঁজই পাচ্ছে না। তাই মেয়েরা হয়ে পড়েছে খেলার বস্তু, আর পুরুষরাও মেয়েদেব কাছে সাধারণ ঘর-কবণার জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইটেই আমার ভালো লাগে না। আব সেই জন্যেই আমি বিয়ে করব না ঠিক কবেছি। কোনো কমনপ্লেস্ কাজ—যা সবাই করে, তা করতে আমার ভালো লাগে না। সে ত আপনি কলেজেও দেখেছেন, কোনো ছেলেই সাহস ক'রে আপনার সঙ্গে কথা কইতে আসতো না, আর আমি—

সরসী বলিল, অনেক বেলা হয় গেল। এক কাজ করুন, আপনি আমার এখানেই দুটি—

চিন্ময় ব্যস্ত হইয়া কহিল, না, না। সেটা বড্ড কমনপ্লেস্ কাজ। আমার ভালো লাগে না।

ফুলশয্যার রাত্রি। বড় ও ক'নে 'পেসেন্স' খেলিয়া কাটাইয়া দিল। দু-একবার 'ডামি' রাখিয়া ব্রীজ খেলাও হইয়াছিল, রাত্রি প্রভাত হইল বলিয়া এ-খেলাটা জমিল না। চা আসিল ও খাওয়া হইয়া

গেল।

চিন্ময় বলিল, তুমি আমার জীবনের আদর্শটাকে রূপ দিয়েছ, তোমায় কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব।

সরসী কহিল, কিছু না বল্‌লেই আমি ভালো বুঝতে পারব। আপনাকে না পেলে আমিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হতুম।

দু-জনে একমত হইয়া বলিল, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা বুঝিবে যে জগতে স্ত্রী পুরুষের এবং পুরুষ স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল না হইলেও জগৎ অচল হয় না।

—আপনি এখন কোথায় যাবেন?

—মেসে।

—কি করবেন?

—স্নান করব, খাব, তার পর এপ্লিকেশন লিখে আপিসে আপিসে ঘুরব।

—শেষেরটা না করলে হয় না?

—দিনকতক নিশ্চয়ই হতে পারে, পাঁচশ টাকার ব্যালেন্স কিছু আছে।

—মাঝে মাঝে আসবেন?

—তা—

—সকালের দিকে আসবেন।

—না-হয় দুপুরের দিকে।

—সকালটাই ভালো।

—বেশ।

আট দিন পরে। বেলা সাতটা। সরসী বিছানায় আড়মোড়া ভাঙিতেছিল। দাসী চিন্ময়ের আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিল। সেইখানেই ডাক পড়িল।

—খবর ভালো?

—হ্যাঁ, কাল রাত্রে ঘুম হয় নি। আজ সেই জন্য এখনও বিছানায় পড়ে আছি।

—ঘুমের অত্যন্ত অন্যায় না হওয়া। তা হ'ল না কেন?

—কে জানে। রাজ্যের স্বপ্ন সারারাত জ্বালাতন করেছে। চা খাবেন?

হাতঘড়িটা দেখিয়া চিন্ময় বলিল, হুকুম কর, চোঁ ক'রে এক চুমুকে টেনে নিই। আটটায় স্নান করি, সাড়ে আটটায় নাকে মুখে গুঁজে ছুটতে হয়।

—কোথায়?

—আপিসে।

—চাকরি হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—কত টাকা মাইনে?

—ত্রিশ।

কথা বহুক্ষণ নিস্তব্ধ।

—কি করতে হয়?

—রেকর্ড-কীপার। বাংলা বা ফার্সী ভাষায় দফ্‌তরী।

ঘরে সূচিপতনের শব্দও শুনা যায়।

—ঐ যা, আটটা বেজে গেল, উঠলুম।

—একটু বসুন।

—সাহেবটা বড়ো পাজি, ট্যাঁস কি না।

—চাকরি ছেড়ে দিন।

—হাতের লক্ষ্মী।

—আমি দু-শ টাকা করে দোব।

—স্ত্রীদত্ত অর্থ নোব না, প্রতিজ্ঞা। চল্‌লুম। সরসী একটু বিমর্ষ।

—আবার কবে আসবেন?

—দেখি। তুমি আর খানিক ঘুমাবে বোধ হয়।

—না উঠি। শীঘ্র একদিন আসবেন।

—আচ্ছা।

—আজ ত রবিবার। আজ এত ওঠবার তাড়া কেন?

—আমার আবার রবিবার। পেয়াদার যেমন শ্বশুরবাড়ি। গেরণের দিন, মেসে হাঁড়ি ফেলছিল, রান্না হয় নি ব'লে একটু দেরিতে গেছলুম, টেঁসু সাহেবটা দু-দিনের মাইনে ফাইন করলে। আবার গাল দিতে এসেছিল, আমি বললাম, মাইনে যত খুশি কাটো, নো গালাগাল। বেটা চটে আছে, কোন্ দিন হয় তা বলে বসবে, ইওর সার্ভিস নো লংগার রিকোয়ার্ড।

—ও চাকরি ছেড়ে দিলেই ত হয়।

—আর একটা না পেলে—

—বিদেশে, জমিদারী এস্টেটে কাজ করবেন?

—কি কাজ?

—ম্যানেজারী। রুক্মিণীর কাছে আমার একটি জমিদারী আছে, ম্যানেজার মারা গেছে, লোক নিতে হ'বে।

—কত মাইনে?

সরসী হাসিল। বলিল, কত হ'লে আপনার চলে? দু-শ টাকা।

চিন্ময় গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিল, আগের ম্যানেজার কত পেত?

—তিন-শ। গ্রেড্ হচ্ছে দু-শ থেকে তিন—শ। ভয় নেই, আপনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কিছু করছি নে।

—তা না করলেই আমি খুশি হব। কবে যেতে হবে?

—কালই যেতে পারেন। আমি নায়েবকে চিঠি পাঠিয়ে দিই। আপনাকে লেটার অফ্ এ্যাপয়েন্ট্‌মেন্ট্ দিতে হবে কি?

—হ্যাঁ, তা দিতে হবে বই কি।

—বেশ; কাল সকালেই—আচ্ছা, আমি আপনার মেসে যেতে পারি?

—পার; কিন্তু কেন?

—চিঠিটা দিয়ে আসব। আপত্তি নেই ত?

—না।

—এই ঘরে মানুষ থাকে?

—একুশ টাকা আট আনা মাইনে যে পায়, সে থাকতে পারে।

—কিন্তু আমার ত একটা—

চিন্ময় হাসিয়া বলিল, এর ভেতর তুমি কে?

সরসী সে কথার উত্তর না দিয়া, হাত ব্যাগ হইতে লেটার অফ্ এ্যাপয়েন্ট্মেন্ট্ বাহির করিয়া চিন্ময়ের হাতে দিল।

—থ্যাঙ্কস্।

—পৌঁছে চিঠি দেবেন ত?

—ম্যানেজার দেবে, না-হয় নায়েব ত দেবেই।

সরসী একটুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহির হইয়া গিয়া মোটরে উঠিল।

মেসের অনেকে জিজ্ঞাসা করিল, কে গো?

চিন্ময় দুর্ভেদ্য রহস্যাচ্ছন্ন হাসি হাসিয়া, যে যাহা ভাবিতে চায়, তাহারই সুযোগ দিয়া দিল।

নায়েবের চিঠিখানি দবকারী ও পড়িবার মতো। সবটায় আমাদেব দবকাব নাই; কতকটা এই ঃ—

পৌষ কিস্তিতে আমাদের আদায় হয় চার হাজাব টাকার উপর। নতুন ম্যানেজাবের দয়া দাক্ষিণ্যের চোটে এ-বছর চার-শত টাকাও আদায় হয় নাই। যে কাঁদুনি গায়, সেই রেহাই পায়। এমন করিলে জমিদারী রাখা যায় না। নতুন ম্যানেজারকে কর্মচ্যুত করিয়া মহালশাসনেব ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না, বিষয়-আসয় নিলামে চড়িবে।

নায়েব যে জবাব পাইল, তাহা এই ঃ—

আমি শীঘ্রই মহাল পরিদর্শন কবিতে যাইতেছি।

নায়েবের বড়ো আনন্দ। অনেক দিন, প্রায় ছয মাস নিরানন্দের পর আনন্দেব সূচনা। ভবা শ্রাবণের শেষাশেষি কড়া রৌদ্র।

ম্যানেজার গেল না, নায়েব প্রভুকে ষ্টেশনে রিসিভ্ কবিতে গিযা ম্যানেজারেব বিরুদ্ধে দশখান করিয়া লাগাইল। প্রজারা কুক্কুরজাতীয় জীব, আস্কারা পাইলে মাথায় উঠিতে অভ্যস্ত। ম্যানেজাব মহালের সর্বনাশ করিয়াছে। পৌষ কিস্তির এখনও আট দিন সময় আছে—উহাকে আজই ডিস্‌মিস্ করিলে, নাযেব কিস্তির পুরা টাকা আদায় করিয়া দিবার ভরসা দিল। ডিস্‌মিস্ করিতে বিলম্ব করিলে আদায়ের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইবে।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর ম্যানেজারের তলব পড়িল। নায়েব পায়ে রবারসোল জুতা পবিযা ডিঙি মারিতে মারিতে পাশের ঘরের আলমারির পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

'জমিদার' বলিল, আপনি আমাব জমিদাবীর সর্বনাশ করেছেন। চার-শ টাকা আদায় হয়নি, চার হাজার টাকা রেভেনিউ।

—তিন বৎসর অজন্মা, প্রজারা খেতেই পাচ্ছে না, তা টাকা দেবে কোথা থেকে?

—জমিদারের খাজনা চলে কি ক'রে?

—জমিদারের রিজার্ভ ফণ্ড থাকা উচিত। যারা রিজার্ভ রাখে না, সব নিজেদের বিলাসে খরচ করে, তাদের জমিদারী না থাকাই সঙ্গত। প্রজার রক্ত শোষণ করবার জন্যে রাজা নয়, প্রজানুরঞ্জনের জন্য রাজা। তোমার খাজনা আদায় হয়নি বটে, কিন্তু তোমার প্রজারা তোমাকে দয়াময়ী রাণী বলে আশীর্বাদ করছে।

'তোমার' শব্দটা আলমারির পার্শ্বে লুক্কায়িত নায়েবের গায়ে জ্বালা ধরাইয়া দিল। সে জমিদার হইলে এই স্পর্ধার উচিত সাজা দিত।

—আপনার দ্বারা জমিদারী শাসন চলবে না।

—প্রজাদের মারতে হ'বে?

—আমাব নায়েব টাকা আদায় ক'রে দেবে।

—প্রজাবিদ্রোহ হবে। খেতে না পেয়ে তারা শুকনো খড় হয়ে আছ; অত্যাচারের স্ফুলিঙ্গ পড়লেই জ্বলে উঠবে।

—আমার কলিয়াবীব ম্যানেজাবীর পোষ্ট খালি হয়েছে, আপনাকে সেখানে যেতে হবে।

পাশেব ঘরে নাযেব নৃত্য কবিল। জুতাব ছিল রবারের, তাই নিঃশব্দ।

বাহিরে অনেক লোক জমায়েত হইয়া বড়ো গণ্ডগোল করিতেছিল। ম্যানেজার মুখ বাড়াইয়া জনতা দেখিযা লইয়া বলিল, তোমাব হাজাব হাজাব প্রজা তোমাকে দেখতে আর প্রাণ খুলে আশীর্বাদ কবতে এসেছে।

সবসী দৃশ্যটা দেখিযা আসিল। বসিযা বলিল, কিন্তু আপনাব এখানে থাকা হবে না।

—আমাব অপবাধ? তুমি ওদেব দেখ, ওদেব চেহারা, কাপড়-চোপড় দেখ, ওদের কথা শোন। তার পব—

দেখি বলিযা সরসী বারান্দায বাহির হইল। সেখানে যে কোলাহল উত্থিত হইল, তাহা প্রচণ্ড ও ভীষণ, কিন্তু তাহার ভিতবে অসীম মাধুর্য ছিল। প্রজাদের মোদ্দা কথা এই যে, বাণীমার দয়ায় তাহাবা বাঁচিযা আছে; নতুবা তাহাবা বাচ্চা-কাচ্চা লইয়া প্রাণে মাবা পড়িত। দলেব মধ্যে যাহারা বর্যীযান্ তাহাদেব আশীর্বাদ শুনিতে শুনিতে সবসীব চক্ষু জলে ভবিযা আসিল।

ঘবে আসিযা বসিতে ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিল, কি গো! আমি অন্যায কবেছি ব'লে মনে হচ্ছে আর? আমায ট্রান্সফাব কববে?

সবসী হাসিযা বলিল, সে কথা পবে হবে। এসে পর্যন্ত একখানা চিঠিও ত লেখ নি।

—কেন, বিপোর্ট সব পাঠিযেছি ত।

—বিপোর্ট আব চিঠি কি এক?

প্রজাবা বাণীমাব জযধ্বনিতে আকাশ, বাতাস, প্রান্তব মুখবিত করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে। অল্পবযসের নাবীর কর্ণে তাহা মধুবর্ষণ কবিতে লাগিল।

সবসী বলিল, অন্য সময় কথা হবে।

—বেশ; কখন আসব? কাল সকালে?

—কেন? আজ বাত্রে?

চিন্ময বলিল, রাত্রে! উঁহু! সকালেই ভালো।

সবসী অভিমানভরে কহিল, কিসের ভালো! রাত্রে এস।

—বাত্রে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাত্রে! কতবার বলব আর?

—কিন্তু কন্‌ট্রাক্ট্ ছিল কি?

—আমি কন্‌ট্রাক্টার নই, অত খবর জানি নে।

—আমি জানিয়ে দিচ্ছি। কন্‌ট্রাক্ট ছিল যে, তুমি এবং আমি চিরদিন পৃথক এবং একা একা থাকব।

—সে কন্‌ট্রাক্ট কে ভাঙ্‌ছে?

—আর কন্‌ট্রাক্ট ছিল আমরা সকাল ছাড়া অন্য সময়ে মিট্ করব না।

—কিন্তু তখন চাকরি করতে না। এখন যখন আমার এষ্টেটে চাকরি করা হচ্ছে, যখন আসতে বলব, তখন আসতে হবে। যা করতে বলব—

—তা তা আমি করি নে দেখেছ। তুমি প্রজা ঠেঙাতে বলেছ, আমি তাদের মাফ্ করেছি।

—খুব করেছ, আমার ব্যাঙ্কের টাকা ভেঙে রেভেনিউ দিতে হবে। সে যাক্, রাত্রে আসছ ত?

—হুকুম লঙ্ঘন করব কেমন করে, যতক্ষণ চাকরি আছে।

—এইখানে খাবে।

—এও কি চাকরির অঙ্গ?

—হ্যাঁ।

—তার পর?

—সরসী উঠিয়া আসিয়া চিন্ময়ের কাঁধের উপর একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, দেখ যে এগ্‌জাম্পল সেট্ করব ভেবেছিলুম, তা করা বড়ো শক্ত। তুমি কি বলো?

—আমারও ঐ মত। এগ্‌জাম্পল ভালো, তবে সেট্ করা শক্ত। লাফিয়ে সাগর লঙ্ঘন করা বীরত্বের কাজ, সেকালে হয়ত সম্ভব ছিল, কিন্তু একালে কেউ পারে না।

প্রবাসী ঃ চৈত্র, ১৩৪২

প থ বা সি নী

শান্তা দেবী

বর্ষার দিনে হঠাৎ জ্বরে পড়িলাম। সারাদিন বিছানায় একটানা শুইয়া থাকিতে হয়। দক্ষিণ দিকের জানালাটা দিয়া বাহিরের পৃথিবীর হরিৎরূপ অনেকখানি চোখে পড়ে তাই রক্ষা, না হইলে সারাদিন কড়িকাঠ গোনা ছাড়া উপায় ছিল না।

বালিশে মাথা দিয়াই দেখিতে পাই ঘনমেঘভারানত আকাশের নিচে বর্ষাস্নাত তাল ও নারিকেল গাছের কণ্টকিত মাথাগুলি হাওয়ায় কেবলই দুলিতেছে। পথের ধারের সারি সারি কৃষ্ণচূড়ায় বসন্তে যে অগ্নিবরণ আবীর ছড়াইয়াছিল আজ তাহা বর্ষার স্নানে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে, গাছগুলির পত্রবহুল শ্যামশ্রীর স্নিগ্ধতা চোখ জুড়াইয়া দিতেছে। পাড়াটা নূতন, কাজেই জনাকীর্ণ ঘরবাড়ির চেয়ে পোড়ো জমিই এখানে বেশি। মাথাটা তুলিয়া মাঝে মাঝে দেখিতাম, পোড়ো জমির চুণ সুরকী, আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা সবই নব তৃণদলের স্বর্ণাভ সবুজ আস্তরণে ঢাকা পড়িয়া যেন কয়দিনে হঠাৎ নন্দনকানন হইয়া উঠিয়াছে। এখানে-ওখানে ঘন কচুবন, মসৃণ কচুপাতার উপর বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা নিটোল মুক্তার মতো টল্‌টল করে। একটু হাওয়ার দোলায় ভাঙিয়া বীজ মুক্তার মতো গড়াইয়া পড়িয়া যায় দেখিয়া মনে হইত কবিরা পদ্মপত্রের জল দেখিয়া এত কবিতা লিখিলেন, কিন্তু ঘরের পাশে ছাই গাদার উপর কচুর পাতায় পাতায় এমন শত শত মুক্তারত্ন কাহারও চোখে পড়িল না কেন?

ঘরে একলা শুইয়া শুইয়া পথের ধারের মানুষগুলার সঙ্গেও পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। সকাল হইলেই টাকপড়া বুড়ো রহমান তার নাতিটিকে কোলে করিয়া ফুটপাথে টাটকা মাছের খোঁজ করিতে আসে। তখন ভালো মাছের ঝাঁকাটা দেখিয়া পড়শীরা সব কিনিয়া লইবে এই ভয়। যতই কেন-না সে পুরনো খরিদ্দার হউক মেছুনিরা তাহার জন্য এক পো'য়া ভালো মাছ কখনই আলাদা করিয়া সরাইয়া রাখিবে না।

দুপুরে গাছতলায় সেই আমাদের সুকৃষ্ণবরণা ভীমকায়া ফেরিওয়ালী রক্তবস্ত্র পরিয়া আমের ঝোড়া লইয়া বিশ্রাম করিতে বসিত। সকালে যা বিক্রি হইয়াছে তাহার পর আর খুব বিক্রির আশা

নাই ; এদিকে পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলিয়াছে। কাজেই ঝুড়ির যতগুলা সম্ভব আম সে একলাই খাইয়া শেষ করিত। পাড়ার ছেলেমেয়েদের দেখিলে দুই-একটা দিতে তাহার কখনও ভুল হইত না। বিশেষ ওই যে ছেলেটা চৌখুপি লুঙ্গি পরিয়া ডোবা হইতে হাঁসের পাল তাড়াইয়া রোজ এই পথে বাড়ি ফিরিত, উহার ভাগ্যে রোজ দুটা আম লেখাই ছিল।

বিকালে বুড়া স্কট সাহেব তাহার লম্বা গলার ডগায় বসানো দুর্বল মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে ছোটো চামড়ার ব্যাগ হাতে ঠিক চারটায় আপিস হইতে বাড়ি ফিরিত। একটু পরেই ছোকরা হড্‌সন সাহেব তাহার চারিটা অতিকায় গ্রে-হাউণ্ড কুকুর লইয়া হাত-কাটা সাদা কুর্তা পরিয়া বাহির হইত হাওয়া খাইতে। সন্ধ্যায় দেখিতাম তরুণী এমির সহিত পালা করিয়া তাহার দুই যুবকবন্ধুর প্রেমলীলা।

সেদিন সকালে দেখিলাম আমাদের আমওয়ালীব বিশ্রামকুঞ্জে ভোর হইতেই নূতন কে আস্তানা গাড়িয়াছে। ওই কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় মাঝে মাঝে ফুলুরিওয়ালারা লোহার উনান কড়া খুন্তি লইয়া দোকান খুলিয়া বসে বটে। তাই হযত হইবে। বিছানা হইতে মাথাটা তুলিয়া দেখিলাম পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক। তিনখানা ইট পাতিয়া মাটির হাঁড়িতে ভাত চড়াইয়াছে। কাগজ খড় শুক্‌না পাতা এইসব তাহার উনানের ইন্ধন। ফুটপাথের কলে গোটা দুই এনামেলের থালা, একটা কাচের গেলাস, একটা এল্‌মিনিয়মের বাটি, একটা ছোটো গামলা মাজিয়া ধুইয়া জল ভরিযা সে উনানের পাশে আনিয়া রাখিল। ভাত নামিল, তারপর ডাল চড়িল। বিস্কুটের টিনেব ভিতব হইতে মাল-মশলা বাহির করিয়া পানও সাজিল। সঙ্গে একটা গামছা-বাঁধা পুটুলীতে খান-চাবেক কাপড়, দু'খানা কাঁথা—খুলিয়া মাঠের উপরেই রৌদ্রে শুকাইতে দিল। এ যে রীতিমতো সংসাব! কিন্তু মানুষটা একেবারেই একা। নিঃসঙ্গ আসিয়া পথে ঘরকন্না সাজাইয়া বসিল এ কে? কোথাও দূরপথে যাইতেছে বোধ হয়। কিন্তু কলিকাতায় ট্রাম আর মোটর বাসের রাজ্যে এমন চাল চিঁড়া বাঁধিয়া গ্রাম্য চালে মানুষ ত পথ চলে না।

দুপুরে লম্বা ঘুম দিয়া যখন উঠিয়া বার্লির জল খাইতে বসিয়াছি, দেখি মেয়েটি গাছতলায় পা ছড়াইয়া দীর্ঘ চুলে বিলি দিয়া চুল শুকাইতেছে। এই গাছতলার ঘবকন্না ছাড়িয়া এখনই চট করিয়া সে কোথাও রওনা হইবে বলিয়া ত মনে হইল না। বেশ শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব, যেন গৃহকর্ত্রী সারাদিনেব কর্মশেষে অপরাহ্নে অন্দরের ছাদের শেষ রোদটুকু একটু উপভোগ করিয়া লইতেছেন। পথচারীরা একটু কৌতূহলের সহিত তাহার দিকে দেখিয়া গেল, কিন্তু কেহ দাঁড়াইল না। সেও কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ কবিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা কবিল না। চুলগুলা হাতে জড়াইয়া শক্ত করিয়া একটা খোঁপা বাঁধিযা কপাল পর্যন্ত ঘোমটা নামাইয়া মাঠে বিছানো কাপড় কাঁথাগুলা এক এক করিয়া তুলিয়া পাট করিতে লাগিল। কাপড় পাট হইলে ভাতের ও ডালের হাঁড়ি দুইটা উনানের উপর চাপা দিয়া রাখিয়া বাসন কয়খানা একটা গামছায় বাঁধিল। আঁচলের সামান্য পয়সা ক'টা কোমরের কসিতে বাঁধিয়া গাছতলার চারিপাশটা ভালো করিয়া দেখিয়া মোটা কাঁথা দুইখানা দিয়া পশ্চিম দিকে একটা বিছানা পাতিয়া শিয়রে কাপড় ক'খানা রাখিল। আমি ত তাহার কাণ্ড দেখিয়া অবাক্‌। এই বর্ষার রাত্রে একটা পোড়ো মাঠের গাছতলায় এই সঙ্গীহীনা স্ত্রীলোক সারারাত শুইয়া থাকিবে? কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। ইহাকে ত পথের ভিখারী মনে হইতেছে না। যেন চিরকাল রান্নাবাড়া ঘরকন্নায় এমন অভ্যস্ত যে গাছতলায়ও কোনো আয়োজন অনুষ্ঠানের ত্রুটি রাখে না।

ঘর হইতে অনেক ডাকাডাকি করার পর আমার ভৃত্য আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওখানকার ও মানুষটা কে রে? রাত্রে কি এই গাছতলাতেই থাক্‌বে? একবার খোঁজ ক'রে দেখ দিকি।

ভৃত্য ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "সে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। ডাক্‌লে জবাব দেয় না। বেশি কথা কেউ জানে না। যা দু-চার জনকে জিজ্ঞেস্‌ করলাম তারা বলে ও আপন মনেই কাজ করছিল। এখানে থাক্‌বে তা কি করে জান্‌ব? কারুর সঙ্গে ত একটা কথা কয়নি। এখন দেখছি

হঠাৎ শুয়ে পড়ল।"

বয়স নিতান্ত ব ম নয় কিন্তু খুব বেশিও নয়। গাছতলায় সারারাত শুইয়া থাকাটা চোখে বড়োই বিসদৃশ লাগে। রা‌ে উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, একলা খোলা আকাশের নীচে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে। সকালে আমার ঘুম ভাঙিবার আগেই দেখি সে তাহার কাজকর্ম শুরু করিয়া দিযাছে। পথের ধারের কলতলায় বাসনমাজা জলভবা স্নান কাপড়-কাচা একে একে সবই সারা হইল। কে বলিবে ইহা তাহার বাড়ির উঠানের কুয়াতলা নয়? আর পাঁচজন কলের জল লইতে আসিলে মনে হইতেছিল সে যেন নিতান্ত দয়া করিয়া একটু সবিযা গিয়া জল দিতেছে। আসলে কলটা তাহারই সংসাবের সারাদিনের ব্যবহারেব জন্য। উনান ধরানো চাল ডাল ধোওযা রান্না-খাওয়া পানসাজা সবই যথাক্রমে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। কোনো তাড়াহুড়া ব্যস্ততা নাই, কোনো ভাবনা চিন্তা নাই, যেন গাছতলায় পাতা এই নূতন সংসারটির তদারকিই তাহার বহুদিনের একমাত্র কর্তব্য। তাহার রান্নাবাড়া হইলে এখনই বাড়ির পাঁচজন আসিয়া খাইতে বসিবে। ছেলে বুড়ো কেহ বাদ যাইবে না।

তাহার উনানের হাত-দুই দূরে টেকো বুড়া রহমান তাহাব নাতিটিকে কোলে লইয়া আসিয়া বসিল। খানিক বাদে দুই চারিটা প্রশ্নও শুরু কবিল। উত্তর পাইল কি-না বোঝা গেল না। একটু পরে আসিল আবু কোচম্যান, যতক্ষণ ভাড়াটে না মিলে একটু গল্পগাছা কবিযা ইহাব সঙ্গে ভাব জমাইবার ইচ্ছা। সে কিন্তু কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানিয়া আপন মনে পিছন ফিবিয়া রান্না কবিতে লাগিল। যাহা হউক মানুষগুলার অধ্যবসায় কমিল না।

আকাশের মেঘ কালো কালো দীর্ঘ জটার মতো ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ জোরে বৃষ্টি নামিল। রহমান নাতির মাথায় হাত চাপা দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল, আবু সেখ চট্ কবিয়া পাল্‌কি-গাড়িটাব ভিতর ঢুকিয়া বসিল। সে কিন্তু এক ইঞ্চি নড়িল না, ঠিক সেইখানে বসিযা উনানের আগুন উস্কাইতে থাকিল। পুঁটুলিসুদ্ধ কাপড় কাঁথা সব ভিজিযা গেল, কোনো ভ্রূক্ষেপ নাই।

ভৃত্য আসিয়া আমার ঘরের জানালা বন্ধ করিযা দিয়া গেল, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বৃষ্টিটা থামিয়া যাইতে জানালা খুলিয়া দেখি—পুকুর হইতে উঠিযা বড়ো বড়ো সাদা রাজহাঁসগুলা লম্বা গলা ঘুরাইয়া ঠোঁট দিয়া পালকের জল ঝাড়িতেছে, আর আমাদের পথবাসিনী পুঁটুলি খুলিয়া কাপড়গুলা নিংড়াইয়া মাঠের ঘাসের উপর মেলিয়া দিতেছে। কাকগুলা তাহার রান্নাঘবেব সন্ধান পাইয়া নাচিয়া নাচিয়া ভাতের হাঁড়ির ঠোকব দিতে আসিতেই কাপড় ফেলিয়া কঞ্চি হাতে সে কাক তাড়াইতে ছুটিতেছে।

সারা দিনই এমনি রৌদ্র ও বৃষ্টির খেলা চলিল। বার বার সে ভিজা কাপড় শুকায় আবার শুকনা কাপড় ভিজিয়া যায়। বর্ষার মাতামাতিতে আমার জ্বর বাড়িযা গেল,—দুই তিন দিন মাথার যন্ত্রণায় পড়িয়া তাহার কোনো খোঁজই লইতে পারিলাম না। তাহাব কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

জ্বরটা ছাড়িলে মেঘছায়াচ্ছন্ন নারিকেল-কুঞ্জের কথা মনে করিয়া জানালাটা খুলিলাম। দেখি জানালার কাছেই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় বেশ সভা বসিয়া গিয়াছে। পথবাসিনীর সংসাব ঘিরিয়া আবু সেখ্ রহমান, ছিদাম, পানু—পাড়ার যত হিন্দু মুসলমান জুটিয়া গিয়াছে। সকলেরই বেশ উৎসুক ভাব; বোধ হয় গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। সারাদিনই ফুটপাথের উপর দুটা একটা মানুষ পালা করিয়া উবু হইয়া বসিয়া আছে। কাজের মধ্যেই নানা গল্প চলিতেছে। উহারই মধ্যে দোকানীর কাছে চালটা ডালটা চাহিয়া আনা, গাছতলা হইতে কাঠকুটা কুড়াইয়া আনার ফাঁক করিয়া লইতে হইতেছে। তাহার ডাগর চক্ষের নির্ভীক চাহনি একটু ভীরু হইয়া আসিয়াছে, নিশ্চিন্ত চলাফেরায় কিসের ব্যাকুলতা ও ক্ষিপ্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের বাড়ির ঝি-চাকরেরা দেখিতেছি এই কয়দিনেই তাহার নাড়ীনক্ষত্র জানিয়া ফেলিয়াছে, বোধ হয় গাছতলার সভায় তাহারাও যোগ দেয়। বুড়ি ঝি বিকালে আমাকে ফল দুধ দিতে আসিয়া বলিল, "মা গো, মানুষটার বড়ো মন্দ কপাল। কায়েতের ঘরের বৌ, শেষ কালে পথেই দাঁড়াবে নাকি কে জানে? এমন বেহিসেবীও মানুষ হয়?" জিজ্ঞাসা করিলাম, "বউ কি রকম? ওর কি স্বামী আছে?" সে বলিল, "হ্যাঁ মা, আছে বই কি। চার চারটে ছেলে মেয়ে, মেদিনীপুরে খোড়ো বাড়ি, সব আছে। তার কি-না এই দশা।"—"তবে এখানে গাছতলায় পড়ে মরতে এল কেন? ট্রেন ভাড়া ক'রে বর্ষাকালে কলকাতার গাছতলায় মানুষ থাকতে আসে নাকি?"

ঝি বলিল,"—বলে ত—যে অনেক দিন ধ'রে পেটের গোলমালে ভুগ্‌ছিল, সেখানে চিকিচ্ছে কিছুই হ'ত না, বল্‌লে কেউ গা-ও করত না। এবার স্বামী হঠাৎ রাজি হয়ে গিয়ে একেবারে কল্‌কাতার হাসপাতালে নিয়ে এল।"

হাসিয়া বলিলাম—"ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা! একেবারে আকাশের নীচে জল হাওয়া বৃষ্টি রোদ, সবই প্রচুর পাচ্ছে। একেবারে নির্মল হয়ে সেরে যাবে।"

ঝি কিছু না বুঝিয়াই বলিল,—"হাসপাতালে ভরতি ক'রে দিয়ে সে বাড়ি গেল। এদিকে ডাক্তার বল্‌লে—অম্বলের অসুখে আবার হাসপাতালে কে রাখে? রোজ এসে ওষুধ নিয়ে যেও। স্বামীর বুদ্ধিটা দেখ্‌লে? দু' দিন থেকে দেখে যেতে নেই?" সে কথার জবাব না দিয়া বলিলাম, "ভরতি করে আবার কখনও বার ক'রে দেয় নাকি?" ঝি বলিল, "কি জানি মা, ভদ্দরলোকের কাণ্ডকারখানা, গরীবের মরণে তাদের কি?"

আমি রাগিয়া বলিলাম, "তা বেশ তো ভদ্দরলোক যদি হাসপাতালে নাই রাখে, নিজের গরীব স্বামীর কাছে গেলেই হয়। তা ত কেউ বারণ করেনি! নিতে আসে না কেন লোকটা?" ঝি বলিল, "আসবে মা, মেদিনীপুর থেকে এসে নিয়ে যাবে। কাছে ত নয়। এখন বৌটা পানুদের দোকানের দালানে রাত্রে শুতে যায়। সেখানটা দিনে বিড়িওয়ালারা বসে তাই রাতটুকুন পায় খালি। এই ক'টা দিন কেটে গেলেই হবে।" বলিলাম "যে ভালো স্বামী তাতে আসবার আশা না করাই ভালো! হাসপাতালে বোধ হয় দরজায় বসিয়েই টিকিট কেটে বাড়ি চলে গেছে। একটা খোঁজ-খবরও ত মানুষ করে, হলই না হয় গরীব। ট্রেন ভাড়া জুটেছিল আর পোষ্টকার্ডের পয়সা জোটে না?" ঝি বলিল, "জানিনে মা, অত কথা। আমায় যা বলেছে তাই বলছি। ওর স্বামী ওই জানে।"

হঠাৎ বাহিরে উন্মত্ত বাদল প্রলয় নাচন শুরু করিয়া দিল। নারিকেল গাছগুলি বা ভাঙিয়া পড়ে। দেখিতে দেখিতে মাঠের সবুজ গালিচা জলে সরোবর হইয়া উঠিল, ডোবার হাঁসগুলা কচি ছেলের মতো টলিতে টলিতে আসিয়া সেই নূতন জলে খেলা শুরু করিল। পথবাসিনী তাহার হাঁড়িকুঁড়ি গাছতলায় উপুড় করিয়া রাখিয়া পুঁটুলিটা লইয়া আমাদের সিঁড়ির তলায় দাঁড়াইল। জল ও বাতাসের যুগল নৃত্যে তাহার গাছতলায় আর টেকা যায় না। কৃষ্ণচূড়ার শাখা-প্রশাখায় ঝড়ের বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে।

বুড়া ঝি আসিয়া বলিল, "মা, বউটা সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়েছে, একবার দেখবে এস।"

সেদিন ভালোই ছিলাম, বাড়িতেও শাসন করিবার মতো কেহ উপস্থিত ছিল না। কাজেই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া একেবারে সিঁড়ির কাছে গিয়া হাজির হইলাম। মেয়েটা দেখিতে মন্দ নয়। ডাগর দুটি ভয়লেশহীন চোখ, মাথায় রুক্ষ চুলের মস্ত একটা খোঁপা, হাসিলে এখনও গালে টোল খায়। কিন্তু বয়সে তরুণীর চপলতা নাই, মাতৃত্বের গাম্ভীর্য আসিয়া পড়িয়াছে। সিঁড়ির দরজা পার হইয়া ভিতরেই আসিয়াছিল। তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ গা বাছা, ঝড়ে জলে পথে পড়ে আছ কেন? তোমার কি কেউ নেই?"

সে জিভ কাটিয়া বলিল, "সে কি কথা মা, আমার সাজন্ত ঘর, সব আছে। রোগের জ্বালায়

বিদেশে এসে এমন বিপদে পড়েছি। নইলে মা, ঘরের বাইরে কোনোদিন পা দিইনি।” বলিলাম, “তোমার স্বামীকে একটা চিঠি দিলেই তা নিয়ে যায়।”

সে বলিল, “লিখতে ত জানি না মা, এই লোকগুলাকে দিয়ে লিখিয়েছিলাম। পেল কি-না তাই বা কে জানে, আর যদি জবাব দিয়ে থাকে হয়ত কার-না-কার হাতে পড়ে খোয়া গেছে। হয়ত ইচ্ছে ক'রে ভুল ঠিকানা লিখেছে; কার পেটের কথা কে জানে?”

বলিলাম, “আমাদের ঐ চালাটায় দু-চারদিন থাক, আমি তোমার চিঠি লিখে দেব, এখান থেকে এসে নিয়ে যাবে।”

কায়েত-বউ, তাহার ডাগর চোখ তুলিয়া বলিল, “আপনারা কি জাত মা? আমি কায়েতের মেয়ে, যার তার ঘবে ত থাকতে পারি না।”

বড়ো রাগ হইল, চাল নাই, চুলা নাই, থাক্‌তে জায়গা দিলাম তা আবার জাতের খোঁজ। বলিলাম, “জাতে আমরা মুচি। তোমায় ত রেঁধে খাওয়াব না, অত ভয় কিসের? থাকতে দিচ্ছি ভাগ্যি মান, তা না জাতকুলেব খবর নিতে বসলে।”

সে বলিল, “হাড়ি মুচির ঘরে রাত কাটালে সোয়ামী কি আর ঘরে নেবে, মা। তার চেয়ে এই ভালো। চিরকালের ঘব খোযানোব চেয়ে দু-দিন পথে থাকাই ভালো।”

বলিলাম, “পথের ধারে ঐ যে গাড়োয়ানগুলোব হাসিতামাশা শোন বসে বসে ওতে কি স্বামী খুব খুশি হবে?”

সে বলিল, “কি কবব মা? আমি ত তাদের হাসতে ডাকিনি। ঘবে নিজের স্বামী আজ দশ বছর হেসে কথা কয় নি, এখানে সবাই হাসিব কথা শোনাতে আসে, তা কি আমাব দোষ। আমবা গরীব লোক ও সব রং তামাশা জানি না। কিন্তু এসে বসলে সবই সইতে হয়।”

হাসিয়া বলিলাম, “আমরা মুচি নয় গো, ওই চালায দিনকতক থাকলে তোমাব জাত যাবে না।”

সে একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখেব দিকে চাহিয়া বলিল, “না, মা, তোমার অনেক চাকব বাকর, সাতজনের সঙ্গে ওখানে আমাব সুবিধা হ'বে না। এই দোকানীর বারান্দাই ভালো, ভিতব থেকে বন্ধ করে একলা থাকি।”

বেশিক্ষণ তাহার সহিত তর্কের খেলা করিবার জোর ছিল না। “যা ভালো বোঝ কর বাছা,” বলিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম।

তিন দিন পরে দেখি, কায়েত-বউয়ের সংসারে আসবাব বাড়িয়াছে। গাছতলায় নিকানো গণ্ডির ভিতর ঘুন্‌সি-পরা একটি উলঙ্গ শিশু হামা দিয়া চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গৃহিণী আজ সন্ত্রস্ত; এই জলের গেলাস, উপুড় হইল, এই ডালের ঠোঙায় থাবা পড়িল, এই উনানের কাঠে টান। ৴৬ তিন-চারিটা মুড়ির দানা তাহার বিরলদন্ত মুখে দিয়া তাহাকে এক জায়গায় স্থির করিয়া বসাইবার চেষ্টা যতবার করিল, ততবারই সে ঠোঁট দুইটা টিপিয়া বন্ধ কবিয়া মুখ ফিরাইয়া হামা দিয়া আসিয়া জলের বাসনগুলায় দুই হাত ডুবাইতে লাগিল। যত হায়রাণি বাড়ে বৌ ততই শিশুকে সহবত শিখাইতে ব্যস্ত, দুইজনে হাসিয়া অস্থির। আবু সেখ, পানু, ছিদাম আসিয়া হাসির কণা যতটুকু পারিল সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেল। পরিবর্তে কেহ কিছু চাল, কেহ চারখানা কাঠ, কেহ একটু গুড় দিয়া দাতা নাম কিনিল।

বুড়ি ঝি জানালা দিয়া দেখিয়া বলিল, “আ-মরণ, উনি আবার ভালো-মানুষের ঝি। নিজের ছেলে ঘরে প'ড়ে কাঁদছে, আর এখানে পরের ছেলে কোলে সোহাগ করা হচ্ছে। ওটা ওই ছিদমে লক্ষ্মীছাড়ার ছেলে।” জানালা দিয়া হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিলাম। ছেলে কোলে করিয়া সে নিচে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, “ও ছেলেটা জোটালে কোত্থেকে?”

বলিল, "ছিদামের বাড়ি গিয়েছিলাম, তার বউ আমাকে মা বলেছে, তাই ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। বিদেশে বিভুঁইয়ে মেয়েছেলের সঙ্গে ভাব রাখা ভালো। নইলে একটা বদনাম উঠ্‌লে আর কি ঘরে ঠাঁই দেবে? তা ছাড়া জানই ত মা, মায়ের জাত কি ছেলে নইলে বাঁচে?"

আমি বলিলাম, "এমনিতেও ত ঘবে ঠাঁই দেবাব কোনো লক্ষণ দেখছি না। ও তোকে ফেলেই হয়ত পালিয়েছে। নইলে কি একটা দিন থেকে ভালো ক'রে ব্যবস্থা করে যেতে পারতো না?"

সে বলিল, "না মা, পুরুষ মানুষ—মারে ধরে বলেই কি আর পথে বার ক'রে দিয়ে যাবে? ভাবছে মনে হাসপাতালে ত আছে, দশদিন পরে এসে খোঁজ করলেই হবে। ছেলেপিলে ফেলে তখন তাড়াতাড়িতে চলে গেছে।" একখানা পোষ্টকার্ড জোগাড় করিয়া তাহার স্বামীর নামে চিঠি লিখিয়া দিলাম, বলিলাম, "ডাকে ফেলে দে, যদি মানুষ হয় ত নিশ্চয় নিয়ে যাবে।"

পাঁচদিন কাটিয়া গেল, ঝড়ে বৃষ্টিতে রৌদ্রে এই অনাবৃত পথে আর কত কাল বাস করা চলে? কিন্তু চিঠিও আসিল না, স্বামীরও দেখা মিলিল না। সব চুপচাপ।

বলিলাম, "কারুব বাড়িতে আশ্রয় নে না বাছা। এমন ক'রে কি মানুষ বাঁচে?"

সে বলিল, "এ খিষ্টান মুসলমান পাড়ায় কোথায় কাব ঘরে থাক্‌ব, মা, আমি হিন্দুর বউ।" বলিলাম, "তবে যা না বাপু, কোথায় হিঁদু পাড়া আছে। এখানে পড়ে মরতে হবে না।" সে ভীতচক্ষে বলিল, "বড়ো ভয় করে মা, জাতজন্ম খোয়ালে আর কি গেরস্তর ঘরে কেউ মুখ দেখবে? এ তবু চেনা শুনো হয়ে এসেছে, এক রকম চলছে। এ দেশে কোথায় কি পাড়া আমি কি কিছু চিনি? কারুর সঙ্গে যেতেও ভরসা হয় না, কোথায় নিয়ে যাবে কি জানি? বড়ো ভয়ে ভয়ে আমার দিন কাটে, মা।" বলিলাম, "তবে অত জাঁক না দেখিয়ে এইখানেই থাক্ না যে ক'দিন দরকার। হলামই বা খিষ্টান।" কি ভাবিযা একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, "আচ্ছা কাল আস্‌ব। ঘবটা আজ দেখে যাই।" চালা ঘরটা দেখাইলাম। একদিকে কেরোসিনের বাক্সে বাড়িব যত ভাঙা কাঁসার বাসন, আর এক দিকে কোদাল টাঙি, খুর্পি ইত্যাদি লোহার সরঞ্জাম ও গোটা-পনের চটের বস্তা পড়িয়া আছে; মাঝখানে একটা ভাঙা তক্তপোষ। বউ ঘর দেখিয়া বলিল, "ভালো করে বন্ধ হয় না।" তারপর চলিয়া গেল।

ধূলিকণার মতো গুঁড়া বৃষ্টির ভিতর কায়েত-বউ সকাল বেলাই রান্না চড়াইয়াছিল। জানালা দিয়া তাহার মুখ ভালো করিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম না, বৃষ্টি যেন পাতলা একটা উড়ন্ত মসলিনের পরদার মতো আমাদের দু জনের মাঝখানে দুলিতেছিল। একবার মনে হইল মুখের উপরের বৃষ্টির জল সে আঁচল দিয়া মুছিতেছে, আবার মনে হইল বৃষ্টির জল নয় চোখের জল। এত দুঃখে কোনো দিন তাহাকে কাঁদিতে দেখি নাই, আজ কি সে তবে সকল আশা ছাড়িয়া দিয়াছে। হাঁটু দুইটার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া সে তাহার কান্না সাম্‌লাইতে লাগিল। এমন সময় একটা ছাতা হাতে পানু সেখানে আসিয়া উপস্থিত। দেখিলাম ছাতাটা লইবার জন্য বউকে অনেক ঝুলোঝুলি করিতেছে, আজ কিন্তু সে দান লইতে বড়োই কুণ্ঠিত। তবু পানু ছাতা রাখিয়া চলিয়া গেল।

এক গালে হাসি ও পান লইয়া কে একটা গাড়ি হাঁকাইয়া গাছতলায় আনিয়া দাঁড় করাইল। কায়েত-বউ একটু ভীতদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া তারপর চোখের জলের ভিতর দিয়া মৃদু একটুখানি হাসিল। গাড়ির ভিতর চারটা ছোটো বাঁশ ও একটা পুরানো তেরপল ছিল। বাঁশ চারিটা চারিকোণে পুঁতিয়া উপরে তেরপলটা চাপা দিয়া আবু অনাবৃত রান্নাঘরের একটা ছাউনি করিতে লাগিয়া গেল। বুড়া রহমান নাতি কোলে যাইতে যাইতে সেদিকে তাকাইয়া বলিল, "বাহাবা তোফা।" মানুষগুলো শুধুই আড্ডা জমাইতে না আসিয়া আজ বেচারীর দুর্গতির একটু প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে, দেখিয়া তাহাদের উপর আমার মনটাও প্রসন্ন হইল।

বুড়ি ঝি খাবার লইয়া আসিয়াছিল, এই সব দেখিয়া বলিল, "বাছা আমার বাঁচলে বাঁচি, ঘোলে

রুচি দুধে অরুচি।" জাতের দেমাকে তোমার ঘরে থাকল না, মা, এখন জাত কুল সব ধুয়ে খাচ্ছেন।" আমি বলিলাম, "চুপ কর্ লক্ষ্মীছাড়ি, লোকের নামে কথা রটাতে পেলে কিছু চাস্ না। মানুষের চামড়া গায়ে থাক্‌লে পরের দুঃখ কষ্টে মানুষ অমন করেই থাকে।"

সে বলিল, "হ্যাঁ দুঃখু কষ্ট না ত আর কিছু। ঐ গাড়োয়ানটা আমাকে নিজে বলেছে ও ওকে গাড়ি করে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যায়; আবার পানুর সঙ্গে তাই নিয়ে ওর ঝগড়া কত! বলে— যাক্ না পানুর চাল চিঁড়ে খেতে, একদিন হাড় ক'খানা ভেঙে রেখে দেব। লজ্জা সরম সব ধুয়ে খেয়েছে মা, নইলে এমন ঢলাঢলি গেরস্তর বউ করে।"

আমি বল্‌লাম, "ও-সব লোকটার দুষ্টুমি, বানিয়ে বলেছে ওর নাম খারাপ করবার জন্যে। তুই যত রাস্তার লোকের সঙ্গে বাজে গল্প করতে যাস কেন বল দেখি! অমন করলে তোকে দিয়ে আমার চলবে না।"

বুড়ি তাড়াতাড়ি আমার পায়ে হাত দিয়া বলিল, "তোমার দিব্যি মা, বাজে গল্প কবতে যাই না। ঘুঁটে কিন্‌তে গিয়েছিলাম, ওরা এসে সাত কথা তুল্‌লে। বউটার ভালোর জন্যে তাকে বল্‌তে গেলুম যে—যার তার সঙ্গে অমন হাওয়া খেতে যাস্‌নে মরবি, তা এমন ন্যাকা সাজল মা, যেন ভাজা মাছটি উল্‌টে খেতে জানে না, যেন হাওয়া খাওযার নামও কোনো দিন শোর্নেনি। ছোটোলোকদের কাণ্ড জান না, মা, ওরা ভর সন্ধ্যে বেলা সেদিন একটা মেয়েকে মোটরগাড়ি কবে নিয়ে পালাচ্ছিল! সে যাই মেম, তাই রক্ষে। সে পুলিশ ফরেদ কত কি কবলে, আর কাঙালের মেয়ে কি বাঁচবে ওদের হাতে পড়লে?"

বুড়ির যত গুণ্ডাব গল্প শুনিবার মতো মস্তিষ্কের অবস্থা ছিল না। শুইয়া পড়িয়া বলিলাম, "যা বাপু, তোর গল্প শুনে আমার মাথা ঘোরে। আমায় একটু ঘুমোতে দে।"

বিকেল বেলায় গাছতলার সভা খুব জাঁকাল হইয়া উঠিয়াছিল। আগে ত এত লোক দেখিতাম না। আরও পাঁচ-সাতটা দুষমনের মতো মানুষ, কেহ ঝুড়ি কেহ কোদাল, কেহ দড়ি কাঠ ও বস্তা হাতে করিয়া ময়লা কাপড় জামা পরিযা যেন দিনমজুরিব কাজ হইতে ফিরিতেছে, এমনি ভাবে এক হাঁটু কাদাধুলা মাখিয়া সেখানে বসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা খুব হাসিগল্প করিতেছে, দেখিয়া মেয়েটার উপর আমার বড়োই বিরক্তি হইল। ভালোই হইয়াছে, আমার বাড়িতে আনি নাই। বিরক্তিতে এ বেলা আর তাহার মুখের দিকেও তাকাই নাই। তা ছাড়া চারিধাবে মানুষ গোল হইয়া বসাতে তাহাকে বিশেষ দেখাও যাইতেছিল না।

পরদিনও নূতন নূতন মানুষ আবির্ভূত হইতে লাগিল, এবং মাঝে মাঝে অভদ্র ঝগড়া ও খণ্ড যুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সেইখানে বসিয়াই কায়েত-বউ তাহার নিত্যকর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিল, সুতরাং জিনিসটার ওজন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। সংসারের শ্রী বাড়িয়াছে, মাথার উপর একটু ঢাকা, বসিবার একখানা পিঁড়া, ছোটো একটা বঁটি। কিন্তু তাহার সে আত্মস্থ ভাব কাটিয়া গিয়াছে। ঘরকন্নার আগ্রহ আছে মনে হয় না, ইহাদের এই আনাগোনা ও কোলাহল যেন তাহার চারিপাশে কিসের একটা ঘূর্ণি নাচাইয়া তুলিয়াছে। তাহার সরল মনের স্থৈর্য ঘুচিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যায় আজ সে একবার আমার সিঁড়ির তলায় আসিয়াছিল, তখনও তার গাছতলায় লোক বসিয়া। ঝি বলিল, "তোমার সঙ্গে কথা কইতে চায়, মা।" বিরক্ত ভাবেই গিয়া বলিলাম, "কি চাই, তোমার?" সে হাত জোড় করিয়া বলিল, "মা, তোমার ওই ঘরটায় আজ আমাকে থাকতে দিও। কিন্তু একটা হুড়কো চাই, মা।"

বলিলাম, "দু'বার ত সাধলাম, এলি কই? এখন এক রাজ্যি লোক জুটিয়ে আবার আমার ঘরের উপর টান কেন?"

ডাগর দুই চক্ষে মিনতি ভরিয়া সে শুধু হাতজোড় করিল, কোনো কথা বলিল না। যেন পিছনে তাহার কথা শুনিবার জন্য কে আড়ি পাতিয়াছে। "আচ্ছা, আসিস" বলিয়া ঘরে চলিয়া গেলাম। লোকগুলা তখনও তাহার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। উহাদের আরও অনেকক্ষণ কথাবার্তা চলিল। একটা উত্তেজিত গলার স্বর কানে আসিতেছিল।

ভোরেই ঘুম ভাঙিল। অনেক দিন পরে সকাল হইতেই উজ্জ্বল নীল আকাশে পরিষ্কার রোদ উঠিয়াছে। সমুদ্রের ফেনার মতো সাদা সাদা ফাঁপা মেঘ মাথার উপরে ছড়াইয়া আছে, যেন শরৎকাল। গাছতলায় দুইটা খোট্টা বুড়ি হল্‌দে তালি-দেওয়া গোলাপী কাপড় পরিয়া পেয়ারাফুলি আমের ঝুড়ি লইয়া বসিয়াছে। কায়েত-বউ ত আসে নাই। রাত্রে আমাদের এখানে শুইতে আসিবে বলিয়াছিল তাহাও ত দেখিলাম না। তাহার ঘরসংসারের তিনটা পোড়া ইট ও দুইটা পোড়া হাঁড়ি ছাড়া আর কিছুই নাই। আজ এমন সুন্দর দিনে তাহার এত আলস্য অথচ বাদ্‌লা দিনে ত দেখি ভোর না-হইতেই জিনিসপত্র সব লইয়া আসিয়া কাজে মাতিয়াছে। হয়ত আমার এখানে থাকিবে বলিয়াও আসে নাই, তাই লজ্জাতে অন্য কোনো দিকে নূতন করিয়া সংসার সাজাইয়াছে। কিছু আশ্চর্য নয়।

আরও বেলা হইল। তাহাকে কোনো দিকে দেখিলাম না। বুড়ি ঝিটা সকাল-বেলাই তাহার মেয়ের বাড়ি গিয়াছে, বিশ্বের গল্প শুনাইবার লোকই বা কোথায় যে পথের মানুষের খবর পাইব?

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় বুড়ি বাড়ি ঢুকিয়াই ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মাগো এত কাণ্ড হয়ে গেল, কিছু শোন নি?"

বলিলাম, "কেন রে, কি হল?"

সে বলিল, "পরশু রাতে ছিদামের দোকান ঘরে চুরি ক'রে বউটা পথে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। পানুটা ওর ভাবের লোক, দালানে শুতে জায়গা দিয়েছিল, তাই চুরি করলে গিয়ে ছিদেমের ঘরে। এত মনোহারী জিনিস, একটা বস্তা ভর্‌তি। এদিকে ছিদেমের বউ নাকি ওকে মা বলে। মা হয়ে ছেলের গলা কাটা! ছিদেম ত রেগে আগুন, বলে ওকে এক বচ্ছরের জেল খাটাব। পানুরা বলেছে, গরীব দুঃখী লোক, টাকার লোভে চুরি করেছে, ওরা ওকে ছাড়িয়ে আন্‌বে। কিন্তু ছিদ্‌মে কি সহজে ছাড়বে? মা সেজে শয়তানি কে সয় বল দিকি মা?"

কুড়ি-বাইশ দিন দোকান ঘরে কাটাইয়া দিয়া আজ হঠাৎ চুরি করিল, কথাটা বিশ্বাস হইল না। হয়ত এই দুষ্ট লোকগুলা শিখাইয়া-পড়াইয়া উহাকে চোর তৈয়ারি করিয়াছে, এমন হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। তাই হয়ত উহাদের ছাড়াইয়া আনিবার এত দরদ।

বিচার হইয়াছে, খবর পাইয়াছি। পানুরা ছিদামকে অনেক বুঝাইয়া বউটাকে ছাড়াইয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। কিন্তু বউ ছাড়া চায় না, তাই আদালতে নিজে বলিয়াছে যে জানিয়া শুনিয়াই জেলে যাইবার জন্য সে তাহার একমাত্র হিতৈষী ছিদামের ঘরে চুরি করিয়াছিল। এখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলে পৃথিবীতে তাহার আর কোনো আশ্রয় নাই। স্বামীর অন্নের আশা তাহার ঘুচিয়াছে, পরের অন্নের দাম সে দিতে পারিবে না। "পানুর ঘরে চুরি করতে ত আমি পারতুম, কিন্তু ও লক্ষ্মীছাড়া আমায় জেলে দেবে না জেনেই আমি ছিদামের ঘরে চুরি করেছি। আমায় ওদের হাতে আর সঁপে দিও না, বাবা" বলিয়া সে কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে!

কায়েত-বউ হাজতেই আছে, যাহারা তাহার ত্রাণকর্তা হইতে চাহিয়াছিল, এখন তাহাদের নামে গ্রেফ্‌তারী পরওয়ানা বাহির হইয়াছে।

প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২৯

বা র - এ ট্ - ল

গোকুলচন্দ্র নাগ

নূতন বারিষ্টার মহলে চারু দত্তের পসার খুব বেশি। তাই অনেকেই তাকে বেশ একটু হিংসার চোখেই দেখে আর তার অসাক্ষাতে কানাকানি করে,—"আশ্চর্য। ছোঁড়াটা বিয়ে করে যেন ফেঁপে উঠল। কে জানত বুড়ো ঘোষ সাহেবের অত টাকা ছিল? ছোকরা দিব্যি শাঁসে জলে বাগিয়েছে হে।"

একজন পাইপটা ঠোঁটের বাঁদিকে চেপে, তাতে আগুন ধরাতে ধরাতে বল্‌ল—"শাঁসে জলে আর বোলটে, ডুটি লক্ষ বেঙ্গল বেঙ্কে নগত।"

দু'বছরের মধ্যে খুব কষ্ট করে চারু দশটি ক্লাবের সেক্রেটারী, সাতটি ক্লাবের মেম্বর, আরও ঐ রকম কত কি হয়েছে, কিন্তু তার মন আর কিছুতেই ওঠে না। মাঝে মাঝে কোন বন্ধুকে বলে, "সত্যি বলছি ভাই, আমাদের এই দেশী ক্লাবগুলো একেবারে ওয়ার্থলেস।"

একদিন সন্ধ্যাবেলা চারু, তার জন দুইচার বিলাত-ফেরত বন্ধুকে নিয়ে চা খাচ্ছে। মিসেস ডাট্ সকলকে আদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত করছেন। "জারমানরা আবার অফেন্‌সিভ্ নিয়েছে, ওদিকে রাশিয়াও নিজেদের মধ্যেই কাটাকাটি মারামারি আরম্ভ করে দিয়েছে, তবে আমেরিকা এলাইদের পক্ষ নিয়ে নাবছে। এই যা ভরসা" ইত্যাদি, আলোচনার মধ্যখানে হঠাৎ চারু বলে উঠল —"আচ্ছা মিঃ বোনার্জি, আপনি ত লজ-এর মেম্বর?" মিঃ বোনার্জি বললেন—"হাঁ সে আর নতুন কথা কি, আজ প্রায় পাঁচবছর ত ওখানে যাতায়াত করছি।" কথা কয়টি বলে বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে তিনি সকলের মুখের দিকে একবার তাকালেন।

চারু বল্‌ল—"তা আমাকে ত ওখানে যাবার জন্যে একবারও বলেন না। যত রাজ্যের নরক ঘেঁটে আমার দিন যায়।"

বোনার্জি বললেন,—তা ভাই একজনকে ত ঘাঁটতেই হবে। নইলে পরিষ্কার হবে কেন? এই দেখনা তুমি এসে পর্যন্ত আমি একটু হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। অস্থির হয়ে উঠেছিলাম হে। কোথায় কোন্ সাহেব বাঙালীদের লক্ষ্য করে কি কথা বলেছে, এক ক্লাব থেকে হুকুম হল—দাও তাব জবাব। আজ ছাত্রদের শারীরিক এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে লেক্‌চার দাও। কাল টি পার্টি দাও। বলতে কি ভাই শুধু পাগল হতে বাকি ছিল। আশীর্বাদ করি আমার মাথার চুলের মতো তোমার পরমায়ু হোক। তুমি আমার প্রাণদাতা সেভিয়র।

চারু হেসে বল্‌ল—"আপনার ওসব বাজে বকুনি রেখে লজ-এ ঢুকবার একটা উপায় করে দিন।"

বোনার্জি সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়া গলাটা উঁচু করে আকাশের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে বল্‌লেন—তা এক কাজ কর না, তুমি একটি এপলিকেশন করে দাও, আমি সেটা সব্‌মিট করব। আসল কথাটা কি জান, রোম্যান ক্যাথলিক মিশনারিদের মতো ভজিয়ে ভজিয়ে মেশন করবার নিয়ম নেই। যার ইচ্ছা হবে তাকে নিজে দরখাস্ত করতে হয়। বুঝলে?

মিসেস ডাট সেইখানে বসে পড়ে বললেন—সত্যি কিন্তু ঐ সব লক্ষ্মীছাড়া বাঙালী ক্লাবে গিয়ে অবধি ওঁর শরীর আধখানা হয়ে গেছে। মিঃ বোনার্জি আপনি একটু চেষ্টা করে ওঁকে আপনাদের লজ্-এ নিন।

রাত্রি ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। সকলে যাবার জন্য ব্যস্ত হতে, শুভরাত্রি ইচ্ছা ক'রে এই টি-তে সকলকে আহ্বান করে মিসেস্ ডাট তাঁদের অত্যন্ত বাধিত করেছেন এবং তাঁরা তাঁর

সুরুচিপূর্ণ ব্যবহারে অত্যন্ত আনন্দলাভ করেছেন ইত্যাদি কথার পর চলে গেলেন।

সকলকে বিদায় দিয়ে মিসেস্ ডাট্ বললেন,—আচ্ছা খুব ভালো হবে না? আমার ত খুব ভালো লাগ্ছে—বেশ হবে কিন্তু। কিংকতগুলো বাজে ক্লাবে গিয়ে সময় নষ্ট করার চেয়ে লজ-এ গেলে ঢের উপকার হবে। তাছাড়া সেখানে কত বড়ো বড়ো লোক যায়। মোটের ওপর সোসাইটিটা খুব হেল্‌দি না?

সপ্তাহ দুই পরে কোর্ট থেকে ফিরেই সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে চারু বলে উঠ্‌ল,—জান মীরা,—শুনেছ?

বারাণ্ডায় রেলিংএ ভর দিয়ে মীরা বলল—"খুব জানি। আগে ওপরে ত উঠে এস।" চারুর ঘর্মাক্ত এবং আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সে বল্‌ল—"ওরা ত আমায় নিয়েছে বুঝলে। সাড়ে পাঁচটা ত বেজে গিয়েছে আর একঘন্টা মাত্র সময় আছে। তুমি শিগ্‌গির আমার ড্রেস সুটটা বার করো দাও। আজ আমার লজ-এ—আঃ দাঁড়িয়ে রইলে কেন? শুনতে পাচ্ছ না?"

মীরা হেসে বল্‌ল,—"আগে যেটা পরে আছ সেটা ত ছাড়। জলটল কিছু খেতে হবে না কি?"

ভ্রূদুটি বাঁকিয়ে চারু বল্‌ল—তোমাকে যা বল্‌ছি তাই কর না। আমার জামা আমি ছাড়ি না ছাড়ি তোমার তাতে দরকার কি? বো—ই। নেপথ্যে শব্দ এল—"হুজুর।"

মীরা একখানা ভিজে তোয়ালে দিয়ে চারুর মুখের ঘাম মুছিয়ে দিয়ে বল্‌ল, "মনে থাকে যেন।" ড্রেসিংরুমে ঢুকে চারু বল্‌ল—"কি?" মীরা বল্‌ল, "আমাকে লজ্ সম্বন্ধে সব কথা বলতে হবে। আমি এন্‌সাইক্লোপিডিয়াতে ফ্রি মেসন্‌রি সম্বন্ধে যত কিছু একাউন্ট ছিল সবই পড়েছি, কিন্তু ওদের আসল উদ্দেশ্যটা যে কি তা ঠিক ধরতে পারি নি। আজ রাত্রে ওখান থেকে ফিরেই আমাকে সব বলতে হবে কিন্তু।"

চারু বল্‌ল,—"বাঃ সে কি করে হবে? তুমি কি জান না মেসনদের যা সিক্রেট তা যারা মেসন্ নয় তাদেব কাছে বল্‌তে নেই?"

মীরা বল্‌ল, "আমি না তোমাব স্ত্রী।"

"হলেই বা স্ত্রী, আমি যখন লজের মেম্বর, তখন আমার কাছে দোকানের মুদি এবং আমার স্ত্রী দুই সমান। তার কাছে যেমন বলতে পারি না, তেমনি তোমার কাছেও নয়।"

ধপধপে শাদা দাঁত দিয়ে মীরা ঠোঁটটিকে একটু কামড়ে, কাপড়ের আঁচলটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বল্‌ল,—"ওঃ বেশ। দোকানের মুদী মিন্‌সে আর তোমার স্ত্রী তোমার কাছে এক? বেশ তাই হোক।" বলে ঝমাস করে চাবির গোছাটি পিঠের ওপর ফেলে, বেশ মন্থর গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কোনো প্রকারে পোষাক পরা শেষ করে চারু মীরার ঘরে এসে দেখল সে বিছানায় শুয়ে আছে। মুখটি দুটি বালিশের মাঝে ঢাকা। আদর করে তার পিঠে হাত বুলিয়ে চারু বল্‌ল—"লক্ষ্মীটি মীরা, রাগ করো না, ওঠো। আচ্ছা, একবার দেখলেও না, আমায় ড্রেসসুটে কেমন মানায়? আচ্ছা বেশ।"

এবার মীরার সর্বশরীর একটু যেন আন্দোলিত হয়ে উঠল। তারপর দুটি ভিজে চোখ আর একটি হাসিমুখ বালিশের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল। চারু মাথার হ্যাটটা ডানহাতে করে তুলে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বিলাতী কায়দায় মীরাকে অভিবাদন করল। মীরা খিলখিল করে হেসে উঠে বলল—"ঠিক যেন হোটেলের ওয়েটার।"

ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো সোজা হয়ে চারু বল্‌ল "অল্ রাইট।" আর কোনো কথা না বলে সে চলে যাবার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মীরা ছুটে এসে তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বল্‌ল "আর বলব না।" চারু বিরক্ত হয়ে বলল, "আঃ কি কর। সরে যাও আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

"আর অত রাগ করতে হবে না গো মশাই। এই নাও মাপ চাচ্ছি।" বলে মীরা চারুর পায়ের

কাছে বসে পড়তে গেল। তাকে তুলে কপালে একটি টোকা দিয়ে চারু বল্‌ল,—"ইউ নটি গার্‌ল্‌। আচ্ছা শোধবোধ কেমন?"

মীরা বল্‌ল, "আচ্ছা; কিন্তু ...।" ঘড়িতে ৬টা বাজ্‌ল। চারু চম্‌কে উঠে বলল "ঐ দেখ তোমার সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল।—টিল্‌ উই মিট্‌ এগেন্‌ ডার্লিং।" চারু যখন শেষ সিঁড়িতে নেবে এসেছে ওপর থেকে মীরা বলে উঠল, "বলতে হবে কিন্তু।"

রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। চারুর পায়ের শব্দ পেয়ে মীরা তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেবে, চারুর সামনে এসে বল্‌ল—"কি হল বল।"

মেসনদের সম্বন্ধে সমস্ত কথা জান্‌বার জন্যে তার মন ছট্‌ফট্‌ করছিল। বই-এর পাতায় সে ঐ বিষয়ের অনেক কথাই পড়েছে, কিন্তু সেগুলো সব সত্যি কিনা জান্‌বার জন্যে তার মন আকুল হয়ে উঠেছিল। কত অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা করে সে সমস্ত সন্ধ্যাটি কাটিয়েছে। তাই চারু ঘরে ঢুকতেই তার যেন আর দেরি সহ্য হল না।

চারুর কিন্তু সে রকম কোনোই ভাব দেখা গেল না। সে দিব্য গদাই লস্করী চালে কোটটি পাট করে একটা চেয়ারের উপর ফেলে, বেশ ভালো করে ধুতিখানি পরে বল্‌ল—"চল শুতে যাই, রাত ত বড়ো কম হয় নি।"

এই অল্প সময়টুকু মীরার যে কি করে কেটেছে, তা ভগবানই জানেন। তার ধারণা ছিল কাপড় ছাড়া হলেই চারু সব বলবে। এত বড়ো একটি ব্যাপার তার কাছ থেকে কি লুকিয়ে রাখতে পারে?

মীরা এবার প্রায় কেঁদে উঠেই বল্‌ল—"তাহলে বলবে না আমায়?" চারু বিরক্ত হয়ে বল্‌ল,—"কি জ্বালা! আমি কি তোমার কাছে হলপ্‌ করেছিলাম বলব? আর বল্‌বই বা কি। লজ-এর কথা কাকেও বলতে নেই এ ত তোমায় হাজারবার বলেছি। সে যে সিক্রেট।"

"কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছু লুকোচুরি থাকা উচিত নয়। তুমি ত একদিন বলেছিলে 'আমার যা কিছু গোপনীয় বিষয় তার ওপর তোমার অধিকার রইল, আর তুমিও আমায় সব বোলো।' আমি ত তোমায় সবই বলেছি। এখন তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রাখ।"

চারু একটা হাই তুলে তুড়ি দিতে দিতে বল্‌ল,—"নাঃ আজ আর ঘুমোতে দেবে না দেখ্‌ছি।" তারপর পাঁচমিনিটের মধ্যেই নাকডাকার শব্দে স্ত্রীর কান্নাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হল।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে কিন্তু কোথায় যেন একটু গরমিল ঠেকছিল, সেটা চারু ঠিক্‌ ধরতে পারছিল না। তাদের সামনে টোস্ট, ডিম, কেক্‌, চা সবই ঠিক রয়েছে, দুজনেই খাচ্ছে, কিন্তু খাওয়াটা যেন সব দিনের মতো হচ্ছে না। মীরার মাথাটা চায়ের পেয়ালা থেকে আর ওঠে না। যদিও বা ওঠেও অন্য সব দিকে ফেরে শুধু চারুর দিক্‌ ছাড়া। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কিছু বুঝতে না পেরে, কিংবা একটু বুঝে চারু বল্‌ল—"দেখ পেলিটি থেকে আর কেক্‌ আনিও না কেস্‌ল্‌এজো থেকেই আনিও।" মীরা ছোট্ট একটি ঘাড় নাড়ল, তারপরই সব চুপ। চারু বল্‌ল—"উঃ চা-টা কি ষ্ট্রং হয়েছে।" মীরা চায়ের পেয়ালায় খানিক দুধ ঢেলে দিয়ে নিজের মনে খেয়ে যেতে লাগ্‌ল।

চা খাওয়া শেষ হলেই মীরা নিজেই চায়ের পাতা দিয়ে টি সেট্‌টা পরিষ্কার করতে বসে গেল। চারু বল্‌ল, "চল কাগজ পড়িগে।" এই সময়টা দুজনে একটু পড়াশুনা করে। মীরা কোনোই উত্তর দিল না, নিজের মনে বাটি ঘস্‌তে লাগ্‌ল। চারু আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটু বিরক্ত হয়ে বল্‌ল—"ওগো শুন্‌ছ?" ওগো যে কিছু শুন্‌ছে তা মনে হল না, অন্ততঃ তার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না।

এইভাবে সকালটা কাট্‌ল। কোর্টে যাবার পূর্বে চারুর খাবার সময় মীরা নিয়মমতো টেবিলের

কাছে এসে বস্‌ল। মোটে দুখানা চপ্ দিয়েছে বলে বয়কে ধম্‌কানও হ্‌ল, কিন্তু চারু কোনো কথা জিজ্ঞেস্ করে সাড়া পেল না।*

কোর্ট থেকে ফিরে জামা কাপড় ছেড়ে চারু দেখ্‌ল মীরা একখানা থালায় ফল সাজিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। খুসী হয়ে সে বল্‌ল, "ওগো চল না আজ দুজনে একটু বেড়িয়ে আসি?" মীরা তেমনি তার নীরবতার ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে স্বামী বেচারাকে বেশ একটু কাহিল করে কোনো কাজে চলে গেল। চারু আপনার মনে বল্‌ল, "নাঃ মজালে দেখ্‌ছি।" সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস করেও মীরার সঙ্গে সন্ধির কোনো উপায়ই সে খুঁজে পেল না। রাত্রে শোবার সময়ও ঐ রকম ব্যবহার পেয়ে তার নাসিকাধ্বনির অনেকখানিই হ্রাস হয়ে গেল। তাবপর আরও চারদিন ঐ একই অবস্থা, বরং একটু খারাপ।

পাঁচদিনের দিন প্রায় মরিয়া হয়েই চারু মীবার হাত চেপে ধরে বল্‌ল—"দোহাই তোমার, একটা কথা বলো। যদি কিছু অন্যায় করে থাকি ত ক্ষমা কর।"

"উঃ লাগে, হাত ছাড়" বলে মীরা পালাবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল।

যাক্ কথা বলেছে। আরামেব নিশ্বাস ফেলে চারু মীবার চুলের মধ্যে বিলি কেটে দিয়ে আদর করে ডাক্‌ল, "মীবি মীরণ।" মীবা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্‌ল—"ঢেব হয়েছে আর অত সোহাগ দেখাতে হবে না।"

চারু বল্‌ল, "মীবা আজ এক সপ্তাহ আমার যে কি কবে কেটেছে তা যদি জানতে যদি বুঝতে..."

মীরা বল্‌ল, "আর আমার বুঝি বড়ো সুখে কেটেছে?"

চারু তাকে বুকেব কাছে টেনে নিয়ে বল্‌ল, "দেখ ত মিছিমিছি আমবা কত কষ্ট পাচ্ছি।"

মীরা চারুর গলা জড়িয়ে বল্‌ল, "বলবে বলো।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চারু বল্‌ল,—"দি ওল্ড ষ্টোরি। ও যে হতে পারে না মীবা।"

"কেন হতে পাবে না? তুমি ত প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমাব কাছ থেকে কোনো কথা লুকিয়ে রাখবে না। আর আমিও ত কিছু লুকোই নি। এই যে সেদিন মিস্ লাহিড়ী ও মিঃ বোনার্জ্জির ছোটো ভাই লুকিয়ে এনগেজমেন্ট কবল, আমি ছাড়া আর কেউ জান্‌ত না, কিন্তু তোমাকে ত সেইরাত্রেই বলেছি। তারা আমায় কত মানা কবেছিল। আমি ভাবলাম তোমাকে বলব তাতে আব দোষ কি?"

চারু একখানা ইজি চেয়াবে শুযে পড়ে বল্‌ল, "তা সত্যি। কিন্তু মীবা, যদি বাইরেব লোক ঘুণাক্ষরেও টের পায় আমি তোমায বলেছি তাহলে কিন্তু ..."

মীরা বল্‌ল "আমি কি এমনি বোকা?"

চারু সোজা হয়ে বসে বল্‌ল—"আচ্ছা শোন তবে—প্রথমে একটা হল পার হয়েই যে ঘরটায় আমি এলাম, সেখানে সাঁইত্রিশ জন লোক। তাদেব 'ভাই' বলে। ধপ্ ধপে সাদা সাটিনের ইজার আর টক্‌টকে লাল জামা পরে ঘরের দুধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আমায় অভ্যর্থনা করল। আর ঐ সাঁইত্রিশ জন ভাই-এর কপালে ...। মীরা ক্ষমা কর, আমি আর পারব না।"

মীরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌ল, "তা আগে বললেই হত। আমায় আশা দিয়ে নিরাশ করবার দরকার কি ছিল?"

চারু তার হাত দুটি ধরে বলল, "রাগ করো না মীরা, কি জান, একটা মস্ত বড়ো প্রতিজ্ঞা করে ভাঙছি বলে মনটা দুর্বল হয়ে পড়েছে।"

মীরা বল্‌ল "আমার কাছে যদি কোনো লুকান কথা বল তাহলে সেটা মোটেই দোষের হয় না। তুমি আর আমি কি এক নই?"

চারু এবার অনেকটা সংযত হয়ে বলতে লাগ্‌ল, "সেই সাঁইত্রিশ জন ভাইয়ের কপালের বাঁদিকে একটা করে রূপোর তারা ঝুলছে—আর—।" চারুর কথা শেষ হবার পূর্বেই মীরা বলে উঠল,—

"তুমি কি বলতে চাও মিঃ বোনার্জি তাঁর কালো পিপেটির মতো বপুখানি সাদা আর লাল সাটিনে ঢেকে কপালে তারা ঝুলিয়ে ...?" বলেই সে চীৎকার করে হেসে উঠ্‌ল।

চারু খুব গম্ভীর হয়ে বল্‌ল—"মীরা তুমি এত বড়ো একটা গুরুতর কথা নিয়ে হাস্‌ছ দেখে আমার যে কি মনে হচ্ছে তা তোমায় বোঝাতে পারি না। লজ-এর সাংকেতিক কথা নিয়ে এমন করে হাসাটা অন্ততঃ তোমার পক্ষে শোভা পায় না।"

"না, না, আর হাস্‌ব না। তুমি বল।—কিন্তু বোনার্জির গায়ে লাল জামা।" বলে মুখে কাপড় গুঁজে মীরা হাসি থামাতে চেষ্টা করতে লাগ্‌ল।

"তারপর সকলে একসঙ্গে ডানহাতের একটা আঙুল ওপরকার ঠোঁটের ওপর রাখল।" মীরা বল্‌ল, "ওঃ ওটা তোমাদের মেসনিক সাইন্‌; আমি কিন্তু বাবার সঙ্গে মিঃ গ্রিমস্বর বাড়ি টিপার্টিতে গিয়ে দু-একজন সাহেবকে ওরকম করতে দেখেছি। তখন মনে করেছিলাম হয়ত ওদের গোঁপ কামাতে গিয়ে কেটে গেছে, তাই হাত বুলাচ্ছে।"

চারু বল্‌ল—"পাগল কোথাকার, তা নয়। ওর মানে একজন মেসন্‌ আর একজন মেসন্‌কে লুকিয়ে নমস্কার করছে, বুঝলে; তারপর আমাকে লজ-এর সেই বিশেষ ঘরটিতে নিয়ে গেল। মীরা...।"

"লক্ষ্মীটি তোমার দুটি পায়ে পড়ি যা বল্‌ছিলে তা বলে ফেল।—বল্‌বে না? লক্ষ্মীটি।"

"সেই ঘরের দেওয়ালের ওপর সৌরমণ্ডল আঁকা ছিল। তার চারধারে অতি সূক্ষ্ম একটি আলোক-রেখা-বেষ্টনীও আঁকা ছিল। এই রেখা-বেষ্টনী ধরেই সৌরমণ্ডল বছরের পর বছর নিজেদের গন্তব্য পথে চল্‌তে থাকে। সেই বেষ্টনীটিকে দেখতে পাবার একটি সহজ উপায় তাঁরা আমায় বলে দিলেন। ঘরের ভিতর বিনা আলোয় সেটিকে দেখ্‌তে পেলে তবে সাঁইত্রিশ মাসের পর শুধু চোখে আকাশের গায়ের রেখাটিও দেখ্‌তে পাব। অন্য বিষয়ের উপদেশ পরের সপ্তায় পাব। আর কিছু জানতে পারিনি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে।"—

মীরা চারুর মুখে হাত চাপা দিয়ে বল্‌ল, "থাক প্রতিজ্ঞার কথা আর বল্‌তে হবে না, অনেক রাত হয়েছে শোবে চল।"

"কিন্তু মীরা প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলাম না বলে আমার বুকের ভিতরটা যা করছে।"

মীরা মনে মনে বল্‌ল "মিসেস্‌ বোনার্জি, চাটার্জি, মজুমদার, এরা কেউ জানে না। শুধু আমি জানি। ওঃ আমার বুকের ভিতরটা যা করছে।"

সকাল বেলাই মিসেস্‌ মজুমদার চিঠি পেলেন,—মীরা লিখেছে :—"ভাই প্রতিমা, তুমি আজ অতি অবিশ্যি দুপুরে আমার বাড়ি এসো। বড়ো গোপনীয়, বড়ো দরকারী কথা আছে। নিশ্চয় নিশ্চয় এসো।"

ঠিক বেলা সাড়ে বারোটার সময় মিসেস মজুমদারের গাড়ি চারুদের ফটকে ঢুক্‌ল। মীরা একরকম ছুটে গিয়েই প্রতিমার ঘাড়ে পড়ে বল্‌ল—"জান ভাই প্রতিমা?" তারপর দশ মিনিটের মধ্যেই মীরার গোপনীয় কথা প্রতিমাকে সব বলা হয়ে গেল। দুজনেই একমত হয়ে রায় দিল,—"কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, ও লজটজের সিক্রেটের কোনো ভ্যালুই নেই।—কিন্তু বোনার্জির গায়ে লাল জামা, আর কপালে তারা, ভারি ইন্টারেস্টিং।" দুজনেই খুব হাস্‌তে লাগ্‌ল। প্রতিমা বল্‌ল, "তাহলে আসি ভাই, কাজ আছে।" মীরা তাকে বিদায় দিয়ে বল্‌ল, "দেখ ভাই কাকেও বলো না যেন, তাহলে ওঁর বড়ো অপমান হবে।" জিভ কেটে প্রতিমা বল্‌ল—"তাও কি হয়?"

গাড়িতে উঠেই প্রতিমা কোচ্‌ম্যান্‌কে বল্‌ল,—"চ্যাটার্জি সাবকা কোঠি।" বেশি নয়—ঘন্টা তিনেকের মধ্যে কতকগুলি বিখ্যাত বঙ্গনারী মেসনিক্‌ লজ্‌ সম্বন্ধে বিনা আয়াসেই অনেক কথা জেনে ফেল্‌লেন।

একদিন চারু কোর্ট থেকে ফিরে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বল্‌ল,—"মীরা।" ঐ মীরা কথাটা এমন ভাবে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, যেন ঐ কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার সুখ দুঃখ আশা ভরসা সমস্তই শেষ হয়ে গেল।

ভয় পেয়ে মীরা বল্‌ল, "কি হয়েছে? অমন করছ কেন?" চারু তেমনি ভাবেই বল্‌ল, "মীরা তুমি আমার স্ত্রী?" তারপর নির্জীবের মতো একটা চেয়ারে বসে পড়ে দুই হাতে মাথা টিপে ধরল। মীরা কাতর হয়ে বল্‌ল, "কি হয়েছে বল্‌বে না?" চারু খুব জোরে নিশ্বাস টেনে সেটা ছাড়তে ছাড়তে বল্‌ল,—"বলবার আর কিছুই নেই মীরা।"

"ওগো দোহাই তোমার, সব খুলে বল। কি হয়েছে?"

"একটু একলা থাক্‌তে চাই মীরা। আহা আজকের এই রাত্রি যদি অনন্ত রাত্রি হয়, দিনের আলো যদি আর না ফোটে, তাহলে আমার এই কালো মুখ এই অন্ধকারের মধ্যে রেখে হয়ত একটু নিশ্চিন্ত হতে পারি। কিন্তু তা হবে কি? ওঃ। ঠিক কাল ৬টার সময় আবার সূর্য উঠ্‌বে, আমার মুখের ওপর দিনের আলো পড়বে। আর লক্ষ লক্ষ লোক আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌বে—ঐ সেই বিশ্বাসঘাতক। ওঃ মীরা।"

স্বামীর মুখের ওপর মুখ রেখে মীরা বল্‌ল, "তোমার পায়ে পড়ি, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

চারু তাকে দুই হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে হঠাৎ ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠ্‌ল—"কি হয়েছে? জান না কিছু? কতশত বছর ধরে মানুষ যে কথাটি প্রাণপণে নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল, সেই কথাটি সেই পবিত্র কথাটি, আজ এই বিংশ শতাব্দীর একজন নব্য বাঙালী ব্যারিষ্টারের মুখ দিয়ে রাষ্ট্র হয়ে গেল। তার আর স্ত্রী . . .!"

"কিন্তু আমি ত কেবল প্রতিমাকে বলেছিলাম।"

"প্রতিমাকে বলেছিলে? তুমি নিজে যে কথা মনে চেপে রাখ্‌তে পার না, কি ক'রে আশা কর অন্যে সেই কথাটা চেপে রাখ্‌বে মীরা?" মীরা চারুর পা দুটি জড়িয়ে ধরে বল্‌ল, "চল আমাকে তোমাদের লজ-এ নিয়ে। আমি সবাই-এর সাম্‌নে আমার দোষ স্বীকার করে নেব।"

"এবং তোমার স্বামীর মুখে চুণকালি আর একটু বেশি করে মাখিয়ে দেবে। মীরা, তোমার স্বামীর গোপনকথার ওপর তোমার অধিকার আছে একদিন বলেছিলে, কিন্তু স্বামীর মান ইজ্জৎ তোমারও মান ইজ্জৎ তা কি একবারও ভেবেছিলে?"

মীরা আকুল হয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। চারু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌ল, "কেঁদে কোনো লাভ নেই মীরা। অবশ্য এ কথাটা লজ-এর মেম্বররা সকলেই অস্বীকার করবে। তবে . . .।"

"আমাকে শাস্তি দাও। ওগো আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমায় মেরে ফেল।"

কেঁদে কেঁদে মীরা ঘুমিয়ে পড়েছে। চারু আস্তে আস্তে ড্রেসিং রুমে ঢুকে আলো জ্বেলে আরসিতে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে কুটিপাটি হতে লাগল। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বল্‌ল—"ওয়েল প্লেড ওল্ড বয়। আমার দেখ্‌ছি ব্যারিষ্টার না হয়ে এ্যাকটর হওয়াই উচিত ছিল।" তারপর অনেকদিন পরে দিব্য আরামে আর একবার নাক ডাকার শব্দে ঘরটিকে কাঁপিয়ে তুল্‌ল।

সকালে চা খাওয়ার পর চারু বল্‌ল, "মীরা, তুমি একটু বোস। আমি লজ্-এর গ্রাণ্ড মাষ্টারের কাছে ফোন করে আমার দোষ স্বীকার করি।" আফিস রুমে ঢুকে রিসিভারটা কানে তুলে নিয়ে হাঁক দিল—"নাইন্ নট্ নট্ নাইন্ প্লিজ।" তারপরই "হ্যালো ডার্ট" "হ্যালো মজুমদার" বলে দুজনে সম্ভাষণ করার পর মজুমদার হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল—"বলি ব্যাপারটা কি হে? তোমার স্ত্রীকে কি সব ছাইভস্ম বলেছ? তিনি আবার তাই আমার স্ত্রীকে বলেছেন। সে ত আজ দুদিন খাওয়া দাওয়া ছেড়ে কেবল এর তার বাড়ি করে বেড়াচ্ছে। কাল দুপুরে তাকে গাড়ি দিইনি বলে একখানা ঘড়্‌ঘড়ে

ছেকড়া গাড়ি করে এই রোদে বেরিয়ে পড়্‌ল। তোমার কথা জনকতক সাহেব মেসন্‌কে বলেছিলাম, তারাও তোমার খুব প্রশংসা করলে। বলে, এত সহজে মিঃ ডাট্‌ নিষ্কৃতি পেলেন। আমাদের হিংসে হচ্ছে। আমাদের আজও ভুগ্‌তে হচ্ছে।"

চারু বল্‌ল—"কি করি বল ভাই। নাচার হয়েই ওটা করতে হয়েছে। যা চুপ মন্ত্র ছেড়েছিল। বাপ! আমার ত দম বন্ধ হবার জোগাড়। শেষে এই মত্‌লব মাথায় আসে। তাকে জানিয়েছি আমার দ্বারা যে লজ্‌-এর সিক্রেট্‌ ফাঁস হয়ে গেছে তা সকলেই জান্‌তে পেরেছে। শুনে ভয়ে ত বেচারী আধমরা। খুব এক চোট্‌ চান্‌কে নিয়েছি। ইন্‌কুইজিটিভনেস ডিজিজের এ্যান্‌টিডোট্‌টা ধরেছে ভালো।"

মীরাকে এসে চারু বল্‌ল, "ওরা আমার দোষ ক্ষমা করতে রাজি হয়েছে। তবে কিছু পেনাল্‌টি দিতে হবে এই যা। তা তুমি কিছু ভেবো না মীরা।"

মীরা তার কৃতজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে স্বামীর মুখখানা একবার ভালো করে দেখে নিল।

"বঙ্গবাণী"· ভাদ্র ১৩৩৩

কিন্নরদল

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাড়াটায় ছ'সাত ঘর ব্রাহ্মণের বাস মোট। সকলের অবস্থাই খারাপ। পরস্পরের কাছে পরস্পরের ধারধোর করে এরা দিন গুজরান করে। অবিশ্যি কেউ কাউকে ঠকাতে পারে না, কারণ সবাই বেশ হুঁসিয়ার। গরীব বলেই এরা বেশী কুচুটে ও হিংসুক, কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না, বা কেউ কাউকে বিশ্বাসও করে না।

পূর্বেই বলেছি, সকলের অবস্থা খারাপ, এবং খানিকটা তার দরুণ, খানিকটা অন্য কারণে সকলের চেহারাও খারাপ। কিশোরী মেয়েদেরও তেমন লালিত্য নেই মুখে, ছোট ছোট ছেলেরা এমন অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকে এবং এমন পাকা পাকা কথা বলে যে তাদের আর শিশু বা বালক বলে মনে হয় না। কাব্যে বা উপন্যাসে যে শৈশবকালের কতই প্রশস্তি পাঠ করা যায়, মনে হয় সে সব এদের জন্যে নয়, এরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে একেবারে প্রবীণত্বে পা দিয়েছে।

পাড়ায় একঘর গৃহস্থ আছে, তারা এখানে থাকে না, তাদের কোঠাবাড়িটা চাবি-দেওয়া পড়ে আছে আজ দশ-বারো বছর। এদের মস্ত বড় সংসার ছিল, এখন প্রায় সবই মরে-হেজে গিয়ে প্রায় পাঁচটি প্রাণীতে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির বড় ছেলে পশ্চিমে চাকুরি করে, মেজ ছেলে কলেজে পড়ে কলকাতায়, ছোট ছেলেটি জন্মাবধি কালা ও বোবা—পিসিমার কাছে থেকে অন্ধ-বধির বিদ্যালয়ে পড়ে। বড় ছেলে বিবাহ করেনি, যদিও তার বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হয়েছে; সে নাকি বিবাহের বিরোধী, শোনা যাচ্ছে যে এমনিভাবেই জীবন কাটাবে।

পাড়ার মধ্যে এরাই শিক্ষিত ও সচ্ছল অবস্থার মানুষ। সেজন্যে এদের কেউ ভালো চোখে দেখে না, মনে মনে সকলেই এদের হিংসে করে এবং বড় ছেলে যে বিয়ে করবে না বলছে, সে সংবাদে পাড়ার সবাই পরম সন্তুষ্ট। যখন সবাই ছোট ও গরীব, তখন একঘর লোক কেন এত বাড় বাড়বে? বড় ছেলে বিয়ে করলেই ছেলেমেয়ে হয়ে জ্বাজ্বল্যমান সংসার হবে দুদিন পরে, সে কেউ সহ্য করতে পারবে না। মেজ ছেলে মোটে কলেজে পড়ছে, এখন সাপ হয় কি ব্যাঙ হয়

তার কিছু ঠিক নেই, তবে বিষয়ে দুশ্চিন্তার এখনও কারণ ঘটেনি, তার বয়েসও বেশী নয়।

মজুমদার-বাড়িতে ভাঙা রোয়াকে দুপুরে পাড়ার মেয়েদের মেয়ে-গজালি হয়। তাতে রায়-গিন্নী, মুখুজ্জে-গিন্নী, বোস-গিন্নী, চক্কত্তি-গিন্নী প্রভৃতি তো থাকেনই, পাড়ার অল্পবয়সী বৌয়েরা ও মেয়েরাও থাকে। সাধারণত যে সব ধরনের চর্চা এ মজলিসে হয়ে থাকে, তা শুনলে নারীজাতি সম্বন্ধে লিখিত নানা সরস প্রশংসাপূর্ণ বর্ণনার সত্যতার সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ যাঁর উপস্থিত না হবে, তিনি নিঃসন্দেহে একজন খুব বড় ধরনেব অপ্‌টিমিস্ট।

আজ দুপুরে যে বৈঠক বসেছে, তাতে আলোচিত বিষয়গুলি থেকে মোটামুটি প্রতিদিনের আলোচনা ও বিতর্কের প্রকৃতি অনুমান করা যেতে পারে।

বোস-গিন্নী বলছিলেন ঃ আর বাপু, দিচ্ছি তো রোজই, আমার গাছের কাঁঠাল খেয়েই তো মানুষ। আমাদের কাঁঠাল যখন পাড়ানো হয়, ছেলে-মেয়েগুলো হ্যাংলার মতো তলায় দাঁড়িয়ে থাকে—ঘেয়ো কি ভুয়ো এক-আধখানা যদি থাকে তো বলি, যা নিয়ে যা। তোদের নেই, যা খেগে যা। তা কি পোড়ার মুখে কোনোদিন সুবাক্যি আছে? ওমা, আজ আমাব মেয়ে দুটো নেবু তুলতে গিয়েছে ডোবার ধারের গাছেব, তো বলে কি না বোজ রোজ নেবু তুলতে আসে, যেন সরকারী গাছ পড়ে রয়েছে আর কি—চব্বিশ ঝুড়ি কথা শুনিয়ে দিলে মন্টুর মা। আচ্ছা বল তো তোরাই—

মন্টুর মা—যাঁকে উদ্দেশ করে একথা বলা হচ্ছিল, তিনি এদের এই মজলিসে কেবল আজই অনুপস্থিত আছেন, নইলে রোজই এসে থাকেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে সবাই তাঁর চালচলন, ধরনধারণ, রীতিনীতির নানারূপ সমালোচনা করলে।

প্রিয় মুখুজ্জের মেয়ে শান্তি—ষোল-সতেরো বছরের কুমারী—তাব মায়ের বয়সী মন্টুর মা-র সম্বন্ধে অমনি বলে বসল, ওঃ, সে কথা আর বোলো না খুড়িমা, কি ব্যাপক মেয়েমানুষ ঐ মন্টুর মা। ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখেছি, অমন লঙ্কাপোড়া ব্যাপক যদি কোথাও দেখে থাকি। ক্ষুরে নমস্কার, বাবা-বাবা।

ছোট মেয়ের ঐ জ্যাঠামি কথার জন্যে তাকে কেউ বকলে না বা শাসন কবলে না, বরং কথাটা সকলেই উপভোগ করলে।

তাবপর কথাটার স্রোত আরও কতদূর গড়াত বলা যায় না এমন সময় রায়বাড়ির বড়বৌ হঠাৎ মনে-পড়ার ভঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ, একটা মজার কথা শোননি বুঝি। শ্রীপতি যে বিয়ে করেছে। বট্‌ঠাকুরের কাছে চিঠি এসেছে, শ্রীপতির মামা লিখেছে।

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, শ্রীপতি বিয়ে করেছে!

তারপর সকলেই একসঙ্গে নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগল।

—কোথায়, কোথায়?

—কবে চিঠি এল?

—তবে যে শুনলাম শ্রীপতি বিয়ে করবে না বলেছে!

শ্রীপতির বিয়ের খবরে অনেকেই যেন একটু দমে গেল। খবরটা তেমন শুভ নয়। কারো উন্নতির সংবাদ এদের পক্ষে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা অসম্ভব। তাদের যখন উন্নতি হল না তখন অপরের উন্নতি হবে কেন? কিন্তু এর পরেই রায়-বৌ মুখ টিপে হেসে আস্তে আস্তে বললেন, বৌটি নাকি বামুনের মেয়ে নয়।—সকলে খাড়া হয়ে সটান উঠে বসল, তাদের মনমরা ভাবটা এক মুহূর্তে গেল কেটে। একটা বেশ সরস ও মুখরোচক পরনিন্দা ও ঘোঁটের আভাস এরা পেলে রায়বৌয়ের চাপা ঠোঁটের হাসি থেকে।

শান্তি উৎসুক চোখে চেয়ে হাসিমুখে বললে, ভেতরে তাহলে অনেকখানি কথা আছে।

বোস-গিন্নী বললেন, তাই বল। নইলে এমনি কোথা কিছু নয় শ্রীপতি বিয়ে করলে এ কি কখনো

হয়। কি জাত মেয়েটা? হিঁদু তো?

অর্থাৎ তা হলে রগড়টা আরও জমে।

রায়-বৌ বল্লেন, হিঁদুই—মেয়েটা বদ্দির বামুন।

এদেশে বৈদ্যকে বলে থাকে 'বদ্দির বামুন'—এ অঞ্চলের ত্রিসীমানায় বৈদ্যের বাস না থাকায় বৈদ্যজাতির সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে এদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কারো বিশ্বাস ব্রাহ্মণের পরেই বৈদ্যের সামাজিক স্থান, তারা এক প্রকারের নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণ, তার চেয়ে নিচু নয়—আবার কারো বিশ্বাস তাদের স্থান সমাজের নিম্নতর ধাপের দিকে।

শান্তি বললে, বৌয়ের বয়েস কত?

—ওঃ, তা অনেক। শুনেছি চব্বিশ-পঁচিশ—

সকলে সমস্বরে আবাব একটা বিস্ময়েব বোল তুললে। চব্বিশ-পঁচিশ বছব পর্যন্ত মেয়ে আইবুড়ো থাকে ঘরে। এ আবাব কোথাকার ছোট জাত! রামো, ছিঃ—

শান্তির মা বললেন, তা হলে মেয়ে আর নয়, মাগী বল। পাঁড় শসা—বাপ-মা বুঝি ঘবে বীজ রেখেছিল।

কে একজন মুখ টিপে হেসে বললেন, বিধবা না তো?

চক্কত্তি-গিন্নী বললেন, আগেব পক্ষেব ছেলে-মেয়ে কিছু আছে নাকি মাগীব!

একথায শান্তিই আগে মুখে আঁচল দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল—তাবপব বাকি সকলে তার সঙ্গে যোগ দিলে। হ্যাঁ, এটা একটা নতুন ও ভাবী মজাব খবব বটে। মেয়ে-গজালিব কিছুদিনেব মতো খোরাক সংগ্রহ হল। আমচুরি-কাঁঠালচুরির গল্প একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল।

ঠিক পরের দিনই এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপাব ঘটল। শ্রীপতির মেজো ভাই উমাপাত গাঁয়ে এসে বাড়ির চাবি খুলে লোক লাগিয়ে ঘরদোব পরিষ্কার কবতে লাগল। তাব দাদা বৌদিদিকে নিয়ে শিগগির আসবে এবং কিছুদিন নাকি গাঁয়েই বাস কববে। বৌদিদি পাড়াগাঁ কখনো দেখেন নি—গ্রামে আসবার তাঁর খুব আগ্রহ। তার দাদাও কলকাতায বদলি হবাব চেষ্টা কবছে।

মেয়ে-মজলিসে সবাই তো অবাক। শ্রীপতি কোন মুখে অজাতেব বউ নিয়ে গাঁয়ে এসে উঠবে! মানুষের একটা লজ্জা-সরমও তো থাকে, করেই ফেলেছিস না হয একটা অকাজ। এ সব কি খিরিষ্টানি কাণ্ডকারখানা, কালে কালে হল কি! আর সে ধিঙ্গি মাগীটারই বা কি ভরসা! যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-পাড়ায় বিয়ের বৌ সেজে সে কোন সাহসেই বা আসবে।

শ্রীপতি অবিশ্যি বৌ নিয়ে পৈতৃক বাড়িতে আসার বিষয়ে এঁদের মত জিজ্ঞাসা করে নি। একদিন একখানা নৌকা এসে গ্রামের ঘাটে দুপুরের সময় লাগল এবং নৌকা থেকে নামলে শ্রীপতি, তাব নব বিবাহিতা বধূ, একটি ছোকরা চাকর ও দুটি ট্রাঙ্ক ও একটা বড় বিছানাব মোট, একটা ঝুড়িবোঝাই টুকিটাকি জিনিস। ঘাটে দু-একজন যারা অত বেলায় স্নান করছিল তারা তখুনি পাড়ার মধ্যে গিয়ে খবরটা সবাইকে বললে। তখন কিন্তু কেউ এল না, অত বেলায় এখন শ্রীপতিদের বাড়ি গেলে তাদের খেতে বলতে হয়। অসময়ে এখন এসে তারা রান্নাবান্না চড়িয়ে খাবে, সেটা প্রতিবেশী হয়ে হতে দেওয়া কর্তব্য নয় কিন্তু সে ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে করবার চেয়ে এখন না যাওয়াই বুদ্ধির কাজ।

কিন্তু রাসু চক্কত্তি আর প্রিয় মুখুজ্যের বাড়ির মেয়েরা অত সহজে রেহাই পেলেন না। শ্রীপতি নিজে গিয়ে একেবারে অন্তঃপুরের মধ্যে ঢুকে বললে, ও-পিসিমা, ও-বৌদি, আপনারা আপনাদের বৌকে হাত ধরে ঘরে না তুললে কে আর তুলবে? আসুন সবাই।

বাধ্য হয়ে কাছাকাছির দু'তিন বাড়ির মেয়েরা শাঁক হাতে, জলের ঘটি হাতে নতুন বৌকে ঘরে তুলতে এলেন—খানিকটা চক্ষুলজ্জায়, খানিকটা কৌতূহলে। মজা দেখবার প্রবৃত্তি সকলের মধ্যেই

আছে। ছোটবড় ছেলেমেয়েও এল অনেকে, শান্তি এল, কমলা এল, সরলা এল।

শ্রীপতিদের বাড়ির উঠোনে লিচুতলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দূর থেকে মেয়েটির ধপধপে ফর্সা গায়ের রঙ ও পরনের দামী সিল্কের শাড়ি দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। সামনে এসে আরও বিস্মিত হবার কারণ ওদের ঘটল মেয়েটির অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী দেখে। কি ডাগর-ডাগর চোখ। কি সুকুমার লাবণ্য সারা অঙ্গে! সর্বোপরি মুখশ্রী—এমন ধরনের সুন্দর মুখ এসব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনো দেখেনি।

সকলে আশা করেছিল গিয়ে দেখবে কালোকোলো একটা মোটামতো মাগী আধ-ঘোমটা দিয়ে উঠোনেব মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্যাটপ্যাট করে চেয়ে রয়েছে ওদের দিকে। কিন্তু তার পরিবর্তে দেখলে এক নম্রমুখী সুন্দরী তরুণী মূর্তি . . .। মুখখানি এত সুকুমার যে মনে হয় ষোল-সতেরো বছরের বালিকা।

বিকেলে ওপাড়াব নিতাই মুখুজ্জেব বৌ ঘাটের পথে চক্কত্তি-গিন্নীকে জিগ্যেস কবলেন ঃ

কি দিদি, শ্রীপতির বৌ দেখলে নাকি? কেমন দেখতে?

চক্কত্তি-গিন্নী বললেন, না, দেখতে বেশ ভালোই—

চক্কত্তি-গিন্নীর সঙ্গে শান্তি ছিল, সে হাজাব হোক ছেলেমানুষ, ভালো লাগলে পবেব প্রশংসার বেলায সে এখনও কার্পণ্য কবতে শেখেনি, সে উচ্ছ্বসিত সুবে বলে উঠল, চমৎকার, খুড়িমা একবার গিয়ে দেখে আসবেন, সত্যিই অদ্ভুত ধবনেব ভালো।

নিতাই মুখুয্যেব বৌ পবের এতখানি প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন না—বুঝতে পারলেন না শান্তি কথাটা ব্যঙ্গের সুরে বলছে, না, সত্যিই বলছে। বললেন, কি রকম ভালো?

এবার চক্কত্তি-গিন্নী নিজেই বললেন, না বৌ, যা ভেবেছিলাম, তা নয়। বৌটি সত্যিই দেখতে ভালো। আব কেনই বা হবে না বল, শহবেব মেয়ে, দিনবাত সাবান ঘসছে, পাউডাব ঘসছে, তোমার আমার মতো রাঁধতে হত বাসন মাজতে হত তো দেখতাম চেহারাব কত জলুস বজায় থাকে।

এই বয়সে তো দূবের কথা, তাঁর বিগত-যৌবন দিনেও অজস্র পাউডার ও সাবান ঘসলে যে কখনো তিনি শ্রীপতিব বৌয়েব পায়ের নখের কাছেও দাঁড়াতে পাবতেন না—চক্কত্তি-গিন্নী সম্বন্ধে শান্তিব এ কথা মনে হল। কিন্তু চুপ করে রইল সে।

বিকেলে এপাড়ার ওপাড়ার মেয়েরা দলে দলে বৌ দেখতে এল। অনেকেই বললে, এমন রূপসী মেয়ে তাবা কখনো দেখেনি। কেবল হবিচরণ রায়েব স্ত্রী বললেন, আর-বছর তারকেশ্বরে যাবার সময় ব্যাণ্ডেল স্টেশনে তিনি একটি বৌ দেখেছিলেন, সেটি এর চেয়েও রূপসী।

মেয়ে-মজলিসে পরদিন আলোচনার একমাত্র বিষয় দাঁড়াল, শ্রীপতির বৌ। দেখা গেল, তার রূপ সম্বন্ধে দুমত নেই সভ্যাদের মধ্যে, কিন্তু তার চরিত্র সম্বন্ধে নানারকম মন্তব্য অবাধে চলছে।

—ধরনধারণ যেন কেমন কেমন—অত সাজগোজ কেন রে বাপু?

—ভালো ঘবের মেয়ে নয়। দেখলেই বোঝা যায়—

—বাসন মাজতে হলে ও-হাত আর বেশীদিন অত সাদাও থাকবে না, নরমও থাকবে না—ঠ্যালা বুঝবেন পাড়াগাঁয়ের। গলায় লেকলেস ঝুলুতে আমরাও জানি—

—বেশ একটু ঠ্যাকারে। পাড়াগাঁয়ের মাটিতে যেন গুমরে পা পড়ছে না, এমনি ভাব। বামুনের ঘরে বিয়ে হয়ে ভাবছে যেন কি—

—তা তো হবেই, বদ্দির বামুনের মেয়ে, বামুনের ঘরে এয়েছে, ওর সাত পুরুষের সৌভাগ্যি না?

নববধূর স্বপক্ষে বললে কেবল শান্তি ও কমলা। শান্তি ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, তোমরা কারো ভালো দেখতে পার না বাপু। কেন ওসব বলবে একজন ভদ্দরলোকের মেয়ের সম্বন্ধে? কাল

বিকেলে আমি গিয়ে কতক্ষণ ছিলাম নতুন বৌয়ের কাছে। কোনো ঠ্যাকার নেই, অংখার নেই, চমৎকার মেয়ে।

কমলা বললে, আমাদের উঠতে দেয় না কিছুতেই—কত গল্প করলে, খাবার খেতে দিলে, চা করলে—আর খুব সাজগোজ কি করে? সাদা-সিদে শাড়ি-সেমিজ পরে তো ছিল। তবে খুব ফর্সা কাপড়-চোপড়—ময়লা একেবারে দু-চোখে দেখতে পারে না—

শান্তি বললে, ঘবগুলো এবই মধ্যে কি চমৎকাব সাজিয়েছে। আয়না, পিকচার, দোপাটিফুলের তোড়া বেঁধে ফুলদানিতে রেখে দিয়েছে—শ্রীপতিদার বাপেব জন্মে কখনো অমন সাজানো ঘরদোবে বাস করেনি—ভারি ফিটফাট গোছালো বৌটি—

দিন দুই পরে ডোবাব ঘাটে নববধূকে একরাশ বাসন নিয়ে নামতে দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। চারিদিকে বনে-ঘেরা ঝুপসি আধ-অন্ধকার ডোবাটা যেন মেয়েটিব স্নিগ্ধ রূপেব প্রভায় এক মুহূর্তে আলো হয়ে ওঠে, একথা যারা তখন ডোবাব অন্যান্য ঘাটে ছিল, সবাই মনে মনে স্বীকার করলে। দৃশ্যটাও যেন অভিনব ঠেকল সকলের কাছে। এমন একটা পচা এঁদো জঙ্গলে-ভবা পাড়াগেঁয়ে ডোবাব ঘাটে সাধারণত কালোকোলো, আধ-ময়লা শাড়িপরা শ্রীহীনা ঝি-বৌ বা ত্রিকালোত্তীর্ণা প্রৌঢ়া বিধবাদেব গামছা-পবিহিত মূর্তিই দেখা যায় বা দেখাব আশা কবা যায়— সেখানে এমন একটি আধুনিক ছাঁদে খোঁপা-বাঁধা, ফর্সা শাড়ি-ব্লাউজ-পবা, রূপকথাব বাজকুমাবীব মতো রূপসী, নব-যৌবনা বধূ সজনেতলাব ঘাটে বসে ছাই দিয়ে নিটোল সুগৌর হাতে বাসন মাজছে, এ দৃশ্যটা খাপ খায় না। সকলেব কাছে এটা খাপছাড়া বলে মনে হল। প্রৌঢাবাও ভেবে দেখলেন গত বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেনি এই ক্ষুদ্র ডোবাটাব ইতিহাসে।

রায়-পাড়ার একটি প্রৌঢ়া বললেন, আহা, বৌ তো নয়, যেন পিরতিমে— কিন্তু অত রূপ নিয়ে কি এই ডোবায় নামে বাসন মাজতে! না ও-হাতে কখনো ছাই দিয়ে বাসন মাজা অভ্যেস আছে! হাত দেখেই বুঝছি।

তারপর থেকে দেখা গেল ঘর-সংসারের যা কিছু শ্রীপতিব বৌ সব নিজেব হাতে করছে। ইতিমধ্যে শ্রীপতির কলকাতায় বদলি হবার খবর আসাতে সে চলে গেল বাড়ি থেকে।

পাড়ার মেয়েদের মধ্যে শান্তি ও কমলা শ্রীপতিব বৌয়ের বড় ন্যাওটা হয়ে পড়ল। সকাল নেই বিকেল নেই, সব সময়েই দেখা যায় শান্তি ও কমলা বসে আছে ওখানে।

পাড়াগাঁয়ের গরীব-ঘরের মেয়ে, অমন আদব কবে কেউ কখনো রোজ বোজ ওদেব লুচি-হালুয়া খেতে দেয়নি।

একদিন কমলা বললে, বৌদিদি, তোমার ঘরে কাপড়মোড়া ওটা কি?

শ্রীপতির বৌ বললে, ওটা এসরাজ—

—বাজাতে জান, বৌদি?

—একটুখানি অমনি জানি ভাই, কিন্তু এ্যাদ্দিন ওকে বার পর্যন্ত করিনি কেন জান, গাঁযে-ঘবে কে কি হয়তো মনে করবে।

শান্তি বলসে, নিজের বাড়ি বসে বাজাবে, কে কি মনে করবে? একটু বাজিয়ে শোনাও না, বৌদি?

একটু পরে রায়-গিন্নী ঘাটে যাবার পথে শুনতে পেলেন শ্রীপতির বাড়ির মধ্যে কে বেহালা না কি বাজাচ্ছে, চমৎকার মিষ্টি। কোনো ভিখিরী গান গাচ্ছে বুঝি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ শুনে তিনি ঘাটে চলে গেলেন।

ঘাটে গিয়ে তিনি মজুমদার-বৌকে বললেন কথাটা।

—ওই শ্রীপতির বাড়ি কে একজন বোষ্টম এসে বেহালা বাজাচ্ছে শুনে এলাম। কি চমৎকার

বাজাচ্ছে দিদি, দুদণ্ড দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছে করে।

দুপুরের মেয়ে-মজ্‌লিসে শান্তির মা বললেন, শ্রীপতির বৌ চমৎকার বাজাতে পারে এসরাজ না কি বলে, একরকম বেহালার মতো। শান্তিদের ওবেলা বাজিয়ে শুনিয়েছিল—

রায়-বৌ বললেন, ও। তাই ওবেলা নাইতে যাবার সময় শুনলাম বটে। সে যে ভারী চমৎকার বাজনা গো, আমি বলি, বুঝি কোনো ফকির-বোষ্টম ভিক্ষে করতে এসে বাজাচ্ছে!

এমন সময় শান্তি আসতেই তার মা বললেন, ওই জিজ্ঞেস কব না শান্তিকে।

শান্তি বললে, উঃ, সে আর তোমায় কি বলব খুড়িমা, বৌদিদি যা বাজালে জীবনে অমন কখনো শুনিনি—শুনবে তোমরা? তা হলে এখন বলি বাজাতে—বললেই বাজাবে।

শান্তি শ্রীপতিদের বাড়ি চলে যাবাব অল্প পবেই শোনা গেল শ্রীপতির বৌয়েব এস্রাজ বাজনা। অনেকক্ষণ কারো মুখে কথা রইল না।

চক্কত্তি-গিন্নী বললেন, আহা, বড় চমৎকার বাজায় গো!

সকলেই স্বীকার করলে শ্রীপতিব বৌকে আগে যা ভাবা গিয়েছিল, সেরকম নয়, বেশ মেয়েটি!

এস্রাজ বাজনাব মধ্যে দিয়ে পাড়ার সকলের সঙ্গে শ্রীপতির বৌয়ের সহজভাবে আলাপ-পরিচয় জমে উঠল। দুপুরে, সন্ধ্যায় প্রায়ই সবাই যায় শ্রীপতিদের বাড়ি বাজনা শুনতে।

তারপর গান শুনল সবাই একদিন। পূর্ণিমার বাতে জ্যোৎস্নাভবা ভেতর-বাড়ির রোয়াকে বসে বৌ এস্রাজ বাজাচ্ছিল, পাড়ার সব মেয়েই এসে জুটেছে। শ্রীপতি বাড়ি নেই।

কমলা বললে, আজ বৌদি একটা গান গাইতেই হবে—তুমি গাইতেও জান ঠিক—শোনাও আজকে—

বৌটি হেসে বললে, কে বলেছে ঠাকুরঝি যে আমি গাইতে জানি?

—না ওসব বাখ—গাও একটা—

সকলেই অনুরোধ কবলে। বললে, গাও বৌমা, এ পাড়ায় মানুষ নেই, আস্তে আস্তে গাও, কেউ শুনবে না—

শ্রীপতির বৌ একখানা মীরার ভজন গাইলে ঃ

রাণাজি, ম্যয় গিবিধর-কে ঘর যাঁউ
গিরিধর মহারা সাচে প্রিতম দেখত রূপ লুভাঁউ

গায়িকার চোখে-মুখে কি ভক্তিপূর্ণ তন্ময়তার শোভা ফুটে উঠল গানখানা গাইতে গাইতে—শান্তি একটা গন্ধরাজ আর টগরের মালা গেঁথে এনেছিল বৌদিদিকেই পরাবে বলে—গান গাইবার সময়ে সে আবার সেটা বৌয়ের গলায় আলগোছে পরিয়ে দিলে—সেই জ্যোৎস্নায় সাদা সুগন্ধি ফুলের মালাগলায় রূপসী বৌয়ের মুখে ভজন শুনতে শুনতে মন্টুর মা-র মনে হল এই মেয়েটিই সেই মীরাবাঈ, অনেককাল পরে পৃথিবীতে আবার নেমে এসেছে, আবার সবাইকে ভক্তির গান গাইয়ে শোনাচ্ছে।

মন্টুর মা একটু-একটু বাইরের খবর রাখতেন, যাত্রায় একবার মীরাবাঈ পালা দেখেছিলেন তাঁর বাপের বাড়ির দেশে।

তারপর আর-একখানা হিন্দী গান গাইলে শ্রীপতির বৌ। এঁরা অবিশ্যি কিছু বুঝলেন না। তবে তন্ময় হয়ে শুনলেন বটে।

তারপর একখানা বেহাগ। বাঙলা গান এবার। সকলে শুয়ে পড়ল—শান্তির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। অনেকে দেখলে বৌয়েরও চোখ দিয়ে জল পড়ছে গান গাইতে গাইতে—রূপসী

গায়িকা একেবারে যেন বাহ্যজ্ঞান ভুলে গিয়েছে।

সেদিন থেকেই সকলে শ্রীপতিব বৌকে অন্য চোখে দেখলে।

ওর সম্বন্ধে ক্রমে উচ্চধারণা করতে সকলে বাধ্য হল আরও নানা ঘটনায়। পাড়াগাঁয়ে সকলেই বেশ হুঁসিয়ার, একথা আগেই বলেছি। ধার দিয়ে—সে যদি এক খুঁচি চাল কি দু-পলা তেলও হয়—তার জন্যে দশবার তাগাদা করতে এদের বাধে না। কিন্তু দেখা গেল শ্রীপতির বৌ সম্পূর্ণ দিলদরিয়া মেজাজের মেয়ে। দেবার বেলায় সে কখনও 'না' বলে কাউকে ফেরায় না, যদি জিনিসটা তার কাছে থাকে। একেবারে মুক্তহস্ত সে বিষয়ে। কিন্তু আদায় করতে জানে না, তাগাদা করতে জানে না, মুখে তার রাগ নেই, বিরক্তি নেই, হাসিমুখ ছাড়া তার কেউ কখনো দেখে নি।

শ্রীপতির বৌয়ের আপন-পর জ্ঞান নেই, এটাও সবাই দেখলে। পাশের বাড়িতে চক্কত্তি-গিন্নি বিধবা, একাদশীর দিন দুপুরে তিনি নিজের ঘরে মাদুর পেতে শুয়ে আছেন, শ্রীপতির বৌ একবাটি তেল নিয়ে এসে তাঁর গায়ে মালিশ করতে বসে গেল। যেন ও তাঁর নিজের ছেলের বৌ।

চক্কত্তি-গিন্নী একটু অবাক হলেন প্রথমটা। গাড়াগাঁয়ে এরকম কেউ করে না, নিজের ছেলের বৌয়েই করে না তো অপরের বৌ!

—এস, এস মা আমার, এস। থাক, তেল-মালিশ আবাব কেন মা? তোমায় ওসব কবতে হবে না, পাগলী মেয়ে—

এই পাগলী মেয়েটি কিন্তু শুনলে না। সে জোর করে বসে গেল তেলমালিশ কবতে। মাথাব চুল এসে অগোছালো ভাবে উড়ে পড়েছে মুখে, সুগৌর মুখে অতিরিক্ত গবমে ও শ্রমে কিছু কিছু ঘাম দেখা দিয়েছে—চক্কত্তি-গিন্নী এই সুন্দরী বৌটির মুখ থেকে চোখ যেন অন্যদিকে ফেবাতে পারলেন না। বড় স্নেহ হল এই আপন-পর জ্ঞান-হারা মেয়েটাব ওপর।

ইতিমধ্যে কমলাব বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়ে সে শ্রীপতিব বৌয়ের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললে, বৌদিদি, তোমায় কি করে ছেড়ে থাকব ভাই? মাকে ছেড়ে যেতে যত কষ্ট না হচ্ছে, তত হচ্ছে তোমায় ছেড়ে যেতে।

এই এক ব্যাপার থেকেই বোঝা যাবে শ্রীপতির বৌ এই অল্প কয়েক মাসেব মধ্যে গ্রামের তরুণ মনের ওপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পুজোর সময় এসে পড়েছে। আশ্বিনের প্রথম। শরতের নীল আকাশে অনেকদিন পবে সোনালি রোদের মেলা, বনসিমের ফুল ফুটেছে ঝোপে ঝোপে, নদীর চরে কাশফুলের শোভা। পাশেব গ্রাম সত্রাজিৎপুরে বাঁড়ুজ্জেবাড়ি পুজো হয় প্রতি বছর, এবারও শোনা যাচ্ছে মহানবমীর দিন তাদেব বাড়ি আর-বছরের মতো যাত্রা হবে কাঁচড়াপাড়াব দলের।

শ্রীপতির বৌ গান-পাগলা মেয়ে, এ কথাটা এতদিনে এ গাঁয়ের সবাই জেনেছে। তাব দিন নেই, রাত নেই, গান লেগে আছে, দুপুরে রাত্রে রোজ এস্রাজ বাজায়। গান সম্বন্ধে কথা সর্বদা তার মুখে। শান্তির এখনও বিয়ে হয়নি, যদিও সে কমলার বয়সী। সে শ্রীপতিব বৌয়ের কাছে আজকাল দিনরাত লেগে থাকে গান শিখবার জন্য।

একদিন শ্রীপতির বৌ তাকে বললে, ভাই শান্তি, এক কাজ করবি, সত্রাজিৎপুরে তো যাত্রা হবে বলে সবাই নেচেছে। আমাদের পাড়ার মেয়েরা তো আর তা দেখতে পাবে না? তারা কি আর অপর গাঁয়ে যাবে যাত্রা শুনতে? অথচ এরা কখনো কিছু শোনে না—আহা। এদের জন্যে যদি আমরা পাড়াতেই থিয়েটার করি?

শান্তি তো অবাক। থিয়েটার। তাদের এই গাঁয়ে? থিয়েটার জিনিসটার নাম শুনেছে বটে সে কিন্তু কখনো দেখেনি। বললে, কি করে করবে বৌদি, কি যে তুমি বল। তুমি একটা পাগল।

শ্রীপতির বৌ হেসে বললে, সে সব বন্দোবস্ত আমি করব এখন। তোকে ভেবে মরতে হবে

ন'—দ্যাখ না কি করি।

সপ্তাহখানেক পরে শ্রীপতি যেমন শনিবারের দিন বাড়ি আসে তেমনি এল। সঙ্গে তিনটি বড় মেয়ে ও দুটি ছোট মেয়ে ও চার-পাঁচটি ছেলে। বড় মেয়ে তিনটির ষোল-সতেরো এমনি বয়েস, সকলেই ভারী সুন্দরী, ছোট মেয়ে দুটির মধ্যে যেটির বয়েস বছর তেরো, সেটি তত দেখতে সুবিধের নয় কিন্তু যেটির বয়েস আন্দাজ দশ—তাকে দেখে রক্ত-মাংসের জীব বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন মোমের পুতুল। ছেলেদের বয়েস পনেরোর বেশী নয় কারো। সকলেই সুবেশ, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন।

শান্তি, শান্তির মা এবং চক্কত্তি-গিন্নী তখন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপতির বৌ ওদের দেখে ছুটে গেল রোয়াক থেকে উঠোনে নেমে। উচ্ছ্বসিত আনন্দের সুরে বললে, এই যে রমা, পিন্টু, তারা, এই যে শিবু আয়, আয়, সব কেমন আছিস? ওঃ, কতদিন দেখিনি তোদের—

রমা বলে ষোল-সতেরো বছরের সুন্দরী মেয়েটি ওর গলা জড়িয়ে ধরলে, সকলেই ওকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে।

—দিদি কেমন আছিস ভাই—

—একটু রোগা হয়ে গেছিস দিদি—

—ওঃ, কতদিন যে তোকে দেখিনি—

—দাদাবাবু যখন বললেন তোর এখানে আসতে হবে আমার তো—

—আহিরীটোলাতে 'মিউজিক কম্পিটিশন' ছিল, নাম দিয়েছিলাম—ছেড়ে চলে এলাম—

মেয়েগুলির মুখ, রঙ ও গড়ন শ্রীপতির বৌয়ের মতো। রমা তো একেবারে হুবহু ওর মতো দেখতে, কেবল যা কিছু বয়েসের তফাত। জানা গেল মেয়ে দুটির মধ্যে রমা ও তার ছোট সতী এবং ছেলেদের মধ্যে বারো বছরের ফুটফুটে ছেলে শিবু শ্রীপতির বৌয়ের আপন ভাই-বোন, বাকি সবাই কেউ খুড়তুতো, কেউ জ্যাঠতুতো ভাই-বোন।

ক্রমে আরও জানা গেল শ্রীপতির বৌ এদের চিঠি লিখিয়ে আনিয়েছে থিয়েটার করানোর জন্যে।

পাড়ার সবাই এদের রূপ দেখে অবাক। এসব পাড়াগাঁয়ে অমন চেহারার ছেলেমেয়ে কল্পনাই করতে পারে না। দশ বছরের সেই ছেলেটার নাম পিন্টু, সে শান্তির বড় ন্যাওটা হয়ে গেল। সে আবার একটা সাঁতার দেবার নীল রঙের পোশাক এনেছে। সিক্ত নীল পোশাক, সুগৌর দেহে যখন সে নদীর ঘাটে স্নান করে উঠে দাঁড়ায়—তখন ঘাটসুদ্ধ মেয়েরা—বোস-গিন্নী, মন্টুর মা, শান্তির মা, মজুমদার-গিন্নী ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকেন। রূপ আছে বটে ছেলেটির! শান্তি দস্তুরমতো গর্ব অনুভব করে, যখন পিন্টু অনুযোগ করে বলে, আঃ শান্তিদি, আসুন না উঠে, ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? আসুন বাড়ি যাই।

পুজো এসে পড়ল। এ-গাঁয়ে কোনো উৎসবই নেই পুজোয়, গরীবদের গাঁয়ে পুজো কে করবে? দূর থেকে সত্রাজিৎপুরের বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির ঢাক শুনেই গাঁয়ের মেয়েরা সন্তুষ্ট হয়। ভিন্‌গাঁয়ে গিয়ে মেয়েদের পুজো দেখবার রীতি না থাকায় অনেকে দশ-পনেরো কি বিশ বছর দুর্গা প্রতিমা পর্যন্ত দেখেনি। মেয়েদের জীবনে কোনো উৎসব-আমোদ নেই এখানে।

শ্রীপতির বৌ তাই একদিন শান্তিকে বলেছিল, সত্যি কি করে যে তোরা থাকিস ঠাকুরঝি—একটু গান নেই, বাজনা নেই, বই-পড়া নেই, মানুষে যে কেমন করে থাকে এমন করে!

বোধহয় সেই জন্যেই এত উৎসাহের সঙ্গে ও লেগেছিল থিয়েটারের ব্যাপারে।

শ্রীপতিদের বাড়ির লম্বা বারান্দার একধারে তক্তপোষ বসিয়ে দড়ি টাঙিয়ে হলদে শাড়ি ঝুলিয়ে স্টেজ করা হয়েছে।

শ্রীপতির বৌ ভাইবোনদের নিয়ে সকাল থেকে খাটছে।

শান্তি বললে, তুমি এত জানলে কি করে বৌদি?

রমা বললে, তুমি জান না দিদিকে শান্তিদি। দিদি 'অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে'—

শ্রীপতির বৌ ধমক দিয়ে বোনকে থামিয়ে দিয়ে বললে, নে, নে—যা, অনেক কাজ বাকি, এখন তোর অত বক্তৃতা করতে হবে না দাঁড়িয়ে—

রমা না থেমে বললে, আর খুব ভাল পার্ট কবার জন্যেও সোনার মেডেল পেয়েছে—যতবার পয়লা বোশেখের দিন আমাদেব বাড়িতে থিয়েটার হয় দিদিই তো তার পাণ্ডা—জান আমাদের কি নাম দিয়েছেন জ্যাঠামশায়?

শ্রীপতির বৌ বললে, আবার?

রমা হেসে থেমে গেল।

মহাষ্টমীর দিন আজ। শুধু মেয়েদের আর ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে থিয়েটার দেখবে শুধু মেয়েরাই—সমস্ত পাড়া কুড়িয়ে সব মেয়ে এসে জুটেছে থিয়েটার দেখতে।

ছোট্ট নাটকটি শ্রীপতির বৌয়ের জ্যাঠামশাইয়ের নাকি লেখা। রাজকুমাবকে ভালোবেসেছিল তাঁরই প্রাসাদের একজন পরিচারিকার মেয়ে। ছেলেবেলায় দুজনে খেলা করেছে। বড় হয়ে দিগ্বিজয়ে বেরুলেন রাজপুত্র, অন্য দেশের রাজকুমাবী ভদ্রাকে বিবাহ করে ফিরলেন। পরিচারিকাব মেয়ে অনুরাধা তখন নবযৌবনা কিশোবী, বিকসিত মল্লিকা-পুষ্পেব মতো শুভ্র, পবিত্র। খুব ভাল নাচতে গাইতে শিখেছিল সে ইতিমধ্যে। রাজধানীর সবাই তাকে চেনে জানে—নৃত্যের অমন রূপ দিতে কেউ পারে না। এ দিকে ভদ্রাকে বাজ্যে এনে রাজকুমার এক উৎসব কবলেন। সে সভায় অনুবাধাকে নাচতে গাইতে হল রাজপুত্রের সামনে ভাড়া-করা নর্তকী হিসেবে। তাব বুক ফেটে যাচ্ছে, অথচ সে একটা কথাও বলসে না। নৃত্যের মধ্যে দিয়ে, সঙ্গীতের মধ্যে দিযে জীবনেব ব্যর্থ প্রেমেব বেদনা সে নিবেদন করলে প্রিয়ের উদ্দেশ্যে। তারপরে কাউকে কিছু না বলে দেশ ছেড়ে পরদিন একা কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

শ্রীপতির বৌ—অনুবাধা। রমা—ভদ্রা। ওব অন্য সব ভাই-বোনেরাও অভিনয় কবলে। শ্রীপতির বৌ বেশভূষায়, রূপে, গলায় দোদুল্যমান জুঁইফুলের মালায় যেন প্রাচীন যুগের রূপকথাব রাজকুমারী। রমাও তাই। গানে গানে অনুরাধা তো স্টেজ ভবিয়ে দিলে, আব কি অপূর্ব নৃত্যভঙ্গি। সতী, রমা, পিন্টুও কি চমৎকাব অভিনয় করলে, আর কি চমৎকার মানিয়েছিল ওদেব।

তারপর বহুকাল পরে পথের ধারে মুমূর্ষু অনুরাধার সঙ্গে রাজপুত্রের দেখা। সে বড় মর্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য। অনুরাধার গানের করুণ সুরপুঞ্জে ঘরের বাতাস ভরে গেল। চারিদিকে শুধু শোনা যাচ্ছিল কান্নার শব্দ, শান্তি তো ফুলে ফুলে কেঁদে সারা।

অভিনয় শেষ হল, তখন রাত প্রায় এগারোটা। গ্রামের মেয়েরা কেউ বাড়ি চলে গেল না। তারা শ্রীপতির বৌকে ও রমাকে অভিনয়ের পর আবার দেখতে চায়। শ্রীপতির বৌ ও তার ভাইবোনদের রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে চক্কত্তি-গিন্নি ও শান্তির মা ও মন্টুর মা খেতে বসিয়ে দিলেন আর ওদের চারিধার দিয়ে পাড়ার যত মেয়ে।

ও-পাড়ার রাম গাঙুলির বৌ বললেন, বৌমা যে আমাদের এমন তা তো জানিনে। কি চমৎকার করলে বৌমা। ওমা, এমন জীবনে তো কখনো দেখিনি—

মন্টুর মা বললেন, আর ভাইবোনগুলিও কি সব হীরের টুকবো। যেমন সব চেহারা তেমনি গান—

শান্তি তো তার বৌদিদির পিছু পিছু ঘুরছে, তার চোখ থেকে অভিনয়ের ঘোর এখনও কাটেনি, সেই যুঁইফুলের মালাটি বৌদিদির গলা থেকে সে এখনও খুলতে দেয়নি। ওর দিক থেকে অন্যদিকে

সে চোখ ফেরাতে পারছে না যেন।

চক্কত্তি-গিন্নী বললেন, আর কি গলা আমাদের বৌমার আর রমার। পিন্টু অতটুকু ছেলে, কি চমৎকার করলে। . . .

শান্তির মা বললেন, পিন্টু খাচ্ছে না, দেখ সেজ-বৌ। আর একটু দুধ দি, ভাত কটা মেখে নাও বাবা, চেঁচিয়ে তো খিদে পেয়ে গিয়েছে। . . . কি চমৎকার মানিয়েছিল পিন্টুকে না সেজ-বৌ—একে ফুটফুটে সুন্দর ছেলে . . .

শ্রীপতির বৌ হাজার হোক ছেলেমানুষ, সকলের প্রশংসায় সে এমন খুশি হয়ে উঠল যে খাওয়াই হল না তার। সলজ্জ হেসে বললে, জ্যাঠামশায় আমাদের বলেন 'কিন্নরদল'—এখনও ওই নামে আমাদের—

রমা হেসে ঘাড় দুলিয়ে বললে, নিজে যে বললে দিদি, আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আমায় তবে ধমক দিলে কেন তখন?

তারা বললে, নামটি বেশ, কিন্নরদল, না? আমাদের শ্যামবাজারের পাড়ায় কিন্নরদল বলতে সবাই চেনে।

রমা বললে কৃত্রিম গর্বের সঙ্গে, প্রায় এক ডাকে চেনে—হুঁ হুঁ—

তারপর এই রূপবান বালক-বালিকার দল সকলে একযোগে হঠাৎ খিলখিল করে মিষ্টি হাসি হেসে উঠল।

সতী হাসতে হাসতে বললে, বেশ নামটি, কিন্নরদল, না?

এমন একদল সুশ্রী চেহারার ছেলেমেয়ে, তার ওপর তাদের এমন অভিনয় করার ক্ষমতা, এমন গানের গলা, এমনি হাসিখুশি মিষ্টি স্বভাব সকলেরই মনোহরণ করবে তার আশ্চর্য কি?

মন্টুর মা ভাবলেন, কিন্নরদলই বটে। . . . .

ওদের খেতে খেতে হাসিগল্প করতে মহাষ্টমীর নিশি প্রায় ভোর হয়ে এল।

শ্রীপতির বৌ বললে, আসুন, বাকি রাতটুকু আর সব বাড়ি যাবেন কেন? গল্প করে কাটানো যাক।

শ্রীপতি বাড়ি নেই। সে সত্রাজিৎপুরের বাঁড়ুজ্জে-বাড়িতে নিমন্ত্রণে গিয়েছে, আজ রাত্রে যাত্রা দেখে সকালে ফিরবে। সেইজন্যে সকলেই বললে, তা ভালো, কিন্তু বৌমা তোমাকে গান গাইতে হবে।

শান্তি বললে, বৌদি, অনুরাধার সেই গানটা গাও আর একবার। আহা, চোখে জল রাখা যায় না শুনলে।

শ্রীপতির বৌ গাইলে, রমা এস্রাজ বাজালে। তারপর রমা ও তারা একসঙ্গে গাইলে।

. . . . একটি মাত্র তেড়োপাখি বাঁশগাছের মগডালে কোথায় ডাকতে আরম্ভ করেছে। রাত ফর্সা হল।

. . . . সেই মহাষ্টমীর রাত্রি থেকে গ্রামের সবাই জানলে শ্রীপতির বৌ কি ধরনের মেয়ে।

কেবল তারা জানলে না যে শ্রীপতির বৌ প্রতিভাশালিনী গায়িকা, সত্যিকার আর্টিস্ট। সে ভালোবেসে শ্রীপতিকে বিয়ে করে এই পাড়াগাঁয়ের বনবাস মাথায় করে নিয়ে, নিজের উচ্চাকাঙ্খা ছেড়েছে, যশের আশা, অর্থের আশা, আর্টের চর্চা ত্যাগ করেছে। তবু গানের ঝোঁক, বাজনার ঝোঁক ওকে ছাড়ে না—ভূতে-পাওয়ার মতো পেয়ে বসে—দিনরাত তাই ওর মুখে গান লেগেই আছে। তাই আজ মহাষ্টমীর দিন সেই নেশার টানেই এই অভিনয়ের আয়োজন করেছে।

শান্তি কিছুতেই ছাড়তে চায় না ওকে। বলে, তুমি কোথাও যেও না বৌদি, আমি মরে যাব, এখানে তিষ্ঠুতে পারব না। শান্তি আজকাল শ্রীপতির বৌয়ের কাছে গান শেখে, গলা মন্দ নয় এবং

এদিকে খানিকটা গুণ থাকায় সে এরই মধ্যে বেশ শিখে ফেলেছে। কিছু কিছু বাজাতেও শিখছে। গানবাজনায় আজকাল তার ভারী উৎসাহ। শ্রীপতির বৌ তো গানবাজনা যদি পেয়েছে, আর বড় একটা কিছু চায় না, শান্তির সঙ্গীতশিক্ষা নিয়েই সে সব সময় মহাব্যস্ত।

অগ্রহায়ণ মাসের দিকে বৌয়ের বাড়ি থেকে চিঠি এল, রমার কি হওয়ায় হঠাৎ সে মারা গিয়েছে। শ্রীপতি কলকাতা থেকে সংবাদ নিয়ে এল। শ্রীপতির বৌ খুব কান্নাকাটি করলে। পাড়াসুদ্ধ সবাই চোখের জল ফেললে ওকে সান্ত্বনা দিতে এসে।

শান্তি সব সময় বৌদিদির কাছে কাছে থাকে আজকাল। তাকে একদিন শ্রীপতির বৌ বললে, জানিস শান্তি, আমাদের কিন্নরের দল ভাঙতে শুরু করেছে, রমাকে দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, আমার মন যেন বলছে . . .

শান্তির বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ধমক দিয়ে বললে, থাক ওসব, কি যে বল বৌদি।

কিন্তু শ্রীপতির বৌয়ের কথাই খাটল।

সে ঠিকই বলেছিল, শান্তি ঠাকুরঝি, কিন্নরের দলে ভাঙন ধবেছে।

রমার পরে ফাল্গুন মাসের দিকে গেল পিন্টু, বসন্ত রোগে। তার আগেই শ্রীপতির বৌ মাঘ মাসে বাপের বাড়ি গিয়েছিল, শ্রাবণ মাসের প্রথমে প্রসব করতে গিয়ে সেও গেল।

এই সংবাদ গ্রামে যখন এল, শান্তি তখন সেখানে ছিল না, সেই বোশেখ মাসে তার বিবাহ হওয়াতে সে তখন ছিল মেটিরি-বানপুর, ওর শ্বশুর বাড়িতে। গ্রামের অন্য অন্য সবাই শুনলে, অনাত্মীয়ের মৃত্যুতে খাঁটি অকৃত্রিম শোক এ রকম এর আগে কখনো এ গাঁয়ে করতে দেখা যায়নি। রায়-গিন্নী, চক্কত্তি-গিন্নী, শান্তির মা, মন্টুর মা কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। ঐ মেয়েটি কোথা থেকে দুদিনের জন্যে এসে তার গানের সুরের প্রভাবে সকলের অকরুণ, কুটিল স্বভাবে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল, সে পরিবর্তন যে কতখানি, এই সময়ে গ্রামের মেয়েদের দেখলে বোঝা যেত। ওদেব চক্কত্তিবাড়ির দুপুবেলার আড্ডায়, স্নানের ঘাটে শ্রীপতির বৌয়ের কথা ছাড়া অন্য কথা ছিল না।

চক্কত্তি-গিন্নী শোক পেয়েছিলেন সকলের চেয়ে বেশী। শ্রীপতির বৌয়ের কথা উঠলেই তিনি চোখের জল সামলাতে পারতেন না। বলতেন, দুদিনের জন্যে এসে মা আমার কি মায়াই দেখিয়ে গেল! আমার পেটের মেয়ে অমন কক্‌খনো করেনি, . . . আহা! আমার কপাল পোড়া, সে কখনো এ কপালে টেঁকে।

মন্টুর বা বলতেন, সে কি আর মানুষ! দেবী-অংশে ওসব মেয়ে জন্মায়। নিজের মুখেই বলত হেসে হেসে, আমরা কিন্নরের দল, খুড়িমা। শাপভ্রষ্ট কিন্নরীই তো ছিল। . . . যেমন রূপ, তেমনি স্বভাব, তেমনি গান . . . . ওকি আর মানুষ মা?

কথা বলতে বলতে মন্টুর মার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ত।

এ সবের মধ্যে কেবল কথা বলত না শান্তি। তার বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয়নি, ভেবেছিল বাপের বাড়ি এসে বৌদিদির সঙ্গে অনেকখানি জ্বালা জুড়োবে। পুজোর পরে কার্তিক মাসের প্রথমে বাপের বাড়ি এসে সে সব শুনেছিল। বৌদিদির যে তার জীবন থেকে কতখানি হরণ করে নিয়ে গিয়েছে, তা এরা কেউ, কেউ জানে না। মুখে সেসব পাঁচজনের সামনে ভ্যাজভ্যাজ করে বলে লাভ কি? কি বুঝবে লোকে?

বছর দুই পরে একদিনের কথা। গাঁয়ের মধ্যে শ্রীপতির বৌয়ের কথা অনেকটা চাপা পড়ে গিয়েছে। শ্রীপতিও অনেকদিন পর আবার গ্রামের বাড়িতে যাওয়া-আসা করছে শনিবারে কিংবা ছুটিছাটাতে।

শ্রীপতিদের বাড়ি থেকে শান্তিদের বাড়ি বেশী দূর নয়, দুখানা বাড়ি পরেই। শান্তি তখন এখানেই ছিল। অনেক রাত্রে সে শুনলে শ্রীপতিদাদাদের বাড়ি কে গান গাইছে। ঘুমের মধ্যে গানের সুর কানে যেতে সে ধড়মড় করে বিছানাব ওপর উঠে বসল—

বিরহিণী মীরা জাগে তব অনুরাগে, গিরিধর নাগর—

এ কার গলা? ওর গা শিউরে উঠল, ঘুমের ঘোর এক মুহূর্তে ছুটে গেল। কখনো ভুলব জীবনে এ গান, এ গলা? সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে ওদের রোয়াকে জ্যোৎস্না-রাত্রে বসে এই গানখানাই বৌদিদি প্রথম গেয়েছিল। সেই অপূর্ব করুণ সুর, গানের সুরের প্রতি মোচড়ে যেন একটি বিষণ্ণ আকাঙ্ক্ষার প্রাণঢালা আত্মনিবেদন। এ কি আর কারো গলার—ওর কুমারী-জীবনের আনন্দভরা দিনগুলির কত অবসরপ্রহর যে এ কণ্ঠের সুরে মধুময়।

ও পাগলের মতো ছুটে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

রাত অনেক? কৃষ্ণা-তৃতীয়াব চাঁদ মাথার ওপর পৌঁছেছে। ফুটফুটে শরতের জ্যোৎস্নায় বাঁশবনেব তলা পর্যন্ত আলো হয়ে উঠেছে।

ঠিক যেন তিন বছর আগেকার সেই মহাষ্টমীর রাত্রি মতো। শান্তির মা ইতিমধ্যে জেগে উঠে বললেন, ও কে গান করছে রে শান্তি। তারপব তিনিও তাড়াতাড়ি বাইবে এলেন। শ্রীপতিদের বাড়ি তো কেউ থাকে না, গান গাইবে কে? ওদিকে মন্টুর মা, মনি, বাদল সবাই জেগেছে দেখা গেল।

প্রথমটা এরা সবাই ভয়ে-বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। পরে ব্যাপারটা বোঝা গেল। শ্রীপতি কখন রাতেব ট্রেনে বাড়ি এসেছিল, কেউ লক্ষ্য কবেনি। সে কলের গান বাজাচ্ছে। ওদের সাড়া পেযে সে বাহিরে এসে বললে, আমার এক বন্ধুর কল, কলকাতা থেকে আজ চেয়ে আনলুম। ওর গানখানা। মরবার ক'মাস আগে রেকর্ডে গেযেছিল।

সবাই খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে বইল। শান্তি প্রথমে সে নীরবতা ভঙ্গ কবে আস্তে আস্তে বললে, ছিরুদা, রেকর্ডখানা আর একবার দেবে?

পরক্ষণেই একটি অতি সুপরিচিত, পরমপ্রিয় সুললিত কণ্ঠের দরদভরা সুরপুঞ্জে পাড়ার আকাশ-বাতাস, স্তব্ধ জ্যোৎস্না-বাত্রিটা ছেয়ে গেল। মানুষের মনেব কি ভুলই যে হয়! অল্পক্ষণের জন্য শান্তির মনে হল তার কুমারী-জীবনেব সুখেব দিনগুলি আবার ফিরে এসেছে, যেন বৌদিদি মবেনি, কিন্নরেব দল ভেঙে যায়নি, সব বজায় আছে। এই তো সামনে আসছে পুজো, আবার মহাষ্টমীতে তাদের থিয়েটার হবে, বৌদিদি গান গাইবে। গান থামিয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসি-হাসি মুখে বৌদিদি বলবে, কেমন শান্তি-ঠাকুরঝি, কেমন লাগল।

পরিচয় ঃ কার্তিক ১৩৪৪

একদা তুমি প্রিয়ে

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ছোটো নদীর ধার, অ্যামিকাটের ফাটক খোলা হয়েছে ব'লে জলের ওপর একটা প্রশস্ত কাদার পাড় পড়েছে। সেই কাদার গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে। নদী-কিনারের সরকারি রাস্তার একধারে ঝাউগাছের সার, অন্যধারে জলরেখার কিছু ওপরে কাশের বন। দীর্ঘ ঝাউগাছের গথিক্ উচ্চাভিলাষ, কাশগুচ্ছের সাদিক্রীড়ারত অশ্বারোহীর শিরস্ত্রাণের পক্ষকম্পন, এবং গোধূলির মন্দির অভ্যন্তরস্থ অস্পষ্টতা মনকে যেমন কল্পলোকের দিকে নিয়ে যায়, তেমনি পেট্রলের ও কাদাব গন্ধ, মোটরের হুঙ্কার ও ধূলাকেতুর পুচ্ছ সম্মার্জন বর্তমান সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের মনকে নিষ্ঠুরভাবে সচেতন ক'রে তোলে। এ বেষ্টনীতে প্রেমের গল্প বলতে হ'লে ভ্রমণরত বন্ধুযুগলকে কোনো গাছের তলায় বসতে হয়। সে রকম উপযুক্ত স্থানও পাওয়া যায় না যে তা নয়। ঝাউগাছের শ্রেণী যেখানে বন্যার কৃপায় হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে, তারই হাত কয়েক দূরে তিনটি দেওদার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, মধ্যবিত্তের নিমন্ত্রণ-বাড়িতে বড়োলোক কুটুম্বিনীর মতন। বন্ধুযুগল দেওদার-তলায় বসে পড়লেন। একজন বল্লেন—"এ যেন সেই ছবির 'তিন বোন'—এঁরা তিনজনে এক হয়ে আছেন। গল্প করতে ইচ্ছা হচ্ছে। শোন।"

অন্য বন্ধুটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "না শোনবার কোনো প্রেরণা পাচ্ছি না, বরঞ্চ আমি গান গাই, তুমি শোন। প্রেমের গল্প চলবে না।"

. "বেশ তাই গাও। আমি সমালোচনা করব।"

গান শুরু হল। গানটি রবীন্দ্রনাথের—

"একদা তুমি প্রিয়ে আমারি এ তরুমূলে,
বসেছ ফুলসাজে, ...
সে কথা কি গেছ ভুলে?"

গায়কের কণ্ঠে মাধুর্য ছিল, কিন্তু সংগীত রচনার বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ পৃথক ও স্বাধীন সত্তাব প্রতি গায়কের কোনো শ্রদ্ধার নিদর্শন ছিল না ব'লে গানটি বোধহয় জম্‌ল না। গায়কও অন্তরার প্রথম চরণটি শেষ করলেন না। 'সেথা যে বহে নদী, নিরবধি, সে ভোলে নি . . . . ইত্যাদি, ইত্যাদি' এই ব'লে উঠ্‌তে চাইলেন।

বন্ধু খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লেন, "তোমার রবি ঠাকুরের গান হয় না। সে যাক্‌গে, আমি বলি রবি ঠাকুরের গান ভালো, তুমি বল খারাপ এই নিয়ে এস তর্ক করি। সময় কাটাতে হবে ত'?"

"তার চেয়ে, আমি বলি ভালো, তুমি বল খারাপ।"

"ভালোই হোক, আর খারাপই হোক এ কথা সুনিশ্চিত, তোমার মুখে এই গানটি খাপ্ খায় না।"

"কেন?"

"এ গানটার মধ্যে এমন একটা অভিমান ও আফ্‌শোষের সুর রয়েছে যেটা তোমার কণ্ঠে ধরা পড়বে না। ঐ গানটিতে ওতঃপ্রোত হয়ে রয়েছে একটা আদর্শবাদ ও সংযম, যাকে কর্তব্যজ্ঞানের দাম্ভিকতা বলতে পার। আফশোষ, অভিমান, ও কর্তব্যজ্ঞান মিলে একটা মিশ্রসুর তৈরি হয়েছে। তুমি কি সেই মিশ্রসুরের প্রতি ন্যায়-বিচার করতে পার?"

"কেন, পারি না? আমি কি এতই দুর্বল?"

"না, তোমার প্রকৃতি ভিন্ন-ধরণের। তোমার প্রিয়া যদি তোমার কাছে ঐ রকমভাবে আত্মনিবেদন করতেন, তা হলে সে আত্মনিবেদনের স্মৃতি কেবল নৈসর্গিক-দৃশ্যের মধ্যে জাগরূক দেখে তুমি সান্ত্বনা পেতে না নিশ্চয়ই। তোমাকে অপমান করছি না। তোমার পুরুষকারকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি।"

"আর সে কাজ বুঝি তুমি পারতে?"

"আমাকে অত খেলো পাওনি যে নিজের স্বভাব কিংবা কাহিনী তোমার কাছে বলব। জোর, যার মুখে ঐ গানটি শোভা পায় তার স্বভাব আমি বর্ণনা করতে পারি। মানুষটা কাল্পনিক, ঘটনাগুলিও কাল্পনিক ভাবতে হবে নচেৎ গানের তাৎপর্যটি ধরতে পারবে না। একটা গল্প তৈরি করি? শোন তা হলে মন দিয়ে। একটু কল্পনাশক্তিকে খাটাতে হবে।"

"আমাকে ত' জানই। ছেলেবয়সে, মহাষ্টমীর দিন পর্যন্ত রঙিন-জামা পরেছি মনে হয় না। বাবার ধারণা ছিল, ইংরেজ জাতটা অত বড়ো হয়েছে তার একমাত্র কারণ তাদের পোশাকের বর্ণহীনতা; এবং তাদের পতনও অবশ্যম্ভাবী, কারণ, তাদের মেয়েদের পোশাকে বর্ণ সম্বন্ধে দুর্বল উচ্ছৃঙ্খলতা। প্রমাণস্বরূপ পশুপক্ষী ও সাঁওতালদের বর্ণপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করতেন। বাবার এই শিক্ষা আমার মনে গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছে। কল্পনা আমার ধাতে আসে না। রবি ঠাকুরের গান গাই, অন্যান্য ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা যে কারণে গেয়ে থাকেন হিন্দুস্থানী-গান জানি না ব'লে, এবং খানিকটা ফ্যাশানের জন্য। খানিকটা ভালোও লাগে, কি রকম গা-টা শুড়শুড়ি দিয়ে ওঠে। তুমি আমাকে কল্পনার সাহায্য নিতে বোলো না। বাস্তব, অর্থাৎ বোধগম্য উপায়ে গানটির উপযুক্ত গায়কের চরিত্র বর্ণনা কর।"

"ফটোগ্রাফ্ তুলে তার ওপর রং লাগাতে বলছ! ও কাজটা অনেকেই করেন জানি। কিন্তু রবি ঠাকুর ও কাজ করেন না, তাই ত' তাঁর কবিতা, বিশেষ ক'রে তাঁর ছবি অত উদ্ভটজনক। বেশ, সহজে বুঝতে চাও ত' তোমাকে আমাকে নিয়েই গল্প ফাঁদি? শেষে আপত্তি কোরো না যেন!"

"যতক্ষণ না কল্পনাকে খাটাতে বলছ, ততক্ষণ সব করতে রাজি। আরম্ভ কর।"

"ধর তোমার বিবাহ হয়েছে একজন অর্ধশিক্ষিতা ও বড়োলোকের মেয়ের সঙ্গে, এবং আমি অবিবাহিত। আমরা দুজনে অন্তরঙ্গ।"

"দেখতে কেমন?"

"কি লোভী!"

"বড়োলোকের মেয়ের সঙ্গে তা হলে বিবাহ দিও না।"

"দিতে হবে অনেক কারণে। অন্যতম কারণ, গল্পের গূঢ় অভিসন্ধি। বড়োলোকের মেয়ে না হলে কোনো বাঙালী মহিলার মানসিক অবস্থা প্রেমে পড়বার উপযুক্ত হয় না। ভালো করে ঘি-দুধ খেয়ে দেহটাকে শ্রীঘৃতের ছবির মতন ক'রে তোলা চাই; অবসর উপভোগ ক'রে ক'রে সংসার-সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হওয়া চাই, তবেই প্রেম নামক সৌখীন-নেশাটা জমে। যাঁকে হাঁড়ি ঠেলতে হয়, পাঁচটা কাচ্ছাবাচ্ছার ধকল্ সইতে হয়, তিনি যদি কোনো দুর্লভ অবসরে 'মহুয়ার' পাতাও ওল্টান্, তবুও তাঁর মন কারুর প্রতি দুর্বল হয় না। জোর তাঁর মনে 'অপরাজিত'-এর অপর্ণার মতন স্বামীভক্তিই ফুটে উঠতে পারে। আর বিংশ শতাব্দীতে স্বামীর সঙ্গে প্রেম নিয়ে গল্প, মা'র ছবির ওপর কবিতা লেখার মতনই অচল, অতএব অসম্ভব। আমি তোমার স্ত্রীকে আমার সঙ্গে প্রেমে পড়াতে চাই।"

"এমন উপযুক্ত লোক কোথায় তিনি পাবেন, আমিই বা কোথায় পাব। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্, করুণাময় স্বামীর বন্ধু!"

"কি করে প্রেমে পড়েছেন জানতে এখন চেয়ো না। আগে তোমার স্ত্রীকে চেন। তোমার স্ত্রীর শ্রেণী যখন ঠিক করে দিয়েছি তখন তাঁর চেহারা ও চরিত্রের অনেকটা বলা হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ

তোমার স্ত্রীর জীবনে বিদ্যাসাগরের ভাষায় প্রলোভন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ভূমার সন্ধান, তরুণের ভাষায় বড়ো'র আহ্বান কিছুই আসে নি, এবং সেইজন্যেই তিনি তোমার ও তোমাদের সমাজের চক্ষে সতী সাধ্বী। অর্থাৎ, তিনি, তাঁরই পিতৃদত্ত মোটরে তোমার সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণে যান, এসেই, বাড়ি ঢুকেই, অসহ্য গরমে তোমারই কষ্ট নিবারণের জন্য, পাখাটা পুরোপুরি খুলে দেন; খাবার সময় একসঙ্গে না খেলেও—শ্বেত পাথরেব মেজেতে থাবড়ি খেয়ে ব'সে বাপেব বাড়ির বুড়ো ঝির অদ্ভুত বড়ি দেবার ক্ষমতার ইতিহাস বলেন, তারপর পান জবদা খেতে খেতে, পান খেলে তোমার 'পাওরিয়া' হবে বলে তোমাকে মানা কবেন। রাতে দাঁড়া-আয়নাব সমানে চুল বাঁধতে বাঁধতে তোমার মুখ থেকে, একবার মাত্র নিজের সৌন্দর্যের প্রশংসা প্রত্যাশা কবেন। যুৎসই ক'রে সুখ্যাতি না করতে পারলে সারারাত মান-অভিমান, সাধাসাধির পালা। সকালে উঠলেই মাথা ঘোবে ব'লে বিছানায় পারসী বেড়ালের মতন শুয়ে থাকা, আটটার সময়, প্রসাধানান্তে, লুচি-হালুয়া ও ঠাণ্ডা চা, দশটার সময় তোমার খাবার কাছে বসা, বেলা বারোটায যৎসামান্য জলযোগেব পব মাসিকপত্রের গল্প পাঠ করতে করতে নিদ্রা, নিদ্রাভঙ্গের পব—উঃ, সেই সমযটায ভাবি কষ্ট, ক্লান্তি, অবসাদ, অতটা ঘুমেব পর খানিকটা বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমাব শ্বশুরেব ইটের কল থেকে মোটরে না ফিরছে। এই সময়টাই দিবাস্বপ্ন দেখতে হয়, এই গল্পটাব, ঐ নভেলটাব নায়িকার অবস্থায় নিজেকে নিয়ে যেতে হয়, নচেৎ কি করবেন তুমিই বল? কল থেকে একটু আগেই না হয় ফিরলে? তোমার কাজের মুখে ছাই পড়ুক। যার জন্য তোমাব কাজ তাকে ভোলো কোন হিসেবে? যা হোক, দেরি ক'বে যখন এসেইছ তখন সতীকে নিয়ে একবাব বায়স্কোপ যাও। অনুগ্রহ ক'রে বায়স্কোপ দেখতে দেখতে কিংবা টকি শুনতে শুনতে যদি কেউ কাউকে চুমু খায় তা হলে হেঁসে ফেল না, কিংবা তাঁর ক'ড়ে আঙুলে চিমটি কেটো না, তোমার চরিত্র সম্বন্ধে তিনি সন্দিগ্ধা হবেন। তোমার মনের ভিতরকার ভাবটা ধরে ফেলবেন, আব লোকলজ্জায়, অর্থাৎ তাঁবই ভয়ে তুমি যে ভদ্র হয়ে চল একথা শুনতে হবে এই হল তোমার স্ত্রীব চরিত্র বর্ণনা। বুদ্ধি থাকলে বুঝবে।"

"সোজা ক'রে বল।"

"এইবার তোমার বন্ধুর চবিত্র আঁকছি। তোমার স্ত্রীটি বড়ো ভালো। অর্থাৎ তিনি ভালোও হতে পারেন মন্দও হতে পারেন। তুমি যেমন তাঁর অবস্থাব ক্রীতদাস, তেমনি তিনিও তাঁব বাপেব অবস্থার ক্রীতদাসী। এ হেন স্ত্রীর স্বামীর একজন বন্ধু আছেন। তিনি মধ্যবিত্ত সম্প্রদাযেব, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্যের অভাবে এই শ্রেণীব মধ্যে খানিকটা বৈচিত্র্য আশা কবা যায। কিন্তু যতটুকু পাওয়া উচিত, ততটুকু পাওয়া যাচ্ছে না। কাবণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থেব ছেলেব মনে অল্পবয়স থেকেই, গোটা কয়েক কুসংস্কার গেঁথে দেওয়া হয়, যেমন loyalty—কিনা বন্ধুবাৎসল্য, honour, যাব বাংলা প্রতিশব্দ নেই কর্তব্যজ্ঞান বলতে পার, ও আদর্শবাদ অর্থাৎ idealism প্রভৃতি। এই সব সংস্কাবগুলি তোমার বন্ধুর চরিত্রকে একেবারে বৈচিত্র্যহীন ক'বে তুলেছিল। সেজন্য তাকে নেহাৎ গোবেচাধি মনে হত। আদর্শবাদই তার চরিত্রের মূলসূত্র। গোটা কয়েক উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে। তাব বিশ্বাস ছিল যে নারীজাতি পুরুষের দ্বারা চিরকাল ধর্ষিত হয়ে এসেছে। অতএব নারীজাগরণের জন্য সে রাবণের উপায় গ্রহণ করতেও দ্বিধা করত না, 'বঙ্গলক্ষ্মী' ও 'জয়শ্রী'তে তার বেনামী প্রবন্ধগুলোর মধ্যে একটা ঢাকঢোলের আওয়াজ পাওয়া যেত। সে বিশ্বাস করেছিল যে ১৯২০ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যেই আমরা স্বরাজ পাব, যখন পেলাম না তখন কারণ দেখিয়েছিল মহাত্মাজীর প্রতি আমাদের অনাস্থা। সে আমেরিকান ম্যাগাজিন পড়ত; গ্যারিবলডির জীবনী, স্যোশিলিজমের ইতিহাস, রুষের বিপ্লবকাহিনী, ম্যাকসুইনীর ও সুনইয়েৎ সেনের জীবন-কথা তার কণ্ঠস্থ ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক আশ্রমকে অর্থসাহায্য করবার ইচ্ছা সত্ত্বেও তার সামর্থ্য ছিল না বলে প্রায় সব সভাতেই তাকে যোগ দিতে হত। আর যেদিন হাতে কাজ থাকত না, সেদিন

সন্ধ্যাবেলায় তোমার বাড়িতে বসে গ্রামোফোন ও রেডিওতে শ্রীআঙুরবালার গান শুনত। কিন্তু তাই ব'লে দু-চারখানা রবি ঠাকুরের, দশ-বিশটা অতুলপ্রসাদের, এবং বিশ-ত্রিশটা কাজী নজরুলের গান শোনবার ক্ষমতা তার ছিল না একথা ভেবো না। সে তোমার স্ত্রীকে ঐ গানগুলোই শিখিয়েছিল।

এবার তার কর্তব্য জ্ঞানের উদাহরণ শোন। প্রত্যেকদিন সকালে উঠে খবরের কাগজ মারফৎ পৃথিবীর যাবতীয় খবর জানা। তারপর সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার সাহায্যে সর্বদেশের চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট হওয়া। বিকেলে মোহনবাগানের খেলা দেখা, ফেরবার পথে শ্রমিকসঙ্ঘের পাক্ষিক-সভায় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক ভোজে যোগদান, প্রায় রোজই তোমাদের বাড়িতে এসে তোমার স্ত্রীকে গান শেখান, চীন-জাপানের যুদ্ধ-কথা, তরুণ-সাহিত্য, তরুণ চিত্রকলা ও নাট্যকলা, তরুণের অভিযান, স্ত্রী-জাগরণের বিবরণ শোনান—এ সব কাজ সে কর্তব্যবোধেই করত। সেইজন্য তার মতামতে একটা একাগ্রতা, মননে একটা উচ্ছ্বাস, ও বচনে একটা উন্মাদনা ছিল। এ গুণগুলির অস্তিত্ব তোমার স্ত্রী ভালো করে না হোক আবছা গোছের সন্দেহ করেছিলেন ভাবা যেতে পারে। অন্ততঃ এ ধারণাটুকু তাঁর ছিল যে কোথায় যেন তাঁর স্বামীর ও সেই স্বামীর বন্ধুর মধ্যে একটা পার্থক্য রয়ে গেছে। তাঁর পার্থক্য-অনুভূতির খবরও বন্ধুটি জানত। তুমি জানতে কিংবা জানতে না, হয়ত জানাতে চাইতে না। সেইজন্য, তুমি যখন টাকার তাগিদ দিতে বিদেশ যেতে, তখন তোমার বন্ধুর চার্জে তোমার স্ত্রীকে রেখে যাওয়াটা তাঁর বাপের বাড়ি পাঠানোর চেয়ে সমীচীন ভাবতে। বন্ধুর প্রতি তোমার প্রগাঢ় বিশ্বাস এইটাই হ'ল তার কর্তব্যবোধের সবচেয়ে বড়ো প্রশংসাপত্র। বন্ধুবাৎসল্য, গোটাকয়েক সনাতন বিশ্বাসে অল্প আস্থা—এ সব সদ্‌গুণ তার চরিত্রে কত পরিমাণে ছিল গল্পের মধ্যেই পাবে।"

"এবার গল্প শুরু হোক্।"

"গল্পের প্রয়োজন নেই। এই তিনটি চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতেই গল্প তৈরি হবে। গল্পের অন্য অস্তিত্ব আছে না কি? গল্প এক রকম হ'য়েই গেছে। অর্থাৎ এখন থেকে যে ঘটনা বিবৃত করব, সেগুলি এই তিনটি চরিত্রে সম্পর্কে হতে বাধ্য। আচ্ছা, আরও একটু বিশদ ক'রে বলি। তোমার বন্ধুর প্রতি তোমার স্ত্রীর মনোভাবটা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকের প্রতি বড়োলোকের মেয়ের অনুকম্পা এবং কর্মবীরের স্ত্রীর বাক্যবীরের প্রতি মোহ, এই দু'এর এক দৈব সংমিশ্রণ। তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার বন্ধুর মনোভাবটা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মোহ ও হিংসার; হিংসাটা তুলে রাখা হয়েছিল খানিকটা তোমার জন্য, খানিকটা ধনী সম্প্রদায়ের জন্য। হিংসাটা ভালো ক'রে প্রকাশ পেত শ্রমিকসঙ্ঘের পাক্ষিক সভার বক্তৃতায়। এই মোহ, ধনী সম্প্রদায়ের ওপর এই রাগ ও তার এক অনুপযুক্ত প্রতিনিধির ওপর অভিমান চমৎকার মিশে গিয়েছিল তার আদর্শবাদের সঙ্গে। সে ভাবত, তোমার স্ত্রীর গহনা-গাঁটি মোটর রেডিও থাকা সত্ত্বেও সে ভারি গরীব, একাকিনী, বন্ধুহীনা, নির্জন পথের যাত্রী। কিন্তু তোমার চরিত্রের প্রশংসায় সে ছিল শতমুখ। এই সব কারণে তোমার স্ত্রী ও তোমার বন্ধুর মধ্যে একটা আদর্শ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। তোমার স্ত্রী যদি পুরুষ হতেন তা হলে সে সম্বন্ধকে প্লেটনিক্ বলা চলত। বিধাতার ইচ্ছা যখন বিপরীত, তখন তাকে মধ্যযুগীয় বলতে বাধ্য।"

"আর আমি। আমি কোথায় রইলাম?"

"আরে তোমাকে বাদ দিয়ে কি গল্প হয়। তুমিই ত গল্পের নায়ক। তবে এমন নায়ক নও যে সর্বদাই রঙ্গমঞ্চের সবখানি জুড়ে আছ। তুমিই সব, তবে গোপনে, অলক্ষ্যে। চক্রের যেমন কেন্দ্র, এ বিশ্বের যেমন ব্রহ্ম, জুলিয়াস সীজার নাটকের শেষ অঙ্কগুলিতেও যেমন সীজার, ঘরে-বাইরের যেমন মাষ্টারমশাই, সুরের যেমন বাদী স্বর, রেমব্রান্টের ছবির কোণ থেকে যেমন আলোর একটি রেখাপাত, তেমনি তুমি আমার গল্পের। লোকে ভাবছে তুমি নিষ্ক্রিয় অনাবশ্যকীয়, অনুবাদী ইত্যাদি,

তা নয়। তুমি ব্যাকরণের অব্যয়। অভিমান কোরো না।"

"ওটা আমার ধাতে নেই।"

"সেইজন্যই ত ঐ গানটা তোমার মুখে শোভা পায় না বল্‌ছি। আচ্ছা ধরাই যাক্‌, তোমাব মনোভাব বলে কিছু নেই। ও সব বাসাই নেই তোমার। খাঁটি বৈজ্ঞানিক তুমি, মন তোমাব সুস্থ। এবার গল্প শোন। প্রথম ঘটনাটি ঘটে তোমারই সামনে। হয়ত তোমার মনে নেই। রেডিও বন্ধ ক'রে তোমার স্ত্রীকে 'সেই' গানটি গাইতে ব'ল্‌লে। তৃতীয় ব্যক্তি, অর্থাৎ তোমাব বন্ধুব সামনে স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধজনোচিত গোপন ইঙ্গিতটা তিনি পছন্দ না ক'রে ভ্রূকুঞ্চিত কবলেন। যে গানটি গাইলেন সেটি তোমার বন্ধুর কাছেই শেখা। কাজী নজরুলের বিখ্যাত গান—কেন কাঁদে পবাণ, কি বেদনা কারে কহি?' প্রথম লাইনটা শুনেই তুমি ঠাট্টা করলে, 'কাঁদবার প্রয়োজন নেই, আমাব কান্না ভালোও লাগে না। বেদনাটা কি আমাকে যদি না বল, ত' এঁকেই বল না।' তোমার বন্ধু তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, 'না, না, আমাকে বলবার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমাব কান্না ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু ওঁর যে বেদনা থাকতে পারে তোমার বোঝা উচিত। প্রত্যেক মানুষেব, বিশেষত, প্রত্যেক স্ত্রীর মধ্যে একটা সৃজনী-শক্তি লুপ্ত থাকেই থাকে, তাকে জাগ্রত, তাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে কোনো কর্মে নিয়োজিত না করতে পারলে বেদন বোধ কবতেই হবে। অন্য বেদনার কথা বলছি না। তুমি লেডী ডাক্তারের কথা তুলে একটা বদরসিকতা কবাতে সেদিনের সভা ভঙ্গ হয়। পরের দিন সকালেই তুমি বাইরে চলে যাও। বন্ধু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তোমাব বৈঠকখানায় এসে অনেক ক'রে তোমার স্ত্রীর—তিনি তখন তোমার স্ত্রী নন্‌, সমগ্র স্ত্রীজাতির প্রতিভূ—মনোবঞ্জন করতে প্রয়াসী হলেন। তাঁর চেষ্টা সফল হ'ল না। লাভের মধ্যে, বন্ধুকে গোটা কযেক কটু কথা শুনতে হ'ল—এই যেমন, 'আমাকে আর গান শেখাবেন না, আমি গাইতে জানি না, আমাব গলা খারাপ, তাল আমার হয় না।' বন্ধু খুব জোরেই প্রতিবাদ কবলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর মনে আত্মবিশ্বাস আনতে পারলেন না। শেষে লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞাসা কবে ফেল্‌লেন—'বেদনাটা কি?' 'বেদনা, বেদনা ত' কিছু নেই। আমি খুব সুখী, আমার মতো সুখী কেউ নেই।' 'এ জগতে সুখ কারুর নেই, যতদিন পর্যন্ত একটি প্রাণী কষ্ট পাচ্ছে ততদিন কারুর সুখের অধিকাব পর্যন্ত নেই।"

'পরের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে না।'

'আমি জানি কাঁদে, খুবই কাঁদে। যদি নাও কাঁদে, নিজেব জন্যও তো কাঁদে? বাস্তবিক, তাই হওয়া চাই। যার নিজের জন্য প্রাণ কাঁদে না, তার পবের জন্য কি সহানুভূতি হতে পাবে? আমি জানি আপনার হৃদয় কত কোমল। বেশী কোমল বলেই ত আপনাব সঙ্গে আলাপ ক'বে সুখ পাই। দেখুন, আমারও আপনার অবস্থা, তবে আমাব হাতে নাকি বিস্তর কাজ, তাই কাজের মধ্যে ডুবে থাকি, নিজেকে ভুলে থাকি। কিন্তু, যখন একলা থাকি তখন এমন একটা নিষ্ফলতা আমাকে আচ্ছন্ন করে যে আমার দমবন্ধ হয়ে যায়, মনে হয় কোথাও চলে যাই।'

'ও সব ভাববেন না, আমার মতন হয়ে যাবেন। কেন এখানে আসেন না? কিই বা দিতে পাবি, তাও নয়।'

"একমাত্র এখানেই আসতে ইচ্ছে করে। আপনি কি দিতে পারেন? সে যাক্‌। কিন্তু আসা উচিত নয়।'

'লোকে কি ভাববে? আপনাকে ত' সকলেই চেনে।'

'আচ্ছা এবার থেকে সময় পেলেই আসব।'

'আসবেন নিশ্চয়। কিন্তু আমাকে গান শেখাবেন না।'

'কেন? গান গাইতে পারি না হয়ত, কিন্তু হয়ত শেখাতে পারি কিছু কিছু।'

'খুব পারেন আমার বিশ্বাস, তবু শেখাবেন না।'

'তবে কেন শেখাব না বলতেই হবে।'

'গান সকলে ভালোবাসেন না।'

'ওঃ বুঝেছি।'

"আদর্শবাদ, কর্তব্যজ্ঞান, সংযম, বন্ধুবাৎসল্য প্রভৃতি কুসংস্কারগুলো কেমন তোমার বন্ধুর মনকে আচ্ছন্ন করেছে বুঝলে? ঐ ছোট্ট 'ওঃ বুঝেছি' কথাটা বড়ো গভীর।"

"সবই বুঝলাম। আমার মনে হয় দুজনই এক ছাঁচে ঢালা, অবস্থা ভিন্ন হলে কি হয়? দুজনেই কল্পনা ও ভাববিলাসী, দুজনেই silly sentimental।"

"এই সাংসারিক বুদ্ধির জন্যই তোমাকে খাতির করি। আজ যদি সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে রস-জ্ঞান না থেকে সামান্য সাংসারিক বুদ্ধিটুকুও থাকত, তাহলে সমালোচনা অত জোলো হত না। এবার অন্য একটা ঘটনা বলি শোন। এ ঘটনা ঘটে তোমার অনুপস্থিতিতে। তুমি ডিহিরীতে না কোথায় ধর চুণ আনতে যাচ্ছিলে, যাবার মুখে, যখন তোমার স্ত্রী গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ধব তুমি ঠাট্টা করে বলেছিলে, 'যাত্রার পূর্বে বন্ধ্যার মুখ দেখলে অমঙ্গল হয়'।"

"আমি এ ধরণের ঠাট্টা করতেই পারি না।"

"অ'লবাৎ কবতে পার। এইটাই ত' ঘরজামাইএর প্রতিশোধ। শোন। তুমি ত' ভাই চলে গেলে, তাবপর তোমাব স্ত্রীর সামনে দুটি পথ খোলা রইল। একটি গোঁসা ঘবেব দিকে, অন্যটি নিরুদ্দেশে, তোমার বন্ধুর সঙ্গে ভেসে পড়া। কোন পথে পাঠাই ঠিক্ করতে পারছি না।

"গোঁসা ঘরেই পাঠাও হে।"

"ভালোই বলেছ। রাস্তায় দাঁড়ানটা মুখরোচক হলেও তোমাব বন্ধুর চবিত্রেব সঙ্গে অন্তত খাপ খায় না। তাব কর্তব্যজ্ঞানে ও অন্যান্য কুসংস্কারে বাধে।"

"গোঁসা-ঘরে কি হল?"

"বিষ-ভক্ষণ। বন্ধু খবর পেয়েই ছুটে এলেন। ব্যাপার বেশি কিছু নয়, গোটা আষ্টেক জেনাস্‌পেবিণের বড়ি খেয়েছেন, বুক ধড়ফড় ক'রে অজ্ঞান হয়েছেন। খানিক পবে জ্ঞান হল। সাবাদিন তোমার বাড়িতে তোমার বন্ধু রইলেন, সন্ধ্যাবেলায় নদীব ধারে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। বাত্রে পাশের ঘরে শোবার বন্দোবস্ত হল। অনেক রাত পর্যন্ত, কারুর ঘুম আসে না, দুজনে চুপ করে সামনাসামনি বৈঠকখানায় বসে রইলেন। শুতে যাবার সময় বন্ধু তোমার স্ত্রীকে বল্‌লেন, 'প্রতিজ্ঞা করুন, এ ভীষণ কাজ আব করবেন না। যদি প্রতিজ্ঞা করেন, শপথ ক'রে বলেন করবেন না, তবেই আমি শোব, তবেই আমি ওকে বলব না, তবেই আমি আপনাদের বাড়ি আসব, নচেৎ আমিও প্রতিজ্ঞা করলুম—আর কখ্খন আসব না।"

'আচ্ছা বলছি, চেষ্টা করব, খুব চেষ্টা করব, কিন্তু কতদূর পারব ব'লতে পারি না। আপনি না এলে আমি—'

'না এলে আপনি কি . . . .?'

'আমার ভালো লাগবে না, আমি বাঁচব না। ও আমাকে যা অপমান করেছে, আপনিই শুধু..., আপনার জন্যই শুধু . . . .' এর পর তোমার বন্ধুর কি অবস্থা হল বুঝতেই পার।"

"কি আবার হল। ও কথা শুনলে আমি স্থির থাকতে পারতাম না।"

"তোমার বন্ধুও স্থির থাকতে পারলেন যে তা নয়। তবে তিনি তোমার মত কর্মবীর নন, তাই রাতে ঘুম হল না—এই চাঞ্চল্যটুকু তাঁর হল। বন্ধু পরিষ্কার বুঝলেন যে তোমার স্ত্রী, তাঁকে ভালোবাসেন। যেই বোঝা, অমনি তাঁহার মনেও প্রেম উপজিল। প্রতিদানের কর্তব্যবোধটা, অতি শীঘ্রই, সমগ্র নারীজাতির প্রতি অনুকম্পার সঙ্গে মিশে একটা খুব উঁচু ধরণের প্রেমে পরিণত হল।

সাধারণতঃ এ রকম উন্নত প্রেমের বিবরণ পাওয়াই যায় না, কিন্তু বাংলাদেশে এর চল্‌তি ও কাট্‌তি দুই-ই খুব স্বাভাবিক। কোনো স্ত্রীলোককে এই ভাবে দেখার সুবিধা কত ভাব। এর মধ্যে আমাদের মজ্জাগত আদর্শবাদের ক্রীড়া চলতে পারে, স্ত্রীজাতিকে নির্যাতনের বিষযবস্তু ভেবে দেহের ব্যক্তিগত সম্বন্ধকে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে—ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু এই অ-বাস্তব ও অ-পার্থিব, অর্থাৎ স্বর্গীয় প্রেমের মধ্যে নভেল নাটকের মূল তথ্য কিনা দ্বন্দ্ব রইল না ভেবো না। দ্বন্দ্ব তুল্‌লে কর্তব্যবোধ ও বন্ধুবাৎসল্য। যদিও তুমি লোকটি সুবিধের নও, তবুও তোমাকে বন্ধু বলে একবার যখন গ্রহণ করা হয়েছে, তখন তোমার স্ত্রীকে নিয়ে কেলেঙ্কারি ক'রে কিছু তোমাব সেবার ত্রুটি ঘটান যায় না। তা হলে, logically, তোমার বন্ধুব সামনে মাত্র দুটি উপায় খোলা রয়েছে। (১) নিজেকে সরিয়ে নেওয়া—সেটা কি কবে সম্ভব বল? বন্ধুর ভাগ্যে প্রেম কখনও হয়নি, একবার ভগবানেব কৃপায় যদি বা সিকে ছিঁড়ল, তখন অত বড়ো অভিজ্ঞতাকে কি ক'বে পাযে ঠেলে দেয় তুমিই বল। হিন্দু সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে জন্মে ঐ ধরণের আদিরসাত্মক অভিজ্ঞতার ওপর একটা ঝোঁক থাকা স্বাভাবিক। তা ছাড়া, জীবনের আহ্বান। তুমি বলবে, অন্যায়, আমিও তাই বলি। কিন্তু তোমার বন্ধুর বেলা সেই অন্যায় প্রবৃত্তি সংযত হল, যা হওয়া উচিত। হিন্দুসমাজেব বন্ধন শিথিল হলেও তোমার বন্ধুব মনে সামাজিক কর্তব্য-জ্ঞান তখনও লুপ্ত হয়নি। সেই জন্য logically (২) দ্বিতীয় উপায় রইল তোমার স্ত্রীর মনকে সবিযে নিতে তাঁকেই শিক্ষা দেওযা, তাঁকেই সংযত হতে অনুরোধ করা।"

"আচ্ছা এইটা শেখাতে খুব কষ্ট পেতে হযেছিল বন্ধুকে?"

"বন্ধুর স্বরূপই হল সংযম জানি। স্বরূপ প্রকাশে আর্টিষ্টের হযত কষ্ট হয না। তাও বোধ হয, হয়। তোমার বন্ধুটি আর্টিষ্ট না হলেও আর্টিষ্টিক ছিলেন ত' বটে। না হে না, গম্ভীব হযে বলছি, খুবই কষ্ট পেতে হয়েছিল। সে কষ্টের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তোমাকে শোনাব। দেখ, স্ত্রীলোকদেব, মস্তিষ্কটা অনেকটা অধ্যাপকদের মতন। সেখানে সহজে কোনো আইডিয়া প্রবেশ কবে না, কিন্তু 'ত্যজ আশা প্রবেশি এ দ্বারে', একবাব প্রবেশ করলে আর তাড়ান যায না। অনেকটা প্যারিসেব শান্তি-সভায় লয়েড জর্জ-উইলসনেব সম্বাদেব মতন ঘটল। তোমাব প্রতি কর্তব্য ও বাৎসল্যেব তাগিদে বন্ধু এক চাল চাললে। সে তোমাব মাহাত্ম্য-কীর্তন সুরু কবল। সকাল সন্ধ্যে সেই এক ধুয়ো তোমার স্ত্রীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে লাগল—'তোমাব মতন দৃঢ়চেতা কর্মবীব এ জগতে দুর্লভ, তোমার চরিত্র হয়ত মার্জিত নয়, তাঁব পছন্দ-সই নয়, নিশ্চয়ই নয়, হতে পাবেই না, কিন্তু তোমার চরিত্র এই বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার নিতান্ত উপযুক্ত। একজন জার্মাণ পণ্ডিত বলেছেন—সভ্যতা সম্বন্ধে জার্মাণদের মতই সবচেয়ে সারবান—এ জগতের নায়ক ও আদর্শ পুরুষ হল মোটবচালক, অর্থাৎ সোফেয়ারের মতনই কর্মতৎপর। যেকালে তিনি বিংশ শতাব্দীরই মেয়ে, তখন এই যুগেব নায়ককেই তাঁকে স্বীকার কবতে হবে।' এ যুক্তিতে কিছু কাজ হল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ হল না। তখন তোমার স্ত্রীকে তোমার বন্ধু নিবেদন করলেন, 'এই যান্ত্রিক-সভ্যতাকে যদি আপনি প্রাণবন্ত না কবেন, কে করবে? এ যুগেব একমাত্র আশা আপনাবা। আপনাদেরই স্নেহ, মমতা, করুণা, প্রেম, নিঃস্বার্থপরতাই এ ধ্বংসোন্মুখী সভ্যতাকে বাঁচাবে।' আপনাকে কল্পনা করেই রবীন্দ্রনাথ রক্তকববী লেখেন। আপনিই নন্দিনী।' এই তুলনামূলক যুক্তি পূর্বের যুক্তিব অপেক্ষা প্রাণস্পর্শী হলেও তাঁর হৃদয়াবেগকে রহিত করতে পারলে না। নন্দিনী নামটি শুনে যখন চোখে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল তখনই তোমার বন্ধু উপলব্ধি করলে যে যখন ঘোড়া উদ্দাম গতিতে ছুটতে চাইছে, তখন লাগাম ঢিল দেওয়াই ভালো। তাই দৈবদুর্বিপাকে সে বাধ্য হল স্বীকার করতে যে সেও ভালোবাসে। এই স্বীকারোক্তিতে আশু ফল লাভ হল। খবরটি শুনে তোমার স্ত্রী গম্ভীর হয়ে ব'সে রইলেন। চোখের জল আর পড়ে না। বন্ধু তখন ব'লে যেতে লাগলেন—'সে অনেক কথা, যে সব নভেল পড়

তাইতে অনেক পাবে'।"

'কিন্তু'

'তবে কিন্তু কেন?'

'কিন্তু এই জন্য যে আমাদের দুজনকেই সংযত হতে হবে। আমি চিরকাল ভালোবাসব, আপনিও ভালোবাসবেন, এই রবে চিরকাল। দুটো পাখি পাশাপাশি দুটো খাঁচার মধ্যে থেকে সার্থক হতে পারে না কি?'

'না আপনিই বনের পাখি, আমিই সোনার খাঁচায় থাকি। বেশ, তাই হোক্, আপনি মুক্ত। আমার কপালে যা লেখা আছে, তাই হোক, আপনি মুক্ত। আপনি আর আসবেন না।'

'না আসব, তবু। সেইজন্যই ত' আপনাকে দেবী মনে করে পুজো করি। আপনি মানুষ নন্, আপনি দেবী।'

"সমগ্র জাতিব প্রতিনিধি হয়ে, বিশ্বসভ্যতার উন্নতির ভার স্কন্ধে নিয়ে, দেবীত্বের দায়িত্বে তোমার স্ত্রী ঠিক্ সপ্তম দিনের মাথায় খানিকটা প্রকৃতিস্থ হলেন।"

"আমার স্ত্রীকে না ভালোবেসে থাকতে পারছিনে যে হে। মোটে সাতদিনে ঠিক হয়ে গেলেন।"

"হাঁ মোটে সাত দিন। ধন্য আর্য ঋষিবা।"

"কিন্তু সীতা, সাবিত্রীর আদর্শ সামনে ধবলে না ত'?"

"আজকাল ও ব্রহ্মাস্ত্র একটু ভোঁতা হয়ে পড়েছে।"

"সে যাক্‌গে। সেরে ত' গেলেন, তারপব কি হল বল?"

"সে তুমিই জান।"

"আমি কিছুই জান না। সবই তোমার সৃষ্টি তুমিই বল।"

"তারপর, তোমার স্ত্রী তোমাকেই পূজা করতে আবম্ভ কবলেন। সেবা আবম্ভ হল। আলমারি থেকে গবদেব লালপাড়ে শাড়ি বেবোল। ফলে পনের দিনেই তোমাব ওজন-বৃদ্ধি। তুমি প্রথমে একটু হতভম্ব হযে গেলে। স্ত্রীজাতির চরিত্র একটু খামখেয়ালী ধরণের জানা থাকলেও তুমি অতিষ্ঠ হযে উঠলে। ঠিক সন্ধ্যার সময় তুমি আর বাড়ি আস না, তোমার অসতে রাত হতে লাগল। হাতের কাছে নিশ্চিতের সন্ধান পেলে এক তোমাব বন্ধু ছাড়া অতি বড়ো সাধুও বিগড়ে যায়। আচ্ছা, তোমাকে একটু দুশ্চরিত্র করব? গল্পটা জমে।"

"না, না, তা কোরো না। কি জানি, তুমি যদি ছাপিয়ে দাও। ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশতে হয়, কনট্র্যাক্ট পাব না।"

"সে ভয় নেই। বেশ, পূজা পেয়ে পেয়ে তোমার হৃদয় পূজারিণীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠ্‌ল। সেইজন্যই হয়ত ডিহিরি কি কাটনীতে চুণের পাহাড় দেখাতে নিয়ে গেলে। সেখান থেকে তোমাদের দুজনেবই স্বাস্থ্যের উন্নতি হল।

"যেদিন ফিরে এলে সেইদিন সন্ধ্যাবেলা তোমার বন্ধু তোমার বাড়িতে হাজরে দিলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর তুমি অফিস থেকে ফিরলে। তোমার স্ত্রী বৈঠকখানায় এলেন। তোমার বন্ধুর সঙ্গে তাঁকে গল্প করতে ব'লে তুমি ভেতরে গেলে। এ-ক'টা মিনিট কি awkwardly কাট্‌ল তা ভগবানই জানেন। সোন নদ কতটা চওড়া, চুণ কি করে পোড়ান হয়, ও অঞ্চলে কি কি খাবার জিনিস পাওয়া যায় না, যেগুলি যায় তার দাম কত বেশি, রাতে বাঘ এসে গ্রামের গরু বাছুর নিয়ে যায়—এ সব কথা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চলে, কিন্তু একবার যাদের মধ্যে প্রাণের কথা জানাজানি হয়ে গিয়েছে তাদের মধ্যে একেবারেই অচল। তুমি যখন ঘরে এলে, তখন তোমার বন্ধু, একটু, অনুযোগের স্বরে বল্‌লেন, 'বনে জঙ্গলে কেমন রইলে একবার খবর দিতে পারতে ত'? ও অঞ্চলটা কখনও দেখিনি, শুনছি খুবই চমৎকার।' তুমি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বল্‌লে, 'আমারও

ইচ্ছা হত, সময় পাইনি, ওঁরও সময় ছিল না, উনিও সারাদিন আমার সঙ্গে বেড়াতেন'।"

'ও সেইজন্যই বুঝি স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে।"

'তা ছাড়া—হ্যাঁ গা, যাবার সময় আমাকে কি স্বীকার কবিয়ে নিয়েছিলে তুমি, বলি?' তোমাব স্ত্রী উঠে গেলেন। এমন সাহস হল না যে তোমাকে মুখের ওপব রাগ প্রকাশ করেন। তিনি চলে যাবার পর বন্ধুর পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে একটু নীচু স্ববে তুমি বল্‌লে—

'ওঁর ভাই আমাকে নিয়ে একটু বাই হয়েছে। যাবার সময় একটা খাম টিকিট চিঠির কাগজ পর্যন্ত নিয়ে গেল না হে, ওখানে কিছুই পাওয়া যায় না। এত ক'রে বল্‌লাম। উত্তর দিলে, আমবা দু'জন আলাদা থাকব, কেবল তুমি আর আমি, আমিও কাউকে লিখব না, তুমিও লিখবে না। আব, কাউকে আসতে বলে হাঙ্গামা বাধিও না, ওখানে খাবার-দাবার পাওয়া যায় না। আদত ব্যাপার, আমি যেন কাউকে চিঠি না লিখি, ওঁরই কাছে কাছে থাকি। একেবারে জোঁক হে, জোঁক হয়ে উঠেছে। কতদিন এ খেয়াল থাকে দেখি। তবে সেখানে যেটা মন্দ ঠেকেনি, এখানে তা ঠেক্‌বে না নিশ্চয়। এটা কাজের জগৎ। তুমি ভাই মাঝে মাঝে আগের মতনই এস। আমায় ত' খেটে খেতে হবে।'

"আচ্ছা এখন তোমার বন্ধুর মনে কি হল বল ত'?"

"সে আমি কি জানি? চল রাত হয়েছে।"

"তোমার বন্ধুর মনে যে ভাব হল তারই আভাস পাবে রবিঠাকুরেব গানটিতে—'একদা তুমি প্রিয়ে।' চল, সংগীত-সমালোচনা শেষ হল।"

আ ম্মা

সীতা দেবী

বছর দুই তিন রেঙ্গুনে থাকিয়া বিনোদিনী যেদিন স্বামীর মুখে শুনিলেন যে, এখান হইতে বাস হয়ত বা তাঁহাদের উঠাইতে হইবে, তখন তাঁর মুখে যে ভাবটা ফুটিয়া উঠিল, তাহাকে বিয়োগ বলিয়া কিছুতেই বর্ণনা করা যায় না। স্বামী নৃপেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতদিন থাকলে, একটু কষ্ট হচ্ছে না, দেশটা ছেড়ে যেতে?"

বিনোদিনী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "বিন্দুমাত্র না। এখানে এমন কি আছে শুনি যেটা ছাড়তে দুঃখ করব? এক যা ভাবনা খোকাকে নিয়ে।"

নৃপেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকাকে নিয়ে আবার কি ভাবনা হল? সে তো তোমার সঙ্গেই যাচ্ছে।

বিনোদিনী বলিলেন, "সে ত যাচ্ছে, কিন্তু তার 'আম্মা' সঙ্গে না থাকলে যে আহার নিদ্রা কিছুই হয় না। দুদিনে আমাকে যমের বাড়ির দিকে বেশ খানিক এগিয়ে দেবে ছেলে। বড়োও হয়েছে, সহজে ভুলবেও না। অন্য ঝি চাকর রাখলে তাদের কাছে যাবেও না।"

নৃপেশ এবং বিনোদিনীর একমাত্র সন্তান খোকার আর কোনো নবাবী থাক্ বা না থাক্, একটি খাশ পরিচারিকা ছিল। তাহাকে ঘরের সকলে ডাকিত 'আয়া' কেবল খোকা কেন জানি না, তাহার নামকরণ করিয়াছিল 'আম্মা'। আয়া জাতিতে মাদ্রাজী, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, রং ঘোর কালো এবং মেজাজটা, ভদ্রভাষায় বলিতে গেলে, অতিরিক্ত তেজালো। নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে নাম তাহার নিশ্চয়ই একটা কিছু ছিল, কিন্তু এ বাড়ির কেহ সে নামের কোনো খোঁজ কখনও পায় নাই। 'আয়া' এবং 'আম্মা' এই ছিল তাহার এখানকার পরিচয়। খোকা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে

এ বাড়িতে আসে, এবং কখনও যে সে এখান হইতে যাইবে এমন ভাবনা তাহার বা তাহার মনিবদের, কাহারও মনেই আসে নাই।

কিন্তু বর্মা ছাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনাতেই ষোলো আনা গোলমাল বাধিল। আয়া দেশ ছাড়িবে না, এবং খোকা আয়াকে ছাড়িবে না। এ অবস্থায় করা যায় কি?

নৃপেশ বলিলেন, "কি আর করা যাবে? দিনকতক ছেলের চিৎকার শোনবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই থাক। যতই কেননা খোকাকে ভালোবাসুক, তাই বলে নিজের দেশ, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে কখনই যেতে রাজি হবে না।"

বিনোদিনী বলিলেন, "আচ্ছা বলেই দেখি না। বলতে দোষ কি? হাজার হোক, মেয়েমানুষের জাত ত? ভালোবাসার খাতিরে দেশ, আত্মীয়স্বজন ছাড়া তাদের অভ্যাসই আছে।"

নৃপেশ বলিলেন, "তোমার খুশি।"

খোকা এবং খোকার আয়া এই সময় বেড়াইয়া ফিরিল। বিনোদিনী অনেক ইতস্ততঃ করিয়া কথাটা পাড়িয়াই ফেলিলেন।

আয়া বেশ খানিকক্ষণ ভাবিয়া লইল। মনে মনে ব্যাপারটা ভালো কবিয়া তৌল দাঁড়িতে ওজন করিয়া লইল বোধ হয়। তাহার পর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যায়েগা আম্মা।"

বিনোদিনী অবাক হইয়া গেলেন। এত সহজে যে আয়া রাজি হইবে তাহা তিনি মোটেই ভাবেন নাই। বলিলেন, "তুমকো জাস্তি তলব দেগা"

আযা বলিলেন, "নেহি মাংতা মা। তলবকো ওয়াস্তে নেহি যাতা হাম্। বিশ রুপিয়াই তুম দেও।" বলিয়া খোকাকে লইয়া সে আর একপালা বেড়াইতে বাহিব হইয়া গেল, যদিও রোদ তখন বেশ কড়া হইয়া উঠিয়াছিল। বিনোদিনী বাবণ কবিলেন না। আযা যাইতে রাজি হওয়ায় তাঁহাব মাথা হইতে যেন একটা প্রকাণ্ড বোঝা নামিয়া গেল। ছেলে যা দুরন্ত, কারো সাধ্যি নাই যে, তাহাকে আঁটিয়া উঠে। দিনের বেলায় উৎপাত না হয় কোনোক্রমে সহিয়া থাকা গেল, কিন্তু রাত্রেও কাহাকেও নিষ্কৃতি দেওয়া খোকার কুষ্ঠিতে লেখা ছিল না। এক এক বাত্রে সে সমানে আট দশ ঘন্টা অপ্রতিহত বিক্রমে চিৎকার করিয়া যাইত। বকুনি, মার কিছুকেই গ্রাহ্য করিত না। তার আব্দার যে সে কোলে চলিয়া বেড়াইবে। রাত্রিটা যে ঠিক এমন আব্দার করিবার সময় নয়, এ জ্ঞান তাহার মোটেই ছিল না। বিরক্তিতে দিশাহারা হইয়া নৃপেশ এক রাত্রে ছেলের গালে বেশ বিরাশী শিক্কা ওজনের একটি চড় লাগাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য খোকার চেঁচানি তাহাতে একটুও থামিল না এবং তাহার সঙ্গে বিনোদিনীর বকুনি জুটিয়া ঘুমকে সম্পূর্ণরূপে দেশছাড়া করিয়া দিল।

কিন্তু সকালে উঠিয়া নৃপেশ দেখিলেন যে, বকুনির পালা রাত্রে মোটেই শেষ হয় নাই। সেটা উপক্রমণিকা মাত্র। আযা সকালে আসিয়া যখন শুনিল যে, খোকাবাবু রাত্রে কাঁদার জন্য মার খাইয়াছে, তখন সে স্থান কাল পাত্র সব ভুলিয়া গিয়া বকুনি জুড়িয়া দিল। এই জিনিসটিতে খোকার আম্মার জুড়িদার পাওয়া রেঙ্গুন শহরেও সম্ভব ছিল না। কাজেই নৃপেশ চা খাইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ির বাহিরে প্রস্থান করিলেন, এবং বিনোদিনী বহুদিনের তুলিয়া রাখা একটা সেলাই পাড়িয়া লইয়া গভীর মনোযোগ সহকারে সেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল চাকর হরনাথ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ছোটোলোককে লাই দেওয়া বিষয়ে গুটিকয়েক মন্তব্য প্রকাশ করিল।

সেদিনও সন্ধ্যা সাতটা বাজিতে-না-বাজিতে বিনোদিনী হরনাথকে খোকার এবং নিজের খাওয়ার জন্য যথারীতি তাড়া দিতে লাগিলেন। আয়া সাড়ে সাতটায় চলিয়া যায়, তার আগে খাওয়া না সারিলে ছেলের উৎপাতে বিনোদিনীর খাওয়াই হয় না। খোকার মাগুর মাছের ঝোল ভাত আয়াই খাওয়াইয়া দিল, তাহার পর তাহাকে ঘুম পাড়াইতে লইয়া গেল।

ছেলে ঘুমাইলেই আয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু বিনোদিনী খাইয়া আসিয়া দেখিলেন, সেদিন আয়া

যায় নাই। খোকার খাটের পাশে ছেঁড়া মাদুর বিছাইয়া মহা আনন্দে নিদ্রা দিতেছে। তিনি খানিকক্ষণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর আয়াকে ঠেলা দিয়া উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘর নেহি যায়েগা?"

আয়া হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, সে রাত্রে থাকিবে, খোকাবাবুকে মার খাইতে দিতে সে পারিবে না। আম্মা বাবু ঘুমান, সে খোকাকে লইয়া বেড়াইবে। আম্মার কাছে চারটা পয়সা থাকিলে যেন তাহাকে দেওয়া হয়, সে রুটি কিনিয়া খাইবে।

রাত্রে নির্বিঘ্নে ঘুমাইতে পাইবার আশায় বিনোদিনী খুশি হইয়া তাহাকে চার আনা পয়সা দিয়া ফেলিলেন।

এই ব্যবস্থাটাই কায়েমী হইয়া গেল। নৃপেশ এবং বিনোদিনীব ছুটি মিলিয়া গেল। রাত্রের চৌকিদারিতে ভর্‌তি হইল আয়া। সারারাত খোকাকে কোলে করিয়া টহল দিয়াও তাহার যে কিছু মাত্র ক্লান্তি হইয়াছে তাহা মনে হইত না। দিনেও সে সমান উদ্যমেই কাজ করিয়া যাইত। মাহিনা বাড়াইবার প্রস্তাব বিনোদিনী একবার করিলেন, কিন্তু আয়া রাজি হইল না। দুনিয়ায় তাহাব কেহই নাই, বেশি টাকা লইয়া সে কি করিবে?

এইভাবে কিছু দিন চলিয়া গেল, তাহার পর আসিল এই কলিকাতা যাওয়াব প্রস্তাব। ইহাতেও আয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিল না দেখিয়া বিনোদিনী অবাক হইয়া গেলেন। নৃপেশ বাড়ি আসিলে বলিলেন, "ওগো, খোকা যে ওকে 'আম্মা' ডাকে সেটা কিছু মিছে নয়। আর জন্মে ঐ ওব মা ছিল, তা না হলে এতখানি স্বার্থত্যাগ কেউ পরের ছেলের জন্যে কবে না।"

নৃপেশ একটা সময়োচিত রসিকতা করিয়া কথাব স্রোতটা অন্য দিকে ফিবাইয়া দিলেন।

কলিকাতা যাত্রার দিন দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। রাশ বাশ জিনিস-পত্র গুছাইয়া বাক্সে ভরিয়া, বিছানা বাঁধিয়া, টিফিন বাস্‌কেট সাজাইয়া বিনোদিনী অনেক কষ্টে কাজ শেষ কবিলেন। আয়ার জিনিসের মধ্যে ছোটো একটা বেতেব বাক্স, তাহাব জিনিস গুছাইতে বেশি সময় লাগিল না। ক্রমাগত খোকাকে কোলে লইয়া সে গলির এ মোড় হইতে ও মোড় ঘুরিতে লাগিল। এই মাটির সঙ্গে তার আজন্মের পরিচয়। ইহাকে আজ সে ছাড়িয়া চলিল। কোনোকালে ইহাব কোলে আবার ফিরিয়া আসিবে কি না ভগবানই জানেন।

ষ্টিমারে উঠিয়া আবার অস্বস্তির সীমা বহিল না। জীবনে সে কখনও জলযাত্রা কবে নাই, এই প্রথম। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। আনুষঙ্গিক উপসর্গও দেখা দিল। কিন্তু খোকা ছাড়িবার পাত্র নয়। "আম্মা-আ" করিয়া সে যথারীতি চিৎকার জুড়িয়া দিল। বিনোদিনী তাহাকে কোলে করিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন, বিস্কুট, কমলালেবু প্রভৃতি ঘুষ দিলেন, কিন্তু খোকার সুর থামিল না। নৃপেশ আসিয়া ছেলের হাত ধরিয়া এক হ্যাঁচ্‌কা টান দিতেই আয়া উঠিয়া বসিল। বাবুব হাত হইতে খোকাকে টানিয়া লইয়া সে টলিতে টলিতে ডেকে চলিল বেড়াইতে।

এই ভাবে ষ্টিমারের তিনটা দিন কাটিয়া গেল। কলিকাতায় নামিয়া বিনোদিনী যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। নৃপেশও আবার পুরাতন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিকে দেখিবার আশায় খুশিই হইলেন। কেবল মুখ ভার করিয়া রহিল খোকা এবং তাহার আম্মা।

কিন্তু মানুষের সব অবস্থাই সহিয়া যায়। ক্রমে কলিকাতার রাস্তা-ঘাট চেনা হইয়া গেল, কোথায় কিসের দোকান, কোথায় জিনিস সস্তা, কোথায় বেশি দাম, সব আয়ার জানা হইয়া গেল। পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাবসাবও অল্প অল্প হইল, বাংলা কথাও ভাঙা ভাঙা দু চারটা বাহির হইতে লাগিল। বোঝা গেল এখানে থাকাটা বিধির বিধান বলিয়া সে স্বীকারই করিয়া লইয়াছে, তাহাকে লইয়া আর সংসারে গোলমাল বাধিবে না।

কিন্তু সাজানো সংসার ভাঙিবার কর্তা যিনি, তিনি আড়ালে বসিয়া নিজের অয়োজন সম্পূর্ণ

করিতেছিলেন। হঠাৎ চারদিনের অসুখে, স্বামী, শিশুপুত্র, সাজানো সংসার, সব কিছুর মায়া কাটাইয়া বিনোদিনী বিদায় হইয়া গেলেন। নৃপেশের বুকে এমন একটা ঘা লাগিল যে তিনি জগৎ সংসারে কোনো কিছুর দিকে কয়েক দিন তাকাইতেই পারিলেন না।

তাঁহার ছিল যন্ত্রপাতির কারবার। স্ত্রী মারা যাইবার পর মাস খানেক তিনি সেদিকে বিন্দুমাত্রও মন দিতে পারিলেন না। ফলে যা ঘটিবার তাহা ঘটিল। বিস্তর ঋণের বোঝা তাঁহার স্কন্ধে চাপাইয়া কারবারটি ফেল হইয়া গেল।

কিন্তু বুকে শোকের শেল যত কঠিন হইয়াই বাজুক, মানুষকে পেটের অন্নের সন্ধানে বাহির হইতেই হয়। যে একলা, তাহার তবু দু'দিন বসিয়া কাঁদিবার ছুটি আছে। যার ঘরে শিশুসন্তান বা আশ্রিত আছে, তাহার সে ছুটিও নাই। পত্নীর জন্য অশ্রুপাত করিবার ছুটি নৃপেশও পাইলেন না। খোকাব মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে রোজগারের চেষ্টায় বাহির হইতে হইল। কলিকাতার বাজারে চাকরি যে কেমন সুলভ তাহা চাকরির উমেদারদের বেশ ভালো কবিয়াই জানা আছে। যাহা হউক, নৃপেশকে ক'দিন আগেই আপনাব অনুগ্রহের বড়ো একটা পরিচয় দিয়া নিয়তি দেবী কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার আব ঐ হতভাগ্যের প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ ছিল না। সুতরাং খুব ভালো না হইলেও কাজ চালানো গোছের চাকরি একটা নৃপেশের জুটিয়াই গেল। সমব্যবসায়ী এক সাহেবের নিকট সামান্য কমিশনে দালালিব কাজ জুটাইয়া, নৃপেশ, পুবাতন বাড়ি ছাড়িয়া এক এঁদো গলিতে, ছোটো এক বাড়িতে আসিয়া উঠিলেন।

মুস্কিল হইল ঝি চাকর লইয়া। সামান্য আয়ে দুটিই রাখা চলে না। অথচ একজনেব দ্বারা সব কাজ হওয়াও শক্ত। বিনোদিনী বাঁচিয়া থাকিতেই যখন দু'জন না হইলে চলিত না, তখন এখন যে চলিবে না তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আয়ের কথাও ভাবিতে হয়।

নৃপেশ ঠিক করিলেন, হরনাথকেই বিদায় দিবেন, তিনজনের বান্না আয়াই কোনোমতে চালাইয়া লইবে। না হয় খাওয়ার কিছু অসুবিধাই হইবে। কিন্তু আযাকে বিদায় দেওয়াই প্রথমত শক্ত, তাহাকে স্বদেশ আত্মীয়স্বজন সব কিছু হইতে ছাড়াইয়া আনা হইযাছে। দ্বিতীয়ত, খোকাকে সামলানো একেবারে অসম্ভব হইবে। তাহার মা তাহাকে চিবদিনেব জন্য ছাড়িয়াছে, ইহাব পব আম্মাও যদি ছাড়ে, তাহা হইলে খোকাকে বাঁচাইয়া রাখাই হইবে দায়।

অতএব হবনাথই বিদায হইল। অন্য এক বন্ধুব বাড়ি তাহাব কাজ জুটাইযা দিযা, নৃপেশ মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

আয়া খোকাকে কোলে করিয়াই বান্না কবিতে চলিল। লঙ্কা এবং তেঁতুল প্রচুব পরিমাণে খবচ কবিযা সে যে অপূর্ব সুখাদ্য প্রস্তুত করিল, তাহাব একগ্রাস মুখে লইয়াই নৃপেশের দম আটকাইবাব জোগাড় হইল। আয়া পাছে বুঝিতে পারিযা মনে আঘাত পায় এই ভয়ে তিনি কিছু না বলিয়া খাইবাব চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আয়ার বুদ্ধির অভাব কিছুমাত্র ছিল না, সে বুঝিতেই পারিল, এবং তাহারই চোখে জল আসিল সবার আগে।

পরদিন নৃপেশ গিয়া হরনাথকে ডাকিয়া আনিলেন। আয়া এবার জোর করিয়াই বিদায় হইয়া গেল। বাবুর দুই চাকর রাখিবার মতো অবস্থা নয়, তাহা সে ভালো করিয়াই জানিত। তাহার দ্বারা যখন সব কাজ চলিল না, তখন তাহার যাওয়াই ভালো। খোকাকে লুকাইয়া সে পলাইয়া গেল। নৃপেশ জিজ্ঞাসা করায় বলিল যে নিকটেই তাহার মুলুকওয়ালী এক স্ত্রীলোক আছে, সেখানে গিয়া সে প্রথমে উঠিবে, তাহার পর অন্য কাজ দেখিয়া লইবে। নৃপেশ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ঝাল তরকারি খাইয়াও দিন চলিত, কিন্তু খোকাকে সমস্ত দিন ঘাড়ে করিয়া তিনি কাজই বা কেমন করিয়া করিবেন, আহার নিদ্রাই বা কেমন করিয়া সম্পন্ন করিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

খাওয়াটা সেদিন ভালোই হইল। কিন্তু ঘুম আর তাহার পর জমিল না। রাত বারোটা অবধি

নৃপেশের কাজ সারিতেই গেল। হরনাথ ততক্ষণ চিৎকার-পরায়ণ খোকাকে ঘাড়ে করিয়া বারান্দাময় দৌড়িয়া বেড়াইল। রোজকার অভ্যাস মতো সকাল ছ'টার জন্য ঘড়িতে 'এলার্ম' দিয়া নৃপেশ শুইতে গেলেন। চাকর আসিয়া খোকাকে তাঁহার পাশে শোয়াইয়া দিয়া, হাঁফ্ ছাড়িয়া নিজে খাইতে শুইতে গেল। খোকা অনেকক্ষণ চেঁচামেচি করিয়া শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই তাহার বাবার মনে একটা ক্ষীণ আশার উদয় হইল যে, রাতটা হয়ত বা ভালোয় ভালোয় কাটিয়া যাইবে।

কিন্তু খোকাবাবুর এলার্ম বাজিয়া উঠিল—সকাল হইবার ঢের আগেই। হরনাথ এবার একেবারেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। তাহাকে বারকয়েক ডাকাডাকি করিয়া নৃপেশ দেখিলেন, তাহার ঘুম আজ আর ভাঙিবে না। বিরক্তচিত্তে নিজেই সারারাত পুত্রকে বহন করিয়া বেড়াইলেন। মৃত পত্নীর মুখ স্মরণ করিয়া ছেলের গায়ে হাত তুলিতেও পারিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, এই রেটে চলিলে খোকাকে পিতৃহীন হইতেও বেশি দেরি হইবে না। আয়ার উপর বিরক্তিতে তাঁহার মন তিক্ত হইয়া উঠিল। এত বেশি আত্মসম্মানের ঘটা না দেখাইলেই কি চলিত না? তিনি ত তা'কে যাইতে বলেন নাই?

সেদিন আফিসে গিয়া অনেকের কাছেই নিজের দুঃখের কথা গল্প করিলেন। মনটা পড়িয়া রহিল বাড়িতে। ছেলেটা না জানি কি করিতেছে। হরনাথের উপর বিশ্বাস এবং ভক্তি তাঁহার অনেকটাই চটিয়া গিয়াছিল। নিজের অসুবিধা করিয়া সে যে খোকাব তত্ত্বাবধান ভালো কবিযা করিবে, তাহা ভাবিতে আর তাঁহার ভরসা হইল না।

বন্ধুবান্ধব অনেকে সময়োচিত উপদেশ দিলেন।—'এ বকম গৃহশূন্য হ'য়ে আর কতদিন থাকবে? বেশ বড়ো সড়ো দেখে একটি ঘরে আন, ছেলেও দেখবে, তোমাকেও দেখবে। ওসব ঝি চাকর দিয়ে কি আর ছেলে মানুষ হয়? নৃপেশ ঘৃণায় আর ক্ষোভে তাহাদের দিকে আর ভিড়িলেন না।

বাড়িতে আসিয়া নৃপেশ হরনাথের কাছে খোকার অপকর্মের মস্ত বড়ো এক তালিকা পাইলেন। এ সমস্যার কি যে সমাধান কিছু ভাবিয়া পাইলেন না। হরনাথ খাইতে ডাকিলে, রাত্রে খাইবেন না, বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। শোবার ঘরে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন, খোকা আর্তনাদ করিতে করিতে খাওয়া শেষ করিতেছে। গেলাস বাটিতে লাথি মারিয়া, চাকরকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া সে যে আসর জমাইয়া তুলিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতেই পারলেন।

নিজের কাজ শেষ করিতে বসিয়া নৃপেশ চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, "খোকাকে শীগ্‌গির করে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যা।"

হরনাথের আপত্তি ছিল না। খোকাকে ঘাড়ে করিয়া, ছুটাছুটি করিয়া, তাহাকে দোলাইয়া, নাচাইয়া, ভাঙা গলায় গান গাহিয়া, সে কোনোরকমে তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া দিল। নৃপেশ ঘড়িব দিকে চাহিয়া দেখিলেন রাত সাড়ে নয়টা। নানা কারণে শরীর মন বড়োই শ্রান্ত ছিল, বারোটা অবধি কাজ করিতে আর ইচ্ছা হইল না। ঘড়িতে এলার্ম না দিয়াই ছেলের পাশে তিনি শুইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন এক আধ ঘন্টা যাহাই হউক ঘুমাইয়া লওয়া যাক্। খোকাবাবু কতক্ষণই বা নিষ্কৃতি দিবেন?

নৃপেশের ঘুম যখন ভাঙিল, তখন রৌদ্রে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। অবাক্ হইয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন ন'টা বাজিতে পনেরো মিনিট। পাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, খোকার স্থান শূন্য। চিৎকার করিয়া চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা কোথায়?"

হরনাথ হাঁড়ির মতো মুখ করিয়া আসিয়াছিল। মনিবের প্রশ্নে মুখের ভাব কিছু পরিবর্তন না করিয়াই বলিল , "তার আম্মার সঙ্গে বেড়াতে গেছে।"

নৃপেশের নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আম্মার সঙ্গে? সে কখন এল?"

হরনাথ বলিল, "সন্ধ্যে রাত থেকে এসেই ঐ ছোটো ঘরটায় বসেছিল। আমি তখন দেখিনি। আপনারা ঘুমিয়ে যাবার পর যেই খোকা উঠে কাঁদতে শুরু করল তখনই বেরিয়ে এল। সাড়ে পাঁচটা অবধি খোকাকে নিয়ে বেড়িয়েছে, তারপর এই আধঘন্টা খানিক আগে, ঘুম থেকে উঠে তাকে নিয়ে বেড়াতে গেল।"

নৃপেশ হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। না খাইলেও তাঁহার তত আপত্তি ছিল না, যত ছিল রাত্রিদিন পুত্রের চেঁচানি শোনায়। তাহা ছাড়া খোকার অযত্ন হইতেছিল অতিরিক্ত রকমের। আয়াকে বিদায় দিয়া খরচ কমানো তাঁহার চলিবে না, তাহা তিনি খুব ভালো করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। হয় আয় বাড়াইতে হইবে, নয় খরচ অন্যদিকে কমাইতে হইবে।

হরনাথ এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাবুর মুখের ভাব দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। নৃপেশ চুপ করিয়াই আছেন দেখিয়া বলিল, "তাহলে আমাকেই জবাব দিন, বাবু।"

নৃপেশ বলিলেন, "রান্না করবে কে, তুই গেলে?"

হরনাথ উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি আযাই যাবে?"

নৃপেশ বলিলেন, "খোকাকে দেখবে কে?"

হরনাথ বলিল, "দুজনকে রাখবেন না বলেছিলেন যে?"

নৃপেশ বলিলেন, "সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না; তুই যা, নিজের কাজ কর গে।'" হরনাথ অপ্রসন্নমুখে চলিয়া গেল।

ঠিক সেই সময় আয়া তাহার ক্ষুদ্র মনিবটিকে লইয়া বেড়াইয়া ফিরিল। নৃপেশকে দেখিয়া অতি সংক্ষেপে বলিল, "সেলাম বাবু", বলিয়া খোকাকে লইয়া ভিতরে চলিল। নৃপেশ তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন।

আয়া আন্দাজ করিল তলব দেওয়া লইয়া একটা আলোচনা হইবে সম্ভবতঃ। সুতরাং নৃপেশ কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আগেই সে বলিয়া গেল, যে, খোকাবাবুকে ছাড়িয়া সে যাইবে না, নিজের দেশ আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া সে আসিয়াছে এই ছেলের জন্য। এখন তাহাকে যাইতে বলিলে চলিবে কিরূপে? বাবুর টাকা পয়সার টানাটানি সে বুঝিতে পারে, তা না হয় এখন সে তলব না লইল? খোকাবাবু বড়ো হইয়া রোজগার করিতে শিখিলে সে সুদে আসলে সব আদায় করিয়া লইবে। তাহাকে খাইতে দিলে এবং বছরে খান দুই কাপড় দিলেই চলিবে। খোকার মা মারা যাইবার সময় খোকাকে তাহার কাছে দিয়া গিয়াছিলেন, কখনও তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে বারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বাবু তাড়াইয়া দিলেও সে যাইবে না।

ব্যাপারটা তখনকার মতো ঐখানেই চুকিয়া গেল। নৃপেশ একরকম নিশ্চিন্ত হইলেন। চাকর এবং আয়ার ঝগড়া ছাড়া আর কোনো গোলমাল সংসারে রহিল না। কিন্তু এ জিনিসটাও যে নিতান্ত তুচ্ছ নয়, তাহা নৃপেশ কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন। হরনাথ পুরানো চাকর, আয়া স্ত্রীলোক, কাহার পক্ষে যে তিনি দাঁড়াইবেন কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। কোনো রকমে ব্যাপারটাকে কেবলি মুলতুবী রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। ফল কিছু ভালো হইল না। চেঁচামেচি করিয়া যেটা একেবারে চুকিয়া যাইত, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় সেটা কেবল ভিতরে ভিতরে জ্বলিতে লাগিল। আয়া এবং চাকর পরস্পরের চিরশত্রু হইয়া দাঁড়াইল। সুবিধা পাইলেই দু'জনেই যে খুব বড়ো রকম শোধ তুলিবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ রহিল না।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত দিক হইতে আর-এক মস্ত বড়ো উৎপাত আসিয়া জুটিল। গলির মোড়ে এক ঘর সোনার বেণের বাসা। আর কিছু তাহাদের থাক বা নাই থাক, টাকা ছিল এক রাশ। তাহাদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের পোষাকে এবং খেলনায়, কথাবার্তায়, টাকার পরিচয় খুবই পাওয়া যাইত।

একদিন সকালে উঠিয়া দেখা গেল, তাহাদের বাড়ির দেড় বছরের এক খোকা, মস্ত বড়ো

এক ট্রাইসাইক্লে চড়িয়া গলির এ মোড় হইতে ও মোড় পর্যন্ত চষিয়া বেড়াইতেছে। তাহার ছোটো ছোটো পা দুখানার এখনও চাকা চালাইবার মতো দৈর্ঘ্য হয় নাই, কিন্তু বড়ো মানুষের ছেলে ট্রাইসাইক্লে চড়ে এ ধারণাটা কোনো কারণে তাহার পিতা বা মাতার মাথায় ঢুকিয়া থাকিবে। সুতরাং ট্রাইসাইক্ল আসিয়াছে এবং ছেলেকে তাহার উপর চড়াইয়া এক উড়ে বেহারা টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে।

যাঁহাতক দেখা, খোকা আয়ার কোল হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দৌড় দিল। আয়া তাহাকে খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কিধর যাতা?"

খোকা হাত পা ছুঁড়িয়া চিৎকার করিয়া যাহা বলিতে লাগিল, তাহার মর্ম এই যে, সে আর আম্মার কোলে চড়িবে না, তাহারও একটা তিন-চাকাওয়ালা গাড়ি চাই।

উড়ে চাকরটা নিজের মানিবের আর্থিক স্বচ্ছলতায় এবং আম্মার মনিবের দীনতায় বিশেষ প্রীত হইয়া পানরসরঞ্জিত দুই পাটি দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া ফেলিল। আয়া তাহার ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষকে মানবের পদবী হইতে খারিজ করিয়া চতুষ্পদ অস্পৃশ্য জীবের দলে ভর্তি করিয়া উচ্চকণ্ঠে গালি দিতে দিতে খোকাকে কোলে করিয়া ঘবে ফিরিয়া আসিল। হরনাথ তাহার চিৎকার শুনিয়া রান্নাঘর হইতে উঁকি মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল কি হইয়াছে।

উত্তরে আয়া উড়িয়া জাতি সম্বন্ধে অনেক এমন কথা বলিয়া গেল, যাহা তাহারা শুনিলে বিন্দুমাত্রও খুশি হইত না। খোকার চিৎকার তখন পর্যন্ত সমান ভাবেই চলিতেছিল।

এমন সময় নৃপেশ কোথা হইতে বেড়াইয়া ফিরিয়া হরনাথকে ডাক দিলেন, "শীগ্‌গির করে ভাত বাড়', অফিসের বেলা হল।"

খোকা এক ছুটে গিয়া বাপের জামার আস্তিন ধরিয়া টান দিল। নৃপেশ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কি খোকাবাবু?"

খোকা বলিল, "বাবা, আমায় একটা ট্রাইসিক্ল কিনে দেবে?"

নৃপেশের স্বভাবে পারিব না বা দিব না বলার ক্ষমতাই ছিল না। কিছু না ভাবিয়াই ছেলের কথার উত্তরে বলিলেন, "দেব এখন, ছাড় অফিস যাই, তা না হলে সাহেব মারবে।"

খোকার মনে তখন ট্রাইসিক্লের প্রীতি আর সব জিনিস ছাপাইয়া উঠিয়াছে। কাজেই "দেব এখন" শুনিয়া সে কিছুমাত্র খুশি হইল না। জিজ্ঞাসা করিল, "কখন? ও বেলা দেবে?"

নৃপেশ তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বলিলেন, "কাল সকালে দেব। যাও এখন আম্মার কাছে।" সুনির্দিষ্ট সময়ের একটা উল্লেখ করাতে খোকা খুশি হইয়া চলিয়া গেল।

ট্রাইসিক্লের কথা নৃপেশ বেশ নিশ্চিন্ত মনে ভুলিয়া গেলেন; কিন্তু খোকা ভুলিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না। সকালে উঠিয়া নৃপেশ দেখিলেন মহা গণ্ডগোল বাধিয়া গিয়াছে। খোকা মুখ ধুইবে না, দুধ খাইবে না, বেড়াইতে যাইবে না। বাবা তাহাকে সকালে ট্রাইসিক্ল দিবেন বলিয়াছেন. সে তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

নৃপেশের মাথার আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। ট্রাইসিক্ল দিবার ক্ষমতা তাঁহার কোথায়? এই দীন-হীন ভাবে সংসার চালাইতেই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। কেনই বা তিনি মুর্খের মতো ছেলেকে ও কথা বলিতে গেলেন? টাকা ধার পাইলেও না হয় কিনিয়া দিতেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুর দল বুদ্ধিমান জীব, টাকা ধার নিতে তাহারা সর্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু ধার দেওয়াটাকে তাহারা প্রাণপণ শক্তিতে এড়াইয়া চলে।

কিন্তু মাতৃহীন একমাত্র সন্তান; তাহাকে না থামাইলেও নয়। একটা ভুলকে আর একটা ভুল করিয়া তিনি চাপা দিলেন। বলিলেন, "এখন যাও বাবা খেলা করগে, কালকে নিশ্চয় দেব।" খোকার জেদ্ ভাঙিল। সে দুধ খাইয়া বেড়াইতে গেল।

অফিসের কাজ সারিয়া নৃপেশ সারা বিকালে চেষ্টা করিয়া বেড়াইলেন, যদি কোথাও ধারে বা মাসে মাসে টাকা দেওয়ার করারে ট্রাইসিক্ল পাওয়া যায়। তাঁহাকে ধার দিতে কেহ রাজি নয়। টাকা ধার করিবার চেষ্টা করিলেন, কোথাও পাওয়া গেল না। সন্ধ্যা বেলায় অবসন্ন দেহমন লইয়া ফিরিয়া আসিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। চাকর ডাকাডাকি করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতে পারিল না।

পরদিন সকালে তাঁহার আর উঠিতে ইচ্ছা করিল না। ছেলের কাছে তিনি মুখ দেখাইবেন কেমন করিয়া? মাথা পর্যন্ত কাপড় মুড়ি দিয়া তিনি শুইয়াই রহিলেন। কিন্তু খোকা অত সহজে ভুলিবার পাত্র নয়। সে আসিয়া তাঁহার মুখের কাপড় ধরিয়া টানাটানি শুরু করিল। "বাবা, ও বাবা, শীগ্‌গির ওঠ। আমার গাড়ি নিয়ে আসবে না?"

নৃপেশের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। হায় রে, অক্ষম পিতৃস্নেহ। এতটুকু সাধ্য নাই যে, ছেলের সামান্য একটা আবদার রক্ষা করিতে পারে? খোকাকে কি বলিবেন তিনি?

খোকা টানাটানি করিয়া তাঁহার মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আমাব ট্রাইসিক্ল কোথায়? কখন যাবে, সেটা আনতে?"

নৃপেশ মরিয়া হইয়া ছেলেকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "তুমি বড়ো বাঁদর হয়েছ, সারাক্ষণ কেবল বিরক্ত কর। যাও এখন।"

এতখানি রূঢ় ব্যবহার তাহার ক্ষুদ্র জীবনে সে কখনও কাহারও কাছে পায় নাই। মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সে কাঁদিয়া বাড়ি ফাটাইয়া ফেলিবার জোগাড় করিল।

আয়া পাশের ঘবে বসিয়া খোকার জামায় বোতাম লাগাইতেছিল। কান্না শুনিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। বাবুকে বেশ নরম গরম কিছু শুনাইবে ভাবিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া দেখিল, তিনি খাটের উপর বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আছেন। আঙুলের ফাঁকে চোখের জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

খোকাকে একটানে মেঝে হইতে কোলে উঠাইয়া আয়া বাহিরে চলিয়া আসিল। একেবারে দুই আনার লজেন্স কিনিয়া তাহার হাতে দিয়া খানিকক্ষণের মতো তাহাকে চুপ করাইল। তাহার পর বলিল, "খোকাবাবু তুম বদমাস্ হ্যয়, বাবাকো মারা?"

খোকা অবাক হইয়া বলিল, সে মোটেই বাবাকে মারে নাই, ববং বাবাই তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়াছে। আয়া বলিল, বাবার কাছে খোকা যেন আর গাড়ি না চায়, তাহা হইলে খোকাকে সে খুব ভালো জিনিস দিবে। বাবার কাছে গাড়ি চাহিলে বাবা আবার কাঁদিবে, লক্ষ্মী ছেলেরা বাপকে কাঁদায় না।

এত বড়ো ত্যাগ স্বীকার করা খোকার পক্ষে বড়োই কঠিন ছিল। কিন্তু বাবাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহারও শিশুমনে বিষম একটা ধাক্কা লাগিয়াছিল। ভয়ে বিস্ময়ে সে এক রকম আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কাজেই বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আম্মার মুখের দিকে চাহিয়া সে স্বীকার করিয়া লইল যে, সে আর বাবার কাছে ট্রাইসিক্ল চাহিবে না।

বাড়ি ফিবিয়া আসিয়া আয়া দেখিল, বাবু তখনও বাহির হন নাই, চাও খান নাই। সেই একই জায়গায় অভিভূতের মতো বসিয়া আছেন। সে আস্তে আস্তে খোকাকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। খোকা বাবার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, "বাবা, আমার ট্রাইসিক্ল চাই না, তুমি চা খাও।"

নৃপেশ তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। খোকা আয়ার দিকে চাহিয়া দেখিল তাহারও চোখে জল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া সেও কাঁদিয়া ফেলিল। গাড়ির নামে সবাই মিলিয়া কেন যে কান্নাকাটি শুরু করিয়াছে, বেচারা কিছুই বুঝিতে পারিল না। আয়া তাহাকে কোলে করিয়া অনেক কষ্টে শান্ত করিল।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া, আয়া বাহিরে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিল। হরনাথের সঙ্গে সে পারতপক্ষে কথা বলি ।। আজ তাহাকে ডাকিয়া মিষ্ট কথায় বলিল, যে, বিশেষ দরকারে সে বাহিরে যাইতেছে। খোকা জাগিলে হরনাথ যেন তাহাকে দুধ খাওয়াইয়া দেয়, এবং একটু দেখে। চারিটার মধ্যেই সে ফিরিয়া আসিবে।

হরনাথের আয়ার কাজ করিয়া দিবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে রাজি না হইয়া পারিল না।

খোকা যথাকালে জাগিয়া উঠিয়া আয়াকে না দেখিয়া মহা চিৎকার জুড়িয়া দিল। হরনাথ দুধ খাওয়াইতে গেলে তাহাকে লাথি মারিয়া হাত হইতে দুধ ফেলিয়া দিল। সৌভাগ্যক্রমে আয়া আধ ঘন্টা খানিকের মধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা না হইলে খোকার এবং হরনাথের ভাগ্যে কি যে ঘটিত তাহা বলা শক্ত।

আয়াকে দেখিয়া ক্রোধে অভিমানে আটখানা হইয়া খোকা যখন আবার চেঁচানি শুরু কবিবার জোগাড় করিতেছে, তখন আয়া তাহাকে টপ্ করিয়া তুলিয়া শোবার ঘরের ভিতর লইয়া গেল। নূতন একটা ট্রাইসিক্রের উপর তাহাকে বসাইয়া এ ধার ও ধার টানিয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিল। আনন্দ যেন খোকার চোখ মুখ দিয়া উপ্‌ছিয়া পড়িতে লাগিল। হরনাথ ছুটিয়া আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া বিরক্তিতে গজ্ গজ্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। হরনাথ বেতন লইয়া কাজ কবে, এবং আয়া কাজ করে বিনা মাহিনায়, ইহাতে হরনাথ নিজেকে একটু হীন মনে করিত। তাহার উপর মাদ্রাজিনী আজ আবার কোথা হইতে এক ট্রাইসিক্ল জোগাড় করিয়া আনিল। ইহাতে বাবুর নজরে সে যে চাকরের চেয়ে আরো ঢের উর্ধ্বে উঠিয়া যাইবে, সে-বিষয়ে হরনাথের সন্দেহ মাত্র রহিল না। কিন্তু মাগী এত টাকা পাইল কোথায়? নৃপেশ বাড়ি আসিতেই হরনাথ ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে খবরটা দিল। নৃপেশ অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া আয়াকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে এত টাকা পাইল কোথায়? আয়া উত্তর দিল, খোকার মা মারা যাইবার সময় তাহার কাছে কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে বলিয়া গিয়াছিলেন খুব বেশি প্রয়োজন হইলে খোকার জন্য উহা খরচ করিতে।

কথাটা একেবারে অবিশ্বাস্য বলিয়া নৃপেশের মনে হইল না। হইতেও পারে। কিন্তু বিনোদিনীর প্রতি একটু অভিমানও তাঁহার মনের কোণে উঁকি মারিতে লাগিল। তিনি কি ছেলের পর? তাহার যাহা কিছু প্রয়োজন তিনিই দিতেন, তাহার জন্য টাকা রাখিয়া যাওয়ার কিছু দরকার ছিল কি? তাহাও বিশ্বাস করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া যান নাই, অন্য মানুষের কাছে দিয়া গিয়াছেন। তিনি কি ছেলের টাকা চুবি করিয়া লইতেন?

পরক্ষণেই লজ্জা আসিয়া অভিমানকে চাপা দিয়া দিল। বাস্তবিক অভিমান করিবার অধিকাব তাঁহার কোথায়? ছেলের সব প্রয়োজন পূর্ণ করিবার যোগ্যতা তাঁহার আছে কই? সামান্য ব্যাপারেও ত নিজের অক্ষমতাই প্রকাশ পাইতেছে। বিনোদিনী তাঁহাকে ভালো করিয়া চিনিতেন বলিয়াই হয়ত এ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন।

খোকার আহারনিদ্রা প্রায় ঘুচিয়া যাইবার জোগাড় হইল, সে ট্রাইসিক্ল হইতে নামিতেই চায় না। হরনাথ ট্রাইসিক্ল টানিয়া বেশি জোরে দৌড়িতে পারে বলিয়া আয়াকে ছাড়িয়া খোকা ক্রমাগত তাহারই খোঁজ করে। সকালে দেখা গেল, আয়া উঠিবার আগেই তাহারা দু'জন গাড়ি লইয়া গলিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মোড়ের বাড়ির উড়ে চাকর পর্যন্ত তাহাদের সোল্লাস চিৎকারে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে।

আয়ার দুই চোখের দৃষ্টি হিংস্র হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া গিয়া ডাকিল, "খোকাবাবু আও, দুধ পিয়েগা।"

খোকা সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "নেহি যায়েগা, দুধ নেহি পিয়েগা। হরনাথদা, আর একটু

জোরে।”

আয়া খপ্ করিয়া খোকাকে গাড়ি হইতে উঠাইয়া লইল। হরনাথকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, যে সব চাকর মাহিনা লইতে ওস্তাদ, কাজ ফাঁকি দিবার ওস্তাদও তাহারাই। এখনও উনানে আগুন পড়ে নাই, বাবুর অফিসের ভাত কি শূন্য চুলায় সিদ্ধ হইবে? খোকাকে লইয়া খেলিতে তাহাকে ডাকিয়াছে কে? খোকাকে দেখিবার, তাহার কাজ করিবার লোকের অভাব এখনও হয় নাই।

ট্রাইসিক্ল হইতে এমন হঠাৎ তুলিয়া লওয়ায় খোকা প্রাণপণে আপত্তি করিতে লাগিল। সে আয়াকে মারিয়া, কামড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া অস্থির করিয়া তুলিল। আয়া তবু তাহাকে ছাড়িল না। উপরে আনিয়া রুটি, ডিম, দুধ সব খাওয়াইয়া তবে নিষ্কৃতি দিল। ছাড়া পাইবামাত্র খোকা আবার এক দৌড়ে গিয়া হাজির হইল রান্নাঘরে। ডাকিয়া বলিল, “এস হরনাথদা, আবার ঘোড়দৌড় করি।”

আয়াকে আড়ালে যতই গাল দিক এবং মনিবের কাছে তাহার নামে যতই নালিশ করুক, সামনাসামনি তাহার সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা করিতে হরনাথের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। সে বেশ জানিত, বাগযুদ্ধে আয়ার সহিত আঁটিয়া উঠিবার তাহার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। পাঁচ মিনিটেই তাহাকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হইবে, এবং বাবুর কাছে নালিশ করিয়াও কোনো প্রতিকার হইবে না। সুতরাং খোকার আহ্বান সে অগ্রাহ্য করিয়াই গেল। দুই হাতে উনানে কয়লা ঠাসিতে ঠাসিতে কহিল, “যাও, দাদাবাবু, তোমার আম্মার সঙ্গে। আমি গেলে আমায় এখনি আস্ত গিলে খাবে। কাজ কি আমার পরের কাজে হাত দেবার? আমার নিজের কি কাজের কিছু অভাব?”

খোকা অগত্যা আম্মার কাছেই ফিরিয়া গেল। কিন্তু তাহাকে কোলে লইয়া আয়ার যেন বুক আর তেমন করিয়া ভরিয়া উঠিল না। খোকা আর সে খোকা নাই। যে নিজের মাকেও ছাড়িয়া আম্মার কাছে ঝাঁপাইয়া পড়িত, এ যেন সে নয়। হরনাথের মত বিষম লক্ষ্মীছাড়াও ইহাকে ভাঙাইয়া লইতে পারে। খোকাকে নাওয়ানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, সবই সে করিয়া গেল, কিন্তু এই সব অভ্যস্ত কর্মের মধ্যেও ঠিক আগেকার সেই সুরটি যেন লাগিল না। কোনোরকমে দুপুরটা কাটাইয়া দিয়া, বিকালের দিকে সে খোকাকে লইয়া বেড়াইতে যাইবার জোগাড় করিতে লাগিল।

কাপড় চোপড় পরিয়া নিচে নামিবামাত্রই খোকা জেদ্ ধরিল সে ট্রাইসিক্ল চড়িবে। আয়া বিরক্ত হইয়া বলিল দিনরাত কেবল ট্রাইসিক্ল চড়িতে চাহিলে সে গাড়ি লইয়া নদীতে ফেলিয়া দিবে। খোকা এত দুষ্টামি করিবে জানিলে সে মোটেই তাহার জন্য গাড়ি আনিয়া দিত না।

খোকা হাত পা ছুঁড়িয়া কোনোরকমে তাহার কোল হইতে নামিয়া গেল। হামাগুড়ি দিয়া সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে ডাকিল, “হরনাথদা, নিচে এস, আমি তোমার সঙ্গে খেলব। আম্মা দুষ্টু, পাজি, তার কাছে আর যাব না।”

হরনাথ সিঁড়ির দরজার কাছে মাথা বাহির করিয়া বলিল, “না, খোকাবাবু, তোমার আম্মার কাছেই থাক, এই নিয়ে আমি এখন খেয়োখেয়ি করতে পারব না।”

তাহার শ্লেষমিশ্রিত চিবানো কথার সুরে আয়ার আরো হাড়জ্বালা করিতে লাগিল। কিন্তু খোকা পাছে সিঁড়ি দিয়া পড়িয়া যায়, সে ভয়ও ছিল। কাজেই উঠিয়া গিয়া সে আবার খোকাকে নামাইয়া আনিল।

খোকার জেদ সে গাড়ি চড়িবেই। আয়ার নিজের গালে নিজে চড়াইতে ইচ্ছা হইতেছিল। কেন মরিতে সে ট্রাইসিক্ল আনিতে গিয়াছিল? মাঝ হইতে খোকাটা তাহার পর হইয়া গেল। তখনকার মতো অনেক লোভ দেখাইয়া সে খোকাকে ট্রাইসিক্ল ছাড়াইয়া বেড়াইতে লইয়া গেল। তাহারা ট্রামে চড়িয়া চিড়িয়াখানায় যাইবে, সেখানে খোকা বাঘ, ভালুক, হাতি কত কি দেখিবে, ইত্যাদি। কিন্তু ঘণ্টাখানেক এধার ওধার ঘুরিয়া, যখন সে ট্রামেও চড়িল না, চিড়িয়াখানাও গেল না, তখন খোকা

আম্মার উপর আরও চটিয়া গেল। বাড়িতে আসিয়া বাপের কাছে নালিশ করিল, হরনাথের কাছে নালিশ করিল, আয়া খাওয়াইতে আসিলে তাহার হাতে বেশ জোরে কামড়াইয়া দিল।

আয়া বিরক্ত হইয়া তাহার পিঠে ছোটো একটা চড় মারিয়া বলিল, "বহুৎ পাজি হুয়া রে। একদম খুন নিকাল দিয়া।"

খোকা ভ্যাঁ করিয়া উঠিতেই হরনাথ ছুটিয়া আসিয়া-তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। পিঠে হাত বুলাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিল, "মায়ের চেয়ে যে ভালোবাসে তার নাম ডান। বাবুর সামনে তো সোহাগেব শেষ নেই, এদিকে পিছন ফিরলেই ছেলের পিঠে ঠ্যাঙা পড়ে। কেই বা বলতে যাবে? ওরা হল গিয়ে কত পেয়ারের চাকর।"

আয়া বাংলা ভালো না বুঝিলেও, হরনাথের কথার গতিটা যে কোনদিকে তাহা বুঝিতেই পারিল। অন্য সময় হইলে প্রলয়-কাণ্ড বাধিয়া যাইত, হরনাথকে জ্যান্ত গিলিয়া খাইবার জোগাড়ই সে করিত বোধ হয়। কিন্তু খোকার বিশ্বাসঘাতকতায় তাহার মন বড়ো ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে চুপ করিয়াই রহিল, কেবল চোখ দুইটা তাহার হৃতশাবক ব্যাঘ্রীর মতো ভীষণ হইয়া উঠিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া ট্রাইসিক্লটা আর দেখা গেল না। মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। খোকা কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইতে লাগিল। নৃপেশ হরনাথকে রাতদিন সদর দরজা খুলিয়া রাখার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। হরনাথ বাবুর কথার উত্তরে লম্বা বক্তৃতা করিয়া চলিল, বাড়িতেই যে চোর থাকিতে পারে, সে ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িল না। চুপ করিয়া রহিল কেবল আয়া।

ঘন্টাখানিক বকাবকির পর বাড়িটা একটু শান্ত হইল। হরনাথ বাজারে গেল, নৃপেশ কাগজ-পত্র লইয়া কাজ করিতে বসিলেন। খোকা একটি বাটি দুধের আধটা খাইয়া আধটা ফেলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল। আয়ার কোনোও কাজে সেদিন মন লাগিতেছিল না, সে বারান্দায় চুপচাপ বসিয়া রহিল।

হঠাৎ হরনাথ ভীষণ উত্তেজিত ভাবে ছুটিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া সোজা নৃপেশের কাছে গিয়া বলিল, "বাবু, গাড়ির তো খোঁজ মিলেছে।"

আয়া নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিল। নৃপেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় খোঁজ মিলল?"

হরনাথ বলিল, "বড়ো রাস্তার ঐ কোণটাতে এক মাদ্রাজীর সাইকেল মেরামতের দোকান আছে না? সেখানে ভোরবেলা গিয়ে আয়া গাড়িখানা রেখে এসেছে। বিক্রি করতেও বলে দিয়েছে।"

নৃপেশ আকাশ হইতে পড়িলেন। তাঁহার যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। আয়া এমন কাজ করিবে? সে আধটা পয়সার জিনিস কোনোদিন সরায় নাই। যতদিন মাহিনা পাইয়াছে, বেশির ভাগ টাকা খরচ করিয়াছে খোকার পিছনেই। এখন ত মাহিনা লয়ই না, তবু মাতার অধিক যত্নে খোকাকে সে পালন করিতেছে। সে কেন এমন কাজ করিতে গেল? অথচ হরনাথ যে মিথ্যা কথা বলিতেছে তাহাও মনে হয় না। আয়ার বাগ্মিতার খ্যাতি যেরূপ তাহাতে ভালো করিয়া না জানিয়া, তাহার নামে চৌর্যের অপবাদ দিবে, এত বড়ো সাহসী পুরুষ এ পর্যন্ত নৃপেশ দেখেন নাই। কি যে তাঁহার করা উচিত, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

হরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠিক জানিস না, বাজে কথা বলছিস?"

হরনাথ বলিল, "এত বড়ো কথা ঠিক না জেনে বলব বাবু, এত বড়ো বুকের পাটা আমার নেই। ওর সঙ্গে আমার শত্রুতাও নেই কিছু, এত কাল এক বাড়িতে কাজ করছি।"

নৃপেশ আয়াকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে ধীরে ধীরে আসিয়া ঘরের ভিতর দাঁড়াইল। নৃপেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ট্রাইসিক্ল লইয়াছে কিনা। আয়া স্বীকার করিল, সে লইয়াছে।

নৃপেশ আরও বিপদে পড়িলেন। ইহাকে লইয়া কি করা যায়? পুলিশে দেওয়ার কথা ত মনেও

করা যায় না। সে যতদিন বিনা মাহিনার কাজ করিয়াছে তাহাতে একটা ছাড়িয়া চারটা ট্রাইসিক্ল কেনা চলে। হয়ত কোনো অভাবে পড়িয়াই করিয়াছে, নৃপেশ ত তাহাকে কিছুই দিতে পারেন নাই। সে যে চুরি করিতে বাধ্য হইয়াছে, এ ত তাঁহারই লজ্জা। আয়াকে ছাড়ানোর ইচ্ছাও তাঁহার মোটেই হইল না, খোকার তাহা হইলে হইবে কি? কিন্তু ইহাকে কিছু একেবারে না বলিলে অন্য চাকর বাকরে আস্কারা পাইয়া যাইবে।

আয়াকে কোনোদিন কেহ বকে নাই। সে যে মাহিনাকরা ঝি তাহা সকলেই অনেক কাল ভুলিয়া গিয়াছিল, আত্মীয়ার মতোই সে বাড়িতে ছিল। কি বলিয়া যে তাহাকে বকা যায়, তাহাও নৃপেশ চট্ করিয়া ভাবিয়া পাইলেন না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "এয়সা আউর মৎ করো। রুপিয়াকো কাম হোনে সে হম্‌কো বোলো।"

আয়াকে কি বলা হয় তাহা শুনিবার আশায় হরনাথ এতক্ষণ বাজারের টুক্‌রি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। বাবুর বকুনি শুনিয়া তাহারও হাড় জ্বলিয়া গেল। ইহার চেয়ে মাগীকে দশটাকা বক্‌শিশ ধরিয়া দিলেই হইত। বড়ো চমৎকার কাজ করিয়াছে কিনা? গজ গজ করিতে করিতে সে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

হরনাথ বাহির হইয়া যাইতেই আয়া বলিল, "হম্ কাম্ নেহি করেগা বাবু। হম্ যাতা। গাড়ি ভেজ দেগা।" হতভম্ব নৃপেশকে কথা বলিবার অবকাশ মাত্র না দিয়া তাহার স্নেহের দুলাল খোকার দিকে একবারও না তাকাইয়া সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। বাবুর আদেশে হরনাথ যখন বক্ বক্ করিতে করিতে তাহাকে ফিরাইবার জন্য নামিল, তখন আর গলির মধ্যে তাহাকে দেখা গেল না।

মনিবে ভৃত্যে মিলিয়া কোনোরকমে খোকাকে সাম্‌লাইয়া রাখিল। নৃপেশ সেদিনকার মতো আফিসে যাওয়ার আশা ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ ট্রাইসিক্লটার পুনরাবির্ভাব হওয়ায়, তাঁহার ছুটি মিলিয়া গেল। একটা উনিশ-কুড়ি বৎসরের মাদ্রাজী ছোকরা সেটা ঘাড়ে করিয়া আসিয়া রাখিয়া গেল। তাহার কাছে বিশেষ কিছু খবর মিলিল না। সে কেবল বলিল, এই বাড়িতে যে আম্মা কাজ করিত, সে গাড়িটা তাহাদের দোকানে রাখিয়া আসিয়াছিল, আজ আবার এই বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিতে বলিয়া গিয়াছে। আয়া কোথায় গিয়াছে সে কিছুই জানে না, তাহার সঙ্গে ইহার বিশেষ আলাপ পরিচয় নাই। যাইতে আসিতে পথে দু'চারবার কথা বলিয়াছে মাত্র।

দিন কাটিয়া চলিল একটার পর একটা। খোকাকে লইয়া তাহার বাবার কষ্টের সীমা ছিল না, তবু দিন কাটিয়াই চলিল, আয়ার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। হরনাথ একলা সব দিক সাম্‌লাইতে পারে না, কাজেই একটা ঠিকা ঝিও আসিয়া জুটিল। ফলে কাজের সুবিধা হোক্ বা না হোক্, কলহ কিচ্‌কিচিতে বাড়ি মুখর হইয়া উঠিল।

দিন কুড়ি পঁচিশ এমনি করিয়া পার হইয়া গেল। সকাল বেলা, ছেলেকে কোলে বসাইয়া নৃপেশ কাজ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিলেন। হরনাথ আসিয়া খবর দিল একজন লোক বাহিরে বাবুকে ডাকিতেছে।

নৃপেশ তাহাকে ভিতরে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। হরনাথের পিছন পিছন একটা চীনা আসিয়া ঢুকিল।

নৃপেশ অত্যন্ত অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই জাতীয় জীবের সঙ্গে তাঁহার কোনোই কারবার ছিল না। হঠাৎ কি কারণে এ ব্যক্তি তাঁহার কাছে উপস্থিত হইল, তিনি কিছু ভাবিয়াই পাইলেন না।

জিজ্ঞাসা করায় সে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলিল যে, নিকটেই তাহার এক জিনিস বন্ধক লইয়া টাকা ধার দেওয়ার দোকান আছে। এই বাড়ির ঠিকানা দিয়া একটি মাদ্রাজী স্ত্রীলোক তাহার

কাছে গলার কণ্ঠী বাঁধা দিয়া টাকা লইয়াছিল। কিন্তু চীনাকে হঠাৎ দেশে যাইতে হইতেছে, তাই সে সকলকে খবর দিতেছে। দিন কুড়ির ভিতর টাকা দিলে, জিনিস ফেরত দিয়া সে যাইবে, না হইলে বাধ্য হইয়া তাহাকে বন্ধকী মাল বিক্রী করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। সুদ সে চায় না, কেবল যে টাকাটা দিয়াছিল,—সেটা পাইলেই হইবে।

নৃপেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ তারিখে স্ত্রীলোকটি টাকা ধার লইয়াছে? চীনা যে তারিখ বলিল, তাহাতে সবই তিনি বুঝিলেন। ট্রাইসিক্ল কেনার রহস্য এতদিনে পরিষ্কার হইয়া গেল। খোকার মৃতা জননী নয়, জীবিতা মাতৃস্বরূপিণীই আপনার শেষ সম্বলটুকু দিয়া তাহার আব্দার রক্ষা করিয়াছিল। এই সোনার কণ্ঠীটির সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। বিনোদিনী বাঁচিয়া থাকিতে আয়া সখ করিয়া অনেকদিন উহা তাঁহার শুভ্র কণ্ঠে পরাইয়া দিত। খোকার বউকে জিনিসটি উপহার দিবে বলিয়া নাকি সে ঠিক করিয়াছিল।

স্ত্রীলোকটি আর এখানে কাজ করে না বলিয়া তিনি চীনাটাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

দিন আবার কাটিতে লাগিল। কিন্তু ঘরের ভিতরের নিরানন্দ ক্রমে যেন জমাট বাঁধিয়া পাষাণভারের মতো হইয়া উঠিল। এ গৃহের স্নেহের নির্ঝর চিরদিনের মতো শুকাইয়া গিয়াছিল। লক্ষ্মীস্বরূপিণী বিনোদিনীকে বিধাতা সরাইয়া লইয়াছিলেন। আর একটি মানুষ, বাহিরটা যাহার কুৎসিত ছিল, কিন্তু ভিতরটা প্রেমের জ্যোতিতে উজ্জ্বল, তাহাকে নিয়তি নিজের রহস্যময় অঞ্চলের আড়ালে কোথায় লুকাইয়া ফেলিল, নৃপেশ কোনোদিন জানিতে পারিলেন না।

প্রবাসী ঃ বৈশাখ ১৩৩৫

জ ল পা নি

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

একটা অতি সহজ গুণ অঙ্ক বার বার ভুল করিতেছে দেখিয়া রামহরিবাবু পুত্র প্রাণহরির পৃষ্ঠে গুম করিয়া একটা কীল বসাইয়া দিয়া কহিলেন,—"হতভাগা! গোল্লায় গিয়েছ একবারে। এবার যদি জলপানি না পাও তা' হ'লে নিতাই মুদির দোকানে কাজে লাগিয়ে দেব। বোঝা টানতে আর পারব না।"

প্রাণহরি মুখ নীচু করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। বেদনায় পিঠের ঠিক মাঝখানটা টন্‌টন্ করিতেছিল, পিতার ভয়ে সেখানে হাত দিতেও সাহসে কুলাইল না। এই সময় গোলপাতার নীচু ছাউনির মধ্য হইতে মুখ বাহির করিয়া প্রাণহরির মা কহিল, "অমন করে ছেলেকে কেউ মারে সকালবেলা?"

রামহরি দাঁত খিঁচাইয়া কহিয়া উঠিলেন, "নাঃ মারে না। যে গুণের ছেলে তোমার। আজ বাদে কাল পরীক্ষা—একটা আঁক কষ্‌তে পারে না। বলে দিচ্ছি তোমাকে পরাণের মা, এবার যদি ছেলে তোমার জলপানি না পায়, তবে নিতাই মুদীর দোকানে লাগিয়ে দেব। কুপুষ্যি আর পুষতে পারব না। হ্যাঁঃ?" বলিয়া রামহরিবাবু চাদরখানা ঘাড়ের উপর ফেলিয়া হন্‌হন্ করিয়া একেবারে ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গেলেন।

মাতঙ্গিনী অর্থাৎ পরাণের মা ঘাড় উঁচু করিয়া নলের বেড়ার উপর দিয়া একবার পথের দিকে চাহিয়াই কহিলেন, "ঐ রে। না খেয়েই চলে গেলেন বুঝি। ডাক্ পরাণ, তোর বাবাকে। বল ভাত

নেমেছে।" প্রাণহরি উঠিল না; মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। মাতঙ্গিনীর রাগ হইল,—তাড়াতাড়ি আসিয়া প্রাণহরির ঝাঁকড়া চুল মুঠা করিয়া ধরিয়া কহিলেন, "হতভাগা ছেলে। বাপ না খেয়ে চলে গেল তবু ওঁর অভিমান গেল না। কাজ নেই পড়াশুনা করে,—যা, বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে।"

প্রাণহরি শ্লেটখানি উলটাইয়া রাখিয়া বিনাবাক্যে উঠিয়া পড়িল। তাহার পর বাঁ হাতের তালুতে চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

পুত্র প্রাণহরির প্রতি রামহরিবাবুর এ অকারণ ক্রোধের হেতু ছিল। গ্রামের রামকৃষ্ণ মাইনব স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা রামকৃষ্ণবাবু প্রত্যেক ক্লাশের প্রথম ছাত্রের জন্য দুই টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম ভাগ শিক্ষার ক্লাশ হইতে গত বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ তিন বৎসর প্রাণহরি বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু গত বৎসর অকস্মাৎ রামকৃষ্ণবাবুর পৌত্র প্রাণকৃষ্ণ প্রথম হইয়া বৃত্তিটি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ফলে রামহরিবাবুর মাসিক কুড়ি টাকা আঠারো টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এবার যাহাতে পুত্র বৃত্তি পাইতে পারে তাহার জন্য রামহরিবাবু এক প্রহর বেলায় শয্যা ত্যাগের অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। আজকাল ভোরে উঠিয়াই প্রাণহরিকে পড়াইতে বসিতেন; কিন্তু অনেক করিয়াও তাহাকে অঙ্কে পাকা করিতে পারিলেন না। কাজেই প্রহার করিয়া পুত্রকে অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শী করিবার সহজ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রহারে প্রাণহরিরও কোন আপত্তি ছিল না। সে অঙ্গে বেদনা বোধ করিত বটে, কিন্তু অভিমান কোনও দিন করে নাই। মাতঙ্গিনী ভুল বুঝিয়াছিলেন—আজও প্রাণহরি অভিমান করে নাই—তাহার হইয়াছিল ভয়। বৃত্তি না পাইলে নিতাই মুদীর দোকানে কাজে লাগিতে হইবে পিতার এই কথা শুনিয়াই সে বিভীষিকা দেখিল। স্পষ্ট চোখে পড়িল নিতাই মুদীর রক্তচক্ষু, দোকানের ছোকবা চাকর মধুর প্রাত্যহিক নির্যাতন, ঝোলা গুড়ের হাঁড়িব চারিপাশে তাহাব আবাল্যের ভীতির হেতু ভীমরুলের ঝাঁক। সে বারবাব শিহরিয়া উঠিতে লাগিল এবং মায়ের আদেশে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বাজারের পথের কুলগাছে অজস্র টোপাকুল দেখিয়াও নিতাই মুদীর দোকানেব কথা ভুলিতে পারিল না। মনে হইল বৃত্তি সে পাইবে না, যেহেতু, রামকৃষ্ণবাবু শহর হইতে ইংবাজী স্কুলের মাষ্টাব আনাইয়া দুইবেলা তাহাদের ক্লাশের প্রাণকৃষ্ণকে পড়াইতেছেন; সে আজকাল মোটা ইংরাজী বই হইতে অঙ্ক কষিতেছে। কাজেই আর উপায় নাই। তিন মাসের মধ্যেই তাহাকে নিতাই মুদীর দোকানের ভীমরুলের ঝাঁকেব মধ্যে গিয়া বসিয়া মিছরী ওজন করিতে হইবে এবং পয়সা গুনিতে ভুল হইলে মধুর মত দুইবেলা কানমলা খাইতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে প্রাণহরির মাথায় এক বুদ্ধি খেলিল—তখন হইতে নিতাইয়ের তামাক সাজিয়া ফরমাস খাটিয়া যদি তাহাকে কিঞ্চিৎ নরম করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে হয়তো নিতাই তাহাকে মুদীখানার দোকানে না রাখিয়া, আড়তের ফরাসের চাদর ঝাড়িবার কাজে লাগাইতে পারে। সে কাজ ভাল—আড়তে ভীমরুল অথবা বোলতার উপদ্রব নাই। ভাবিতে ভাবিতে প্রাণহরি দুটি টোপাকুল কুড়াইয়া লইয়া চিবাইতে চিবাইতে অন্যমনস্কভাবে বাজারের দিকে চলিয়া গেল।

২

নিতাই ময়রাকে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিয়া তাহার অনুমতিক্রমে প্রাণহরি ডাল চালের ঝাঁকার সম্মুখে বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে মধুর নিকট হইতে ওজন দেওয়া শিক্ষা করিতেছিল। বাঁ হাতের বুড়া আঙ্গুল কায়দা মাফিক পাল্লাতে ছোঁয়াইতে পারিলে কেমন করিয়া সেরকে এক ছটাক মাল কম দেওয়া যায় মধু তাহাকে তাহাই শিখাইতেছিল। কিন্তু প্রাণহরি কৌশলটি আয়ত্ত করিতে পারিতেছিল না। শেষে বিব্রত হইয়া প্রাণহরি প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, কম না দিলে কি হয় মধুদা?"

নিতাই সদ্য বন্ধু মোহান্তের আখড়া হইতে গাঁজা টানিয়া আসিয়াছে, দাঁত খিঁচাইয়া কহিয়া উঠিল,

"হয় তোর বাপের মুণ্ডু! কি হয়—দে তো মোধো ওর কান ধরে বুঝিয়ে। দোকানদারী শিখতে এসেছে—যা গরু চরাগে যা।" প্রাণহরি ভয়ে মধুর নিকট হইতে দুই হাত সরিয়া বসিল। কিন্তু উঠিল না।

প্রাণহরি ভবিষ্যতের কথাই ভাবিতেছিল, এমন সময় কে ডাকিল, "তুই সকালবেলা দোকানে বসে কেন মিতে?"

প্রাণহরি মুখ তুলিয়া দেখিল প্রাণকৃষ্ণ। প্রাণহরি কথা বলিবার পূর্বেই প্রাণকৃষ্ণ পকেট হইতে কাগজে মোড়া একটি পদার্থ বাহির করিয়া কহিল, "আয় পাটালি খাবি। মা দিয়েছে।" প্রাণহরি ধীরে ধীরে মাচান হইতে নামিয়া আসিয়া প্রাণকৃষ্ণের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। পাটালিখানা ঠিক সমান দুই ভাগে ভাঙিয়া একভাগ প্রাণহরির হাতে দিয়া প্রাণকৃষ্ণ কহিল, "খা! খুব ভাল পাটালি, কাল আমাদের জমিদারী থেকে এসেছে!" প্রাণহরি পাটালি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, খাইল না। প্রাণকৃষ্ণ কহিল, "খাচ্ছিসনে যে মিতে। কি হয়েছে তোর আজ?"

উত্তরের জন্য প্রাণকৃষ্ণ প্রাণহরির মুখের দিকে চাহিয়াই দেখিল প্রাণহরির চোখ ছল ছল করিতেছে। প্রাণকৃষ্ণ নিজের ভাগের পাটালিখানা মুখের কাছ হইতে নামাইয়া পকেটে পুরিয়া প্রাণহরির দুই হাত ধরিয়া কহিল, "বল মিতে কি হয়েছে? নিতাই গেঁজেলটা মেরেছে বুঝি? কেন এলি ওর দোকানে?"

এত প্রশ্নের জবাব প্রাণহরি দিল না, কহিল, "দোকানদারী শিখছিলাম।"

প্রাণকৃষ্ণ আশ্চর্য হইয়া কহিল, "দোকানদারী। আজ বাদে কাল পরীক্ষা, এখন দোকানদাবী কি রে? পড়বি নে আর?"

প্রাণহরি বলিল, "বাবা আর পড়াবে না বলেছে!"

প্রাণকৃষ্ণ প্রশ্ন করিল, "কেন?"

প্রাণহরি বন্ধুর কাছে প্রাতঃকালের ঘটনা বিন্দুবিসর্গও গোপন কবিল না। অকপটে সমস্তই কহিয়া গেল।

শুনিয়া প্রাণকৃষ্ণ কহিল, "তুই বৃত্তি পাবি মিতে! সত্যি বলছি।"

প্রাণহরি কহিল, "কেমন করে? আমি যে তোর মত অঙ্ক জানিনে।"

"না জানলিই বা। আমি ফাস্ আর তুই সেকেন হবি।" প্রাণকৃষ্ণ কহিল।

প্রাণহরি হতাশ হইয়া কহিল, "তাতে তো আর জলপানি পাব না।"

প্রাণকৃষ্ণ কহিল, "সেকেন হলেই পাবি। আমি দাদাবাবুকে বলব যে এবার থেকে ফাস আর সেকেন দু'টো বৃত্তি দিতে হবে।"

প্রাণহরির মুখ উজ্জ্বল হইল, হাসিয়া সে জিজ্ঞাসা কবিল "পারবি?"

প্রাণকৃষ্ণ বাঁ হাতে প্রাণহরির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "বাঃ রে! পার্ব না আবার। আমার দাদাবাবু আমার কথা শুনবে না মিতে?"

প্রাণকৃষ্ণের কথা শুনিয়া প্রাণহরি হাসিয়া ফেলিল। তাহার পরই উভয় বন্ধু গলা জড়াজড়ি করিয়া পূর্বোক্ত টোপা কুলের গাছের দিকে প্রস্থান করিল।

৩

তাহাদের ক্লাশে দুইটি বৃত্তিদানের প্রস্তাব শুনিয়া রামকৃষ্ণ হাসিয়া কহিলেন, "কেন যাদু, ভয় হয়েছে, ফাষ্ট হতে পারবে না বুঝি? তা হবে না কিন্তু, ফাষ্ট হওয়া চাই।"

প্রাণকৃষ্ণের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগিল। ভয় নহে, বন্ধুর উপকারের জন্যই যে সে প্রস্তাব করিয়াছে, সে কথাটি সদম্ভে বলিতে ইচ্ছা কবিল। কিন্তু সাহস হইল না, কেননা বলিতে গেলেই

প্রাণহরির কথা বলিতে হইবে।এদিকে প্রজার ছেলে প্রাণহরির সহিত মিতালি করিতে জননী এবং পিতামহ উভয়েরই নিষেধ ছিল। কাজেই উভয়সঙ্কটে পড়িয়া দাদামহাশয়ের শ্লেষটি বিনা বাক্যে প্রাণকৃষ্ণ স্বীকার করিয়া লইল এবং খানিক্ষণ ধরিয়া রাকৃষ্ণবাবুর মহাভারতখানা নাড়াচাড়া করিয়া প্রস্থান করিল।

রাত্রি ন'টায় প্যাসেঞ্জার গাড়ী হুস্‌হুস্ করিয়া চলিয়া গেল, তবু আজ প্রাণকৃষ্ণের ঘুম আসিল না। বারবার প্রাণহরির কথাই মনে পড়িতে লাগিল। বৃত্তি যদি সে না পায়, তাহা হইলে গাঁজাখোর নিতাই ময়রার দোকানে সে বাতাসা ওজন করিবে, আর প্রাণকৃষ্ণ তাহারই সম্মুখ দিয়া স্কুলে যাতায়াত করিবে, তাহা কেমন করিয়া সম্ভব? ভাবিতে ভাবিতে প্রাণকৃষ্ণ উঠিয়া খোলা জানালা দিয়া বাহির চাহিল। বাজারেব সেই অশ্বত্থ গাছটা আবছায়া দেখা যাইতেছে। গত বৎসর কালীপূজার রাত্রিতে বারোয়ারিতলায় "দুই বন্ধু" নাটকের অভিনয় হইতেছিল। প্রাণকৃষ্ণ ও প্রাণহরি পাশাপাশি বসিয়া যাত্রা শুনিতেছিল। শেষের দিকে ভাবাবিষ্ট হইয়া দুইজনেই কাঁদিয়া ফেলিল। প্রাণকৃষ্ণ বুঝিল, জগতে যার বন্ধু নাই তাহার কেহ নাই। প্রাণহরি কি বুঝিল তাহা সে জানে না; কিন্তু দুজনেই এক সঙ্গে ফিরিবার পথে ওই অশ্বত্থতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাণহরি ভয় পাইয়া কহিল, "এইখানটায় এলেই গা ছম্‌ছম্ করে।" প্রাণকৃষ্ণ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ভয় কি ভাই? আমরা দু'জনেই তে৷ 'প্রাণ' আয়, দু'জনা বন্ধু হই।" প্রাণহরি তৎক্ষণাৎ রাজী হইল এবং দু'জনেই যাত্রার পালার বন্ধুদ্বয়ের বক্তৃতার যতগুলি কথা মনে ছিল উচ্চারণ করিয়া বন্ধু হইল। কেবল রাত্রিকালে এবং অমাবস্যা বলিয়া আকাশের সূর্য-চন্দ্রকে সাক্ষী করিতে পারিল না। অতএব বুড়ো অশ্বত্থ গাছটাকে সাক্ষী রাখিল। সমস্ত কাহিনী ভাবিতে ভাবিতে অতি স্পষ্ট করিয়াই প্রাণকৃষ্ণের মনে হইল। তাহাব চোখে জল আসিল।

*　　　　*　　　　*

পরদিন প্রাতঃকালে ভাগ অঙ্কের প্রণালী ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য কেবল রামহরিবাবু প্রাণহরির পৃষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া মুষ্টি উদ্যত করিয়াছেন এমন সময় আঙ্গিনায় প্রাণকৃষ্ণ প্রবেশ করিল। বামহরিবাবু উদ্যত মুষ্টি সম্বরণ করিলেন, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা প্রাণকৃষ্ণ দেখিয়া লইল। সহসা প্রভাতের সূর্যালোক তাহার কাছে অত্যন্ত ম্লান বলিয়া বোধ হইল। সে একবার অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে অঙ্কের খাতায় বদ্ধদৃষ্টি প্রাণহরির দিকে চাহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল এবং মার্বেলের থলিতে লুকাইয়া প্রাণহরির মাতার জন্য যে নূতন আলু আনিয়াছিল, সেগুলি চৌমাথার ডোবাব জলে ঢালিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিল।

স্কুলে পৌঁছিয়াই প্রাণহরি দেখিল বেঞ্চের এক কোণে প্রাণকৃষ্ণ চুপ করিয়া বসিয়া ভূগোল পড়িতেছে। প্রাণহরি কহিল, "আজ আমাদের বাড়ী সকালবেলা তুই গেছলি মিঁতে?"

প্রাণকৃষ্ণ কহিল, "হ্যাঁ।"

প্রাণহরি প্রশ্ন করিল, "কেন?"

দাদামহাশয়ের সহিত গত সন্ধ্যায় যে কথাবার্তা হইয়াছিল তাহাই বন্ধুকে জানাইয়া, বন্ধুর বৃত্তিলাভের একটি সুবিধাজনক উপায় উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির কবিবে, এই অভিপ্রায়েই প্রাণকৃষ্ণ বন্ধুর বাড়ীতে গিয়াছিল। কিন্তু প্রাতঃকালে বন্ধুর যে নির্যাতন সে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহার পর আর এ নিদারুণ সংবাদ সে প্রাণহরিকে দিতে পারিল না, সংক্ষেপে কহিল, "তোকে দেখতে।"

প্রাণহরি কহিল, "আর সকালবেলা যাসনি মিতে। তোদের গণশা চাকর খেজুর রস পাড়তে আমাদের বাড়ীর দিকে চেয়ে দেখছিল, তোর দাদুকে বলে দেবে।"

প্রাণকৃষ্ণ শুধু কহিল, "ব'য়ে গেল।" এই সময় মাষ্টার আসিয়া পড়িলেন, কথাবার্তা আর অগ্রসর

হইল না।

ছুটির পর অকস্মাৎ প্রাণকৃষ্ণ প্রাণহরিকে বারান্দার এককোণে ডাকিয়া নিয়া মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, "তোর বাবা তোকে মারে মিতে?"

প্রাণহরি কহিল, "হুঁ।"

প্রাণকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

প্রাণহরি কহিল, "বৃত্তি পাইনি তাই।"

প্রাণকৃষ্ণ বলিল, "বলিস তোর বাবাকে আর তোকে মারে না যেন। বাবা জমিদারী থেকে ফিরলে তাকে বলে তোকে জলপানি দেওয়াব।"

কাল দাদামহাশয়কে বলিয়া বৃত্তিদানের প্রস্তাব ছিল আজ আবার বাবার জন্য প্রতীক্ষা করিবার কি প্রয়োজন আছে, সে প্রশ্ন আর প্রাণহরির মনে উঠিল না। সে খুশি হইয়া কহিল, "বলব।" সপ্তাহ পরে যখন প্রাণকৃষ্ণের পিতার চিঠি আসিল যে তিনি দুই মাসের মধ্যে ফিরিতে পারিবেন না, তখন প্রাণকৃষ্ণ একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। বন্ধুকে বৃত্তিদানের আর কোনও উপায় সে চিন্তা করিয়া উঠিতে পারিল না। এদিকে পরীক্ষারও আর দিন সাতেক মাত্র বাকী আছে। এক রাত্রে অঙ্ক যদি সমস্ত ভুলিয়া যাইতে পারিত, তাহা হইলে বেশ হইত। কিন্তু তাহাতেও বিপদ আছে। প্রাণহরির নীচে হইলে বাড়ীর মাষ্টার গোপালবাবু তাহার কান টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। পর্দার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার মাতাও বিধু ঝির মারফতে গোপাল মাষ্টারেব এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়াছেন। এখন যদি জ্বর হইয়া পড়ে তাহা হইলে সকল দিক বক্ষা হয়। কিন্তু জ্বব হয় কি করিয়া? অনেক ভাবিয়া স্থির করিল এখন দেবতা ছাড়া আর উপায় নাই। কলুপাড়ার মা মঙ্গলচণ্ডী জাগ্রত দেবতা। মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম ও সেই সঙ্গে পাঁচ সিকা প্রণামী মানসিক করিয়া সাত দিনের জন্য অসুখের প্রার্থনা জানাইয়া প্রাণকৃষ্ণ সেদিন কিঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করিল। বাত্রে মনে হইল শীত যেন একটু বেশী বোধ হইতেছে। জ্বরের পূর্বলক্ষণ ভাবিয়া সে দু'টি করতল কপালে ঠেকাইয়া মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করিল। কিন্তু সকালে কপালে হাত দিয়া দেখিল কপাল ঠাণ্ডা। বুঝিল সে বন্ধুর অদৃষ্ট মন্দ, মঙ্গলচণ্ডীর তাহার উপর দয়া নাই। তখন মঙ্গলচণ্ডী ছাড়িয়া সে বাজারের বুড়াশিবের উদ্দেশে যথেষ্ট পরিমাণ সিদ্ধি এবং কাঁচা দুধ মানৎ কবিল। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। হতভাগ্য প্রাণহরির প্রতি কোনও দেবতাই প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া প্রাণকৃষ্ণের আর চিন্তার অবধি রহিল না। সমস্ত দিন প্রাণহরির শুষ্কমুখ, রামহরিবাবুর বদ্ধ মুষ্টি, নিতাই ময়রাব রক্তচক্ষু পর্যায়ক্রমে প্রাণকৃষ্ণের মনে পড়িতে লাগিল। পরশু পরীক্ষা, প্রাণহরি নিশ্চয়ই তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছে। বৃত্তিলাভের কোনও ভরসা নাই, একথা শুনিলে বন্ধুর কি অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিতেও প্রাণকৃষ্ণের গা কাঁটা দিয়া উঠিল।

সন্ধ্যায় নিতান্ত অস্থির হইয়া প্রাণকৃষ্ণ লেভেল ক্রশিংএর রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এমন সময় দেখিল, তাহাদের বাড়ীর গরুর রাখাল বাগদীদের ছেলে গুপী রেল লাইনের ধারে বসিয়া বাঁশের আড়বাঁশী বাজাইতেছে। গুপীকে দেখিয়াই প্রাণকৃষ্ণের মনে আশু বিপন্মুক্তির একটু ক্ষীণ আশা জাগিয়া উঠিল। গুপী জ্বরের অছিলায় মাসে আট দশ দিন কাজ কামাই করে,—জ্বর হইবার উপায় তাহার জানা সম্ভব। প্রাণকৃষ্ণ ডাকিল, "গুপী?"

গুপী মুখ ফিরাইয়া প্রাণকৃষ্ণকে দেখিল। তারপর তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, "কি দাদাবাবু?"

প্রাণকৃষ্ণ কহিল, "কাউকে বলবিনে বল্? মা কালীর দিব্যি।"

গুপী তৎক্ষণাৎ শপথ করিল। প্রাণকৃষ্ণ প্রশ্ন করিল, "তুই জ্বর করিস্ কি ক'রে?"

গুপী ভয় পাইল। পাছে দাদাবাবু কর্তাবাবুকে বলিয়া দেয় সেই ভয়ে কহিল, "জ্বর এমনি হয়।"

প্রাণকৃষ্ণও রাগিয়া উঠিল, "এমনি জ্বর কক্ষনো হয় না। সত্যি কথা বল। কাউকে বলব না আমি।"

গুপী আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "মুন্সীদের এঁদো পুকুরে গুণে গুণ্ডা আষ্টেক ডুব দিলেই জ্বর আসে দাদাবাবু। দু' বগলে পেঁয়াজ রাখলেও গা তাতে, কিন্তু পহর খানেকের বেশী থাকে না।"

প্রাণকৃষ্ণ "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া গেল।

*　　　*　　　*

সতর্ক দৃষ্টিতে চারি দিক দেখিয়া মুন্সীদের এঁদো পুকুরের বাঁশঝাড়ের মধ্য হইতে যখন প্রাণকৃষ্ণ বাহির হইল তখন সূর্য ডুবিয়াছে। পথে আসিয়া তাহার মনে হইল যে গুপী সত্য কথাই কহিয়াছে,— সর্বাঙ্গে অত্যন্ত শীত বোধ হইতেছে ও মাথাও টন্‌টন্ করিতেছে। প্রভাতে গুপীকে একটা সিকি বখশিস দিবে স্থির করিয়া প্রাণকৃষ্ণ বাড়ী ফিরিল।

*　　　*　　　*

দুই দিন প্রাণকৃষ্ণের সঙ্গে প্রাণহরির সাক্ষাৎ হয় নাই। পরীক্ষার দিন আসিয়া প্রাণহরি তাহাব বন্ধুর সন্ধান কবিয়া শুনিল যে সে পরীক্ষা দিবে না। কারণ কেহ কিছু বলিতে পারিল না। স্কুল হইতে ফিরিবাব পথে প্রাণকৃষ্ণের পড়িবার নীচের ঘবখানির রুদ্ধ জানালায় মুখ লাগাইয়া সে সতর্ক মৃদুস্বরে ডাকিল, "মিতে?" প্রথম আহ্বানেব কোনও জবাব আসিল না। দ্বিতীয়বার ডাকিতেই পাশেব একটি জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বিধু ঝি কহিল, "তেনার অসুখ গো, অসুখ! বের হবেক্ নি!"

প্রাণহরির মুখখানি ছোট হইয়া গেল। শঙ্কিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "খুব অসুখ ঝি মাসী?"

বিধু ঝি কহিল, "খুব বলে খুব! আকাশ পাতাল জ্বর!"

বন্ধুকে একবার দেখিবার প্রার্থনা জানাইবার পূর্বেই বিধু ঝি জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

অঙ্কের পরীক্ষার দিন স্কুলের পথে প্রাণহরি সংবাদ পাইল যে প্রাণকৃষ্ণ জ্বরের ঘোরে 'জলপানি' 'জলপানি' বলিয়া চেঁচাইতেছে। সংবাদ শুনিয়াই সে বন্ধুর বাড়ীর দিকে চলিল। বাড়ীর সদর দরজার রাস্তায় সারি সারি মোটরকার দেখিয়া ভয়ে আর বাড়ীতে ঢুকিতে তাহার সাহসে কুলাইল না।

*　　　*　　　*

পরের কাহিনী অত্যন্ত সাধারণ। মাস খানেক পর একদিন প্রাতঃকালে স্কুলের নোটিশ বোর্ডে পরীক্ষার ফল টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল। প্রাণহরি প্রথম হইয়া জলপানি পাইয়াছে। প্রাণহরি সংবাদটি দেখিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও হাসিতে পারিল না। স্কুলের দরজার গায়ে লাগানো পুরাতন ছিন্নপ্রায় নোটিশটির দিকে বার বার চাহিতে চাহিতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

নোটিশে লেখা ছিল,—"অত্র স্কুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র শ্রীমান প্রাণকৃষ্ণ তালুকদারের জ্বরবিকার রোগে পরলোকগমন উপলক্ষে অত্র স্কুল অদ্য তারিখ হইতে সাত দিন বন্ধ রহিল।"

পরাজয়

ঘৃত-তত্ত্ব

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

এর মধ্যে গদাধরের দোষ কতটুকু আপনারাই বিচার করিবেন, আমি কাহিনীটুকু বিবৃত করিয়াই খালাস।

গদাধরের বাপ নিরুপম পাল একজন পাকা ব্যবসায়ী ছিলেন। একেবারে গোড়ায় একটা আড়তে খাতা লিখিতেন, আর বাজাইয়া বাজাইয়া টাকা গুণিতেন। টাকা চেনা থেকে একটু একটু করিয়া বাজার চিনিতে লাগিলেন, তাহার পর অল্পে অল্পে নিজের ফলাও ব্যবসা ফাঁদিয়া বিষয়সম্পত্তি যাহা করিবার সবই করিলেন। কিন্তু একটা দুঃখ রহিয়া গেল, গদাধরকে টাকার মতো করিয়াই কয়েকবার গভীর অভিনিবেশের সহিত বাজাইয়া বাজাইয়া বুঝিলেন, তেজারতের বাজারে এ-ছেলে অচল। বুদ্ধিটা বেশ একটু মোটা।

তবে ধর্মের দিকে মতিগতি আছে, টাকা উড়াইবে এমন ভয় নাই। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে নিরুপম ব্যবসা ধীবে ধীরে সম্পূর্ণভাবে গুটাইয়া লইলেন এবং টাকা যাহা হইল সেটা গোটা দুই ব্যাঙ্কে জমা দিয়া দিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ব্যবসার দিকে তুমি হঠাৎ যেতে চেও না বাবা, ব্যাঙ্ক থেকে মোটা সুদ পাবে, তার যতটুকু দরকার হয় ততটুকু নিয়ে বাকিটা আবার জমা দিয়ে যাবে মাসে মাসে। পুকুর, বাগান, ধান-জমি সব রইল, অভাব হবে না। বাড়িতে বিগ্রহ রয়েছেন, তাঁর সেবাতেই কাটিয়ে দিও, তিনিই রক্ষা করবেন যা-সব রেখে গেলাম'।

একটু থামিয়া বলিলেন, 'তোমার ছেলের মধ্যে যদি আসে তার ঠাকুরদার বুদ্ধি—এমন হয় তো অনেক সময়—সে তখন আবার ফেঁদে নেবে নিজের কাজ।'

শেষের এই কথাগুলির মধ্যে বেশ একটু খোঁচা ছিল, কতকটা সেই অভিমানেও, কতকটা প্রকৃত অপটুতা আর আলস্যের জন্যও গদাধর গেল না ব্যবসাব দিকে। রাধারমণের সেবাতেই নিজেকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়া দিল, ফলে, জাতব্যবসায়ী হিসাবে মস্তিষ্কের কোনখানে যদি হয়তো কোথাও ছিল একটু বুদ্ধি, সেটুকুও অপসৃত হইয়া সমস্ত দেহ মন নিটোলভাবে ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সংসারটি ছোট ; স্ত্রী সরোজিনী, দুটি কন্যা—সরযূ আর যমুনা, আর একটি ছেলে, কেশব। ছোট হইলেও কিন্তু দুর্বহ গদাধরের পক্ষে। সরোজিনীকে ঘরে আনিবাব সময় তাঁহার রাশিচক্রের খোঁজ লওয়া হইয়াছিল কিন্তু মেজাজের খোঁজ লওয়া হয় নাই; অত্যন্ত মুখরা, নিত্যই কলহ হইবার কথা, শুধু গদাধর নির্বিবাদে সব কথা মানিয়া লইয়া রাধারমণের কাছে ধরণা দিয়া পড়ে বলিয়া বিনা গোলযোগে কাটিয়া যাইতেছে। বড় মেয়ে সরযূটি একেবারেই বোবা : বিবাহ হইবে না। রাধারমণের পায়ে সমর্পণ করিয়া যতটা সম্ভব মনের বোঝা হালকা করিয়াছে গদাধর। ছোট মেয়েটি তেমনি বাচাল, এককালে মাকে ছাড়াইয়া যাইবে। আপাতত বিবাহ দেওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। এক কথায় পাঁচ কথা বলিয়া জবাব দেয়। তিনবার তিন জায়গা হইতে দেখিতে আসিয়াছে, ফিরিয়া গিয়া আর উচ্চবাচ্য করে নাই। এ মেয়েটিকেও রাধারমণের পায়ে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার ইচ্ছা ছিল, স্বপ্ন পেলে তিনি জটিলা-কুটিলাকে লইয়া হিমসিম খাইতেছেন, আর ভেজাল বাড়াইবার উৎসাহ বা অভিরুচি নাই। বাকি থাকে কেশব। ছেলেটি ছোটদিদির মতো কথা কহিতে কহিতে এক এক সময় বড়দিদির মতো হঠাৎ মৌন আর গম্ভীর হইয়া যায়। ফলে তাহাকে অত্যন্ত রহস্যময় বলিয়া মনে হয়; ও যেন বাপের মূঢ়তার জন্য ঠাকুরদাদার বিশেষ আশীর্বাদ লইয়া তাঁহার ব্যবসা আবার ফলাও করিয়া ফাঁদিবার উদ্দেশ্যে জন্ম লইয়াছে; কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয় গদাধরের।

বড় মনোকষ্টে কাটিতেছে এবং সেইজন্য সমস্ত মনটাকে রাধারমণের পায়ে ঢালিয়া কোনমতে কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেঁছে।

অর্ধেক জীবন প্রায় কাটিয়াও আসিয়াছে এমন সময় লড়াই আসিয়া পড়িল এবং মিলিটারিতে কতকগুলা কাঁচামাল সরবরাহ করিবার ঠিকা লইয়া, বৌঁচির কাশীনাথ একজন ভালো মূলধনীর সন্ধানে বাহির হইয়া বেহালায় আমাদের গদাধরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

লোকটার মানুষ পটাইবার অসাধারণ ক্ষমতা। মন্দির থেকে টানিয়া গদাধরকে বাহির করিতে যা-একটু বেগ পাইতে হইল, তাহার পর কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে ভিজাইয়া ফেলিল। গদাধরের কোথায় কে আছে সব জানে, টাকা না খাটাইবার কারণও অবগত আছে, আসিয়াছেও একটা সম্পর্ক দাঁড় করাইয়া। বলিল, 'আপনি আমায় বলবেন কি? আমি আপনাকে টাকা বের করতে মানা করতাম, নিরুপম কাকা কি যা-তা লোক ছিলেন একটা, যে মিছিমিছি বারণ করে যাবেন? আর ব্যবসাতে কি ছিল শুনি? টাকায় আধ পয়সাও টানতে পারছিল না। আপনি দেখতেন না, ওদিকে খেয়াল ছিল না; কিন্তু এতবড় একটা আড়তদাবের ছেলে এটুকু ওয়াকিবহাল তো ছিলেনই? "না" বললে শুনব কেন, মশাই? লোক দেখে তার নজব কতদূর যায় তা টের পাব না?'

এ ধবনেব তাবিফ গদাধরের কানে এই প্রথম গেল, অল্প একটু হাসিয়া বলিল, 'দেখতাম না তো সেইজন্যই, মশাই। ফলটা কি দেখে বলুন?'

'ঐ দেখুন, আমি বলব কি, নিজের মুখেই প্রকাশ করতে হ'ল আপনাকে। টাকায় যখন আধলাও অর্জন করতে পারছে না তখন সে টাকা বাজারে ছড়িয়ে লাভ কি মশায়? না-হক হায়রানি বইত নয়!'

গদাধরের আত্মপ্রসাদ জমিয়া উঠিয়াছে, একটু ব্যঙ্গহাসির সহিত বলিল, 'তাই গুটিয়েও নিতে হ'ল শেষ পর্যন্ত বাবাকে।'

কাশীনাথও একটু মৃদু হাসিয়া মুখটা নিচু করিল। তাহার পর বলিল, 'আপনিও তো ঐ একই কারণে বের করেননি টাকাটা? তাহলে তাঁতে আপনাতে তফাতটা হ'ল কোথায়? যাক্‌, ধরে নিচ্ছি তিনি বারণ কবে গেছেন বলেই খাটান্‌নি টাকাটা এতদিন, এযুগে বাপের কথাই বা রাখছে ক'টা লোক, মশাই? যেদিক দিয়ে যান, যশটা গদাধর পালেরই। আমিও আসতাম কি?—আসতাম না, যদি আমি যে-ব্যাপার নিয়ে এসেছি সেটাকে ব্যবসা বলা যেত।'

গদাধব একটু বিমূঢ়ভাবে চাহিতে বলিল, 'না, একে ব্যবসা বলব না,—টাকায় এক আনা—দু'আনা—চার আনা—আট আনা, এমন কি টাকায় টাকা হ'লেও তাকে ব্যবসাই বলব না আমি।'

শুনিতে শুনিতে গদাধরের মুখটা হাঁ হইয়া গিয়াছিল, দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া সেইভাবেই চাহিয়া রহিল। কাশীনাথ একটু অপাঙ্গে চাহিয়া লইয়া বলিল, 'কিন্তু যখন দেখছি টাকায় দু'টাকা লাভ—একটা টাকা সঙ্গে সঙ্গে তিন টাকা হয়ে যাচ্ছে . . . .'

গদাধরের হাঁ-টা একেবারে দ্বিগুণ হইয়া গেল, চক্ষু দুইটাও যেন ঠেলিয়া আসিল, কাশীনাথ একটু হাসিয়া বলিল, 'আপনি এইতেই চমকালেন! আরও যে-সব রহস্য আছে তা শুনলে তো তাক লেগে যাবে আপনার। লড়াইয়ের বাজার যে মশাই, সেকথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? একে তিন, এ তো হেসে খেলে আসবে মশাই, যাকে বলে জুতো মেরে। এক হাজার ঢালুন—সঙ্গে সঙ্গে তিন হাজার, তিন হাজার ঢালুন—ন'হাজার, ন'হাজার ঢালুন একেবারে তিন-ন'য় সাতাশ। এর জন্যে কারুর কাছে খোসামোদ করতে হবে নাকি? তারপর—অ্যাডভান্স। . . . .'

কথাটা বলিয়া একটু আড়চোখে চাহিয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিল; গদাধর প্রশ্ন করিল, 'সেটা কিরকম?'

কাশীনাথ ভ্রূ কুঁচকাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, 'বাঃ, তোমরা প্রকাণ্ড এক লড়াই ফেঁদে বসেছ সাহেব, তোমাদের এখন লাখ লাখ টাকার মাল চাই, আমি গরীব কনট্রাকটার, অত টাকা হঠাৎ বের করি কোথা থেকে? হদ্দ কুড়িয়ে বাড়িয়ে হাজার কতক হতে পারে বাড়ি বাঁধা দিয়ে, বৌয়ের গহনা বেচে। . . . হুকুম হল—বেশ লেগে যাও . . .। একবার আরম্ভ করে দিলেন, তারপর বিশ্বাস যেই জমে গেল, আগাম টেনে যান না কত টানতে পারেন, দশ হাজার টাকা যদি বের করতে পারলেন, আপনি লাখখানেকের লেন-দেন লাগিয়ে দিন না। কে মানা করছে? তবে সে কি আর যার-তার কর্ম? আমি একেবারে গোড়ার তিন বেটাকে হাত করেছি কি-না।'

গদাধর প্রশ্ন করিল, 'কত টাকার কাজ ধরেছেন?'

'সব বলছি আপনাকে। ধরা যেত অনেক, কিন্তু অত লোভ করলাম না একেবারে। দু'হাজার টিন ঘিয়ের দরকার ওদের, আমি ধরলাম পাঁচশো টিন। প্রতি টিনে গড়ে আঠারো সের, দাম বত্রিশ, এই ষোল হাজার টাকা বের করতে হচ্ছে আমায়। পাচ্ছি প্রতি টিনে একশো, মোট পঞ্চাশ হাজার। খরচ-খরচা বাদ দিয়ে যদি ত্রিশ হাজারও না হাতে আসে তো এমন ঠিকে নিতে যাই কেন মশাই এই লড়াইয়ের বাজারে? বুঝুন। দেখতে দেখতে এই যে লাল হয়ে যাচ্ছে—আপনি আমি একটুকরো লোহা দেখতে পাই না চোখে, আর সব চারতলা পাঁচতলা বাড়ি হাঁকাচ্ছে, সে কি এমনি? . . মাড়োয়ারীরা তো গোরাদের সামনে এগুতে পারে না, টাকা নিয়ে ঝুলোঝুলি, মনে মনে বললাম, রোসো, আগে দেখি, স্বজাতি কেউ রাজী না হয়, তখন তোমরা। . . . তারপর হঠাৎ আপনার নামটা মনে পড়ে গেল।'

গদাধর যতটা লুব্ধ এবং বিস্মিত হইল, ততটা তাড়াতাড়ি কিন্তু রাজী হইল না; ক্রমাগতই সুদেব টাকা জমা দিয়া আসল না ভাঙিবার একটা অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে, বলিল—ভাবিয়া দেখিবে। কাশীনাথ লাভের সবচেয়ে বড় রহস্যটা ভাবিয়াছিল নিজের হাতে রাখিবে, দুই দিন চেষ্টা করিয়াও যখন দেখিল মন ভরিয়া আসিলেও টাকাটা বাহির করিতে চাহিতেছেন না, তখন সেটাও প্রকাশ করিয়া দিল। বলিল, 'এখনও কিন্তু আপনাকে আসল কথাটা বলিনি। অবিশ্যি না বলবার হেতু সাহেব-বেটাকে বাগাতে পারছিলাম্ না এতদিন, কাল ঠিক করেছি, সে শুনলে এক টাকায় দু'টাকা লাভ নেহাত ছেলেখেলা বলে মনে হবে। সে কথা কিন্তু . . . '

গদাধর একটু সরিয়া আসিয়া বসিলে, আরও কাছে ঘেঁষিয়া, গলা আরও খাটো করিয়া বলিল, 'কিন্তু ঘি বেটাদের দিচ্ছে কে, মশাই? ও প্রায় যা পাচ্ছেন তার সমস্তটাই লাভ।'

নিত্য নূতন ধরনের কথা শুনিয়া গদাধর একেবারে অভিভূত হইয়া আসিতেছিল, সেসবেব উপর আরও কিছু যে থাকিতে পারে যেন ধারণা করিতেই পারিতেছে না; প্রশ্ন করিল, 'তার মানে?'

'তার মানে টিনে মুখের কাছটায় ইঞ্চি দুয়েক করে ঘি, খুরজার এক নম্বর, বাকি সব . . . আরও স্পষ্ট করে বলতে হবে নাকি? ভি-ই-জি-ই-টি-এ-বি-এল্-ই!!'

ঠোঁটের কোণটা কামড়াইয়া একটা চোখ বুজিয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিল।

২

কিন্তু এ কাহিনীটা ব্যবসা-সম্পর্কীয় নয়, বিবাহের। এইবার সেই কথাতেই আসা যাক।

তৃতীয় দিনের কথা। টাকা গদাধর বাহির করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। কথাটা একবার স্ত্রী সরোজিনীর নিকট পাড়িতে হইবে, মেজাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অবসর খুঁজিতেছে, এমন সময় সন্ধ্যা ঠিক উতরাইয়া যাইবার পর হঠাৎ বিধু ঘটক আসিয়া উপস্থিত হইল; বলিল, 'দাদা, মেয়েটার বিয়ে দেবে তো বলো, ভালো সম্বন্ধ হাতে এসেছে একটা। নিজে হতে সেধে এসেছে, লেগে যেতে পারে।'

গদাধর প্রশ্ন করিল, 'লোকটা কে?'

'চেনা লোক আপনার। বৈঁচিতে বাড়ি, নাম কাশীনাথ কুণ্ডু; আপনার কাছে নাকি কি-একটা কাজ নিয়ে যাওয়া-আসাও করছে শুনছি। বললে—বিয়ের কথাটা আপনিই পাড়ুন ঘটকঠাকুর, উনি রাজী হন তখন আবার আমাদের দুজনের মধ্যে সাক্ষাৎ কথাবার্তা হবে। আপনি মুখপাতটা ধরিয়ে দিন।'

'তা রাজী হব না কেন? এ তো ওঁর দয়া। ছেলেটি?'

'ছেলেটি খুবই বাঞ্ছনীয়, যেমন উনি বললেন, ডাক্তারি পাস করেছে এবছর মেডিক্যাল কলেজ থেকে, আপাতত গ্রামেই বসবে, তারপর লড়াই শেষ হলেই বিলেত পাঠাবেন। দেখতে-শুনতে ভালো—বাপের চেহারা দেখছেনই আপনি। বিলেত পাঠাবার কথাটা না হয় বাদই দেওয়া যায় আপাতত; বাকি তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। নিজেরও ভালো রকমই সম্পত্তি আছে বলে মনে হ'ল, কলকাতাতে একখানা বাড়ি তুলছেন বললেন, সেও খোঁজ নিলেই টের পাওয়া যাবে . . .'

'খাঁই?—দিয়েছেন কিছু আন্দাজ?'

'খাঁই আছে। সেটা এ-বাজারে এমন কিছু বেশিও নয় যে তোমার দিতে কষ্ট হবে, তবে . . .'

'তবে?'

'তবে যেভাবে চাইছেন উনি, সেভাবে দিতে তুমি রাজী হবে কি না তুমিই জানো, যদিও আমি তো ক্ষতি দেখি না। উনি চাইছেন সতের হাজার টাকা—তা দেওয়া যায়, ছেলে যেমন বলছেন যদি সেইরকম হয়—তবে উনি সবটা নগদ চান; বলছেন গয়নাগাঁটি যা গড়াবার উনি নিজেই গড়িয়ে দেবেন। . . . . তা তোমার কী আপত্তি থাকতে পারে? ওসব হ্যাঙ্গাম যত পরের ঘাড় দিয়ে যায় ততোই ভালো নয় কি? . . . . সোনার খাদ বেশি—প্যাটার্নি তেমন পছন্দসই নয় . . . . কাজ কি বাবা?—তোমাদেরই জিনিস তোমরাই দেখেশুনে গড়িয়ে নাও। . . . . আমি যা বুঝি।'

ঘটক আরও যা-যা বোঝে বোঝাইয়া দিয়া বিদায় লইল। বলিল, পরদিন আবার আসিবে।

বিবাহের কথাটা স্ত্রীর কাছে পাড়িতে গদাধরের তত ভাবিতে হইল না, বাপের চেয়ে মায়েই এ বিষয়ে বেশি উদ্বিগ্ন থাকে। ঘটকের কথাগুলা বেশ গুছাইয়া লইয়া প্রায় তখনি সরোজিনীকে গিয়া সব জানাইল। সরোজিনী মুখটা গম্ভীর করিয়া বলিল, 'আমি অমন চশমখোর মানুষের বাড়িতে মেয়ে দোব না।'

'কেন?'

সরোজিনী রাগটা হদ্দ একবার কোনরকমে সামলাইয়া রাখিতে পারে, বেশ জোর গলাতেই একটু হাত নাড়িয়া বলিল, 'সে বোঝবার ক্ষমতা যদি তোমার থাকত তাহলে দু-দুটো ধুমড়ো মেয়ে এরকম আইবুড়ো হয়ে ঘরে পড়ে থাকত না। মেয়েকে আমার গয়না দিয়ে কাজ নেই, সব টাকা ওর ছিচরণে ঢালি, উনি পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে ওড়ান। গয়নাই হ'ল মেয়ের স্ত্রীধন, নিজেব বলতে যা-কিছু! . . . . মিনসেকে একবাব আমার সামনে এনে হাজির করতে পার?'

গতিক দেখিয়া গদাধর নিজেই সামনে থেকে সরিয়া পড়িত, কিন্তু সম্বন্ধটা কেমন বড় পছন্দ হইয়া গেছে, একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, 'স্ত্রীধন নিয়ে যা বললে তুমি, সেটা ঠিকই, তবে লোকটা যে পায়ের ওপর পা দিয়ে টাকা ওড়াবার মানুষ নয় এটা আমি জানি।'

'কি করে জানলে?'

গদাধর কাশীনাথের ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রস্তাবটা বলিল, শুধু টিনে ঘি ভরতি করিবার রহস্যটা বাদ দিয়া।

সরোজিনী একেবারে নির্বাক হইয়া খানিকক্ষণ এমনভাবে মুখের পানে চাহিয়া রহিল যে,

গদাধরেরও প্রায় বাক্‌রোধ হইবার মতো অবস্থা হইয়া পড়িল। সরোজিনী কোমরে দুইটা হাত দিয়া ঘাড়টা সামনে একটু আগাইয়া প্রশ্ন করিল, 'টাকা বের করে দিয়েছ তুমি? তোমায় না বাবা পইপই করে মানা ক'রে গেছেন? লোকটা যে জোচ্চোর নয়, কি করে জানলে?'

গদাধবের সব গোলমাল হইয়া গেল, বলিল, 'টাকা কখনও বের করে দিই? আর তা হলে তোমায় জিগ্যেস করতাম না? ব্যবসার কথাতে তো ভাগিয়েই দিয়েছিলাম। এটা ভাবলাম বিয়ের কথা বলছে—বিয়ে তো আর ব্যবসা নয়, তাই . . . .'

'এর মধ্যে কত বড় ব্যবসাদারী মতলব আছে, সেটা ঢুকেছে তোমার মাথায়? অবশ্য নেহাত উড়িয়ে না দিয়ে যদি খাটায়ই ব্যবসাতে।'

গদাধর বিহ্বলভাবে মুখের পানে চাহিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

'তা হলে আমার কাছে শোন; আমি কেন, রাস্তার মুটেটাকেও ডেকে জিগ্যেস করলে সে বলে দেবে, তুমি টাকা দিলে মুনাফার অর্ধেক বখরা দিতে হবে তো তোমায়?—দিত কচু, তবু আইনের একটা ভয় থাকত তো?—কথাবার্তায় দেখেছে দিব্যি গোবরগণেশ লোকটা, ছেলের বিয়ে দিয়ে সমস্ত টাকাটা বেব করে নিয়ে খাটাই—তখন মুনাফার ষোল আনাই আমাব—কেউ আর চাইবার থাকবে না। দেখতে পাচ্ছ না? যত ক'টি টাকা ওদিকে চেয়েছিল ঠিক তত ক'টি টাকা চাইছে বিয়েতে। জোচ্চোরের কি একটা করে ল্যাজ হয়?'

গদাধর ঘামিয়া উঠিতেছিল, তবু ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে যে টিনে ঘি ভরতিব কথাটা বলিয়া ফেলে নাই। এমন কী ছুতা কবিয়া এখান থেকে সরিয়া পড়া যায় ভাবিতেছিল, স্ত্রী বলিল, 'ওসব লোকের কি ওষুধ জান?'

'কি?'

'কি তা তোমায় বলে কোনও ফল আছে?—তোমার মতন মেনিমুখো পুরুষকে?—আমি হলে জপিয়ে জাপিয়ে ওর কাছ থেকেই সমস্ত আঁতঘাত বুঝে নিয়ে ওকে বিল্বিপত্র শুঁকিয়ে দিতাম। তারপর নিজের কারবার নিজে ফাঁদতাম—ওসব লোকের ওই ব্যবস্থা। আমি আমার গাঁটের টাকা বের করে দোব, অন্যে তার মুনাফা তুলবে! কি বলে বলতে এলে তুমি কথাটা আমার কাছে? লোভ কি হয় না মানুষের? হয়, লড়াইয়ের বাজার ধুলোমুঠো ধরতে সোনামুঠো ধরছে লোকে—বসে বসে দেখছি তো? লোভ হয় বইকি, লোভ হয়ে আর কি অন্যায় হয়েছে—কিন্তু . . . .'

গদাধরেরও একটা প্রবল লোভ হইতেছিল, একটু বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত হইবার, জীবনে অন্তত একবার; বলিল, 'তা আমিই কি বসে আছি নাকি? কিন্তু টাকা বের করতে গেলেই তুমি তো হৈ-হৈ লাগিয়ে দেবে। সব বুদ্ধির গোড়াতেই তো টাকা। হদিস জেনে নিয়েছি অনেক—এক একটা শুনলে তাক লেগে যাবে। কিন্তু টাকার বেলায়ই যে ঠুঁটো হয়ে বসে থাকতে হয়েছে, বাবা করে গেলেন বারণ, এদিকে তুমি . . . .'

সরোজিনী ঘাড়টা একটু ফিরাইয়া শুনিতেছিল, বলিল, 'বলে যাও। . . . . বারণ করে লোকে সাধ করে? মাথায় যে ওদিকে . . . . বেশ, কি কি হদিস আদায় করেছ, দুটো শোনাও দিকিন।'

'কেন, এই ধরো, আগামের কথাটা, যদি দশ হাজারের কাজ করি, এক লাখ . . . . বেশ, এক লাখ না হোক, বিশ হাজারও তো . . . .'

সরোজিনী ঠোঁট উলটাইয়া বলিল, 'মস্ত বড় হদিস আদায় করে নিয়েছ তো। ওগো, এও তোমার অপরের কাছে জেনে নিতে হ'ল? পাটের চাষীও তো দাদন পায়—বিচি না ছড়াবার আগে। . . . . মরিঃ! মনে করলাম না জানি কি এক হদিস শিখে এলেন মন্দ আমার!...যাও, ঘরে গিয়ে বোসো তো।' অবজ্ঞাভরে চলিয়া যাইতে যাইতে ঘুরিয়া বলিল, 'হদিস বরং ঐ সাহেবদের গিয়ে ধরা, তা পারবে? যাও না কেন, পারা তো উচিত, পেটে বিদ্যে তো রয়েছে, মাথায় বুদ্ধি না থাক।'

গদাধরের মনের ভিতরটা তোলপাড় করিতেছিল,—আর নিজেকে চাপিতে পারিল না। টিনের রহস্যটা মুখ দিয়া বাহির হইয়া না পড়ায় এতক্ষণ নিজেকে ভাগ্যবান বলিয়াই মনে হইতেছিল, এবার স্ত্রীর বিদ্রূপ আর নিজের লোভের মাঝে পড়িয়া—সেটা নিজে হইতেই প্রকাশ করিয়া দিল,—একবার বুঝুক ব্যবসার রহস্য কাহাকে বলে!—কত গভীর তত্ত্বই না টানিয়া বাহির করিতে পাবে সে।

সরোজিনী একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, আরও দুই পা আগাইয়া আসিয়া বলিল, 'কী! টিনের সমস্তটায় ভেজিটেবল দিয়ে ভ'রে মুখে দু'ইঞ্চি খুরজার এক নম্বর ঘি দিয়ে—ব্যবসা করবে? এই বুদ্ধি দিয়েছে, আর সেই বুদ্ধি নিযে তুমি লাফালাফি করছ?—রাধারমণের মন্দির আর ভালো লাগছে না, না?—জেলে গিয়ে উঠবার জন্যে পা চুলকুচ্ছে। . . . কি জোচ্চোর রে বাবা।—কখন আসবে সে-মিনসে বলো দিকিন আমায়। . . . ভেতরে সবটা মেকী, বাইরে একেবারে এক নম্বর। . . . . এই মানুষেব সঙ্গে ব্যবসা কববে।—শুধু তাই নয়, এই মানুষের ঘরে মেয়ে দেবে . . . নিজের মেয়ে দেবে—বোঝ একবার!—যে লোক সলা দিচ্ছে যে শুধু বাইরেব চেহারাটা দেখিয়ে, ভেতরে ভূষিমাল . . . . '

কথাগুলা বলিতে বলিতে সরোজিনী আবার ফিবিয়া যাইতেছিল, ঘরের চৌকাঠের ভিতর একটা পা দিয়া হঠাৎ চুপ কবিয়া গেল, একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ফিরিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, দেখে তাহার পিছন ফেরাব সুযোগে স্বামী ইতিমধ্যেই অন্তর্ধান হইয়াছে।

গিয়া বাবান্দায় একটা থাম ধবিয়া সামনের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া দাঁতে নখ খুঁটিতে লাগিল, অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। বেশ খানিকক্ষণ গেল।

এত গুরুতর ব্যাপাব সরোজিনীর কাছে এত শীঘ্র শেষ হয না। গদাধব রাধারমণেবই শরণ লইতে যাইতেছিল, একেবাবে এরকম নিস্তব্ধতা দেখিযা খুব পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার কাছে আসিতেই একেবাবে সামনে পড়িয়া গেল।

সরোজিনী বলিল, 'তোমায়ই খুঁজছিলাম।'

গদাধব বলিল, 'মনে হ'ল যেন ডাকছ, তাই মন্দিবেব দিক থেকে ফিরে এলাম। কি?'

'দোব মেয়ের বিয়ে আমি, ঠিক করো।'

গদাধব আগাইয়া আসিতেছিল, বিমূঢ়ভাবে উঠানেব মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিল, 'কোথায়?'

'বৈঁচিতে। যেখান থেকে সম্বন্ধ এনেছ।'

গদাধব নিজেব চক্ষুকর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, আমতা-আমতা করিয়া প্রশ্ন করিল, 'খাঁই মিটোবে?'

'মিটোব।'

'যেমন ভাবে চাইছে—গয়নার টাকা-সুদ্ধ নগদে মিলিযে সতের হাজার?'

'এর ওপরও যদি গয়নাব জন্যে আলাদা চায় তো দোব।'

কিছুক্ষণ বাক্স্ফূর্তি হইল না গদাধরের, তাহার পর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, 'তোমার মাথা-খারাপ হয়েছে?

'এত পবিষ্কার মাথা আমার কোন দিনই ছিল না, তা না হলে এমন পরিষ্কার মাথাওয়ালা বেহাই চাইছি?—লোকে সমান-সমানই চায় তো? . . . অবশ্য তোমার মাথাটা নিশ্চয়ই এতটা খারাপ হবে না যে, গয়নার কথাটা গিয়ে তুলবে। তবে, ঐ নগদের ওপর কিছু গয়না দোব আমি মেয়েকে। . . . . ওপর ঘরে চলো, সব কথা এখানে হয় না।'

৩

পরামর্শটাই আসল, স্বামী-স্ত্রীর প্রায় সমস্ত রাতই অনিদ্রায় কাটিল—বিবাহের ব্যবস্থাটা কি হইবে, দেওয়া-থোওয়া গয়না-গাঁটি—ভোজ—তাহার পর মেয়ে পাঠানো—তাহার পর—তাহার পর

সময়ও তো হাতে নাই একেবারে।

আসল বিবাহের মধ্যে আর নূতন কথা কি থাকিবে যে আলাদা করিয়া বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন তাহার?—সেই মেয়ে-দেখা, সেই আসর, সেই ভোজ, সেই বাসর, সেই বিদায়।

যমুনা মেয়েটি বড় বেশি সপ্রতিভ, যাহা জিজ্ঞাসা করা হয় দুই-তিন বার প্রশ্নের পর মাথাটি নিচু করিয়া যেমন বলা উচিত সেভাবে তো বলেই না, বরং একটু বাগ্‌বিস্তার করিয়া বসে।

'আঁা নাম আমার? আমার নাম শ্রীমতী যমুনা দাসী মা বলেন। স্কুলে দিদিমণি বলেন দাসী না লিখে পাল লিখো '

এই করিয়া তিনটি সম্বন্ধ নষ্ট করিয়াছে। সরোজিনী সামনে ঝিকে রাখিয়া দোরের আড়ালে অপেক্ষা করিতেছিলেন। দেখিতে আসিয়াছেন মাত্র বরকর্তা, ঘটককে সঙ্গে লইয়া,—দেখা শেষ হইলে ঝিয়ের মধ্যস্থতায় পর্দা রক্ষা করিয়া বলিলেন 'ঝি, বল, বাড়িতে দুটো বেশি কথা বলে ব'লে উনি না মনে করেন, মেয়ে আমার বাচাল। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দেখবেন, সাত চড়েও কথা কইবে না, বিশ্বাস না হয় বরং লিখিয়ে নিন আমার কাছে।'

আর সব দিক দিয়া দিব্যি মেয়ে, সর্বোপরি নগদ সাতের হাজার টাকা আর তত্ত্ব-আবাসে দোহন করিবার এত বড় সম্ভাবনা মনের আনন্দে কাশীনাথ একটু রহস্যই আরম্ভ করিয়া দিল একটু হাসিয়া বলিল, 'বেয়ানকে অবিশ্বাস ক'রে কি পাপের ভাগী হব?'

হইতে হইল না পাপের ভাগী।

নগদ সতের হাজার টাকার উপর এক-গা গয়না লইয়া বৌ পালকি হইতে নামিল। বৌচিতে বেশ সাঁড়াই পড়িয়া গেল।

সত্যই কিন্তু 'সাত চড়েও' কথা কয় না।

সরোজিনী উপরে দু'ইঞ্চি খুরজার একনম্বর ঘি দেখাইয়া টিন ভরতি ভেজিটেবল গছাইয়া দিয়াছে।

মেয়েটি যমুনা নয়, বড় মেয়ে সরযূ।

স্বনির্বাচিত

শে ষে র হি সা ব

পরিমল গোস্বামী

নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এসে পূর্বতন বাসিন্দার একখানা হিসাবের খাতা হঠাৎ হাতে এল। দেয়ালের গায়ের আলমারির মধ্যে খাতাখানা পড়েছিল। চুনকাম করবার সময়েও কেউ এটা লক্ষ্য করেনি, আশ্চর্য! আলমারিটা তারা কেউ খোলেনি বোধহয়। কিন্তু আগের সেই ভাড়াটিয়াই বা কেমন লোক, হিসাবের খাতাখানাই নিতে ভুলে গেছে?

খাতাখানা সরিয়ে রেখে দিলাম, খোঁজ পড়বে একদিন হয়তো, তখন দেওয়া যাবে।

এদিকে আমার সংসারের যা দুর্গতি, তাতে এই সামান্য পরোপকারের প্রবৃত্তিও এখন আমার কাছে অস্বাভাবিক বোধহয়। জীবনরক্ষার মূল জিনিসেরই অভাব, অথচ বাঁধা আয়ে সংসার চালাতে হবে। এ অবস্থায় কার কি রইল, কার কি গেল, ভাববার প্রবৃত্তিও হয় না। চোখের সামনে সব ভেঙে পড়েছে। ঘুণ ধরে গেছে বাংলাদেশের জীবনে।

মাসে যা উপার্জ্জন করি তাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিছুই কেনা হয় না। জানুয়ারি মাসের বেতন দিয়ে শুধু বিছানার চাদর কিনেছি। পরিবারের লোকসংখ্যা পাঁচ, একসঙ্গে অনেক জিনিস কিনতে হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দিয়ে কিনলাম পাঁচজোড়া জুতো। এমনি ভাবে এক এক মাসে এক একজাতীয় জিনিস!

গ্রীক পৌরাণিক গল্পে আছে, পারসিউস, গর্গন-হত্যার অভিযানে যাবার পথে এক সময় তিনটি বৃদ্ধা ভগিনীর দেখা পায়। তাদের তিনজনের চোখ ছিল মাত্র একটি, যখন যার দেখার দরকার হ'ত সে তখন ঐ চোখটি আর একজনের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ব্যবহার করত। তার কথাই আজ মনে পড়ছে। বর্তমানে আমাদের দেশের এক এক পরিবারের পাকস্থলী থেকে শুরু ক'রে ছাতাটি পর্য্যন্ত যদি ঐ রকম একটিতে কাজ চলত!

একদিন একা বিছানায় প'ড়ে এই সব নানা অসম্ভব কল্পনায় মেতেছি, এমন সময় খেয়াল হ'ল আমার এই ফ্ল্যাটের পূর্বপুরুষটি কি ভাবে সংসার চালাতেন দেখা যাক। তাঁর এই ফেলে-যাওয়া হিসাবের খাতাখানা খুলে শুয়ে শুয়েই পড়তে আরম্ভ করলাম। পাঁচ বছরের হিসাব। পড়তে পড়তে উঠে বসলাম। এক নিশ্বাসে সবটা পড়ে ফেলতে হ'ল। শেষ করে স্তম্ভিত হ'য়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে যখন উত্তেজনা কমে এল, বুঝলাম এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। কিছু বুঝেও নিষ্কৃতি পেলাম না।

আমার নিজের হিসাবের খাতাখানাও খুলে দেখি, এই হিসাবের সঙ্গে আশ্চর্য মিল। এঁর শেষ হিসাব লেখা হ'য়ে গেছে, কিন্তু আমার শেষ হিসাব এখনও লেখা হয়নি—ঐখানেই যা তফাৎ।

প্রতি মাসে আশী টাকার সযত্ন হিসাব। ভদ্রলোক মাসে আশী টাকা বেতন পেতেন, বেশ বোঝা যায় তিনি কখনও ধার করেননি। তাঁর এই হিসাব থেকে আমি পাঁচ বছরে ছটি মাস বেছে নিয়েছি। এরই মধ্যে পাওয়া যাবে তাঁর ইতিহাস।

কিন্তু কোন এক অদৃশ্য শক্তি এই হিসাবের সঙ্গে আমার নিজের হিসাব এক সুরে বেঁধে দিয়েছে, ভাবতে গেলে আমি অস্থির হয়ে উঠি। তাই নিজের মনকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে আমার আবিষ্কার-করা হিসাবের খাতা থেকে আমার বাছাই-করা ছ'টি হিসাব সবার সামনে এনে হাজির করলাম, হয়তো আরও পাঁচজনের হিসাবের সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য থাকতে পারে। এটা কল্পনা করেও অনেক আরাম বোধ করছি। আমার একান্ত অনুরোধ নীচের পাঁচ বছরের ছ'টি হিসাব আপনারা ভাল করে পড়ুন।

(১) ১৯৩৯ জুলাই

বাড়িভাড়া	...	১৫৲
চাল দু'মণ	...	১০৲
কাপড় ৪ জোড়া	...	১০৲
বাজার খরচ	..	৩০৲
কয়লা ৩ মণ	...	১॥০
থিয়েটার ও সিনেমা	...	৭৲
অন্যান্য	...	৬॥০
		৮০৲

(২) ১৯৪০ জুলাই

বাড়িভাড়া	..	১৫৲
চাল দু'মণ	...	১২৲
কাপড় ৪ জোড়া	..	১৮৲
কয়লা ৩ মণ	..	২।০
বাজার	..	৩০৲
অন্যান্য	..	২॥০
		৮০৲

(৩) ১৯৪১ জুলাই

বাড়িভাড়া	...	১৫৲
চাল একমণ	...	১০৲
বাজার	...	৩৫৲
কাপড় ২ জোড়া	...	১৪৲
কয়লা ২ মণ	...	২৲
অন্যান্য	...	৪৲
		৮০৲

(৪) ১৯৪২ জুলাই

বাড়িভাড়া (গত জানুয়ারি থেকে সাময়িক ভাবে কম)		১২৲
চাল আধমণ	...	১২৲
বাজার	...	৩৬৲
কয়লা ২ মণ	...	৩৲
লটারির টিকিট	...	৬৲
কাপড় ১ জোড়া	...	১০৲
অন্যান্য	...	১৲
		৮০৲

(৫) ১৯৪৩ জুলাই

বাড়িভাড়া(পুনরায় বৃদ্ধি)...		১৫৲
চাল দশ সের	...	৭।।০
বাজার	...	৩০৲
কাপড় ১ জোড়া	...	১০৲
লটারির টিকিট	...	৫৲
সর্বসিদ্ধি কবচ	...	৫৲
ভাগ্যলক্ষ্মী মাদুলি	...	৫৲
কয়লা আধমণ	...	১।।০
অন্যান্য	...	১.
		৮০

(৬) ১৯৪৩ অগস্ট

বাড়িভাড়া	...	১৫৲
পরিবার দেশে পাঠানোব খরচ	...	১২৲
স্ত্রীর হাতে দেওয়া গেল	...	৫১।।০
দড়ি ও কলসি	...	১।০
		৮০.

ব্ল্যাকমার্কেট

লেখকের বিচার

মণীন্দ্রলাল বসু

অবনীর 'ললিত-লাবণ্য কথা', সিতাংশুর 'বালীগঞ্জে ভূতুড়ে বাড়ি' ও সতীশের 'অনন্ত তৃষ্ণা' গল্পগুলির পর আমার গল্প তোমাদের তেমন ভাল লাগবে না। আমি যা বলব তা গল্প নয়, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এ ঘটনা ঘটেছিল, অর্থাৎ ঘটা উচিত ছিল।

গত মাসে সতীশ চৌধুরীর বাড়িতে ডিনার-খাওয়া তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে। চৌধুরীর কোনও ডিনার আমি ভুলতে পারি না, ও লোকটা খাওয়ার আর্ট ওস্তাদের মত আয়ত্ত করেছে। যেমন বর্ণ ও রেখা-ছন্দের সামঞ্জস্যে চিত্রের সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়; যেমন বেহালার সঙ্গে পিয়ানোর বা শরদের সঙ্গে বাঁয়া তবলার যথাযথ সঙ্গতে সুরের সমন্বয়ে জল্‌সা জ'মে ওঠে, তেমনিই আহার্যের সঙ্গে পানীয়ের যথোচিত সম্মিলনেই আহারের আনন্দ সৃষ্টি হয়; ভোজ্য প্রচুর ও বিচিত্র হলেই হয় না; আহার্য নির্ধারণে চাই সংযম এবং ডিনারের প্রতি কোর্সের খাদ্যের সঙ্গে পানীয় নির্বাচনে চাই পান-বিলাসীর সূক্ষ্ম আভিজাতিক রুচি; চৌধুরীর প্রতি ডিনারে আহার্য ও পানীয়ের শুধু বৈচিত্র্য নয়, আনন্দময় ঐক্য পাওয়া যায় ব'লেই তার ডিনারগুলি এমন উপভোগ্য।

ডিনার খেয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম, রাত বারটা বেজে গেছে, কে আমায় মোটরে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল, অবনী তুমিই বোধ হয়। হাসছ কেন,—বুঝেছি, তুমি বলতে চাও, মোটরে বাড়ি পৌঁছে না দিয়ে গেলে, একা বাড়ি ফেরবার মত অবস্থা আমার ছিল না তা হয়ত সত্যি!

আমার ড্রয়িং-রুম তোমরা দেখেছ, বাড়ির একতলার প্রায় সমস্ত অংশ জুড়ে, তার পাশে বারান্দা তারপর দোতালাতে ওঠবার সিঁড়ি। সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে দেখি ড্রয়িং-রুমে আলো জ্বলছে; এত রাত্রে ড্রয়িং-রুমে কে আলো জ্বালাল!

খোলা দরজার পর্দা সরিয়ে দেখি, ঘর লোক-ভরা, সব অজানা অদ্ভুত-মূর্তি। এত রাতে এত লোক আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছে আর গেট খোলবার সময় দরোয়ান একটা কথাও বললে না? ঘরের আলো বড় অপূর্ব লাগল, এ-আলো কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর বৈদ্যুতিক আলো নয়, এ সূর্যের বা চন্দ্রের আলোও নয়, এ কোনও অতীন্দ্রিয় লোকের আলো।

ঘরে প্রবেশ করতেই একটা সোরগোল প'ড়ে গেল।

—এই যে এতক্ষণে এসেছেন।

—খাওয়া বেশ ভালই হয়েছে দেখছি।

—পান ততোধিক, আমরা এদিকে এক ঘন্টা ব'সে।

বিস্মিতভাবে বললুম, ক্ষমা করবেন, আমি কাউকে ঠিক চিনতে পারছি না, কোনও জরুরী কেস্ নাকি, পুলিস কেস্?

সোফাতে একটি মোটা লোক বসেছিল, সার্কাসের ক্লাউনের মত হা-হা ক'রে সে অদ্ভুত হেসে উঠল,—ওহে আমাদের চিনতে পারছে না!

সামনের সেটিতে এক মধ্যবয়স্কা নারী ব'সে শুষ্ক মুখ, শীর্ণ দেহ, চোখ দুটি অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করছে। কোণে গদি আঁটা চেয়ারে এক তরুণ যুবক, কালো কোঁকড়ান চুল, কবির মত স্বপ্নভরা চোখ। রজনীগন্ধা-ভরা ফুলদানির পাশে দোলানো-চেয়ারে এক তরুণী, বর্ষাস্নাত শ্বেতকরবীর মত করুণ সুন্দর। অপর দিকে এক কিশোরী মভ-রঙের শাড়ী প'রে, শ্রাবণ-জ্যোৎস্নায় অপরাজিতা লতার মত মধুর উদাস। আরও অনেক বিচিত্রবেশী বিভিন্ন বয়সের নরনারী। মনে হ'ল, তাদের যেন কোন স্বপ্নে দেখছি, চেনা হয়েছিল, কিন্তু জানা হয়নি, সব ভুলে গেছি। মোটা লোকটি পরিহাসের সুরে হেসে উঠল,—ভয় নেই, চেয়ারটায় ব'স, ভারতীতে 'ক্লাউন' ব'লে একটি গল্প

লিখেছিলে মনে পড়ে?

—হাঁ, সে ত অনেক বছর আগে হবে।

—আমি সেই ক্লাউন, আমার কথাই তুমি লিখে নাম করেছিলে। আমার আসার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এঁরা বিশেষ ক'রে ইনি, কিছুতেই ছাড়লেন না।

রঙ্গভরা চোখ নাচিয়ে সে শীর্ণা নারীটির দিকে চাইল।

ক্লাউন বলতে লাগল,—'মা' গল্পটা মনে পড়ে? ইনি সেই মা। তোমার গল্পে এঁর সাত বছরেব ছেলে টাইফয়েডে মারা যায়, চার বছর ধ'রে ইনি মৃত ছেলের জন্যে শোক করছেন, প্রতীক্ষা করছেন, এখন এসেছেন তোমার কাছে, তাঁর প্রতি কেন এ অবিচার, কেন তাঁর ছেলে মারা যাবে, তুমি ত তাঁব ছেলেকে বাঁচিয়ে দিতে পারতে। আর এঁরা সব তোমার গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা—ওই হচ্ছে বিশু পাগল, কোণে গুম হয়ে বসে আছে, ওই তোমার তরুণ কবি রেবন্ত, ওই মাধবী কেশে শ্বেত করবীর মালা জড়িয়েছে, ওই চিববিরহিণী অপরাজিতা—এঁরা এসেছেন তোমার বিচার করতে, তুমি তোমার খুশীমত তাঁদেব জীবন গড়েছ, ভেঙেছ, কেন তাঁরা এত দুঃখ পাবেন চিরদিন। তুমি কি ওঁদের সুখী করতে পারতে না? হা হা, এবার বড় মুস্কিলে পড়েছ লেখক।

ব্যঙ্গের সুবে সে উচ্চৈঃস্ববে হেসে উঠল, যেন জীবনটা একটা অট্টহাস্য।

ধীরে বললুম, আমি লেখক মাত্র, মানব-সংসারে যদি দুঃখ মৃত্যু বিচ্ছেদ না থাকত, আমিও সে কথা লিখতুম না, আমার কি অপরাধ?

শীর্ণা নারী ব্যথিত স্বরে ব'লে উঠল, কাব কি অপরাধ আমি জানি না, বুঝি না, আমি চাই আমার ছেলেকে, আমার মানিককে ফিরিয়ে দাও।

—আমি চাই আমার স্বামীকে। কেন তিনি আমায় ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবেন এক ঘৃণিতা নারীব সঙ্গে।

—আমি চাই আমার প্রেমিক, আমার অজিতকে সে ত সত্যি আমায় ভালবাসত, আমায় বিবাহ করবে বলেছিল, তুমি কি আমার সুখ-মিলন কথা লিখে তোমার উপন্যাস শেষ করতে পারতে না? কেন তুমি আনলে ইন্দ্রাণীকে, অজিত তার রূপ দেখে ভুলে গেল, আমাকে ত্যাগ ক'রে চলে গেল—আমাদের প্রেম-মিলনপথে তুমি কেন আনলে ইন্দ্রাণীকে?

—আব আমি? হৈমন্তীকে আমাব মত কে ভালবাসত, কে ভালবাসে? নিজ হাতে তাকে আমি খুন করলুম. হৈমন্তী শবৎ-শেফালির মত পবিত্র নিষ্পাপ, তাকে আমি সন্দেহ করলুম; কেন তুমি শরতকে আনলে আমাদের জীবনে? সে শুধু আমার মনে সন্দেহ জাগাত, নিজ স্ত্রীকে ভাবলুম অবিশ্বাসিনী, তুমি লেখক শরতের চরিত্র এঁকে পেলে বাহবা, আমি হলুম স্ত্রী-হত্যাকাবী।

আমি বললুম, দেখ তোমরা যদি একে একে তোমাদের কথা বল, তাহলে তোমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করতে পারি।

শীর্ণা নারী ব'লে উঠলেন, আগে আমার উত্তর দাও, কেন আমার ছেলে মরবে, টাইফয়েড রোগ থেকে ত কত ছেলে সেবে ওঠে, তুমি কি গল্পে লিখতে পারতে না, আমার ছেলে সেরে উঠল?

বললুম, মা, তুমি কি ভাবো, তোমার ছেলের মৃত্যুতে আমার অন্তরের ব্যথা, তোমার ব্যথার চেয়ে কিছু কম? তুমি জানো, আমিও তোমারই মত তোমার রুগ্ন শিশুর শিয়রে রাতের পর রাত ভয়ব্যাকুল চক্ষে জেগেছি; তুমি জানো, আমিও তোমারই মত তার রোগমুক্তির জন্যে প্রার্থনা করেছি। মনে পড়ে, যে-রাতে তোমার ছেলের মৃত্যু হয়—সন্ধ্যায় ডাক্তার ব'লে গেল, খোকা অনেকটা ভাল আছে, সেই আশ্বাসবাণী শুনে তুমি ভাবলে রাতে একটু ঘুমোবে, শ্রান্তিতে তুমি তার শয্যাপার্শ্বে ঘুমিয়ে পড়লে, আমি কিন্তু বিনিদ্র নয়নে জেগে রইলুম। শ্রাবণের মধ্যরাতে আকাশের সব তারা নিবিয়ে বৃষ্টি এল, দ্বারে দেখলুম, কার করাল কৃষ্ণ ছায়া, সে যম। দ্বার রোধ

ক'রে দাঁড়ালুম, বললুম, নিদ্রিত মায়ের কোল থেকে রুগ্ন পুত্রকে তুমি নিতে পারবে না, আমি মাকে জাগিয়ে দেব। যম বললে,—তুমি বাধা দিও না, সৃষ্টির সত্যকে তুমি লঙ্ঘন করতে চাও। আমি যম, আমি অমোঘ শাশ্বত নিয়ম, আমি আজ্ঞাবহনকারী ভৃত্য মাত্র, আমার কাছে প্রার্থনা করা বৃথা; যিনি জন্মমৃত্যুব অধিপতি তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, কিন্তু সে প্রার্থনাও বৃথা হবে, সৃষ্টিকর্তা নিজ নিয়ম-জালে আপনি বাঁধা পড়েছেন। পারলুম না যমকে বাধা দিতে, নিশীথ রাত্রে তোমার ঘব থেকে সে তোমার ছেলেকে নিয়ে গেল, তুমি নিদ্রিতা ছিলে, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ শ্রাবণ নিশীথাকাশেব মত আমাব চোখে অশ্রুর বন্যা উথলে উঠেছিল। তা যদি না হত তা হ'লে পারতুম কি তোমায় সৃষ্টি করতে, তোমার কথা লিখতে কি পারতুম? তোমার মনেব বেদনা আমার রেখাঙ্কিত ললাটে আমার শীর্ণ কপোলে; তোমার আশাহীন কালো চোখের দিকে চেয়ে বিশ্বস্রষ্টাকে আমিও রাতের পর রাত প্রশ্ন করেছি; উত্তর পেলুম না, কিন্তু শোকাতুবা মাতাব দিব্য মূর্তি দেখলুম; তুমি ছিলে চঞ্চলা বালিকা, নিজ স্বার্থকামিনী, সুখান্বেষিণী, তুমি বদলে গেলে, নিজ সুখ-সম্পদেব দিকে চাইলে না, তুমি হলে সেবিকা, পৃথিবীর সব মা-হারা সন্তানদের তুমি বুকে টেনে নিলে; তোমাব দুঃখ-বেদনা যদি না জানতুম, তোমার কথা কি লিখতে পারতুম এমন কবে?

পুত্র-মৃত্যুপীড়িতা মাতা কোনও উত্তব দিল না, দীপ্ত নযনযুগল অশ্রুতে অন্ধ হযে গেছে।

বিরহিণী অপবাজিতা বললে, অজিতকে ত মৃত্যুতে নিযে যায নি, নিযে গেল এক ডাইনী, সে মায়াবিনীকে তুমিই ত আমাদের জীবনে আনলে, তোমার গল্প হযত বেশ জমল, কিন্তু আমাব জীবন হ'ল ব্যর্থ শূন্য। তুমি তোমার উপন্যাসের একটা উপসংহাব লেখ—অজিত বুঝতে পেবেছে ইন্দ্রাণী মেকী, তার ক্ষণিক রূপের মোহ ভেঙে গেছে, অজিত বুঝবে আমার প্রেম কত সত্য, আমি তার জন্য প্রতীক্ষা করছি, সে আমাব কাছে ফিবে আসুক, তোমাব উপন্যাসেব কি সুন্দব শেষ হবে বল দেখি।

বললুম, আমার সমস্যা দেখছ না, অজিতকে তোমবা দু-জনেই ভালবাস, আমি কাব সঙ্গে তাব মিলন ঘটাই? অজিত যাকে ভালবাসবে, তাব সঙ্গে মিলন হওযা ভাল নয কি? তোমাব সঙ্গে যদি অজিতের বিবাহ দিতুম, আজ ইন্দ্রাণী এসে আমায প্রশ্ন কবত, আমাদের মিলন কেন হবে না, আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি? হযত তোমাদেব বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হযে যেত।

—মিথ্যে কথা, ইন্দ্রাণী কি অজিতকে আমাব মত ভালবাসে? ও অজিতেব টাকায ভুলেছে।

—মানলুম, কিন্তু জীবনের বিপুল পথে মানব-দেহমনের লোভ মোহ ক্ষুধা বাসনা কামনাকে তুমি কোনও নিয়মে নিয়ন্ত্রিত কবতে পাব? আমি দিতে পাবি অজিতকে তোমার হাতে, কিন্তু তুমি বাখতে পারবে কি? দীর্ঘ বিচিত্র জীবনপথে কত নবীনা ইন্দ্রাণী অজিতেব হৃদয-দ্বাবে আঘাত কববে, অজিতের হৃদয উদাস হবে, তাব পাযে শৃঙ্খল দিযে রাখতে পার, কিন্তু তার প্রেম পাবে কি? চাও তুমি তোমার ব্যর্থ প্রেমের কারাগারে তার অশান্ত বুভুক্ষু দেহমনকে বন্দী ক'রে রাখতে?

—কেন সে আমায় ভালবাসবে না? তুমি ত উপন্যাসে লিখতে পার, সে আমায মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসল, তুমি ত তাকে তেমনই ক'রে সৃষ্টি করতে পার।

—অজিতকে আমি তোমার প্রেমিকারূপেই সৃষ্টি করতে চেয়েছিলুম, আমি লিখতে চেযেছিলুম, সত্যিকার প্রেমিক আজীবন অনুরক্ত স্বামীর কথা, আঁকতে চেয়েছিলুম আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন। কিন্তু মানুষের মন ত আমার হাতের পুতুল নয়, সে সজীব, সক্রিয় অগ্নিগর্ভ, পর্বতগুহাবতীর্ণা নদীধারাব মত সে যে কোন্ পথে যাবে, পুরানো পাড় ভাঙবে, নূতন তীর গড়বে, তার পথের নির্দেশ কে করতে পারে! সজীব মানুষ যখন আমার উপন্যাসে আসে, তাকে ত শৃঙ্খলিত সামাজিক অনুশাসনপীড়িত ক'রে আপন ইচ্ছা আদর্শ মত চালাতে পারি না, সব বাধা শৃঙ্খল ভেঙে সে তার নিজ যাত্রাপথ ক'রে চলে, আমি তার পথ চলার কাহিনী লিখি।

দোলানো-চেয়ার থেকে দীর্ঘ কৃষ্ণ অক্ষিপক্ষ্ম কাঁপিয়ে মাধবী আমার দিকে চাইল। বললুম, মূর্তিমতী বেদনার মত তুমি মূক ব'সে আছ, মাধবী, তুমি ত কিছু বলছ না? আমার আত্মার সুগভীর বেদনা দিয়ে তোমায় সৃষ্টি করেছি, তুমি আমার প্রেমের কাহিনী জানো। শোন, তোমরা আমার গল্প শোনো :

আমি যখন কিশোর ছিলুম, এক কিশোরীকে ভালবেসেছিলুম, সে ছিল আমার জীবন-রূপকথার রাজকন্যা, তাকে ঘিরে রচতুম যৌবনস্বপ্ন, জীবন-মায়াজাল। কিন্তু সে সুন্দরীর মন ছিল অন্যমনা, সে ভালবাসত আর-এক যুবককে, আনমনা হয়ে সে বসে থাকত আমার পাশে। জেদ হ'ল, জয় করব ওই কিশোরী-চিত্তকে। আমার প্রেমের সাধনায় সে মুগ্ধ হ'ল, তাকে জয় করলুম; যৌবনে তাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পেলুম। তারপর বাহির হলুম পৃথিবীর বিপণিতে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুটে আনতে হবে প্রিয়ার পদপ্রান্তে; সেখানে স্বর্ণের জন্য হানাহানি, কাড়াকাড়ি, স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত, অর্থ-আহরণের প্রবল সংগ্রামে মেতে গেলুম। প্রথম যৌবনের প্রেম-বিহ্বল দিনগুলি স্বপ্ন হয়ে গেল; প্রিয়া যখন গান গায়, আমার এস্রাজ বাজাবার সময় হয় না; প্রিয়া যখন ছবি আঁকে, আমার রং গুলে দেবার অবসর কোথায়?

বাণিজ্য ক'রে আনলুম স্বর্ণ, ব্যাঙ্কে তহবিল উঠল উপছে। প্রিয়াকে সাজালুম,—কর্ণে মুক্তার দুল, কণ্ঠে হীরার মালা, অঙ্গুলিতে নীলার অঙ্গুরীয়, কটিতে স্বর্ণময় কাঞ্চী, পদে মণির নূপুর।

গঙ্গাতীরে তৈরী করলুম বিচিত্র প্রাসাদ প্রিয়ার জন্য। জার্মানি দেশ হতে এল স্থপতি, ইতালী হতে এল বিচিত্র বর্ণের মর্মরপ্রস্তর, চৈনিক কারিগর তৈরী করল গবাক্ষ, পারসিক রীতিতে নির্মিত হ'ল স্নানাগার।

প্রাসাদের চারিদিকে রমণীয় উদ্যান রচনা করলুম—পূর্বদ্বারে অশোকবীথিকা, পশ্চিমে তালতমালশ্রেণী, উত্তরে পদ্মদিঘী, দক্ষিণে নীপবন, করবীকুঞ্জ।

কিন্তু প্রিয়ার মন রইল অন্যমনা, আনমনা হ'য়ে সে সুদূরে চেয়ে থাকে, প্রেমতৃষিতা।

সে দিন সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশের বর্ণোৎসবে পৃথিবী রঙিন, হেনাহাস্নাহানা কুঞ্জের গন্ধোচ্ছ্বাসে বাতাস মাতাল, নদীর জল কূলে কূলে ভরা। বিপণী থেকে গৃহে ফিরলুম; চন্দনকাষ্ঠের দ্বার খুলে পারস্যকার্পেটমণ্ডিত অধিরোহণী অতিক্রম করে প্রিয়ার কক্ষের দিকে গেলুম। সে সন্ধ্যায় প্রিয়া পরেছিল মাধবী রঙের শাড়ী, কণ্ঠে ছিল রজনীগন্ধার মালা; আমাকে দেখে প্রিয়া স্মিতমুখে, চকিতপদে এগিয়ে এল, শ্বেতপ্রস্তরের গৃহতলদর্পণের মতো দীপ্তিময়, পদযুগল ফুটে উঠল রক্তকমলের মতো, কিন্তু প্রিয়ার মন ছিল আনমনা, কাচের মতো মসৃণ মেঝেতে পা গেল পিছলে, সে মুর্ছিতা হয়ে পড়ল, শুভ্র মর্মরে রক্তপদ্মের পাপড়ি ছড়িয়ে লুটিয়ে পড়ল। সে মূর্ছা ভাঙল না, অন্যমনা হয়ে আমার গৃহে চলতে চলতে প্রিয়ার চরণ স্খলিত হ'ল, মৃত্যু এল।

পশ্চিমাকাশের বর্ণোৎসব শেষ হয়ে অন্ধকার এল, আমার অগণিত অশ্রুবিন্দু অনন্ত আকাশ ভরে জ্বলে উঠল। সে রাতে বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তাকে যদি পেলুম, কেন তার ভালবাসা পেলুম না, তাকে এমন করে কেন তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলে? বোবা আকাশ কোনো উত্তর দিল না।

উন্মাদ হয়ে প্রাসাদ ভেঙে দিলুম, প্রিয়ামৃত্যুবেদনা অহর্নিশি অন্তরে বহন ক'রে মহা উন্মাদনায় দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরেছি। জীবনের সেই অপরিসীম বেদনাসমুদ্র মন্থন ক'রে তুমি এলে মাধবী, তুমি এলে তরুণ কবি রেবন্ত; তোমরা আনলে নবদৃষ্টি, নববাণী মানবজীবনে, সংসারের সুখ দুঃখ পৃথিবীর সৌন্দর্য নূতন চোখে গভীরভাবে দেখলুম। আগে যাদের হৃদয়ের ব্যথা বুঝিনি, যাদের তুচ্ছ অবহেলা করেছি, তাদের বীরত্ব, তাদের মহত্ত্ব দেখলুম, আত্মার নবজন্ম হল। তুমি খুনী, তুমি

ঘৃণিতা, তুমি পাগল, তুমি ক্লাউন, তোমাদের সঙ্গে অন্তরের পরিচয় হ'ল, তোমাদের সমব্যথী হলুম। তোমাদের দুঃখের কথা লিখেছি, তোমাদের আত্মার সংগ্রামবেদনার কাহিনী। প্রিয়াবিরহকাতর আমার অন্তর দিয়ে যা অনুভব করেছি তাই লিখেছি, আমি কথাশিল্পী তোমাদের দুঃখে সমবেদনায় কাঁদতে পারি, আমি দার্শনিক নই, মানবজীবনের দুঃখের অর্থ কেমন করে বলব? আমি শুধু বুঝেছি, অপরূপ এই পৃথিবী, মহান এই মানবজীবন।

আমি চুপ করলুম। ঘরভরা স্তব্ধতা কাঁপতে লাগল তেল-ফুরিয়ে-যাওয়া প্রদীপের শিখার মত। সহসা বিশে পাগল হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল—আমি পারি, আমি পারি বলতে, এস আমার সঙ্গে।

বিশে পাগল পুব দিকের সবুজ পর্দা সরিয়ে আমার লাইব্রেরীতে যাবার দরজা খুলে দিল। সবাই চমকে দাঁড়ালুম। লাইব্রেরীতে নটরাজ শিবের একটি মূর্তি আছে দেখেছ, মূর্তিটিব দিকে বিশু ছুটে গেল, হাত জোড় করে নতজানু হয়ে মূর্তির সামনে বসল।

চোখে চমক লাগল। মনে হ'ল, এ আমাব লাইব্রেরী নয়, ভারতীয় কোনো গুহামন্দিরের গর্ভগৃহের সম্মুখে আমি দাঁড়িয়ে, গর্ভগৃহের অন্ধকারে অগ্নিকান্তি নটরাজ বিগ্রহ। গৃহের দ্বার শঙ্খপদ্মখোদিত কারুকার্যময় প্রস্তরনির্মিত; দ্বারের দক্ষিণে গঙ্গা ও বামে যমুনার লাবণ্যময়ী মূর্তি উৎকীর্ণ, অমৃতনিষ্যন্দিনী রূপ কঠিন প্রস্তর ভেদ ক'রে পদ্মের মত ফুটে উঠতে চায়— জ্যোৎস্নাশুভ্র গঙ্গা তরুচ্ছায়ায় মকরের উপর বঙ্কিমভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, এক হস্তে পূর্ণ জলকুম্ভ, অপর হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম; নীলোৎপলবর্ণা যমুনা কূর্মের উপর দাঁড়িয়ে, তাঁর এক হস্তে চামব অপর হস্তে নীলোৎপল।

গর্ভগৃহে দশদিকে ষোড়শ হস্ত প্রসারিত ক'রে অপরূপ নটরাজ মূর্তি—দক্ষিণ হস্তগুলিতে ডমরু বজ্র শূল পাশ টঙ্ক দণ্ড সর্প ও অভয়-মুদ্রা; বাম হস্তগুলিতে অগ্নি খেটক ঘন্টা কপাল খড়্গ পতাকা শুচিমুদ্রা ও গজহস্তভঙ্গি; পিঙ্গল জটাভাবে অর্ক ধুতুরাপুষ্প, চন্দ্র, গঙ্গামূর্তি; কণ্ঠে মুক্তার হার, সর্পহার, বকুলের মালা; বাম স্কন্ধে ব্যাঘ্রচর্ম; কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে পদে মণিমাণিক্য-বিজড়িত বলয়; অগ্নিশিখাবেষ্টিত পদ্মের উপর দক্ষিণপদ; নৃত্যচঞ্চল বামপদ শূন্যে স্থাপিত।

বিশে পাগল অট্টহাস্য করলে—হাঃ হাঃ। পদ্মপীঠ ঘিরে অগ্নিশিখা নেচে উঠল। চারিদিক অন্ধকার হয়ে এল। নটরাজ নৃত্য শুরু করলেন। নৃত্যেব তালে তালে হস্তের নানা অস্ত্র দিকে দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলেন। পরম বিস্ময়ে দেখলুম, নানা অস্ত্রের বদলে আমাব গল্প-উপন্যাসেব নায়ক-নায়িকারা তাঁর অগণিত হস্তে পুত্তলিকার মত শোভিত। নটরাজ তার ডমরু ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আমার দিকে, যেন তিনি বললেন, আমাব ডমরু তুমি বাজাও, আমি তোমার সৃষ্ট নরনারীদেব নিয়ে নৃত্যে মাতি। দেখলুম পুত্রশোকাতুরা মাতা, চিরবিরহিণী প্রেমিকা, জীবনের হলাহলপায়ী পাগল, সবাই মেতেছে তাঁর হস্তে জন্মমৃত্যু সুখদুঃখের নৃত্যের উন্মাদনায়।

আকাশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত বিসর্পিল গতিতে বিদ্যুৎ চমকে গেল। অশনিগর্জনে চমকে জেগে দেখি, সিঁড়ির পাশে বারান্দায় বেতের লম্বা চেয়ারে শুয়ে আছি, আমার চোখেমুখে বৃষ্টির জল অঝোরে ঝরে পড়ছে, বাতাসে অন্ধকার আকাশ হা হা করে উঠল।

কল্পলতা

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।। ১৭৮৭-১৮৪৮।। বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে ভবানীচরণের দান সামান্য নয়। সেকালের সমাজে তিনি অশেষ কীর্তি অর্জন করেন। তাঁর জীবনও ছিল কর্মময়। সামাজিক ব্যাপারে তাঁর অভিমতের মূল্য ছিল অনেক। সাহিত্যে তিনি সর্বপ্রথম ব্যঙ্গরচনার সূচনা করেন। সেকালের বাবু ও বিবি বাঙালীদের নিজ নিজ চেহারা দেখাবার জন্যে তিনি লেখনী ধারণ করেন। ১৮২১ সালের ৪ ডিসেম্বর তারিখে 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশিত হয়, এখানেই তাঁর সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি; অতঃপর তিনি 'সমাচার-চন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন।

গ্রন্থাবলী : কলিকাতা কমলালয়, হিতোপদেশ, নববাবুবিলাস, দূতীবিলাস, নববিবিবিলাস ইত্যাদি।

প্যারীচাঁদ মিত্র।। ১৮১৪-১৮৮৩।। সাহিত্যজগতে ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর নামে খ্যাত। এই নামে তিনি রচনা করেন 'আলালের ঘরের দুলাল'—এই বই-ই প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষায় প্রথম সামাজিক উপন্যাস। তাঁর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাংলা ভাষাকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাংলা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে।"

গ্রন্থাবলী : আলালের ঘরের দুলাল, বামারঞ্জিকা, ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত ইত্যাদি।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।। ১৮২৭-১৮৯৪।। আজীবন শিক্ষার উন্নতি ও শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী ভূদেব এদেশে সংস্কৃতচর্চার পথ সুগম করেন। তিনি জাতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিনি সহপাঠী, দুইজনের মেজাজের মিল ছিল না, কিন্তু মনের মিল ছিল। ভূদেবের রচনায় পুরাতনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পরিস্ফুট। বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস তিনিই প্রথম রচনা করেন। তিনি দীর্ঘকাল 'এডুকেশন গেজেট' সম্পাদনা করেন।

গ্রন্থাবলী : ঐতিহাসিক উপন্যাস, পুষ্পাঞ্জলি, পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার-প্রবন্ধ, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস ইত্যাদি।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।। ১৮৩৪-১৮৮৯।। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ। তাঁর রচনার পরিমাণ অল্প। স্বল্পপরিমাণ রচনাতেও তাঁর প্রতিভার দ্যুতিবিচ্ছুরণ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না।" তিনি রচনার প্রতি উদাসীনই ছিলেন।

গ্রন্থাবলী : যাত্রা-সমালোচন, রামেশ্বরের অদৃষ্ট, কণ্ঠমালা, সংকার, বাল্যবিবাহ, জাল প্রতাপচাঁদ, মাধবীলতা, দামিনী, পালামৌ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।। ১৮৩৮-১৮৯৪।। সাহিত্যের বহু বিষয়ে তিনি পথিকৃত। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদপ্রভাকর'-এ তাঁর অনেক গদ্য ও পদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫ সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গসাহিত্যে নবযুগের সৃষ্টি করে, বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে জ্ঞানচর্চার পথ রচনা করে এই পত্রিকাটি।

গ্রন্থাবলী : দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, কমলাকান্তের দপ্তর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ ইত্যাদি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ।। ১৮৪০-১৮৭০।। কালীপ্রসন্ন তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনে নিজেকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন যে, উনিশ শতকের বঙ্গদেশে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে তিনি একজন বলে গণ্য হয়েছেন। দেশের ও দশের হিতকারী অনেক উদ্যোগের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বঙ্গ ভাষার অনুশীলনের জন্যে মাত্র তেরো বৎসর বয়সে তিনি 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। এই 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' মাইকেল মধুসূদনকে মানপত্র দিয়ে প্রথম সম্মানিত করেন। মহাভারতেব অনুবাদ তাঁর অন্যতম মহৎ কীর্তি।

গ্রন্থাবলী ঃ বাবু নাটক, বিক্রমোর্বশী নাটক, সাবিত্রী-সত্যবান নাটক, মালতীমাধব নাটক, হুতোম প্যাঁচার নকশা ইত্যাদি।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।। ১৮৪৩-১৮৯১।। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একটি মাত্র গ্রন্থ রচনা করেই খ্যাত হন, সে গ্রন্থটি স্বর্ণলতা। তিনি মেডিকাল কলেজ থেকে পাস করে সরকাবী চাকুরি গ্রহণ করেন। যখন ডাক্তারী পড়ছেন, সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রেব 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। তখনই বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করে গ্রন্থরচনাব ইচ্ছা তাঁর হয়, তারই পরিণাম 'স্বর্ণলতা'। এই গ্রন্থেব সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তারকনাথ আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু তাঁর খ্যাতি নির্ভর করে তাঁর প্রথম গ্রন্থটির উপরেই।

গ্রন্থাবলী ঃ স্বর্ণলতা, ললিত সৌদামিনী, হরিষে বিষাদ, তিনটি গল্প, অদৃষ্ট ইত্যাদি।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।। ১৮৪৭-১৯১৯।। ত্রৈলোক্যনাথের জীবন বিভিন্ন অভিজ্ঞতাব আকর। তিনি বহুবিধ কাজ করেছেন, স্কুলমাস্টারি, দারোগাগিরি এবং অবশেষে মিউজিযমেব অ্যাসিস্টান্ট কিউরেটর। আজগুবি ও ব্যঙ্গরচনায ত্রৈলোক্যনাথের জুড়ি নেই। তাঁরই রচনা অনুসরণ করে উত্তরকালে অনেকে যশস্বী হয়েছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে এক নূতন রসেব জোগান দিয়েছেন, এরূপ নির্দোষ রসিকতার তিনিই প্রবর্তক।

গ্রন্থাবলী ঃ কঙ্কাবতী, ভূত ও মানুষ, ফোকলা দিগম্বর, মুক্তামালা, ভারতবর্ষীয বিজ্ঞানসভা, ময়না কোথায, মজার গল্প, পাপের পরিণাম, ডমরু-চরিত ইত্যাদি।

ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।। ১৮৪৯-১৯১১।। ইন্দ্রনাথ আইনজীবী ছিলেন, কলকাতার হাইকোর্টে ওকালতী করতেন। কিন্তু সাহিত্যেব প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাল্যকাল থেকে। গদ্যে ও পদ্যে তিনি সমান সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠকীর্তি তাঁর সম্পাদিত 'পঞ্চানন্দ'।

গ্রন্থাবলী ঃ উৎকৃষ্ট কাব্যম্‌, কল্পতরু, ভারত-উদ্ধার, হাতে হাতে ফল, পাঁচু ঠাকুর, তিনখণ্ড, খাজানার আইন, ক্ষুদিরাম, জাতিভেদ ইত্যাদি।

অমৃতলাল বসু।। ১৮৫৩-১৯২৯।। শৈশবাবধি অমৃতলাল বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি প্যারডি-রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি একাধারে নট ও নাট্যকার ছিলেন। বাংলার রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। রসরচনার গুণে তিনি দেশবাসীর কাছে 'রসরাজ' নামে পরিচিত ছিলেন।

গ্রন্থাবলী ঃ হীরকচূর্ণ নাটক, চোরের উপর বাটপাড়ি, তিলতর্পণ নাটক, ব্রজলীলা, ডিস্‌মিশ, চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে, বিবাহবিভ্রাট, কৌতুক-যৌতুক ইত্যাদি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।। ১৮৫৩-১৯৩১।। হরপ্রসাদের জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যাচর্চা। পুরাতত্ত্ব-আলোচনায় তাঁর অনুরাগ ছিল অপরিসীম। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' আবিষ্কার করে তিনি বঙ্গভাষীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় হরপ্রসাদ মৌলিক রচনা আরম্ভ করেন, এবং তদ্দ্বারা স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দেন।

গ্রন্থাবলী ঃ ভারত মহিলা, বাল্মীকির জয়, সচিত্র রামায়ণ, মেঘদূত-ব্যাখ্যা, কাঞ্চনমালা, বেনের মেয়ে, প্রাচীন বাংলার গৌরব, বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।। ১৮৫৪-১৯০৫।। যোগেন্দ্রচন্দ্রের বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কীর্তি 'বঙ্গবাসী'-প্রতিষ্ঠান স্থাপন; কেননা এই প্রতিষ্ঠান বঙ্গদেশের, বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গসমাজের অনেক কল্যাণ সাধন করেছে। তাঁর রচনায় তিনি সমাজের বিবিধ গ্লানি নিবারণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে 'মডেল ভগিনী' গ্রন্থ বিশেষভাবে পরিচিত।

গ্রন্থাবলী ঃ বাঙালী-চরিত, মডেল ভগিনী, চিনিবাস চরিতামৃত, কালাচাঁদ, পঞ্চানন্দ, কৌতুক-কণা, নেড়া হরিদাস ইত্যাদি।

স্বর্ণকুমারী দেবী।। ১৮৫৫-১৯৩২।। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। ইংরেজি সভ্যতা ও সাহিত্যের সংযোগে বঙ্গদেশের সাহিত্যে যে নবচেতনা জাগ্রত হয়, নারী-সমাজের পক্ষ থেকে স্বর্ণকুমারীই সেই চেতনার কলগীতি প্রথম ধ্বনিত করেন। গান গল্প উপন্যাস নাটক কৌতুকনাট্য প্রহসন কবিতা প্রবন্ধ—সাহিত্যের সব বিভাগেই তাঁর দানের পরিমাণ বিপুল।

গ্রন্থাবলী ঃ দীপনির্বাণ, বসন্ত-উৎসব, ছিন্নমুকুল মিবাররাজ, হুগলীর ইমামবাড়ী, বিবাহ উৎসব, নবকাহিনী, স্নেহলতা ইত্যাদি।

জলধর সেন।। ১৮৬০-১৯৩৯।। শৈশবকাল থেকে মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ। প্রথমজীবনে গোয়ালন্দে শিক্ষকতা করার সময়ে তিনি কাঙ্গাল হরিনাথের 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখতেন। ১৮৮৭ সালে জলধর সেন পারিবারিক শোকে অধীর হয়ে দেশত্যাগ করেন এবং হিমালয়-ভ্রমণ করেন। কিন্তু মুসাফিরকে অবশেষে আবার সংসারে প্রবেশ করতে হল। তিনি মহিষাদলে মাস্টারি গ্রহণ করলেন। তিনি অনেক পত্রিকার সঙ্গে সম্পাদনাকার্যে যুক্ত ছিলেন, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ভারতবর্ষ'।

গ্রন্থাবলী ঃ প্রবাস-চিত্র, চাহার দরবেশ, হিমালয়, নৈবেদ্য, হিমাচল-বক্ষে, কাঙ্গাল হরিনাথ, দানপত্র, তিনপুরুষ ইত্যাদি।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।। ১৮৬০-১৯০৮।। বর্ধমানের নপাড়া গ্রামে জন্ম। বাল্যশিক্ষা রাজশাহী জেলার পুঠিয়ায়। তাঁর পিতা পুঠিয়া রাজস্টেটের দেওয়ান ছিলেন, সেই উপলক্ষে রাজবাটীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। রাণীমাতা সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন, তাঁর সঙ্গে বালক শ্রীশচন্দ্র সাহিত্যালোচনা করতেন। এইভাবে সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। রবীন্দ্রনাথের তিনি অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ছিলেন, তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা ও চিঠি আছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনকে তাঁর

সমসাময়িক যে-কযজন বন্ধু পুষ্ট কবেছেন তাঁদেব মধ্যে শ্রীশচন্দ্র একজন। পুবাতন 'বঙ্গদর্শনে'ব শেষ পবিচালক ও নবপর্যায 'বঙ্গদর্শনে'ব প্রবর্তক ও প্রধান সহায বলে তিনি পবিচিত।

গ্রন্থাবলী : শক্তি-কানন, ফুলজানি, কৃতজ্ঞতা, বিশ্বনাথ, বাজ-তপস্বিনী ইত্যাদি।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।। ১৮৬১-১৯৪০।। ববীন্দ্রনাথেব অন্তবঙ্গ সুহৃদ্। কবাচিতে অবস্থান কবেন, তখন 'প্রবাসেব চিঠি' ও 'কবাচিব চিঠি' নামে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' (১২৯২ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায প্রকাশিত হয। কবাচিতে 'ফিনিক্স' পত্রিকা ও লাহোবে 'ট্রিবিউন' পত্র সম্পাদনা কবেন। পবে, বামানন্দ চট্টোপাধ্যাযেব অবসব গ্রহণেব পব 'প্রদীপ' সম্পাদনা কবেন।

গ্রন্থাবলী : স্বপনসঙ্গীত, পর্বতবাসিনী, অমবসিংহ, সংগ্রহ, লীলা, জয়ন্তী, আবাতামা ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব।। ১৮৬১-১৯৪১।। জোড়াসাঁকো-ঠাকুবপবিবাবেব পুত্র—দেবেন্দ্রনাথ ও সাবদা দেবীব চতুর্দশ সন্তান। সাহিত্যেব আবহাওযাব মধ্যে মানুষ। শৈশবকাল থেকেই সাহিত্যেব প্রতি অনুবাগ দেখা যায। কবিতা গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ সংগীত—সকল স্তবেই সমান দক্ষতাব এরূপ দৃষ্টান্ত বিবল। ষোলো বৎসব বযঃক্রমকালে সদ্যপ্রকাশিত 'ভাবতী' পত্রিকায বচনা আবম্ভ কবেন। তাঁব দীর্ঘদিনেব তপস্যাব ও সাধনাব স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুবস্কাব পান। ১৯২১ সালে বিশ্বভাবতী প্রতিষ্ঠা কবেন, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও শ্রীনিকেতনে পল্লীসেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা তাঁব অন্যতম কীর্তি। তাঁব বচিত গ্রন্থেব সংখ্যা সামান্য নয। সে এক দীর্ঘ তালিকা।

শরৎকুমারী চৌধুবাণী।। ১৮৬১-১৯২০।। বাংলা সাহিত্যেব ক্ষেত্রে মহিলা সাহিত্যিকদেব সংখ্যা যদিও কম, অবদান সামান্য নয। ঘবোযা সংসাব-জীবনেব চিত্রবচনায শবৎকুমাবী বিশেষ পাবদর্শিতা দেখিয়েছেন। চোববাগানেব বসুপবিবাবে তাঁব জন্ম। তাঁব স্বামী অক্ষযকুমাব চৌধুবী। কলকাতাব ঠাকুবপবিবাবেব সঙ্গে অক্ষযকুমাবেব ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা ছিল। সেই সূত্রে শবৎকুমাবীও ঠাকুবপবিবাবেব সঙ্গে অন্তবঙ্গ হন। তিনি 'ভাবতী' পত্রিকাব নিযমিত লেখিকা ছিলেন। তাঁব বহু বচনা সামযিক পত্রেব পৃষ্ঠায আত্মগোপন কবে আছে।

গ্রন্থাবলী : শুভবিবাহ, শবৎকুমাবী চৌধুবাণীব বচনাবলী।

কেদাবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায।। ১৮৬৩-১৯৪৯।। চব্বিশ পবগনাব দক্ষিণেশ্ববে নিবাস। প্রথমজীবনে 'সংসাবদর্পণ' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদন কবেন। সেই সময থেকেই সাহিত্যচর্চাব প্রতি প্রবল আগ্রহ জন্মে। অনেক স্যাটাযাব ও কবিতা বচনা কবেছেন। ফ্রেনলজি ও সামুদ্রিক নিযেও অনেক সময অতিবাহিত কবেন। কেদাবনাথ তাঁব দীর্ঘজীবনেব সাহিত্যসাধনাব ফলে বঙ্গসাহিত্যকে উনিশখানি মুদ্রিত পুস্তক উপহাব দিযেছেন।

গ্রন্থাবলী : বত্নাকব, গুপ্তবত্নোদ্ধাব, কাশীব কিঞ্চিৎ, কাশী-সঙ্গীতাঞ্জলী, চীনযাত্রী, শেষ খেযা, আমবা কি ও কে, কবলুতি, আই হ্যাজ, স্মৃতিকথা ইত্যাদি।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।। ১৮৬৫-১৯৩১।। পাকুড়িয়া-পাবনা। প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ডেপুটি কালেক্টর ও পবে ইন্‌কাম ট্যাক্স বিভাগেব ডেপুটি কমিশনাবেব পদ পান। পরিণত বয়সে ছোট গল্প রচনায় ব্রতী হন।

গ্রন্থাবলী : ছোট ছোট গল্প, কর্মযোগেব টীকা আনন্দ পর্যটন, পূজাব আসব প্রভৃতি।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।। ১৮৬৮-১৯২৯।। লঘুরসের সাহিত্যরচনা করে একদা যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, ললিতকুমার তাঁদের অন্যতম। ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। নদীয়া জেলার শান্তিপুরে তাঁর জন্ম। তিনি কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন।

গ্রন্থাবলী ঃ ফোয়ারা, ব্যাকরণ-বিভীষিকা, অনুপ্রাস, ক-এর অহঙ্কার, পাগলাঝোরা, প্রেমের কথা ইত্যাদি।

প্রমথ চৌধুরী।। ১৮৬৮-১৯৪৬।। প্রমথ চৌধুরীর রচনায় সর্বত্র মজলিশি মেজাজের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। তিনি ব্যারিস্টারি পাস করে কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন, কিন্তু আইন-ব্যবসায়ে বেশিদিন লিপ্ত ছিলেন না। তিনি নানাজাতীয় মানুষের সংস্পর্শে আসেন, তাঁর রচিত গল্পে এইসব অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। চলতি ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হওয়া যে সম্ভব তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি ১৩২১ বঙ্গাব্দে 'সবুজ পত্র' প্রকাশ করেন। কবিতারচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

গ্রন্থাবলী ঃ তেল নুন লকড়ি, সনেট-পঞ্চাশৎ, চার-ইয়ারি কথা, বীরবলের হালখাতা, নানাকথা, পদ-চারণ, নীললোহিতের আদিপ্রেম ইত্যাদি।

দীনেন্দ্রকুমার রায়।। ১৮৬৯-১৯৪৩।। নন্দনকানন সিরিজ ও রহস্যলহরী সিরিজ লেখায় দীনেন্দ্রকুমারের সাহিত্যিক সুনাম অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হলেও বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্র থেকে তিনি স্থানচ্যুত হন নি। তাঁর 'পল্লীচিত্র', 'পল্লীবৈচিত্র্য' ও 'পল্লীচরিত্র' গ্রন্থাবলীতে তিনি তাঁর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ রেখে গিয়েছেন। 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় সর্বপ্রথম তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থাবলী ঃ বাসন্তী, হামিদা, পট, অজয়সিংহের কুঠী, পল্লীচিত্র, পল্লীবৈচিত্র্য, চীনের ড্রাগন, পল্লীচরিত্র ইত্যাদি।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।। ১৮৬৯-১৯২৯।। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থা থেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী। মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়—অগ্রহায়ণ ১২৯৮। বাংলা সাহিত্যে তাঁর দানের পরিমাণ খুব বেশি নয়, কিন্তু সকল রচনাই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

গ্রন্থাবলী ঃ দোলা, মঞ্জুষা, মায়ার বন্ধন, দাসী, চিত্ররেখা, বৈতানিক, করঙ্ক ইত্যাদি।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।। ১৮৭০-১৯২১।। ইনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র। ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে সংস্কৃত পাঠ করে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। অল্পবয়সে স্বল্পপুঁজিতে 'সাহিত্য' পত্রিকা সম্পাদন আরম্ভ করেন। অনেক লেখক সৃষ্টি তাঁর অন্যতম সাহিত্যিক দান। 'সাহিত্য' ছাড়া 'বসুমতী', 'সন্ধ্যা', 'নায়ক', 'বাঙ্গালী' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদন করেছেন।

গ্রন্থাবলী ঃ কল্কিপুরাণ, সাজি, রণভেরী, ইউরোপের মহাসমর, ছিন্নহস্ত, বঙ্কিমপ্রসঙ্গ প্রভৃতি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।। ১৮৭১-১৯৫১।। অবনীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে বেশি দূর পড়াশুনা করেন নি। ছবি-আঁকাতেই তাঁর আগ্রহ ছিল। পরে সাহিত্য-চর্চা আরম্ভ করেন। চিত্রশিল্পী হিসাবে তিনি বিশ্ববিখ্যাত, কথাশিল্পী হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব সামান্য নয়। তাঁর ভাষায় চিত্রকরের কারুকাজ লক্ষ্য করার মত। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভার মূল্যায়ন এখনো সঠিক ভাবে হয় নি। তিনি শিল্পী, এবং তিনি ভাষার জাদুকর।

গ্রন্থাবলী ঃ শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী, ভারতশিল্প, ভুতপত্রীর দেশ, নালক, বাংলার ব্রত, খাতাঞ্চির খাতা, প্রিয়দর্শিকা, বুড়ো-আংলা, ঘরোয়া, জোড়াসাঁকোর ধারে, মাসি, একে তিন তিনে এক, মারুতির পুঁথি, রং-বেরং, চাঁইবুড়োর পুঁথি ইত্যাদি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।। ১৮৭৩-১৯৩২।। বর্ধমানের ধাত্রীগ্রামে মাতুলালয়ে প্রভাতকুমারের জন্ম। আদি নিবাস হুগলী জেলার গুরুপ। বি. এ. পাস করার পর কিছুকাল ভারত-সরকারের আপিসে কেরানীগিরি করেন। তারপর অকস্মাৎ বিলাতযাত্রার সুযোগ লাভ করে সেখানে গিয়ে তিনি ব্যারিস্টারি পাস করেন। দেশে ফিরে কিছুকাল রংপুরে তারপর গয়ায় প্র্যাকটিস করেন। জীবনের শেষভাগে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল-কলেজে অধ্যাপনা করেন। ছাত্রাবস্থাতেই সাহিত্যসেবা তিনি আরম্ভ করেন। প্রথমে কবিতা লিখতেন, তারপরে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে গল্পরচনা আরম্ভ করেন।

গ্রন্থাবলী ঃ নবকথা, অভিশাপ, ষোড়শী, রমাসুন্দরী, দেশী ও বিলাতী, নবীন সন্ন্যাসী, গল্পাঞ্জলি, রত্নদ্বীপ ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।। ১৮৭৬-১৯৩৮।। নিবাস—দেবানন্দপুর, হুগলি। বাল্যকালে দেবানন্দপুরেই গল্পরচনায় হাতেখড়ি। পরে, কৈশোরে ও প্রথম-যৌবনে ভাগলপুরে মাতুলালয়ে সাহিত্যসাধনা বিশেষ অগ্রসর হয়। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যজীবনের আরম্ভ বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়, ব্রহ্মপ্রবাসকালে। গল্প ও উপন্যাস রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য লোকমুখে কথাসাহিত্য-সম্রাট রূপে বিখ্যাত হন। 'ভারতী' পত্রিকায় ১৯০৭ সালে 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়; কয়েক বছর পরে পুস্তকাকারে বইটি প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থাবলী ঃ বড়দিদি, বিরাজবৌ, বিন্দুর ছেলে, পরিণীতা, পণ্ডিত মশাই, পল্লী-সমাজ, চন্দ্রনাথ, বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়া, শ্রী কান্ত ৪ পর্ব, দেবদাস, নিষ্কৃতি, চরিত্রহীন, দত্তা, গৃহদাহ, দেনাপাওনা, হরিলক্ষ্মী, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন, বিপ্রদাস ইত্যাদি।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।। ১৮৭৭-১৯৩৮।। মালদহ জেলার চাঁচল গ্রামে জন্ম। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করে যশস্বী হন। সাহিত্যসাধনার সঙ্গে পত্রিকা-সম্পাদনাতেও বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। ইনি কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা করেন। 'প্রবাসী' পত্রিকার সহঃসম্পাদক ছিলেন।

গ্রন্থাবলী ঃ হাইফেন, যমুনাপুলিনে ভিখারিণী, সর্বনাশের নেশা, পরগাছা, পঞ্চদশী, চোরকাঁটা, নষ্টচন্দ্র ইত্যাদি।

রাজশেখর বসু।। ১৮৮০-১৯৬০।। ছদ্ম নাম পরশুরাম। প্রথম জীবনে সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। বেয়াল্লিশ বৎসর বয়সে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' রচনার দ্বারা হঠাৎ খ্যাতি অর্জন করেন। সে খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ব্যঙ্গ-রচনায় যেমন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাতেও তেমনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

গ্রন্থাবলী ঃ গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন, চলন্তিকা, লঘুগুরু, মেঘদূত, ভারতের খনিজ, কুটীরশিল্প, চলচ্চিন্তা, চমৎকুমারী ইত্যাদি।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।। ১৮৮১-১৯৬০।। বিহারের ভাগলপুরে জন্ম। তিনি 'বিচিত্রা' পত্রিকার সম্পাদকরূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। সাহিত্যই তাঁর জীবনের একমাত্র উপাস্য ছিল; সংগীতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। জীবনের শেষভাগে তিনি 'গল্পভারতী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন পারিবারিক সম্পর্কে তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মাতুল ছিলেন।

গ্রন্থাবলী : রাজপথ, দিকশূল, অমূলতরু, বিদুষী ভার্যা, শশিনাথ, অমলা, নবগ্রহ ইত্যাদি।

অনুরূপা দেবী।। ১৮৮১-১৯৫৮।। পিতামহ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, তাঁর কাছেই অনুরূপা দেবী জীবনের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, 'ভারতী' পত্রিকায় অনুরূপার 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এর আগে কুন্তলীন প্রতিযোগিতায় গল্প লিখে পুরস্কৃত হন। এঁর স্বামীর নাম শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থাবলী : পোষ্যপুত্র, মন্ত্রশক্তি, মহানিশা, মা ইত্যাদি।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।। ১৮৮২-১৯৬০।। ইনি বহু উপন্যাস রচনা করেছেন। কলকাতা হাইকোর্টে বহুদিন আইন ব্যবসায়ে রত ছিলেন। এই কাজে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। বিভিন্ন কলেজে ইনি আইনের অধ্যাপনাও করেছেন। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যসাধনায় ছেদ পড়ে নি। এমন এক সময় ছিল যখন সর্বসাধারণ নরেশচন্দ্রের উপন্যাস সাগ্রহে পাঠ করতেন।

গ্রন্থাবলী : শুভা, সর্বহারা, অগ্নিসংস্কার, শাস্তি, সতী, মেঘনাদ, প্রহেলিকা, তরুণী ভার্যা, অভয়ের বিয়ে, বংশধর, টিকি বনাম টাক, দ্বিতীয় পক্ষ ইত্যাদি।

নিরুপমা দেবী।। ১৮৮৩-১৯৫১।। বাংলা সাহিত্যে যে-কয়জন প্রতিভাশালিনী লেখিকার আবির্ভাব ঘটেছে নিরুপমা দেবী তাঁদের অন্যতমা। বহরমপুরের সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী পরিবারে তাঁর জন্ম, কিন্তু অতি অল্প বয়সে, ১৮৯৭ সালে, তাঁকে বৈধব্যবরণ করতে হয়। তিনি জীবনের সহচর করে নিলেন সাহিত্যকে। অনুরূপা দেবীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল, তাঁরা উভয়ে উভয়ের 'গঙ্গাজল' ছিলেন। কঠোর ব্রতপালন, জপতপ ও তীর্থপর্যটনে জীবনের দীর্ঘকাল তিনি অতিবাহিত করেছেন।

গ্রন্থাবলী : অন্নপূর্ণার মন্দির, দিদি, অষ্টক, আলেয়া, শ্যামলী, বন্ধু, দেবত্র, আমার ডায়েরী, যুগান্তরের কথা, অনুকর্ষ ইত্যাদি।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।। ১৮৮৪-১৯৬০।। ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্য-সাধনায় লিপ্ত। এঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক, প্রায় শতাধিক—বড়দের জন্যেও যেমন, ছোটদের জন্যেও তেমনি। 'ভারতী' সাহিত্যচক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পরবর্তীকালে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকও হন।

গ্রন্থাবলী : কাজরী, বাবলা, আঁধি, রাঙামাটির পথ, লাখ টাকা, আরব্য উপন্যাসের গল্প ইত্যাদি।

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত।। ১৮৮৬-১৯৫৭।। একাত্তর বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সারাজীবন তিনি সাহিত্যের নিভৃতেই সাধনা করেছেন। আত্মপ্রচারে তিনি উদাসীন ছিলেন। কিন্তু প্রথম দিকে তিনি যেমন সুযশ ও কীর্তি অর্জন করেন, জীবিতকালেই তিনি তাঁর সেই কীর্তি ম্লান হয়ে যেতে দেখেছেন। কিন্তু তাতে বোধহয় কিছু যায়-আসে না। বিস্মৃতির অতল থেকেও নূতনভাবে অভ্যুত্থান অনেকের ঘটতে দেখা গিয়েছে।

গ্রন্থাবলী : লঘুগুরু, রোমন্থন, রতিবিরতি, সুতিনী, অসাধু সিদ্ধার্থ ইত্যাদি।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।। ১৮৮৮-১৯২৯।। পারিবারিক পরিচয়ে ইনি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের জামাতা। বিভিন্ন ধরনের রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল। বড়দের জন্যে যেমন, ছোটদের জন্যেও তেমনি তিনি অনেক রচনা করেছেন। তাঁর লিখিত নাটক এককালে সাধাবণ রঙ্গালয়ে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। 'ভারতী' পত্রিকাব অন্যতম সম্পাদক ছিলেন।

গ্রন্থাবলী : জাপানী ফানুশ, কায়াহীনের কাহিনী ইত্যাদি।

দীনেশরঞ্জন দাশ।। ১৮৮৮-১৯৪১।। ঢাকা জেলার বিক্রমপুব পরগনার কুমোরপুর গ্রামে জন্ম। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে এনট্রান্স পড়া ছেড়ে দেন। কলকাতায় এসে আর্টস্কুলে ভর্তি হন। অনেক রকম কাজ তিনি করেছেন। প্রথমে একটি দোকানে সেল্‌স্‌ম্যান, পবে ব্যবসায। গোকুল নাগের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ১৯২১ সালে, এবং শিল্প ও সাহিত্যে মনোযোগ ঘটে। ফোর আর্টস্‌ ক্লাব স্থাপনা, এবং 'কল্লোল' পত্রিকা সম্পাদনা তাঁর জীবনেব উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পরে চলচ্চিত্র শিল্পে আত্ম-নিয়োগ করেন।

গ্রন্থাবলী : ঝড়ের দোলা, মাটির নেশা, রাতের বাসা, দীপক, উতঙ্ক ইত্যাদি।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী।। ১৮৯০-১৯৬০।। ইনি যেমন সুবসিক তেমনি বন্ধুবৎসল ছিলেন। 'ভারতী'র সঙ্গে ইনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এঁর রচিত 'আনাবকলি' গ্রন্থটি এঁব খ্যাতিব অন্যতম কারণ। 'যাদুকর' নামক একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন কবেন। 'মহাস্থবিব জাতক' এঁর পরিণত বয়সেব রচনা—এই গ্রন্থ সাহিত্যবসিকসমাজে বিশেষ সমাদব লাভ কবে।

গ্রন্থাবলী : আনারকলি, চাষার মেয়ে, দুই রাত্রি, ঝড়ের পাখি, মহাস্থবিব জাতক ইত্যাদি।

কিরণশঙ্কর রায়।। ১৮৯১-১৯৪৯।। ঢাকা জেলাব মানিকগঞ্জ মহকুমাব অন্তর্গত তেওতাব বিখ্যাত জমিদার-বংশে জন্ম। কলকাতার হিন্দু স্কুলের ছাত্র, তারপব সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ. এ. পাস করেন মাত্র সতেবো বৎসর বযসে। উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যান। ইতিহাসে ট্রাইপস-সহ অক্সফোর্ড থেকে গ্র্যাজুয়েট হন। দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসেব অধ্যাপক হন। ১৯১৭ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে অসহযোগ-আন্দোলনে যোগদান কবেন। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হন। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গেব মন্ত্রিসভায যোগ দেন। ইনি 'সবুজ পত্রে'র লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। প্রবাসী, আত্মশক্তি পত্রিকাতেও এঁব বচনা প্রকাশিত হয়েছে। একটি মাত্র গ্রন্থের রচয়িতা।

গ্রন্থ : সপ্তপর্ণ।

বিজয়রত্ন মজুমদার।। ১৮৯৩-১৯৬০।। বহুকাল যাবৎ বিবিধ পত্রিকা সম্পাদকতা করেন। সাপ্তাহিক 'বাঙলা' পত্রিকা ১৯২৩ সাল থেকে মৃত্যুকাল অবধি সম্পাদনা করেন। কিছুকাল সাপ্তাহিক 'শিশির' পত্রিকা এবং 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। অতি রসিক ও বন্ধুবৎসল ছিলেন, দেশভ্রমণে ও মৎস্যশিকারে উৎসাহ ছিল প্রবল।

গ্রন্থাবলী : সাথী, গৃহদেবী, লেডী ডাক্তার, স্ত্রীর চিঠি, সতীত্বের মূল্য, প্লাবন আবহাওয়া ক্ষুধা, রাজস্থানের গল্প ইত্যাদি।

শান্তা দেবী।। ১৮৯৪-১৯৬০।। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা। শৈশবাবধি সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যে লালিত। 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখা আরম্ভ। ডক্টর কালিদাস নাগ ইঁহার স্বামী।

গ্রন্থাবলী : হিন্দুস্থানী উপকথা (সীতা দেবীর সঙ্গে), বিদ্যুৎলতা (সীতা দেবীর সঙ্গে)।

গোকুলচন্দ্র নাগ।। ১৮৯৪-১৯২৫।। গোকুলচন্দ্র আসলে একজন চিত্রশিল্পী। গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে তিনি অতুল বসু, যামিনী রায় প্রভৃতির সহাধ্যায়ী ছিলেন। তৈলচিত্র অঙ্কন করে তিনি অর্থোপার্জন আরম্ভ করেন, কিন্তু ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকাতেই তাঁর আগ্রহ ছিল অধিক। আর্কিয়োলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের চাকুরি করেন, তখন ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের বহুদেশ ও অবজ্ঞাত স্থান পরিভ্রমণ করেন। এ'তে তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটে। তিনি শিল্পী, সেইসঙ্গে 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প রচনাও করেন, তখনই তাঁর সাহিত্যিক সত্তার পরিচয়ে সকলে মুগ্ধ হন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা কালিদাস নাগের সঙ্গে জাঁ ক্রিস্তভ অনুবাদ করেন। ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে না পেরে অকালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

গ্রন্থ : পথিক।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।। ১৮৯৪-১৯৫০।। 'পথের পাঁচালী' খ্যাত বিভূতিভূষণ বি এ পাশ করার পর কিছুকাল চব্বিশ পরগনা জেলার হরিনাভিতে স্কুলমাস্টারি করার পর ভাগলপুরের সন্নিকটে জমিদারের স্টেটের ম্যানেজারির কাজ করেন। সেখানে থেকে ফিরে পুনরায় স্কুলমাস্টারি করেন কলকাতায়। তাঁর রচনায় গ্রামজীবনের চিত্র স্পষ্টভাবে চিত্রিত।

গ্রন্থাবলী : দৃষ্টিপ্রদীপ, যাত্রাবদল, নবাগত, তৃণাঙ্কুর, আরণ্যক, মৌরীফুল, আদর্শ হিন্দু হোটেল, অপরাজিত, বিধুমাস্টার, ইছামতী, দেবযান, উর্মিমুখর, মেঘমল্লার, অনুবর্তন ইত্যাদি।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।। ১৮৯৫-১৯৬০।। বাংলা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির কথার সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদের নাম জড়িত। জীবনের দীর্ঘকাল এঁর প্রবাসজীবন কাটে—লখনউয়ে অধ্যাপনাতে নিযুক্ত ছিলেন। প্রবাসজীবন অতিবাহিত করলেও বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর যোগ নিয়মিত। সংগীত সাহিত্য শিল্প – সর্ববিষয়েই এঁর রুচি সমান উচ্চাঙ্গের। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংগীত বিষয়ে পত্রালাপ করেছেন, প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে'র সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ রেখেছিলেন।

গ্রন্থাবলী : কথা ও সুর (রবীন্দ্রনাথ-সহ), অন্তঃশীলা, বক্তব্য, মনে এল ইত্যাদি।

সীতা দেবী।। ১৮৯৫-১৯৬০।। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। শান্তা দেবীর মত ইঁহার জীবনও সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যে পরিপুষ্ট। অনেক উপন্যাস রচনা করে একসময়ে বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক রূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কবি সুধীরকুমার চৌধুরী ইঁহার স্বামী।

গ্রন্থাবলী : চিরন্তনী, সোনার খাঁচা, পরভৃতিকা, হিন্দুস্থানী উপকথা (শান্তা দেবীর সঙ্গে), বিদ্যুৎলতা (শান্তা দেবীর সঙ্গে) ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র।। ১৮৯৬-১৯৩২।। বাংলা সাহিত্য এঁর কাছ থেকে অনেক আশা করেছিল, কিন্তু অপরিণত বয়সে মৃত্যুর জন্য সে আশা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নি। দিবাকর শর্মা ছদ্মনামে ইনি দৈনিক পত্রিকায় লিখতেন। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ 'মানময়ী গার্লস স্কুল'। গল্প রচনায় এঁর দক্ষতা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়েছিল।

গ্রন্থাবলী : ত্রিলোচন কবিরাজ, উদাসীর মাঠ, থার্ড ক্লাস, দধিকর্দম, মানময়ী গার্লস স্কুল ইত্যাদি।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।। ১৮৯৬-১৯৬০।। ইনি প্রবাসী বাঙালী। দ্বারভাঙায় অবস্থান করেন। রসরচনায় দক্ষতা অসামান্য। যেসব চরিত্র ইনি অঙ্কন করেছেন তা যেমন সহজ তেমনি স্বাভাবিক এবং তেমনি নিখুঁত। বহুদিন থেকে ইনি রচনাকার্যে লিপ্ত আছেন, কিন্তু গ্রন্থপ্রকাশ আরম্ভ হয়েছে অনেক দেরিতে। তৎসত্ত্বেও গ্রন্থের সংখ্যা এখন আর সামান্য নয়।

গ্রন্থাবলী ঃ রাণুর প্রথম ভাগ, রাণুর দ্বিতীয় ভাগ. বরযাত্রী, বসন্তে, বর্ষায় নীলাঙ্গুরীয়, রিকশার গান ইত্যাদি।

পরিমল গোস্বামী।। ১৮৯৭-১৯৬০।। পাবনা ও পরে ফরিদপুর জেলার অধিবাসী। পিতা বিহারীলাল গোস্বামী ছিলেন বহুভাষাবিৎ, কবি, প্রবন্ধকার। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে সম্ভবত পিতার প্রভাবে। ১৯২০ সালে বি. এ. পাশ করে কিছুকাল বিশ্বভারতীতে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৩ সালে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে যোগ্যতার সঙ্গে এম. এ. পাশ করেন। ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। 'বসুমতী', 'কল্লোল', 'উপাসনা' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রথম লেখা শুরু করেন! কিছুকাল, ১৯৩২ থেকে ১৯৩৬, 'শনিবাবের চিঠি'র সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৮ সালে 'সচিত্র ভারত' ও ১৯৩৯ সালে প্রমথ চৌধুরীর সহযোগীরূপে 'অলকা' মাসিক পত্র সম্পাদন কবেন। ১৯৪৫ সাল থেকে 'যুগান্তর' পত্রিকার সাহিত্য-বিভাগের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

গ্রন্থাবলী ঃ মারকে লেঙ্গে, ঘুঘু, পথে পথে, ম্যাজিক লণ্ঠন, সপ্তপঞ্চ, স্মৃতিচিত্রণ ইত্যাদি।

মণীন্দ্রলাল বসু।। ১৮৯৭-১৯৬০।। ইনি ব্যারিস্টার। খুব বেশি লেখেন নি, কিন্তু স্বল্পরচনার দ্বারাই পাঠকচিত্ত জয় করেছেন। 'রমলা' গ্রন্থটি রচনা করেই ইনি খ্যাত হন। 'প্রবাসী' পত্রিকার গল্প প্রতিযোগিতায় মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেন, গল্পের নাম 'অরুণ'। ইউরোপের চিত্রশিল্প সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধও রচনা করেছেন।

গ্রন্থাবলী ঃ রমলা, মায়াপুরী, সোনার হরিণ, রক্তকমল, কল্পলতা, জীবনায়ন, সহযাত্রিণী, স্বপ্ন ইত্যাদি।